বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী

ওমার খৈয়ম

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত

৪৭শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৩০ { প্রথম সংখ্যা

বিভুতি

কে তুমি হে? জল্লাদ!
এতদিনে এসেছিস্ বঁধু?
আহা, তোর হাতখানি মধু!
কোথা হতে আসে শক্তি এ হাতেতে তোর!
কার আজ্ঞা-বলে হোস্ এমন কঠোর!
সে যে আপন আমার! নিত্য করে
অতি দূরে বাস!
তোর হাতে তার বার্ত্তাটি পেয়ে
লভিলাম শ্বাস!

কোথা মিত্র? কসাই!
এস, এস, লওহে আসন,
কর বিশ্রাম; তোমার ভাষণ
বহি আনে প্রতিধ্বনি স্বজন-কণ্ঠের!
নিভৃতনিবাসী যে হৃদি উপকণ্ঠের,
বৃত্তি তোমার তারি নিয়োজিত!
উদার আচার!
প্রতি কোপে তব সে জনার মোরে
দাও সমাচার!

এস হে কর্কশভাষ!
গুরু তুমি! দিলে নব দীক্ষা!
তোমা হতে লভিনু তিতিক্ষা!
পাদ্য-অর্ঘ্য লও, মম পুজা-উপচার!
শ্রুতিসহিষ্ণুতা দেহে করিলে সঞ্চার
অভাব মিটানো তরে যে তোমারে
পাঠাইল দূত,
সে মোর ঘরের লোক একাত্ম,
ওহে অবধূত!

অবজ্ঞা ও উপহাস!
কুমার যুগলে নমস্কার!
কৃপা বলে হল তিরস্কার
সন্দেহ, অব্যভিচারিণী ভক্তি মম
জ্বলিল নিবাত নিষ্কম্প দীপ সম!
সজ্জন হে দংশনে করিলে স্থির,
দৃঢ়নিশ্চয়!
মিলন-সম্বাদে তার শান্ত হল
দোদুল্য হৃদয়!

হিমালয় শ্রীসরলা দেবী।

ছেলে ভোলানো ছড়া

বাংলার প্রায় সব গাঁয়েরই একটি করে নদী—তার পূর্ণি নদী, ক্ষীরাই নদী, ভাংলো নদী, চূর্ণি নদী এমনি কত কি নাম! কোন নদী গাঁয়ের মেয়ের মিষ্টি হাসির মতো মধুর, কোনো নদী দামাল ছেলের মতো দুর্জ্জয় ধারা নিয়ে খেলে চলেছে ঘরের ধারেই। এই সব নদী বেয়ে সদাগর আসে যায় বাণিজ্যে, বর আসে বিয়ে করতে চরে চরে নৌকো ভিড়িয়ে, নিয়ে চলে শ্বশুর-বাড়ী গাঁয়ের মেয়েটিকে জোয়ার বেয়ে,—মেয়ে আর ফেরে না! কিম্বা হয়তো আসে একটিবার বছরে, পূজোর সময় এতটুকু একটি মা,—কোলে এতটুকু ছেলে-মেয়েকে নিয়ে! নয়তো নৌকো আসে একদিন আচম্কা, সাদা কাপড়, শুধু হাত, সিঁথের সিঁদুর যার মুছে গেছে, ভিজে চোখ, এমন একজনকে নিয়ে,—যার বাপ-মায়ের দেশ ছাড়া কোথাও আর যাবার জায়গা নেই।

গাঁয়ের একধারে নদী আর একধারে মাঠ—হলদী-গুঁড়ির মাঠ, তেপান্তর মাঠ, তার মাঝ দিয়ে হাটে যাবার রাস্তা—ক্ষেতের ধার দিয়ে আকবাড়ীর পাশ দিয়ে খানা-ডোবা পেরিয়ে কতদূর চলে গেছে, তার ঠিক নেই! এদিকে নদীর স্রোত বেয়ে নৌকোর চলাচল ওদিকে রোদে-পোড়া মাঠ ভেঙ্গে গরুর গাড়ির চলাচল—ভোর না হতে কাঁকর-মাটির রাস্তার উপর চাকা-চলার শব্দ দিয়ে কতদূর থেকে গাড়ি সে জানিয়ে দেয় ঘুমন্ত গ্রামটিকে, আমি আসছি, জ্বালানি কাঠ বয়ে, ঘর ছায়বার খড় বয়ে, ভিন্ গাঁয়ের মানুষকে বয়ে, জমিদারের তশীলদারকে বয়ে! গাড়ি চলে যায় মাঠ-ঘাট রাঙা হয়ে ওঠে, হাটের পথে দেখা দেয় দলে দলে চওড়া লাল পেড়ে গড়া পরণে কালো-কালো মেয়ে, কারু মাথায় তরকারির ঝাঁকা—কারু বা মাথায় কালো মাটির হাঁড়ি-কুড়ি, কত ক্রোশ ধরে চলে আসছে তারা, কোন্ সব না-দেখা নদী পার হয়ে, না-দেখা কুমোরের চাকের, না-দেখা কামার-শালের, না-দেখা তাঁতির তাঁতের ভালমন্দ সামিগ্রী নিয়ে; চলতে চলতে তারা হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ায়, এক একবার মেঠো হাওয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে বুকের আঁচল সরিয়ে, আদুল গায়ে হাওয়া এসে লাগে ঝির-ঝির, সকাল বেলার হিম-হাওয়া, তার পর আবার তারা পথ চলে, কত মাঠের ধারে ধারে তারা বসে নেয়, থেকে থেকে গল্প করে, হাসি করে, ডোবার জলে পা ধুয়ে নেয়, ঘাসের ফুল খোঁপায় গুঁজে নিয়ে চলে যায় দলে দলে হাটের মুখে।

দূরে দেখা যায় রথতলায় নাট-বাড়ীর চূড়ো—অশথ বট আম জাম তেঁতুল গাছের সবুজ ঢেউ, তার উপর ঠাকুরের রথের ধ্বজা বাতাসে উড়ছে! এর ওধারে তালতলি, তেঁতুল-তলি, সারি সারি গাছে ঘেরা, পোড়া মাটির ঢেউয়ের বুকে খসে-পড়া নীল আকাশের টুকরোর মতো মস্ত বাঁধ, শালুক ফুলে আর জলে টল্‌টল্ করছে! রাখাল চলে এরি তীরে তীরে গরু চরিয়ে, গাঁয়ের মেয়েরা চলে এই খানে জল আনতে, সেখান থেকে দেখা যায় জমিদারের বাড়ী—আঁচিল পাঁচিল ঘেরা সাত-মহল বাড়ি দুয়োরে মস্ত হাতি বাঁধা!

এমনি একটির পর একটি গাঁ তার নদী তার ক্ষেত তার মাঠ তার ঘাট হাট বাট বাড়ি ঘর নিয়ে ছবির মতো আঁকা দেখা যায়! এ জলা সে জলা মাঝে মাঝে এ ডাঙ্গা সে ডাঙ্গা, এ বন, সে বন এ গ্রাম সে গ্রাম এমনি যতদূর চলি ততদূর, যতদিকে চাই ততদিকে শাল-পিয়ালের বন, তার ফাঁকে ফাঁকে খড়ের চাল, সকাল বেলার সন্ধ্যা বেলার আকাশের কোণে আঁকা ছোট ছোট ছবি, ছবির মতই স্তব্ধ, শব্দ নেই কিন্তু সাড়া দিচ্ছে মনে—এই হল আমাদের বাংলা দেশ। এখানে এক গাঁয়ের খবর আর এক গাঁয়ে আসতে দিন কেটে যায়! হয়তো এসে পৌছল অনেক পরে, লোকের মুখে-মুখে ঠিক-ঠাক খবর, নয়তো বা হারিয়ে গেল খবরটা নতুন কোন গাঁয়ের খবরের মধ্যে তলিয়ে! (যেমন গ্রামের খবর মুখে মুখে, তেমনি ভাবে ছড়াগুলোর মধ্যে নানা ছবি নানা নানা খবর রয়ে গেছে। কারা যে সে সব খবর ছড়ায় ধরে ছড়িয়ে গেছে দেশে,

* The Greek Lullabies and Nursery Rhymes are from—Greek folk Poesy vol. 1. Garnett and Stuart Glennie.

তাদের নাম জানা যায় না, কিন্তু এই সব ছড়ার মধ্য দিয়ে তাদের প্রাণের সুর, তাদের চোখের দেখা সুস্পষ্ট এসে পৌঁছয় এখনো, আমাদের কাছে! আমাদের মায়ের চোখের দেখার মধ্যে দিয়ে, মুখের কথার মধ্যে দিয়ে!) কত কালের কত মাসি-পিসির মামা-মামির, দাদা-দিদির কত খবর, কতকালের দেখা ষষ্ঠীতলা, রথতলা, অপার নদী, তেপান্তর মাঠ, কত দুঃখের দিনের সুখের দিনের ঘরের বাইরের ছবি যে এসে যায়, তার ঠিক-ঠিকানা নেই;—পুরো ছবি, ছেঁড়া ছবি, পুরো সুর ভাঙ্গা সুর!

সে কোন্ কালের আলোতে প্রথম ফুটলো এই সব ছড়ানো রকম ছবি, এই সব ছোট ছোট ভাবের কলি, কার মুখে এর সুর প্রথম উঠলো এবং কোন্ ঘুমন্ত ছেলের কানে আর প্রাণে প্রথমে গিয়ে বাজলো, তা জানবার উপায় নেই। দেখি,(ছড়াগুলো কতক একেবারে সম্পূর্ণ ঘরের জিনিস হয়ে আছে, আবার দেশ-কালের বাইরেও চলে গেছে, কতক ছড়া যেমন—বাংলায় গাইলেন মা "হাটের ঘুম বাটের ঘুম ঘুম গড়াগড়ি যায়" গ্রীস দেশে মা গাইছেন, শুনি, "The wind is sleeping on the plains, the sun upon the height"—এমনি আমাদের মা গাইছেন "ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্ ঘুমচি গাছের পাতা"—তাদের মা গাইছেন, "The lemon blossom slumder too the balsam on their stem"···ছেলের চোখে ঘুম আসছে না, ভূমধ্য-সাগরের ধারে এক মা গাইছেন, "O Hushaby! thy mother sings yet liest awake my dearie and wide thine eyes are open still though mothers arms are weary! come dear sleep take my boy..."এদিকে বঙ্গসাগরের ধারে বাঙ্গালীর মা গাইছেন, "খোকা আমার ঘুম না যায় মিটি-মিটি চক্ষু চায় ঘুমের মাসি ঘুমের পিসি ঘুম দিলে ভাল বাসি!" গ্রীক ছেলের দুই চোখের পাতায় ঘুম দিয়ে যায় যারা দুটিতে, তারা কতকটা ধরা পড়ে গেছে দেশ-কালের মধ্যে,যেমন—"Saint Mariana lull to sleep,Saint Sophia bring slumber deep!") আমাদের ঘুমের মাসি ঘুমের পিসিও ঠাকুর হয়ে পড়া থেকে পার পান্‌নি, এক-আধ বার বাঁধা পড়েছেন ঠাকুর-ঘরে, যেমন—"গেরোস্তোর দুয়ারে ঘুম যায় রে বেতুয়া কুকুর আমাদের দুয়ারে ঘুম এস গো লক্ষ্মী নারাণ দুটি ঠাকুর" এটা হয়তো পাঠ ভুলের দরুণ হতে পারে,—"আমোদের দুয়ারে ঘুম যায় রে, লক্ষ্মীনারায়ণ দুটি ঠাকুর" এ রকমও হতে পারে কিন্তু আমার খোকার চোখে ঘুম এস গো হরিষ ঠাকুর এখানে হরিষ ঠাকুর বলে কোন্ দেবতা এলেন! খোকা সেও ঠাকুর হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে যেমন 'ছাই' গাদায় ঘুম যায় খেঁকি কুকুর খাট পালঙে ঘুম যায় খোকা ঠাকুর!" এখানে খোকার ঠাকুর (পিতা) বল্লে গোল হয় না।

(দেশ-কালের ছাপ পড়েছে অনেকগুলো ছড়ায়, যা থেকে ধরা যায় তাদের রচনার পরিষ্কার ইতিহাস; যেমন—ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে! ধান ফুরোলো পাণ ফুরোলো, এখন উপায় কি? আর কটা দিন সবুর কর আলু পেতেছি।" বর্গির পেট ভরাতে ধানে কুলোয় নি, পাণে কুলোয় নি, আলু পাতা সুরু হয়ে গেছে। বর্গীর আসার সঙ্গে সঙ্গে আলু এসেছে, এই খবরটা ধরা রয়ে গেছে ছড়াতে! আলুর সঙ্গে আরো অনেক সামগ্রী এসেছিল বিদেশী তারও খবর, যেমন—"এক নৌকো আলো চাল এক নৌকো ঘী, দাদা গেছেন বে কত্তে ইংরেজ-রাজার ঝী।" গড়ের বাগ্যি এসে গেছে—"নাড়া বনে কাড়া বাজে, লোকে বলবে কি!" খবরের অন্ত নেই, ঘী ময়দা তেল হলুদ কোথায় ভাল পাওয়া যায়, তার হিসেব, যেমন—"সায়দাবাদের ময়দা কাশিম বাজারের ঘী, একটু বিলম্ব কর লুচি ভেজে দি।" কিম্বা "তোমরা কে বলিবে কালো, পাটনা থেকে হলুদ এনে গা করিব আলো!" গোলপাতার ছাতাকে সাহেব কোম্পানির ছাতা মেরেছে, তার ট্রেডমার্ক দেখ—"গোপাল বেড়ায় অলি-গলি ছাতা ধর্‌গা বনমালি, ছাতার ভেতর কোম্পানি···!" যখন কড়ি চলেছে দেশে; আবার যখন টাকা চলেছে কোম্পানির, তারও খবর—"চার কড়া দিয়ে কিনলুম ঘুম, খোকার চোখে আয়" কিম্বা 'আয়রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই, দোলায় আছে ছ'পোণ কড়ি গুনতে গুনতে যাই।" তার পর টাকা এসে পড়েছে,কড়ি দিয়ে

আর কিছু পাওয়া যায় না, সস্তাও নেই সামিগ্রী—ঘুমের বাজার হাসির বাজারে সব জিনিষের চড়া দর—"এখন হাসিব কি চম্পাই নগরে হাসির বায়না দিয়েছি, হাসির ষোল টাকা মণ হাসি মাঝারি রকম!" আর পাড়া গাঁয়ে থেকে সংসার চলছেনা, বাড়ীর বড় ছেলে সহরে গেল চাকরি করতে চাষ বাস ছেড়ে—"দাদাগো দাদা সহরে যাও তিন টাকা করে মাইনে পাও।" কোন কোন দাদার বড় চাকরীও জুটলো, সদাগর আফিসে বড় বাবু হ'য়ে চল্লেন দাদা—"ও দাদা ভাই কমনে যাবে, হাজার টাকা মাইনে পাবে, চন্দ্রকলা বৌ আনবে!" ফস্ করে তখন আর মেয়ের বিয়ে হয় না, খেলা-ঘরে পুতুলের বিয়ের মতো সহজ নেই সত্যি মেয়ের বিয়ে—"এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে, এখন কেন কান্‌ছো বাবা গামছা-মুড়ি দিয়ে!" খুকুমণির বিয়েতে আগে টাকার কথা ছিল না "খুকুমণির বিয়ে দেব হট্টামালার দেশে, তারা গাই-বলদে চষে, তারা হীরেয় দাঁত ঘসে, রুই মাছ পালংএর শাক ভারে ভারে আসে··!"

ইতিহাস যে ভাবে ঘটনার খবর দেয় কিম্বা খবরের কাগজের খবর যে ভাবে আসে, এই সব ছড়ার মধ্যে দিয়ে খবরগুলো ঠিক তেমন ভাবে আসে না আমাদের কাছে, ছড়াতে খবরটার সঙ্গে যে খবর দিচ্ছে, সে এবং তার তখনকার আনন্দ সুখ-দুঃখ সব জড়িয়ে রসালো হয়ে আসে জিনিষটা যৎসামান্য হলেও! কবে কোন্ এক ময়রা বুড়ো রথে খুব ধুম-ধাম করেছিল—ইতিহাসে কিম্বা খবরের কাগজে এটা ধরতে হলে ময়রার নাম ধাম তার জন্ম-মৃত্যুর সন-তারিখ ইত্যাদিই কাজে আসতো কিন্তু ছড়ার খবর দেওয়ার ধরণই স্বতন্ত্র; সেখানে ময়রা, রথ এবং যে রথ দেখছে সবাই এল ছবির মতো সাম্‌নে; কিন্তু কে তারা, নাম কি, কোথায় ছিল তাদের বাস, কিছুই ধরা নেই ছড়ার খবরে, ছোট একটু কথা-বার্ত্তার রূপ ধরে এল খবর, যথা—একদল বল্লে—

ও পারে এক ময়রা বুড়ো রথ করেচে তেরো চূড়ো,
বানরে ধরেছে ধ্বজা দিদিগো দেখতে মজা!"

অন্য দল উত্তর দিলে—

তোদের হলুদ-মাখা গা তোরা রথ দেখতে যা,
আমরা হলুদ কোথা পাবো? আমরা উল্টো রথে যাবো।

নদী তার এপার ওপার দুপারের খবর, রথখানার সাজ-সজ্জা ও বাঁধুনি এবং যারা রথ দেখতে যাবে এবং যারা যাবে না, তাদের মুখ-বাঁকানো এবং বাঁকা বাঁকা কথার সুর এমন কি চেহারা, মায় গায়ের রং-এর খবরটিও এসে গেল পরিষ্কার! ছবি আঁকার আর্ট, কথা বলার আর্ট, মায় সুর ধরার আর্ট একসঙ্গে মিলে একছড়া হার হয়ে উঠেছে যেন!

গড়ন যে করে সে যদি খুব ভাল করেও একটা খোকা-পুতুল গড়ে, তবে সেটা পুতুলের বেশী হয় না; কিন্তু ছড়ার খোকা, সে জীবন্ত খোকা—"খুকু বলতে পারে কইতে পারে সইতে পারে না, খেতে পারে নিতে পারে দিতে পারে না!" খুকুর আধ আধ বোল শোনা যাচ্ছে, ছেলের অভিমানে ঠোঁট ফোলানো দেখা যাচ্ছে! যে নিতে পারছে সব কচি হাতের মুঠোয়, মুখে দিচ্ছে যা পাচ্ছে তাই, অথচ কাউকে কিছু প্রতিদান দিতে পারছে না ছোট আছে বলে, সেই অক্ষম অবোধ শিশুকে জীয়ন্ত রূপে পাচ্ছি কাছে!

বায়স্কোপের চলন্ত ছবির চেয়ে জীবন্ত ছবি দেখ—"বৈরাগী ঠাকুর টং টং, কাউট্টা যাইতে বড় রং, ছলার ভিতর মালা থুইয়া বৈরাগী নাচে উচুৎ হইয়া!"

খুব বড় বড় পেণ্টারের হাতে আঁকা "Sunset" "The Evening Lamp" এমনি কত-কি অনড় অচল ছবি মাসিক পত্রিকায় তিন বর্ণে মুদ্রিত দেখেছি, তারা এতটুকু একটা ছড়ার কাছে হেরে যায়—"সায়মণির কোলে রতন মণি দোলে, দুগগো পিদিম জ্বলে!" আকাশ একটা উপল-মণির মতো নীল সবুজ গোলাপি আভা নিয়ে ঝক্‌ঝক্ করছে, তার মধ্যে একখানি মাণিকের মতো সূর্য্য দুলছেন! সন্ধ্যারাণী দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন, একটি দিনের একটু-খানি আলোকে মায়ের কোলে ছেলের মতো! একটির পর একটি তারা সাঁঝের পিদুম জ্বালিয়ে এই মাতৃ-মূর্ত্তির আরতি দিচ্ছে! এই বাইরের দৃশ্য তারি পাশে ঘরের দৃশ্য—"সাঁঝের বাতি নড়ে চড়ে সোনামণি ঘরে ঘর ঝলমল্ করে!" ছেলে নড়ছে দোলায়, পিলসুজে পিদুমের শিষ নড়ছে, চঞ্চল আলো প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে এতে বসছে ওতে বসছে, ছাওয়া দুলছে মাটির দেওয়ালে এ কোণে ও কোণে!

আঁকা ঘরের দৃশ্যে এই ঝলমল্ দোলা আনাই মুস্কিল। "দোলেরে মাল চন্দনী গোপাল।" এই যে চন্দনে মাখা মালার মতো দুলছে মার বুকে গোপাল, ছবি আঁকার হিসেবের মধ্যে একে ফেলতে হলে কতটা যে সেটা কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠবে, তা চিত্রকর মাত্রেই বুঝবে, এ শুধু কবিতায় প্রকাশ করা চলে। বড় একজন কবির দরকার এই ভাবে একটি লাইনকে ফুল-চন্দনের গন্ধে ভরপুর করে তুলতে হলে! এই সব ছড়ার মধ্যে যা বলা হল, তা খুব গভীর কিন্তু অতি সহজে সাদা কথায় বলা হল এবং তার সঙ্গে সে রইল যে বলছে—খেলার দিন চলে গেছে, খেলা ঘরের সাথীরা চলে গেছে, কত দিনের পরে কে কবে বাড়ী এসে বলেছিল চোখের জল ফেলতে ফেলতে এই কটা কথা, তা কে জানে—"এই খানটিতে খেলেছিলেম ভাঁড় কাটি নিয়ে, এই খানটি রুঁধে দিও ময়না-কাঁটা দিয়ে!" এমনি কত গুমরে-কান্না ধরা পড়েছে সহজ সুর নিয়ে ছড়াতে, "তোরা কে যাবি বাপ-মার দেশে, কার সঙ্গে কবো দুঃখের কথা, কারে দিয়ে লিখিয়ে পাঠাবো! দুঃখে যেতাম শুধু যেতাম সেও ছিল ভাল, মনের তাপে গায়ের বরণ হয়ে গেল কালো।" কার সঙ্গে কার ছাড়াছাড়ি, তাদের নাম কচিৎ পাওয়া যায়, ছড়ার মধ্যে কেবল তাদের কান্না দূরে থেকে আসে স্থান-কালের বাধা পেরিয়ে, চোখের জলের নদী বেয়ে! "ওপারেতে কালো রং বিষ্টি পড়ে ঝমঝম্, এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙ্গা টুকটুক্ করে, গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে"—চোখের জলে ভেজানো এ কার ছোট চিঠি!

এই আবার কোন্ গাঁয়ের কোন্ তিনকড়ি বলে মেয়ে কার ঘরে চলে গেছে, মায়ের প্রাণ থেকে থেকে কাঁদছে—"তিনকড়ি গো মা, তোমায় কোন কাহারে নিয়ে গেল দেখতে পেলেম না! আগে যদি জান্‌তাম গলা ধরে কান্‌তাম···।" খুব ধুমধাম করে ঢাক বাজিয়ে বর এসে নিয়ে গেছে কনেকে—এতটুকু সুন্দুরী-গাঁয়ের হয়তো কালো মেয়ে—সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল সব আলো, তারি খবর···"ঢাকায়েরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে, সুন্দরীর বিয়ে দিলাম ডাকাতের মেলে! ডাকাত লো মা! কাপড় দিয়ে বেড়ে নিলে দেখতে দিলে না?" শুধু কান্না নয়, কত না-জানা সমস্ত লোকের হাসি-ঠাট্টা, তাও ধরা রয়েছে—"ও জামাই খেয়ে যাও সাধের নতুন তরকারি, শিল ভাতে নোড়া ভাজা কোদাল চচ্চড়ি।"

দারোগা এসে উৎপাত করে গেছে; চলে যাবার পরে লোকে ছড়া কাটছে তার নামে—

"মন্দ বড় বাছের বাছ, হেলান দিয়েছে আমরুল গাছ, হুকার কৌৎকা হাতে চলেছে রাজ-পথে, পথে দেখেছে পাঁকাটি লেগেছে দাঁত-কপাটি!"

ফটোগ্রাফের চেয়ে নিখুঁৎ ছেলের ছবি "দুধি ভাতি খেয়ে খুকুর ভুতি ভুতি গাল!"

বিলিতি Punch কাগজ থেকে উঠিয়ে আনা—"খাঁদা নাক পরশের চাক, নাক উড়েছে ঝাঁক ঝাক"! নাক ওঠার মন্তর শোনো—

"নাক ওঠে নাক ওঠে ওঠে ধানের শিষ। নাক ওঠে নাক ওঠে পিছুমের শিষ। নাক ওঠে নাক ওঠে, ওঠে পানের বোঁট—যাদুর নাকটা ওঠ্!"

"যাদুর কাছে কে? টিয়ে এসেছে।
খাঁদা নাক নে, টিয়ে নাকটি দে!"

এই ছড়াগুলোর মধ্যে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়—ছেলে ভোলানো হচ্ছে কখনো আদর করে, কখনো খানিক ভয় দেখিয়ে, কখনো বা একটানা সুরে কতকগুলো কথা ক্রমাগত আউড়ে গিয়ে এবং এদের আরম্ভ হচ্ছে কোনটা 'আছে' কোনটা 'ছিল' দিয়ে। ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াবার বেলায় জিনিষটাকে খুব সত্যি করে একেবারে বর্তমানে টেনে আনা হচ্ছে, যেমন "এক যে আছে একা-নোড়ে, সে থাকে তালগাছে চোড়ে!" কিম্বা "সরল পথে তরল গাছ তার উপরে বাসা, জুজুমানা বসে আছে সঙ্গে দু'পোণ মশা!" "চার চোখের মা নরুণ-দাঁতি তেঁতুল গাছে আছে!" "কট্‌কটেটা বলে আমি এই খানেতে আছি!" নরুণ-দাঁতি ইত্যাদি বিশেষণ বিশেষ ভয়ের কারণ হল ছেলেদের কাছে। এরা সব জাজ্বল্য রকম সত্যি না হলে ভয় পায় না ছেলে, এ যেন কতক

গুলো মানুষের কাছে ছেলেটিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ওই ধরণের বলে, এরা যে আছে তাতে সন্দেহ থাকলে চলে না। কতকগুলো শব্দ ছেলেকে ভয় দেখিয়েছে—"হুম্ হুমা হুম্ গুম্ গুমাগুম্ ডালে বসেছে!" কিম্বা—"তালগাছেতে হুমুরমুমুর বাঁশগাছেতে থানা।"

এই যে আছের জগৎ, সে হল ভয়ের জগৎ। ছিলর জগৎ সে হল গল্পের জগৎ। সেখানে কিছু সত্যি হয়ে ভয় দেখায় না, যেমন—"এক যে ছিল শেয়াল তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল"—এখানে সত্যিকার শেয়াল যদিও ভয় করবার মতো, তবু অতীত কালের মধ্যে দিয়ে এতটা দূরে চলে গেল যে তাকে ভয় করবার রাস্তাই বন্ধ হল। সেটা শেয়াল না মানুষ, তাও আর চেনা যায় না, তার বাপ দেয়াল দিচ্ছে, শুধু তাই দেখা যাচ্ছে—আলপনা দেওয়া চমৎকার দেওয়াল, কিন্তু ভয় দেখাবার বেলায় একেবারে সত্যি এবং বর্ত্তমান উপস্থিত, অতীত কালের আড়ালে মোটেই নেই—"যাদু ঘুমো রে ঘুমো, শান্তিপুরে বাঘ এসেছে দারুণ হুমো।"

আছে জিনিস হল ছেলের কাছে যেমন ভয়ের জিনিষ, ছিল জিনিষ যেমন গল্পের জিনিষ, তেমনি যে সব জিনিষ বারে-বারে ডাকলেও কাছে আসে না, সেই সব হল আদরের জিনিষ মন-ভোলানো এবং লোভনীয় এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বাঁধে, খেলাও চলে, যেমন—"আয় আয় চাঁদা মামা।" চাঁদ হল ঘরের লোক, ঘরের মধ্যেও আসতে তার বাধা নেই, যথা—

"এস চন্দর আলো করে দীঘির জল কালো করে, ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দেবো, মাছ কুট্‌লে মুড়া দেবো, সোনার থালে ভাত দেবো, চারিদিকে বাটি দেবো, বসতে পিঁড়ি দেবো, খুকির সঙ্গে বিয়ে দেবো!" মামার আদর জামায়ের আদর, চাঁদকে ধরতে কত ফাঁদ! এই চাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী হল টীয়ে পাখি—সে গাছে থাকে, চাঁদেরই মতো সে গাছের ডালে থেকে উঁকি দেয়, কিন্তু চাঁদের আলোর মতো সহজে সে ঘরের মধ্যে আসে না। চাঁদ যেমন—"আয়রে চাঁদা" বলে সোনার থালে ভাত দেখিয়ে ডাক দিলেই এসে হাজির হয়, টীয়ে তো তেমন নয়! সে চায় সত্যিকার খাবার, খাঁচা না হলে তাকে ধরাই মুস্কিল, তাই তাকে বেশী করে সাধ্য-সাধনা আয় আয় বলে!—

"আমার ছেলে আমার কোলে গাছের পাখি গাছের ডালে, খোকা ডাকে আয় পাখী দেখলে তোরে হয় সুখী!" খোকা ডাকছে, আমি ডাকছিনে ভয় কি? কিন্তু গাছ যে পাখীকে দোলা দেয় মায়ের মতো, সে তো তাকে ছেড়ে দেয় না, তাই খাঁচার খোঁজ হচ্ছে খেলার সাথীও খুঁজে দেওয়া হচ্ছে—

"আয় রে পাখী, তোকে খাঁচায় পুরে রাখি
খাবি দাবি কল্-কলাবি খোকার সাথে খেলু করবি!"

কিন্তু এর চেয়ে লোভনীয় জিনিষ না হ'লে পাখী আসে না। গাছের পাখীকে গাছ যে খেলার সাথী দিয়েছে, সুন্দর বাসা দিয়েছে একেবারে নিজের বুকের খোপে তাই, পাখী বলে—না না, যাবো না! খোকা পাখী চেয়ে কাঁদে—সোনার আতা গাছ তার উপরে তোতা পাখী বসে আছে, হাট থেকে খেলনা আসে খোকার জন্যে, মা সোলার আতা সোলার তোতা মাটির ডালিম এমনি কত কি নতুন খেলনার উপরে নতুন নতুন ছড়া দিয়ে খোকাকে ভুলিয়ে দিতে চায়—

"আতা গাছে তোতা পাখী ডালিম গাছে মৌ,
কথা কয় না কেন বৌ!"

কিন্তু খোকা সেই দূরের টিয়েকে ভুলতে চায় না; টিয়েও ভুলতে চায় না তার গাছ—

"খায় দায় পাখীটি
বনের দিকে আঁখিটি!"

মা ডাকেন—

"ও আমার যাদু বাছা কোন বনেতে যায়,
পিঁজরাতে বসি ময়না চিকন দানা খায়,
উড়িয়া যাইতে ময়না ফিরিয়া না চায়।"

পাখীর সঙ্গে খোকার মন চলে যেতে চায় বনে, ধরে রাখা যায় না, ভয় দেখিয়ে আটকে রাখা যায় না, আদর করেও ফেরানো যায় না—বনেই যেতে চায় পাখীর সঙ্গে খোকা, মা বলেন আদর করে, না না—

"ধন্ ধন্ ধন্ যেওনারে বন,
তোমার তরে গড়িয়ে দেবো রত্ন-সিংহাসন।"

ভয় দেখিয়ে বলেন মা—

"ও পথে যেও নাকো হিটিম্‌টিমের ভয়,

তিন মিন্‌সে গন্না-কাটা নাকে কথা কয়!"

কিন্তু মায়ের গলার সুরের সঙ্গে ছড়ার মধ্যে গাঁথা হয়ে ভয় গুলো ভয়ের জিনিষ থাকে না, বেশ মজার জিনিষ হয়ে ওঠে ছেলের কাছে—এমন ভয় যাকে দেখতে ইচ্ছে করে, তার কথা শুনতেও চায় ছেলে—ভুড়-শেয়াল যে আকবাড়ির পাশে থাকে সন্ধ্যেবেলা, হট্টিমাটিম পাখী যাদের ডুটো করে শিং আছে এবং মাঠে যারা ডিম পাড়ে, বাসাও বাঁধেনা, ডিমে তা দিতে বসে থাকেনা—এরা ভয় দেখানো দূরে থাক, উল্টে বরং ছেলেকে ঘর থেকে পালাবার রাস্তাই দেখায়। মা দেখেন, আর উপায় নেই! তখন বনে যা পাবার উপায় নেই, এমন সমস্ত সামিগ্রীর আমদানি করেন মা—

"আয় আয় তুতি খেতে দেব দুদি,

আয়রে পাখী লেজ-ঝোটলা খেতে দেব খৈ কলা!"

দুধ খৈ বনেতে নেই যে পাখি পাবে! মা বুঝিয়ে দেন খোকাকে, বনে যেতে পারি কি খাবার নেই সেখানে, শুধু তুমি আর আমি এ ওর দিকে চেয়েই দিন কাটাতে হবে—

"ধনকে নিয়ে বনকে যাবো, সেথায় খাবো কি!

নিরলে বসিয়া ধনের মুখ নিরখি।"

মা বলেন, তোর দিকে চেয়ে আমার ক্ষুধা না হয় মিটলো, কিন্তু তোর কি! খোকা জবাব দেয়না, ঝাঁপিয়ে এসে কোলে ওঠে—বনের পাখী ধরা দেয় হঠাৎ এসে—তখন আর কি গান সুরু হয় নতুন—

"আমার সোনার বাছা রূপোর খাঁচা তুলে নাচারে।"

সুন্দর পাখী এল, তার দেখাদেখি একটি কালো পাখী সেও একদিন এসে গেল ডাক দিতেই,—

"আয়রে পাখী আয় কালো জামা গায়,

আসতে যেতে ঘুঙুর বাজে আমার বাছুর পায়!"

কালো কিনা, তাই সে বেশী আশা করেনা, একটি ছড়া পেয়েই খুশী হয়ে ধরা দেয়, পায়ে শিকল পরে নেয় সহজে!

"খোকা বলে পাখীটি কোন্ বিলে চরে,

খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে!"

নীল পায়রা আসে,—তাকে ডাকতে হয়না, ধরতেও হয়না, পরের ঘর সে আপনার করে নিতে শিখে গেছে, দূর-দূরান্তরে তার যাওয়া-আসা, তার সঙ্গে দুপুর বেলা যখন খোকা ঘুমিয়েছে তখন মায়ের কথাবার্তা চলেছে, দেখি। প্রশ্ন করলেন মা,—

"ধন ধন পায়রা,

এমন ধন পায় কারা?"

নীল পায়রা যেন উত্তর দিলে,—

"সাগরে কামনা করে ধন পেয়েছি আমরা,

সাগরে ঢালিয়া গা হয়েছি নীলমণির মা!"

আমরা নীল সাগরের ঢেউ নিয়ে এসেছি, তারি রং বুকে লেগে আছে এতটুকু! মায়ের কোলে সোনার চাঁদটির দিকে নজর পড়ে পায়রার, সে শুধোয়,—

"কি ধন কি ধন বেণে? কে দিল তোমায় এনে?"

সে কোন সাগরে পাড়ি দিয়ে আসে, সে কোন সদাগর যে ঘরে ঘরে সোনার চাঁদ বিলিয়ে যায়! তার নাগাল তো পাওয়া যায়না,—

"তার নাগাল যদি পেতাম

তোমার মতো সোনার চাঁদ আর গোটা দুই চেতাম"

অচেনা দেশের সদাগর,—তার উদ্দেশ করে চলে মায়ের মন এবং যে মা হতে পেরেলে না তারও মন—পায়রা যেন তাকে জানে! এমনি ভাবে ঘাড় নেড়ে বকম্ বকম্ করে বলে,

"এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,

তার মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর!"

হয় তো বা এ সেই সদাগরই হবে! মা বলেন, হতেও পারে হয়তো বা! এইভাবে দুপুর কাটে—ঘুম জাগা বকম্ বকম্ করা ছড়া বলার মধ্য দিয়ে ছেলের সঙ্গে! আজও যেমন, কালও তেমন, একই ছড়া ঘুরে ফিরে বলা, এর মধ্যে হঠাৎ এক একদিন একটা একটা নতুন ঘটনা উপস্থিত হয়, ছেলে বড় হয়ে যায় মেয়ে বড় হয়ে ওঠে দেখতে দেখতে, তখন নতুন ছড়া গাঁথতে হয়,—

"চড়ুইটিরে মরুইটিরে দুয়োরে বসো' সে,

রামচন্দ্রের কান ফোঁড়াবো নাড়ু বেলাও সে!"

মেয়ে কেঁদে বলে, আমিও বড় হয়েছি, আমার বিয়ে হবে!

অমনি বিয়ের আয়োজন হতে থাকে, বাঁশপাতা চুড়ির ফরমাস হয়ে গেছে তার খবর হাওয়া সে দিয়ে যায়,—

"বাঁশ পাতা নড়ে চড়ে ননির বর গয়না গড়ে
বরকে দেখতে মজা, গাঁদা ফুল বাজনা বাজে!"

এমনি ছড়ার মধ্যে খেলার ছলে বাংলার ছেলে মেয়ে ও মায়ের জীবনের একটা দিক নিখুঁৎ ভাবে ধরা পড়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে বাংলা দেশ বাংলার দৃশ্য পশু পক্ষী ঘর বাড়ি অসন বসন আচার ব্যবহার সমস্তই কোনটা ছবির মতো আঁকা, কোনটা পুতুলের মত গড়া, কোনটা গল্পের মতো কোনটা নাটকের আকার! এই একটা ছড়া কিন্তু এটা ছোট নাটক। নামটা এর "বড় বাবু বড় বৌ।" বড়বাবু বল্লেন, "এক পো দুধ কিনেছি, কি হবে তা বল না?" বড় বৌ বল্লেন, "ক্ষীর হবে, সর হবে, ছানা হবে, মাখন হবে।" বাবু—"ও বড় বৌ, আর কি হবে বলনা?" বৌ—"এ বেলা হবে ও বেলা হবে, নগেন খাবে যোগেন খাবে, কুঞ্জ কোলের ছেলে, সে একটু বল্কা খাবে, সনাতন কেশো রোগা, তাকে একটু দিতে হবে, পাখিটা ছোলা খায়না, তাকে কোন্ না দিতে হবে, কর্ত্তার দুধ না হলে চলে না, আমার পোড়ার মুখে দৈ না হলে রোচে না, তাও তো একটু রাখতে হবে!" বাবু (সনিঃশ্বাসে)—"ও বড় বৌ আর কি হবে, বলনা।"

কেবল উত্তর-প্রত্যুত্তর, মানের খোঁজ নেই! যেমন একটি কথা আছে,—কি কথা? ব্যাঙের মাথা! কি ব্যাঙ? সরু ঠেঙ! কি সরু? বামুন গরু! এই ভাবেই চল্লো খানিক। এইবার ঠিক গল্পের মতো গল্প বলা হচ্ছে, "তাঁতি ঘরে ব্যাঙের বাসা তিনটি পেড়েছে ছানা, খায় দায় নিদ্রা যায় তাঁত-ঘরে তার থানা"...ইত্যাদি।

এবার ছবির পালা, একেবারে প্রাচ্য শিল্পের water-pain-ting—"এপারে ঢেউ ওপারে ঢেউ মাঝখানে বসে আছে গঙ্গারামের বৌ"!

পাশ্চাত্য শিল্পের cloud-effect—"উত্তরেতে মেঘ করেছে গরু যাচ্ছে উড়ে, পেয়াদা বেটা পাগ্ বেঁধেছে সব ধানের চিঁড়ে!"

একেবারে sun-set landscape—"আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে সূর্য্যি গেল পাটে, খুকু গেছে জল আনতে পদ্ম দীঘির ঘাটে, পদ্ম দীঘির কালো জলে হরেক রকম হেঁটোর নীচে দুলছে খুকুর গোছা ভরা চুল।"

দেওয়ালে আলপনার গাছ decorative painting
"এক যে গাছ ছিল, লতায় লতিয়ে গেল, তার এক ছিল, ফুল ফুল ফুল ফুটে গেল!"

পুতুল গড়া হ'ল দেখ এঁটেল মাটির—"খাঁদা বোঁ বাঁধা গরু চরাতে যায়, কোপ্‌নি বাঁধা দিয়ে খাঁদা কিনে খায়।"

বিলিতি টিনের পুতুল দম দিলে নাচে, নতুন এসেছে বাজা
"ঐ আসছে প্যাগনা বিবি প্যাক প্যাক প্যাক, দেখ দেখ।"

একেবারে শিল্পশাস্ত্র-মতো গড়া পুতুল—"পাঁকাল মা কাঁকাল সরু মেয়েটি যেন কল্প-তরু"!

নটরাজ মূর্ত্তির চেয়ে কিছু কম নয়—"হাতের নাচন পা নাচন, বাটা মুখের নাচন, নাটা চোখের না কাঁটালী ভুরুর নাচন, টিয়া নাকের নাচন, মাজা বে নাচন, আর নাচন কি, অনেক সাধন করে নাচ পেয়েছি"।

এটা একেবারে গান—

"আয় রে আয় ছেলের পাল, মাছ ধরতে যাই,
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটলো, দোলায় চেপে যাই।
এ নদীর জলটুকু টল্‌মল্ করে,
এ নদীর ধারেরে ভাই বালি ঝুর ঝুর করে!
বকুল-তলার ঘাটে রে ভাই ঝুর ঝুরে বালি,
সোনা-মুখে রোদ লেগেছে তুলে ধর ডালি"...ইত্যাদি

ছড়া-গুলো এত কালের পুরোনো, তাদের নিয়ে এত দি ধরে এত লোক ভেঙেছে জুড়েছে যে সম্পূর্ণতা বলে পদা তাদের মধ্যে পাওয়াই যায় না। এটার খানিক ওটার খানি মিলে একটা, এই ভাবে প্রায় সব ছড়া ধরা রয়েছে—খে ঘরে। একটার আগা গেছে অন্যটার শেষে, অন্যটার শে এসে জোড়া লেগেছে একটার আগায়! এই ছেলে-ভোলানে ছড়ার সম্পূর্ণ রূপটা ধরতে হ'লে এটার এক অংশ ওটার সেটার খানিক এটায় জুড়ে না দেখলে উপায় নেই, কাজট ভারি শক্ত কিন্তু ভারি চিত্তাকর্ষক। এ যেন কত কালে

খেলা-ঘরে কে জানে কাদের ভাঙ্গা পুতুল ছেঁড়া, ছবি, গল্পের খাতার পাতা, কত কি অগোছালো ভাবে ছড়ানো রয়েছে, তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে শিশু-জগতের সম্পূর্ণ একটা চিত্র, এবং ইতিহাস খাড়া করে তোলা—টুকরোগুলোকে মিলিয়ে মিলিয়ে। মিশরের রাজাদের কবর থেকে হাজার হাজার বছরের রাজা-রাণীর জীবনের কাহিনী, তাদের নানা ব্যবহারের জিনিষের মধ্যে থেকে প্রকাশ হচ্ছে—কতক ভাঙ্গা অবস্থায়, কতক পুরোপুরি-ভাবে। এই ছড়া নিয়ে নাড়া-চাড়ার কাজও ঠিক তাই। ভাঙ্গা, আধ-ভাঙ্গা, সব ছড়া, এরি সাহায্যে গড়ে তুলতে হ'বে শিশু সাহিত্যের ও বাঙ্গালীর জীবনের একটা অধ্যায়! এখন যেভাবে ছড়াগুলো ছড়ানো অবস্থায় ছাপানো হয়েছে, তা থেকে জিনিষটার রস পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব হয় না, শিল্প-প্রদর্শনীতে যখন গাদা গাদা ছবি ইত্যাদি এসে জমা হয়, তখন সাধারণ লোক বুঝতেই পারে না, ভাল মন্দ কোনটা কি, কিন্তু যখন সেগুলোকে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত আলো বুঝে ধরে দেওয়া হয়, তখনি তাদের রূপ-রসের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ উপভোগ করার পথ খুলে যায়। এই ভাবে ছড়াগুলিকে গুছিয়ে ধরার সময় এসেছে। এতদিন ছড়াগুলো সংগ্রহ হ'য়ে জমা হচ্ছিল মাত্র এক জায়গায়, হিসাব করে তাদের যার যে স্থান সেখানে ধরার কারণ হয়নি! এখনো কাব্যের দিক দিয়ে ইতিহাস সাহিত্য ইত্যাদি নানা দিক দিয়ে এই ছড়ার দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে যা বলবার এবং করবার দরকার ছিল, তা বলা এবং করা হ'য়ে গেছে বলে মনে হয় না। যতক্ষণ না এই ছড়াগুলো নিজের নিজের জায়গা অধিকার করে অখণ্ড রূপ ও রস নিয়ে ফুটে উঠছে, ততক্ষণ সংগ্রহের দিক দিয়েও কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। কত ছড়া এখনো ধরা দেয়নি, বাংলার কোন্ গ্রামে কত কি কথা লুকিয়ে আছে তার ঠিক নাই! হয়তো দেখা যাবে, এখন যে ছড়া এক গ্রামে ভাঙ্গা অবস্থায় পাচ্ছি, তারি টুকরোটা আর এক গ্রামে আর একটা ছড়ার মধ্যে ঢুকে বসে আছে! আর্ট হিসাবে দেখলে ভাঙ্গা এবং পুরো বড় বেশি তফাৎ করে না—রস যা পাবার, তা টুকরো থেকেও পাওয়া যায়; সুতরাং যে ভাবে ভিনাস্ মূর্ত্তির ভাঙ্গা হাত সংস্কার করা হয়েছিল সে ভাবের কোন চেষ্টা ছড়াগুলোকে নিয়ে করা একেবারেই ঠিক কায হবে না; কিন্তু সব ছড়াগুলোকে চোখের সামনে ধরে দেখলে যখন স্পষ্ট দেখি এটার হাত ওটার পায়ে গিয়ে লেগেছে, এখানেরটা ওখানে, এই ভাবে অগোছালো হয়ে পড়ে আছে, তখন তাদের যেখানকার যা, তা মিলিয়ে দেখতে কোন দোষ হতে পারে না। দু'একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক, "আঁধার ঘরের মাণিক, নড়বোনা চড়বোনা দেখবো খানিক খানিক।" এটি একটি সম্পূর্ণ ছড়া, কিন্তু "ধনকে নিয়ে বনকে যাবো, থাকবো বনের মাঝে, আয় দেখিনি নীলমণি তোর কেমন ঘুঙ্গুর বাজে, তোরে নাচলে কেমন সাজে, ঝুমুক ঝুমুক বাজে!"

এই ছড়াটা আগা-গোড়া বদ্ রকম জোড়াতাড়া দেওয়া হয়েছে,—এর অংশ খুঁজে এনে মেলালে তবে সেটা বোঝা যায়; যথা—

"ধনকে নিয়ে বনকে যাবো রইবো গাছের তলে,
কোলে বসে সোনার যাদু ডাকবে মা মা বলে,
মা বোল সে কেমন-তরো বল্‌তো শুনি
ডাক একবার ডাক দেখি আমার নয়ন-মণি!
ধনকে নিয়ে বনকে যাবো সেখানে খাবো কি;
নিরসে বসিয়া ধনের মুখ নিরখি"।
এর পরে মেলে এসে, "ওরে আমার ধন যেওনা বন,
তোমার বাড়ির মাঝে ফুলের বাগান, তাতেই বৃন্দাবন"
"ধন ধন ধন কেনে যাবে বন,
তোমার তরে গড়িয়ে দেবো রত্ন-সিংহাসন।"

ছড়াগুলোর মধ্যে এক সুরে বলতে বলতে হঠাৎ আর এক সুরে আর এক কথা ধরা হচ্ছে অনেক জায়গায় এবং সেইটেই হচ্ছে ছেলে-ভুলোনো ছড়ার আর্ট ও মজা কিন্তু সুর যেখানে বেসুর হচ্ছে, সেখানে সেটা অন্য সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে টুকরো অবস্থাতেই দেখা ঠিক কিম্বা অন্য কোন ছড়ার মধ্যে তার বাকি অংশ পাই কি না তাও দেখা ঠিক। এই ছড়াটা দেখছি বিশ্রী হয়েছে বদ রকম জোড়াতাড়া দিয়ে, যথা—"এইখানটিতে খেলে ছিলেক ভাঁড় কাটি নিয়ে, এইখানটি রুঁধে দাও ময়না কাঁটা দিয়ে" ব্যাপারটা এই ছত্রে বেশ বোঝা গেল। এর পরেই হঠাৎ শুনি—"চাঁদ উঠলো

ফুল ফুটলো ঝলক মলক দিয়ে" তার পরেই এল—"ওর বেটা পাণ খেয়েছে শাশুড়ি বাঁধা দিয়ে!" কোন্ চাঁদ সদাগরের গল্পের খানিক এসে জোড়া লাগলো উপরের চমৎকার ছুই ছত্রে! ছড়াগুলো কোনটা কার সঙ্গে খাপ খাবে, তা ঠিক করে বলা ভারি শক্ত। এই গোছানো কাজ কতকটা ব্যক্তিগত রুচির উপরে নির্ভর করে। নানা আকারের নানা রংএর স্ফটিকের দানা নিয়ে ছড়া ছড়া পুঁথির মালা গাঁথার মতো কাজ এটা, একদিকে যেমন সহজ, অন্যদিকে তেমনিই শক্ত কাজ এটা। প্রায় চারশো কি তার কিছু বেশী ছড়া শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "খুকুমণির ছড়া" এবং আমার বাল্য-বন্ধু শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের "ছেলে ভুলোনো ছড়া" নামে বই ছুখানায় ছাপা হয়েছে—এ ছাড়া পুঁটুরাণীর ছড়া" শ্রীবৈষ্ণব চরণ বসাকের,তাতেও কতক ছড়া প্রকাশ হয়ে গেছে। এর মধ্যে খুব ছেঁটে নিয়ে ভাল ছড়া প্রায় আড়াই-শোখানা টুকরো রঙ্গীন স্ফটিক এদের Stained Glassএর মতো করে সাজিয়ে যে ক'রকম ছবি হতে পারে, তার মোটামুটি একটা হিসেব দিই; যথা—সন্ধ্যার আকাশ, সন্ধ্যার প্রদীপ, আদরের ধন, কালো সোনা, খাঁদা, দোলা, নাচ, পুঁটুরাণী, হাসি, কান্না, গাছের পাখী, বনের পাখী, গাছ ও চাঁদ, আঁধারের ভয়, ঘুম, ঝড়-বৃষ্টি, পাঠশালা বেড়ানো, গাই চরাণো, নৌকো বাওয়া, মাছ ধরা, খোকার বিয়ে, গায়ে হলুদ, বরযাত্রা, মেয়ের বিয়ে, কনে বিদায়, জামাই বাবু, বাপ-মার দেশ, বিধবা, শেষ খেলা, মায়ের ছঃখু, দিদিমার কাশীপ্রাপ্তি, শিবের গাজন, এ ছাড়া রথ ষষ্ঠীতলা নানা খেলা এবং নানা ছোট গল্প।

ছড়াগুলো এমন জিনিষ যে তাদের যে ভাবেই সাজাও তা থেকে একটা না একটা রস পাওয়া যায়, সুতরাং ছড়ানো অবস্থাতেই ওগুলো হয়তো রাখাই ঠিক, শুধু মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দেখা নানা রকম আলোতে ধরে। বিশেষ একটা নক্সার মধ্যে ফেলে ছড়াগুলোকে একটা বাঁধা রূপ দেওয়াতে ভয় আছে, যদি না ঠিক আলো ঠিক Back ground দিয়ে সেগুলো সাজিয়ে ধরা যায়।

ছড়ার ছুটো দিক রয়েছে দেখি, একদিক হচ্ছে প্রতি দিনের জীবনের সঙ্গে ছোট-খাট সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে বাস্তবের সঙ্গে তার বাঁধন, আর এক দিকে হল ছ[illegible] সম্পূর্ণ মুক্ত, কল্পনা ও অবাস্তবের রাজ্যে! এই অ[illegible] চোখে-দেখা জগতে, এই গেছি মনে-ভাবা কল্পনা-রাজ্যে[illegible] একই ছড়ায় মধ্যে দিয়ে এই রকম বাস্তব অবাস্তব ছুই[illegible] ঢেউয়ের খেলা দেখি, যেমন—"আগডুম বাগডুম ঘোড়া সাজে, ঢাল মির্গেল ঝাঁঝর বাজে। বাজতে বাজতে পড়[illegible] চুলি, চুলি গেল সেই কমলা পুলি। কমলা পুলির টীয়ে[illegible] সুয্যি মামার বিয়েটা! হলুদ বনে কলুদ ফুল, তারা না[illegible] টগর ফুল!"

গাছের টগর ফুল খসে পড়া তারার পাশাপাশি মি[illegible] হলুদ বনে হলুদ না হয়ে হলো কলুদ ফুল, যা চক্ষে দেখি[illegible] কেউ কমলা! ফুলির টীয়ের সঙ্গে সুয্যি মামার বিয়ে হচ্ছে[illegible] বেশ ঘোড়া চলছিল, ঢাক বাজছিল, বাস্তবিক শোভা-যাত্রা মাঝে হঠাৎ চুলি পড়লো আর সব উল্টে গেল অবাস্তবে!

এটা একটা পাকা ছড়া যেমন..."যমুনাবতী সরস্বতী কা[illegible] যমুনার বিয়ে, যমুনা যাবেন শ্বশুর-বাড়ী কাজি-তলা দিয়ে কাজি ফুল কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা, হাত ঝুম্‌ঝুম্ [illegible] ঝুম্ ঝুম্ সীতারামের খেলা। নাচতো সীতারাম কাঁকা[illegible] বেঁকিয়ে, আলো চাল দেবো টাপাল ভরিয়ে। আলো[illegible] চাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ, হেথায়তো জল নাই তী[illegible] পূর্ণির ঘাট। তীরপূর্ণির ঘাটে ছুটো মাছ ভেসেছে, একটি নিলেন গুরু ঠাকুর, একটি নিলেন কে! তার বোনকে বি[illegible] করি ওড় ফুল দিয়ে। ওড় ফুল কুড়োতে হয়ে গেল বেলা তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক ছুপুর বেলা!"

ছুপুর বেলায় বিয়ে হিন্দু শাস্ত্রে নেই! অতএব অসম্ভবের চেয়ে অসম্ভব এ কাণ্ড; তার পর ঘটনার পারম্পর্য্য মোটেই নেই এই ছড়ায়! কথায় কথায় মিল কিন্তু মানেও মেলে না, ভাবও মেলে না! এইটেই হচ্ছে পাকা ছড়ার মজা, স্থান কাল ডিঙ্গিয়ে, পরিচয় অপরিচয় ছুই নিয়ে কথার মিল ও ধ্বনি ধরে চলে যাচ্ছি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল—কোথাও বাধা নেই, যা-খুসি সৃষ্টি করতে করতে চলেছি!

সাহিত্যের cubism বলা যেতে পারে এই সব যা খুসি জিনিষকে—কেন না, ছেলের মন বুড়োর মনকে খুসি করাই এর কাজ। পুরো ছবি দেওয়া, পুরোপুরি চেহারা কিম্বা বর্ণনা

দেওয়া,ঠিক যাকে ছড়া বলে তাতে নেই। ছেলের মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তাকে সত্যি সত্যি জাগিয়ে রাখাতো ছড়ার উদ্দেশ্য নয়, বেশীর ভাগ ছড়া ঘুম পাড়াতে গাওয়া হয় ছেলেকে অন্যমনস্ক করে দিতে বলা হয়। টুকরো টুকরো ছবি একটার ঘাড়ে আর একটা এইভাবে চোখে পড়তে পড়তে ছেলের চোখ ও মন আপনিই ঝিমিয়ে যাতে আসে, এইটুকু করা হল ছড়া বলার উদ্দেশ্য ও আর্ট। গল্প কথকতা ইত্যাদি অন্য আর্টের সঙ্গে ছড়ার আর্টের তফাৎ এইখানে। "ওই আসছে প্যাখনা বিবি প্যাক্ প্যাক্ প্যাক্, দেখ দেখ দেখ" কিম্বা, "চেঙ্গা ক্ষেতে ঝেঙ্গা ফুল ছেঙ্গ ছেঙ্গাইয়া রোদ তোল" এ সব ছড়া ছেলের ঔৎসুক্য জাগিয়ে দিয়ে তার ঘুম বারণ করছে।

আর এই রকম ছড়া, এরা মনকে একটা থেকে একটায় নিয়ে চলেছে, চোখে মুখে দেখতে দিচ্ছে না কিছু—"কুকুরে বাজায় টুমটুমি,, বানরে বাজায় ঢোল, টুনটুনিয়ে টুনটুনালো ইঁদুরে বাজায় খোল, সাপের মাথায় বেঙ নাচুনি, চেয়ে দেখনা খোকন-মণি!" যে চেয়ে দেখবে সে ততক্ষণ ঘুমিয়ে এই স্বপ্নটা দেখছে! মনের উপর দিয়ে, চোখের উপর দিয়ে, বিচিত্র সুর সার বুনিয়ে চলা হল ঘুমের ছড়ার আর্ট।

ছড়ার সুর একঘেয়ে হলে চলে না, বর্ণনাও বিচিত্র হওয়া চাই, না হলে ছেলে ঘুমোয় না। ছড়ার ধ্বনিগুলো কি রকম ভেঙ্গে চলেছে, তার হিসেব দি,—

"ধন ধন ধন বাড়িতে ফুলের বন, ধন ধন ধন খুদে-মেতির কোণ, ধন ধন ধন লক্ষ্মীনারায়ণ" এই ভাবে একটা না যেতে যেতে বদলালো ছন্দ—"ধন্ ধন্ ধোনা চোত-বোশেখের বেনা" আরো এক পাক ফিরলো, "ধন ধন ধুনিয়ে কাপড় দেবো বুনিয়ে", আবার ফিরলো, "ধনকে নিয়ে বনকে যাবো রইবো গাছের তলে।"

এইভাবে চলতে চলতে একটা ফাঁক আসে, ছড়া একটা গানের সূত্র ধরে চলে, যেমন—"এতদিন ছিল ধন কোন হিজুলীর বনে, দুঃখিনীর দুঃখ দেখে ভেসে এলেন বাণে, ষষ্ঠীতলার বাণে কুড়িয়ে পেলাম ধনে।" আস্তে আস্তে আবার আগেকার সুর চাল-চোল ফিরে আসে—

"ওরে আমার ধন যেও নারে বন, বাড়ীর মাঝে ফুলের বাগান তাতেই বৃন্দাবন।" "ধন ধন ধন কেনে যাবে বন, তোমার তরে গড়িয়ে দেবো রত্ন-সিংহাসন।"

ছড়াগুলো গুছিয়ে ছাপাতে হলে এই সুরের গতির হিসেব ধরে চলা চাই, এ ছাড়া আরো অনেক কথা ভাবতে হবে ছড়াগুলোকে সাজাবার বেলায়। দেখতে পাওয়া যায় কতক ছড়া দুপুর বেলা ঘুমের জন্য,কতক রাতের ঘুমের জন্য—

"আয়রে আয় সাঁঝে বা, খুকুরে ঘুম পাড়িয়ে যা

খুকুর গলার মতির মালা, খুকুর হাতের হীরের বালা

খুকুর কানের সোনার ফুল খুকুর মাথার চাঁপা ফুল দুলিয়ে যা।" এটা পরিষ্কার রাতের ঘুমের ছড়া। আবার—"আয় ঘুম ভাসিয়া, চোখে বোস্ হাসিয়া,কপালে বসে কর্ খেলা, ঘুমোয় খোকা দুপুর-বেলা।" বেশীর ভাগ ঘুমের ছড়া দিনের ঘুমের জন্যেই রচা মনে হয়,—রাতে ঘুম আপনি আসে, ডাকতে হয় না, সে সময় না ঘুমোলে ভয়ের ছড়া রয়েছে, নানা উস্ খুস্ খুটখাটা শব্দ দিয়ে ছড়াগুলো বাঁধা, যেমন—

"তাল গাছেতে হুতুর মুতুর" কিম্বা "ট্যেট টোনা ট্যেন্ ট্যেং, কেলে ভূতের ঠেং" অথবা "ট্যাপ্ ট্যাপ্ ট্যাপ টেঁ্যপের ভিতর ঝিঙ্গে, বিষ্টিবাদল হলে ট্যাপ বসে বাজায় শিঙ্গে।" নানা শব্দ নানা অদ্ভুত জীব কাছে আসে না কিন্তু আশে পাশে অন্ধকারে ঘোরে; ছেলের মন ভেবে পায় না, এ সব কারা, কি-বা করবে এরা তাকে নিয়ে! ভয়ে ভাবনায় ঘুম এসে পড়ে, মায়ের কোলে কুঁকড়ি সুঁকুড়ি হয়ে থাকে ছেলে সারারাত। স্বপ্ন দেখে হয়তো বা—একটা বাঁশ-তলার বুড়ি অনেকটা দেখতে ঠাকুর-মার মতো কিন্তু চুলগুলো বাঁশ পাতার মতো শুকনো মড়-মড়ে, ধুলো-কাদায় মাথা—সে এসে বলছে—"আমি বাঁশ-তলার বুড়ি, নাকে মাটি খুঁড়ি!" হাস্যরস অদ্ভুত রস, করুণরস এমনি নানা রসের সমাবেশ দেখা যায় রকম রকম ছড়াতে। মেয়ের বিয়ের ছড়াগুলো সব চেয়ে করুণ। এর মধ্যে বাংলার যেন প্রাণের সাড়া লুকিয়ে আছে—"ঢোল বাজে গামুর গুমুর সানাই বাজে রইয়া, পরার পুতে নিত আইছে ঢোলে বারি দিয়া। আগুলো খেলার সই খেলার সাজু লইয়া,আরতো খেলতাম না পরার ঘরে গিয়া।"

আরতো খেলা হবে না ! তাই দুঃখু বাজছে, একটিবার সইদের সঙ্গে খেলে না নিয়ে যেতে চায়না মন, কিন্তু সইরা আর এক খেলার পুতুল নিয়ে তারি বিয়ের আয়োজনে মত্ত রইলো, মনের দুঃখু মনে নিয়ে মেয়ে গেল শ্বশুর বাড়ী, কোন্ দূর দেশে ! সেখানে গিয়ে কপাল পুড়লো সংসারে নতুন খেলাঘর বাঁধার পূর্ব্বেই, ভাই দেখতে এল, বোন গলা ধরে কাঁদে আর বলে—"ওপারেতে কালো রং বিষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্, এপারেতে লঙ্কা গাছ রাঙ্গা টুকটুক্ করে, গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।" ভাই কাঁদে আর বলে—"এ-মাসটা থাক দিদি কাঁদিয়ে ককিয়ে, ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কি সাজিয়ে—" বোন্ নিশ্বাস ফেলে বলে—"হাড় হ'ল ভাজা ভাজা মাষ হ'ল দড়ী আয়রে নদীর জল ঝাঁপ দিয়ে পড়ি," এ যে শ্বশুর বাড়ীর দেশে নদী-হীন কোন্ মরুভূমির মাঝে বসে মেয়ে ডাক্‌ছে নদীকে, জ্বালা জুড়োতে, স্বামীর দেওয়া জ্বালা, শাশুড়ি-ননদের দেওয়া জ্বালা ! ভাই চলে গেল আশা দিয়ে, কিন্তু আরতো এলনা নিতে কেউ ; মেয়ে পথ চায় আর কাঁদে, যাকে দেখে তাকেই বলে—"তোরা কে যাবি বাপ মার দেশে ? কার সঙ্গে কবো দুখের কথা কারে দিয়ে লিখইয়ে পাঠাবো !" মেয়ে কাঁদ্‌ছে, মায়ের মন চঞ্চল হয়, গুণবতী ভাই আসে অবশেষে পাল্কি নিয়ে। সেই একদিন পাল্কি চড়া আর আজকের পাল্কিতে ফিরে চলা দুয়ের কথা মনে হয়, ধিক্কার আসে বাণা বাজে হতভাগিনীর মনে—"দুঃখে যেতাম শুধু যেতাম সেও ছিল ভাল, মনের তাপে গায়ের বরণ হয়ে গেল কালো।" দেশে গিয়ে মুখ দেখাই কি বলে ! ঘরের পাল্কি ঘরে এলো মেয়েকে নিয়ে, এ কি সাজে ! দেখে মা কপালে ঘা দিয়ে বলছেন—"অলকমণি রাজার রাণী কি বলিব আর, অলকমণির কপাল পুড়ে হ'ল ছারখার। দু দুটো দাসি দিলুম পায়ে তেল দিতে, দুটো দুটো কাহার দিলুম কাঁধে করে নিতে, আম-কাঁঠালের বাগান দিলুম ছায়ায় ছায়ায় যেতে, উড়কি ধানের মুড়কি দিলুম পথে জল খেতে, রাজা গেল রাজ্য গেল গেল সমুদায়, বাতি দিতে রাজপুরীতে নাইকো কেউ হায়।" মেয়ে ফিরলো বটে, পুরোনো ঘরে খেলার জায়গায়, কিন্তু মন বসেনা, সে তীর্থে চল্লো—কোন তীর্থে, তা কে জানে ! সেই সব ফেলে যাবার সময় বলে গেল মেয়ে—"এই খানটিতে খেলেছিলাম ভাঁড় কাটি নিয়ে, এইখানটি রুঁধে দিও ময়না কাঁটা দিয়ে"—এমন খেলা এখানে আর যেন না খেলা হয় !

বাঙ্গলার ছেলে-মেয়ে মা-মাসি ভাই-বোন, এদের জীবনের গতিবিধির হিসেব ধরে চলেছে ছড়া—ষষ্ঠীপুজো থেকে আরম্ভ করে দুলতে দুলতে হামা দিতে দিতে নানা খেলা খেলে পাঠশালায় পড়ে বিয়ে এবং তার পরে সুখ-দুঃখের মধ্যে গিয়ে এক অধ্যায় শেষ হল, এই বলে মা কাঁদলেন—"হায় করলাম কি, জামাইকে দিলাম ঝি। হারালাম লো ! বৌকে দিলাম পো।" কিন্তু ছড়া বলার পালা শেষ হল না এইখানেই—এক মেয়ে বড় হয়ে চলে গেল, তার জায়গায় ঠিক তারি মতো একটি নাতনী এল কিম্বা যে ছেলে বড় হয়ে গেছে তারি মতো নাক-চোখ, এল একটি নাতি ! তখন আবার ঘুরে ফিরে সেই সব পুরোনো ছড়া দিয়ে বুড়ি ঠাকুরমার দিদিমার ঘরে ফিরে এল পুরোনো দিনটি পুরোনো সুরের স্মৃতি নিয়ে—"অনেক দিনের কথা সেই মনে পড়েছে, সোনার যাদু গোপাল আমার গান ধরেছে ! এমনি করে কেমন ধারা গান গাইতেম সেই, ধেই ধেই ধেই খোকা নাচে ধেই !"

এ যেন হারানিধি, তারাই আবার ফিরে এল ! ঠাকুরমা বলে ডাকে তারা,—নতুন ডাক কিন্তু শুনতে চায় সেই পুরোনো ছড়া যা কখনো, পুরোনো হয় না। ঘরের মেয়ে পর হয়ে যায়, পরের মেয়ে এসে ঘর জুড়ে বসে, তার সঙ্গে নতুন ছেলে-মেয়ে আসে, সেই পুরোনো দোলায় চেপে তারা দোল খায়, ঘুমোয়, মাছ ধরতে যায়, নৌকো বায়, গাড়ি হাঁকায়—এমনি কত কি খেলা জমায় শূন্য ঘরে, পুরোনো ছড়া ফিরে ফিরে চলে পুরোনো ঘরে, যে নতুন তাকে ভোলাতে,—দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয় জীবনে সেই পুরোনো ছড়া বলে—"এ ধনটা কে রে ? স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে এসে ছিষ্টি রেখেছেরে !" কত যুগ এই ছড়া চলে ঘরে ঘরে, তার পর হয়তো দেশের চালচোল্ ভোল্-ভাল্ ফিরে যায় ! ছড়ার জায়গা ঘরের মধ্যে থেকে উঠে গিয়ে পাবলিশিং হাউসে, নয় Research

Studentএর টেবিলে পাতা হয়। মায়ের সুর মিলিয়ে যায়, তার স্থান এসে অধিকার করে একটা রবারের ছিপি, যার নাম India Rubber baby-pacifier"। কাঁদলেই মা ছেলের মুখে এই ছিপি এঁটে দেয়,—ছড়া বলা, ঘুম পাড়ানো এ সব উঠে যায়,—কলে দুধ খায় ছেলে,—কলে চুপ করে ছেলে, কলে মানুষ হয়ে চলে ছেলে, তখন সেই চিরকেলে ষষ্ঠীতলায় ষষ্ঠীবুড়ি আপনার মনে ছড়া কেটে পালা শেষ করে দেয়—

আমার কথা ফুরোলো, নটে গাছ মুড়োলো!
কেনরে নটে মুড়োলি? জল কেন হয় না!
কেনরে জল হস্‌নে? ব্যাঙ কেন ডাকে না!
কেনরে বেঙ ডাকিস না……,

উত্তর আসে না! প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলে ষষ্ঠীতলায়, এমন হল কেন? ছেলে কাঁদে না, ছড়া কাটে না, এ হল কি? হঠাৎ সব ফুরোলো না কি, জীবন্ত গাছ মুড়োলো না কি— এই প্রশ্ন!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একশত বৎসর পরে আমেরিকার সভ্যতার পরিণাম

একশত বৎসর পরে আমেরিকার সভ্যতার পরিণাম কি হইবে তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের অভিমত সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমেরিকারই একজন চিন্তাশীল মনীষীর মত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ। ইঁহার নাম জে, এইচ, হপ্‌কিন্স। তিনি বলিয়াছেন:—

"রোম-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ আমেরিকার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে সহায়তা করিবে।

রোমানেরা আমেরিকানদিগেরই ন্যায় কৃষি-জীবী ও শান্তি-প্রিয় ছিল। ইহারা যুদ্ধ-বিমুখ ছিল। প্রতিবেশী জাতিদিগের উপর হস্তক্ষেপ করার অভিপ্রায় ইহাদের ছিল না। আমেরিকার ন্যায় ইহারাও নূতন রকমের সাধারণ তন্ত্র-শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রাজ-সকলের শাসন-প্রণালীর তুলনায় ইহার প্রণালী অনেক অগ্রবর্ত্তী ছিল। এই শাসনের ফলে আমেরিকার মিলিত-রাজ্য সকলেরই ন্যায় রোমীয়দিগের প্রতিপত্তি ও অপর জাতির নিকট সম্ভ্রম ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাদের সমৃদ্ধিও বিবৃদ্ধিমান্ হইয়া চলিল।

কিন্তু সময় যতই যাইতে লাগিল, তাহাদের রাজনৈতিক নেতাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং রাজস্ব-সম্বন্ধীয় অধিনায়কদিগের লোভ-হেতু তাহারা "সাম্রাজ্য-বাদ" গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই দাঁড়াইল যে রোম-রাজ্যাধি-বাসিগণ সামরিক জাতিতে পরিণত হইয়া গেল এবং যুদ্ধ-ব্যাপারের দ্বারা তাহারা অভূতপূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে লাগিল। ইহাতে কিন্তু তাঁহাদের জাতীয়-ভাবের বিপরীত ফলই ফলিল। কারণ তাঁহাদের কৃষক-সকল কর্ষণ-কার্য্য ছাড়িয়া বৎসর-ভুই যুদ্ধের জন্য ধাবিত হইল। এইরূপে দেশের বিশেষ পৌরুষ-সম্পন্ন লোক-সকল সৈন্যদলে যোগদান করিল। যাহারা জমি লইয়া রহিল, তাহারা অতিরিক্ত করভারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িল। তখন তাহারা কৃষিকার্য্য ফেলিয়া আসিয়া সহরে আশ্রয় লইল। সহর একক্ষণে বেকার ভিখারীতে দ্বারা ভরিয়া গেল।

রোমের এই অবস্থা চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। ভ্যান্ লুন্ তদীয় "History of Mankind" (মানব-জাতির ইতিহাস) নামক গ্রন্থে এই অবস্থার এইরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন:—

"রোমের রাজনৈতিক গঠনে অসম্ভবরূপে গলদ ছিল, তাহাতেই রোম টিঁকিল না। ইহার যুবকদল অশেষ যুদ্ধে হত হইল। ইহার কৃষককুল একদিকে দীর্ঘ সামরিক-জীবন

ও অন্যদিকে করের দ্বারা নির্ম্মূল হইল। সাম্রাজ্যই এক্ষণে একমাত্র বিষয় হইল। নাগরিকগণ একপ্রকার নগণ্য হইয়া গেল।

প্রাচীন রোমান্ সাধারণ-তন্ত্রে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ লোক-দিগের সরল জীবন গর্ব্বের বিষয় ছিল। নব্য সাধারণ-তন্ত্র পিতৃ-পিতামহদিগের সময়ে প্রচলিত সেই উচ্চভাব প্রকাশ করিতে লজ্জা-বোধ করিতে লাগিল। রোম এক্ষণে ধনী-দিগেরই স্থান হইল এবং ধনীদিগেরই উপকারার্থ ধনীদিগের দ্বারাই শাসিত হইতে লাগিল। এমতাবস্থায় ইহার যে অধঃপতন হইবে তাহা অবশ্যম্ভাবী।"

অতঃপর তিনি এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন :—

"উহার ঠিক্ ১৯০০ বৎসর পরে পৃথিবীর মহাসমর আরম্ভ হইয়াছে। ভ্যান্ লুন্ যে অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, বর্ত্তমানে আমেরিকা সেই অবস্থায়ই আপতিত হইয়াছে। আমেরিকা কি একই প্রকারের কারণে যে একই প্রকারের ফল উৎপন্ন হয় এই সত্যটী শিক্ষা করিবার জন্য একশত বৎসর এই অবস্থার মধ্য দিয়াই চলিবে, না, মহৈশ্বর্য্যের চাক্‌চিক্য দূরে নিক্ষেপ করতঃ ইহার পূর্ব্বপুরুষ-গণ যে সমস্ত সরল ভাবের জন্য সংগ্রাম ও প্রাণ-পাত করিয়াছেন—তৎসমস্তেরই উপর স্থায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতঃ ইহা যে আপনার উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ, তাহারই পরিচয় প্রদান করিবে?"

আমেরিকান মনীষীর মন্তব্য যে আমাদের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমেরিকান্ সভ্যতার সমক্ষে আজ যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, সমস্ত পৃথিবীর সমক্ষেও আজ সেই সমস্যাই উপস্থিত। আমেরিকান্ মনীষী এই সমস্যার যে সমাধান প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা সকল সভ্য জাতিরই গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

রোমের অধঃপতনের যে চিত্র আমাদের নিকট অঙ্কিত হইয়াছে, আজ ১৯০০শত বৎসর পরে আবার সেই চিত্রই আমাদের নিকট নূতনরূপে উন্মোচিত হইতেছে। ইতিহাসে এইরূপেই ঘটনাচক্রের পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। রোম তাহার আড়ম্বরহীন কৃষিসম্পদ পায়ে ঠেলিয়া চাক্‌চিক্যময় বাহ্যসম্পদের পথে চলিয়া প্রকৃত সুখ-শান্তি উভয়েই বঞ্চিত হইয়া ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছিল। আজ আমরাও দেশের প্রাচীন কৃষি শিল্পের সরল-স্বল্প সন্তোষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের অসীম ঐশ্বর্য্য ও অশেষ বিলাসের ভাবে মত্ত হইয়া উঠিয়াছি। অর্থই আমাদের একমাত্র উপাস্য হইয়াছে। অর্থসাধনই প্রধান হইয়াছে। চরিত্রবল ও নীতিবলের পরিবর্ত্তে অর্থবলকেই আমরা পরম বল বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি। এই সমস্ত বিকৃত ভাবের যে কিরূপ বিষম পরিণাম হইবে, রোমের ভাগ্যই কি তাহা আমাদিগকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে না?

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গান

সুর বর্ষার স্রোত

আমার আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে
ফুটবে নাকো আলো।
ওগো ক্ষণিক চাওয়ার চকমকানি—
তাও তো নিভে গেল!
পাগল হাওয়া আগল খুলে
দীপ-শিখাটি নিভিয়ে দিলে,
জড়িয়ে দিয়ে সিক্ত আঁচল
সকল ভিজালো।

মৃত্যু-বরণ রুদ্র তালে
দূর আকাশে নৃত্য চলে,
রিক্ত আলো ঘরের কোলে
রইব কত বল।
অশেষ চাওয়া যাদের কাছে
তারা ত' কেউ নেইক পাছে,
শুধুই আঁধার জেগে আছে
চির-অচঞ্চল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

বাংলার পণ্ডিত

পণ্ডিত বীর্য্যবাহু

বিক্রমশীলার বৌদ্ধ মঠে যে সব অসংখ্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁদের সকলের নাম পাওয়া শক্ত। তিব্বতের বৌদ্ধ ত্রিপিটকে অনেক সন্ন্যাসীর নাম দেওয়া আছে। সেই সব ভিক্ষুদের মধ্যে দুই-এক জন ভিক্ষুর পরিচয় দিয়েছি। আজ আর একজন পণ্ডিতের কথা বলব, তাঁর নাম—বীর্য্যসিংহ।

বীর্য্যসিংহ বিক্রমশীলার মঠে বসে অনেক কাজ করেছিলেন। সেখানে তিনি খানকতক সংস্কৃত বৌদ্ধ বইয়ের তিব্বতী অনুবাদ করেন। তিব্বতী অনুবাদ করেন এই জন্য, যাতে সংস্কৃতে লেখা বৌদ্ধ বইগুলি তিব্বতে বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচারিত হয়।

তিনি যে সব বই তিব্বতীদের জন্যে অনুবাদ করেন, তার মধ্যে একখানার নাম হচ্ছে—সংসার-মনো-নির্ণয়াণ কার নাম-সংগীতি (Cordier. Cat. III পৃঃ ৩৩৮)। আসলে এ বইটা হচ্ছে—উপাধ্যায় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিসের রচনা। পণ্ডিত বীর্য্যসিংহ একা এ বইটার অনুবাদ করেন নি, এ বিষয়ে তিনি উপাধ্যায় দীপঙ্করের খুব সাহায্য পেয়েছিলেন।

যদি দীপঙ্কর তাঁর তিব্বতী অনুবাদ কাজে সাহায্য করে থাকেন, তবে বোঝা যাচ্ছে যে দীপঙ্কর ও বীর্য্যসিংহ একই সময়ে জীবিত ছিলেন। আমরা জানি, উপাধ্যায় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৯৮০ খৃঃ অব্দে জন্মান ও তিব্বতের রাজার আহ্বানে তিনি তিব্বতে ধর্ম্ম প্রচার করে ১০৫০ খৃঃ অব্দে মারা যান। তা হলে আমরা মোটামুটি বলতে পারি যে পণ্ডিত বীর্য্যসিংহের আবির্ভাব-কাল—৯৮০ থেকে থেকে ১০৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পড়ে।

যখন তিনি বিক্রমশীলার মঠে ছিলেন, তখন আর একখানি সংস্কৃত বইয়ের তিব্বতী অনুবাদে সাহায্য করেন। সে বইখানির নাম—কায়-বাক্-চিত্ত-সুপ্রতিষ্ঠা-নাম। Cordier Cat. II ২৫৭) এ অনুবাদে তিনি তিব্বতী ভাষার দোভাষীর কাজ করেছিলেন, আর আসল অনুবাদ কাজ করেছিলেন —উপাধ্যায় দীপঙ্কর। এ বইটার রচয়িতাও হচ্ছেন দীপঙ্কর।

এতে দেখা যাচ্ছে যে বীর্য্যসিংহ তিব্বতী ভাষায় খুব পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজেও একখানা বইয়ের তিব্বতী অনুবাদ করেন। সে বইখানি হচ্ছে—দেবীতারেক-বিংশতি-স্তোত্র বিশুদ্ধ চূড়ামণি-নাম (Cordier, Cat. II পৃঃ ১১৪)। মহাচার্য্য সূর্য্যগুপ্ত এ বইটী সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন।

পণ্ডিত বীর্য্যসিংহ তিব্বতে গিয়েছিলেন কি না, তা আমরা জানি না। তিনি বোধ হয়—জাতক-মালা পঞ্জিকা (Cordier. Cat III পৃঃ ৫১২) নামে বইখানিও তিব্বতীতে অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু M. Cordier বলেন, অনুবাদকের নামের বদলে বীর্য্যসিংহ নাম লিপিকর বসিয়ে দিয়েছেন।

যে বইগুলা বীর্য্যসিংহ বা অন্য অন্য ভারতীয় ও তিব্বতীয় পণ্ডিতরা তিব্বতী ভাষাতে অনুবাদ করেছিলেন, তার সংস্কৃত মূল প্রায়ই নষ্ট হয়ে গেছে। যা বাকি আছে তা তিব্বতী ভাষাতেই আছে। যদি তিব্বতী ভাষা থেকে মূল সংস্কৃত পাঠটী ফিরিয়ে আনতে পারা যায়, তবেই আমরা বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাটত্ব অনুভব করতে পারব।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

ঋতুর পালা

গ্রীষ্ম

তৃষ্ণাভরা গ্রীষ্ম !
বৈশ্বানরের শিষ্য !
প্রান্তরেতে,
নৃত্যে মেতে
বিশ্ব করে নিঃস্ব !
তৃষ্ণাভরা গ্রীষ্ম !

*

তপ্ত-ধূলায় হৃষ্ট !
অগ্নি-ঝড়ে সৃষ্ট !
রুদ্র-রাগে
ক্ষুদ্র ভাগে,—
যোদ্ধা, সে নয় ক্লিষ্ট ;
তপ্ত-ধূলায় হৃষ্ট !

*

রক্ত-রাঙা, দৃপ্ত !
মৃত্যু-রতে লিপ্ত।
পৃথ্বী-গৃহে
বিদ্রোহী হে !
শক্ত, অটল, ক্ষিপ্ত—
রক্ত রাঙা, দৃপ্ত !

*

সূর্য্য-চিতা জ্বলচে,
ব্যোম-নীলিমা গলচে।
বৃক্ষ যত,
দুঃখে নত
অগ্নি-নেশায় টলচে।
সূর্য্য-চিতা জ্বলচে।

*

ক্ষেত্র তাপে জীর্ণ—
অগ্নি-বাণে দীর্ণ।
পন্থ ধূ-ধূ,
শূন্য শুধু,
পুষ্করিণী শীর্ণ।
ক্ষেত্র তাপে জীর্ণ !

*

মূর্ত্ত মরু চক্ষে,
মূর্চ্ছা জাগে লক্ষ্যে !
কল্পনারি
শান্তবারি
শুষ্ক হা-হা, বক্ষে—
মূর্ত্ত মরু চক্ষে !

*

সৃষ্টি বাঁচাও, বৃষ্টি !
স্নিগ্ধ-সজল-দৃষ্টি !
উৎস খোলাও,
তেষ্টা ভোলাও,—
সিক্ত, শীতল, মিষ্টি !
সৃষ্টি বাঁচাও, বৃষ্টি !

——

বর্ষা

অন্তরে গুরু-গুরু,
কম্পন হোলো সুরু,
নেত্র সে চেয়ে চেয়ে
যারে এত খুঁজ্‌চে,
হিন্দোলা তুলে বনে,
নন্দিতা এল মনে,
ছন্দিত চিত আজি
অনুভবে বুঝ্‌চে !

ডম্বরু-পাখোয়াজে,
অম্বরে ধ্বনি বাজে,
কজ্জল-তুলি দিয়ে
　　মেঘে আঁকা চিত্র,
চঞ্চলা আসে সাজি,
বিদ্রোহী হয়ে আজি,
বজ্রকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
　　মেঘে করে ছিদ্র !

উৎসবে ধরা ভ'রে,
সূর্য্যকে কাণা ক'রে,
অগ্নিতে মুহু-মুহু
　　রচে শত সর্প,
উচ্ছলি ঝরণাতে,
উচ্ছ্বাসে সুখে মাতে,
উল্লাসে ভেঙে দিলে
　　নিদাঘেরি দর্প !

নির্জ্জন মাঠে-বাটে,
পান্থরা নাহি হাঁটে,
উজ্জ্বল শ্যামলেতে
　　বনভূমি কান্ত,
বর্ষণ গাথা ছাড়া,
পল্লীতে নাহি সাড়া,
শূন্যেতে ডানা মেলে
　　চাতকেরা শান্ত ।

পুষ্পিত কেয়া-কাশে,
শুভ্র কি হাসি ভাসে,
নৃত্যতি কত শিখী
　　নব-ধারা-ছন্দে,
প্রান্তরে পবনেতে,
বন্যা যে ওঠে মেতে,
উন্মনা হোলো হিয়া
　　ভিজে-মাটি-গন্ধে ।

কুঞ্জেতে কবি জাগে,
উৎসাহে, অনুরাগে—
পুঞ্জিত মেঘ-ছায়া
　　হৃদয়েতে ধর্তে ;
বর্ষা গো প্রিয়তমা !
সুন্দরী, মনোরমা !
কাব্যেরি হেম-ঝারি
　　যুগে যুগে মর্ত্ত্যে !

——

শরৎ

শরৎ-ভোরে মরত ভ'রে
　　মন ভুলিয়ে
　　　　চপল
　　　　　　আসে ।
বাদল-মেঘে থামিয়ে মাদল
　　বন দুলিয়ে
　　　　শ্যামল
　　　　　　শ্বাসে ।
আকাশ-ভরা নীলের ধারায়,
নিমেষ-হারা নয়ন হারায়,
শিশির-ধোয়া ফুলের চারায়
　　আঁকছে কে ওই
　　　　কান্ত
　　　　　　ছবি ।
জাগ্‌চে ধীরে উদয়-পাড়ায়
　　আলোয়-অস্পষ্ট
　　　　শান্ত
　　　　　　রবি ।

*

কেয়াফুলের নিশান ওড়ে,
　　ভুর্‌ভুরে্ তার
　　　　গন্ধ
　　　　　　রেণু ।

হাল্‌কা বায়ে শিউলি ঝরে
ফুর্‌ফুরে তার
ছন্দ-
বেণু।
জল্‌কে-যাওয়া চুট্‌কী বাজে—
ঝল্‌কে সবুজ ঘাসের সাজে,
কল্‌কে-ফুলের গেলাস-খাঁজে
চল্‌কে কিরণ
উপ্‌চে
ওঠে।
তীরে-নীরে নিখিল মাঝে
সুখের হিরণ
রূপ যে
ফোটে।

*

রূপ-সায়রে ঢল্ নেমেচে
প্রাণে প্রাণে
জানা-
শোনা।
সোনার-দানা ছড়িয়ে ও কার
ধানে ধানে
আনা-
গোনা।
ওগো অচিন, তোমার বাঁশী,—
মেঠো-গানের মৌন হাসি,
ভোর-স্বপনের সুর উছাসি
বোবা-কালার
চিত্ত
রসায়।
ঘর-ভোলা মোর মন উদাসী
কমল-বালার
নৃত্য-
সভায়।

—

হেমন্ত

ঝির্‌-ঝির্‌ ঝির্ নতুন শিশির
ঝর্‌চে বুকে হিমেল নিশির!
নীল-সায়রের মুক্তো-ঝরা,
স্বপ্নে দেখে সুপ্ত ধরা।
লাল-ভেরাণ্ডার জঙ্গলেতে,
জোনাক-ঝিঁঝির দঙ্গলেতে—
হেমন্তরি মন্ত্র জাগে,
সন্ধ্যামণির নেত্র-আগে।

*

অল্প-ভেজা ভোরের বেলা,
সজ্‌নে-গাছে মুকুল-মেলা।
জামালকোটা বেড়ার পাশে,
শিউলিগুলি ঝ'রেও হাসে।
ধানের ক্ষেতে দোল-দোলানি,
কনক-চূড়ার সোনার বাণী!
লুকিয়ে অলি মৌচাকেতে,
ভাব্‌চে বেরুই কোন্ ফাঁকেতে!

*

শীতের স্যাঙাত হিম-ঋতু রে,
যৌবনেরি মন ভীতু রে!
শীত চলে গো ঠক্‌ঠকিয়ে,
রূপ-রং নেয় সব ঠকিয়ে!
ঘাস-বিছানো বনের মাটি—
শিশির পাতে শীতলপাটি!
প্রথম ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকা,
পদ্ম-দিঘির বক্ষে লিখা।

*

আর্ত্ত ধরার দীর্ঘশ্বাসে,
ঠাণ্ডা হাওয়ার দম্‌কা আসে।
চিত্ত-ব্যথার গোপন তাপে,
ফুলপরীদের পাথ্‌না কাঁপে!

ঝাপ্‌সা হোলো তারার আলো,
জোছ্‌না-হাসির কাল ফুরালো ;
কবির বাঁশীর রন্ধ্র-মাঝে,
বাষ্প-কাতর ছন্দ বাজে !

শীত

ঠক্‌-ঠক্‌ কম্পন, খক্‌ খক্‌ সর্দ্দি,
শাঁই-শাঁই হাঁপ্‌কাশ – শীত ঐ আস্‌চে !
হায় মোর চিত্তের সব সুখ গোর দি,
আজ শীত-দৈত্যের কন্‌-কন্‌ শ্বাস যে !

*

ঐ ত্যাখ্‌ চন্দ্র পাণ্ডুর শঙ্কায়,
আজ তার উজ্জ্বল কৈ সেই দীপ্তি ?
ধূম্রের আব্‌ছায় ছায় আজ গঙ্গায়,
ঢেউদের বক্ষে ঠাণ্ডার ছিপ্‌টি !

*

উদ্যান-কুঞ্জে নেই প্রেম-বন্দন,
মুখ চুপ ভোম্‌রার ঘুম-ঘুম স্বপ্নেই !
ঝর্‌-ঝর্‌ পল্লব ; অস্ফুট ক্রন্দন
দীন-হীন বৃক্ষের ;—মর্ম্মর রব নেই !

*

শ্যাম-রূপ লুপ্ত—ভুঁই আজ নগ্ন,
হিম-হিম মৃত্যুই দিন-রাত জাগ্‌চে !
দক্ষিণ স্তব্ধ,– বীণ তার ভগ্ন,
চক্কর কুঁচ্‌কে সাপ, সেও ভাগ্‌চে !

*

দুঃখের মূর্চ্ছায় জোছনার রাত্রি,
টল্‌-টল্‌ অশ্রু পৃথ্বীর চক্ষে,
ফাল্গুন—বন্ধু ! নন্দন-যাত্রী !
উচ্ছ্বাস-ছন্দে খোল্‌ দ্বার কক্ষে !

বসন্ত

এসেচে, বসন্ত ঐ ধরায় রঙের ঝর্ণা খুলে,
ভেসেচে, আব্‌ছায়া সব শীত-কুয়াশার ওড়্‌না তুলে !
আকাশ ঐ, নীল-মাখানো !
বাতাস ঐ, দিল-জাগানো !
বনেতে, শ্যামের খেলা, ফুলের মেলা, স্বপন-ভরা !
মনেতে, হাস্য-রঙিন প্রেমের ফসল বপন-করা !

*

ওরে আয়, মোর দুলালী, আজ আঁধারে কঠিন যাওয়া !
তোরে চায়, চাঁদের আলো, বকুল-মুকুল, দখিন হাওয়া !
বুকে সই, সাজ রেখনা,
মুখে ওই, লাজ এঁকনা,
সজনী, লজ্জা-সরম ভীরুর ধরম ভুল্‌তে হবে !
রজনী, রূপের নেশায় মধুর ক'রে তুল্‌তে হবে !

*

মরি ও, কোন্‌ বনেতে শোন্‌ কাণেতে কোকিল ডাকে,
তোরি ও, মন জাগাতে ডাক্‌চে রাতে অখিলটাকে !
ওকি গো, কাঁপ্‌চ হেন ?
সখী গো, ভাব্‌চ কেন ?
ললনা, মাস যে ফাগুন, প্রাণ যে আগুন চন্দ্রকরে !
বলনা, কেমন ক'রে চল্‌ব ওরে বন্ধ ঘরে ?

*

পিয়া তোর, চরণ-তলে চাঁদ নাচিয়ে যায় গো নদী !
হিয়া মোর, বুঝ্‌বে তবে—প্রাণের বাঁশী গায় গো যদি !
শয়নে, জাগ্‌বে, বধু !
নয়নে, রাখ্‌বে মধু !
শ্রবণে, মলয়-বাতাস পড়্‌বে মিলন-কাব্য-গাথা !
ভবনে, আজ যাবনা,— যে যা বলুক, ভাব্‌বনা তা !

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

১৬

ঝর্ণার কাছে দাঁড়াইয়া, খুব নিকটের একটা ঝাউএর ডাল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে অরুণ ও কনক কথা কহিতেছিল। কনক বড় এক টুকরা পাথরের উপর বসিয়াছিল।

সকাল বেলা,—নির্মেঘ নির্ম্মল রৌদ্রে ঝরণার নিদাঘ-শীর্ণ জলের ধারা গলিত রূপার মত সুন্দর দেখাইতেছিল। কনক বলিল,—আজ তোমাকে আমি খুব খানিক বকবো অরুণ, চার মাসকার দাদা ব'লে আজ আর খাতির-টাতির রাখছিনে!

অরুণ হাসিয়া বলিল,—কারণ? ওহো! তোমার খোকাটীরই বয়স হল বুঝি চার মাস!

—খুব মানে ধরেছো যা হোক্!

—তা নইলে আর তুমি এগোলে কিসে? বিয়েতে? তা সে তো সেই প্রথম যখন বিয়ে হলো ভাবলাম, বাহা, বাহারে—

—তা কেন,—কি রকম যে হয়ে গেলাম বলবো তাহা কাহারে—! তুমি ভারি চালাকী করছো অরুণ, কথাটা আমাকে পাড়তেই দিচ্ছ না যে!

—তা পাড়ো না কি করে পাড়বে,—আমি কি তোমাকে আটকাচ্ছি না কি?

—আচ্ছা দাদা, বৌদিদিটী তো এমন নিখুঁত নির্দ্দোষ মানুষ, তবু তোমার পছন্দ হয় না কেন, বল তো! সত্যি বলো কিন্তু।

—কে বললে যে আমার পছন্দ হয় না? দোষ আছে বা খুঁত আছে, এমন কথাই বা কে বলেছে কাকে?

অরুণের রহস্য তরল, গলার স্বর একটু গাঢ়!

কনক বলিল,—কেউ বলেনি—আমাকে আবার বলতে যাবে কে? আমি নিজেই তো তোমাকে গোড়া থেকে জানি, কিন্তু বিয়ের পরেও যে তুমি এমন করেই কর্ত্তব্য-জ্ঞানের মাথা খেয়ে ব'সে থাক্‌বে, তা আর আমরা ভাবি নি। কেন এমন ভাব করছো দাদা, তুমি তো ভালো ছেলে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অরুণ হাসিয়াই বলিল, —কি জ্বালা! আজ তুমি সত্যি সত্যিই জ্বালাবে দেখছি। নাও, আরো কি বলবার আছে তোমার, সেরে নাও শীগ্‌গির!

—নিশ্চয়ই। আগে থেকেই তো বলে রেখেছি যে বকাবো। শোনো তুমি, আচ্ছা, সেই যে জ্যোতি, যার সঙ্গে তুলনা ক'রতে গিয়েই—

দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া রুষ্ট কণ্ঠে অরুণ বলিল—আবার! রাস্কেল, বাঁদর কোথাকার! ওই কথা আবার তুই কার্ডে লিখেছিলি! থাম্‌ থাম্—

—কক্ষণো না, আমি কখনই থামবো না। আমাকে আগে তুমি বুঝিয়ে দাও যে, কেন, কিসের জন্যে তুমি বছরের পর বছর ধরে এই সংসারটাকে শান্তিহারা করে রেখেছো—

—সংসারটাকে শান্তিহারা করে রেখেছি, আমি! আর আমি নিজে খুব শান্তিতে আছি?—

—সে তোমার ইচ্ছে, তোমার সাধ। কর্ত্তব্য-জ্ঞান হারিয়ে অমানুষ হতে যাও কেন, বুঝিয়ে দাও আমাকে। আমি তোমার সবই জানি, পিসিমাও এই জন্যে কত দুঃখ নিয়ে চলে গেলেন। তুমি আবার আমাকে লুকোতে চাও?

এবারেও সহজভাবে হাসিয়া অরুণ বলিল—হয়েছে তোমার কথা! অচ্ছা; তোমার সব কথাই আমি বিনা-প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছি, কিন্তু আমার যেমন উত্তর নেই, তেমনি তুমিও থামো কনক, তোমার ও কথাগুলি আমার মোটেই প্রীতিকর হচ্ছে না, এটা কি বুঝতে পারছো না তুমি?

—খুবই পারছি। কিন্তু অপ্রীতিকর বলেই তো কথাটা তুলে শেষ করতে চাই। তা নইলে প্রীতি যে তোমার কিছুতেই থাকবে না, তাও তো দেখছি! তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না যে বড়? দাও, আমার কথার জবাব দাও তুমি!

অরুণ অন্যমনে ঝাউয়ের ডালের পাতাগুলি সব নিঃশেষ করিয়া টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। কোন কথাই সে বলিল না। কনক একটুখানি তার উত্তরের অপেক্ষা করিয়া বলিল,—কিন্তু তুলনাই যদি করতে চাও তো বলছি, শোনো, সে জ্যোতিও এখানেই আছে, বেশী দূরেও নয়। ঐ যে ওপরের ঐ রাস্তার পাশের সাদা বাড়ীটা, ঐটাতে তারা থাকে। শুনছো?

অরুণ গর্জ্জিয়া উঠিল,—কে তোমার জ্যোতির খোঁজ চায়, কনক? আমি তো চাইনে। তা ছাড়া তা জেনে কি আমার লাভ আছে কিছু? তোমরাই তো বল যে, আমি না কি স্বার্থ ছাড়া কথাও বলিনে,—তবে?

—নাঃ, তুমি আমাকে হার মানালে ভাই,—তুমি দাদাই বটে! আমি বুঝতে পারলুম না যে ব্যাপারখানা কি! বলবে না ভাই?

পাতা-শূন্য ডালটা এ দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অরুণ বলিল, কি বলবো বল,—বলবার আমার কিছুই নেই। তোমার সে চিঠিখানি আমি কি করেছি, জানো?

—না,—কি করেছ?

—যার পক্ষ হয়ে তুমি আমার সঙ্গে লেগেছ, তার ঘরে ফেলে রেখে এসেছি।

—সে কি ইচ্ছে করে, না ভুলে? তবে বুঝি সন্ধি হয়ে গেছে?

—দ্বন্দ্বই নেই, তার সন্ধি! ভুলে। এইমাত্র মনে পড়লো। যাক্, যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে,—কি বল?

কনক মাথা নাড়িয়া বলিল,—আমি আর কিছু বলিনে ভাই!

এই ঝর্ণাটি বাসার পিছনের দিকে,—স্থানটি একেবারে নির্জ্জন বলিলেই হয়! পাহাড়ের গায়ে কয়েক রকম বনফুল ফুটিয়া জায়গাটিকে আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে!

কাছেই একটী রাস্তা আছে বটে, কিন্তু রিক্সা বা ডাণ্ডি সে পথে চলে না, বড় অসরল বন্ধুর পথ। দু চারজন সৌখীন লোক পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে যায়!

সবিতার ঘরের পাশেই এই জায়গাটী। সবিতাও মধ্যে মধ্যে ঘরের এই দিকের কপাট খুলিয়া এইখানে আসিয়া বসিত, আশে-পাশে পুলক খেলা করিয়া বেড়াইত, তাই পুলকের বিশ্বাস ছিল যে, এ স্থানটুকু তাদেরই ইজারা করা; সে লাফাইতে লাফাইতে গিয়া বলিল,—বৌমা, আমাদের সেই বসবার পাথর দুখানা বড় মামা নিয়ে নিয়েছেন, দেখেছো তুমি?

সবিতা কাজ করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল,—কেমন করে?

—তুমি ওঠো, দেখ্‌বে চল না,—ওঁরা গিয়ে সেইখানে বসেছেন!

—তা বেশ তো, পুলক, আমরা আর ওখানে বসবো না,—ওঁরা বসুন।

পুলক রাগ করিয়া বলিল,—না, তাহলে আমি গিয়ে দাদাবাবুকে বলে দেব।

—কি বলে দিবি রে তুই দাদাবাবুকে?—বলিয়া কনক আসিয়া পুলককে কোলে তুলিয়া লইল। অচেনা লোকের কোলে উঠিয়া পুলকের মুখে চট্ করিয়া আর কথা ফুটিল না; সে আড়ষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিল।

কিন্তু অল্পক্ষণ আলাপেই কনক তার ভয় ভাঙ্গিয়া দিলে সে বলিল,—কই, তোমার তো চশমা নেই, ভেঙ্গে গিয়েছে বুঝি?

—না, আমি চশমা পরিনে। তাই আমার চশমা নেই।

মাথা নাড়িয়া সগর্ব্বে পুলক বলিল,—আমার বড় মামার খুব সুন্দর ভাল চশমা আছে।

কনক হাসিয়া বলিল, তোর মামা বাবু যে কাণা, চোখে দেখতে পায় না।

—ইস্, তা বই কি! আমিও বড় হয়ে এক পয়সা দিয়ে খুব ভালো চশমা কিনবো, কাণা হব না।

কনক হাসিয়া উঠিল, কহিল,—তা কেন, কাণা হতেই হবে তোমায়। শাস্ত্রে আছে নরানাং মাতুলক্রমঃ, কেন তা হবে না?

—না, আমি কক্ষনো কানা হবোনা! বলিয়া কনকের হাত ছাড়াইয়া পুলক নামিয়া পড়িল, চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল,—ইস্, আমি বুঝি ভিখিরীদের মত কানা হব! ভারি উনি, আমাকে কানা হতে বলবেন!

যেন কনকের কথা মত সে কানা হইতেই বসিয়াছে! আশার ভাই আসিয়া তাকে লইয়া গিয়াছে, সেও বোনের বিবাহে যাইবার জন্য খুব নাচিয়াছিল। এখন সবিতা আবার সেই একা!

সংসারের ছোট ছোট কাজকেই বাড়াইয়া ফেনাইয়া তাই লইয়া সে নিবিষ্ট থাকে। যেন একখানি উচ্ছ্বাসহীন আবেগ-হীন যন্ত্রমান! এর মাঝে আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, দুঃখ নাই, ক্ষোভ নাই, এমনি অচঞ্চল স্থির!

ব্রহ্মচর্য্য-রত ব্রাহ্মণ ও বিধবার সাহচর্য্যে সে মানুষ,—বাসনার দাহকে প্রাণপণে পরিহার করিয়া চলে,—ঘৃণা করে।

প্রিয় হউক, অপ্রিয় হউক, সে চায় কঠোর সত্য। স্বামী যদি তাকে ভাল নাই বাসেন, তবে মিথ্যা ছলনায় সংসার অভিনয়ের দরকার সে বোঝে না,—সে সুখ চায় না,সত্য চায়!

তাই তার কামনা-বাসনার তাপহীন স্নেহ-শীতল হৃদয় খানি যে দেখিত, সসম্ভ্রম শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিত, কনকও এই দুদিনের দেখাতেই তাকে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অরুণও কি মুগ্ধ হয় নাই? দুঃখে-সুখে যার সহানুভূতি সর্ব্বক্ষণ তার চারিদিকে ঘিরিয়া আছে, কতক্ষণ সে চোখ বুজিয়া থাকিবে? কিন্তু তার তখন এমন অবস্থা যে, এতদিনকার গর্ব্বোন্নত কঠিন মন, বিজয়ী মস্তক নামাইয়া হার মানিতে সে যেন পারে না!

এ কথা মনে করিতেও তার মাথার রক্ত গরম হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই মনে পড়ে,—কেন, আমার প্রতি যে অন্যায় এঁরা করিবেন, সেই অন্যায়ের তলেই আমি মাথা পাতিয়া দিব, কে?

লোকে কি বুঝিবে না যে আমারও একটা স্বাধীন মন আছে? আমি নিজেও একটা মানুষ? সংসারের ঘানি-গাছে চোখ বাঁধিয়া জুড়িয়া দিবার আগে কেন ব্যাপারটা একটুও বিবেচনা করিতে দিবেন না?

'ফুলের ঘা' এখন অনেক দূরেই গিয়া পড়িয়াছিল। তার আর সেদিকে কোন খোঁজ ছিল না, তবে ঘুচে নাই শুধু অটুট অহঙ্কার!

দিনকয়েক পরে একদিন কনকও অরুণের সঙ্গে পুলকও বেড়াইতে গিয়াছিল। পুলককে সঙ্গে করিয়া যাইবার আগ্রহ অরুণের তেমন ছিল না, কিন্তু কনকই তাকে জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিল। পুলকের গায়ে তেমন মোটা জামা দেওয়া ছিল না বলিয়া সবিতা উদ্বিগ্ন ছিল, কেন না সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল।

পুলক ফিরিবামাত্র তাড়াতাড়ি তাকে একটা মোটা জামা পরাইয়া সবিতা তাকে খাওয়াইতে লইয়া গেল। কিন্তু পুলক নানা আব্দারে কাঁদিয়া কাটিয়া সবিতাকে বিরক্ত করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল! তার সেদিন কিছুই খাওয়া হইল না! অনেক কাণ্ড করিয়া অল্প কিছু দুধ পেটে পড়িয়াছিল মাত্র।

রাত্রে যখন সবিতা শুইতে গেল, তখন দেখিল, পুলকের গা বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। এই জ্বরের জন্যই সে খাইতে বসিয়া সে মোটেই খাইতে পারে নাই।

সবিতার মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, পুলকের তো জ্বর বেশী হয় না, এই পাহাড়ে দেশে আসিয়া এমন জ্বরটা হইল কেন?

কাকেই বা সে বলিবে? শ্বশুর শোকে সন্তপ্ত, তাতে আবার হার্টের অসুখের রুগী,—এত রাত্রে তাঁকে জাগানো হয়তো উচিত হয় না,—তবে...?

তবে কি সে অরুণকে খবর দিবে? একটা ঘর বাদ দিয়া পরের ঘরে অরুণ শুইয়া আছে, কিন্তু জাগিয়া আছে কি?

সবিতা সার্শি-ঘেরা বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, সে কি করিবে?

বাড়ীর আর-সব লোকজন খাওয়া-দাওয়া সারিয়া চলিয়া গিয়াছিল, কেবল কর্ত্তার বুড়ো খানসামা গোপী একটা দীপ হাতে করিয়া যাইবার যোগাড় করিতেছিল।

তাকে দেখিয়া একটু আশা পাইয়া সবিতা বলিল,—বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না, জানো?

গুপী কর্ত্তার ঘর দেখিয়া আসিয়া বলিল,—হাঁ৷ তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন,—আজ-কাল শীগ্‌গির শীগ্‌গিরই তিনি ঘুমোন।

সবিতা একটু ভাবিয়া অগত্যা অরুণকেই খবর দিতে বলিল। বাড়ীর একজন কাহাকেও খবর না দিয়া সে সুস্থ হইতে পারিল না। যদিই জ্বরটা সহজ না হয়, জানাইয়া রাখা ভাল।

অরুণকে খবর দিয়া সে পুলকের টেম্পারেচার লইল, জ্বর অনেকখানি উঠিল। কিন্তু তখনো পুলক সুস্থভাবেই ঘুমাইতেছিল। গোপী আসিয়া বলিয়া গেল, অরুণের দরজায় ঘা দিয়া কোনো সাড়া মিলিল না, বোধ হয়, সেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

পুলক কোনো রকম চঞ্চলতা দেখাইতেছিল না বলিয়া সবিতা আর কিছু বলিল না, আপনা হইতে তার কপালে একটা জলপটী বসাইয়া দিল।

গুপীর মুখে পুলকের জ্বরের খবর পাইয়া, ভোরবেলা কর্ত্তা আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন,— বৌমা!

সবিতা বিছানা হইতে নামিয়া আগাইয়া গেল, বলিলেন, পুলকে নাকি জ্বর হয়েছে?

— খুব জ্বর,—সারারাত একটুও চোখ মেলেনি, এখনো মেল্‌ছে না।

কর্ত্তা পুলকের কপালে হাত দিয়া একটু গম্ভীর মুখে বলিলেন,—তাই তো! জ্বরটা কখন্ হল বৌমা?

—আমি যখন টের পেলাম। তখন রাত দশটা, গুপীকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু আপনি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বাবা।

চিন্তিতভাবে কর্ত্তা বলিলেন,—তাই তো! নতুন যায়গা! যাই, ডাক্তারকে খবর পাঠাতে হবে।

সবিতা বলিল,—আপনার ওষুধ-টষুধ—

—আহা! থাক্ না মা, সে গুপীই দেবে এখন,—তুমি তো এখন ওকে ছেড়ে উঠ্‌তে পারবে না!

গুপী পুরানো ও বিশ্বাসী চাকর, কর্ত্তার সেবা করিয়াই সে চুল পাকাইয়াছে; তাই তার উপরেই কর্ত্তার সেবার ভার দিয়া সবিতা পুলককে লইয়া রহিল।

এতক্ষণে পুলক কাঁদিয়া জলপটীটা বার বার টানিয়া ফেলিতে লাগিল। তার অনবরত মাথা নাড়ার জন্য সবিতা আর জলপটী দিতে পারিতেছিল না।

অরুণ ও কনক এক সঙ্গে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। কনক পুলকের কাছে গিয়া বলিল,—কি হল রে পুলক? জ্বর হল কেন?

অরুণ ততক্ষণ ঘরের এদিক ওদিক দেখিতেছিল একটা চেয়ার বা টুলের আশায়, কিন্তু কিছুই পাইল না।

সবিতা বিছানার উপর বসিয়াছিল, সেই উঠিয়া দাঁড়াইল, অরুণ ও কনক সেই বিছানাতেই পুলকের পাশে বসিল। কনক বলিল,—হঠাৎ এমন জ্বরটা কেন হল? কাল আমাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েই কি জ্বরটা হলো?

অরুণ বলিল,—বলাও যায় না—তবে তাতে আর কিই এমন ঠাণ্ডা লেগেছে! ওই ভয়ে আমি কখনো ওকে সঙ্গে নিইনে,—কি জানি, ছেলে-পিলেদের কিছু তো বুঝিনে!

পুলক খুব কাঁদিতেছিল। সবিতা তাই তাকে কোলে করিয়া ঘরের মেঝেয় ম্যাটিংয়ের উপর বসিল।

কনক বলিল,—আমার তো তাহলে এখন বৌঠাকুরুণের সামনে দাঁড়ানোই ঠিক নয়,—উনি তো আমাকেই পুলকের জ্বরের কারণ ধরে নিচ্ছেন।

সবিতা পুলকের মাথার রেশম-গুচ্ছের মত চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—না, না, তা কেন ভাববো?

অরুণ বলিল,—একদিনকার জ্বরে আবার ভাববার কি আছে? ডাক্তার ডাকতে লোক গিয়েছে এখনি তিনিও আসবেন্।

চাকর আসিয়া জানাইল, চা দেওয়া হইয়াছে। কনক উঠিয়া গেল। অরুণও উঠিয়া বলিল,—এইবারে তাকে বিছানায় শুইয়ে দাও।

সবিতা বলিল,—দিচ্ছি।

—দিচ্ছি কেন আবার! কতক্ষণ কোলে নিয়ে বসে থাকবে! দাও শুইয়ে!

সবিতা পুলককে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিল,—এক দিনের জ্বরেই কি রকম নেতিয়ে পড়েছে!

—হুঁ, টের পাও এখন। তখন বলেছিলুম, প্রভাতের সঙ্গে পাঠাতে,—তা শোনা হলো না!—এখন পরের ছেলে নিয়ে—

সবিতার চোখ দুটী জ্বলিয়া উঠিল ; সে বলিল,—বোনের ছেলে কি পরের ছেলে ?

—বোনের ছেলে আমার ;—আমি তোমার কথা বলছিলুম !

—আমার কথা ! সবিতার দুই চোখ অবধি ঘোর অবিশ্বাসে হাসিয়া উঠিল।

অরুণ অপ্রতিভ হইয়া সবিতার মুখের নির্ব্বাক তিরস্কার দেখিতে লাগিল। কত ব্যথা, কত দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে একটী স্নিগ্ধোজ্জ্বল মহিমশ্রী তার তরুণ মুখখানির লাবণ্য শত গুণে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। তার মনের জ্যোতি তার সারা অঙ্গে আলো ছড়াইতেছিল।

সে ধূপের মত সন্তাপে পুড়িতে জানে, কিন্তু বিতরণ করে স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ !

অরুণ নির্ণিমেষে তার দিকেই চাহিয়া আছে দেখিয়া সবিতা লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—তোমার চা যে জুড়িয়ে যাচ্চে !

হাসিতে হাসিতে অরুণ বলিল,—তা যাক্‌,—কিন্তু তোমাকে যে গরম করে নিলুম,—এ কাজটা কি ভাল হলো !

সবিতা বলিল,—যদিও আমি গরম হই নি, তবু হ'লেও বা অন্যায় কি ? ক্ষতি তো কিছু নেই এতে !

—তা না থাক্‌—তবু—

সবিতার মন ভাল ছিল না, সে মাথা হেঁট করিয়া বলিল,—তোমার চা কিন্তু এর পর আর খেতে পারবে না !

অরুণ হাসিল, বলিল,—তাগাদা ? আচ্ছা, যাচ্চি।

পুলকের মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিয়া সে উঠিয়া গেল। তাকে দেখিয়া কনক রহস্য-ভরা হাসি হাসিয়া বলিল,—কি অরুণ, আশা করি যে—

অরুণ বলিল, চুপ্‌, চুপ্‌,—অনেক হয়ে গেছে তো আজ, আবার কেন ?

—ধর যদি উল্‌টো গাই, আপত্তি আছে কিছু ?

—নিশ্চয়ই। সে যে মিথ্যে হবে।

—কেন ?

—থাম্‌ ভাই, চাটা আগে খেয়ে নি। বলিয়া অরুণ ব্যস্তভাবে চায়ের পাত্র মুখে তুলিল। কনক চা শেষ করিয়া মশলা চিবাইতে চিবাইতে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

পণ্ডিত

আজ শুধু একদিন তোমার অন্তর
এড়াইতে পারে নাই বনানীর বসন্তের কুহক-মন্তর !
অপরাধ গণিয়া তাহায়
জানি আমি হে পণ্ডিত, দগ্ধ তুমি অনুশোচনায় !
দিন তব কাটিয়াছে খালি
চিন্তা করি অদৃষ্টের নিগূঢ় হেঁয়ালি—
জীবনেরে ভুলে আছ হায়
ডুব দিয়ে পুঁথির পাতায় !
কিবা ফল তায় ?

বিধাতার রহস্য অপার
ছেড়ে দাও হাতে বিধাতার !
যত দিন প্রাণ আছে দেহে, দুঃখ করি দূর
'বাঁচা' এই সহজ কথার পান কর রস সুমধুর ! *

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* রচয়িতা বেলজিয়ামের কবি Fernand Severin

কাশ্মীর যাত্রা

অনেক দিন থেকে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর যাবার কথা মনে হত। হঠাৎ একদিন সংকল্প স্থির করে তদুপযোগী আয়োজন করতে লেগে গেলুম। নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রী সংগৃহীত হল। পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধা হলো—বাক্সও সাজানো হ'ল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই ছত্র মনে পড়ল—

"বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি—"

কিন্তু আমার কাছে কে আর সে রকম আবদার করবে? —ও পাট আমার বহুদিন শেষ হয়ে গেছে। যাই হোক্, আসবাব-পত্র গুছিয়ে নিয়ে হাবড়া ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলুম। কাশ্মীর যাচ্ছি—একা। মনে আনন্দ হচ্ছে—আবার অন্তরের নিভৃত কোণে নিঃসঙ্গ প্রবাস-দুঃখও উঁকি দিচ্ছে। মনের এইরূপ ভারাক্রান্ত অবস্থায় ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে বম্বে মেলের থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে উঠে বসলুম। ধারের একটি বেঞ্চে আমার প্রবাস-জীবনের সাথী সংরঞ্চখানা বিছিয়ে কোন রকমে কিছু জায়গা ক'রে নিলুম। যেতে হবে অনেকদূর, এজন্য আমার একলার দ্বারা যতদূর সম্ভব, সবই এক রকম গুছিয়ে নিয়ে ছিলুম।

গাড়ী ছাড়ে আর কি; ফার্ষ্ট বেল হয়ে গেছে—গার্ড সাহেব ছাড়-পত্র পেয়ে সবুজ আলো দেখিয়ে বাঁশী বাজিয়ে দিয়েচেন—এমন সময় দেখি, আমার এক প্রবাসী বন্ধু বিপিন বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের কামরার দরজায় এসে হাজির। আমি তাঁকে দেখেই তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলুম। নিতান্তই স্থানাভাব—তথাপি কোন রকমে একটু জায়গা করে দিলুম। তিনি তাঁর আসবাব-পত্র গুছিয়ে রেখে চাদর নেড়ে একটু হাওয়া খেতে-খেতে বল্লেন—যাক্, এখন বাঁচলুম।

গাড়ী ছেড়ে দিলে—দানব-শিশুর হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে গাড়ী চল্ল। পরস্পর কুশল-প্রশ্নের পর বিপিন বাবু বল্লেন, "তুমি যাবে কোথায়?" আমি বল্লুম, "কাশ্মীর।" কাশ্মীর শুনেই বিপিন বাবু বল্লেন, "একলা যে,—একজন চাকর নিতে পারতে!" আমি বল্লুম, "তা নয় ভাই! নিঃসঙ্গ প্রবাস-যাত্রায় মজা কত, সেটা একবার দেখবার ইচ্ছা হয়েছে—তাই এ যাত্রা!" বিপিনবাবু বল্লেন,—"তা কি হয় ভাই! ভগবান কি কারুকে একলা ছেড়ে দিতে পারেন—এই দেখ না কেন, আমি যাব জব্বলপুর,—ভাবছিলুম, একলা এতটা পথ যাব কি করে! কিন্তু দেখি, বিধাতা অপ্রত্যাশিতরূপে তোমায় মিলিয়ে দিলেন!"

বিপিন বাবুর কথাটা আমার মনে লাগল। দুই বন্ধুতে নানা কথাবার্ত্তায় রাত কাটিয়ে দিলুম। সকাল হলো। গাড়ীও মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌছুল। আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের একটা পরিচ্ছেদও এইখানে শেষ হ'ল। কেননা, আমাকে এইখানে গাড়ী বদল করতে হবে। আমি বিপিন বাবুকে নমস্কার জানিয়ে নেমে পড়লুম। একটা কুলির মাথায় আমার ট্রাঙ্ক ও বেডিংটা চাপিয়ে ও, এগু আর, আর লাইনের মেল ধরবার জন্যে চল্লুম।

যথাসময়ে গাড়ীও ছেড়ে দিলে। কয়েক মাইল পথ যেতেই সৌধ কিরীটিনী বারাণসীর সুউচ্চ মিনার চোখের সামনে ফুটে উঠল। আমি বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। মিনিট কয়েক পরেই দেখলুম, উত্তর-বাহিনী ভাগীরথীর কোলে অৰ্দ্ধচন্দ্রাকারে সোপান-নিবদ্ধ বারাণসী-ক্ষেত্র। কত বিশ্বাসীর ভক্তির অশ্রুজলে পবিত্র এই স্থানটি দেখে আমার তাপ-দগ্ধ প্রাণ যেন শীতল হয়ে গেল। আমি উদ্দেশ্যে বিশ্ব-মানবকে প্রণাম করে কত কি ভাবতে লাগ্‌লুম।

বৈকাল বেলায় গাড়ী লক্ষ্ণৌ এসে পৌছুল। আমি সেদিন আমার এক লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী বন্ধুর বাসায় রাত্রি যাপন করে পরদিন পুনরায় মেলে চড়ে বসলুম। সাহারাণপুরে এসে এন, ডব্লিউ আরের গাড়ীতে উঠ্‌তে হয়। যাই হোক, আমি পরদিন লাহোর হয়ে রাওলপিণ্ডিতে এসে পৌছুলুম। এখান থেকেই আমাকে কাশ্মীর যেতে হবে। কাশ্মীরের যাত্রা-পথের কত সুখ-স্বপ্ন, কত কল্পিত মাধুরী আমাকে নব-নব ভাবে প্রলোভন দেখাতে লাগ্‌লে। আমি কাশ্মীর-যাত্রার যান-বাহনাদির ব্যবস্থা করতে লাগ্‌লুম।

দেখলুম রাওলপিণ্ডি থেকে কাশ্মীর যেতে পাঁচ রকম যান-বাহনের ব্যবস্থা করতে পারা যায়। প্রথম সাধারণ টঙ্গা। এই টঙ্গায় তিনজন মানুষ বসতে পারে। এই রকম টঙ্গা লক্ষ্ণৌ বেরেলি মিরাট লাহোর প্রভৃতি সব সহরেই দেখা যায়। এই টঙ্গার ভাড়া প্রায় ৩০।৩৫৲ টাকা। দ্বিতীয় ধনজী ভাইয়ের টঙ্গা। এই টঙ্গা ইম্পিরিয়াল ক্যারীইং কোম্প্যানির তরফ্ হ'তে রাওলপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর, আবার শ্রীনগর থেকে রাওলপিণ্ডি পর্য্যন্ত ডাকের চিঠিপত্র বয়ে যাতায়াত করে। এই রকম টঙ্গাতেও যাত্রী নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে। ভাড়া প্রতি জন ৩২॥০। সাধারণ টঙ্গা পঞ্চম দিনে রাওলপিণ্ডি থেকে শ্রীনগরে পৌঁছয়—কিন্তু

পহল গাঁও

এই টঙ্গা তৃতীয় দিনে শ্রীনগরে পৌঁছে দেয়। এর জন্যেই এর ভাড়া একটু বেশী। তৃতীয় ধনজী ভাইএর ফিটন্, এর ভাড়া ১৮০৲ টাকা। এতে চারজন মানুষ বসতে পারে। এই ফিটনও তিন-চার দিনে শ্রীনগর পৌঁছয়—কিন্তু এই ফিটনে বেশী মাল-পত্র রাখ্‌বার উপায় নেই। চতুর্থ মামুলি এক্কা। তিন জন এতে বস্‌তে পারে। আস্‌বাব-পত্র যদিও এতে অনেক যেতে পারে বটে, কিন্তু এতে বস্‌বার বড় কষ্ট। পঞ্চম, মোটর-কার—এর ভাড়া ২৫০৲। এই মোটর-কারে একদিনে রাওলপিণ্ডি থেকে শ্রীনগরে যাওয়া যায়। যাই হোক, আমি পাঁচ রকম যান-বাহনের খবর নিয়ে একটা মামুলি টঙ্গায় যাবার ব্যবস্থা করে নিলুম। মোটরের কাছে ঘেঁস্‌তে পারলুম না। কারণ মোটরে যেতে হ'লে পকেট খুব ভারী থাকা চাই। তাছাড়া টঙ্গায় গেলে ইচ্ছামত বিশ্রাম করে যেতে পারা যাবে। একটু বা হেঁটে গেলুম—কোনো জায়গার দৃশ্য দেখ্‌তে বেশ ভাল লাগ্‌ল, একটু বা সেখানে এখানে দাঁড়ালুম। অতএব বিচার করে' টঙ্গাই ঠিক করা গেল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে আমি কাশ্মীর-যাত্রী একজন সঙ্গী পেয়েছিলুম। এঁর নাম রামদত্ত চৌবে। পরিচয়ে জান্‌লুম, ইনিও আমারি মত মুক্তদার। মনের অবস্থা খারাপ হওয়ায় একটু বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছেন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এক সহরে ওকালতি করতেন। এই সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় এক সমব্যথী বন্ধু পেয়ে তাঁকে আমার বড়ই ভাল লাগ্‌ল; এবং তাঁকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌তে লাগলুম।

সন্ধ্যার সময় চৌবেজীর সঙ্গে সাধারণ টঙ্গা চড়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম। রাত্রি দশটার সময় একটা গাঁ পাওয়া

গেল। এই গাঁয়ে কাশ্মীর-যাত্রী যত টঙ্গা আর এক্কা একটু বিশ্রাম করে নেয়। রাত্রি বারোটার পর পুনরায় যাত্রা সুরু হলো। পরদিন বেলা বারোটার পর মারীতে এসে পৌছলুম। মারী সমুদ্রতল থেকে প্রায় আট হাজার ফুট উঁচু। মারীর উপরকার সমতল ভূমিতে লোকের বসতি। পাকা। এই পথের এক পাশে উঁচু পাহাড় এবং অন্য পাশে সুগভীর খাই। এ রাস্তা এমন চওড়া যে, দুখানা টঙ্গা স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি যেতে পারে। মাঝে মাঝে এমন সংকীর্ণ স্থান আছে যেখানে একখানা টঙ্গা অতি কষ্টে কোনো মতে পার হয়ে যায়। যাত্রীরা ঐ রাস্তা দিয়ে নিরাপদে যাওয়া-

সোপুর—বিতস্তার উপর পুল
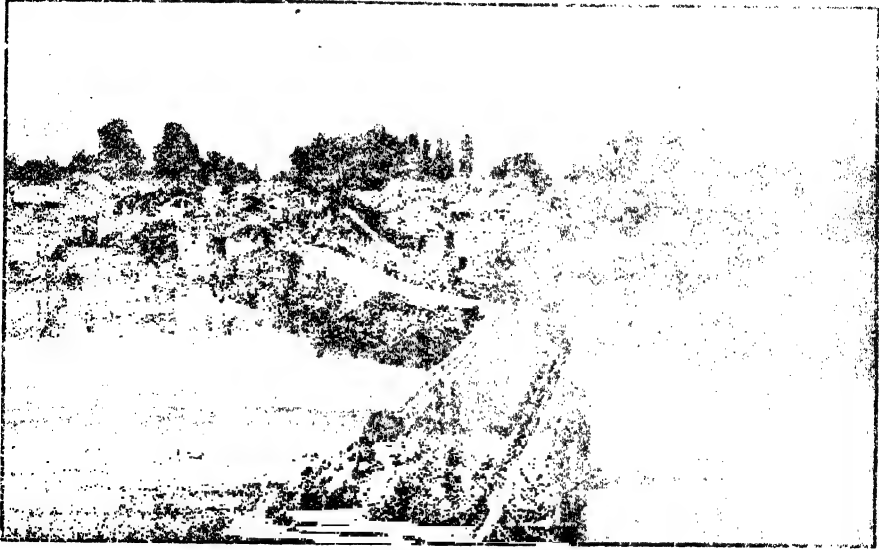
এখানে অনেক ইংরাজ গ্রীষ্মকালে বাস করেন। এই জায়গাটা শ্রীনগরের চেয়েও ঠাণ্ডা। এখানে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের একটি ছাউনিও আছে। এখান থেকে বরফে-ঢাকা উঁচু পাহাড়ের চূড়াগুলি বড় সুন্দর দেখায়। মনে হয়, যেন ধরণী দেবী তাঁর বড় বড় আঙুল তুলে বিশ্ব-পিতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি হিমালয়ের অপরূপ ছবি মানুষকে দেখিয়ে দিচ্চেন। বাংলার সমতল ভূমিতে বাস ক'রে পাহাড়ের দৃশ্য দেখায়-অনভ্যস্ত আমার প্রাণটা আজ শান্তোদার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে গেল। আমরা কিছুক্ষণ একটু বিশ্রাম করে' টঙ্গা-ওয়ালাকে আবার ঘোড়া জুততে বল্লুম। টঙ্গাওয়ালা ঘোড়া জুত্‌ল। ঘণ্টার ঠনাঠন্ শব্দে উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে যেন সেই পাহাড়ী ঘোড়া পাথরের বুকে পদাঘাত করতে করতে ছুটে চলল।

মারী থেকে এবার ওৎরাই। এই পথ বেশ চওড়া আর আসা করতে পারে, এ রাস্তায় চোর-ডাকাতের কোন উপদ্রব নেই।

রাস্তার মধ্যে রাত্রি-যাপনের জন্যে বিস্তর সরাই আছে। ঐ-সব সরাইয়ের মধ্যে উড়ী বারামুলা এবং পটন বড় সরাই। এ-ছাড়া আরো কয়েকটা সরাই আছে। সেখানে দুধ, সন্দেশ আর লুচি পাওয়া যায়। চার আনা দক্ষিণা দিলেই রাত্রি-যাপনের জন্যে এক-একটা ঘর পাওয়া যেতে পারে। ঐ ঘরের মধ্যে খাটিয়া প্রভৃতি আছে। সরাইয়ে সব সময়ে লুচি তৈরি থাকে না; দোকানদারকে বল্লে সে যথাসময়ে তৈরি করে দেয়। উড়ী সরাইয়ে জলের বড় অভাব। পাহাড়ের গা থেকে একটি মাত্র ঝরণা নেমেছে। তার জলই উড়ীর লোকের একমাত্র ভরসা। ঐ ঝরণার জল বেশ ঠাণ্ডা, হাল্‌কা আর সুপেয়। কাশ্মীরে যত ঝরণা দেখেছি, অধিকাংশ ঝরণার জল এই রকম ঠাণ্ডা

আর মিষ্টি—দু'একটা ঝরণার জল একটু গরম এবং কটু। সব সরাইয়েই দুধ পাওয়া যায়। এক সের খাঁটি দুধের দাম দু' আনা।

বারামুলার অধিবাসী-সংখ্যা প্রায় পনের হাজার। এটাকে পাঞ্জাবীদের উপনিবেশ বললেও চলে। এখানে সপ্তসিংহের একখানি বাড়ী আছে। সপ্তসিং জাতিতে শিখ। শুনলুম, তিনি অতি উদার এবং ধার্ম্মিক। তিনি আপনার বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার বন্দোবস্ত করেছেন। যাত্রীরা ইচ্ছা করলে তাঁর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতে পারেন। যাতে অতিথিদের কোনোরকম কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, এজন্য তিনি দস্তুর-মত ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

রাওলপিণ্ডি থেকেই কাশ্মীর-রাজের অধিকার আরম্ভ

বারামুলা

হয় নি। রাওলপিণ্ডি থেকে ৬৩ মাইল দূরে কোহালা বলে একটা জায়গা আছে। এইখান থেকেই কাশ্মীরের অধিকার-সীমা আরম্ভ। এই জায়গা থেকেই ঝিলামের তীর দিয়ে প্রায় ১০০ মাইল রাস্তা আছে। এই-নদীতে বারামুলা পর্য্যন্ত নৌকা চলে না। নদীর মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাথরের স্তূপ রয়েচে—তাতে জল আছাড় খেয়ে পড়চে—এজন্যে নৌকা-চলাচল একরকম অসম্ভব। বারামুলা থেকে টঙ্গা যে পথে যায়, তা নদীর ধার দিয়ে নয়। এই রাস্তা নতুন তৈরি হয়েছে। যখন এ রাস্তা তৈরি হয় নি, তখন লোকে বারামুলা থেকে নৌকা ক'রে শ্রীনগর যেত। বারামুলা থেকে একটু দূরেই উলার ঝিল। উলার-ঝিল থেকে বেরিয়েচে বলেই এর নাম হয়েচে ঝিলাম্। উলার ঝিলের আগে এই নদীর নাম বিতস্তা। এই বিতস্তা নদী শ্রীনগর থেকে ৫০ মাইল দক্ষিণে বীরনাগ নামার এক ঝরণা থেকে বেরিয়ে শ্রীনগরের কাছ দিয়ে এসে উলার ঝিলে পড়েচে।

শ্রীনগরে নবাগত যাত্রীদের থাকবার জন্যে শিখেদের ধর্ম্মশালাই ভাল। যাঁদের কাশ্মীরে কেউ আত্মীয়-স্বজন বা থাকবার তেমন ব্যবস্থা নেই, তাঁরা ঐ সব ধর্ম্মশালায় দু'চার দিন থেকে কোন বাড়ী বা হাউস-বোট ঠিক করে নিলেই চলে। এখনকার বাড়ী-ঘর প্রায়ই কাঠের তৈরী; দেওয়ালও কাঠের। তার সেই কাঠের দেওয়ালে মাটির

নঙ্গা পর্ব্বত

প্লাষ্টার করা। এখানে আগে খুব ভূমিকম্প হতো ; কাঠও খুব শক্ত ছিল। এজন্যে এখানকার লোকেরা তাদের ঘর-দোর কাঠেই তৈরি করত। এখন কাঠ তেমন সুলভ নয় বলে বাড়ী ইটেরও তৈরী হচ্চে। এখানে বাড়ী ভাড়া তেমন শস্তা নয়। কল্‌কাতা প্রভৃতি সহরে একটা বাড়াতে যেমন পাঁচ-সাতটা পরিবার একত্রে থাকে, এখানেও সেই রকম দেখলুম। এখানকার বাড়ীর ছাদ সমতল নয়। খাপ্‌রার বা খড়ের ছাউনি-করা ঘরের চাল যে-রকম হ'য়ে থাকে, এখানকার ঘরের চালও সেই রকম মাটি বা টিন দিয়ে ঢাকা। এ রকম করার উদ্দেশ্য এই যে বরফ পড়্‌লে তা পিছলে নীচে পড়ে যায়।

অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন যাত্রীরা (১) হাউস বোটে থাক্‌তে পারেন। এক একটা হাউস বোট সুন্দর সাজানো,—একটা ড্রয়িং রুম, দু-তিনটে শোবার ঘর ও একটা খাবার ঘর এবং দু'টো নাইবার ঘর আছে। সব ঘরগুলিই বেশ ঝরঝরে। দরজা জানালাগুলি পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। ঘরের আসবাবপত্রগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর তৃপ্তিদায়ক। এই রকম এক-একখানি হাউস-বোটের ভাড়া মাসে ৪০ ৫০ টাকা। আর একরকম হাউস-বোট পাওয়া যায় ; তার নাম (২) ডুংগা হাউস বোট ; এর ছাদ কাঠের তৈরি।

এই নৌকায় বস্‌বার জন্য খোলা ছাদ নাই। এর ভাড়া প্রায় ২৫। ৩০ টাকা। আর এক রকম নৌকা আছে—তার নাম (৩) ডুংগা। এ নৌকাও হাউস বোটের মত, কিন্তু এর ছাদ চাটাইয়ের তৈরি। এতে কাঠের দেওয়াল নাই। নৌকার চারপাশে চাটাই ঝোলানো। কোনো-কোনোটাতে এক-একটি বেশ সাজানো কামরা আছে। এর ভাড়া মাসিক ১০। ১৫ টাকা। এ ছাড়া (৪)কুকিং বোট(৫), শিকারা বৃহৎ ও দরাও (৬)নামে আরো তিনরকমের বোট ভাড়া পাওয়া যায়। যাঁরা হাউস-বোটে থাকেন, তাঁদের রান্নার জন্যে এই কুকিং বোটের বড় দরকার হয়। শিকারা বোট সাধারণতঃ দু' ঘণ্টা নদীতে বেড়াবার প্রয়োজনে আসে। বৃহৎ নৌকায় লোকে মাল আসবাব-পত্র বোঝাই করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া-আসা করে।

এখানে এ কথাও বলা দরকার যে যাঁরা হাউস বোটে থাক্‌তে চান তাঁদের কুকিং বোট ও একটা শিকারা অবশ্যই

ভাড়া করতে হবে। কেননা হাউস-বোটে রান্নার কোন বন্দোবস্তই নাই। হাউস-বোট অপেক্ষাকৃত ভারী। এজন্য কোন জায়গায় যেতে হলে শিকারাই বেশী কাজ দেয়।

কাশ্মীরের অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানই প্রধান। সেকালে কাশ্মীর যখন হিন্দু রাজাদের অধিকারে ছিল, তখন কাশ্মীরে হিন্দু ভিন্ন অপর অধিবাসী ছিল না। কালের পরিবর্ত্তনে যখন কাশ্মীর থেকে হিন্দু রাজত্বের অবসান হয় এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যখন মুসলমানের খুব দীপ্ত তেজ, সেই সময় মুসলমানেরা জোর ক'রে অনেক হিন্দুকে মুসলমান করেছিলেন। বাদশাহ সিকন্দর বুতশিকনের সময়ে এই ধর্ম্ম প্রচার কাজটা খুব খর বেগেই চলেছিল। তিনি ধর্ম্মপ্রচারের

ডল হ্রদের প্রবেশ পথ

অজুহাতে অত্যাচার ও পীড়নের কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নি। ফলে অনেক হিন্দু মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং হিন্দুদের অনেক বড় বড় বাড়ী বাদশাহের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এইরকম প্রবাদ আছে যে, বাদশাহ বুতশিকনের অত্যাচারে কাশ্মীরের অধিকাংশ হিন্দুই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল—মাত্র ১১টি পরিবার কোন রকমে আত্মরক্ষা করে, নিজেদের ধর্ম্ম বজায় রাখ্‌তে পেরেছিল। কাশ্মীরের বর্ত্তমান হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই সেই এগারোটি পরিবারের বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় দেন। মুসলমান ধর্ম্মপ্রচার কাশ্মীরে যেরূপ জবরদস্তির সঙ্গে চলেছিল, বোধ হয়, এমন ভাবে আর কোথাও চলেনি। এর কারণ, এখানকার হিন্দুদের সাহায্য করবার জন্য এখানে কেউ ছিল না; তার পর ভারতবর্ষ থেকে এই দেশ অনেক দূরে এবং রাস্তা-ঘাটও তেমন ভাল ছিল না যে অন্য কোন পরাক্রান্ত রাজা এসে যে এদের সাহায্য করবেন, তা পারেন নি। সহর ছেড়ে কোনো গ্রামে গেলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—অধিবাসীদের মধ্যে প্রায়ই সব মুসলমান। সেখানকার জমিদার, চাষা, ধোপা, মুচি, গোয়ালা সব মুসলমান। বেশী বলব কি, যারা প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্যে জল তোলে, তারাও মুসলমান। আশ্চর্য্য এই যে, কাশ্মীরের অধিবাসীরা মুসলমান ভিস্তির মশকের জল অস্পৃশ্য ও অব্যবহার্য্য বলে মনে করে না। কিন্তু মুসলমানের ঘরের দই তারা খায় না। এখানে সিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের মুসলমান বাস করে। কিন্তু তাদের মধ্যে তেমন ভালবাসা নাই।

হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য প্রধান। ক্ষত্রিয়কে এখানে 'বোহরে' বলে।

পণ্ডিত শব্দটা সাধারণ হিন্দুদের সম্বন্ধে প্রয়োগ কর

যায়। হিন্দুরা মুসলমানদের অপেক্ষা একটু আচার-বিচার মেনে চলে; তা ছাড়া মুসলমানদের চেয়ে তারা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হিন্দু পুরুষ সাধারণতঃ ফিরন্—হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা একরকম জামা—পরে। তার আস্তীন চওড়া আর ঐ জামার ঘেরও খুব বেশী। শৌচ-কার্য্য বা ভোজনের সময় তারা সেই একই জামা ব্যবহার করে থাকে। এদের শুচি-অশুচি-জ্ঞানটা আমাদের বাংলা দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। প্রায় সব হিন্দু 'পণ্ডিত' পোষাক ধারণ করে। কিন্তু ইংরাজী সভ্যতার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ইহার ধীরে

ঝিলাম নদীর উপর দড়ির পুল

ধীরে লোপ পেতে আরম্ভ হয়েচে। এখানকার বেশির ভাগ হিন্দুই শৈব। এখানে হিন্দু মুসলমান ছাড়া শিখও আছে। মহারাজ গুলাব সিংহের সময় তাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাঞ্জাব থেকে এসে ছিলেন। সেই থেকে তাঁরা পাঞ্জাবেই চাষ-বাস করচেন। এঁদের কেউ কেউ বা চাক্‌রিও করেন। পুরুষদের চালচলন বেশ-ভূষা সবই শিখেদের মত। কেবল মেয়েদের পোষাক অনেকটা কাশ্মীরী মেয়েদের অনুরূপ। শিখ ছাড়া কাশ্মীরে বৌদ্ধ ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকও কোন কোন জায়গায় বাস করুচে।

কাশ্মীরের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোকে অতিথি-সৎকার করা বড়ই পুণ্যজনক বলে মনে করে থাকে। কাশ্মীরে চায়ের বড় আদর। প্রায় সকল বাড়ীতেই পিতলের তৈরি কলাই করা এক একটা চা-দানি আছে। তাতে আগুন ও জল দেবার দুটো জায়গা আছে। বাড়ীতে কোন অতিথি এলেই ঐ পাত্রে আগুন ও জল দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই চা তৈরি করে' দেয়। কাশ্মীরীরা বড় অতিথি-প্রিয়। একবার তাদের সঙ্গে পরিচয় হ'লে তারা সে পরিচয় কিছুতেই নষ্ট হ'তে দেয় না। বিদেশী লোকের সঙ্গে কাশ্মীরীরা বেশ সদ্ব্যবহার করে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে এদের তেমন সদ্ভাব আছে বলে মনে হয় না। কালধর্ম্মে যদিও এই দোষটা প্রত্যেক জাতের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে, তবু কাশ্মীরীদের মধ্যে এটা যত বেশি অন্য কোথাও ততটা দেখেছি বলে মনে হয় না। কাশ্মীরীরা বেশ নম্র ও ভদ্র। তবে বাজারে যারা দোকান-

দাবী করে তারা যে কি রকম মারাত্মক জাত, তা বলে' শেষ করা যায় না। চার আনার জিনিষটার দাম তারা দু'টাকা বল্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না!

কাশ্মীরীদের পোষাক প্রায় এক রকম ও সাদা কাপড়ের। ভদ্র কাশ্মীরীদের মাথায় একরকম টুপি ও গায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা একরকম জামা থাকে। সাবেক ধাঁচের কাশ্মীরী পুরুষরা মাথায় পাগড়ী বাঁধে। স্ত্রীলোকদের পোষাক বেশ সাদা-সিধে। তারা মাথায় খঞ্জনীর মত গোল এক রকম টুপী পরে; ঐ টুপীর উপর একটা চাদর ঝুলিয়ে দেয়। সেই চাদরটা কোমর পর্য্যন্ত ঝুল্‌তে থাকে। কেউ কেউ বা চাদরের বদলে বড় বড় রুমাল ব্যবহার করে। বাড়ীতে কোনো উৎসব হ'লে তারা সাধারণ চাদরের পরিবর্ত্তে রেশমী বেলদার চাদর বা রুমাল টুপীর উপরে ঝুলিয়ে দেয়। মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পোষাক হিন্দুদের পোষাকের মত। তবে মুসলমান পুরুষদের ফিরনের (লম্বা জামার) হাত চুড়িদার পাঞ্জাবী জামার মত। কাশ্মীরী হিন্দু রমণীরা কোমরে একটা চাদর বাঁধে—মুসলমান স্ত্রীলোকদের মধ্যে কোমরে চাদর বাঁধার রেওয়াজ নেই। সাধারণতঃ মুসলমান স্ত্রীলোকদের টুপীর রঙ্‌ লাল। হিন্দু স্ত্রীলোকদের টুপীর রঙ্‌ সাদা। হিন্দু কাশ্মীরী রমণীরা কানে ধুর বলে এক রকম গহনা পরে—কিন্তু মুসলমান স্ত্রীলোকদের মধ্যে তার প্রচলন নেই; তার বদলে, তারা প্রত্যেক কানে ১০। ১২ টা করে ছোট ছোট এক রকম মাকড়ি একটা বড় মাকড়িতে পরিয়ে পরে থাকে। মুসলমান রমণীরা কখনো কখনো তাদের ফিরনের নীচে আর একটা সুথ্‌না (সায়ার মত) পরে।

শ্রীনগর

এখানকার হিন্দু ও মুসলমান সকলেই মাংস খায়। বাঙ্গালীদের মত এরা মাছও খায়। এরা অতিশয় বুদ্ধিমান ও সুচতুর। কাশ্মীরীরা বেশ ভাল কারীগর। নমুনা দিলে সেই নমুনা-মাফিক জিনিষ কাশ্মীরীরা তৈরী করতে পারে। এমন দেখা যায়, আধুনিক রুচিসঙ্গত অনেক জিনিষ তৈরী করে' তারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে।

কাশ্মীরীদের পারিবারিক জীবন বেশ সুখকর। এদের চালচলনও খুব সাদাসিধে। প্রত্যেকেরই ঘরে এক

একটা চরকা আছে। এবং কাশ্মীরা রমণী ও পুরুষ উভয়েই চরকায় সুতা কাটতে পারে।

কাশ্মীরের চাল প্রভৃতি কয়েকটা জিনিষ বাইরে অন্যদেশে রপ্তানি করা আইন-অনুসারে নিষিদ্ধ। এজন্যে চাল এখনো বেশ সস্তা; টাকায় ২০।২৫ সের। আটাও টাকায় প্রায় ১৫।১৬ সের পাওয়া যায়। দুধ টাকায় ১৬ সের। কাশ্মীরের জল-বায়ু সাধারণতঃ ভাল, তার উপর খাওয়া-পরার বিশেষ কষ্ট নেই—এবং দেশে নানারকম পুষ্টিকর ফল-মূল খেতে পায় বলে এরা বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ।

কাশ্মীরের মহারাজের মহাল

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য লিখে শেষ করতে পারা যায় না। ভূ-স্বর্গ ত ভূ-স্বর্গই! কাশ্মীরে প্রবেশ করে' যে দিকেই চাও সেই দিকেই দেখ্‌তে পাবে প্রকৃতি দেবী যেন নিজের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার উজাড় করে কাশ্মীরকে সাজিয়ে রেখেছেন। চারিদিকেই তুষারে ঢাকা উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়া! শ্রীনগরের কাছেই 'শঙ্করাচার্য্য' নামে যে একটা পাহাড়ে জায়গা আছে, তার উপরে উঠ্‌লেই কাশ্মীরের যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়—তার বর্ণনায় ভাষা হার মানে। একদিকে নগর সৌধের মনোহর দৃশ্য,—তার পশ্চাতে না জানি কত দূরে তুষারাবৃত পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর সূর্য্য-কিরণের স্বর্ণ শোভা! অন্যদিকে ডল নামক সুপ্রশস্ত হ্রদের সলিল-তরঙ্গ, এবং তার চারিদিকে শস্য ক্ষেত্রের শ্যাম সৌন্দর্য্য দেখে মন আনন্দে নেচে ওঠে। সুসজ্জিত নৌকায় কুসুম-হার পরে গর্ব্বিতা রমণীর মত বিতস্তা কাশ্মীরের বুকের উপর দিয়ে মৃদু গুঞ্জনে নেচে চলেছে—আর তার অপর পাশে সবুজ পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর কাশ্মীরের পার্ব্বত্য-নিবাস, ছোট ছোট বাংলো আর কাশ্মীরের ফুল-ফলের পরিষ্কার বাগান ও উঁচু উঁচু সফেদা ও চিনার গাছের সার দেখে মনে যে কোন্ ভাবের উদয় হয়, তা যদি কবি হতুম তবে হয়ত বা তার কতক বোঝাতে পারতুম।

যে ডল হ্রদের কথা আগে বলেছি, তার দৃশ্য বড় সুন্দর। এই হ্রদের উপর নানা জাতীয় পদ্ম ফুটে

রয়েচে। জ্যোৎস্না রাত্রে একখানি ছোট ডিঙ্গি করে দু-চার জন বন্ধুর সঙ্গে সেই পুষ্পিত কমল-বনের ভিতর দিয়ে ডল হ্রদের উপর বিচরণ করতে পাওয়া—সে এক সৌভাগ্য! সন্ধ্যার সময় যখন জোরে বাতাস বয়, যখন ডলের জলোচ্ছ্বাস তার বক্ষোবিহারী নৌকার পাশে আছাড় খেয়ে খেয়ে আনন্দ জানাতে থাকে, তখন মনে যে কি আনন্দের সঞ্চার হয়

অবন্তীপুরের ভগ্ন মন্দির

তা যিনি সে দৃশ্য দেখেছেন, তিনিই অনুমান করতে পারবেন। বলা বাহুল্য, কাশ্মীরে এসে ডল হ্রদের যে শোভা দেখে আত্মহারা হয়েচি, এরূপ আনন্দ আর কোথাও পাই নি। এইখানে ডলের একখানি ছবি দেওয়া হলো। এই ছবি দেখেই দুধের সাধ অনেকে ঘোলে মেটাতে পারবেন।

স্কুলে যখন পড়ি, তখন পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য বস্তুর মধ্যে ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগানের কথা পড়েছিলুম। এখানে এসে সেই রকম এক আশ্চর্য্য ক্ষেত দেখে কতকটা তার সৌন্দর্য্য অনুমান করে নিলুম। দেখলুম, ডল হ্রদের উপরে লোকে চারদিকে চারটে বাঁশ পুঁতে তার উপরে আশে পাশে বাঁশ বিছিয়ে মাচার মত করেচে। তারপর তার উপর ডলের একরকম শেওলা-মাটী দিয়ে বেশ ক্ষেত তৈরি করেচে। ঐ ক্ষেতে নানা রকম তরকারীর চাষ হচ্ছে। হ্রদের উপর এই তরকারীর ক্ষেত দেখে আমার যে কি আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল, তা আর কি বলবো। তার চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে ছিলুম আমার বন্ধু চৌবেজীর কাছ থেকে কাশ্মীরের এই ক্ষেত চুরির কথা শুনে। ক্ষেত চুরি আবার কি? বাস্তবিকই এখানে ক্ষেত চুরি হয়। কি রকম করে? যারা এই রকম ক্ষেত চুরি করে, তারা রাত্রে এক-একটা বড় নৌকা করে সেই ক্ষেতের কাছে এসে চার দিকের বাঁশ কেটে সেই ক্ষেতটা নিয়ে গিয়ে আপনাদের ক্ষেতের উপর সাবধানে বেমালুম বসিয়ে দেয়। যেমন আশ্চর্য্য দেশ, তেমনি আশ্চর্য্য চুরির ভঙ্গী বটে!

নিদারুণ গ্রীষ্মের সময়ও এখানে জল এত ঠাণ্ডা যে তাতে হাত যেন অসাড় হয়ে যায়। এখানে গরম হাওয়া বইতে আমি দেখি নি। জুলাই আগষ্ট মাস কাশ্মীরে গ্রীষ্মকাল। এ সময়েও হাওয়া এবং জল দুই-ই বেশ ঠাণ্ডা থাকে। এখানে তরি-তরকারীও প্রচুর উৎপন্ন হয়। মাইল-মাইল লম্বা-চওড়া তরকারীর ক্ষেত যেন সবুজ মখমলের চাদর ধরণীর বুকে বিছানো রয়েচে। সন্ধ্যার সময় ঐ তরকারীর ক্ষেতের উপর দিয়ে যখন বেড়াতে যেতুম, তখন নানা রকম ফুলের বিচিত্র গন্ধে আকুল-করা ব্যাকুল বায়ুর স্পর্শে যে

পুলক-শিহরণ অনুভব কর্ত্তুম, তা আজো আমার মনে জেগে রয়েচে।

শ্বাসযন্ত্রের বিকার ও পেটের অসুখ, এই দু রকম রোগ কাশ্মীরে কিছু দিন থাক্‌লেই আরাম হয়। জল-বায়ু এর মুখ্য কারণ বটে, তা ছাড়া, কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সেখানকার নানা রকম সুস্বাদু ফল-মূলও যে এর আনুসঙ্গিক কারণ, তাতে সন্দেহ নেই। প্রকৃতির বৈচিত্র্যে এখানে মানুষের মন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, তার উপর খাদ্য পানীয় ও ফল-মূলাদির প্রাচুর্য্যে এখানে স্বাস্থ্য ভাল না থেকে পারে না। বৎসরের প্রথম ভাগে এখানে ষ্ট্রবেরি ও চেরি এই দুটো ফলের খুব আমদানী হয়। তার পরে ক্রমে ক্রমে খুবানি, আঁড়ু, আলুবুখারা, নাশপাতি, আপেল, আঙুর পাওয়া যায়। মার্চ্চ থেকে নভেম্বর এই ক' মাস কাশ্মীর প্রবাসের উপযুক্ত সময়। কিন্তু যাঁরা এত দীর্ঘ কাল এখানে না থাক্‌তে পারবেন, তাঁদের সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর এই দু মাস অবশ্যই থাকা উচিত। কারণ বছরের মধ্যে এই দু মাসই এখানে ভারী তৃপ্তিদায়ক, মনোহর। কাশ্মীরে যথেষ্ট তরকারী পাওয়া যায়। মে মাসে আলু পেঁয়াজ ও কলমী শাক ভিন্ন অপর তরকারী কিছু পাওয়া যায় না। তার পর ক্রমে ক্রমে লাউ, নানা-রকম শাক-সবজী, বেগুন, করলা, কপি, মূলা প্রভৃতির আমদানী হয়। তরমুজ খরমুজ যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। আমাদের বাংলা দেশের মত এখানে আম জাম কাঁঠাল কলা নারিকেল লেবু প্রভৃতি পাওয়া যায় না।

মার্ত্তণ্ড মন্দির

এখানে গোলাপফুল প্রচুর। এটা গোলাপের দেশ, এ কথা বললে একটুও অত্যুক্তি হয় না। নানা রকমের গোলাপগাছ এখানে বাড়ীর দেওয়ালে বা ছাদে গজিয়ে চলেছে বেড়ে চলেছে, দেখা যায়। আমাদের দেশের ঘাসের মত এখানে গোলাপ বিনা-আবাদে জন্মায়।

দেখবার জিনিষ এখানে বিস্তর, সবচেয়ে মনোরম দৃশ্য শঙ্করাচার্য্য অথবা তখ্‌ত সুলেমান। শ্রীনগরে সবচেয়ে মনোহর শঙ্করাচার্য্য মন্দির। দূরে সুনীল পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর এই মন্দিরের শোভা যে কত অনুপম তা লিখে জানাতে পারিনে। এই মন্দির শ্রীনগর হতে প্রায় দু মাইল দূরে। পর্ব্বত পাদমূল হতে মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ১০০০ একহাজার ফুট। এইরূপ প্রবাদ আছে যে খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫৬৪ অব্দে সন্দিমান নামক ব্যক্তি এই মন্দির তৈরি করেন। এর পর গোপাদিত্য খৃষ্টপূর্ব্ব ৪২৪ অব্দে এবং ললিতাদিত্য ৭৩৪ অব্দে এই মন্দিরের মেরামত করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, মহম্মদ গজনবী এই মন্দিরে হজরত মহম্মদের

উপাসনা করেছিলেন বলে' সিকন্দর বুতশিকন এই মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন নি। পরে ঐ মন্দির যখন আবার ভগ্ন দশায় উপস্থিত হয়, তখন জৈনুল আব্দীন নামক এক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান এই মন্দিরের ছাদ মেরামত করিয়ে দেন। এখানকার লোকে বলে, বিতস্তার কিনারা থেকে এই মন্দির পর্য্যন্ত পূর্ব্বে পাথরের সিঁড়ি ছিল। নূরজাহান শ্রীনগরে যে মসজিদ তৈরি করিয়ে ছিলেন, ঐ সিঁড়ির পাথর দিয়েই তা তৈরি হয়েছিল। এখন ঐ মন্দির দেখলে বেশী-দিনের পুরানো বলে মনে হয় না। এই মন্দিরে এখন এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

যাঁরা লাহোরের শালিমার বাগ দেখেছেন, তাঁরা শ্রীনগরের এই শালিমার বাগ যে কি বিচিত্র সুন্দর উদ্যান তা কতক বুঝতে পারবেন। এই বাগান দুই অংশে বিভক্ত; প্রথম অংশকে ফরহত বখ্শ, দ্বিতীয় অংশকে জবব্শখবলে। প্রথমঅংশ জাহাঙ্গীর বাদশা ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়াংশ সম্রাট শাহজাহানের আদেশে কাশ্মীরের মোগল শাসনকর্ত্তা জাফর খাঁ ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে তৈরি করান। এই বাগানটি নানারকম ফুলের কেয়ারি দিয়ে সাজানো। মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য তৃণময় ক্ষেত্র বড় সুন্দর। একটী ছোট পাহাড় থেকে একটী ক্ষুদ্র জলধারা এই বাগানকে শ্যামায়িত করুচে। বাগানে আস্‌বার পথে এই জলধারাকে কয়েকটি জল-প্রপাত রচনা করে আস্‌তে হয়েচে। অবশ্য এই জলপ্রপাতের রচনায় মানুষেরই কারিগারর! এই বাগানে অনেকগুলি ফোয়ারা আছে। প্রতি রাববারে এই ফোয়ারাগুলি খুলে দেওয়া হয়। যখন ঐ সব ফোয়ারা হ'তে জল বেরতে থাকে এবং ঐ জলধারা বিচিত্র আকারে সবুজ তৃণ ক্ষেত্রে পড়ে সে দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর! এই স্থানটী শ্রীনগর থেকে ১৩।১৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

ডল হ্রদের কাছে শালিমার বাগের পশ্চিমাংশে নসীম বাগ। সম্রাট শাহজাহান ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে এই বাগান তৈরি করিয়েছিলেন। এই বাগানে চিনার গাছের শ্রেণী দেখে দর্শক আত্মহারা হ'য়ে যায়। এই বাগান থেকে ডল হ্রদের মনোহর শোভা বড়ই চিত্তাকর্ষক। এই বাগানের প্রাচীরের সিঁড়ির ভগ্ন অংশ এখন বহু জায়গায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

কাশ্মীরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং সুন্দর বাগান নিশাত বাগ। এই বাগানটিও ডলের তীরে—সহর থেকে প্রায় ৭।৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ডল হ্রদ থেকে কয়েকটি সিঁড়ির উপর দিয়ে এই বাগানে ঢুক্‌তে হয়। সিঁড়িগুলি বেশ চওড়া এবং দুই পাশ ফুলের গামলা দিয়ে সাজানো। মাঝে মাঝে বাগানের জল বেরবার জন্য জলনালা আছে। এই নালা গুলি কৃত্রিম জলপ্রপাত রচনা করে ডলের জলের সঙ্গে মিশেতো শালামার বাগের মত এখানকার উৎসগুলি প্রতি রবিবারে খুলে দেওয়া হয়। সেই উৎসের জলধারা দেখবার জন্য সে দিন দর্শকের খুব ভিড় জমে যায়। বাগানের নীচেই ডল হ্রদ আর তার পারে সুউচ্চ পাহাড়। জাহাঙ্গীর বাদশাহের শ্যালক, নূরজাহানের ভাই আসফজাহ এই বাগানটি ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে তৈরি করেন। এই বাগানের সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প আছে। সম্রাট শাহ্‌জাহান কোনো সময়ে এই বাগানটি দেখে খুব ক্রুদ্ধ হন। এজন্যে তিনি এই বাগানে যেখান থেকে জল আস্‌ত সেই জলধারার মুখ বুজিয়ে দেবার আজ্ঞা দিলেন। বাদসাহের হুকুম—তখনি সেই জলধারার মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল। বাগানে আর জল আসে না। গাছ শুকিয়ে গেল। বাগানের শ্যামল শোভা আর নাই। এমন সময়—একদিন আশফ জাহ সেই বাগানে এসে বাগানের এই রকম দুর্দ্দশা দেখে বড়ই দুঃখিত হ'লেন। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে বাদশাহের হুকুম অমান্য করে সেই জলধারার মুখ খুলিয়ে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বাগানের শ্যাম শোভা আবার ফিরে এল। সম্রাট শাহ্‌জাহান এজন্য যদিও প্রথমে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তথাপি আসফজার কাতর প্রার্থনায় শেষে তিনি তাঁর অপরাধ মার্জ্জনা করেছিলেন। আর একটি দর্শনীয় স্থান চশ্‌মাসাহী। এটিও ডলের কিনারায় এবং নিশাত বাগের প্রায় ২।৩ মাইল দূরে অবস্থিত। সহর থেকে এর ব্যবধান প্রায় ৬ মাইল। এখানকার জল খুব হজ্‌মী! জল ঠাণ্ডা হাল্‌কা আরো সুস্বাদু। সম্রাট শাহজাহান এর কাছেই আর একটি বাগান তৈরি করেছিলেন ১৬৩২ খৃঃ। কিন্তু তার অবস্থা এখন বড় খারাপ। এখান-কার জল খুব হজমি বলে অনেক যাত্রী জল খাবার

জন্যে এইখানে এসে থাকে। চশ্‌মাসাহীর এক মাইল দূরে পরী-মহল। এক খুব উঁচু পাহাড়ের এক অংশে এই মহল তৈরি। এই প্রাসাদ পাঁচতলা। লোকে বলে, ফলিত জ্যোতিষ শেখাবার জন্য দারা শিকোহ এই প্রাসাদ তাঁর গুরু মুল্লা শাহ থাকবেন বলে তৈরি করিয়েছিলেন। এই প্রাসাদ সম্বন্ধে কাশ্মীরে নানা রকম কিংবদন্তী চলে আস্‌চে। তার মধ্যে একটি এই যে, কেউ কেউ বলে পরীদের বসবাসের জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর এই মহল তৈরি করিয়েছিলেন। এই মহল এমন কৌশলে তৈরি যে, যে রমণী একবার এই মহলে প্রবেশ করতেন, তিনি আর সেখান থেকে কিছুতেই বেরুতে পারতেন না।

নিসাৎ বাগ

আর একটি দর্শনীয় স্থানের নাম পাণ্ডুরেথন। একটি ছোট মন্দির। শ্রীনগর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। অনন্তনাগ যাবার পথে এই মন্দির তৈরি। এখন এর অবস্থা বড় খারাপ। শ্রীযুক্ত আনন্দ কৌল'তাঁর "Geography of Kashmir and Jammu" নামক বইয়ে লিখেছেন, রাজা পার্থের মন্ত্রী মেরু ৯ ৬—৯৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই মন্দির তৈরি করেছিলেন। এই মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপনা করা হয়ে ছিল। এই শিবের নাম ছিল গোবর্দ্ধন স্বামী। এখানকার লোকে বলে, এক সময়ে আগুন লেগে ঐ মন্দির ও শিবলিঙ্গ পুড়ে যায়। এবং সেই দগ্ধ স্তূপের মধ্যে পুনরায় এ মন্দির তৈরি হয়। তখন থেকে সেই মন্দিরের নাম হয় পাণ্ডবস্থান। এই পাণ্ডবস্থানই পরে পাণ্ডুরেথন নামে প্রচলিত হয়। এখন এখানে কোনো শিবলিঙ্গ নাই।

এ পর্য্যন্ত শ্রীনগরের আশ-পাশের দর্শনীয় স্থানের কথাই বললুম। এখন আমি শ্রীনগর থেকে জম্মু যাবার পথের ধারে অর্থাৎ বিতস্তা নদীর উৎপত্তি-স্থানের অভিমুখে যে যে দর্শনীয় স্থান আছে তার কথাই বলব।

প্রথমেই একটি দর্শনীয় স্থান পুণ্ড্রাথন। এর একটু আগে পাঁপুর (পদ্মপুর) গাঁয়ের কাছে 'কেশর' ক্ষেত দেখবে বড় সুন্দর। পাঁপুরে খুব ভাল ঘী পাওয়া যায়। পাঁপুর ছেড়ে একটু গেলেই অবন্তিপুর নামে একটি গাঁ। এই গাঁখানি নদীর ধারে অবস্থিত। এখানে দুটি প্রাচীন মন্দির আছে; এই মন্দিরের গায়ে নানা রকম মূর্ত্তি খোদা আছে। এই সব খোদিত মূর্ত্তি দেখলে প্রাচীন হিন্দুদের কলা-কৌশল এবং ভাস্কর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বড় মন্দিরটি থেকে একটি বিষ্ণু মূর্ত্তি পাওয়া গেছে।

দু'টী মন্দিরই পাথরের তৈরি। এখান থেকে কয়েক মাইল আগে শ্রীনগর থেকে ৩৪ মাইল দূরে অনন্ত নাগ (ইসলামাবাদ) একটি ছোট গাঁ। এখানে অনন্ত নাগ নামে একটি ছোট ঝিল দেখিবার জিনিষ। এই ঝিলে নানা রংবেরঙের মাছ দেখতে পাওয়া যায়। এ সামনে নিভর (লম্বোদর) নামে এক জল প্রবাহ। এই জল-প্রবাহের উৎপত্তি-স্থানের দিকে গেলে একটি সুন্দর জায়গায় পৌঁছনো যায়। সে জায়গাটির নাম পহল গাঁও। শুধু এই জায়গাটি নয়, নিভর জলধারার উপকূল-ভাগের প্রায় সমস্ত অংশটাই শ্যামল, মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর।
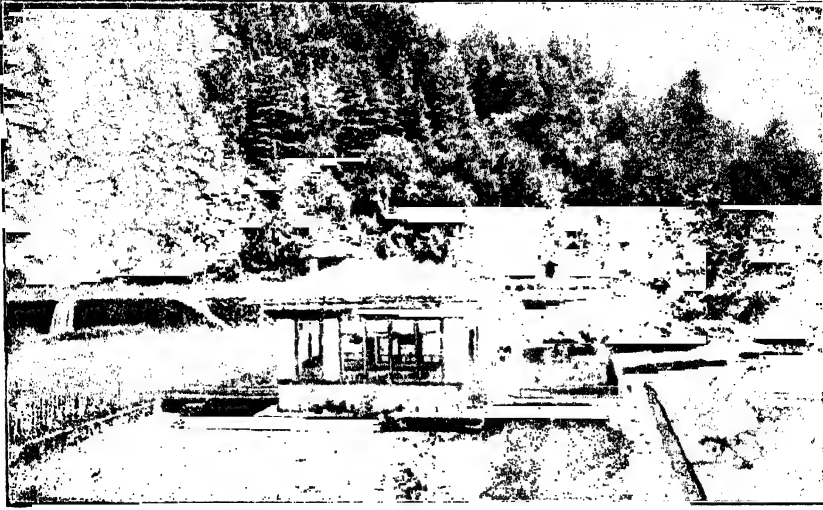
অচ্ছাবল বাগ

মাছ ধরবার হুকুম নেই। কাছেই শিখেদের এক ধরমশালা আছে। এই অনন্ত নাগ থেকে উত্তর পূর্ব্ব পাঁচ মাইল গেলে মার্ত্তণ্ড (মটন) নামে এক তীর্থস্থান আছে। কাশ্মীরীরা এই তীর্থকে আপনাদের গয়া তীর্থ বলে। এখানে তারা পিতৃ-পুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ড দান করে থাকে। একটি ছোট পাহাড়ের পাদমূলে মহারাজ রণবীর সিংহের প্রতিষ্ঠিত এত মন্দির আছে। তার মধ্যে সূর্য্যের মূর্ত্তি রয়েচে। এই জন্যেই ঐ মন্দিরের নাম মার্ত্তণ্ড মন্দির। মন্দিরের পাশেই একটি ছোট ঝিল। অনন্ত নাগের মত এখানে নানা রঙের মাছ দেখা যায়। এখান থেকে আধ মাইল দূরে পর্ব্বত-প্রান্তে দুটি গুহা দেখা যায়। ঐ গুহাদুটির মধ্যে একটি বেশ বড় ও চওড়া, অন্যটি একটু ছোট। বোধ হয় আগে হিন্দু রাজাদের অধিকার-সময়ে এই গুহায় মুনি-ঋষিরা বাস করতেন। এই রকম একটি ছোট গুহার মধ্যে একটি শিব-মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের কাশ্মীরে যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁরা এই সব জায়গায় কিছু দিন পরে বাস করবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ করতে পারেন না। এই জায়গার জলবায়ু খুব ভালো করা যায় না। এর আগে উত্তর দিক পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বর। এইখান হ'তেই অমরনাথ তীর্থ যাবার রাস্তা বেরিয়েছে।

অনন্ত নাগ হ'তে দক্ষিণ পশ্চিমে ৬ মাইল দূরে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ স্থান 'অচ্ছাবল'। এখানকার জল বায়ু খুব সুন্দর। এখানকার পর্ব্বত গাত্রে মাঝে মাঝে হরিৎবর্ণ শস্য ক্ষেত্র দেখা যায়। পর্ব্বত-পাদমূলে দুই তিনটী ঝরণা আছে। ঐ ঝরণার ধারে সুন্দর বাগান তৈরি হয়েচে। দিয়াল গাঁও নামক এক পার্ব্বত্য গ্রামের পাশ দিয়ে বুনৃথী নামক এক নদী ছিল—ক্রমেই এই নদী শুকিয়ে যাচ্চে। আগে যে বাগানের কথা বলেছি, সেই বাগানটি ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাহজাহানের কন্যা জাহান্ আরা তৈরি করিয়েছিলেন। বাগানের পাশেই হরিৎবর্ণ তৃণ ক্ষেত্র। অনেক কাশ্মীর-

প্রবাসী এখানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করেন। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। এই কাশ্মীরে অক্ষবল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৯৬ হইতে ৪২৬ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরই নামানুসারে ঐ জায়গার নাম অচ্ছাবল হয়েচে।

অনন্ত নাগ থেকে ১৬ মাইল দূরে বেরি নাগ। এইটিই ঝিলম্ নদীর উৎপত্তি স্থান। দুর্গম পর্ব্বত-শ্রেণীর একাংশে একটি উৎস আছে। ঐ উৎসের জলধারা একটি অষ্টকোণ জলাশয়ে জমচে। ঐ জলাশয় হ'তে নিঃসৃত জলধারা বিতস্তা নামে পরিচিত। ঐ জলাশয় ১০ ফুট গভীর। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাহজাহান এই জলাশয় তৈরি করিয়েছিলেন। পরে ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে এক কৃত্রিম উৎস ও তার চারিপাশে একটি সুন্দর বাগান তৈরি হয়। এই বাগানটি উচ্চ পর্ব্বত-গাত্রে অবস্থিত বলে এখানে ঠাণ্ডা খুব বেশী।

অনন্ত নাগ হ'তে ৬ মাইল দূরে কোকর নাগ। বড় সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর জায়গা।

উপরে যে সব জায়গার কথা বলা হ'ল সে সব স্থানই অনন্ত নাগের আশে পাশে এবং বিতস্তা নদীর উৎপত্তি-স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত। এবার শ্রীনগরে যাওয়া যাক। প্রথমেই দোখ, সিন্ধুধারা। বিতস্তা এবং সিন্ধুর সঙ্গম হ'য়েচে। এই জন্য কাশ্মীরীরা একে প্রয়াগ বলে। এই জায়গার নাম শাদীপুর। এখানে কুম্ভ মেলা হয়। সঙ্গম স্থল হ'তে সিন্ধু ধারায় নৌকা চলাচল করে। এই জল-স্রোতের জল বরফের মত শীতল দুধের মত শাদা এবং বড়ই পাচক। এই ধারা বড় প্রখর। জল-স্রোতের অভিমুখে পাঁচ মাইল গেলেই কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ স্থান গাঁধরমল। বড় সুন্দর-শোভন স্থান। এখানকার জলবায়ু খুব ভাল এখান থেকে ৬ মাইল দূরে পর্ব্বতের ঢালুতে 'রয়পুর' নামে একটি জায়গা আছে। এর মত সুন্দর জায়গা আমি কাশ্মীরে খুব কমই দেখেচি। এখানে অনেকগুলি আঙুরের ক্ষেত ও ফুলের বাগান আছে। চিনার ও বেতস কুঞ্জের ছায়া-শীতল প্রান্তরে সে প্রকৃতির মনোরম ছবি অপূর্ব্ব, অব্যক্ত।

গাঁধরমল থেকে এক মাইল দূরে খীর ভবানী, এখানে যাবার অন্য কোনো উপায় নেই, হাঁটা রাস্তা। এখানে উৎস আছে। এই উৎসব জলধারা একটি কুণ্ডে এসে পড়ে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কুণ্ডের জলের রঙ্ দিনের মধ্যে অনেকবার বদ্‌লে যাচ্ছে। খীর ভবানী হ'তে ৩ মাইল দূরে মানসবল নামে ঝিল। এই ঝিল সুগভীর ও প্রশস্ত। বেড়াবার জন্য এই ঝিলের বক্ষে শত শত নৌকা ভাসমান দেখা যায়। শ্রীনগরের দিকে হরিমুখ-গঙ্গা বিশেষ দর্শনীয় স্থান।

শ্রীনগর হ'তে রাওলপিণ্ডি যাবার রাস্তায় ১০ মাইল তফাতে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ স্থান গুলমার্গ। এখানে অনেক ইংরেজ স্থায়িভাবে বসবাস করে। একে ইংরেজদের এক প্রসিদ্ধ উপনিবেশ বল্‌লেও চলে। পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত; এখানকার জল-বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর। এত সুন্দর এই জায়গা যে, কাশ্মীর-যাত্রী যদি এই জায়গা না দেখেন, তবে তাঁর কাশ্মীর-যাত্রা অসম্পূর্ণ হবে, এ কথা জোর করে' বলা যেতে পারে।

কাশ্মীরের মধ্যে আর একটি দর্শনীয় স্থান উলার ঝিল। ভারতবর্ষের মধ্যে এইটিই সর্ব্বপ্রধান ঝিল। সন্ধ্যার সময়ে বাতাসের স্পর্শে এতে যখন খুব ঢেউ ওঠে, তখন দেখ্‌তে বড় সুন্দর দেখায়। এই ঝিল প্রায় ১২ মাইল দীর্ঘ।

উপসংহারে আরো কয়েকটি বিষয় বলা দরকার। যাঁরা কাশ্মীরে বেড়াবার জন্যে আস্‌বেন, এই কথাগুলি তাঁদের ভাল করে জেনে রাখা উচিত। কাশ্মীর-যাত্রীদের পক্ষে নৌকা-চালক মাঝির একান্ত প্রয়োজন। এজন্যে প্রথমেই তাঁদের কথা কিছু বলে' রাখি। এখানকার মাঝিরা বড় চালাক। এরা পাক দিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে বড়ই চতুর। কাশ্মীরের বিখ্যাত জিনিষ যারা বিক্রী করে, মাঝিরা তাদের নিয়ে আসে এবং যাত্রীদের কাছে এক টাকার জিনিসের দাম চার টাকা বলে সুপারিস করে। পরে এদের উভয়ের মধ্যে লভ্যাংশের বাটোয়ারা হয়। এরা বড়ই শঠ ও ধূর্ত্ত। কোনো জিনিষ কিন্‌তে দিলে এরা তার মধ্যে থেকে কিছু আদায় করবেই। কাঠ ও খাবার জিনিষ চুরি করতে এদের মত চালাক আর কোথাও দেখা যায় না।

কাশ্মীরে কোনো জিনিষ কিন্‌তে হ'লে একজন পরিচিত লোক সঙ্গে না থাক্‌লে বড় বিপদ। কাশ্মীরী দোকানদার ভারী দাগাবাজ। তারা একটাকার জিনিষের দাম চার টাকা বল্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।

গোঁড়া হিন্দু যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে চাকর-বাকর না থাক্‌লে তাঁদের বিশেষ কষ্ট পেতে হয়। কেন না, কাশ্মীরের অধিবাসী বেশীর ভাগই মুসলমান। আগেই বলেছি কাশ্মীরের লোকেরা মুসলমান ভিস্তিওয়ালার মশকের জল ব্যবহার করে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে এরূপ ব্যবহারের প্রচলন নাই। সুতরাং মুসলমানের জল-ব্যবহারে অভ্যস্ত হিন্দুদের এখানে এজন্য বড় অসুবিধা হয়।

কাশ্মীরে মশা ও বিচ্ছুর বড় প্রাদুর্ভাব। সুতরাং প্রত্যেক কাশ্মীর-যাত্রীর সঙ্গে একটা মশারি থাকা বিশেষ দরকার। যাঁরা ফোটোগ্রাফ তুল্‌তে জানেন, তাঁদের ক্যামেরা নিয়ে আসা উচিত। কেননা, এমনি দৃশ্য-বৈচিত্র্য এখানে, যে তা দেখে ফটোগ্রাফারের হাত নিশ্‌পিশ্‌ করবে। আমার সঙ্গে ক্যামেরা ছিল না কাজেই সে আক্ষেপ আমার কাশ্মীর ভ্রমণের আনন্দটুকুকে অসম্পূর্ণ করে রেখেচে।

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রূপা ও রূপ

টাকার পরে টাকা জমাস্ তোরা,
চুমার পরে আমরা জমাই চুমা ;
জাগব নীরব চাঁদ্‌নী-নিশায় মোরা,
জান্‌লা-দুয়ার বন্ধ কোরে ঘুমা !

রূপায় তোদের মগ্ন মজুক খুব,
মোদের মরম মজ্‌ল মোহন রূপে ;
মুক্তা-আশায় সমুদ্রে দে ডুব,
আমরা ডুবি প্রেমের অতল কূপে !

জমাস্ তোরা আধ্‌লি আনি সিকি,
আমরা প্রিয়ার হাসির টুকরোগুলি ;
পুঁথির বুলি জমাস্ নাড়ি টিকি,
আমরা প্রিয়ার অস্ফুট রসের বুলি !

তোরা বুঝিস্ মোহর মাণিক সোনা,
ঘর বাড়ী সব তাতেই হোল ছাওয়া ;
মোদের বুকেই হসন্-চাঁদের কোনা,
আঁখির পরে আঁখির নীরব চাওয়া !

শুনিস্ তোরা টাকার ঝনন্ ধ্বনি,
তৃপ্তিতে তোর উথ্‌লে যে বুক মাতে ;
চুড়ির মৃদুল রুনুন্-ঝুনু শুনি,
বুকের পাশে বাহু যখন বাঁধে !

মোহর টাকায় মিটিয়ে দে তোর পাওয়া,
খাস্ কেবলি শুক্‌তো মাছের ঝোল ;
আমরা খাব চাঁদের জোছন্, হাওয়া,
চুমায় চুমায় ভরিয়ে প্রিয়ার টোল !

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নারীর অবস্থা

পুরুষ বড় গলায় বলিয়াছেন যে "পুরুষের সম-অধিকারিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহাদের লীলা-সামগ্রী নহ।" দেখা যাক, এ কথার মর্য্যাদা পুরুষ কতদূর রক্ষা করিয়াছেন।

শাস্ত্রকার পুরুষ, নারী নহে—তাই শাস্ত্র কহিতেছে যে নারীর আর ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই গতি নাই, চিন্তা নাই, সব সার্থকতা তাহার ফুটিয়া উঠিবে পুরুষের সেবায়। তাই বঙ্কিমবাবু দেখাইলেন যে প্রফুল্ল এত শিক্ষার পর ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভের পর বুঝিল, এ সকল কিছুই তাহাকে উদ্ধার করিবে না; তাই আবার প্রফুল্ল সংসারে ফিরিয়া আসল! ভবানী ঠাকুরের সব শিক্ষাই ব্যর্থ হইল। ভাবিতে বিস্মিত হই যে ভবানী ঠাকুরের ন্যায় সাধকের নিকট জ্ঞানযোগ শিক্ষার পর অন্তরে সম্পূর্ণ ন্যাস সাধন করিয়া সন্ন্যাসিনী প্রফুল্ল কিরূপে আবার সংসারেই ফিরিয়া আসিল! ভগবৎ-বাক্য তো সর্ব্বদাই বলিতেছে, 'কা তব কান্তা, 'কস্তে পুত্রঃ।' মীরাবাই তো পতির চরণ সার করিয়া সংসারে থাকিতে পারেন নাই। পতিই যদি স্বয়ং ঈশ্বর তবে তো পতি ত্যাগ করিয়া অন্য ঈশ্বরকে অন্বেষণ করা মীরার পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত হয় নাই। উত্তর পাইলাম, মীরাবাই ভগবানের দয়ায় তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল, সত্যই তাহার জ্ঞান হইয়াছিল; আর সে ঈশ্বরেরই সৃজিত নারী; কিন্তু প্রফুল্ল সংসারী ও ভোগী, একজন পুরুষের আশ্রিতা। মীরাবাইয়ের আসন মানুষের অধিকার ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর প্রফুল্লর আসন পুরুষের স্বার্থপরতার উপর স্থাপিত। অনাদি কাল হইতে পুরুষ আপনার স্বার্থই বুঝিয়া চলিতেছে; বঙ্কিমবাবু নূতন কিছু দেখান নাই, তিনি পূর্ব্বতনেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কেননা তাহা না হইলে পুরুষের সুখ ও সুবিধা হয় না। নারী যদি আপনার অধিকার বুঝিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে, সে যদি মনুষ্যত্বের অধিকারে সত্য বুঝিতে পারে তবে পুরুষের প্রধানত্ব, দেবত্ব আর থাকে না, তাই নারীর দেবতা পুরুষ। নতুবা পুরুষ কোন্ গুণে নারী অপেক্ষা উচ্চ যে সে নারীর দেবতা? পুরুষও তো নারীর মতই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ মোহেরই বশীভূত। চুরি করিয়া দেবত্ব লইতে লজ্জা হয় না?

চোখে ঠুলি দিয়া সকল পথ বন্ধ করিয়া কেবল একদিক দেখাইয়া দিলে, ঘোড়া সেই পথ ধরিয়াই ছুটিবে, কারণ অন্য দিক সে দেখিতে পায় না। নারীকেও তেমনি সকল পথ বন্ধ করিয়া পুরুষ কেবল একটি মাত্র দিক দেখাইয়া দিয়াছিল, আজ তাহার চোখ হইতে সে ঠুলি খসিয়া পড়িয়াছে, নারী আজ দেখিতে পাইয়াছে যে জগতে চলিবার পথ আরও আছে। ঠুলি-আঁটা চোখে একদিক ধরিয়া চলিলে নারীর মঙ্গল নাই, কারণ জ্ঞানহীন হওয়া মঙ্গলকর নহে। জ্ঞানের জন্যই ভগবান-সৃজিত সকল জীব হইতে মানুষ শ্রেষ্ঠ। সেই জ্ঞান হইতেই নারীকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। যাহাকে দেবতার আসন দিয়া নারী এতদিন একনিষ্ঠ প্রেমে, অটল বিশ্বাসে (অন্ধ ভক্তি কথাটা নাই বলিলাম) পূজা করিয়াছে, যাহার জন্য নারী স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ, প্রাণত্যাগ করিয়াছে, নারীর সেই ইহ-পরলোক, নারীর গতি-মুক্তি, নারীর সুখ-ধর্ম্ম, নারীর পতি পরম গুরু (!) নিকট তাহার কি প্রতি-দান পাইয়াছে! শাস্ত্র হইতে উদ্ভট শ্লোকগুলিতে অবধি নারীর নীচতাই ঘোষিত হইয়াছে। শাস্ত্র-বচন—

"যোষিৎ সর্ব্বা জলোকেব ভূষণাচ্ছাদনা শনৈঃ।
সুভৃত্যাপি কৃতা নিত্যং পুরুষং অপকর্ষতি॥
জলৌকা রক্তমাদত্তে কেবলং সা তপস্বিনী—
ইতরাং তু ধনং বিত্তং মাংসং বীর্য্যং বলং সুখম॥"

উদ্ভট শ্লোক বলেন,

"মাতালে কি না বলে মদের নেশায়,
স্ত্রীলোকে কি না করে বল এ ধরায়!"

নারীর কোন্ কার্য্যের কোন্ প্রমাণে পুরুষের এই মজ্জা-গত অবিশ্বাস ও ঘৃণা?

অবোধ শিশুকে বিদ্যারম্ভের সময় যেরূপ নানা অসম্ভব দ্রব্যের কথা বলিয়া ভুলান হয়, নারীকেও তেমনি পরলোকের স্বর্গের প্রলোভনে ভুলাইয়া ইহলোকের সকল সুখ ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সুখের

আশাতেই মানুষ সকল দুঃখ-কষ্ট সহিয়া থাকে; কিন্তু ইহলোকে নারীর জন্য তো কোন সুখই নাই। তবে কিসের জন্য নারী সকল দুঃখ সহ্য করিবে, তাহাকে তো একটা কিছু দেওয়া চাই। ইহলোকের সুখ তো দুদিনের জন্য; পরলোকের সুখ অনন্তকাল-স্থায়ী, তাই নিঃস্বার্থ ধার্ম্মিক পুরুষ ইহলোক আপনাদের জন্য রাখিয়া পরলোক নারীকে প্রদান করিলেন। কি ত্যাগ! কি মহত্ত্ব! ইহলোকে নারী পুরুষের দ্বারা এবং পুরুষের জন্য যত উৎপীড়িতই হউক, পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ তাহারই! কেবল পত্নী-বিয়োগের পর কেন, পত্নীর সম্মুখেই পুরুষ সহস্র বিবাহ করুক,—বিবাহ তো ভাল কথা! বিবাহ না করিয়াও নারীকে পাপের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাক, তাহাতে পুরুষের কোন পাপ নাই, কেননা সে পুরুষ, —এ পাপের জন্য দায়ী নারীই! ভগবান কি নারী ও পুরুষের জন্য পাপ দুইভাগ করিয়া রাখিয়াছেন? স্কুলে কি এই নীতিশিক্ষা দেওয়া হয় যে মিথ্যা বলা বা চুরি করা প্রভৃতি বালকের পাপ নহে, কিন্তু তাহা বালিকার পক্ষে পাপ? যদি তাহাই না হয়, সামান্য মিথ্যা বা চুরিতে যদি বালক বালিকার সমান অন্যায় হয়, তবে ব্যভিচার—যাহা মানব-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ, তাহাতে কেবল নারী পাপের ভাগী হয় কেন? কেন তাহাতে পুরুষের বেলায় পাপ হয় না? যদিই হয়, তবে সমাজ ও ধর্ম্ম তাহাকে এত উপেক্ষা ও সাধারণ দৃষ্টিতে দেখে কেন? কেন পতিতা নারীর ন্যায় সমাজে পতিত পুরুষের স্বতন্ত্র স্থান নাই? যে পাপে নারী ও পুরুষ তুল্য অপরাধী—কেন তাহার বিষময় ফল কেবল নারীর ভাগ্যেই সমাজ নির্দ্দেশ করিয়াছে? নারীকে যখন পুরুষ শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে দুর্ব্বল মনে করে, তখন শক্তিশালী পুরুষ যে অপরাধে আপনাদের কোন শাস্তিই লইল না, সেই অপরাধেই নারীর জন্য ভীষণ শাস্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিল!

দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার মিথ্যা বা কল্পিত নহে। যে কার্য্যে দেশীয়ের প্রাণদণ্ড হয়, সেই অপরাধেই ইংরাজের কি শাস্তি হয় তাহা না বলিলেও চলে! প্রাচীন কালে যে কার্য্যে অপরের প্রাণদণ্ড হইত, সেই কার্য্যে ব্রাহ্মণের কিছুই হইত না, তখন ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া লোকে গ্রহণ করিত। কিন্তু এখন ভিন্ন-ধর্ম্মীর নিকট ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এক ভাবেই শাসিত হইতেছে বলিয়া আমাদের সেই প্রাচীন বিধি যে কর্ত্তব্য-বিরুদ্ধ ও অনুদার তাহা বুঝিয়াছি। তেমনি নারী ও পুরুষের স্রষ্টার চক্ষেও কি ধর্ম্মে, অধর্ম্মে, সমাজে ও মনুষ্যত্বে উভয়ে একই নহে? তাঁহার নিকট কি মানুষ এইরূপই বিচার হয় না?—তাহাই যখন সত্য, তখন কোন্ অধিকারে নারীর প্রতি পুরুষ এত আধিপত্য খাটাইবে?

মানুষের সর্ব্বপ্রথম কাজ বাঁচিয়া থাকা, এবং সেজন্য আহার করা। পুরুষ মহোদয় নারীকে সেই আহার হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন! নারী তৃপ্তি-পূর্ব্বক আহার করিবে না, ইহাই শাস্ত্রের বিধি! শতবর্ষীয় বৃদ্ধও যথেচ্ছাচার করুক, তাহাতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু বালবিধবার ব্রহ্মচর্য্যই সঙ্গত! কারণ ইহলোকের সুখ, শান্তি, এ সব যে পুরুষের! এই দুঃখময় সংসার হইতে যদি বিধবার চলিয়া যাইতে বিলম্ব হয়, পাছে বিধবার বিবাহ-চিন্তা মনের কোণেও জাগে, সেজন্য দয়া করিয়া পুরুষ তাহাকে জীয়ন্ত পুড়াইয়া মৃত পতির সঙ্গেই পরলোকে পাঠাইয়াছে! পুরুষের সুখের ঘর ভাঙ্গিলে শতবার তাহা গঠন করিয়া লওয়া চলে, আর নারীর বেলায়, দুঃখ তাহার অদৃষ্টের লেখা! তাহার অন্যথা হইতে পারে না। ইহলোকের সুখ-সুবিধা সব ভোগ করুক পুরুষ; নারীকে তাহা দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ তাহাদের জন্য তো পরলোক রহিয়াছে! পুরুষকে তো পরলোকে যাইতে হয় না!

অসভ্য বা অনার্য্যের উদাহরণ দিব না, অনার্য্যের উপর আর্য্য হিন্দুর মহা বিরাগ! তাই আর্য্য সভ্য ও প্রাচীন সমাজের দৃষ্টান্ত দেখা যাক। মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজে বিধবা ও পতি-পরিত্যক্তার বিবাহ প্রচলিত আছে। কেবল হিন্দু সমাজেই নাই, কারণ হিন্দুধর্ম্ম বড়ই উদার! এই ধর্ম্মে নারীর প্রতি বড়ই সম্মান! যে যে সমাজে এরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে, তথায় সমাজের বহু দুর্নীতি ও অত্যাচার, বহু তৃষিত অন্তরের হাহাকার নিবারিত হইয়াছে। আমাদের সমাজে পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কত হতভাগিনী আপনাদের নিরানন্দ জীবন কাটাইবার জন্য কত পথ

অবলম্বন করিতেছে, বোধ হয় অনেকেই তাহা জানেন এবং এরূপ নারীর বিবাহের আবশ্যকতাও সকলে বুঝিতেছেন। যে যে কারণে পুরুষের একাধিক বিবাহের প্রয়োজন হয় সেই সেই কারণেই নারীরও বিবাহের প্রয়োজন হইতে পারে, ইহা পুরুষ ভুলিয়া গিয়াছেন।

১৩২৮ সনের চৈত্রের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ "সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীকান্তের" "অভয়া"র এক বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন, এবং "অভয়ার" কার্য্য কিরূপ নিন্দনীয় লজ্জাকর, তাহা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ বিবাহ প্রচলিত থাকিলে নারীত্ব প্রস্ফুটিত করিবার জন্য অভয়াকে পাপ পথ অবলম্বন করিতে হইত না। অন্য পথ রুদ্ধ বলিয়াই অভয়ার ভিতরের মাতৃত্ব ও সংসার-ভোগের ইচ্ছা পাপ পথ লইয়াছিল। কিন্তু অভয়ার প্রশ্ন "এ সব সন্তানের সমাজে স্থান কোথায়?" এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর,—স্থান নাই এবং তা না থাকাই উচিত। কিন্তু সমাজের রীতি-নীতি পরিবর্ত্তিত হওয়া দরকার। খৃষ্টান বা মুসলমান নারী এ স্থলে স্বচ্ছন্দে কুলবধূর মর্য্যাদা রাখিয়াই সমাজের একজন হইয়া থাকিতে পারিত। হিন্দুধর্ম্ম উদার বলিয়াই সে স্থান এখানে তাহার নাই। তা যখন নাই, নারীর জন্য যখন স্বতন্ত্র বিধি নাই, তখন পুরুষের জন্যও নিগড় নিয়ম থাকা উচিত ছিল। এরূপ বিধি থাকা উচিত ছিল যে পত্নীত্যাগী বা ব্যভিচারী পুরুষ রাজদ্বারে কর্ম্ম পাইবে না বা সম্পত্তিতে তাহার অধিকার থাকিবে না অথবা যে তাহার সহিত মেলমেশা করিবে সেও পতিত হইবে। বন্ধন থাকিলে কিছুই উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না। কোন ভয় নাই, বন্ধন নাই বলিয়াই পুরুষ সমাজ এত দুশ্চরিত্র। এরূপ কোন বিধি থাকিলে অভয়ার সৃষ্টি হইত না। অভয়াকে তাহার স্বামী—পুরুষই সৃষ্টি করিয়াছে। অভয়ার স্বামী পত্নীপরায়ণ হইলে অভয়াও সাবিত্রী বা শকুন্তলার ন্যায় একজন পতিব্রতা হইত। শকুন্তলা স্বামীকর্ত্তৃক বিনাদোষে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অভয়া ও শকুন্তলার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রহিয়াছে। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই বলিয়া পরস্ত্রী-জ্ঞানে অসম্মত হইয়াছিলেন, অভয়ার স্বামীর ন্যায় কদাচারী ও দুশ্চরিত্র ছিলেন না। ভুল ভাঙ্গিলে দুষ্মন্তই বেদনা ও অনুতাপে দগ্ধ হইয়া শকুন্তলার অন্বেষণ করিয়াছিলেন ও তাহাকে রাজলক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।* যাঁহারা শকুন্তলার সহিত অভয়ার তুলনা দেন তাহারা যে এ কথা ভুলিয়া যান, ইহা আক্ষেপের কথা।

অভয়ার স্বামী থাকিলে সমাজে অভয়ারও আবির্ভাব হইবে। সকলেই সীতা বা শকুন্তলা হইতে পারে না। সব পুরুষ কি রাম বা যুধিষ্ঠির হইতে পারে? এ সব নারীর জন্য ব্যবস্থা কই? অভয়ার এ পতনের জন্য দায়ী কি পুরুষই নয়? পরিত্যক্তা বলিয়াই কি তাহাদের অন্তঃকরণ তখনই পাথরে পরিণত হইয়া যাইতে পারে? না, তাহাদের সংসার-ভোগেচ্ছা চলিয়া যাইবে? তা যাইতে পারে না, কারণ ভগবান তো বাছিয়া বিধবা বা পরিত্যক্তা করেন না। তাহাদের মনেও ঘর-সংসার করিবার ইচ্ছা, পতির স্ত্রী ও সন্তানের মা হইবার ইচ্ছা, দশজনের ন্যায় সুখ-দুঃখে জড়িত হইয়া সংসার-ভোগ করিবার ইচ্ছা থাকেই। শকুন্তলা পরিত্যক্তা হইলে স্থান পাইয়াছিল অপ্সরা মাতার সাহায্যে তপোবনে; তপোবনে স্থান পাইলে অভয়াও যে শকুন্তলা হইতে পারিত না, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ভোগময় সংসারে থাকিয়া সকলেই শকুন্তলা হইতে পারে না।

বিধবার অবস্থা দেখা যাক। ব্রহ্মচর্য্যের এই উদ্দেশ্য যে ইহলোকে জীবিত বা মৃত একেরই থাকিয়া পরলোকে আবার তাহাকে পাওয়া। কিন্তু প্রথমতঃ পরলোক আছে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; অনিশ্চিত ও অজ্ঞাত পরলোকের আশায় ইহলোকের সুখ ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহারা "শ্যাম ও কুল" দুই-ই যে হারান না, তাহা কে বলিতে পারে? তারপর যদিও পরলোক থাকে তবে স্ব স্ব কর্ম্মফল অনুসারে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্থানে

---

* সিংহ মহাশয় রসিকতার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন যে শকুন্তলা যদি maintenance suit করিতেন তাহা হইলে কি হইত? কিন্তু এ দৃষ্টান্ত প্রাচীনকালে নিতান্তই বিরল ছিল। দেবযানী কি যযাতিকে অন্যাসক্ত জানিয়া অভিশাপ দেয় নাই? তখন মুখের জোর ছিল বলিয়া আদালত ছিল না। হতভাগ্য কলিতে তো তা হইবার উপায় নাই।

থাকিবে, সুতরাং তথায় মিলনের অপেক্ষা করা ভুল। কারণ কর্ম্মফল কাহাকে কোথায় লইয়া যায়, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তারপর পুনর্জ্জন্ম আছে। তাহাতে প্রতি-জন্মে যে একই পতিপত্নী প্রাপ্তি ঘটিবে, শাস্ত্র এমন কথা বলে না। কর্ম্মফল অনুসারে জন্মান্তরে কে কোথায় যাইতেছে, এ জন্মে যাহারা পতি-পত্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ, পরজন্মে হয়তো তাহারা কোন্ সুদূরের ব্যবধানে রহিয়াছে! কাহারও কাহাকে চিনিবার সাধ্য নাই! এই তো একখানা বাঙলা উপন্যাসে পড়িতেছিলাম, এক নারীর স্বামী জন্মান্তরে তাহারই ছোট ভাই হইয়া জন্মিয়াছিল! সে পুত্রের মত্নে তাহার পূর্ব্বজন্মের স্বামীকে পালন করিয়াছিল! এখন জিজ্ঞাস্য এই যে সে বিধবা পরলোকে গিয়া তো তাহার স্বামীকে পাইবে না, তবে সে কোথায় আবার তাহার স্বামীকে পাইবে? তাহার ব্রহ্মচর্য্য তো নিষ্ফল! আর পরলোকেও কি দৈহিক স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক থাকে! পুরুষ তো মৃত-পত্নীর সহিত মিলিবার ইচ্ছায় ইহলোকে একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন না! একনিষ্ঠার পালাটা নারীর উপর দিয়াই সারা গিয়াছে। —সিন্ধবাদ নাবিক বলিয়াছিল যে "……পত্নীর মৃত্যুতে বন্ধুর শোক দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, স্ত্রীর জন্য পুরুষের এত ব্যাকুলতা অতিশয় বিস্ময়ের কথা! তারপর যখন শুনিলাম, স্ত্রীর সহিত বন্ধুকেও সহমরণে যাইতে হইবে তখন বুঝিলাম যে শোক কেবল স্ত্রীর জন্যই নহে! আপনার মৃত্যু-ভয়েই বন্ধু অত শোক প্রকাশ করিতেছেন।" হিন্দু-নারীও কেবল যে পতির মৃত্যুতে এত শোকাকুল হয় তাহাই কি ঠিক? না, তাঁহার শোক কেবল পতির জন্য নহে, পতির সঙ্গে তাহার সর্ব্বস্ব—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, সেই জন্যই এত অধিক শোক? আরব্য উপন্যাসকারের বিচার তবু দুইদিক দিয়াই হইয়াছিল!

স্নেহ, ভক্তি বা ভালবাসাকে শূন্য আধারে স্থাপন করা যায় না, অতি সাধকেরও প্রতিমা আবশ্যক হয়। কারণ নিরাকারের ধারণা করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই জন্য হিন্দুধর্ম্ম সাকার উপাসনার পক্ষপাতী, সেই জন্যই বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে টিঁকিতে পারে নাই। কিন্তু এই ধর্ম্মেই বিধবাকে মৃত পতির প্রতি ভালবাসা রাখিতে যে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা কতদূর সমীচীন তাহা বাবু যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রমুখ সমাজ-হিতৈষীগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আধার-শূন্য প্রেম বা ভক্তি এবং মূর্ত্তি-বিনা পূজা কষ্টসাধ্য, সকলে ইহা গ্রহণ করিতেও পারে না। আর আদান-প্রদানই দাম্পত্য প্রেমের রীতি। পরলোকের প্রতি বিশ্বাস এবং যথেষ্ট জ্ঞান না হইলে কেহই এই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার যোগ্য হয় না। কোমলপ্রাণা বালিকাকে জোর করিয়া বাধ্য করা নিষ্ঠুরতার কাজ, অবিবেচনার কাজ। পথ খোলসা থাকাই উচিত, যে ইচ্ছা করিয়া বৈধব্য গ্রহণ করিবে বা বিবাহ করিবে সে বিধি থাকা উচিত, যেমন পুরুষদের আছে। সতীদাহ ইংরাজের আইনে বন্ধ হইয়াছে বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করেন! নারী বিধবা হইলে তাহাদের বয়স বা শারীরিক ও মানসিক গতি, তাহাদের সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ জীবন কিছুই দেখা হয় না, কেবল ইহাই দেখা হয় যে সে নারী! সুতরাং তাহার গত্যন্তর নাই! পুরুষের বিশ্বাস, স্বাধীনতা দিলে নারী আর বশীভূত থাকিবে না। তাই ধর্ম্মে নারীর অধিকার নাই, সমাজে নারীর অধিকার নাই—এমন কি আপনার শরীরেও নাই। নারীর বাঁচিয়া থাকাটা পুরুষের দয়ার উপরই নির্ভর করে।

বিধবাকে ব্রহ্মচারিণী আখ্যা দেওয়া হয়, কিন্তু বিধবা মাত্রই কি ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারিণী? আমি হিন্দু নারী, অনেক বিধবা দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে পবিত্র-হৃদয়া সাধু-শীলা অনেক আছেন সত্য, কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতেছি, তাঁহাদের বৈধব্য কেবল লোকাচার দেশাচারের অপরিহার্য্য বন্ধন বলিয়া, নতুবা সত্যই মৃত পতির ধ্যান করিয়া কেহ জীবন কাটান্ না। যে সকল বিধবাকে স্নেহ করিবার কেহ আছে, তাহারা শাঁখা, সিঁদুর ভিন্ন প্রায়ই সধবার বেশ গ্রহণ করে, তাহাদের প্রতি স্নেহশালিনী মায়েরা সর্ব্বদা চেষ্টা করেন যে সে যে বিধবা, দুঃখিনী, ইহা যতটা পারে ভুলিয়া থাকুক। "আহা, ওকে থিয়েটারে কি বায়স্কোপে নিয়ে যা রে,—দুখানা ভাল বই এনে দে, তবু একটু ভুলে থাকুক।" এই সকল বিধবার বিবাহ দিলেই কি মহা পাপ হয়? ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'বিপর্য্যয়' নামক উপন্যাসের মনোরমা বিধবা

বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মনোরমা পবিত্রচিত্তা ও সাধ্বী, কিন্তু সে 'গান-বাজনায় যোগ' দেয়, 'পেটিকোট পরে' সর্ব্বদা 'নানা বিষয় আলোচনা' করে, সখীগণের সহিত 'হাস্যালাপে' অনেক সময় কাটায়, সুতরাং পতির অভাবে দুঃখিনী নহে ; এজন্য মনোরমার মনে অনুতাপ আসিয়াছিল। লেখকের মতে বিধবা আর কোন কাজ না করিয়া কেবল তিনি যে পতিহীনা ইহাই ভাবিয়া দুঃখেই সময় কাটাইবেন ; তাহার অন্যথায় বিধবার অধর্ম্ম। এরূপ বিধবা কেহ দেখিয়াছেন, সত্য বলিতে পারিবেন কি ? উহাই যদি বৈধব্যের আদর্শ হয়, তবে প্রকৃত বিধবা নাই এ কথা বলা যাইতে পারে। সময়ে মানুষ পুত্র ও পতি বিয়োগের তীব্র শোকও ভুলিয়া যায়। ইহা ভগবানের রীতি, নতুবা মানুষ বাঁচিতে পারিত না, অথবা পাগল হইয়া যাইত। অবশ্য কাব্যাদিতে আদর্শ-চরিত্র থাকা অতিশয় প্রয়োজন, কিন্তু বাস্তব-জগতে সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে তাহা সৃষ্টি করিতে যাওয়া বাতুলতা। তাহাতেই সমাজে শুভা ও অভয়ার আবির্ভাব হয়। বিধবা মাত্রকেই দেবী বানাইতে গিয়া সমাজে এত পতিতার সৃষ্টি হইয়াছে।

বিধবা বিবাহের কথায় যাঁহারা ভয় পান তাঁহাদের মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজ দেখিতে বলি। সে সমাজে কি পতিব্রতা নারী নাই ? না, সেটা হিন্দু-সমাজই মৌরসী-পাট্টা লইয়াছে ? হিন্দু-ধর্ম্মের ন্যায় উদার নহে বলিয়াই তাহারা নারীকে পিষিয়া মারিবার ব্যবস্থা না করিয়া সমান অধিকার দিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্ম হিন্দুর ন্যায় অতি সহজেই সকলকে ঈশ্বরের আসন দিয়া বসে না। তাহাদের মহম্মদ মহাপুরুষ মাত্র, স্বয়ং ঈশ্বর নহেন। আমাদের সকলেই ঈশ্বর, বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ হইতে গান্ধী পর্য্যন্ত ! হিন্দু-নারীর তো ঈশ্বর সাক্ষাৎ অহরহ ঘটিতেছে, নিশ্চয়ই তাঁহাদের "পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে !"

একনিষ্ঠতা প্রশংসনীয় ও উত্তম বস্তু কিন্তু সুলভ নহে।

সমাজ-হিতৈষী পুরুষগণ মুখে বিধবা-বিবাহের কথা যতই বলুন না কেন, তাঁহাদের মন ইহার সমর্থন করে না। তাঁহাদের লেখা হইতেই একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "রত্নদীপ" উপন্যাসে দেখাইয়াছেন বিধবা নায়িকা স্বামী ভাবিয়া অপরকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু সে ভুল ভাঙ্গিবামাত্র তাহার মনও ফিরিয়া গেল। সে স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া গেল। "খোকার কাণ্ড" নামক গল্পেও নায়কের মুখ দিয়া লেখক বলিতেছেন, "না, বিধবার বিয়ে হওয়া কখনই উচিত নয় ইত্যাদি।" মৃত্যুর কোলে দাঁড়াইয়া নায়ক যখন অন্তরে অনুভব করিত যে তাহার স্ত্রী অন্যের হইবে, তখন তাহা তাহার সহ্য হইত না। ইচ্ছা যে, মৃত্যুতেও স্ত্রী তাহারই থাকিবে কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হইলে সে কি করিত ? স্বামী অপর স্ত্রীর হইলে স্ত্রীদের বুঝি তাহা খুব ভাল লাগে ? পরলোক-গতা পত্নী বুঝি তাহা দেখিয়া পরম পুলকিত হয় ? বোধ হয়, হয় ; কারণ তাহারা যে দেবী !*

চকচকে খেলনা পাইলেই শিশু তুষ্ট হইয়া থাকে—তাহা মূল্যবান কি না সে প্রশ্ন তাহার মনে আসে না। ইহলোকে একেবারে কিছু না দিলে তো ভুলাইতে পারা যায় না, তাই যাহাতে জ্ঞান হইতে না পারে সেজন্য বিদ্যা হইতে বঞ্চিত করিয়া, যাহাতে বহির্জগতে বিচরণ করিয়া আপনার অধিকার বুঝিতে না পারে, সেজন্য স্বাধীনতা লুপ্ত করিয়া পুরুষ তাহাকে অসার কাঞ্চন দিয়া ভুলাইয়াছে। স্বর্ণ, হীরক, মণি ও মুক্তা সংসার হিসাবে যত মূল্যবানই হউক, জ্ঞান ও আত্মার বিকাশের পক্ষে তাহা কোন সাহায্য করে কি ? "বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখ।" মনুর এই বাক্য পুরুষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে। শাস্ত্রে নারীকে অধিকার দিও না, শিক্ষায় অধিকার দিও না, স্বাধীনতায় অধিকার দিও না ! যদি তাহারা আপনাদের ক্ষমতা বুঝিতে

* এখানে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনেক পুরুষকে বলিতে শুনিয়াছি যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষ আবার বিবাহ করিলে স্বামীরা শান্তি ও অন্য অবলম্বনে শোক ভুলিতেছে দেখিয়া পরলোকগতা পত্নী সুখীই হয়। তবে অন্য স্বামী-অবলম্বনে স্ত্রী যদি শোক ভুলিতে পারে, চির-দুঃখ হইতে অব্যাহতি পায় তাহাতে পুরুষ সুখী হয় না কেন ?

কেহ কেহ বলেন, মুসলমান নারী এতদিন একস্বামীর সঙ্গে বাসের পর আবার কি করিয়া অন্যকে গ্রহণ করে, এ বড় আশ্চর্য্যের কথা। পুরুষেরা কি করিয়া অন্য নারীকে গ্রহণ করেন, তাহা ভাবিয়া দেখিতে বলি।

পারে, যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহারা কেবল পরিচর্য্যা করিতেই আসে নাই, তাহারাও সংসার ভোগ করিতে আসিয়াছে, যদি তাহারা আর পুরুষের অধীনতা স্বীকার না করে, তাই তাহাদের জ্ঞান-লাভের সুযোগ দিও না! বস্ত্র ও অলঙ্কারের উপরও তাহাদের কতখানি অধিকার, তাহা সকলেই জানি! শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত একটি গানে এ ফাঁকিটুকু বেশ ধরাইয়া দিয়াছেন,—

"লেখাপড়া শিখতে মানা পাছে জেনে ফেলি সব,
পাছে তাঁদের সুখের নিদ্রা ভাঙ্গায় মোদের কলরব,
রান্না-বান্না মানের কান্না দুয়ের মাঝেই করি বাস!
তাঁদের তরেই বাঁচা মোদের, নইলে কিসের বাঁচা হায়—
তাঁদের যদি বাজে ব্যথা, সরে পড়াই সদুপায়—"

নারীর এই যে ব্যঙ্গোক্তি ইহাতে পুরুষের লজ্জা হয় না?

সিংহ মহাশয়ের এই উক্তি কেমন সুযুক্তি ও সুরুচি-সম্পন্ন তাহা দেখুন,—"বিবাহিতা নারী (পাশ্চাত্য দেশে) ইচ্ছা করিলে স্বামীর দোষ প্রমাণ করিয়া বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে পারেন ও অবলীলাক্রমে পরপুরুষের সহিত মিলিত হইতে পারেন।" কোনও পাশ্চাত্য নারী অবলীলাক্রমে পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হন না—ইহা মিথ্যা। "ইহাতে সমাজে কোনও নিন্দা নাই", ইহাও মিথ্যা। সে দেশে স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশার যথেষ্ট নিয়ম ও রীতি আছে। যে-সে ঘরে-তার সঙ্গে মেশে না। এ কথা জোর গলায় যিনি বলিতে চান্, তিনি সত্যের মর্য্যাদা রাখিতে জানেন না!

ব্যভিচার সকল অবস্থায় এবং সকল সমাজেই নিন্দনীয়। পতি-ত্যাগের পর বা পতি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইবার পর, অথবা বৈধব্যের পর ঐ সকল নারী পুনরায় যথারীতি বিবাহ করিয়া তাহার সঙ্গে বাস করেন। বিবাহিত স্বামী "পরপুরুষ" নহে। কিম্বা সিংহ মহাশয় যদি দ্বিতীয় বিবাহকে স্বীকার না করেন তবে তো হিন্দু পুরুষও পত্নীর মৃত্যুর পর পরস্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন। "আগে নিজের ঘর ঝাঁট দাও।" আমাদের পুরাণে বা ইতিহাসে কি দ্বিতীয় বার পতি-গ্রহণের ব্যবস্থা নাই? মনুর উক্তি "নষ্টে মৃতে" বচন বোধ হয় সিংহ মহাশয় জানেন না, তাই স্বাধীন মানব-সমাজের স্বাধীন আচরণে বিস্মিত হইয়াছেন। কিন্তু নারীও যে মানুষ, যাঁহারা এ কথা ভুলিয়া যান না, তাঁহারা ইহাতে আশ্চর্য্য হন না! সিংহ মহাশয়ের মতে এরূপ স্থলে পুরুষই দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করার অধিকারী, কারণ তিনি দ্বিতীয় বিবাহিতার জন্য নরক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র প্রবন্ধটি এইরূপ গোঁড়ামিতে পূর্ণ। এই একদেশদর্শিতাতেই তাঁহার অনুপমার জন্ম হইয়াছে। বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে বিধবাকেই তিনি সালিশ মানিয়াছেন, কিন্তু আজন্মের সংস্কার, অজ্ঞতা, অন্ধতা এবং অনভ্যস্ততা বশতঃ হিন্দু বিধবা-বিবাহে আপত্তি করেন। উপায় নাই বলিয়াই সমাজের অত্যাচার সহ্য করেন। ('আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম' 'কেন ক্ষমা করলে, তুমিও প্রতিশোধ দাও, ওর মার ফিরিয়ে দাও।' 'না, আমি ওকে ক্ষমা করলাম, কারণ ওর সঙ্গে জোরে পাবনো না!') একাধিক পতির সাহচর্য্য পাপ হইলে পৌরাণিক দ্রৌপদী, কুন্তী বরণীয়া হইতেন না। যখন যাহা দেশাচার, তাহাই তখন ধর্ম্ম লোকমত বুঝিয়া ধর্ম্ম-মতও পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং মানুষের মনের গতি-অনুসারে সমাজ ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।...আরও একটী কথা পুরুষের প্রেম ও নারীর সতীত্বকে যত বড় করিয়া দেখানো হইয়া থাকে, বাস্তব পক্ষে তাহা তত বড় নহে। কারণ পরীক্ষা-স্থলে এ দুইয়ের কোনটিই টিঁকে না। সুতরাং এত বড় করিয়া না দেখিলেও লোকসান নাই।

বড় বড় কথা বলিয়া এবং "দেবী" বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেই বিধবা দেবী হইয়া দাঁড়াইবে না। মনুষ্য-ধর্ম্ম নর-নারীতে স্বভাবতঃই আছে, তাহা রোধ করায় কুফলই ফলিতেছে। "দেবী" বানাইতে হইলে আগে "দেব" বানাইতে হয়। মহম্মদ আগে নিজে চিনি ছাড়িয়া পরে অপরকে চিনি ছাড়িবার উপদেশ দেন। মদ্যপের উপদেশে কেহ মদ ছাড়িতে পারে না, সাধুর নিকট হইতেই সৎ-উপদেশ গ্রহণ করা হয়। রামেরই পত্নী সীতা, অজেরই পত্নী ইন্দুমতী। অভয়ার স্বামীর স্ত্রী অভয়াই হইবে, সীতা হইবে না।

সিংহ মহাশয় আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে নারী নিজের দুর্ব্বলতার জন্য অথবা পাষণ্ড-স্বামী যাহাকে যন্ত্রণা দিয়া গৃহে তিষ্ঠিতে দেয় নাই, তাহাদের জীবন কি বৃথাই যাইবে? কিসে তাহাদের জীবনের সার্থকতা হইবে?

উত্তরও তিনিই দিয়াছেন যে "এরূপ পতিকে যে নারী ভক্তি করিয়া পাতিব্রতা ধর্ম্ম পালন করিতে পারিবে না, তাহার জীবনে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। তাহার উচিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সেই দুঃখ-ভোগের ভিতর দিয়া ভাবী জীবনকে সার্থক করিবার চেষ্টা করা।"

এ বিধি নারীর জন্য পুরুষ হইলে এস্থলে কি করিতেন? অদৃষ্ট এবং অবশ্যম্ভাবী বলিয়া এরূপ দুঃখকে স্বীকার করেন কি? সহ্য করেন কি? স্বামী দুরাচার, চরিত্রহীন, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর হইলেও সেই স্বামীকে ভক্তি করিতে হইবে! ভালবাসিতে হইবে! কেন? কিসের জন্য এত প্রভুত্ব?

হায়! তাহাই করিতে হইবে! পুরুষের পাপের শেষ আছে, উত্থান আছে, প্রায়শ্চিত্ত আছে, নারীর কিছুই নাই! একবার প্রলোভনে পড়িয়া যদি নারী ভুল করে, আর তাহার সংশোধন নাই। পাপী কি চিরদিনই পাপী থাকে? তীব্র অনুতাপ, অসহ্য মর্ম্মদাহ কিছুতেই তাহার পাপের ক্ষয় নাই? নারীর পাপ অক্ষয়! পুরুষের সহস্র অত্যাচার, অদৃষ্টের বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে? তাহার প্রতিকার করাও অনুচিত? হয়তো এ উত্তরও পাইতে পারি যে অদৃষ্টবাদী হিন্দু যে অদৃষ্ট স্বীকার করিবে ইহা আশ্চর্য্য কি? তবে কেন অদৃষ্টবাদী হিন্দুই দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার জন্য এত আর্ত্তনাদ করে? কেন অর্থাভাবের জন্য রাজার দ্বারে প্রার্থী হয়? কেন তাহা অদৃষ্ট বলিয়া নীরবে স্বীকার করে না? সহ্য করে না? জড় প্রকৃতিকে যদি প্রতিকারদ্বারা ভিন্ন-ধর্ম্মী করা যায়, তবে নারীও দুঃখ-লাঞ্ছনা সহ্য না করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিবেই এবং নারীর সে চেষ্টা একদিন সফলও হইবে। দুঃখিনী হিন্দু-নারী পুরুষের পদে আপনার জীবন উৎসর্গ না করিয়া আপনার দুঃখ আপনিই ঘুচাইবে।

নারী দুর্ব্বল অর্থাৎ কোমল। সময়-বিশেষে আরও দুর্ব্বল ও অপরের সাহায্যপ্রার্থী হয়, সেই সুযোগে পুরুষ তাদের সকল ক্ষমতা, সকল অধিকার আপনাদের প্রভাবে বিলোপ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের সুখ, শান্তি, ভাগ্য, স্বাধীনতা চিন্তা পর্য্যন্ত চুরি করিয়াছে। তাহাদের জন্য যত দুঃখ, কষ্ট, একাহার, অল্পাহার, অনাহার পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, শেষে তাহাদের পুড়াইয়া মারিয়াছে!

হায় নারী, এই স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও ভণ্ড পুরুষকেই দেবতার আসন দিয়া এতদিন তোমরা পূজা করিয়াছ! যাহারা তোমাদের পূজা চুরি করিয়াছে, আজ তাহাদের মুখ হইতে ভণ্ডামির মুখোস খসাইয়া দেখ, নীচতা ভিন্ন সেখানে আর কিছু নাই। নারীর চক্ষু এতদিন পরে সত্য দেখিতে পাইয়াছে, তাই পুরুষ ভয় পাইয়াছে। কিন্তু বাঁধন যখন বুঝিয়াছে, তখন নারী তাহা ছেদন করিবেই।

শ্রীমতী উষাপ্রভা সেন।

বিশ্ব-বিরহ

নীল নিশীথের নন্দদুলাল, নীল আকাশের তারা
নির্নিমেষের দেশের তীর্থ-যাত্রী নিদ্রাহারা,
চলেছি জন্ম-অবধি নিরুদ্দেশের অন্বেষণে—
কূল দুলিছে দুধারে রুদ্ধ আবেগে ক্ষণে ক্ষণে।
কোথায়—? হায় কে কোথায়? কার ঝরিছে ব্যথিত সুর
র ইঙ্গিত? কোন সঙ্গীত?—বহুদূর, বহুদূর!

* * * *

মূর্চ্ছিত,—ম্লান পড়েছিনু কোন তিমির সাগর-কূলে,
চকিত পরশে জাগিয়া শিহরি চাহিনু চক্ষু তুলে।
কে যেন পলালো! কে জানে, কোথায়? ছুটিনু আত্মহারা;
সে দিন হইতে অসীম যাত্রী আমরা পথিক তারা।

* * * *

অমর লোকের অধিবাসী—শুধু নহি তো অমৃত-পায়ী
নীলকণ্ঠের জাতি তাইতো গরলে কুণ্ঠা নাহি।

আপনার প্রাণ প্রদীপ করিয়া আকাশে দিয়েছি আলো,
বলেছি—আপনি জ্বলিয়া জগতে জীবন-বহ্নি জ্বালো,
সকল বিসম্বাদের মধ্যে বিরাট ঐক্যতান
—অসংখ্য তারা এক অনন্ত—ছন্দে কম্পমান ;
বিচিত্রতার ঘাত-প্রতিঘাতে বিশ্বজীবন বাজে—
চিরন্তন এ বিরহ-মিলন আকুল লীলার মাঝে।
ক্ষুদ্র আমরা শান্ত আমরা নীরব আমরা ম্লান,
রুদ্র আমরা বৃহৎ মুখর দীপ্ত অনির্ব্বাণ।
বর্ণে-বিভাগে গোপনে প্রকাশে সকল সৃষ্টিছাড়া
অলকা-তাড়িত অলোক বিহারী—আলোক-বিলাসী তারা।

* * * *

তোমরা কোথায়, আমরা কোথায়—অলঙ্ঘ্য ব্যবধান,
তবু কি গভীর সমবেদনায় স্পন্দে দোঁহার প্রাণ!
তোমরা চলেছ আমরা চলেছি—চলিবার শেষ নাই,—
ধরায় আলোক মানব—আমরা আকাশের আলো, ভাই!
তুমি-আমি দোঁহে হৃদয়ে বহ্নি জ্বালিয়া রেখেছি তাই,
হে মানুষ কবি, এস তবে আজি আগুনের গান গাই!
পৃথিবীর মহাকাব্যে নায়ক—মানব তোমার স্থান,
আকাশের মহাকাব্যে সে গীত জানো কি কাহার গান?
কিসে হাহাকার, বুক-ফাটা কার, অনন্ত বেদনায়—
অসীম শূন্যে—শুনেছ কি তুমি—টুটে পড়ে লুটে যায়?
জ্যোতির স্পন্দে জানো কি ছন্দে, বাজিছে গভীর সুখ,
কি অনুভূতিতে কাঁপে, তা কি জানো নিশীথ-তারার বুক?

* * * *

ওহে বাঞ্চিত হে চির-দয়িত, ওগো হৃদয়ের রাজা,
যুগান্ত পরে আজো দেখা নাই, এ কি সখা দিলে সাজা!
তোমার মুরলী ডেকেছে আমারে, ছুটিয়া চলেছি তাই,
যত ধাই, হায়, তুমি সে কোথায়? পথের কি শেষ নাই?
প্রিয় হতে প্রিয়, জীবন-অধিক জীবন চেয়েছ মোর,
অভিসারিকার পরাণে কেন সে লাগালে পথের ঘোর?
পরাণ সঁপিব—এ দীন সাধের বাধা রাখিয়াছ বঁধু?
উপহার সখা ব্যর্থ করিবে,—এ দীপ্তি, এই মধু?
মিশায় ওখানে করুণ আভায়, অরুণ রবির হাসি,—
সেথা হয় ম্লান কার সুনয়ান, কেঁদে ওঠে কার বাঁশী?
শত জনমের বিফল বাসনা অশ্রুতে হয় হারা,
'আয়, আয়, আয়' বলে কেঁদে হায়, কোথা ডেকে যায় তা'রা
ওহে সুন্দর হে মনোহরণ চির-ঈপ্সিত মম,
আজো কি আসার সময় হল না, হে আমার প্রিয়তম?

* * * *

কত দেখিলাম মহা-প্রলয়, কত জগতীর সৃষ্টি,
কত তাণ্ডব-নৃত্যে চকিত—মুদিয়াছিলাম দৃষ্টি!
সুনীল গগন দারুণ আভায় কতবার হল রক্ত,
নীল-লোহিতের ভীষণ ভ্রূকুটি-ভঙ্গে জগৎ স্তব্ধ।
ভয়ঙ্করের শঙ্কা ছাপিয়া তখনো উঠেছে সুর
—আর কতদূর, আর কতদূর, ওগো আর কতদূর!
যুগান্তরের জীবন বাহিয়া সুদূরের পানে চাহি
আমরা অমর অনাদি হইতে বিশ্ব-বিরহ গাহি।

* * * *

হয়ত বিশাল মরণ-বাসরে—মোরা অবিনশ্বর
চির-বেদনার জ্বালায় জ্বলিয়া আছি চির-ভাস্বর।
জানি না—জীবন কোথা থেকে এলো, কোথা হবে এর শেষ,
মিটিল কোন্ সে সমস্যা কার মিলিল না উদ্দেশ,
কোন্ রহস্য রহিল নি-গূঢ়, প্রশ্ন অসমাহিত,—
জানি না।—অর্থ এই জীবনের রহিল অপরিচিত।
এ প্রহেলিকার উত্তর প্রিয়, পাবনা কভু কি, হায়?
তবুও রহিব যুগযুগান্ত তাহার অপেক্ষায়।
আমরা ছিলাম, আমরা থাকিব, আমরা জানি যে আছি,
এ ছাড়া কি কিছু জানিবার নাই? আলো,আলো,আলো যাচি

* * * *

কোথা নিয়ে যায় অনাহত গতি প্রেমের অমৃত-রথ?
—মরণবক্ষে মিলিবে না বঁধু, ধরেছি জীবন-পথ।
তাই যুগ-যুগ জাগিয়া জাগিয়া প্রতীক্ষা-পথ চাহি,
আকাশের বুকে স্পন্দন তুলি, অজানার গান গাহি।
চির-দিবসের আকুল পথিক অসীমে আত্মহারা
আমরা নীলের নন্দদুলাল আমরা নিশার তারা।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

প্রত্নের প্রেত

সাহিত্যচর্চ্চা ছেড়ে দিয়েছি বলে বন্ধুরা প্রায়ই অনুযোগ করেন, তাঁদের কথার যে কি জবাব দেব তা বুঝতে পারি না। মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখি, প্রকাশ করি না। মধ্যে মধ্যে মনকে ফাঁকি দিয়ে চোখ দিয়ে দু-এক ফোঁটা জলও বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু আমার ও-পথ মাড়াবার আর যো নেই। সরস্বতীর নিকুঞ্জে পৌছবার রাস্তার দুধারে যতগুলি দাঙ্গাবাজ গুণ্ডা আড়ালে, আবডালে, ঝোপে-ঝাপে লুকিয়ে আছে, বরাতের গুণে তারা একে একে সবাই আমাকে আক্রমণ করেছিল, গাঁটে যা ছিল তা তো কেড়ে নিয়েছে, উপরন্তু বলে দিয়েছে যে, এ পথ মাড়ালে এবার প্রাণটা পর্য্যন্ত যাবে। তাদের অত্যাচারে সাহিত্য রোগ আমার সেরে গিয়েছে, কিন্তু রোগের ভয়টা এখনো যায়-নি।

ছেলেবেলায় কবি হবার সাধ মনের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। রোজ গাদা-গাদা কবিতাও লিখতুম, বাড়ীর সবার মুখে আমার কবিতার প্রশংসা আর ধরত না। তাঁরা শেলী না কীট্‌স্ এই রকম কি একটা খেতাবও আমায় দিয়েছিলেন। কিন্তু কবি হওয়া আমার বরাতে নেই। আমার কবিতা লেখার অভ্যাস যদি স্থায়ী হতো, তা হলে কবিতার বাজারে আজকাল যাঁরা আসর জমিয়ে বসেছেন তাঁদের অনেককেই অন্য আসরে আশ্রয় নিতে হতো। কিন্তু পরের উপকার করার দিকে ঝোঁকটা ছেলেবেলা থেকেই কিছু বেশী পরিমাণে থাকায় কবিতা লেখা ছেড়ে দিলুম। অবশ্য আমার কবিতা লেখা ত্যাগ করার মূলে মাসিক পত্রিকাগুলির সম্পাদকদের যে কোন হাত ছিল না, সে কথা হলফ করে বলতে পারি না; তবে সে কথাগুলো আর প্রকাশ করবো না, রসিক যাঁরা সেটা তাঁরা বুঝে নেবেন।

ঐ একই কারণে গল্প ও উপন্যাস লেখাও ত্যাগ করতে হয়েছিল। এবারের মতন সাহিত্যচর্চ্চা এখানেই শেষ হলো মনে করে মনটা ভারি দমে গেল, ঠিক এই সময়ে দু-এক জন বন্ধু আমায় গল্প কবিতা ছেড়ে সমালোচনায় মন দিতে পরামর্শ দিলেন। শুধু সাহিত্য-ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের বাইরে যে বাস্তব বলে আর একটা বড় ক্ষেত্র আছে সেখানেও এমন বন্ধু ও এমন অমোঘ উপদেশ আমি কখনো পাই-নি।

আমি সমালোচক হলুম। ছোট গল্পকে চুটকি-গল্প নাম দিয়ে বর্ত্তমানের গল্প-লেখক সম্প্রদায়কে গালাগালি দিয়ে কোনো এক মাসিক পত্রে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেওয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এবার আর সাতদিন যেতে না যেতেই লেখা ফিরে এল না। প্রবন্ধ তো বেরোলই, উল্টে অন্য কাগজ থেকে লেখার জন্য তাগাদা আসতে লাগল। যে সব সম্পাদক আমার কবিতার ওপর একটু-আধটু টীপ্পনী কেটে ফেরৎ দিতেন, তাঁরাও সমালোচনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ চেয়ে পাঠাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে সাহিত্যের বাজারে সমালোচক বলে আমার একটা সুনাম রটে গেল ভাবলুম যে, গল্প আর কবিতা লিখে জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলেছিলুম আর কি!

তখনো আমি কলেজে পড়ি। কলেজ থেকে বাইরে বেরোবার আগেই একজন উঁচু-দরের সমালোচক বলে আমার নাম রটে গিয়েছিল।

লেখা পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার চেয়ে একটা বড় রাস্তা আমার চোখের সামনে খুলে যাওয়ায় সে রাস্তা ছেড়ে সাহিত্যের আর একটা রাজপথে প্রবেশ করেছিলুম। এই রাস্তায় যদি না যেতুম তা হলে সাহিত্যচর্চ্চা আমায় ছাড়তে হোতো না।

কলেজ ছেড়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটা বড় সহরে এক কলেজের অধ্যাপকের চাকরী পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হলো। সহরে অনেক বাঙালীর বাস, এইখানে এসে আমার প্রত্নতাত্ত্বিক হবার সখ চেপেছিল। এই নতুন সখের কারণ যে একেবারে ছিল না, তা নয়। আমি দেখতুম যে, সহরের চারদিকে যেখানেই যাই সেইখানেই একটা না একটা অদ্ভুত পাথরের মূর্ত্তি পড়ে রয়েছে। রাস্তার ধারে এই পাথরের মূর্ত্তিগুলো কতদিন

ধরে এইভাবে অবহেলায় পড়ে রয়েছে তার ঠিকানা নাই। এক একটা মূর্ত্তির পিছনে কত বড় বড় ইতিহাস, কত আশ্চর্য্য কাহিনী, হয়ত কত প্রণয়ীর অশ্রুজল ও দীর্ঘশ্বাস জড়িত রয়েছে তা কে বলতে পারে! কোনো কোনো জায়গায় পল্লীর গরীব লোকেরা তাদের পাড়ায় একটা মূর্ত্তির অদ্ভুত নাম দিয়ে মূর্ত্তিটাকে সিঁদুর মাখিয়ে পুজা করে। আমার বাড়ী থেকে কলেজ ছিল প্রায় চার মাইল দূরে। কলেজে যাওয়া-আসায় সময় এক্কাগাড়ীর ঝাঁকুনির তালে-তালে আমার মগজে এই সব মূর্ত্তির ইতিহাস গজিয়ে উঠতে থাকত। আমি রবিবারে ও অন্য অন্য ছুটির দিন মূর্ত্তিগুলোকে গিয়ে ভাল কোরে দেখে আসতে আরম্ভ করলুম।

মাস কয়েক চাকরী করে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে শ-পাঁচেক টাকা জমেছিল। সেই টাকা কটা তুলে এনে একটা ক্যামেরা কিনে ফেল্লুম। তারপর কয়েকটা মূর্ত্তির ফটো তুলে একখানা বিখ্যাত বাংলা মাসিক পত্রে এক প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেওয়া গেল।

সমালোচকের চাইতে প্রত্নতাত্ত্বিকের খাতির তখন বাজারে খুব বেশী। প্রবন্ধ বেরুতে না বেরুতে চারদিকে তার প্রতিবাদ ও সঙ্গে সঙ্গে একজন মস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বলে আমার খ্যাতি রটে গেল। প্রতি মাসেই ফটো সমেত আমার প্রবন্ধ মাসিক পত্রে শোভা পেতে লাগ্‌ল। চারিদিকে জম-জমাট নাম, আর খাতির, সাহিত্য সভা-সমিতিতে নিমন্ত্রণ,—এই সব ব্যাপারে মেজাজ আমার সরগরম হয়ে উঠলো।

এই রকম একটা সময়, তখন বোধ হয় ইষ্টারের ছুটি। ছুটিতে যে একবার বাড়ী ঘুরে আসব, তারও যো নেই, মাত্র চারদিনের ছুটি, বাড়ীতে যেতে আসতেই চারদিন কেটে যাবে। সকাল বেলা চা খেয়ে বাইরের ঘরে বসে একটা মূর্ত্তির ছবি নিয়ে সেটার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখার কথা ভাবছি, এমন সময় আমার দুটি ছাত্র সন্তর্পণে এসে আমায় নমস্কার করলে।

কি ব্যাপার! সকাল বেলা কি মনে করে হে?

বিশ্বনাথ ও সুরেশ বল্লে যে, তারা প্রত্নতত্ব শিখতে চায়।

আমি তাদের খুব উৎসাহ দিয়ে বল্লুম—তোমাদের মতন যদি কয়েকটি উৎসাহী ছেলে পাই, তা হোলে দেশের যে কত কাজ করতে পারি—

আমার কথা শুনে তারা বল্লে—স্যর, আপনি যা বলবেন তাই করব।

বিশ্বনাথ ও সুরেশ সেদিন থেকে সকালে বিকেলে আমার কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল। আমার অর্দ্ধেক কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নিতুম। তাদের উৎসাহ দেখে আমার ইতিহাস-চর্চ্চার ঝোঁক আরও বেড়ে গেল।

সেদিন রবিবার। বিশ্বনাথ কোথায় বাইরে গিয়েছে, সুরেশ সকাল বেলা একলাই এসেছিল। নিমক্ মণ্ডীর চৌ-পায়া মায়ির মূর্ত্তি সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা চলছিল। এই মূর্ত্তিটি অদ্ভুত, তার চারটি পা পাঁচটি হাত কিন্তু মুণ্ডুটা নেই, হয়ত ভেঙে গিয়েছে। রাস্তার ধারে একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে হেলান ভাবে পড়ে আছে। মূর্ত্তির কতক অংশ মাটির নীচে পোঁতা। সে পল্লীর লোকেরা মূর্ত্তিটাকে তেল সিঁদুর মাখিয়ে পুজো করে। আমরা কিছুদিন আগে মূর্ত্তিটার একটা ফটো নিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু পল্লীর লোকেরা ভয়ানক আপত্তি করায় সেদিন আর ছবি তোলা হয়-নি। মূর্ত্তিটার সঙ্গে যে একটা বড় ও অত্যন্ত আশ্চর্য্য রকমের ইতিহাস জড়িত আছে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

সুরেশ বল্লে—স্যর, মূর্ত্তিটাকে ওখান থেকে তুলে আনলে কেমন হয়?

সুরেশের প্রস্তাবটা নেহাৎ মন্দ লাগ্‌ল না। কিছুদিন থেকে বাড়ীতে একটা মিউজিয়াম করবার আমার ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু মূর্ত্তিগুলি যে ভারী, কেই বা সেগুলো নিয়ে আসবে? আর এদেশের কোনো লোকের কাছে সে প্রস্তাব করলে সে খুনই করে ফেলবে? এই সব নানান কথা ভেবে ও বিষয়ে এখনো কিছু স্থির করতে পারি-নি। সুরেশের কথা শুনে আমি বল্লুম—চৌপায়া মূর্ত্তির ওজন প্রায় চার মণ হবে, কে নিয়ে আসবে?

সুরেশ বল্লে—স্যর, বিশ্বনাথদের বাড়ীতে একটা উড়ে ঠাকুর আছে, সে লোকটা আকাট যণ্ডা, তাকে কিছু

কবলালে হয়ত সে এ কাজে রাজী হোতে পারে। পশ্চিমের দেবতাদের ওপর উড়েদের কোনো ভক্তি নেই।

ঠিক হলো যে, বিশ্বনাথদের ঠাকুরটা যদি রাজী হয়, তা হলে তাকে নিয়ে গিয়ে একদিন রাত্রিবেলা মূর্ত্তিটা তুলে আনতে হবে।

কথাবার্তা ঠিক করে উঠে যাবার সময় সুরেশ বল্লে—স্যর, একটা কথা বলব ?

আকস্মিক তার এই রকম বিনয় প্রকাশের ঘটা দেখে আমি অবাক হয়ে বল্লুম—বল না কি বলবে ?

সে বল্লে—স্যর, 'সেকালের বরাহ' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছি, দেখে দিতে হবে।

তার কথা শুনে আমি তো অবাক! প্রবন্ধ লেখবার কি আর বিষয় পেলে না বাবা! সেকালের বরাহ তো দূরের কথা, এ কালের বরাহ সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান উইলসনের হোটেলের চেয়ে বেশী দূর অগ্রসর হয়-নি। আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লুম।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—বৈষ্ণবের ছেলের বরাহের ওপর অহেতুক এমন প্রেম উথলে উঠ্‌ল কেন হে ?

সে বল্লে যে, লালবাগ যাবার রাস্তায় জোয়ার ক্ষেতের পাশে একটা পাথরের বরাহ মূর্ত্তি পড়ে আছে, সেটাকে দেখে প্রথমে বরাহ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখবার অনুপ্রেরণা আসে। তারপরে অনেক গবেষণা করে সে এই প্রবন্ধটী লিখেছে। সুরেশের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হলো, সেদিন বিকেলে তার সঙ্গে গিয়ে মূর্ত্তিটা দেখে আসব।

বিকেল বেলা সুরেশচন্দ্র একা নিয়ে হাজির! দুজনে মিলে সেকালের বরাহের সন্ধানে যাত্রা করা গেল। একায় উঠেই সুরেশ বল্লে—স্যর, একটা শাবল নিয়ে এসেছি।

—শাবল! শাবল কি হবে ?

—যদি সুবিধা হয় তো আজকেই ওটাকে তুলে নিয়ে আসা যাবে।

আধঘণ্টা একার ঝাঁকুনি সহ্য করে আমরা বরাহ অবতারের মূর্ত্তির কাছে এসে পৌছলুম। একাওয়ালাকে একটু দূরে দাঁড়াতে বলে আমরা মূর্ত্তিটার কাছে হাজির হলুম। দিব্যি ছোট খাট একটি জানোয়ারের মূর্ত্তি, অনেকটা বরাহেরই মতন; তবে মাথার উপর দুটো শিং আছে। ওজনে দশ-পনেরো সেরের বেশী হবে না। কিন্তু সেদিন লালবাগে কি একটা মেলার জন্য পথে লোক চলার আর অন্ত ছিল না। ঠিক হলো, আসছে শনিবার সন্ধ্যের পর সুরেশ এসে বরাহটি এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে।

সে বল্লে—আপনার আর আসবার দরকার হবে না, স্যর।

শনিবার রাত্রে প্রায় নটার সময় গলদঘর্ম-কলেবরে সুরেশচন্দ্র বরাহ মূর্ত্তি নিয়ে এসে হাজির!

সে বল্লে—লোকজনের চলাচল কিছুতে কমে না। শেষকালে রাস্তা একটু নিরিবিলি হতে সে মূর্ত্তিটা তুলে ফেললুম। কিন্তু সেটিকে তুলে কিছুদূর এগিয়ে এসে আবার এক মুস্কিল! একাওয়ালা সে মূর্ত্তি তার গাড়ীতে তুলতে কিছুতেই রাজী হয় না। শেষে আর কোনো উপায় নেই দেখে এই চার মাইল রাস্তা সেই আধ-মুণে বরাহ ঘাড়ে করে আসতে হয়েছে।

সুরেশের উৎসাহ দেখে আমি তো স্তম্ভিত! তার সর্ব্বাঙ্গ ধুলোয় ভরে গেছে! আমার বাড়ীতে স্নান করে খেয়ে দেয়ে যখন সে বাড়ী গেল তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। যাবার সময় সে বল্লে—শাবলটা মাঝ পথে ফেলে এসেছি, কাল সকালেই আবার সেটাকে আনতে যেতে হবে।

যখন সমালোচক ছিলুম, তখন সাধারণে আমাকে চিনত বটে, কিন্তু পত্রিকা-সম্পাদকদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়-নি। প্রত্নতাত্ত্বিক হওয়ার কিছুদিন পরেই তিন চারটি প্রধান প্রধান মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা, কারো কারো সঙ্গে আত্মীয়তাও জন্মে গিয়েছিল। আমি সুপারিশ করে যখন সুরেশের "সেকালের বরাহ" প্রবন্ধ পাঠিয়েছি, তখন আর কথা আছে! পরের মাসেই একখানা প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রে সুরেশের প্রবন্ধ প্রকাশিত হোলো।

ছাপার অক্ষরে নাম দেখে সুরেশের উৎসাহ দশগুণ বেড়ে গেল। সে একদিন কলেজের ছুটির পর আমাকে

জানালে—স্যর, আজ রাত্রি দশটার সময় আপনি ঠিক হোয়ে থাকবেন, আমি আর বিশে আপনার ওখানে যাব, তার পর চৌপায়া মায়িকে তুলে আনার বন্দোবস্ত করতে হবে।

চৌপায়া মায়ি সম্বন্ধে প্রবন্ধ আমার লেখা হয়ে পড়েছিল, কেবল ছবির জন্য সেটা কাগজে দেওয়া হচ্ছিল না। তার কথা শুনে আমার ভরসা হলো যে, এতদিনে আর একটা বড় রকম প্রবন্ধ বেরোবার সুবিধা বুঝি লাগে।

রাত্রি দশটার সময় আমার দুই সাকরেদ এসে উপস্থিত। দুজনের হাতে দুটো বড় শাবল। বিশ্বনাথের বাড়ীতে শাবল ছিল না, প্রত্নতত্ত্ব শিখতে হলে প্রত্যহ যে শাবলের প্রয়োজন হয়, এ কথা সুরেশ আমার সামনেই দু-তিন দিন তাকে বলেছিল। নতুন উৎসাহে সে তিন হাত লম্বা একটা শাবল কিনে ফেলেছে।

রাত্রি প্রায় দেড়টা অবধি তিনজনে মিলে চৌপায়া-মায়ির চারিদিকে পগারের মত চওড়া এক গর্ত্ত কোরে ফেললুম, তবুও তাকে একটু নড়াতে পারলুম না। অনেক কষ্টে প্রায় দু-হাত গর্ত্ত খোঁড়ার পর চৌপায়া-মায়িকে একটু নড়ানো গেল। কিন্তু আমাদের সাধ্য কি যে সে মূর্ত্তি সেখান থেকে তুলে আনি! ঠিক হলো, কাল রাতে বিশ্বনাথদের ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে চারজনে মিলে মূর্ত্তিটা বাড়ীতে আনা হবে। সেদিন রাতে বাড়ী ফিরে হাতের তেল-সিঁদুর তুলতে রাত প্রায় ভোর হয়ে গেল।

পরদিন সন্ধ্যার একটু পরে নিমক-মণ্ডির ভিতর দিয়ে বাড়ী ফিরছি এমন সময় দেখি যে, চৌপায়া মায়ির চারিদিকে বিস্তর লোকের সমাগম হয়েছে। চারিদিকে আলো, মূর্ত্তির ওপরে একটা লাল রংয়ের চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। সে মহল্লার যত মেয়ে-পুরুষ মিলে সেখানে গান গাইছে, মহা-ধুমধাম করে পূজোর যোগাড় হচ্ছে। ব্যাপার কি! একটু সন্ধান নিয়ে জানলুম যে, মায়ি কি জন্য নারাজ হোয়ে কাল রাত্রে এখান থেকে উঠে চলে চার পায়ে দৌড় দিয়েছিলেন, এমন সময় সদাশিব পাঁড়ে তাঁকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে তাঁর একখানি পা জড়িয়ে ধরে। মা আর কিছুতেই ফিরবেন না, শেষকালে তিনি সদাশিবকে বল্লেন যে,—তুই যদি আমার রোজ সেবা করিস্, তবেই আমি থাকব, নইলে—

সদাশিবের কথায় তিনি ফিরে এসেছেন। আজ রাত্রি বারোটার সময় মহা ধুম করে তাঁর ক্রোধ-শান্তির জন্য পূজো হবে। মুন্সী নন্দাপ্রসাদ সদাশিবকে একটা মন্দির করবার টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছে। বুঝলুম যে, চৌপায়া মূর্ত্তির প্রবন্ধখানা আরও কিছুদিন বাক্সে চাপা রইলো।

এদিকে সুরেশের প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়ার পর থেকে আমার শিষ্যদ্বয়ের উৎসাহ দিন দিন বাড়তে সুরু করল। বিশ্বনাথ "বৈদিক যুগের কালী পূজা" নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে নিয়ে এল। সেটা ছাপাও হয়েছিল। রোজ তারা সহর চুঁড়ে যত সব মূর্ত্তি তুলে নিয়ে এসে আমার বাড়ীতে পুরতে লাগল। বাড়ীটা একটি ভাঙা মূর্ত্তির আস্তাবল হোয়ে উঠলো। আমার বসবার ঘর, রান্নাঘর খাবার ঘর, এমন কি শোবার ঘরের খাটখানি ছাড়া আর সমস্ত জায়গায় মূর্ত্তি—ভাঙা মূর্ত্তি। সুরেশ আর বিশ্বনাথ নিত্য নূতন প্রবন্ধ লিখে আনে, তাদের প্রবন্ধ লেখার ঠেলায় আমার প্রত্নচর্চ্চা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে উঠলো।

সেদিন শরীরটা ভাল ছিল না বলে সন্ধ্যের সময় কোথাও যাই-নি। রাত্রি প্রায় দশটার সময় শোবার জোগাড় করছি এমন সময় বিশ্বনাথ ও সুরেশ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির।

সুরেশ বল্লে—স্যর, কাজ হাসিল, চৌপায়া মায়িকে নিয়ে এসেছি।

আমি লাফিয়ে উঠে বল্লুম—কোথায়—কোথায়?

—বাইরে গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে!

গরুর গাড়ীর নাম শুনে আমি একটু দমে গেলুম।

সুরেশ আবার বল্লে—কিছু ভয় নেই স্যর। মুসলমানের গাড়ী, তাও দেহাতি; কি কাজে সহরে এসেছিল, আজ রাতেই ফিরে যাবে।

তাদের কথা শুনে একটু আশ্বস্ত হওয়া গেল, তারপর চারজনে মিলে চৌপায়া মাম্মিকে কোনো রকমে নিয়ে গিয়ে শোবার ঘরে রাখা হোলো।

পরদিন সকালে বিশ্বনাথ এসে বল্লে যে, কাল সারা রাত জেগে সে চৌপায়া সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছে কোনো কাগজে ছাপিয়ে দিতে হবে।

আমি বিশ্বনাথকে বলে দিলুম - দেখো, সামনে পরীক্ষা; এখন কয়েকমাস প্রবন্ধ লেখা-টেখা ছেড়ে দিয়ে পড়া শুনায় মন দাও গে !

বিশ্বনাথ মনমরা হয়ে চলে গেল।

সেদিন নিমক মণ্ডীতে গিয়ে যে দৃশ্য দেখেছিলুম তা কখনো ভুলবো না। মুর্ত্তিটা যেখানে ছিল সেখানে একটা বিরাট গর্ত্ত হাঁ করে রয়েছে, আর তারই চারদিকে পল্লার যত লোক ঘিরে বসে বুক চাপড়াচ্ছে, আর চেঁচাচ্ছে—হা মাম্মি—হা মাম্মি—

সকলের মুখে একটা ত্রস্ত ভাব, কি যেন কি একটা ভয়ানক সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে।

ফোটোগ্রাফগুলি তখনো ডেভেলপ্ করা হয়-নি বলে সেখানে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা হলো না।

চৌপায়ার প্রবন্ধ বেরিয়ে গেল। হাতে আপাততঃ কোনো কাজ নেই। মনে করেছি এবার কিছুদিন বিশ্রাম নেব; এই রকম একটা সময়ে কোথা থেকে অনাসৃষ্টির অনিদ্রা রোগ এসে আমায় বড় কাতর করে ফেল্লে। সারা রাত বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করতে হয়। শেষ রাত্রে ঘুম আসে, একেবারে বেলা নটার আগে সে ঘুম ভাঙে না।

একদিন, রাত্রি তখন প্রায় দেড়টা, কিছুতেই ঘুম আসছে না। নানা রকমের বিদ্‌ঘুটে চিন্তায় মাথা গরম হয়ে উঠেছে। শুয়ে থাকা অসম্ভব মনে হওয়ায় বিছানা ছেড়ে উঠে বাতিটা জ্বালিয়ে ফেল্লুম। তারপর মাথায় একটু হিমসাগর তেল মালিস করব মনে করে খাট থেকে যেমন নামতে গিয়েছি, আর দেখি—সর্ব্বনাশ !!!

বেশ স্পষ্ট দেখলুম যে, আমার প্রধান সাকরেদ সুরেশচন্দ্রের সেকালের বরাহ কুলুঙ্গী থেকে নেমে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে !

চোখের সামনে দিয়ে যেন এক সঙ্গে দশ-বারোটা তারাবাজি খেলে গেল। চোখ দুটো বেশ করে রগড়ে আবার চেয়ে দেখলুম। বরাহ অবতার আমার দিকে একবার আড়নয়নে চেয়ে একটু মুচ্‌কি হেসে ঘাড়টা অন্য দিকে ফিরিয়ে ল্যাজ নাড়াতে লাগ্‌ল।

শুয়ারের মুখে মানুষের হাসি যে কি রকম মানায় তা যে না দেখেছে তাকে সে কথা বোঝানো যাবে না। ভয়ে আমি খাটের এক কোণে সরে গেলুম। কিন্তু একটু পরেই দেখি, বরাহ অবতার খাড়া হয়ে আমার খাটের ওপরে দুটি পা তুলে দিলেন।

ব্যাপার ক্রমেই সঙ্গীন হোয়ে উঠছে দেখে আমি একটু সাহস করে এগিয়ে গিয়ে বল্লুম—বাবা বরাহ অবতার, দীনের ওপর আজ এ কি অনুগ্রহ আপনার—

আমার কথা শেষ হতে না হতে বরাহ মহাশয় তর্জ্জন করে উঠলেন—চোপরাও ইউ শুয়ার, আমায় বরাহ বলা ! বরাহ তুই, তোর—

ওঃ বাবা ! এ আবার কথা কয় যে ! কুমোরের চরকীর মতন মাথা ঘুরতে লাগলো। ঢোঁক গিলতে গিয়ে দেখি, গলার মধ্যে যেন করাতের গুঁড়ো ঠাসা। নেমে গিয়ে যে এক ঢোঁক জল খাব তারও উপায় নেই, বরাহ মহাশয় পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি কাঁপতে কাঁপতে বল্লুম—তবে আপনি কে ?

বরাহ বল্লেন—সেটে বুঝিয়ে দেবার জন্যই এত কষ্ট করে ঐ কুলুঙ্গী থেকে নেমে এসেছি। তুমি কাগজে আমার ছবি ছাপিয়ে তার নীচে বরাহ লিখেছ কেন ? জানো, আমি কে ?

আমি হাত জোড় কোরে বল্লুম—আজ্ঞে, আপনি ভুল করছেন, সে প্রবন্ধ আমি লিখি-নি। কলেজের একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া লিখেছে, তার নাম সুরেশ চক্রবর্ত্তী। তার বাড়ীটা দেখিয়ে দেবো ?

—তোমার ভরসা না পেলে সুরেশের সাধ্যি কি যে আমায় অপমান করে ! দেখবে, আমি কে ?

এই কথা বলে সে তড়াক করে লাফ মেরে হাত-পাঁচেক দূরে ছটকে গেল। আর একটু হলেই তার পায়ের চাট্ লেগে আমার দেড়শ টাকার আয়নাখানাই চুর হোয়ে যেত।

আমি বল্লুম—আজ্ঞে, আপনার চেহারা দেখে তো বরাহ বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু হালচাল দেখে মনে হচ্ছে আপনি ষাঁড়—

—ষাঁড় নয়, বৃষ। শুনবে আমার আওয়াজ—

এই বলে সে মিনিটখানেক ধরে একটি ছোট্ট হাঁক ছাড়লে।

আমার মনে হলো যেন ঘরের মধ্যে দুটো মানোয়ারী জাহাজ খানিকক্ষণ পাল্লা দিয়ে গলা সেধে নিলে। গলার আওয়াজের ধমক সামলে উঠতে না উঠতে বৃষ অবতার বল্লেন—দেখবে আমার গুঁতোর জোর?

এই বলেই সে ছুটে গিয়ে ঘরের দেওয়ালে একটা ঢুঁ মারলে।

তার ঢুঁর জোরে সমস্ত বাড়ীখানা কেঁপে উঠল। ঘরের মধ্যে আরও শতখানেক মূর্ত্তি সাজানো ছিল, ঘরখানা কেঁপে উঠতেই মূর্ত্তিগুলো খিল্ খিল করে হেসে এক অদ্ভুত ভাষায় কথা-বলাবলি করতে লাগলো।

তারা একটু চুপ করলে বৃষ মহাশয় বল্লেন—আমার কি ইচ্ছে করছে জান?

—আজ্ঞে না।

—আমার ইচ্ছে করছে যে, তোমার নাকে এমনি জোরে একটা ঢুঁ লাগাই। অনেকদিন গুঁতোগুঁতি করা হয়-নি।

বৃষের প্রস্তাব শুনে আমি কেঁদে ফেলে বল্লুম—দোহাই আপনার। ঐ ইচ্ছেটি সম্বরণ করুন। আপনাকে খুসী করবার জন্য যা করতে বলবেন, তাই করব।

আমার চোখের জল দেখে বোধ হয় ষাঁড়ের প্রাণটা একটু নরম হলো। সে বল্লে, আচ্ছা আজ ঘুমোও। আমি একটু চিন্তা করে দেখে যা ব্যবস্থা হয় তাই করবো।

এই বলে সে এক লাফে কুলুঙ্গীতে চড়ে বসল।

আমি বল্লুম—একটা বালিশ দেবো কি?

সে কোন কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লো।

তখন প্রায় সকাল হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে বাইরে একটু ঠাণ্ডা বাতাসে এসে দাঁড়ালুম গা দিয়ে তখনো কাল ঘাম ছুটছে। সকাল হতে না হতে স্নান করে একেবারে সুরেশের বাড়াতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তাকে বল্লুম—ওহে আমার দেশ থেকে কয়েকজন লোক আসবেন, মূর্ত্তিগুলো দিন-কতক তোমার এখানে রাখবার সুবিধা হবে?

সুরেশ বল্লে, তার ওখানে রাখবার সুবিধা হবে না। তবে সে আশ্বাস দিয়ে বল্লে যে, বিশ্বনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে নিশ্চয় এ বিষয়ের একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে।

দুপুর বেলা সেদিন আর কলেজে যাওয়া হলো না, পেটে চারটি ভাত পড়তে না পড়তেই চোখ ঝিমিয়ে এল। কিন্তু ঘুমিয়েই কি নিশ্চিন্ত হবার যো আছে! ঘুমোতে না ঘুমোতে স্বপ্ন দেখি, বৃষ মহাশয় আমার নাকটি তাগ্ কোরে ছুটে আসছে, আর অমনি ধড়মড় করে উঠে বসি।

দুপুরটা তো এই কোরে কাটল। সন্ধ্যার সময়ও বাড়ী থেকে বেরোতে পারলুম না, যদি সুরেশ ও বিশ্বনাথ এসে আমাকে না পেয়ে ফিরে যায়! কিন্তু কোথায় বা বিশ্বনাথ, আর কোথাই বা সুরেশ। অনেক রাত অবধি তাদের জন্য অপেক্ষা কোরে খেয়ে-দেয়ে যখন গিয়ে শুলুম, মাথার কাছের ঘড়িটাতে তখন এগারোটা বাজলো। সেদিন আর বাতি নেবানো হবে না ঠিক করে বাতিটা জেলেই চোখ বুজিয়ে পড়ে রইলুম।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, কিসের একটা আওয়াজ শুনে চট্কা ভেঙে গেল। দেখি, বিশ্বনাথের বৈদিক যুগের কালী তাক্ থেকে নেমে ঘড়িটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন!

কালীকে নামতে দেখে তো আমার আত্মাপুরুষ খাঁচা-ছাড়া হবার উদ্যোগ করলে। তিনি খানিকক্ষণ ঘড়ির দিকে চেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কি হে?

—আজ্ঞে ওটা ঘড়ি।

দেখলুম বৈদিক যুগের কালীর মেজাজটা বৃষের মতন অত কড়া নয়। তিনি আর কোন কথা না বলে ঘরের

মধ্যে এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সে রাত্রে আর কোনো উৎপাত হয়-নি বটে, কিন্তু উৎপাতের ভয়ে সারা রাত্রি জেগে থাকতে হয়েছিল।

পরদিন কলেজে সাতদিনের ছুটি চেয়ে এক দরখাস্ত দিলুম। কলেজের ছুটি মঞ্জুর হলো। দু-তিন দিন কেটে গেল, অথচ মূর্ত্তিগুলোকে সরাবার কোনো বন্দোবস্ত করতে পারলুম না। এদিকে রোজ রাতে তারা তাক্ থেকে নেমে এসে ঘরময় নৃত্য করে। মধ্যে মধ্যে বুদ্ধ মহাপ্রভু আমার নাকের উপর চুঁ লাগিয়ে গুঁতোগুঁতির সখ মেটাতে চায়। রাত্রে ঘুম হয় না, দিনে বা যদি একটু ঘুম হয়, তা স্বপ্ন দেখতে থাকি যে, মূর্ত্তিগুলো সব আকাশে উড়তে আরম্ভ করেছে; আর মধ্যে মধ্যে গোঁৎ খেয়ে আমার মাথার উপর পড়বার উপক্রম করছে। এর ওপরে সুরেশ ও বিশ্বনাথ এমন ডুব মারলে যে, বাড়ীতে গিয়েও তাদের পাত্তা পাওয়া মুস্কিল হলো। বিপদের কথা কাউকে বলবারও জো নেই, আত্মহত্যা করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই এমন অবস্থা দাঁড়াল—

বিপদ যখন আসে তখন সে তার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবকেও ডেকে নিয়ে আসে। একে আমার এই বিপদ তার উপরে আমার বাড়ীওয়ালা জোয়ালাপ্রসাদ এসে একদিন বল্লে—তার বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে, দেহাত থেকে তার কয়জন জাতভাই এসে সেখানে থাকবে।

মূর্ত্তিগুলো যখন বাড়ীতে এনে পুরেছিলুম তখন বাড়ী ছাড়ার কথা একবারও মনে হয় নি। এখন এগুলো বার করি কি করে!

যা থাকে কপালে মনে করে চুপচাপ বসে রইলুম। ওদিকে বাড়ীওয়ালা রোজ এসে কড়া তাগাদা দিয়ে যায়, শেষকালে আমি তার সঙ্গে দেখা করা পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিলুম।

সেদিন বোধ হয় শনিবার; কলেজ বন্ধ। সারা রাত্রি মহাপ্রভুর খোসামোদ করে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা উঠে দুটি কাপ চা খেয়ে সবে বসেছি, এমন সময় সুরেশ ও বিশ্বনাথ এসে হাজির! তাদের দেখে তো আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল! আমি টেবিল চাপড়ে চীৎকার করে উঠলুম—রাস্কেল, এই তোমাদের গুরুভক্তি—

তারা কাঁচুমাচু হোয়ে বল্লে, দিনকতকের জন্যে ক'জন বন্ধু মিলে বিন্ধ্যাচল বেড়াতে গিয়েছিল। আজ সকালে ফিরেছে। এখানে এসেই তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

আমি তাদের সমস্ত ব্যাপার খুলে বল্লুম—বাবা তোমাদের গুরুকে যদি প্রাণে বাচাতে চাও তা হলে শীগ্‌গির একটা উপায় কর, নইলে—

ঠিক এই সময় তিন-চার জন লোক আমার বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। তাদের মধ্যে একজন বল্লে—শিশির বাবু কার নাম?

—আমার, কি চাই আপনার?

—আপনার বাড়ীওয়ালা আপনার নামে নালিশ করেছিল। আমরা কোর্টের পেয়াদা, আমরা আপনার জিনিষপত্র রাস্তায় নামিয়ে দেব। তারপর আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে সে সব নিয়ে যেতে পারেন। এই আদালতের হুকুম।

কাছারির লোকের সঙ্গে বাক্যব্যয় করা বৃথা। তারা তখুনি কাজে লেগে গেল। দশ-বারোটা মুটে মিলে আমার জিনিষপত্র রাস্তায় নামান হোতে লাগলো। পাথরের মূর্ত্তিতে গলি ভরে উঠল।

পেয়াদা দেখে সুরেশ একটু আসি বলে সরে পড়েছিল, বিশ্বনাথ তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে। এমন সময় ছুটতে ছুটতে সুরেশ এসে বল্লে—স্যর, সর্ব্বনাশ হয়েছে, পালিয়ে আসুন।

—ব্যাপার কি?

—ব্যাপার পরে শুনবেন, বলে সে আমার হাত ধরে একেবারে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা পর্দ্দা-ঢাকা একায় তুলে বল্লে—জোরসে চালাও।

সুরেশের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সে বল্লে—সর্ব্বনাশ হয়েছে, রাস্তায় চৌপায় মান্দির মূর্ত্তি দেখে কে গিয়ে নিমক্ মণ্ডিতে খবর দিয়েছে, সেখানকার লোকেরা লাঠি নিয়ে এদিকে ছুটে আসছে,—আমি দেখে এলুম।

—এাঁ, বল কি!

আমার মাথার ভেতর কেমন করতে লাগলো, বসে থাকতে পারলুম না; সেইখানেই শুয়ে পড়লুম

ওদিকে নিমকমণ্ডির লোকেরা মার-মার করে এসে চৌপায়া মূর্ত্তি তুলে নিয়ে চলে গেল। সহরের গুণ্ডারা সেই সুবিধায় আমার সমস্ত জিনিষ-পত্র লুঠে নিলে। তারা যেখানে সেখানে বাঙালীদের দেখ্-মার কর বেড়াতে লাগলো।

মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথ আর সুরেশ খবর আনতে লাগলো। এক-একটি সংবাদ যেন এক-একটি কামানের গোলা। তারা এসে বল্লে—স্যর, বদমাইসগুলো আপনাকে খুন করবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইতিমধ্যে পুলিশের সঙ্গে এক জায়গায় বদমাইসদের একটা বড় রকমের দাঙ্গাও হয়ে গেল। সন্ধ্যে-নাগাদ সহরে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অনেক বাঙালী সহর ছেড়ে নৌকো কোরে লম্বা দিলেন।

সন্ধ্যা অবধি সুরেশদের বাড়ীতে থেকে হিন্দুস্থানীর পোষাক পরে আমি সেই রাত্রেই কলকাতা পালিয়ে এলুম।

কলকাতায় এসেও নিশ্চিন্ত হবার যো নেই। সেখান থেকে ওয়ারেণ্ট এসে আমায় ধরে নিয়ে গেল। মূর্ত্তি চুরি করার অপরাধে আমার বিরুদ্ধে মস্ত মামলা রুজু হলো। বিচারের ফলাফলটা আর শুনে কাজ নেই, তবে এইটুকু শুনলেই হবে, চাকরী কোরে যা কিছু পুঁজি করেছিলুম মকদ্দমার খরচ চালাতে তা বেরিয়ে গেল, উপরন্তু চাকরীটাও গেল।

চাকরী আবার পেয়েছি। দু-পয়সা পুঁজিও হয়েছে, তবে সাহিত্যচর্চ্চা আর করছি না। সুরেশ আর বিশ্বনাথের নাম এখন দেশের সবাই জানে। তারা দুজনেই প্রত্নতত্ত্ব-বারিধি উপাধি পেয়েছে।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

বিবাহচ্ছেদ ও নারী-স্বাতন্ত্র্য

বিলাতে divorce-এর সর্ত্তে মেয়েরা সাম্যের দাবী করায় তাহার বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তি সম্প্রতি কাগজে দেখা গেল।* এ বিষয়ে প্রথমেই বলিতে হয় যে, মেয়েদের মধ্যে যাঁহারা আপনাদের ও সমস্ত মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্য সত্যই চিন্তা করেন,—বিবাহকে হাল্কা করিয়া ফেলা কখনই তাঁহাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ইহার গুরুত্ব, মর্য্যাদা ও উন্নত আদর্শ রক্ষার উপর মনুষ্য-সমাজের উন্নতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে কতটা নির্ভর করে,—তাহা তাঁহারা পুরুষদের অপেক্ষা বেশীই অনুভব করিয়া থাকেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বিবাহ যখন নরনারী উভয়কে লইয়া—তখন দুইপক্ষেই ইহার সর্ত্ত ও দায়িত্ব সমান থাকিলেই সে সম্পর্ক রক্ষা হওয়ার বেশী সম্ভাবনা বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। নতুবা একপক্ষে তাহা হাল্কা রাখিলে সেই পক্ষ তাহার সুবিধা লইয়া অন্যকে সহজেই বিপন্ন করিতে পারে,—বিশেষতঃ সে পক্ষ আবার স্বভাবতঃই প্রবল হইলে তাহাতে যে কতটা অবিচার হওয়া সম্ভব, বর্ত্তমান বিবাহ-প্রথায় তাহা কি সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে না?—এই বৈষম্যের ফলে পুরুষের ব্যভিচার কি রকম প্রশ্রয় পাইতেছে ও তাঁহাদের নিষ্ঠা যে তাঁহাদের দেশে প্রায় কথার কথায় দাঁড়াইয়াছে, ইহা দেখিয়াও সকলে বিবাহের মর্য্যাদা রক্ষার নামে কি করিয়া যে ইহার সমর্থন করেন বোঝা কঠিন।

যাহা হউক, এখন ইহার যুক্তিগুলির আলোচনা করা যাক : -

সম্প্রতি কোন নারী বিশেষ বিপজ্জনক পাগল, খুনে স্বামীর হাত হইতে divorce এর সাহায্যে উদ্ধার পাইবার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় বলা হইয়াছে যে, ইহা তাঁহার পক্ষে যতই কষ্টকর বলিয়া "বোধ" হউক,—নারীর সংখ্যাধিক্য-হেতু বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিলেও যখন তাঁহার বিবাহ বাজারের ভিড় আর একটু বৃদ্ধি করা ভিন্ন কোনই লাভ

* Statesman—জানুয়ারী—রবিবার সংখ্যা—Divorce Reform marriage a stabiliser of society নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইত না, তখন ইহাতে ক্ষতি কিছুই নাই।—কিন্তু আবার বিবাহ করামাত্রই তাঁহার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্য নাও হইতে পারে। ঐ রকম অবস্থার অকথ্য দুর্গতি হইতে মুক্তি ও আত্মসম্মান রক্ষাও তাহার কারণ হওয়া সম্ভব। আর এ রকম বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও যদি তিনি পুনর্বিবাহে কৃতকার্য্য হন, তাহা ত তাঁহারই গুণের পরিচয়। তাঁহার বিবাহ দেওয়ার ভার ত আর কেহ লইতেছেন না। সুতরাং কেবল নারীর সংখ্যাধিক্যের জন্য কাহাকেও বলপূর্ব্বক ঐ রকম দুর্গতির মধ্যে বদ্ধ রাখা যাইতে পারে না। স্বতন্ত্র থাকার ব্যবস্থা দ্বারা ইহা কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে বটে, -কিন্তু তাহাতেও নানা দোষ, অসম্পূর্ণতা আছে।

২। তার পর বলা হইয়াছে যে বিবাহ-নিয়মের দোষ নয়, প্রাকৃতিক নিয়ম-বশেই নারীর সংখ্যাধিক্য হেতু পুরুষ বহুবিবাহ করিলে মাত্র সকল নারীর স্বামী লাভ সম্ভব কিন্তু কোন মতে "স্বামীলাভ" মাত্রই ত আর নারীর জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যতমদেরও যখন ওরূপভাবে "স্বামী লাভ" করিতে ইচ্ছা হইবার কথা নয়—তখন তাঁহাদের বাদ দিয়া অযোগ্যদের কোনমতে স্বামী জুটাইয়া দেওয়া মাত্র ইহার দ্বারা চলিতে পারে। কিন্তু আরও নানারকম জটিল সমস্যার কথা ছাড়িয়া দিলেও বিবাহের উচ্চ আদর্শ রক্ষার স্থান ইহাতে কোথায়? এই সংখ্যাধিক্য দ্বারা বরং ইহাও কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে যে সভ্যতার উন্নতির মধ্যে মেয়েদের ভিতর যোগ্যতমেরাই যাহাতে মাতৃত্বের জন্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, তাহার সুবিধা হওয়া আবশ্যক। এবং সেইজন্যই প্রধানতঃ তাঁহাদের দেশের বর্ত্তমান বিবাহপ্রথারও অনেক সংস্কার, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি হওয়া প্রয়োজন। কারণ ইহা তাঁহাদের অনুকূল নয়। আর মনুষ্যসন্তানের জন্ম ও লালন-পালনের দায়িত্ব যখন সভ্যতার উন্নতির সহিত বাড়িয়াই চলিতেছে, তখন অন্য নারীদেরও নানা রকমে তাহার সাহায্য করা আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। শারীরিক [illegible]ত্বই স্বীকার করিতে গেলে তাহা সব সময় যথোপযুক্ত [illegible]বে করিয়া উঠা সম্ভব নয়। সর্ব্বোপরি যুদ্ধবিগ্রহমূলক লোভ-হিংসাবিদ্বেষাদি-প্রধান রাষ্ট্র-সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে নারী-চরিত্রের সার সত্যের আদর্শানুযায়ী প্রেম মৈত্রী, সহিষ্ণুতা ইত্যাদির অনুকূল ভাবের উপরেই যে ক্রমে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত, এই নারী-সংখ্যাধিক্যে তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

এই সূত্রে আর একটা কথাও এখানে মনে না আসিয়া পারে না। ইয়োরোপে নারীর সংখ্যাধিক্যের জন্য তাহাদের অনেক রকম দুর্গতি এমন কি পুরুষের নানারকমের বহু বিবাহের কথাও উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে পুরুষেরই সংখ্যাধিক্য সত্বেও তাঁহাদের বহু বিবাহ প্রচলিতই আছে। তাহার উপর বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ! মেয়েদের সংখ্যার অল্পতাই আবার আমাদের দেশে তাঁহাদের বিবাহ বাধ্যতামূলক হওয়ার কারণ বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে পুরুষ-সংখ্যার অল্পতা সত্বেও তাঁহাদের বিবাহে অবশ্য-বাধ্যতা নাই। (নারী-সংখ্যার অল্পতার মধ্যেও বহুবিবাহ রাখিতে হইলে বিবাহ তাঁহাদের ইচ্ছাধীন থাকিলে তাঁহারা তাহাতে সম্মত না হইতে পারেন বলিয়াও কি তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হওয়ার অবশ্যকর্ত্তব্যতার এত ধর্ম্মানুশাসন, এবং তাঁহাদের বিবাহেই জাতি বিচারের কঠোরতর ব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা তাহা এত কঠিন করিয়া রাখা হইয়াছে? মেয়েদের সম্বন্ধে শুচিবায়ু ও জাতিভেদই অবশ্য এস্থলে প্রধান কারণ বটে)। সুতরাং নরনারীর সংখ্যামাত্র কোনরকম বিবাহ-নিয়মের কারণ নয় দেখা যাইতেছে। নারীর অবস্থাগুণে তাঁহাদের সংখ্যার আধিক্য বা অল্পতা কিছুই তাঁহাদের দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তবে তাহার সমতাই যে বিবাহের উন্নত আদর্শরক্ষার অনুকূল, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রসঙ্গটাতে বহুবিবাহের সমর্থন না থাকিলেও এ সম্বন্ধে সম্প্রতি বড় বড় লোকদের নানা কথা বলিতে শুনিয়াই এত কথা বলিতে হইল।

আর পশ্চিম-ইয়োরোপের এই নারী-সংখ্যা-বৃদ্ধি কি বাস্তবিকই একেবারে অনিবার্য্য!—পৃথিবীর নানা দেশ আধিপত্য বিস্তারের জন্য তাঁহাদের পুরুষদেরই অধিক সংখ্যায় বিদেশে যাওয়া ইহার একটা কারণ। নারীর মুক্তির সহিত

তাঁহারাও সমান সংখ্যায় (আপাততঃ বেশীই উচিত,—কারণ, এখন ঐ সকল দেশে নারীসংখ্যার অল্পতার জন্য আবার নানা দুর্নীতির সৃষ্টি হইতেছে !) ঐ সব দেশে যাইতে আরম্ভ করিলে ইহার কতক প্রতিকার হইতে পারে। তাহার পর বিগত যুদ্ধ এবং বরাবরই নানারকম যুদ্ধবিগ্রহে পুরুষের মৃত্যুও ইহার জন্য কম দায়ী নয়। শিশুর মৃত্যুর মধ্যে বালকের সংখ্যাধিক্য আর একটী কারণ। তাহার প্রকৃত কারণ ও প্রতিষেধের উপায় আবিষ্কারের দ্বারা ইহাও অনেকাংশে নিবারিত হইতে পারে। বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে সন্তানের জাতি-নির্ণয় মানুষের ইচ্ছাসাধ্য হওয়ারও যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহার সাহায্যেও ইহার প্রতিকারের আশা আছে। তার পর পুরুষের আত্মপ্রশ্রয়ের ফলে তাহাদের যে স্বল্পায়ুত্ব ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে,—তাহাও নিবার্য্য।

বিবাহচ্ছেদ বা স্বতন্ত্র হওয়ার পূর্ব্বে পাদরীদের সহিত পরামর্শ করার প্রস্তাবটী অবশ্যই খুবই ভাল ও সমর্থনযোগ্য। —কেবল পাদরী কেন—পতি-পত্নী উভয়কেই এ বিষয়ে সহৃদয়, বিচক্ষণ, যথার্থ শুদ্ধধর্ম্ম-পরায়ণ, পক্ষপাতশূন্য নরনারীর পরামর্শ ও উপদেশ লওয়ার সুবিধা দেওয়া আবশ্যক।

তার পর কতকগুলি ক্ষেত্রে স্ত্রীও দোষী থাকা সত্ত্বেও যেখানে বিবাহচ্ছেদ মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

আইনানুসারে ইহা তাঁহারা পাইতে পারেন না।—এ বিষয়ের অনুসন্ধানের ভার যাঁহাদের উপর, কার্য্যাধিক্য বশতঃ তাঁহারা তাহা ভালরূপে করিয়া উঠিতে না পারাই যে তাহার কারণ, ইহাও বলা হইয়াছে।—আইনরক্ষার ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য্যের জন্য কেহ বঞ্চনা করিবার সুবিধা পাইলে তাহাতে মেয়েদের অপরাধ কি বোঝা কঠিন। পুরুষদের ক্ষেত্রেও কি এরকম ঘটে না?—এরূপ কি অনেক বেশী সংখ্যাতেই যে ঘটিয়া থাকে না, তাহা কি কেহ বলিতে পারেন? মেয়েদের ক্ষেত্রেই যদি ইহার সম্যক্ অনুসন্ধান এত কঠিন হয়, তখন পুরুষদের সম্বন্ধে ইহা যে কি রকম, ভাবিয়া দেখিলেই হয়। তাহার পর ঐ রকম স্ত্রীদের মধ্যে অভিনেত্রীও অনেক আছেন। তবে উভয়ে দোষী হইলেই যে বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়,—এমনও অবশ্য নয়।—ওরূপ বিবাহবন্ধন রাখিয়াই বা কি ফল?—তাহাতে ঐ সম্বন্ধটীর অপমানই করা হয় না কি?—তাহা অপেক্ষা উভয়কেই আপনাপন মনোমত পাত্রকে বিবাহ করার সুবিধা দেওয়াই কি অপেক্ষাকৃত ভাল নয়?

নারীরা এ বিষয়ে সাম্যের দাবী করায় বিদ্রূপ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে, পত্নীর দুশ্চরিত্রতায় যখন পরিবারে অবৈধ সন্তানের আবির্ভাব হইতে পারে,—এবং স্বামীর ক্ষেত্রে যখন তাহার সম্ভাবনা নাই,—তখন একরূপ দাবী হইতে পারে না। হইলেই কি স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতা দূষণীয় বা বিবাহভঙ্গের হেতু বলিয়া পরিগণিত হয় না?—এখন নানারকম প্রতিষেধক উপায়ের দ্বারা ত তাহার ব্যবস্থা সহজেই করা যাইতে পারে;—কিন্তু তাহা হইলেই কি তাহা চলিতে দেওয়া হইবে? আর স্বামীর ক্ষেত্রে ঐরূপ অবৈধ সন্তানটীকে পরিবারের মধ্যে দেখা না গেলেও তাহার অস্তিত্ব থাকা কি সমানই সম্ভব নয়?—পাপ কি কেবল চোখের উপর দেখা গেলেই পাপ,—আড়ালে থাকিলেই সাধু হইয়া যায়? ঐরূপ অবৈধ সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাই বা কোথা হইতে হইবে?—তাহার জন্ম দিয়া পিতা তাহার ভার না লওয়া অন্যায়,—এদিকে তাহার ও তাহার মাতার ভার লইতে গেলেই স্ত্রী ও বৈধ সন্তানদের তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইতেই হইবে—সুতরাং তাহাতে স্ত্রীর ক্ষেত্রে বস্তুগত ক্ষতিও যে কিছু হয় না, এমন নয়। আর ঐরূপ গুপ্ত পাপের ফলে স্বামী যখন কুরোগ আনিয়া সমস্ত পরিবারের ধ্বংস সাধন করেন, তখনই বা স্ত্রীর পক্ষে অবস্থাটি কি রকম দাঁড়ায়?

তার পর স্ত্রীর ক্ষেত্রে শরীর ও অর্থকষ্টকে বিবাহসম্বন্ধের মূলনীতিরও উপরে স্থান দেওয়ার চেষ্টায় বিবাহের কোন উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইতে পারে? স্ত্রী যাহাতে স্বামীর বিশ্বাসভঙ্গ অপেক্ষাও অর্থ ও শরীর-কষ্টকে বড় করিয়া দেখেন,—এই সকল নিয়মের গতি সেইদিকেই

দাঁড়ায় কি?—ইহা কি মনুষ্যপ্রকৃতির বড়ই সাধু ও মহত্ত্ব। মনুষ্যত্বকেই ত ইহাতে খর্ব্ব করিয়া ফেলা হয়। মেয়েরা যে বস্তুগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাইলে আর কিছুই চাহেন না বলা হয়, এইরূপেই ত তাহার সৃষ্টি করিয়া তোলা হয়। আমাদের দেশে স্ত্রী যখন বাজুবন্ধ পাইলে স্বামীকে আবার "বিবাহ" করিবার "অনুমতি" দিয়া থাকেন,—তখনও ইহারই ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মহিমা-গুণেই অনেক গৃহকার্য্যে সাহায্য ও সেবা পাইবার জন্যও স্বামীর "বিবাহ" "দিতে" পারেন। স্বামীরও এই কারণেই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই আপনাকে তাঁহার সম্বন্ধে সকল কর্ত্তব্য হইতে মুক্ত মনে করা সম্ভব হয়।

যে বিরাট পাপের ব্যবসায় মনুষ্য "সভ্যতা"র বুকের উপর বিষাক্ত ক্ষতের মত লাগিয়া আছে, এই দ্বৈতমূলক নৈতিক আদর্শেই ত তাহার সৃষ্টি ও সমৃদ্ধি। পুরুষকে প্রশ্রয় না দিলে ইহার অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। কেবল নারীর পবিত্রতা ও সন্তানের বৈধতা মাত্র চাহিলেও ইহা চলে না,—কারণ কোন নারীকে কলুষিত, হীনতাপন্ন এবং অবৈধ সন্তানের জন্ম-সম্ভাবনা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। এই সকলই একান্ত প্রত্যক্ষ সত্য,—তবু এখনও ইহা লইয়া যে তর্ক করিতে হয় ইহাই বিড়ম্বনা। বড় দুঃখেই নারী ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির ক্ষেত্র ও সুবিধাভাব এবং অন্নকষ্ট ইহার যতই কারণ হউক,—প্রেমের ক্ষেত্রে নরনারীর সম্বন্ধের মূলেই এই এই দারুণ বৈষম্যই যে তাঁহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে উৎসারিত প্রধানতম অভিযোগ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার জন্য ঘরে বাহিরে দুই মূর্ত্তিতে তাঁহার লাঞ্ছনা, এবং আপনারাই আপনাদের শত্রু হইয়া রহিয়াছেন। ইহারই জন্য তাঁহার অমূল্য ভালবাসাও মূল্যহীন হইয়া পদদলিত হইতেছে। এই বৈষম্য না থাকিলে নারী কখনই এত শস্তা হইতে পারিত না, এবং বিবাহে নারীর গরজ না হইয়া পুরুষেরই গরজ বেশী দেখা যাইত। এই জন্যই পুরুষের নিকট অন্নবস্ত্রের দাবী তাঁহার একান্ত ন্যায্য হইলেও তাহার প্রতি তাঁহার ধিক্কার জাগিয়াছে। এত-বড় ব্যাপারটী স্ত্রীর ক্ষেত্রে অবৈধ-সন্তানের জন্ম-সম্ভাবনা দিয়া চাপা দিবার নয়। বিশেষতঃ নারীর যতই স্বাধীনতা লাভ হউক, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে সৎপথে রাখা ও তাহার অন্নপানীয় যাহা জন্য দেওয়া যত সহজ, স্ত্রীর পক্ষে তাহা সম্ভব কি? তাহার উপর রাষ্ট্র সমাজও তাঁহার সাহায্য না করিয়া প্রতিকূল থাকলে তাঁহার অবস্থার কথা কি আর বলবার অপেক্ষা করে? আর "cruelty" কথাটী যদি নামমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তবে ঐ শব্দটি বহন করিবারই বা দরকার কি!—ফেলিয়া দিলেও ত কোন ক্ষতি দেখা যায় না।

দুইপক্ষেরই মহৎ সহিষ্ণুতা (sublime toleration) দ্বারা মাত্রই যে বিবাহ-সম্বন্ধ সম্ভব, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতেই পারে না। তবে মেয়েরা তাহা সত্যই "দুই পক্ষেই" করিতে চাহেন মাত্র। কিন্তু এই সকল দাম্পত্য সম্বন্ধের "উচ্চ-আদর্শ"বাদীরা মুখে ঐ কথা বলিয়া এক পক্ষের উপরেই তাহার ষোল আনা দায়িত্ব ও বোঝা চাপাইয়া তাহার গরজেই মাত্র ঐ সম্বন্ধটীকে বজায় রাখিতে চান। তখন তাহা আর "মহৎ" থাকা দূরের কথা, অতি হীন ও ঘৃণিত ব্যাপারেই পরিণত হয়।

তার পর বলা হইয়াছে, যুদ্ধে যাঁহাদের স্বামী অন্ধ বা বিকলাঙ্গ হইয়া ফিরিয়াছেন, তাঁহারা যদি divorceএর জন্য দৌড়িতেন,—তাহা হইলে কেমন হইত? তাঁহাদের জন্য সকলের অপেক্ষা তাহার কারণ আছে বলিয়া স্বীকারও করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মেয়েরা—তাঁহাদের রুচি যথেষ্ট বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও, এই সকল "উচ্চ আদর্শ" বাদীরা বিবাহ ব্যাপারটা যে চক্ষে দেখেন, এবং তাঁহাদের যেমন ভাবে লইতে অনুশাসন করিয়া থাকেন, ঠিক সেই ভাবে দেখেন না। তাই স্ত্রীর এরকম অবস্থায় তাঁহারা কি করিতেন, তাহারাই ভাবিয়া দেখিতে পারেন—কিন্তু কোন হৃদয়বতী নারীর পক্ষেই এ অবস্থায় স্বামী পরিত্যাগ অসম্ভব। তাই তাঁহারা ইহার জন্য কোন অভিযোগ করেন নাই। তবে যাহার জন্য তাঁহাদের পতিপুত্রের এই অবস্থা এবং আপনাদেরও নানারকমে অশেষ দুর্গতি ঘটে,—সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ইহার প্রতিকারের উপায়ও অবশ্য তাঁহাদের করিতেই হইবে।

মেয়েদের বিবাহকে ঠাট্টার চোখে দেখার কথা আগেই

বলা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা গণনার উপযুক্ত তাঁহাদের যে এ ত নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। একটু খোঁজ করিলেই তাঁহাদের সকলকে এক দলে ফেলিয়া এরকম বক্তৃতা ঝাড়া চলিত না। আর মেয়েদের মধ্যেও সেরকম লোক থাকিলে অপরপক্ষেও তাহার অসদ্ভাব নাই দেখা যাইবে। মেয়েরা "jazz" বিবাহ করিতে চাহিলেই বা তাহা সম্ভব হয় কি করিয়া? বিবাহ কি তাঁহারা একা করিয়া থাকেন? কিন্তু ঐ "jazz" বিবাহ করিবার সুবিধা দুইজনকেই দিয়া তাহার পর কেবল মেয়েদেরই তাহার ফলভোগ করিতে বাধ্য করা, এ কেমন বিচার? বিবাহ বিষয়ে নরনারীর মতের আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? পুরুষদের মধ্যেই যে সকল বিখ্যাত লোকও বিবাহ-নিয়মের পরিবর্ত্তন চাহেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মধ্যেই বড় বড় কথার বহর সত্ত্বেও বিবাহের আদর্শ আরও খর্ব্ব করার দিকেই প্রবণতা দেখা যায়। ইঁহাদের দ্বারা গোঁড়ামির বন্ধন শিথিল হইয়া থাকিলেও তাঁহাদের দেশের বিবাহ-ধারণার মধ্যে "jazz"ভাব প্রবেশ করানোর জন্য ইঁহারাই প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে দু'চার জন (যথা Ellen Key ইত্যাদি) যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা করতালি পাইয়া থাকেন তাঁহারা ভিন্ন কোন চিন্তাশীল মহিলারই এ রকম মত নয়। ঐ সকল লেখিকারাও ইয়োরোপের অন্য প্রদেশের লোক এবং প্রায়ই কুমারী। ইয়োরোপের অন্য প্রদেশের রুচি এ বিষয়ে আরও বিকৃত,—এবং কুমারীদেরও কিছু পত্নীদের গোপন ব্যথা জানিবার কথা নয়। কিন্তু ইহারা ঐ সকল "উন্নতিশীল" পুরুষদের মতেরই প্রায় প্রতিধ্বনি করেন বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হন। আপনাদের মনুষ্য জাতির যথার্থ উন্নতির জন্য চিন্তার দায় যাঁহারা রাখেন, —তাঁহাদের, কি "উন্নতিশীল" কি রক্ষণশীল, সকলের কাছেই নিন্দিত হইতে হয়। তাঁহাদের প্রকৃত মনোভাব খোলাখুলি প্রকাশ করাই সহজ হয় না।

না ভাবিয়া চিন্তিয়া তাড়াতাড়ি বিবাহের ফল ছাড়া গরিব লোকের পক্ষেও divorce আজকাল অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হওয়াও যে তাহার সংখ্যাধিক্যের একটী কারণ তাহা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। Divorce এর সুবিধা যে কেবল ধনী লোকদেরই পাওয়া উচিত, ইহা সম্ভবতঃ তিনিও বলেন না। ধনীরা বরং ঐরূপস্থলে আরও নানারকম উপায়ে তাহার দুর্দ্দশা হইতে কতকটা মুক্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু divorce এর কারণ ঘটা সত্ত্বেও তাহার সুবিধা না পাইলে দরিদ্রের অবস্থাই যে ভীষণতর হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য।—এরকম স্থলে মেয়েদের অবস্থা ভাবিয়া দেখিলেই হয়।

শেষে আপনাদের মুক্তি ও উন্নতিকামী মেয়েদের পাদরীর গলায় যে শাসানো হইয়াছে, তাহাতে বলিতে পারা যায় যে বিবাহসম্বন্ধের প্রকৃত উচ্চাদর্শের মর্ম্ম তাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা বেশীই মনে রাখেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি কি মনে করেন, এই রকম গায়ের জোরে ধমক দিলেই মেয়েরা সুড় সুড় করিয়া ঘরে গিয়া ঘোমটা টানিবেন?—আর পঞ্চাশ বৎসর আগে হইলেও বা এইরকমে তাঁহাদের সনাতন ধ্বংস (eternal perdition অভিশাপ দিয়া রসাতলে পাঠানো চলিতে পারিত। কিন্তু এখন তাঁহারা সত্যই জাগিয়াছেন,—তাঁহাদের বিষয়ে তাঁহাদের উপদেষ্টা ও হিতৈষীগণের জ্ঞানের অভ্রভেদী হিমাচলের মহিমা দেখিয়াও আর তাঁহাদের মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা নাই! অন্যের ন্যায্য মনুষ্যত্বের অধিকার পদদলিত করিয়া স্বভাবতঃ প্রবল হইয়াও যাহারা রাষ্ট্র সমাজের সমস্ত অস্ত্রগুলি নিজেদের মুঠার মধ্যে রাখিয়া দুর্ব্বলের উপর চিরকাল একাধিপত্য বজায় রাখিতে চায়, আর যাহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হইয়াও পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা, বিঘ্ন, নিন্দা, ভয় অতিক্রম করিয়া আপনাদের ও সমস্ত মনুষ্যজাতির কল্যাণ কামনায় ন্যায্য মনুষ্যত্ব লাভের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহাদের মধ্যে কাহার প্রয়াস প্রশংসার্হ, ভবিষ্যতের মানব-জাতি তাহার বিচার করিবে।

তবে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংস্কারের দাস;—তাই সকল মেয়েই ক্ষমার যোগ্য।

বিলাতের "উদোর পিণ্ডি" লইয়া এই মাথাব্যথার কারণ যে, সর্ব্বত্রই তাহা "বুদোর ঘাড়ে" পড়িয়া থাকে।—আর আমাদেরও শিক্ষা ও চিন্তার খোরাক ইহাতে পাওয়া যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গটীতে পাশ্চাত্য সমাজের কথাই আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ইহা প্রকাশ করিতে কিছু ইতস্ততঃ বোধ হইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি ফাল্গুন মাসের "ভারতী"তে একটী "তর্কসভার" বিবরণ দেখিয়া তাহা দূর হইল। আমাদের দেশে নারী-প্রচেষ্টার জন্ম না হইতেই যখন পাশ্চাত্য সমাজের জুজুর ভয় দেখাইয়া তাহা মারিবার চেষ্টা হইতেছে, তখন উহার বিষয়েও আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। তবে "তর্কসভার" উত্তরের জন্য আরও কয়েকটী কথা যোগ করা আবশ্যক।

"তর্কসভার" সভ্যদিগকে প্রথমেই বলিতে হয়, মেয়েদের সম্বন্ধে কোন কথা সত্য আলোচনা করিতে যদি তাঁহাদের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে হিঁদুয়ানীর খোলসটা ছাড়িয়া আসিতে হইবে। স্ত্রীর চরিত্রদোষ ঘটিবামাত্র ("সতীত্ব-নষ্ট" কথাটী কেবল লাঞ্ছনামাত্র কি না, তাহাও স্পষ্ট বোঝা যায় না। যাহা হউক তাহা বক্তার অভিপ্রেত নহে বলিয়াই ধরা যাইতেছে) তাঁহাকে "ত্যাগ" করার জন্য এত অধৈর্য্য,—কিন্তু তিনি পরিত্যক্ত হইয়া কোথায় যাইবেন তাহা কি তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন—এই সব কারণেই ত পতিতার সংখ্যা দেশে এত বাড়িয়া চলিতেছে। পুরুষের চরিত্র-দোষ মানিয়া নারীর সম্বন্ধে এই উচ্চনৈতিকতার অর্থ কি দাঁড়ায়?—যে, আপনারা দূষিত হইতে বা তাহার জন্য অন্য নারীকে দূষিত করিতে ও করিয়া রাখিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। পুরুষের চরিত্রদোষও যে নারীকে কলুষিত না করিয়া চলা অসম্ভব, সে বিষয়ে আগেই বলা হইয়াছে। এমন কি স্ত্রীরও কোন বিচ্যুতি ঘটিলেই তাহাকে সেই অবস্থায় তাঁহারা ফেলিতে পারেন।

স্ত্রী যদি স্বামীকে ঐরূপ স্থলে "ত্যাগ" করিতে না পারেন, এবং তাঁহারও পুনর্বিবাহ করিবার অধিকার না থাকে,— তাহা হইলে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তিনিও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। তবে ন্যায়ধর্ম্মের যিনি ধার ধারেন না, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।—"Might is right" বুলি তাঁহারই কাজে লাগিতে পারে। Morality is enlightened self-interestও যদি হয়, তাহা হইলে ইহা "enlightened"ও নয়, দেখা যাইতেছে।

সমাজে চলাচলই অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা নয়;—যাহা ভাল ও কর্ত্তব্য বলিয়া জানা যায়, তাহা সমাজে চালাইবার চেষ্টা করাই সৎ লোকের কাজ। তবে ইহাও নিশ্চয় বলা যাইতে পারে স্বামী যদি হৈ চৈ রব না করেন, এবং দুজনেই আবার সদ্ভাবে থাকেন, তাহা হইলে সমাজও কিছুই বলিবে না।

"বিচারক" হইবার যে স্পর্দ্ধা করা হইয়াছে, তাহার অধিকার তাঁহাদের কোথায়? তাঁহারা ত বাদী হইতে পারেন মাত্র। এ বিষয়ে "বিজলী"তে যে আলোচনা করা গিয়াছিল তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

'স্বামী বা স্ত্রী, কাহারও একবার পদস্খলন হইলে কিম্বা পূর্ব্বে কোন প্রণয়ব্যাপার (Love-affairs) হইয়া থাকিলে দোষী-পক্ষ যদি দোষ স্বীকার করিয়া যথার্থ অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং তাহার পর ভাল-ভাবে থাকে ও অপর পক্ষকে ভালবাসে, তাহা হইলে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়। কিন্তু ইহাই স্বামী ও স্ত্রী দুজনের বেলাই মনে রাখা উচিত। দোষী-পক্ষকে ভাল করিয়া লওয়ার চেষ্টাও উভয়েরই সমানভাবে করিতে হইবে। এ বিষয়ে স্ত্রীর সম্বন্ধে যে নৃশংসতা হয়, তাহার কথা বলিতেও ঘৃণা বোধ হয়। অনেক স্থলেই কিছুই না জানিয়া না বুঝিয়া, না শুনিয়াও যে সকল কাণ্ড হয়, তাহার উদাহরণ দিতে গেলে মহাভারতেও কুলাইবে না। কিন্তু কাণ্ডা-কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হইবার আগে মানুষ যে বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন জীব, এবং স্নেহ, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি চরিত্র-সম্পদেই যে সে ঐ আখ্যার অধিকারী,—স্বামীর ইহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" কথাটী প্রাচীনেরাও মেয়েদের বাদ দিয়া বলেন নাই।'

তবে সংশোধনের আশা ও সম্ভাবনা না থাকিলে দুই-পক্ষেরই স্বতন্ত্র থাকা উচিত। এবং রাষ্ট্র সমাজবিধির পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত দুই ক্ষেত্রে স্বামীর খরচ দেওয়া কর্ত্তব্য এ বিষয়েও ঐ প্রবন্ধটীতে আলোচনা করা হইয়াছে। "Mutual breach of marriage contract" ইত্যাদির আলোচনা এই প্রবন্ধে আছে।

তাহার পর পাশ্চাত্যদেশের "নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিণতি" কি তাঁহারা তাঁহার চরিত্রদোষেই পাইলেন?—নাটক-নভেলগুলির চিত্রও সমগ্র বা অভ্রান্ত সত্য নয়। আর বর্ত্তমানে সেখানে চরিত্রদোষ যদি বেশী প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে, তাহার প্রধান কারণ "নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য" নয়, বিগত যুদ্ধ।—তাহাতে নারীর চরিত্রদোষ যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে,—পুরুষের তাহা শতসহস্র গুণ বাড়িয়াছে।—একের চরিত্রদোষের এ রকম বৃদ্ধি অপরকে স্পর্শ না করা ত সম্ভব হইতে পারে না। সেখানকার নারীর সংখ্যাধিক্য আর এক কারণ। বেশ্যালয় উঠিয়া যাওয়ায় ঐ সকল স্ত্রীলোক ঘুরিয়া বেড়ানোতেও তাহা আরও চোখে পড়িতেছে। তাহার পর নারী-প্রচেষ্টাব্রতী মহিলাগণ নহেন,—কিন্তু সেখানকার তথাকথিত "উন্নতি"-বাদী পুরুষ সাহিত্যিকদের কথাও বলিতে হয়। তাঁহারা আপনাদের অসংযত বাসনা-তৃপ্তির সকল বাধা দূর করিতে গিয়া কালধর্ম্মানুসারে নারীকেও বাহিরে কিছু সুবিধা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের কল্পনানুযায়ী ব্যবস্থায় নারীর অবস্থা হীনতরই করা হইয়াছে। ইঁহারা অনেকেই ক্ষমতাশালী বিখ্যাত সাহিত্যিক,—সুতরাং ইঁহাদের প্রভাব যথেষ্টই।—অনেক নরনারীকেই ইঁহারা ভুল পথে চালাইতেছেন। ইঁহাদের মতবাদে দৃষ্টিবিভ্রমের পরিচয় ভারতীর "পারিবারিক নারীসমস্যা" প্রবন্ধটীতেও পাওয়া গেল। ঘটিয়া উঠিলে ভবিষ্যতে সে বিষয়ে কিছু নিবেদন করিবার ইচ্ছা রহিল। এই প্রবন্ধেও ইঁহাদের উল্লেখ আগেই করা হইয়াছে।

নারীর প্রকৃত উন্নতিকামীদের এখন তিনদলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। প্রাচীন আদর্শের ভাবপন্থীগণ,—ইঁহারা প্রধানতঃ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকেন। দ্বিতীয়,—ভাবের আবরণ সরিয়া গিয়া যাঁহাদের নগ্নমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে,—সেই সকল বলের আস্ফালনকারীর দল। তৃতীয়,—এই তথাকথিত "উন্নতি"-বাদীরা।—ইঁহাদের লইয়াই সর্ব্বাপেক্ষা মুস্কিল। কারণ নারীর এই দুঃসময়ে তাঁহারা তাহার কতকটা মনুষ্যত্ব স্বীকার করেন,—সুতরাং ইঁহাদের চটাইতে অনেকেই সাহস পান না,—তাহা অপেক্ষাও বেশী লোকে ইঁহাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হন।

আর "নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিণতি" কি তাঁহারা এখনই দেখিতে পাইয়াছেন? আমরাও তাহার অরুণোদয় মাত্র দেখিতেছি। তাহার পর পাশ্চাত্য সমাজে যদি নানারকম ভুল, ভ্রান্তি ঘটিয়াই থাকে,—আমাদের ত তাহা দেখিয়া শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বিশেষ সুযোগই লাভ হইতে পারে। সুতরাং কতকগুলি অপ্রীতিকর ঘটনামাত্র দেখিয়াই "নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিণতি" সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত না করিয়া তাহা যাহাতে আরও সন্তোষজনকরূপে পরিচালিত হইতে পারে,—তাহাই আমাদের চেষ্টাও লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ বিষয়ে ১১ই ফাল্গুনের "বিজলী"তে "নারী প্রচেষ্টা" প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা গিয়াছে। তাহার পর যে নাটক-নভেলগুলি তাহাদের এতটা বিচলিত করিয়াছে, তাহাতেও নারীর চরিত্রদোষ ঘটার কারণ প্রায় সর্ব্বত্রই কি দেখিতে পাওয়া যায়?—কাহার হাত তাহাতে কাজ করিতেছে? "নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য" দ্বারা এ সকলের কবল হইতে আপনাদের উদ্ধার করিয়া যাহারা তাহাদের ঐ রূপ দুর্দ্দশার কারণ, তাহাদের মানুষ করিয়া তোলাও ঐ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

"সীতা-সাবিত্রী"র কথাও আগেই অন্যত্র (বিজলীতে) বলা গিয়াছে। আমাদের আজকালকার সমাজ-ব্যবস্থার কথায় অপ্রিয় সত্যের সম্মুখীন হইলেই হিন্দুশাস্ত্র ও সীতা-সাবিত্রীকে টানিয়া আনা তাঁহাদের অপমান করা মাত্র। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে সীতা-সাবিত্রীকে যদি তাঁহাদের দেখিবার বাসনা থাকে, তবে তথাকথিত "নারী স্বাতন্ত্র্যে"র মধ্যেই তাহার বেশী সম্ভাবনা। যে সকল মহীয়সী নারী নিন্দা ও অপমানের ডালি মাথায় করিয়া আপনাদের ও মানব জাতির কল্যাণকামনায় প্রাণপাত করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেই তাঁহাদের উদ্ভব হইতেছে নিশ্চয়। আর সচ্চরিত্রতা যে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় সদ্‌গুণ, এ বিষয়ে কোন তর্ক আছে বলিয়া ত জানা নাই। সুতরাং তাহার সাফাই গাহিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। তবে ইহা নরনারী উভয়ের পক্ষেই আবশ্যক,—"নারীস্বাতন্ত্র্যে"র দল ইহাই বলিতে চাহেন মাত্র। এ কথাও আগেই বলা হইয়াছে।*

বঙ্গনারী

* এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর কাগজে দেখা গেল, স্বামীর চরিত্রদোষেই স্ত্রী divorce পাইবেন; crueltyর লেজুড় আর থাকা আবশ্যক হইবে না—এই আইন পাশ হইয়াছে।

শিখিবার কলা-কৌশল

৩

একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হইল; অনেক বৎসর অতীত না হইলে, তাহাকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করা নিষ্ফল:.

—বিশ্রামেই সুখ, না, স্বকীয় জীবনকে বর্দ্ধিত করাতেই সুখ?

কিন্তু সে ইহারই মধ্যে কার্য্যতঃ এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে,—অন্ততঃ প্রকৃতি-জননী তাহার হইয়া এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন; কেমন করিয়া করিয়াছেন, শোনো। যখন হইতেই তাহার জীবন আরম্ভ হইল, তখন হইতেই ঐ শিশুটি আত্মবর্দ্ধনের জন্য তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার আত্মবর্দ্ধনের প্রণালীটি কি?—অন্নের দ্বারা আপনার পুষ্টিসাধন করা। সেই সঙ্গে, তাহার জন্মের আরম্ভ হইতেই, বাহ্যজগৎ হইতে কিছু কিছু জিনিস সে আহরণ করিতে লাগিল; উহা নিজ দেহের অন্তর্ভুক্ত ও অঙ্গীভূত করিয়া লইল; এবং যতদিন সে বাঁচিয়া থাকিবে, এই চেষ্টায় বিরাম হইবে না।

মনুষ্য বাহ্যজগতের মূল-উপাদান সকল শোষণ করিয়া লইয়া যে প্রণালীতে স্বকীয় দেহ বর্দ্ধন করে এবং বাহির হইতে আগত জ্ঞান ও অনুভূতিকে আত্মসাৎ করিয়া যে প্রণালীতে স্বকীয় মনের বৃদ্ধিসাধন করে,—এই উভয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

তাই, "মনের পুষ্টিসাধন" এই কথাটি চলিত ভাষায় সচরাচর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হাঁ, এই দুই প্রকার আহারের মধ্যে বেশ একটা তুলনা চলিতে পারে, কিন্তু ভৌতিক আহারের মধ্যে যে কলা-কৌশল আছে, মানসিক আহারের কলাকৌশল অপেক্ষা তাহা সহজে চোখে পড়ে—চট্ করিয়া ধরা যায়। সর্ব্বাগ্রে এই ভৌতিক কল-কৌশলটা কি, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখা যাক্, সম্ভবত, উপমা-সাদৃশ্যের যোগে মানসিক আহারের কল-কৌশলটিও আমাদের নিকট স্বতই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। বিশেষজ্ঞদিগের মতে শরীর পোষণের মূল নিয়মগুলি এই যথা: খাদ্যগুলি বেশ বিচার করিয়া নির্ব্বাচন করা; নিয়মিত ভোজনের সময় এই খাদ্যগুলি বণ্টন করা; খাদ্যের পরিমাণ স্থির করা, অতি ভোজন বর্জ্জন করা ইত্যাদি......পক্ষান্তরে, একবার এই খাদ্যগুলিকে মানব-শরীর আত্মসাৎ করিলে, তাহার পর খাদ্যগুলির মধ্যে কিরূপ ব্যাপার চলিতে থাকে, তাহাও তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ঐ খাদ্য সকল কেমন করিয়া পরিপাক হয়, কি উপায়ে ভাল করিয়া পরিপাক করা যায় আত্মীকৃত করা যায়, তাহাও তাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন। কণ্ঠনালী দিয়া খাদ্য উদরে প্রবিষ্ট হইলে তাহার পর খাদ্যের মধ্যে কি প্রক্রিয়া চলিতে থাকে,—এ কথাটার গুরুত্ব কেবল এই শতাব্দীর আরম্ভে বিশেষজ্ঞেরা উপলব্ধি করিয়াছেন।

লিষ্টার বা পাস্তারের ন্যায় কোনও মহাপণ্ডিত, সাধারণের হিতার্থ এই বিষয়ের অনুশীলন করেন নাই, অনুশীলন করিয়াছেন নিউইয়র্কের একজন সামান্য ডাক্তার। ফরাসী ডাক্তারদিগের নিকট যদি ইহার নাম করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা মৃদু মৃদু হাস্য করিবেন কিংবা কাঁধ ঝাঁকাইবেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি পাস্তার প্রভৃতি অপেক্ষা কম প্রখ্যাত নহেন,—তাঁহার খ্যাতি নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে। তাঁহার নাম—Horace Fletcher.

এই "ইয়াঙ্কি" ডাক্তার—পরে যিনি একজন গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, হাজার হাজার ভক্ত শিষ্য যাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল—ইনি একদিন মনে মনে ভাবিলেন:—

—আমি খাই......কেন খাই?—খাই, আপনার পুষ্টিসাধনের জন্য, অর্থাৎ যে দ্রব্য আমার দেহযন্ত্রের খাদ্য যোগাইবে, সেই দ্রব্যকে আমার দেহ-যন্ত্রে বেমালুম মিশাইয়া লইবার জন্য। এখন দেখ,—ঐ খাদ্য যখন আমার কণ্ঠনালী পার হইয়া যায়, তখন ঐ খাদ্যের উপর আমার আর কোন হাত থাকে না। এই আভ্যন্তরিক কার্য্যটা নৈশ অন্ধকারে আবৃত একটা রহস্যজালে আবৃত। ঐ খাদ্য হইতে কিরূপে রক্ত উৎপন্ন হয়, মাংস উৎপন্ন হয়, চর্ব্বি উৎপন্ন হয় তাহা আমরা জানি না। এই প্রক্রিয়ার যে অংশটা আমরা জানি, যাহা আমাদের আয়ত্তাধীন, তাহা আমাদের ওষ্ঠযুগলে আরম্ভ হয় এবং আমাদের কণ্ঠনালীতে শেষ হয়।

যতক্ষণ আমরা খাদ্যটা চর্ব্বণ করি, ঠিক ততটুকু সময়ই উহা স্থায়ী হয়......অতএব এই সময়কার প্রক্রিয়ার উপরেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিতে হইবে। আমার চিবুক, আমার জিহ্বা, আমার মুখের তালু, আমার দন্ত, আমার লালা,—আমার মন,—এই সমস্তেরই সদ্ব্যবহার করিয়া খাদ্য চর্ব্বণ করিতে হইবে। ভাল করিয়া চর্ব্বণ না করিলে খাদ্য হজম হয় না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। মানসিক পুষ্টিসাধনের প্রক্রিয়া আরও বেশী রহস্যময় হইলেও, উপরি-উক্ত ভৌতিক প্রক্রিয়ার সহিত উহার বেশ একটু সাদৃশ্য আছে।

প্রথমে দেখিতে পাইবে, খাদ্য ভাল করিয়া চর্ব্বণ করিবার সময় অবিরাম ইচ্ছাশক্তি ব্যয় করা আবশ্যক। আসলে কাজটা সোজা, আমরা অজ্ঞাতসারেই চর্ব্বণ করিয়া থাকি; কিন্তু মনোযোগ-সহকারে যথানিয়মে এই কাজটা করিতে হইলে,আলস্য বিসর্জ্জন করিতে হয়। ফ্লেচারের শিষ্যেরা এবিষয়ে ভারি কড়াকড়; তাহারা বলেন খাদ্যসামগ্রী চর্ব্বণের দ্বারা যতক্ষণ না অণু-পরমাণুতে পরিণত হয় ততক্ষণ চর্ব্বণ করিতে ক্ষান্ত হইবে না। স্বীকার করি কথাটা একটু অতিরঞ্জিত। কিন্তু এ কথাও সত্য, অধিকাংশ লোকে খাদ্য ভাল করিয়া চর্ব্বণ করে না; রাক্ষসের মত গব্ গব্ গিলিতে থাকে। খাদ্যকে দন্তের দ্বারা বেশ চূর্ণ করিয়া, লালার সহিত মিশাইয়া তাহার পর ক্ষীরের আকারে গলাধঃকরণ করা—ইহাতে তাঁহাদের ধৈর্য্য থাকে না। কারণ ইহাতে মনঃসংযোগের দরকার হয়, পৌরুষ শক্তি প্রয়োগের দরকার হয়, অর্থাৎ, ইচ্ছাশক্তি ব্যয় করিতে হয়। দেখা যায়, অধিকাংশ লোকই ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে অতিশয় ক্ষীণ ও হীন ভাবাপন্ন। দ্বিতীয় কথা,—ভাল করিয়া চিবাইতে হইলে, একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করা আবশ্যক। ফ্লেচার-শিষ্যেরা নির্দ্দেশ করিয়া ছেন,—কোন খাদ্য কতবার চিবাইতে হইবে। এক ঢোক সুপ, এক ঢোক বিয়ার পান করিতে হইলেও, এতবার চর্ব্বণ করা দরকার। কারণ তাঁহাদের মতে, সুপ ও বিয়ারও চর্ব্বণ করিতে হয়! আবার আমরা বলিতেছি,—এ কথাটাতেও বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অমিতভোজী পেটুকের মত খুব ঠাসিয়া আহার করে। এক খণ্ড মাংস সমেত খাবার কাঁটাটা উহারা সবেমাত্র মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছে,—তখনও তাহার উপর দন্তের আক্রমণ হয় নাই—এমন সময় তাহার সহিত একটা বড় রুটির টুকরা যোগ হইল;—তাহার পরেই আবার কাঁটাটা আর এক টুকরা মাংস মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল; তারপর এই মিশ্র পদার্থের সহিত একসঙ্গে অর্দ্ধগেলাস পরিমাণ বর্গণ্ডি সুরা ঢোঁ-করিয়া পান করা হইল......অতি ভয়ঙ্কর! অতি ভয়ঙ্কর!.........
পাঠক, এই গোলমেলে ব্যাপারটাকে একটা ব্যবস্থার মধ্যে, একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার চেষ্টা কর। শীঘ্রই তুমি উহাতে সুখানুভব করিবে; কারণ শৃঙ্খলা জিনিসটাই প্রীতিপদ —অতি মনোরম; শৃঙ্খলাই মূর্ত্তিমান সুখ। কি নৃত্যকলা, কি ব্যায়াম-ক্রীড়া, যে কোন রকমের অঙ্গচালনাই হোক্ না, সমস্তের মধ্যেই একটু বিচার-চিন্তা আবশ্যক, একটু নিয়ম সংযম আবশ্যক। ভাল করিয়া চর্ব্বণ করাও—একটা শৃঙ্খলার ব্যাপার। তৃতীয় কথা:—ভাল করিয়া চিবাইতে হইলে, বেশ একটু সময় লাগে। ফ্লেচার-শিষ্যেরা বলেন, প্রত্যেক ভোজনে অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় দেওয়া উচিত। কেহ কেহ বলেন, অমিতভোজ নিবারণের জন্য চর্ব্বণের পক্ষপাতী ফ্লেচার-সম্প্রদায় এই পাক-চক্র উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা আবার বলিতেছি, ফ্লেচার-সম্প্রদায়ের এই কথাতেও একটু বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু বস্তুতঃ পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাইবে,ভাল করিয়া চর্ব্বণ করা একটু সময়-সাপেক্ষ।

* * *

অতএব দেখা যাইতেছে, বাহ্য উপাদান সমূহকে স্বাত্মীকৃত করিবার জন্য জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক যে সংগ্রাম করিতে হয়, সেই সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে তিনটা জিনিস আবশ্যক:—ইচ্ছাশক্তি, শৃঙ্খলা, ও সময়ের ব্যবহার।

সেইরূপ মনের ভিতর, অভৌতিক জ্ঞানপদার্থ সঞ্চারিত করিতে হইলেও, কতকটা উক্ত প্রকার প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। সব বিষয়েই উহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

খাদ্যকে স্বাত্মীকৃত করিবার জন্য, আপনার মধ্যে শোষণ

করিয়া লইবার জন্য যেরূপ একটা কৌশল আছে, জ্ঞানকে শোষণ করিবার জন্যও সেইরূপ একটা কৌশল আছে। ভৌতিক চর্ব্বণে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয়, মানসিক চর্ব্বণেও ঠিক্ সেই সব নিয়মই পালন করিতে হয়।

শিক্ষা কি ?—না, আমাদের বাহিরে যে-জ্ঞান জন্মায় বা গড়িয়া উঠে, তাহাকে পাকড়াও করা ; তাহার পর, সহজে যাহাতে সেই জ্ঞান আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এই উদ্দেশে তাহাকে চূর্ণ চূর্ণ করিয়া গুঁড়াইয়া ফেলা ; যাহাতে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, মিশিয়া যাইতে পারে, আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে এই উদ্দেশে, সেই জ্ঞানকে আমাদের মনের উপর শুধু না চাপাইয়া উহাকে আমাদের মনের তরল রসে পরিণত করিয়া ঐ রস পান করা —ইহাকেই শেখা বলে।

ইচ্ছা, শৃঙ্খলা, সময়—ইহাই শিক্ষাব্যাপারের মূল-উপাদান।

এই তিনটা বিষয় আমরা একাদিক্রমে পর-পর আলোচনা করিয়া দেখিব। আমরা মানসিক খাদ্যের আহার সম্বন্ধে খাঁটি ফ্লেচার-মতবাদী। জ্ঞান-খাদ্যের সম্মুখে আমরা পেটুকের মত অথবা অরুচিগ্রস্তের মতও ভোজন করিতে বসি না। এই ত্রয়ীর বিচার-আলোচনা হইয়া গেলেই এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ডে, আমরা আলোচনা করিব—শিক্ষা করিবার সহজ-সাধ্য 'কেজো' উপায়গুলি কি ; এই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, ইচ্ছা শৃঙ্খলা ও সময়কে কাজে লাগাইবার প্রকৃত প্রক্রিয়াগুলি কি।

এই ব্যাপারটা স্থির হইয়া গেলে, আর আমাদের বিশেষ কিছু করিবার থাকিবে না। তখন আমাদের শুধু ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে—বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যকে গুঁড়া করিবার জন্য কি কি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। বাদামের কুল্পি যেরূপ ভাবে চিবানো হয়, সেরূপ ভাবে ও আর কট্‌লেট চিবানো যায় না ...

দেখিতে হইবে,—শিক্ষাব্যাপারের মূল উপাদানগুলি কি ; দেখিতে হইবে, যাহা কিছু শিক্ষা করিবার আছে, সেই সমস্ত বিষয়ে এই উপায়গুলি কিরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শিখিবার কলাকৌশল ইহাকেই আমি বলি। পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিয়াছেন, এই শিক্ষাবিধান কার্য্যের মূলে একটুও পাণ্ডিত্যাভিমান নাই। ইহাতে প্রতিভার কোন দাবী নাই। বরং বলা যাইতে Pic de la Mirandole কিম্বা Berthlot যদি এই বিষয়ে শিক্ষা দিতেন তাহা হইলে খুব খারাপ শিক্ষকই হইতেন। গণনা শিখিবার জন্ম আমি Inandia নিকট কখনই যাইতে ইচ্ছা করি না। কেননা, তাঁহার গণনা-প্রক্রিয়া আমার বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে নহে। যেহেতু তিনি যদি তাঁহার প্রণালী অনুসারে আমাকে শিখাইতে চাহেন—তাহা হইলে সে কি রকম হয় ?—না, কোন দৈত্য যদি তার ৭ যোজন দীর্ঘ পাদুকা আমার পায়ে পরাইয়া দিতে চাহে—ইহাও সেইরূপ। শিক্ষার কলা-কৌশল মাঝারি-বুদ্ধি লেখকদিগকে শিখাইতে হইলে দেখিতে হইবে স্বয়ং শিক্ষকেরও বুদ্ধি অপর লোক-দিগের বুদ্ধির সীমাকে বেশী ছাড়াইয়া না যায়। শুধু তাঁহার বুদ্ধিটা একটু স্বচ্ছ হওয়া চাই। বিনা পরিশ্রমে তিনি কিছুই শেখেন নাই, এবং বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করিতেও বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন—এইরূপ হওয়া চাই। মাঝামাঝি বুদ্ধি বিশিষ্ট হইলেও তাঁহার হওয়া চাই—লাগিয়া-পড়িয়া-থাকা শিক্ষার্থী। বিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার বহু বৎসর পরেও খুব দৃঢ়তার সহিত তাঁহার আরও বিদ্যানুশীলন করা চাই। প্রিয় পাঠক, আমি তোমাকে জানাইয়া দিতেছি—আমি সেই নিরভিমান অথচ নাছোড়বন্দা শিক্ষার্থী। জীবনের যত রকম সুখ আছে তাহা আমি ইচ্ছা করিয়া আস্বাদন করিয়াছি ; কিন্তু আমি এ কথা বলিতে কখনই ক্ষান্ত হইব না যে, শিক্ষাতে যে-সুখ, সেরূপ জলন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ, ও স্থায়ী সুখ আর কিছুতেই নাই।

পাঠক! আমার জীবনের এই সামান্য অভিজ্ঞতাটুকু বিনীত ভাবে তোমাকে উপহার দিতেছি। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরের ছেলে

নবম পরিচ্ছেদ

রাজেশ্বরী দেবীকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া কিশোর কয়েকদিন তাঁহার অনুমতির অপেক্ষায় গৃহেই রহিল; কিন্তু সপ্তাহের পরও যখন মাতার কোন ইচ্ছার আভাষমাত্র আর তাহার নিকটে প্রকাশ পাইল না, তখন অগত্যা সে নিজেই তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। কুণ্ঠিত মুখে মাত্র বলিল, "আমি কি এখন কল্‌কাতায় যাব?" মা বলিয়া ডাকিতে মুখে বাধিয়া গেল। সেদিনের সেই উন্মাদ উচ্ছ্বাসের পর কিশোর আর তাঁহার সম্মুখে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতেই পারিতেছিল না!

রাজেশ্বরী কি একটা করিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "যেতে পার।"

ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া কিশোর আবার বলিল, "কবে যাব?"

"যেদিন তোমার ইচ্ছা।"

কিশোর বুঝিল, তিনি আর তাহার বিষয়ে কোন মতামতই দিতে চাহেন না! তথাপি সে আবারও বলিল, "সে বাসা তো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—এখন মেসে থাক্‌ব যখন, তখন সঙ্গে বেশী লোক নিয়ে কি হবে?"

"যাকে তোমার ইচ্ছা তাকেই নিয়ে যাও—বেশীর দরকার না থাকে, নিও না।"

কিশোর একটু হাসিয়া বলিল,—"এম্ এ দেওয়ার পর গেজেট দেখে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদের চেষ্টা দেখতে হবে। এবার বোধ হয় অনেক দিনই বাড়ী আসা হবে না!"

"আচ্ছা।"

কিশোর যেন লগি নামাইয়া রাজেশ্বরীর মনোভাবের তল নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা পাইতেছিল। এমন সংবাদেও তাঁহাকে ঈষৎ মাত্রও বিচলিত না দেখিয়া এইবার নিঃশব্দে কিছুকাল ভাবিয়া লইয়া শেষে আরও মাথা নামাইয়া আরও মৃদুস্বরে বলিল, "আমায় কিন্তু এর মধ্যে আবার বাড়ী চলে আস্‌তে হলে মুস্কিলে পড়্‌তে হবে। যদি কোন দরকার থাকে, এখনো দু-এক মাস দেরী করে তবে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে কল্‌কাতায় গিয়ে বস্‌তে পারি।"

"আমার দরকার তো কিছুই দেখ্‌ছি না। তবে তোমার বিষয়-সম্পত্তির যদি কোন কাজ পড়ে, তোমার দেওয়ান গোমস্তাকে এ কথা ব'লে সেই রকম ব্যবস্থা করে যাও। তারা কি বলে এ কথায়, জানো।"

"তাদের কথা পরে, তোমার কি এই দু'এক বছরের মধ্যে আমায় আর কোন দরকার হবে না মা—?"

এতক্ষণে রাজেশ্বরী একটু মুখ তুলিয়া অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার আর কি দরকার?—না—কোন দরকার পড়্‌বে না।" কিশোর ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া এইবারে যেন মরিয়ার মত বলিয়া উঠিল, "এবারে কল্‌কাতা যাবার আগে কি যে-সব সম্বন্ধ আন্‌ছিলে, মেয়ে দেখ্‌ছিলে,—সে সব ব্যাপারের জন্যেও দরকার হবে না?"

রাজেশ্বরী কিশোরের দিকে চাহিলেন। বিস্ময়ে তিনি যেন হত-বাক্ হইয়া উঠিলেন! এত বড় ব্যাপারের পর এই নির্ম্মম অমানুষ যুবকের কি এ বিষয়েও এতখানি হৃদয়-হীনতা প্রকাশ পাইবে? দুইদিনও তাহার দেরী সহিতেছে না? এই জন্যই কি ঝরণার সম্বন্ধে সে এত খোঁজ রাখিয়াছিল? ছি, ছি, সবই কি তাহার খেয়াল মাত্র? এই ছেলেকে এতদিনেও না চিনিয়া রাজেশ্বরী কত না ব্যথাই জীবনে সঞ্চয় করিলেন। কিন্তু আর না।

কিশোর উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া রাজেশ্বরী গম্ভীর মুখে বলিলেন, "যদি তাই ইচ্ছা কর, দেওয়ান-গোমস্তাকে বল। তারাই—"এইবারে কিশোর ঈষৎ মাত্র হাসিয়া মাতার মুখের পানে চোখ তুলিয়া বলিল, "তাও দেওয়ান-গোমস্তাই ঠিক্ করবে মা? বৌ এনে আমাকে সংসার সাজিয়ে কি তাদেরই দিতে হবে নাকি?"

রাজেশ্বরীর মুখ দেখিতে দেখিতে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। এই নিষ্ঠুর পরের সন্তানের নিকটে নিজের ব্যথা-প্রকাশে আর তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি আর

উত্তর মাত্র না করিয়া নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগের উপক্রম করিবামাত্র কিশোর দুই হাত দিয়া দুয়ার রোধ করিয়া দাঁড়াইল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তা হবে না মা, পালালে চল্‌বে না। বল, আমায় এখন কি কর্‌তে হবে? না বল্‌লে তোমায় কিছুতেই ছাড়্‌ব না।" রাজেশ্বরীর সঙ্কল্প-কঠিন অন্তরে কিসের যেন ঘা পড়িতে লাগিল—রুদ্ধকণ্ঠে সগর্জ্জনে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুই কি আমায় সে জোর করে বলাবি? তোর কাছে আর আমি কিছু চাইব না। পরের সন্তান দিয়ে সংসার তৈরীর আমার প্রবৃত্তি আর নেই। তোর যা খুসী তুই তাই কর্‌,—আমারও যা খুসী আমি কর্‌ব।"

"কি তুমি কর্‌বে আর? কাশী যাবে? চল না, যাই যাই দুজনে।"

"কাশী যাব তোমায় কে বল্‌লে? আমার স্বামীর ভিটা তাঁর সর্ব্বস্ব ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। এইই আমার কাশী।"

কিশোর একটু উন্মনাভাবে বলিল, "তুমি যখনি রাগ কর, কাশী যাব বল কি না, তাই আন্দাজ করছিলাম। যাক্‌, আমায় তো আর কিছু কর্‌তে হবে না, চিরদিনের সেই কথাটি আমি জান্‌তে চাই! বল্‌তে হবে তোমায়।"

রাজেশ্বরী ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া শেষে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ, এতেই যদি তুমি সুখী হও, স্বস্তি পাও হাঁা, চিরদিনের মতই তোমায় আমি ছুটী দিলাম। আমার কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত, লোভের সাজা তোমায় দিয়েই ভগবান আমায় ভাল করেই দিলেন! এখনো যদি লোভ করি, তোমার হাত দিয়ে না জানি আমার আরও কত লাঞ্ছনা হবে! তুমি যা খুসী কর কিশোর, তুমি স্বাধীন। আমার জন্য আমাদের জন্য তোমার কর্ত্তব্য আজ থেকে আর কিছু নেই,—তোমার উপর আমাদের কোন দাবী নেই! তুমিও আমার কেউ নও—আমিও তোমার কেউ নই! কেমন, এই তো তুমি চাও? এইবার তো তুমি সুখী হচ্ছ? এইবার আমায় রেহাই দাও, তুমি আমার সুমুখ থেকে যাও।"—বলিতে বলিতে মুখে কাপড় দিয়া রাজেশ্বরী কাঁদিয়া উঠিলেন। বিবর্ণ স্তব্ধ মুখে কিশোর ক্ষণেক তাঁহার সেই রোদনোচ্ছ্বাস সম্বরণের বিফল চেষ্টা দেখিতে লাগিল; ক্ষণেক পরে একটু যেন দৃঢ় হইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল। ধীরে ধীরে রাজেশ্বরীর পায়ের কাছে একটা প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি তাহলে কল্‌কাতাতেই যাচ্ছি মা।"

"যাও—এস।"

* * * *

প্রভুকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে দেওয়ান এবং আরও দুই-তিন জন লোক ষ্টেশনে আসিয়াছিল। ষ্টেশন হইতে গ্রাম দূর-পথ, তাই কিছু পূর্ব্বেই তাহারা সদল বলে আসিয়াছে। সম্মুখে তখন পশ্চিম-গামী ট্রেণ। এখানা ছাড়িলে তাহার পরে কলিকাতা-গামী ট্রেণটা আসিবে। কিশোরকে তাহারা ওয়েটিং রুমে একটু অপেক্ষা করিতে বলিবে ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে কিশোরকে একটা ইণ্টার ক্লাশ-কম্পার্টমেণ্টের হাতল ধরিয়া ঘুরাইতে দেখিয়া দেওয়ান সবিস্ময়ে "এটা নয়—এটা—নয়—এটা যে, দেখছেন্ না—?" বলিয়া বাধা দিতে দিতে কিশোর কামরার দ্বার খুলিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "হাঁ, এইটেই। আমি এইটেতেই যাব।"

দেওয়ান সবিস্ময়ে হাঁ করিয়া চাহিতেই কিশোর অন্য একজন কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "শীগ্‌গির একখানা টিকিট্‌ নিয়ে আসুন। এখনো পাঁচ মিনিট সময় আছে।"

"আজ্ঞে—আজ্ঞে, কোথায় যাবেন? কোথাকার টিকিট?"

"যেখানের হোক। এ গাড়ীটা যতদূর যাবে! মোকামা—মোগলসরাই—কাশী—যেখানের হোক্‌।"

দেওয়ান এইবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ কি বল্‌বেন?"

"কিছু বল্‌বেন না। তুমি তাঁকে গিয়ে বলো, আমি দুদিন পশ্চিম বেড়াতে চল্‌লাম—হাওয়া খেয়ে আস্‌ব।"

"তাহলে—তাহলে মোগলসরাই হয়ে কাশীই যান্‌। কাশীরই টিকিট আনো—বুঝলে ভবচরণ—শীগ্‌গির—শীগ্‌গির। কিন্তু এ ক্লাশে কেন? সেকেণ্ড ক্লাশে চলুন—আর সঙ্গে কে কে যাবে? শুধু ভজহরি—?"

"হ্যাঁ—মাত্র ভজহরিই যাবে। আর এই ইণ্টারেই যাব আমরা। জিনিস-পত্রগুলো তুলে দাও। ভজা, উঠে পড়্—কৈ ভবচরণ, টিকিট আন্‌লে— ?"

"আন্‌ছে, এখনো সময় আছে। এসে পৌঁছুবে।—মাঠাকরুণ—"

"কিছু বলবেন না তিনি। নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি গিয়েই তাঁকে পত্র দেব। আমাদের পাণ্ডার নাম কিম্বা আপনার কোন জানিত পাণ্ডার নাম বলে দিন্ তো, লিখে নিই।"

"ঠিক্, ঠিক্ বলেছেন,—গণেশলাল পাণ্ডাকে একটা তার করে দিচ্চি এখনি। পৌঁছেই খবর দেবেন দেরী না হয়।"

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। হতভম্ব সহযাত্রীদের সহিত দ্বিগুণ হতভম্ব দেওয়ান নিজেদের অশ্বযানে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "চল—কি আর করা যাবে? মাঠাকরুণকে গিয়ে বলিগে। পাণ্ডা ঠাকুরকে তো টেলিগ্রাফ করে দিলাম! একটা বাসা-টাসা ঠিক্ করুক সে ইতিমধ্যে, আর মোগল সরাই থেকে ধরেও নিয়ে যাক্। যে রকম ভাব দেখলাম, যতদূর গাড়ীটা যাবে, ততদূর যাবেন, বল্লেন না? কে জানে, ততদূরই বা চ'লে যান্! কল্‌কাতার বাসা উঠিয়ে দেওয়াই উচিত হল না! কি যে করবেন, তাই বুঝ্‌ছিনা! এই রকম ক'রে কি বেড়াতে যায়? আগে বল্লেই হত—ব্যবস্থা করা যেত, মাঠাকরুণও সঙ্গে যেতে পারতেন। যত সব ছেলেমানুষী কাণ্ড—হুঁঃ!"

দশম পরিচ্ছেদ

কিশোর নিজের এই স্বাধীন জীবন লইয়া প্রথমে কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। নিজের অতি শৈশব স্মৃতির পর এ রকম অনুভব তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, তাই সে প্রথমে রাজেশ্বরীর কথা বিশ্বাসই করিতে পারে নাই। তারপরে বিশ্বাস আসিল, রাজেশ্বরীর কথাগুলি যে তাঁহার সম্পূর্ণ আন্তরিক তাহা বুঝিতে পারিলে স্বাধীনতা লাভের প্রথম উত্তেজনা-তপ্ত রক্ত মাথায় উঠিবার পূর্ব্বে সেই আশৈশব একান্ত স্নেহের সঙ্গে পালয়িত্রী মাতার বেদনাও আজ নূতন হইয়া যেন তাহার চক্ষে পড়িল। সে বুঝিল, তিনি নিজে যাহাই বলুন, ইঁহার কাছেও আর তাহার এতখানি কৃতঘ্ন হওয়া চলিবে না। তিনি তাহাকে সকল কর্ত্তব্য হইতে মুক্ত করিয়া দিলেও তাহা যে আর এ জীবনে অসম্ভব! তাহার এই ব্রজকিশোর রায় নামও থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সবই থাকিবে। যাহা গিয়াছে, তাহা তো আর সে ফিরিয়া পাইবে না! সে-মাণিক তো সে আর হইতে পারিবে না—তবে কেনই আর সে নূতন নূতন অপরাধের সংখ্যা বাড়াইয়া চলে? এই চিরদিনের মাতৃসম স্নেহাতুর হৃদয়কেও কেবলই ব্যথা দিতে থাকে? আবার তাহাকে তাহার ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট পথেই যে চলিতেই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইতিমধ্যে সে কেন একবার কিছুদিনও অন্ততঃ তাহার এই মুক্ত জীবনকে ভোগ করিয়া লউক্ না! রাজেশ্বরীর কথিত-মত ভাবিয়া লউক্ না কেন! সে আজ পিতার অপরকে বিলাইয়া দেওয়া হতভাগা সন্তান নয়! সম্পূর্ণ অনধিকারের স্থানে কলমের মত তাহাকে কেহ জোড়া দিয়া পরের রসে বর্দ্ধিত করিয়া ত পর-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে দেয় নাই! পরের ঘরে তাহাকে পরের সন্তান হইয়া আর আপন-জনার সান্নিধ্যে লজ্জায় পৃথিবীর বুকে মুখ লুকাইতেও হইবে না; আপন হইয়াও 'পর' হইয়া যাওয়ার বেদনার বিষেও আর তাহার জীবন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে না। সে এখন অপর সাধারণের মতই একজন সহজ মানুষ! আজীবনের অধীনতার দূষিত বাষ্পে ঘেরা পৃথিবীতে আজ সে মুক্তির শুদ্ধ নির্ম্মল নিশ্বাস টানিয়া লইয়া দুদিন বেড়াইয়া বেড়াক্ না কেন! আজ তাহার স্নেহ, ভালবাসা, মমতা, প্রেম প্রভৃতি জীবনের সমস্ত বৃত্তিকে স্বাধীন জীবনের ভূমিতে আনিয়া একবার সাধারণের মত অনুভব করিয়া লউক না কেন! আজ একবার ঝরণাকে গিয়া সে কি বলিতে পারে না যে, আজ তোমাকে আমার এই অতি অস্বাভাবিক দুর্জ্জয় প্রেম আমি নিবেদন করিতে পারি, যে প্রেম তোমার অতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার স্মৃতির মধ্যেই জন্মিয়া আমার অন্তরে ধীরে ধীরে দিনে দিনে কালে কালে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে! ইহার কোন আকাঙ্ক্ষা

ছিল না, কোন আশা ছিল না। এমন স্পর্দ্ধাও ইহার এতদিন ছিল না যে তোমার কাছে সে নিজের এই আত্ম-নিবেদন প্রকাশ করিতে পারে! অন্তরের অন্তরে অপ্রকাশ্যরূপে তাহার এই "গুহায়িত পরমতত্ত্ব" একটা বেদনার আকারেই তাহার জীবনে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। সেই বেদনাটুকুই মাত্র আজ তোমার কাছে নিবেদন করার মত স্বাধীনতা সে পাইয়াছে, তাহার বেশি আর কিছু নয়। তোমার শ্রদ্ধা বা অন্য কিছুর কথা স্বপনেও তাহার আশা করিবার কথা নয়! কেবল একটু সহানুভূতি, তাহার এই বেদনা প্রকাশ করিতে পাওয়ার একটু অধিকার, এইমাত্র সে চাহে, তারপরে—না, ইহার পরের কথা এখন সে আর ভাবিতে পারে না। এখন এইটুকুই মাত্র তাহার ভাবিবার এবং বলিবার। পরের কথা পরের জন্যই থাক্।

রাজেশ্বরীর সেই উদাসীন বাক্য তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিবার যে আভাস প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা সে মনের সঙ্গে বিচারের সঙ্গে গ্রহণ না করিলে তাহার চির-দিনের ব্যথা-জর্জ্জর মুক্তিকামী অন্তর এক এক বার এমনি উতলা হইয়া উঠিয়া তাহার তরুণ যৌবনের দুর্দ্দম বেগকে, অন্তর-গুহাশ্রিত রুদ্ধ স্রোতকে এমনি উদ্দাম করিয়াই তুলিতেছিল। তাই সে কলিকাতা যাইবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ষ্টেশনে আসিয়া সে যাহা করিল, তাহা সে কেন করিল, নিজেই যেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না! সে পশ্চিমে যাইতেছে, কাশী যাইতেছে! কেন? কিসের জন্য? কি পাইতে চায় সে, যাহার জন্য ঝরণার নিকটেও না গিয়া তাহাকে বিপরীত পথে ছুটিতে হইল! ঝরণার কাছে গিয়া যে অন্তর তাহার আত্ম-নিবেদনের জন্য এতক্ষণ উতলা হইয়া উঠিয়াছিল, সে এখন আবার ও কি চাহে? অন্তরের ওকি অন্তরতম আর কোন এমন কিছু আছে, যাহা তাহার নিজের কাছেও অজ্ঞাত তত্ত্ব?

মোগলসরাইয়ে নামিয়া সে যখন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন এক রুদ্রাক্ষ ও চন্দন-চর্চ্চিত বিশাল বপু ত্রিপুণ্ড্র-শোভিত ললাট এবং স্থূল উদর লইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। জানাইল, সে রায় বাবুদের বংশানুক্রমে পাণ্ডা বংশধরের ছড়িদার, দেওয়ানজীর টেলিগ্রাম পাইয়াই তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক্ করিয়া সে "হুজুর"কে লইতে আসিয়াছে। হুজুরকে তাঁহার কলিকাতার বাসায় অল্পদিন পূর্ব্বেই কার্য্যানুরোধে গিয়া দেখিয়াছিল, তাই তাহার মনিব পাণ্ডা গণেশলাল তাহাকেই পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি বক্তৃতার মধ্যেই সে ভজহরির সঙ্গে কিশোরের জিনিষ-পত্র কাশী-যাত্রা ট্রেনে তুলিয়া ফেলিল। যন্ত্র-চালিতের মত কিশোরও তাহাদের সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

আরামজনক বাসা, দেব-দর্শন কাশীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ানো ইত্যাদি পাণ্ডার অনুচরদের সাগ্রহ চেষ্টায় সমস্তই কিশোরের যথানিয়মে হইতে লাগিল। ভৃত্য ভজহরির বড়ই আনন্দ! কেবল মাঝে মাঝে সে গণেশলাল পাণ্ডার স্থূলতা লক্ষ্য করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িত! প্রভুর নিকট মন্তব্য প্রকাশ করিত যে বেচারী বোধ হয় কোন্ দিন ফাটিয়াই মরিয়া যাবে। নিজের ভবিষ্যৎ-জ্ঞান সম্বন্ধেও প্রমাণ দিতে বলিত যে—যখন পাণ্ডার ছড়িদারের ঐ রকম চেহারা দেখেছি, তখন আন্দাজ করেছি, পাণ্ডা না জানি কি হবেন! আচ্ছা দাদাবাবু, বাবা বিশ্বনাথের তো সবাই ছেলে, তাঁর দুয়োরে এত অনাথ আতুর ভিখারি একমুঠো চালের জন্যে হাহাকার করছে, আর পাণ্ডা ব্যাটারা এমন হয় কি ক'রে?" ভজহরির মন্তব্য শুনিতে শুনিতে সহসা একবার কিশোরের মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, "পাণ্ডারা বোধ হয় বিশ্বনাথের পোষ্যপুত্র।" ভজহরি একটু যেন অবাক হইয়া প্রভুর পানে চাহিল। কিন্তু ক্ষণপরে সরল-হৃদয় বৃদ্ধ ভৃত্য সরল হাসি হাসিয়া বলিল, "আর ভিখারিগুলো বুঝি আপন ছেলে? তাই দাদাবাবু আপনি ওদের অত ভাল বাসেন? পাণ্ডার চেলাগুলো যে বলাবলি করছিল, 'বাবু এখনো বাচ্ছা আছেন, তাই কাঙাল ভিখারীর ওপরই দয়া বেশী, ওদের দিকেই পয়সা বেশী খরচ করেন। পুণ্য-ধরমের কাজে তেমন "ইচ্ছা" নেই।"

কথাটা সত্যই! তাই কিশোর খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাশী ধামের যেখানে যেখানে অনাথ-আতুরের ভিখারীর দুঃখ-হরণের ব্যবস্থা ছিল, সেই সেই স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইত। ৺অহল্যা বাই, ৺রাণী ভবানী, ৺রাণী বিদ্যাময়ী, ৺রাণী শরৎ-

সুন্দরী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মহীয়সী মহিলাদের ছত্রে অন্নদান সে সস্পৃহ নয়নে দেখিত, আর মনে মনে নিজ মাতা রাজেশ্বরীকে উদ্দেশ করিয়া বলিত, "এমন সব উপায় থাকিতে এমন পথে কেন গিয়াছিলে! নিজেও সুখ পাইলে না, পরেরও যা হইবার তা হইল! বংশের নাম এমন চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা আর কিসে সম্ভব হইত? এই যে প্রাত্যহিক প্রাণী-যজ্ঞ, ইহার কাছে পর ধরিয়া বৎসরান্তে পরলোক-উদ্দেশ্যে কয়েক গণ্ডূষ জল ও পিণ্ড দান, সে যে কি তুচ্ছ, এ কি তোমার মনে একবারও জাগে নাই মা?

সেদিন ৺বটুক ভৈরব দর্শন করিয়া কিশোরকে আগেই ৺রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডার অনুচরেরা আর বিরক্তি দমন করিতে পারিল না। কিন্তু তাহাদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশেও লেড়কা বাবু সাহেবের যে কোন মত পরিবর্ত্তন হইবে, এমন বোধ হইল না। আশ্রমের প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রত্যেক কক্ষ ঘুরিয়া প্রত্যেক রোগীকে বিশেষ করিয়া সে দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। কাহাকেও যন্ত্রণাগ্রস্ত দেখিলে তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার কি কষ্ট, জানিয়া লইতেছিল। তাহাদের কি নিয়মে আহার চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা করা হয়, তাহা সেবকদের নিকট হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিয়া লইতেছিল। কয়েকটা ঘরের মাথার উপরে কোন্ কোন্ পিতৃভক্ত মাতৃভক্ত সন্তান, স্বামীহারা স্ত্রী, স্ত্রীগত-প্রাণ স্বামী তাহাদের মৃত প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে সেই কক্ষ কয়টি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া তাঁহাদের নামগুলি সে টুকিয়া লইল। প্রাঙ্গণের সেই সুন্দর জলাধারটি, যাহার অঙ্গে সেই অমৃতময়ী শ্লোকে পানীয়ের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের পরে তাহা যে দাতার স্বর্গগত পিতার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত, তাহা পড়িয়া কিশোর স্তব্ধ হইয়া ক্ষণেক সেইখানে দাঁড়াইয়া জলাধারটির পানে চাহিয়া রহিল। বুকের মধ্যে তাহার যেন হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল! হায় ভাগ্য, হায় হতভাগ্য, যাহার পিতাই নাই, শৈশবেই যে পিতৃহীন, তাহার আবার এ কি সাধ! কাহার তৃপ্তির জন্য কে দিবে? ৺নন্দকিশোর রায়ের উদ্দেশ্যে এখনি এমন একটা কিছু করা অতি সহজ, কিশোরের ইচ্ছা মাত্রেই এখনি তাহা সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাই কি! অন্তর কি এই সাধেই এমন করিতেছে? কোথায় সে পিতা তার, যাঁর অভাবে যাঁর জন্য তাহার অন্তর এমন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে! তাঁর স্মৃতি পর্য্যন্ত যে কিশোরের পক্ষে অগ্নিময়ী! সেই প্রচণ্ড অগ্নি-স্রোতকে এমন স্নিগ্ধ ক্ষীণ নীরধারাতে কিশোর তো পরিণত করিতে পারিবে না! তবে কেন আর...?

সেদিনের মত দেখা শেষ করিয়া সে ফিরিবে মনে করিতেছে, এমন সময়ে তাহার পরিদর্শক সেবক যুবকটি বলিল, "মোক্ষ মন্দিরটা দেখ্‌বেন না কি? তাতে অবশ্য দেখার এমন কিছু নেই! যার আর বেশী দেরী নেই বলে মনে হয় তাকেই সেখানে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। সিরিয়স্ কেস্ হলে সকল রোগীর কাছে তাকে রাখা হয় না। ঐ যে ঐদিকে একটী মাত্র বড় ঘর দেখছেন, ওতেই তাকে রাখা হয়। তার সুমুখেই ঐ যে ছোট ঘরটি, ঐটিই মোক্ষ মন্দির। আজ একজন আধ-মরা লোককে এনে মোক্ষ মন্দিরে রাখা হয়েছে। রাস্তায় পড়েছিল, খবর পেয়ে আনা হয়েছে! লোকটীর কোথায় চোট্ লেগেছে, বোধ হচ্ছে,—আঘাতের চিহ্ন ডাক্তারে এমন কিছু ধর্‌তে পার্‌লে না, কিন্তু একেবারে অজ্ঞান। গিয়ে দেখে আসতে হচ্ছে।"

শুনিতে শুনিতে ও বলিতে বলিতে উভয়ে মোক্ষ মন্দিরের দ্বারের নিকট পৌঁছিলে কিশোর দেখিল, নামের উপযুক্ত ঘর বটে! সে ঘরে আলো-বাতাসের তেমন কোন নিকাশ-পথ নাই, গৃহতলে কোন দ্রব্য নাই, খালি ঘরের মেঝের উপরেই একটু শয্যায় একটি মুমূর্ষু একাকী পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহের মধ্যে যাইতে আর কিশোরের ইচ্ছা হইল না, এর আর কি দেখিবে! এমন ঘটনা তো জগতে অহরহই ঘটিতেছে; বরং এ হতভাগ্য যে ইহাদের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িতে পারিয়াছে, ইহাই তাহার পক্ষে শেষ সৌভাগ্য! উভয়ে গৃহের মধ্যে চাহিতেই দেখিল, রোগী যেন মাথা চালিতেছে, মাঝে মাঝে হাত-পা নাড়িতেছে। সঙ্গের পরিদর্শক যুবক তখনি ছুটিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করায় কিশোরও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িল। যুবক বলিল, "এঁর অবস্থান্তর এসেছে দেখ্‌ছি। এমন করে তো

একবারও নড়েনি।" তারপরে রোগীর নিকটে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠোঁট নড়ছে কি যেন বলছে, মশায়! আমি ডাক্তার আর এখানের যারা সেবক তাদের খবর দিতে যাচ্চি, আপনি এখন আর এখানে থাকবেন কি?"

"কিশোর ঈষৎ কৌতূহলী হইয়া বলিল, "আপনি আনুন তাদের ডেকে। আমি থাকছি এইখানেই।"

রোগী তখন অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সবেগে হাত-পা নাড়িতেছে এবং অস্ফুট আর্ত্তনাদে কি যেন বলিতেছে। সহসা কিশোরের কাণে তীরের মত একটা শব্দ প্রবেশ করিল, "মাণিক—মাণিক—"

বন্দুকের গুলি খাইয়া যেমন করিয়া পাখী ঘুরিয়া পড়ে তেমনি করিয়া সহসা কিশোর মুমূর্ষুর মুখের নিকটে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। এ কি, এ কি শব্দ! কে এ, এ কে? নিজেকে সামলাইয়া লইতে লইতে তাহার কাণে সেই একই শব্দ পুনঃপুনঃ প্রবেশ করিতেছিল, "বাপরে মাণিক, মাণিক, ওঃ!"

দুই হাতে সেই মৃত্যুশয্যাশায়ীর মুখখানা আলোর দিকে ফিরাইয়া কিশোর দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল, চিনবার চেষ্টা করিতেছিল। চোখের দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত যেন তাহার লোপ পাইয়াছে?—আঁধার, আঁধার, কিছু দেখা যায় না, কাণেও আর কোন শব্দ প্রবেশ করিতেছে না, সর্ব্বাঙ্গ যেন জড়ের ন্যায় সর্ব্বক্রিয়া-রহিত!

মনুষ্য সমাগমের সংঘাতে কিশোর সসংজ্ঞ হইয়া মুখখানা ছাড়িয়া দিল। নিজের এই অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেও সে বেশ চিনিতে পারিয়াছে, এ মুমূর্ষু কে! ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, "এ ঘর থেকে একে নিয়ে যাও। বাঁচবে বলে বোধ হয় না,—তবে এখনো দু'চারদিন টি'কতে পারে, একটু চেষ্টা-চরিত্তির দেখতে হবে,—যখন জ্ঞান এমন ফিরেছে—"

রোগীকে ষ্ট্রেচারে করিয়া সাবধানে নিকটস্থ সেই সিরিয়স কেসের ঘরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে করিতে কিশোরের এতক্ষণকার সঙ্গী সহসা তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "একে কি আপনার কোন পরিচিত ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে মশায়?"

"হাঁা, আমি এঁর কাছে থাকতে চাই, আপনারা অনুগ্রহ করে সেই রকম বন্দোবস্ত করে দিন।"

ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী।

আলোচনা

আস্তিক ও নাস্তিক

আস্তিক। আচ্ছা মাষ্টার মহাশয়, আপনি বলেন ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর যে নাই তাহার প্রমাণ কি?

নাস্তিক। ঈশ্বর নাই আমি বলি না, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, ন্যায়বান, প্রেমময় পরমপুরুষ এই অর্থে যে কোন ঈশ্বর আছেন তাহা আমি কোনভাবে বিশ্বাস করিতে পারি না। ঈশ্বর আছেন যদি বলেন, তবে সেই প্রমাণের ভার আপনার উপর। যাহা আছে তাহার প্রমাণ থাকে, যাহা নাই তাহা প্রমাণ করা যায় না, "The negative cannot be proved."

আস্তিক। কি? আপনি বলেন ঈশ্বর যে আছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই? এই পৃথিবী কেমন নিয়মে ও শৃঙ্খলায় চলিতেছে, চুল-প্রমাণ ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, চারিদিকে কেমন সৌন্দর্য্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলা। তবু আপনি বলেন, ঈশ্বর নাই?

না। কোথায় নিয়ম শৃঙ্খলা? এক সময় চন্দ্রলোকে জীবের বাসস্থান ছিল এখন জীবের চিহ্নও নাই, এক সময় পৃথিবী ছিল ভীষণ উত্তপ্ত বাষ্প-পিণ্ড, কোথায় ছিল তখন সৌন্দর্য্য আর নিয়ম-শৃঙ্খলা? এক সময় আসিবে যখন সূর্য্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া একটা প্রদীপে পরিণত হইবে "reduced to a lamp." বিসুবিয়সের অগ্নির উদ্গমে যে দুইটী নগর ধ্বংস হইয়াছিল তাহাদের অধিবাসীরাও নিয়ম শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। প্রকৃতিতে অনিয়ম নাই, যাহা ঘটে তাহাই প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ। প্রাকৃতিক নিয়ম অব্যর্থ, এই বিশ্বাসহেতু রূপকভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হয়, প্রকৃত পক্ষে ইহার কোন

law-maker নাই। আমি ত দেখিতে পাই সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, উৎপীড়ন, খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ।

আ। তিনি ধীরে সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় তাঁহার সৃষ্টিকে সৌন্দর্য্যের ও পূর্ণতার দিকে বিকশিত করিতেছেন।

না। তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না, তিনি এক পন্থা (process) অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় আর এই চিত্রটা তাঁহার না ফুটাইলেই ভাল হইত! কত বিনাশের পর এই evolution—ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, "Survival of the fittest" যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন আর অযোগ্যের বিনাশ এই ত বিকাশের নিয়ম!

Nature is red in tooth and claw তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বমঙ্গলময় অথচ তাঁহার সৃষ্ট কোটি কোটি নর-নারী অনাহারে অর্দ্ধাহারে রোগে, শোকে জর্জ্জরিত। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কী ভীষণ দৃশ্য! দুঃখ-পূর্ণ এই ক্ষণস্থায়ী জীবন, ইহার জন্য কি কঠোর সংগ্রাম! তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? আমাদের পরীক্ষা? তিনি সর্ব্বজ্ঞ, পরীক্ষার প্রয়োজন কি? তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে সর্ব্বমঙ্গলময় নহেন, অথবা সর্ব্বমঙ্গলময় হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন। সন্তান প্রসবকালে মাতার কি প্রাণান্ত যাতনা! প্রসব কালে কত প্রসূতির প্রাণ নষ্ট হয়; মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী অথচ মৃত্যু যাতনা কী ভীষণ! কেন ভগবান জীবকে বৃথা এই কষ্ট দেন? এই দেহ-যন্ত্রটা সামান্য কারণেই বিকল হইয়া যায়, ইহার নির্ম্মাণ-কৌশলের জন্য ভগবানকে প্রশংসা করিতে পারি না, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Helmholtz আমাদের চক্ষুর নির্ম্মাণ-কৌশলের ত্রুটি দেখাইয়া বলিয়াছেন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কৌশলে চক্ষু নির্ম্মিত হইলে ইহার দৃষ্টিশক্তি অনেক গুণ বাড়িয়া যাইত। কোন দেশে নারীর সংখ্যা পুরুষের তিনগুণ, কোথাও বা পুরুষের সংখ্যা নারীর তিনগুণ, ইহাতে কত বীভৎস পাপের সৃষ্টি হয়। ইহাতে কি সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যে আপনারা কি প্রকারে দয়াময় ভগবানে বিশ্বাস করেন ভাবিলে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হই। বোধ হয় গতানুগতিক ভাবেই বিশ্বাস করাটা একটা temperament স্বভাবগত হইয়া গিয়াছে। ইহাই ত Slave-mentality (দাস মনোভাব)। ক্ষণকালের দুর্ব্বলতা জনিত পাপের ফল—অনন্ত নরক, অনন্ত জন্ম-মৃত্যু, রৌরবানল, এই সকল ভয়াবহ চিত্র ভাবিলে কাহার না আতঙ্ক জন্মে? অন্ধ বিশ্বাসে কত সরলপ্রাণ নরনারী দুঃখে পড়িয়া দয়াময় ভগবানকে ডাকে, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ব্যাকুলভাবে কত কাতর প্রার্থনা করে কিন্তু তিনি সাড়া দেন কি? মসজিদে প্রার্থনা করিবার সময় ভূমিকম্পে চাপা পড়িয়া প্রার্থনাকারীর মৃত্যু ঘটে, ইহা দেখিয়াও কি আর দয়াময় ভগবানে আস্থা থাকিতে পারে?

আ। আমরা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, নগণ্য কৃমিকীট, তাঁহার অনন্তজ্ঞানে যাহা প্রকৃত মঙ্গল তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে দোষ দিই। আমাদের জ্ঞান কতটুকু? কতটুকু আমরা দেখিতে পাই? কতটুকু বুঝিতে পারি? হয়ত পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে কোন প্রসূতি প্রসব-কালে মারা গিয়াছে। একজন অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, আর-একজন সুস্থ ও সুন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করে এই পার্থক্যের কারণ কি? পূর্ব্বজন্মের পাপ ছাড়া এই পার্থক্যের আর কোন কারণ থাকিতে পারে না। ঈশ্বর ন্যায়বান, পাপীর দণ্ড তিনি দিবেনই!

না। আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য, সত্য, তবে আমরা না বুঝিয়াই বা কেন তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াময় ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করি? আমরা সমাজবদ্ধ মানুষের গুণ কল্পনায় যথাসাধ্য বাড়াইয়া কাল্পনিক ভগবানে যুক্ত করি।

অমঙ্গল না থাকিলে মঙ্গল ও মঙ্গল না থাকিলে অমঙ্গল থাকে কি? অন্ধকার না থাকিলে আলোর ধারণা হয় কি? সসীম হইয়া অসীমকে ধারণা করা অসম্ভব, যাহাকে ধারণা করিতে পারা যায় তাহাই সসীম হইয়া পড়ে; আপনি বলেন পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে প্রসূতি মারা যায়, স্ত্রীজাতির প্রতি কিছুমাত্র সম্মান থাকিলে এইরূপ বলিতে হয়ত ইতস্ততঃ করিতেন, এমন কি পাপ হইতে পারে যে প্রসবের সময় ভগবান পাপের দণ্ড স্বরূপ এইরূপ নিঃসহায় অবস্থায় প্রসূতির প্রাণবধ করিবেন? ব্যাধও প্রসবকালে কোন প্রাণী শিকার করে না। ইতর প্রাণীও প্রসবকালে কখন কখন মারা যায়, তাহারও কি পূর্ব্বজন্মে পাপ ছিল? পশু উদ্ভিদাদির মধ্যে বৈষম্য দেখিতে পাই কেন? যে প্রাকৃতিক কারণে ইহাদের মধ্যে বৈষম্য ঘটে, মানুষের মধ্যে সেই কারণেই একজন সুস্থ ও অপরে অন্ধ হয়। ন্যায় বিচারের কথা বলেন? ন্যায়-বিচারে দুইটী উদ্দেশ্য থাকে—প্রথম উদ্দেশ্য, সমাজকে শিক্ষা দেওয়া যে এই কার্য্যের এই ফল। পাপের গুরুত্বের উপর দণ্ডের গুরুত্ব নির্ভর করে। এস্থলে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে? প্রতিহিংসা-বৃত্তিই পরিতৃপ্ত করিবার জন্য শাস্তি দেওয়া বর্ব্বরতার পরিচায়ক। পূর্ব্বজন্ম যে আছে তাহার প্রমাণ কি? পূর্ব্বজন্ম কাহার হইবে, পরমাত্মার না জীবাত্মার? "পরমাত্মা বিকারহীন, সত্য, নিত্য পদার্থ; সুতরাং জন্ম-মৃত্যুর অতীত, বেদান্ত মতে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম; অবিদ্যা (মায়া) ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে ব্রহ্মই জীবভাবাপন্ন হয়, জীব বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই।" অতএব জীবাত্মারও পুনর্জন্ম হইতে পারে না, হয়ত কল্পনার জোরে বলিবেন, লিঙ্গ শরীরের পুনর্জন্ম হয়। স্মৃতির যোগ না থাকিলে ব্যক্তিত্বের একত্ব অর্থহীন, ভিত্তিহীন। তারপর সেই গর্ভস্থ শিশু কি পাপ করিয়াছিল? প্রসূতির শারীরিক অপূর্ণতা বশতঃ প্রসূতি ও সন্তান দুই জনেই নিষ্ঠুরভাবে বিনষ্ট হইল। এই ত

ঈশ্বরের সৃষ্টি-কৌশল! এই সকলের পশ্চাতে কি প্রকৃত মঙ্গল থাকিতে পারে?

আমার একটী বন্ধু একটী গর্ভিণী বাঘিনী শিকার করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহার পেটে গুলিবিদ্ধ ছানাগুলাকে দেখিয়া আমার স্ত্রী কত দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন! কোন সভ্য গভর্ণমেণ্ট অতি নিষ্ঠুর হত্যাকারীকেও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলে যত কম কষ্ট দিয়া অপরাধীর প্রাণ লইতে পারা যায় সেই জন্য ফাঁসী, guillotine ও electric batteryর ব্যবস্থা করিয়াছেন। God punishes helplessness and poverty—"ঈশ্বর দুর্ব্বল ও দরিদ্রকে শাস্তি দেন।" প্রবল তাঁহাকে মানিয়া চলে কোথায়? ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। তিনি ত জানেন যে স্বাধীন-ইচ্ছা সত্ত্বেও দুর্ব্বল মানব প্রবলতর রিপুর উত্তেজনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পাপে পতিত হইবে। তিনি জানিয়াও ইহার প্রতিকার করিলেন না কেন? "His created beings will suffer and He will enjoy the fun of seeing it. Is it His intention?" তিনি মজা দেখিতেছেন, তাঁহার লীলা?

আ। যদি মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে তবে লোকে পাপকার্য্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না, সমাজ ধ্বংস হইবে।

না। যে প্রকারের ঈশ্বর বিশ্বাস দেখিতে পাই তাহাতে বোধ হয় না যে ঈশ্বরের ভয়ে, ধর্ম্মজ্ঞানে মানুষ পাপ হইতে বিরত হইয়াছে। প্রকৃত পাপ কি তাহা কোন ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্দেশ করে নাই। Imperialism, Capitalism, Industrialism, বিলাসিতা, অলসতা, পররাজ্য লোভে যুদ্ধ, অযোগ্যের সন্তান-উৎপাদন, এই সকল পাপ ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। Heathen Pagan, কাফের, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি শব্দ পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিচায়ক। কত অমানুষিক অত্যাচার ধর্ম্মের নামে হইয়াছে হইতেছে। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, ধনের ও শক্তির পূজা। নির্ধনের পক্ষে ধার্ম্মিক হওয়া সহজ নহে। এই সব ভাবিলে সত্যই মনে হয় ইহা যেন শয়তানের সৃষ্টি (Devil's creation) "we can forgive God only because He does not exist) আপনি বলিতেছেন ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলে লোকে অকাতরে পাপ করিবে, সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে, কিন্তু আমার মনে হয়, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অভাব পাপের মূল কারণ। দুর্ব্বল জাতি ও দুর্ব্বল ব্যক্তি একটা আশ্রয়, একটা সান্ত্বনা পাইবার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। লোকে সাধারণতঃ সমাজের নিন্দার ভয়ে, শাসনের ভয়ে, আইনের ভয়ে কিছু পাপ হইতে বিরত থাকে। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষায় বিবেক ও বিভিন্ন হয়, সকলের বিবেক এক নহে।

পরকালের ভয়ে, ঈশ্বরের ভয়ে কয়জন পাপ হইতে বিরত থাকে? বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর নিরপেক্ষ, ইহাতে কোন অবিনাশী আত্মার স্থান নাই, কুবাসনার বিনাশ ও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ইহ-জীবনেই "নির্ব্বাণ" লাভ হয়। "Self is but a heap of composite qualities, there is no Personal Creator, neither the Personal God nor the Absolute. According to Buddha's view, Nirvan can be attained and enjoyed in this life and in this life only."—Buddhism by T. W. Rhys Davids

বৌদ্ধের লক্ষ্য "নির্ব্বাণ।" "নির্ব্বাণ" লাভ হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। বৌদ্ধমতে মৃত্যুর পর ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, ইহাই বুদ্ধের শূন্যবাদ। বৌদ্ধধর্ম্ম স্বর্গের লোভ বা নরকের ভয় দেখায় না। বুদ্ধদেব যে নীতি-ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায়? পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধ, মৃত্যুর পর বিলুপ্ত হইয়া যাইবে সেই জন্য বৌদ্ধের মনে আতঙ্কের উদ্রেক হয় না। বৌদ্ধজাতি কি ধ্বংসের দিকে গিয়াছে? বর্ত্তমানে বলশেভিক রুশিয়া ঈশ্বরকে বাদ দিয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। Religion (ধর্ম্মমত) সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। যাঁহারা স্বর্গলাভের আশায় বা নরকের ভয়ে পাপ হইতে বিরত থাকে, তাঁহাদের ধর্ম্মের ও নীতির প্রশংসা করিতে পারি না, কোন ন্যায়বান ভগবান থাকিলে তাঁহাদিগকে স্বর্গে স্থান দিয়া সরল বিশ্বাসের জন্য কোন চরিত্রবান নাস্তিককে নরকে পাঠাইবেন না, ইহা নিশ্চয়,—

"There lives more faith in honest doubt,
Believe me, than in half the creeds."—Tennyson.

আ। সরল বিশ্বাসে যে শান্তি পাওয়া যায় তাহার পরিবর্ত্তে আপনি কি দিবেন?

না। অন্ধ বিশ্বাসের শান্তি অপেক্ষা জ্ঞানের মুক্তি কি অধিক লোভনীয় নহে?

"A discontented man is better than an evercontented ass."

আ। পৃথিবীর এত কোটি কোটি নরনারী আবহমান কাল হইতে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, সেই বিশ্বাসের মূলে কি কোন সত্য নাই? পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ এই সকল জ্ঞান ঈশ্বর না থাকিলে কোথা হইতে আসিল।

না। "This is just, that is unkind are merely the ethical creations of the human mind, There is no good or bad but thinking makes it so." Huxley.—পাপ-পুণ্য বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নাই, ইহা মনের একটা ধারণা মাত্র। "Homo men-Sura"—Man is the measure of all things—সমস্তই মানবের মনের কল্পনা। বিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলেও মানব পাপের জন্য ভগবানের নিকট দায়ী নহে। মানুষ

ব্যক্তিগত চরিত্র-অনুযায়ী কার্য্য করে, "every action is the product of two conditions viz heredity and environment." চরিত্র গঠনে তাহার কোন হাত নাই, জন্মগত প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা তাহার চরিত্র গঠিত হয়। "No person is responsible for his being and the nature and nurture over which he has no control has made him the being he is, good or evil—Karl Pearson. ঈশ্বরের নিকট মানুষ পাপের জন্য দায়ী নহে, পুণ্যের জন্যও প্রশংসনীয় নহে। Causalityর নিয়মে মানবদেহ রোগের আক্রমণ এড়াইতে পারে না ; সেই নিয়মেই মানুষ পাপ-প্রলোভন জয় করিতে পারে না। গীতায় রহিয়াছে—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"—ভগবান যাহা করান তাহাই করি।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে।"
—"প্রকৃতির গুণে জগতের কর্ম্ম চলে
অহঙ্কারে মুগ্ধ আত্মা আমি কর্ত্তা বলে।"

জীবন-সংগ্রামে, natural Selectionএর (প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন) ফলে যে প্রকারে লোকের মাথায় সিং গজাইয়াছে, জিরাফের গলা লম্বা হইয়াছে, সেই প্রকারে মানুষেরও নীতিজ্ঞান জন্মিয়াছে ; নীতিজ্ঞান জীবন সংগ্রামে সহায়তা করে। "Morality is enlightened self-interest." সমাজ রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। পৃথিবীতে একাকী বাস করিলে নীতির কোন প্রয়োজন হইত না। সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মানুষের সংস্কার উপর নির্ভর না করিয়া খাঁটি যুক্তির উপরই নির্ভর করিতে হয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিরা খৃষ্টান, অতএব খৃষ্টান ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এইরূপ যুক্তি পাদরীর মুখেই শোভা পায়।

আ। ঘড়ি দেখিলেই আমরা অনুমান করিতে পারি যে ইহা আপনা হইতেই এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হয় নাই, ইহার একজন সুনিপুণ নির্ম্মাতা আছে, আর এই জগৎ-যন্ত্রের কি কোন নির্ম্মাতা নাই? আপনা হইতেই হইয়াছে? ইহা অসম্ভব—যতই আপনি বলুন না কেন? কেনর উত্তর দর্শন বা বিজ্ঞান দিতে পারে না, "ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে, কথা কেনর জবাব দেয় সে?"

না। প্রথমে আমরা এক ব্যক্তিকে ঘড়ি নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়া অন্য সময় অন্যত্র একটী ঘড়ি দেখিলে স্থির করি, ইহারও একজন নির্ম্মাতা রহিয়াছে। ঘড়ি কৃত্রিম পদার্থ। এই পৃথিবীকে নির্ম্মাণ করিয়াছে, দেখি নাই, পৃথিবী কৃত্রিম পদার্থও নহে, আমি কি প্রকারে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইব? তৃণ-গুল্মাদির যে প্রকারে উদ্ভব হইয়াছে এই পৃথিবীর সেই প্রকারে উদ্ভব হইয়াছে, ইহা যদি অসম্ভব হয়, তবে ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, অনাদি, অনন্ত, ইহাও অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, "Matter and motion are eternal and infinite"—জড় অনাদি, অনন্ত ও স্বয়ম্ভু। জড়ের যে দোষ এড়াইবার জন্য ঈশ্বর কল্পিত হইয়াছে "ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত স্বয়ম্ভু" বলিলে সেই দোষই ঘটে, অতএব এইরূপ অনুমান তর্কশাস্ত্রে বিরুদ্ধ। ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে জড়ের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে "Argumentum ad infinitum" (অনবস্থা) এর দোষ ঘটে না, infinitum (অনন্তত্ব) এর হাত হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেক দার্শনিক "Uncaused Cause" (অকারণ কারণ) মানিয়া লইয়াছেন। "কেনর কেন" জিজ্ঞাসা করা কোন কোন স্থলে নিরর্থক, ডান হাতটা বাম হাত হইল না কেন? এইরূপ প্রশ্ন অর্থহীন, কারণ ডান হাত বাম হাত হইলেও আবার এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারিত। মানুষের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি কিছুতেই তৃপ্ত হইবার নহে।

আ। আপনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না, কি ভয়ঙ্কর!

না। ঈশ্বর বিশ্বাস করিলেই তিনি মুক্ত পুরুষ, আর না করিলেই তিনি ভয়ঙ্কর এইরূপ মনে করেন কেন? দয়ার সাগর ৺ঈশ্বরচন্দ্র, ৺কবি-দ্বিজেন্দ্রলাল, পূত চরিত্র আচার্য্য ৺রামেন্দ্রসুন্দর, ইঁহারা ত ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহারা কি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ছিলেন?

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"বেদান্ত বলেন, (শঙ্করাচার্য্যের মতে) জীব এক বই দুই না:—আমিই একমাত্র চেতন পুরুষ, বেদান্তের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই বাক্যের আর কোন তাৎপর্য্য নাই, আপনাদের যদি উহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অন্যবিধ ধারণা থাকে তাহা সমূলে উৎপাটন করুন।"—বিচিত্র জগৎ। আমারই অনুভূতি—শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—ইহারাই আমার জগৎ। "আমা হইতে ভিন্ন, আমার অতীত কোন স্রষ্টা মনে করা মায়ার কার্য্য"—গীতার ঈশ্বরবাদ, "The Universe is the self-manifestation of Atman, in truth, there is only one thing—the Brahman, the Atman, the self, the Consciousness"—Outlines of Vedanta by Paul Denssan.

দেশ ও কাল (time and space) আমারই মনের কল্পনা (subjective forms of intellect) এই দেশ ও কালের মধ্যে আমার অনুভূতি—শব্দ, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ইত্যাদিকে ছাড়িয়া দিয়া আমিই এই বাহ্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা আমার মায়া প্রসূত। "অহং ব্রহ্মাঽস্মি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি," "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বেদান্তের এই অদ্বৈতবাদ নাস্তিকবাদ হইতে অধিক দূরে নহে। সাংখ্যকার বলেন, জগতের সৃষ্টি অচেতন প্রকৃতি হইতে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ" ইহা ত এক প্রকার নাস্তিকবাদই। "ন্যায়, বৈশেষিক ও পাতঞ্জল ব্যতীত অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রসমূহ যথা বেদান্ত বা উত্তর মীমাংসা

পূর্ব মীমাংসা, সাংখ্য ইত্যাদি ঈশ্বর স্বীকার করে নাই। ন্যায় ঈশ্বর স্বীকার করিলেও প্রকৃতি হিসাবে করিয়াছে, "কর্ম্মফলদাতা" রূপে নহে। পাতঞ্জল ও বৈশেষিক দর্শন গৌণভাবে ঈশ্বর স্বীকার করে কিন্তু জীবের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের দরকার হয় না বলে।" গীতায় ঈশ্বরবাদ। বিলাতে এক সময় নাস্তিকের প্রতি সাধারণের অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল, বিচারালয়ে নাস্তিকের সাক্ষ্য বা অভিযোগ লওয়া হইত না, কিন্তু উদার হিন্দু সমাজ কাহারও স্বাধীন-চিন্তায় হস্তক্ষেপ করিল না। চিন্তারাজ্যের স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাক্ মুনি নাস্তিক ছিলেন। চার্ব্বাক্ দর্শন এক সময়ে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে উহা "লোকায়ত দর্শন" নামে পরিচিত ছিল। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদী, যাঁহারা Idealist (আত্মবাদী) তাঁহারাও সকলে ঈশ্বর-বিশ্বাসী নহেন, অনেকেই Personal god-এ (লৌকিক ঈশ্বর) অর্থাৎ thinking, feeling and willing Being-এ—কোন পরমপুরুষে বিশ্বাস করেন না; কেহ কেহ প্রকৃতি হিসাবে ঈশ্বর বিশ্বাস করেন। সকলের বিশ্বাসও একপ্রকারের নহে।

আ। আপনি কি Materialist (জড়বাদী) না, Idealist (আত্মবাদী) ঠিক বুঝিতেছি না।

না। আমি এক view-point (দিক) হইতে যখন ভাবি তখন আমি Indealist. জগৎ আমারই Idea, "All existence has truth only in idea, for the idea is the only reality"—Hegel, আমি আছে বলিয়াই জগৎ আছে "Its esse is percipe"—Its being consists in being perceived, we cannot know that anything exists which we do, do not know." জ্ঞানে যাহার বিকাশ তাহাই আছে, দ্রষ্টা ব্যতীত দৃষ্ট থাকিতে পারে না।

আবার আর এক view-point হইতে ভাবিলে মনে হয় জড় হইতেই চৈতন্যের উদ্ভব, চৈতন্য মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া—"activity of the brain-cell" চৈতন্য হইতে জড়, আবার জড় হইতে চৈতন্য, দুই-ই সত্য, দুই ভিন্ন দিক হইতে। কোনটা আগে কোনটা পরে, এ প্রশ্ন চলে না। "A world of pure ideas, pure essence, bodiless mind is a figment of imagination, an abstraction, as false as materialists universe of mindless stuff." "It is impossible to think that the Ego should exist without the simultaneous existence of an external world—Dr. Tagore's Ontology. কড়ার concave (ভিতর) দিক হইতে দেখিলে মনে হয় কড়া একটা গর্ত্ত বিশেষ, আবার convex (পিঠের) দিক হইতে দেখিলে মনে হয় কড়া একটা উঁচু ঢিপি বিশেষ, এই উঁচু আর ঢিপি লইয়াই কড়া, এক দিক concave হইয়াছে বলিয়াই অপর দিক convex. কোনটা আগে কোনটা পরে, এ প্রশ্ন চলে না; হয়ত জড় ও চৈতন্য একই অজ্ঞেয় শক্তির (energy) ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ, "utterly beyond not only human knowledge but human conception is the universal power of which nature, life and thought are manifestations"—Herbert Spencer.

আ। আত্মা জড় হইতে ভিন্ন, আমরা বলি আমার দেহ, অতএব আমি দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, আমি অনুভব করি, কে অনুভব করে? আমি। অতএব আমি কর্ত্তা, দেহ হইতে স্বতন্ত্র।

না। কথাটা হইল যেমন, এক ছেলে তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা মুরগী আগে না মুরগীর ডিম আগে?" পিতা কিছুক্ষণ ভাবিয়া পরে বলিলেন, "আমরা যখন কথায় বলি মুরগীর ডিম—তখন বুঝিতে হইবে মুরগী আগে।" আমরা বলি আমি পীড়িত, সে পঙ্গু, ইহা দ্বারা কি আমার আত্মার পীড়া হইয়াছে, তাহার আত্মা পঙ্গু এইরূপ বুঝিয়া থাকি? আমরা কথায় বলি সূর্য্য উঠিয়াছে, অথচ জানি সূর্য্য ওঠে না। এই সকল কথা দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। কে অনুভব করে, এইরূপ প্রশ্ন অসঙ্গত, প্রশ্ন হওয়া উচিত,—কি প্রকারে অনুভূতি জন্মে?

"It is not a fit question to ask who is it that feels?" This is the right way to ask the question—"conditioned by what is there feeling?"

"Self is a mere bundle of sensations It is illusory to assume either a spiritual substance or a material substance as the Cause of our sensations—Hume.

আ। এই সব থিওরি অনেক শুনিয়াছি, ঈশ্বর যে আছেন ও আমি অর্থাৎ আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা আমি আত্মাদ্বারা বুঝিতেছি, আপনার এই সব ধার করা যুক্তিতর্কে আমার মত ও বিশ্বাসের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না।

না। আপনি যদি আত্মা দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব বুঝিয়া থাকেন তবে ভালই, আর যুক্তি তর্ক অনাবশ্যক।

আ। না, না, বলুন না, শুনি, এই কথার উপর আপনার কি বলিবার আছে?

না। নিজেকে নিজে জানিতে পারা যায় না, introspection (অন্তর্দৃষ্টি) অসম্ভব, নিজের মুখ নিজে দেখিতে পাই না, দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব দেখি। আত্মা জ্ঞাতা (subject) ও জ্ঞেয় (object) হইতে পারে না, "আগুন নিজকে নিজে পোড়াইতে পারে না, অতি সুদক্ষ নট ও নিজের স্কন্ধে উঠিয়া নিজে নাচিতে পারে না।" শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম্. এ কৃত শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন।

বেদান্ত মতে আত্মা স্বতঃ-প্রকাশিত, প্রদীপ জ্বালাইয়া যেরূপ সূর্য্য দেখিবার প্রয়োজন হয় না সেইরূপ আমি যে আছি তাহা প্রমাণ করিতে অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন, স্বতঃসিদ্ধ (self-evident) কিন্তু যাহা (self-evident) তাহা কেহ সন্দেহ করিতে পারে কি? Descartes "আমি আছি, কি না" সন্দেহ করিয়াছিলেন, অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, "Cogito ergo sum—I doubt therefore I exist, আমি আছি কি না আমি সন্দেহ করি, কে সন্দেহ করি, আমি, অতএব আমি আছি। এইরূপ সিদ্ধান্ত তর্কশাস্ত্র বিরুদ্ধ-কারণ প্রমাণ্য বিষয়কেই প্রমাণিত বলিয়া ধরা হইয়াছে। এখানে "Begging the question-এর দোষ ঘটিয়াছে, I doubt—"আমি" সন্দেহ করি এই স্থলে "I" "আমি" স্বীকার করা যাইতে পারে না; কারণ "I" প্রামাণ্য বিষয়। Descartes এর Cogito ergo sum" সমালোচনা করিয়া প্রশ্নচ্ছলে Hume জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; "why do you not doubt that you doubt"—"আপনি যে সন্দেহ করেন, এই কথাটি আপনি সন্দেহ করেন না কেন?"

বৌদ্ধমতেও "There is no real 'I' unit—"আমি" বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। অবশ্য আপনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহাই আপনার নিকট সত্য, কারণ আমার মনে হয় সত্য-মিথ্যা মনের অবস্থামাত্র, মনের বাহিরে সত্য-মিথ্যা কিছুই নাই; রামধনুর ন্যায় অলীক, ধাঁধা, আমার অনুভূতিগুলিকে বাদ দিলে জগৎ থাকে না, "আমি"ও থাকি না। "The ideas are themselves the actors, the stage, the theatre, the spectators and the play"—Hume ঈশ্বর ও মনের কল্পনা—"God is only a notion of the human mind ever varying and unrealisable." "There is a wide-spread philosophical tendency to-wards the view which tells us that man is the measure of all things, that truth is man made, that space and time and the world of universals are properties of the mind and that, if there be anything not created by the mind, it is unknowable and of no account for us."—History of Philosophy by Clement Webb. সত্য-মিথ্যা সব মনের কল্পনা, মনের বাহিরে কিছুই নাই, থাকিলেও উহা অজ্ঞেয়, আমাদের ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই। সমস্তই A riddle, an enigma, an Inexplicable mystery—রহস্যপূর্ণ।

"The human conscience revolts against this law of nature, and to satisfy its own instincts of justice, it has imagined two hypotheses, out of which it has made for itself a religion—the idea of an individual providence and the hypothesis of another life"—Amiel's Journal—ঈশ্বর এবং পরকাল মনের কল্পনা। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক Kant বলেন,—"Thus if materialism was inadequate to explain my existence, spiritualism is equally inadequate for that purpose and the conclusion is that in no way whatsoever can we know anything of the nature of our soul, so far as the possibility of its separte existence is concerned—Critique of Pure Reason—যদি জড়বাদ আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইয়া থাকে তবে আত্মবাদও তাহা দিতে সক্ষম হয় নাই এবং আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ তাহা জানিবারও কোন উপায় নাই।

আ। Kant দেশ-কালের অতীত, অতীন্দ্রিয় এক পারমার্থিক সত্তায় "Thing-in-itself" বিশ্বাস করিতেন, ইহাই আমাদের বেদান্তের "নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্ম," আমাদের ব্রহ্ম আর খৃষ্টানদের God এক নয়। আমাদের ব্রহ্ম impersonal (লৌকিক ঈশ্বর নহে)। intuition (প্রজ্ঞা) দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়।

না। এই "Thing-in-itself" (সৎ বস্তু) অসার, অর্থহীন, মন-গড়া কথা—"Metaphysical jargon" উপাধি-বর্জ্জিত. "নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্ম" যদি বা থাকেন তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। "with Shankar even intelligence was not a quality of Brahman, but Brahman was pure thought and pure being"—Maxmuller. এই প্রকার নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্ম" থাকার সার্থকতা কি? এই প্রকারে থাকা বা না থাকা আমাদের পক্ষে উভয়ই সমান, নির্গুণ ব্রহ্মের কল্পনা এক প্রকারের পৌত্তলিকতা—"It is not to be wondered at that Kant should have followers who thought his philosophy would be improved by frankly recognising that the "Thing in itself" was itself, after all, only a creature of the mind, that to suppose there need be anything in our experience which is not produced by the mind from its own resources, is only an inconsistent relic of that "dogmatic" way of thinking, of which it had been Kant's great aim to get rid"—History of Philosophy by Clement Webb. Fichte বলিয়াছেন, ' This" "Thing-in itself" is only a creation of the mind, only ideal."

যদি intuition (প্রজ্ঞা) দ্বারা সৎ-বস্তু জানিতে পারা যায় তবে দার্শনিকগণের মধ্যে এত মতভেদ ও মত-বৈপরীত্য দেখিতে পাই কেন ?

আ। John Stuart Mill নাকি মৃত্যুর পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিকট সকাতরে এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন—"If there be any God and if there be any soul, oh, God save my soul!" নাস্তিকেরা রোগের যাতনায়, মৃত্যুর গলা টিপুনি খাইয়া শেষে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়।

না। Mill ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন ইহা পাদরিদের স্ব-রচিত কথা, তিনি আত্ম জীবনীতে এক স্থানে লিখিয়াছেন,—Her memory was made a religion to me."—ধর্ম্ম যেরূপ পবিত্র বিবেচিত হয় তাঁহার মৃত স্ত্রীর স্মৃতিকে তিনি সেইরূপ পবিত্র মনে করিতেন। প্রকৃত ভালবাসার ইহাই নিদর্শন, "Love is Heaven and Heaven is Love." "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

প্রার্থনা করায় বিশেষ কোন মহত্ব নাই, অবশ্য ইহাতে ঈশ্বরে ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি মনে শান্তি পাইতে পারে। প্রার্থনায় তিনটী উদ্দেশ্য থাকে,—gratitude, glorification and request (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, মহিমা প্রচার ও অনুরোধ) যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা তাঁহাকে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রের পক্ষে glorify করা ধৃষ্টতা, তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি করিবেনই ; বাক্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কার্য্যে করাই প্রকৃত ভক্তির পরিচায়ক। সাধারণ মানুষ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা নীচতা এইরূপ। প্রার্থনায় তাঁহার সংকল্প কিছুমাত্র টলিবে না, তিনি ইহাতে সন্তুষ্টও হইবেন না। আপনি বলিতেছেন নাস্তিককে ঈশ্বর গুঁতোর চোটে "বাবা বলান।" আপনাদের মনে ঈশ্বর-বিশ্বাস কি বাস্তবিক এইরূপ ?

আ। আপনি কতকগুলি নাস্তিকবাদের বিলাতি পুস্তক পড়িয়াছেন আস্তিকবাদের পুস্তক বিশেষতঃ হিন্দুদর্শন কিছুই পড়েন নাই, পড়িয়া থাকিলেও তাহার প্রকৃত তৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। সেদিন একজন দর্শন শাস্ত্রের এম্, এ, তর্কনিধি, কেমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া-ছিলেন -"এই আত্মা অন্নময়, প্রাণময় আদি পঞ্চকোষের মধ্যে অবস্থিত, এই আত্মা কেমন করিয়া পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করে, ইহাই জীবনের বন্ধন, জীব শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনযুক্ত কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ দ্বারা সাজুয্য লাভ করিবে।" কূটস্থ চৈতন্য, ষট্ চক্রভেদ ইত্যাদি অনেক জটিল ও দুর্ব্বোধ তত্ত্ব জলের মত বুঝাইয়াছিলেন, তখন আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, এখন আমার মনে নাই। আপনি যদি একবার শুনিতেন! আপনি নিরামিষ আহারী হইয়া একাগ্রচিত্তে, শুদ্ধ শান্ত মনে এই সকল দুরূহ বিষয় চিন্তা করিলে ধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য দর্শনে এই সকল তত্ত্ব পাইবেন না আমি দর্শনশাস্ত্র বিশেষ আলোচনা করি নাই, সেই জন্য আপনার সকল কথার উত্তর দিতে পারিলাম না ; একদিন তর্কনিধি মহাশয়কে আপনার নিকট লইয়া আসিব ; তখন দেখা যাইবে, কাহার তর্কের জোর বেশী। মাষ্টার মহাশয়, "ভক্তিতে মিলায় হরি, তর্কে বহু দূর," "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।"

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নিবেদন

আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে আধুনিক উন্নত প্রণালীর চাষবাসাদি প্রবর্ত্তন করার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলে দেশের অর্থ সমস্যা যে বহু পরিমাণে মিটিতে পারে, সে বিষয় একপ্রকার নিশ্চিত। আমাদের দেশের লোকের এ দিকে এখনও বিশ্বাস জন্মে নাই, তাহারা এ বিষয়ে মান্ধাতা আমলের পুরাতন পদ্ধতি ও সাধারণ কৃষককুলের উপরেই নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন। সঙ্ঘবদ্ধতা ব্যবসায়ের জ্ঞান ও সতর্ক কর্ম্মশীলতা দ্বারা যে আধুনিক জগতের প্রতিযোগিতায় ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ এবং উন্নত হওয়া যায়, সে বিষয় এখনও কেহ বড় ভাবিয়া দেখেন না।

ঐরূপ ভাবিয়াই আমি একটি কৃষি-সমবায় স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি, এবং সেজন্য কতকগুলি (প্রায় তিন হাজার বিঘা) জমিও সংগ্রহ করিতেছি। যে অর্থের প্রয়োজন তাহা আমার নাই ; দেশবাসীগণ অর্থদ্বারা আনুকূল্য করিলে এই অনুষ্ঠানটি সম্ভব হইতে পারে। আশা করি দেশবাসীগণ হইতে অর্থ-সাহায্য পাইতে বঞ্চিত হইব না। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে উৎসাহিত করিয়া ২৮শে ডিসেম্বরে ১৩২২ তারিখে লিখিয়াছেন,—

"Realising the great importance of organising a large scale farm on a commercial basis in order to prove to our countrymen the efficacy of improved method of agriculture, and knowing for certain that Mr. Pulinbihari Das is one of the most rare of our workers, who has the disintrested spirit of service and marvellous power of organisation necessary for guiding such a work into success, I promise to pay Rs. 500—as my contribution to the fund for which he appeals to the country.

Rabindranath Tagore."

এ সম্বন্ধে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিস্তারিত কেহ কিছু জানিতে চাহিলে আমি সাগ্রহে জানাইব। ইতি

নিবেদক—শ্রীপুলিনবিহারী দাস।

৯০।১, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিমন্ত্রণ-রক্ষা

সুরেশ ও নরেশ বাল্যবন্ধু। অবস্থার বৈষম্য-সত্ত্বেও তাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। নরেশ বড়লোকের ছেলে,—কোন বিষয়েই তার আগ্রহাতিশয্য দেখা যেত না। দৈনন্দিনতার শান্ত ধারাই ছিল তার সারা জীবনের ইতিহাস। কিছুতেই তার মন্থর ভাবের বৈলক্ষণ্য হত না। তার পিতামহ যেরকম ভাবে টাকা জমিয়ে গিয়েছিলেন সেই ভাবেই নরেশ তার ইচ্ছাশক্তির অপচয় হতে দিত না। সুরেশ এই সঞ্চয়-বৃত্তিকে কার্পণ্য বল্‌ত। সুরেশের কাছে নরেশ আত্মার উপর দেহের প্রভূত প্রভাবের নিদর্শন মাত্র। নরেশের বইয়ের নেশা ছিল না, কিন্তু বই কিনে সুরেশকে পড়্‌তে দিত—সুরেশ নির্লজ্জভাবে সেগুলো পড়ে শেষ করত।

আর সুরেশ নেশা না হলে থাক্‌তেই পার্‌ত না। ছেলেবেলায় নস্য—তারপর সিগারেট, চা—তারপর বই এবং পরে বউ। বাইরে থেকে দেখ্‌লে প্রত্যেকটির উপরই তার প্রগাঢ় ভক্তি—কিন্তু বাস্তবিক তা নয়—সে জামাইষষ্ঠীর টাকা নিয়ে বই কিন্‌ত। বিবাহের কিছুদিন পরেই একরাত্রে তার স্ত্রী, সুরেশ পড়্‌ছে এমন সময়, বই কেড়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে দেয়! তখনি দেশলাই জ্বেলে সুরেশ একটু গম্ভীর হয়ে বল্লে, "কি করব বল—ওটা বিদ্যাসাগরের দোষ—কেন উ-কারের আগে ই-কার এল?" সুরেশ সর্ব্বশেষে পঠিত শক্তিশালী লেখকের কথার উদ্গার করত—এই কথা বলে নরেশ তাকে কত ঠাট্টাই করেছে, কিন্তু নরেশ জান্‌ত মনে-মনে যে সে মোহ ক্ষণস্থায়ী। দু এক মাস পরেই সুরেশের গুপ্ত সত্তা খাড়া হয়ে উঠ্‌ত, তখন তার মত কঠিন হ'তে কঠিনতর হত, অবশ্য নবশক্তি-আবির্ভাবের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত। কিন্তু প্রত্যেক বন্যা যেমন পলি রেখে যেত সেটা ধীরে ধীরে এক যে অতি উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছিল, সে খবর সুরেশ জান্‌ত না—কিন্তু নরেশ জান্‌ত। লোকে তাকে inconsistent বললে সে চেঁচিয়ে বল্‌ত—"তোদের এমার্সনই বলেছে, "Inconsistency is the hobgoblin of little minds." সত্যই তার কথা এবং কাজের ভিতর এমন একটি আন্তরিক সঙ্গতি ছিল, যেটা বন্ধুর চোখ ব্যতীত আর সকলের চোখ এড়িয়ে যেত। একজন নন্-কো-অপারেটার তাকে 'পশ্চিম সভ্যতার কুফল' বলাতে নরেশ ধীরে ধীরে জবাব দিয়েছিল, "সুরেশ নিজের দামে জিনিষ কেনে, পরের দামে নয়।"

সুরেশ অনর্গল কথা কয়—নরেশ শোনে আর মাঝে মাঝে সে যে জেগে আছে, এই সত্যের প্রমাণ দেয় 'হুঁ হাঁ' করে। সুরেশ কথা কইতে কইতে ভাবে—সে ভাষায় না আছে শ্রী, না আছে সৌষ্ঠব—তার ক্ষুরধার বুদ্ধি শুধু বিশ্লেষণ কর্‌তেই জান্‌ত—পরের বোকামির পায়ে শাণ দিতেই জান্‌ত—খুব কম সময়ই সেটা খাপে পোরা থাক্‌ত। গোলদীঘীর ধারে বস্‌লে তার মাথা খুলে যেত—সন্ধ্যাবেলায় তার কথায় ফোয়ারা ছুটত—বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা এবং ভাবে যার অধিকার সে কিন্তু সব কথা শেষ করত নিজেকে বিশ্লেষণ করে। নরেশ তাকে Egoist বল্‌লে সে উত্তর কর্‌ত—"Hamletism বল। হ্যামলেটের অসামঞ্জস্যই হচ্ছে উন্নতির মূল কারণ। রুষিয়ার প্রত্যেক নায়কই হ'চ্ছে Egoist. Egoismএর নিন্দা করো না, বেদান্ত তা হ'লে কোথায় দাঁড়ায়?"

২

তখন সুরেশ এফ্, এ পড়ে—তার ভগ্নীপতি থাক্‌তেন আসামে। বড় দিনের ছুটিতে তেজপুর থেকে তার দিদি চিঠি লিখ্‌লেন যেতে—চিঠির সঙ্গে সঙ্গে একটা কুড়ি টাকার মনি-অর্ডার এল। কলকাতার ধোঁয়া তার বুকে হাঁপ ধরিয়ে দিত, নরেশও পুরী যাচ্ছে—সুরেশও বেরিয়ে পড়্‌ল।

দুদিন পরে যখন সে তেজপুরে পৌঁছুল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আরদালী গাড়ীতে লট-বহর তুলে তাকে বাসায় নিয়ে গেল। রাত্রে খাবার সময় সুরেশ তার দিদিকে তাঁর মেয়ে বেশ সুন্দরী হয়েছে, এই খবরটা

দিলে। দিদি বল্লেন, "ওকে আর সুন্দরী বলিস্‌নে—কাল সকালে ওর চেয়েও সুন্দরী তোকে দেখাব। ওলো অলি, কাল মুখ্‌খীকে ডাকিস্‌ ত। সে আজ সন্ধ্যাবেলায় আসেনি, লজ্জা হয়েছে বুঝি?" মেয়ে বল্লে, "না মা—সে এসেছিল। তবে মামাবাবুকে দেখে বল্লে—ওরে ঠিক দাদার মতন—আর পালিয়ে গেল।"

তেজপুরের শীত একটু ভিন্ন রকমের। বেলা আটটা পর্যন্ত সুরেশ লেপের ভিতর শুয়ে রইল। যখন ঘুম ভাঙল, তখন মনে হল, জান্‌লার ফুটো দিয়ে তার চোখের পাতায় আলো এসে পড়েছে—সব সোনালি দেখাচ্ছে—খুব তীব্র চাঁপা ফুলের গন্ধ সব ঘরকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে চোখ বুজে পড়ে রইল। অলি এসে তার গায়ে হাত দিয়ে বল্লে, "মামাবাবু ওঠো, দেখ, কে এসেছে।" চোখ খুল্‌তে না খুল্‌তে এক জোড়া মাটি-ছাড়া পা দেখ্‌তে পেলে। অলি "ওঃ যাঃ, পোড়ারমুখী পালিয়ে গেল।"

"কে? মুখ্‌খী বুঝি?"

"হ্যাঁ, ভারী লজ্জা—আমি আর আন্‌তে পারি না" এই বলে অলি বিছানায় বসে মুখ্‌খীর জীবন-কাহিনী আবৃত্তি করে যেতে লাগল—তার সম্পর্কে পিস্‌তুতো বোন হয়—ওরা সকলে সুন্দর—ওর আর এক বোন পূজার সময় এসেছিল, সেও খুব সুন্দর—তবে অত নয়। ওর পড়াশোনায় মতি নেই—শিবের মাথার চাঁপা ফুল নিজের খোঁপায় গুঁজেছিল—মার সঙ্গে ঝগড়া করে—ওর বাবার সঙ্গে বেশী ভাব অথচ যদি মা হৃদয় বাবুর গিন্নীর সঙ্গে গল্প করে, কি, তাদের বাড়ী বেড়াতে যায় তা হ'লে ভয়ানক চটে যায়—আর ওর বাবা কাছারি থেকে এলেই বলে দেয়—গিন্নী এলেই কুকুর ছেড়ে দেয় আর বলে, ছুঁয়ে ফেল্‌, ছুঁয়ে দে গিন্নীকে—খুব প্যাঁচ মার্‌তে পারে—আঁচলের খুটে ঝিনুক নিয়ে বেড়ায় তা কি শীত কি গ্রীষ্ম!"

খানিক পরে দিদি তাকে ধরে নিয়ে এলেন—যেন কত শান্ত মেয়েটী! পরণে পেঁয়াজ রংএর সাড়ী, ভুরু ও চোখের তারা উজ্জ্বল, যেন চীনে কালি দিয়ে আঁকা! কাল-বৈশাখীর পর যখন আকাশ সন্ধ্যা বেলায় পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন যেমন একটা হল্‌দে সোনালি আভা কালোকনেকেও সুন্দরী করে তোলে—বাঙ্গালা মেয়েরা যাকে ঘরোয়া ভাষায় 'কনে দেখা বেলা' বলে—সেই রকমের রঙ মুখ্‌খীর। সুরেশ তার চেহারার সঙ্গে অলির বর্ণনা খাপ খাওয়াতে না পেরে হেসে ফেল্‌লে, "কই রে অলি, এ ত দুষ্টু নয়—"মুখ্‌খী হাত ছিনিয়ে পালিয়ে গেল।

সেই দিন থেকে মুখ্‌খীর দুষ্টুমি সুরু হল। মুখ্‌খী বিকালে অলিকে বল্লে, "তুই পাজী, আমি ভাল—আর তোর মামা খুব পাজী। আর আমি যদি পাজী হই তা হ'লে দ্যাখ্‌ আমি কি রকম পাজী হতে পারি।" দুষ্টুমী হচ্ছে অন্তর্ধান-বিদ্যার খেলা, জুতো লুকিয়ে রাখা, জামার বোতাম ছেঁড়া, টকিংএর গার্ডার উড়িয়ে দেওয়া—এই সব থেকে আরম্ভ ক'রে শেষকালে চায়ের পেয়ালায় কম চিনি দেওয়া আর লেপের ভিতর মিনি বেড়াল পুরে রাখা। সুরেশ নীরবে সহ্য করে একদিন প্রতিশোধ নেবে ঠিক করলে। যেই কলমের কালি জান্‌লার তলায় ফুলগাছের ঝোপে পড়েচে, অম্‌নি সুরেশ মুখ্‌খীর হাত দুটো চেপে ধরে অলিকে ডেকে বললে, "সেই শিশিটা নিয়ে আয়।" অলি শিশিটা নিয়ে এলে সুরেশ তাকে দু-হাত দিয়ে জোরে মুখ্‌খীর হাতদুটো চেপে ধর্‌তে বললে। তখন ছিপি খুলে একটা আরশুলার শুঁড় ধরে বার করে মুখ্‌খীর চোখের সাম্‌নে ধরলে—মুখখী তখন চোখ বুজে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে—পালাবার চেষ্টা নেই—মুখ শুকিয়ে গেছে। সুরেশ তার মাথায় তেলাপোকাকে ছাড়্‌তে গিয়ে দেখে যে, মুখ্‌খীর মুখ সাদা হয়ে গেছে। সুরেশ বললে, "আর কালি ফেলে দেবে? আচ্ছা, যাও—আর যদি দুষ্টুমি দেখি, তা হ'লে এই তেলাপোকা ছেড়ে দেবো।" এই ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে সুরেশ নরেশকে একদিন বলে'ছিল, "লোকে যাকে cadaverous বলে সেটা ভুল—সত্যি Cadaverous দেখ্‌তে খুব ভাল। তার ওপর যদি সে চোখ বুজে কাঁপে—!"

তারপর থেকে মুখ্‌খী খুব গম্ভীর হয়ে গেল—সুরেশের ছুটীর মেয়াদও ফুরিয়ে এল। যেদিন কলকাতায়

ফিরবে, সে দিন সকালে সে একটা পয়সা ওপরে ছুড়ে ফেলে দিলে—যদি রাণীর মুখ পড়ে, তা হ'লে মুখ্‌খীর সঙ্গে যাবার আগেই দেখা হবে! উল্‌টো পড়্‌ল—মন তার খারাপ হয়ে গেল। যাত্রা করবার পর রাস্তায় এসে দেখ্‌লে যে মুখ্‌খী তাদের ঝুম্‌কো-লতার গাছের তলায় গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সুরেশ সে দিকে আর না চেয়ে বরাবর ষ্টেশনে চলে এল।

তার তিন বছর পরে সুরেশ অলির বিয়েতে তেজপুরে যায়—বাসর ঘরে মুখ্‌খীকে দেখ্‌তে পেয়ে প্রথমটা চিন্‌তে পারেনি। সে একেবারে বদ্‌লে গেছে! সুরেশের দিদি বললেন, "ওর বিয়ে হবে শীগ্‌গির, সব ঠিক হয়ে গেছে, খুব ভাল পাত্র।"

সুরেশ এসে নরেশকে মুখ্‌খীর বিবাহ হয়ে গেছে বলাতে নরেশ তাকে একবার চন্দ্রশেখরের পাতা উল্টে নিতে উপদেশ দিলে। সুরেশ বললে, "কি জান—ওটা প্রেম নয়, ভালো লাগা মাত্র।"

"না, ওটি প্রেম - বাল্য প্রেম।"

সেই রাত্রে বাসায় গিয়ে সুরেশ একবার বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলী ওলটাতে লাগ্‌ল। হাতে ছোঁওয়া মাত্র সে বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, তার প্রেম হয়েছে—সব লক্ষণই বর্ত্তমান। বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলীর মলাটে যে দৈনিক বসুমতীর আদালতের খবর ছিল, সেখানে ফরিয়াদী আসামীর কথা পড়েই তার মন চম্‌কে উঠ্‌ল—অমনি আসামের কথা, তারপর তেজপুর—তার মাঝে মুখ্‌খী বসে রয়েছে। সুরেশ ভাব্‌লে, যে কালে প্রেম হয়েছে, তখন পুরো দমেই সে প্রেম করে যাবে। তার জীবন অভিশপ্ত—ভালই ত, সমস্ত মাসিক সাহিত্য কেবল দুঃখের কথাই কয়! ব্যথা, বাথা, ব্যথা—ব্যথায় সব রঙ্গীন হয়ে উঠ্‌বে! রবিবাবুও লিখ্‌ছেন, "সকল কাঁটা ধন্য করে গোলাপ হয়ে ফুটবে।" Oscar Wildeও তাঁর De Profundis এ তাঁর জীবনের সার্থকতা দিয়েছেন ব্যথায়।

এম.এ পরীক্ষার ছ' মাস পূর্ব্বে নরেশ সুরেশকে বললে, "প্রেমের ফাঁদে যেন পরীক্ষাটি ফাঁস না হয়! আবার বাড়ী গিয়ে পড়বে চল—তোমাকে চাকরি করে খেতে হবে।"

সুরেশ পাশ হল নরেশের তাড়ায়। পাশের খবর পাবার পর সুরেশের দিদি তাকে চিঠি লিখ্‌লেন, "যদি তোমার কৃতজ্ঞতা থাকে, তা হ'লে তোমার জামাই বাবুর প্রস্তাব অমান্য করো না।"—প্রস্তাব বিবাহের, যদিও ভাষা আদালতের। কন্যাটী জামাই বাবুর এক আত্মীয়ের,—অরক্ষণীয়া সুন্দরী। কন্যার পিতা তেজপুরের স্কুলের শিক্ষক—ভদ্র বংশ ইত্যাদি। নরেশেরও সেই সময় বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছিল। সুরেশ চিঠি নিয়ে তার কাছে গেল। নরেশ চিঠি দেখে বল্‌লে, "এখনি সম্মতি দাও—সেই বিয়ে কর্‌তেই হবে—লোক হাসিয়ে কাজ নেই। আমিও মত দিয়েছি—মার কথা কখনও শুনিনি, একবার না হয় শুন্‌লাম।" সুরেশ বললে, "তোমার আর আবার অবস্থা এক নয়।"

"হ্যা, তোমার আমার চেয়ে খারাপ।"

নরেশের মা সুরেশকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "বাবা, তুই যদি আমাকে ভাল বাসিস্‌, তা হলে বিয়েতে মত দে। তুই না বিয়ে করলে নরেশ বিয়ে করবে না বলেছে—আমি নাতির মুখ দেখে কাশী-বাসী হব।" সুরেশ "ভেবে দেখি" বলে বাসায় চলে গেল। নরেশ তাকে যাবার সময় বল্‌লে, "মত দিয়ো হে, দয়া ক'রে, তা না হলে আমার বিয়ে হবে না। আর এও ত মন্দ নয়, ঘরে স্ত্রী অথচ প্রেমের সাহিত্যে মহত্ত্বের উৎস অন্যত্র—এই ত আথ্‌ছার ঘাট! আথ্‌ছার কেন, এই প্রতিভার রীতি—আমি পড়িনি; কিন্তু এই রকম একটা সংস্কৃত শ্লোক কেউ না কেউ ধর্ম্ম-শাস্ত্রে লিখে গেছেন।"

৩

বিবাহ হয়ে গেল। তার বাসরে মুখ্‌খী এলনা। সে সেখানে ছিল না, শ্বশুর-বাড়ী ছিল। পরের দিন সকালে একখানা পত্র এল। মুখখী লিখেছে, "দাদা, বাণী আমার সমবয়সী। তাকে বৌদি বলব, না, ছোড়্‌দি বলব, তাই ভাব্‌ছি। বড় দুঃখ যে, তোমার বিয়েতে যেতে পার্‌লাম না।

ছোড়দি বড় ভাল, সত্যি ভাল—বড় ভীতু—আরশুলা দেখিয়ো না"—সুরেশের এই প্রথম চিঠি পাওয়া।

সুরেশ নববধূক পেয়ে দেখ্‌লে যে সে বিছানায় এক পাশে শোয়, কোণে শুতে ভালবাসে—ট্রাঙ্কে এবং দেওয়ালের ফাঁকে যেখানে শুধু একটী বিল্লী যেতে পারে।—সুরেশের দিদি বল্লেন, "পাখীর খাবারে হবে না—একটা ছেলেপুলে হতে না হতেই ইতিয়ে যাবে।" এক টুকরো মেয়ে, তবু পৃথিবীকে ভার বহন করাতে নারাজ। গিরীশ বাবু মধ্যে মধ্যে তাঁর নায়িকে যেমন একটী ছোট্ট মধুর মেয়ে আঁকতেন —এ তেমনি! পারস্য দেশের ছবিতে যেন কার্পেটের ধারে একটী ছোট্ট ফুল, তপন-তাপে শুকিয়ে যেতে যারা জন্মেছে! সুরেশ একদিন এসে নরেশকে বলেছিল, "বাণীর বধবা হওয়া উচিত ছিল!

নরেশ একটু চোখ কুঁচকে বললে, "অর্থাৎ, বোধ হয় একটু সাত্ত্বিক প্রকৃতির!"

প্রথমে সুরেশের লজ্জা হল, কি ক'রে একে ভালবাস্‌বে! নরেশ বললে, "কেন জুলিয়েট রোমিওর দ্বিতীয় পক্ষ—"

"ও সব বইয়ের কথা।"

বটে!"

"ও সব হয় যাদের হৃদয়ে চিরবসন্ত বিরাজমান!"

"কেন? বর্ষামঙ্গল তো দ্বিতীয় রাত্রেই জমেছিল।"

একমাস পরে পরে সুরেশ হিসেব করে দেখলে যে তার স্ত্রীর প্রতি বর্ত্তমান মনোভাবকে দয়া বলা যেতে পারে —সে যে কেমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে—চোখের পাতা সহজেই লাল হয়—ঠোঁট কাঁপে-কাঁপে,—কিন্তু মুখ্‌খীর যেমন কেঁপেছিল তেমন ঠক্‌ঠক্ করে নয়—আরো মৃদু ভাবে। একদিন রাত্রে হরিবোল দিয়ে যখন একটা মড়া নিয়ে গেল, তখন এই সরমী মেয়েটি তার সরম টুটে ফেলে সুরেশের বুকের কাছে চলে এল। সুরেশ এতদিন পরে মুখ্‌খীর সঙ্গে তার স্ত্রীর একটা নিগূঢ় মিল খুঁজে পেলে। ভাবলে, "স্ত্রীলোকেরা কি একটা বিশিষ্ট জাতি যারা আরশুলা দেখে মূর্চ্ছা যাওয়া থেকে আরম্ভ করে হরিধ্বনি পর্য্যন্ত শুধন অজ্ঞান হ'য়ে স্বামীকে বিপদে ফেল্‌তে পারে? ও জাতই আলাদা। যাই হোক, সুরেশ বিছানা থেকে বোকার মতন লাফিয়ে অভয় প্রদান কর্‌তে লাগ্‌ল, "ভয় কি? ও মড়া —আরশুলা নয়। ভূত নেই, মরে গেলে সব ফুরিয়ে যায়। আমি রয়েছি—ভয় কিসের?"

বাণী তবু ছাড়লে না। সেই রাতের ভোরে সুরেশ ঠিক করলে যেকালে মরে গেলে কিছু থাকে না তখন বিবাহ হলে পূর্ব্ব-স্মৃতি লোপ পাওয়া উচিত—আর যে অভয়বাণী সে দিয়েছে সেইটেই সত্য,—আমি রয়েছি ভূত নেই! সুরেশের একটা অদৃশ্য মহাশক্তি ছিল যে তাকে—চাণক্যের পাষাণীর মতন নয়—ভাল দিকেই নিয়ে যেত—সক্রেটিসের demon এর মত, রবিবাবুর জীবন-দেবতার মত। সুরেশ তাকে নমস্কার করে ঘুমিয়ে পড়ল।

৪

নূতন জীবন আরম্ভ হল—নরেশেরও হয়েছিল। দুই বন্ধুতে গোলদীঘির ধারে নোট compare কর্‌তে কর্‌তে একদিন নরেশ বললে, "স্ত্রীকে damaged goods দিয়ে লাভ আছে?"

সুরেশ বললে, "চব্বিশ বছরের বাঙ্গালীর জীবনে আর কি damaged হবে? জীবনের দু-একটী ঘটনা স্ত্রীকে না বলাই ভাল। প্রত্যেক স্ত্রীর অনেক গোপনীয় কথা থাক্‌বে, প্রত্যেক স্বামীরও তাই। অতএব সুখে সংসার কর্‌তে হলে প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের নীরবতাকে শ্রদ্ধা করে চলা উচিত।"

নরেশ বলেন, "এরই মধ্যে সুখ সম্বন্ধে থিওরি বেরিয়েছে! pessimist হলে কবে? আত্মদান সব উড়ে গেল!"

সুরেশ বললে, "না। এবার সুখী হব ভাবছি। সুখ—বুঝেছ—নিজের হাতে। প্রেম বইয়ের কথা আর যে প্রেম জীবনের কথা, সেটা সোয়াস্তি।"

সুরেশ কিন্তু নরেশকে লেকচার দিয়ে বাড়ী গিয়েই তার স্ত্রীকে বললে যে তার প্রেম হয়েছিল মুখ্‌খীর সঙ্গে। বাণী চুপ ক'রে রইল। সুরেশ অনর্গল বকে যাবার পর রেগেই বললে, "শুন্‌লে গা Iceberg?"

"হাঁ। তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়"—

সুরেশ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বস্‌ল—"তাই না

কি? তবু একটা কিছু হয়! আমিই যে তোমাকে এতদিন দয়া করে আস্‌ছি, আছি আজ বুঝি তার প্রতিশোধ নিলে? দেখছি, সবই উল্টে যায়, নয়?"

৫

পরের বৎসর সুরেশের একটী পুত্র হল। নরেশের স্ত্রী এসে বাণীকে বললে, "ওকে আমায় দিতে হবে—আমি ওর মা—তুমি ওর আসল মা।"

"আচ্ছা—শেষকালে যেন ফিরিয়ে নিয়ো না। দিয়ে ফেরৎ নিলে কি হয় জানো ত?" ষষ্ঠী-পূজার পরেই নরেশ ছেলেকে নিয়ে গেল—সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন সে থাকে ও বাড়ীতে আর চার দিন এ বাড়ীতে।

ছেলের ভাতের সময় বাণী সুরেশকে অনুরোধ করলে' দিদিকে এই মর্ম্মে লিখ্‌তে যেন তিনি আসবার সময় মুখ্‌খীকে নিয়ে আসেন—

মুক্ষী এল—আসা পর্য্যন্ত সে ছেলেকে কোল থেকে নামালে না - যাবার সময় পর্য্যন্ত গাড়ীতে নিয়ে গেল। সুরেশকে ষ্টেশন থেকে খোকাকে নিয়ে আস্‌তে হল। ঘোড়ার গাড়ীতে ওঠবার সময় মুখ্‌খী বাণীকে বললে, "ছোড়দি খোকাকে দেবে?" বাণী একটু হেসে বললে, "না, দেবো না। তা হলে তুমি আর আস্‌বে না। না দিলে খোকার টানে আস্‌বে। খোকা হল বলেই ত এলে—"

সুরেশ বলে উঠ্‌ল, "তবে আস্‌তে পেলে বল—"

মুখ্‌খী বললে, "তা না হ'লে আস্‌তে পেতাম না। আচ্ছা, এবার থেকে খোকার জন্য আসব।"

তার পর যখনই মুখ্‌খী কলকাতায় আসে, তখনই ছেলেকে দেখে যায়—সে এসে ছেলেকে আদর দিয়ে মাটী করে যায়, সুরেশের এই অভিযোগ! বাণী বলে, "আসুক না, ভয় কি? আমি রয়েছি।"

৬

সেদিন বেড়িয়ে ফেরবার সময় সুরেশ নরেশকে বললে, "তোমার আর কি, চল না। গোলদীঘিতে সন্ধ্যাকৃত্য সেরে বাড়ী ঢুকবে, তার পর খেয়ে দেয়ে আলো জেলে একখানি পুরোণো 'ভারতী'র পাতা ওলটাতে ওলটাতে ঘুমিয়ে পড়বে, বীণা এসে আলো নিভিয়ে দেবে। শুনেছি, তুমি আবার মাদাম বোভারির স্বামীর মতন ভোঁস-ভোঁস করে নাক ডাকাও! তোমার স্ত্রীকে অপমান করছি না।"

নরেশ উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলে, "আর তুমি?"

সুরেশ একটু গলাটা তারিয়ে নিয়ে বলে যেতে লাগল, "আর আমি? আমি আলোর গায়ে একখানা খবরের কাগজের টুক্‌রো জড়িয়ে জানলার কোণে রাখব—একখানা বই খুলে আকাশ পাতাল ভাব্‌ব। কি যে পড়ি আর কি যে ভাবি, তার ইয়ত্তা নেই! এক এক রাত্রে মনে হয়, আর পারি না, পাগল হয়ে যাই, কাগজ নিয়ে বসি—সাজাতে গিয়ে সব গুলিয়ে যায়। জননী বঙ্গভাষা আমাকে savage সন্তান ঠাওরান—আবার ইংরিজী লিখতে গেলে বাঁধা বুকনীর দাসত্বে ভাব তার সহজ গতি হারায়—মাথায় তোয়ালে ভিজিয়ে বাঁধি। তার পর হঠাৎ মনে হয়, খোকাকে দুধ খাওয়াতে হবে, খোকার মাকে ডেকে দি। দুধের বাটী হারিকেনের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে যে ঘুমিয়ে পড়ে - সারাদিন তাকে কি গাধার মতন পরিশ্রম করতে হয়, তুমি কি জানবে? আবার ডেকে দি - যেদিন মড়ার মতন ঘুমিয়ে পড়ে, সেদিন আর ডাকতে পারি না দুধ খাওয়ানোই হয় না। সেই দুধে সকালে চা করে দেয়, ডেকে দিইনি বলে বকেও না ভাই, —এই আমার রাতের রুটিন।"

নরেশ খানিক পরে ধীরে ধীরে বললে, "নিজে না পড়ে ছেলেকে ঘুম পাড়াওগে। common-placeকে ফাঁকি দেবে, সাধ্য কি? মাদাম্‌ বোভারির দুর্দ্দশা সকলেরই হয়। কি স্ত্রী, কি পুরুষের।" নরেশ বাড়ী ফিরল, সুরেশও পাশের দোকানে দড়ি থেকে চুরুট ধরিয়ে বাড়ীমুখো হল।

৭

বাড়ীর সদর দরজায় পৌঁছেই সে জিজ্ঞাসা করলে, "দোর খুলে রাখলে কে রে?" কে-একজন জবাব দিলে, "এই যে দাদা! এতক্ষণে বুঝি বাড়ী ফেরা হল। আমরা যে সব খেয়ে-দেয়ে বসে আছি। এত রাত্রে খেলে নিজেরও শরীর খারাপ হয়, আর ছোড়দিরও জেগে বসে থাক্‌তে হয়।

"এই যে মুখ্‌খী! কবে এলে?"

"তুমি বেরিয়ে যাবার পরই আমার দেওর এখানে দিয়ে গেল।"

"হঠাৎ যে বড়! এবার কিন্তু অনেক দিন পরে!"

"হাঁ দাদা, আসি-আসি করে আর আসা হয়ে ওঠে না। এবার ছোড়দিকে নিয়ে যেতে এসেছি—ছাড়ব না কিন্তু। তোমাকেও যেতে হবে, আর খোকা বাবুকেও—খোকন-মণিকেও—আমি বুঝি তোর কেউ নই? আমি যে তোর মা।"

"ও সকলের কোলেই যায়, বেশী আর ভাল বাসে না, সেই জন্য তোমার কোলে থাক্‌ছে না। নিমন্ত্রণ কিসের?"

"আমার দাদার বিয়ে। কাল সকালে আসাম মেলে যেতে হবে—সে মেয়ে আমি দেখে পছন্দ করে এসেছি।"

"অর্থাৎ সে সুন্দর না হয়ে যায় না—কি বল, মুখ্‌শ্রী? তোমার ও থিওরি ভুল। সুন্দর কালোকে ভালবাসে—বাঁশী-নাক খাঁদাকে—পটল-চেরা আলুচেরাকে—অতএব সে মেয়ে কালোই হবে। যাই হোক, তোমার শোবার যায়গা হয়েছে ত? পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে সব স্বামীদের নিন্দে করগে—"

"না দাদা, আমি আর খোকন একসঙ্গে শোব। খোকন-মণি শোবে ত? কাঁদতে নেই রে, আমি যে তোর মা।"

"ওর তা হ'লে তিন মা হলো। তিন মাতে ওর মাথাটী চিবিয়ে খেয়ো না।"

"আর একটী মা কে, দাদা?"

"নরেশের স্ত্রী। তিনি আবার খোকনকে না দেখ্‌লে থাকতে পারেন না।—খোকার তারি সঙ্গে সব চেয়ে ভাব—সে হচ্ছে মা, আর তোমার ছোড়দি হচ্ছে আসল মা। আর কথা, কলমে কালি পুরে রাখা হয়েছে?" সুরেশের স্ত্রী সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়্‌তে নাড়্‌তে ওপরে উঠতে লাগল। মুখশ্রী বললে, "কই দাদা—তোমার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখ। কাল নটায় ট্রেণ। ছোড়দি, চাবিটা দেবে, চল।"

"তুমি নেহাৎ ছাড়বে না, কি বল?"

"কিছুতেই না।"

"বেশ, তোমার ছোড়দিই না হয় যাক, আবার আমায় কেন?"

"সেটি হবে না—তা হলে আমরা কেউ যাব না। একে ছোড়দি কথা কয় না, তার ওপর তুমি না গেলে মুখে ইস্ক্রুপ পড়ে যাবে। কোথায় মেশে মেশে খেয়ে বেড়াবে।"

"না, মেশে কেন? নরেশের বাড়ীতে থাক্‌ব'খন্‌, সেই বেশ হবে। তোমরা যাও। অনেক রাত হয়েছে, সকালে উঠতে হবে, দুমুঠো খেয়ে যেতে হবে ত! দুজনে ঘুমিয়ে পড়গে।"

আধঘণ্টার ভিতর যখন মুখ্‌শ্রী—তার ছারপোকার গন্ধ বড় ভাল লাগে—মশার সঙ্গে তার ভাব এবং ছোড়দির সঙ্গে তাদের শত্রুতার খবর দিতে তার ছোড়দিকে নিয়ে সুরেশের ঘরে এল, তখন আলো কমানো। "দাদা ঘুমোলে—ওঃ ঘুমিয়েছ! তুমি শোওগে ছোড়দি। খোকাকে আমার কাছে দাও।"

"ও কাঁদবে, আর কাঁদলে ঘুম ভেঙ্গে যাবে, রাগ করবেন।"

"আচ্ছা, আমি যাই—ভোর-বেলা উঠতে হবে।"

বাণী বিছানায় শুতেই সুরেশ চুপি চুপি বললে, "শুয়ে পড়, খোকাকে দাও না ওর কাছে।"

"না, খোকার ওর কাছে ওখানে গিয়ে কাজ নেই। তুমি ঘুমোবে?"

"হাঁ, শরীর বড় ক্লান্ত হয়েছে।"

৮

সুরেশের ঘুম আসে শেষে, অনেক সাধ্য-সাধনার পর—অনেকক্ষণ নিদ্রাদেবীর সঙ্গে লড়াই করে যখন হেরে যায়, তখনই সে জেতে। হাত-পা কাঠ করে মড়ার মতন সে পড়ে থাকে—নিশ্বাস গুণতে থাকে; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শরণাপন্ন হয়ে বৃষ্টি পড়ার কথা ভাবে—ভেড়ার সার চলেছে, ভাবে—কিন্তু ছ্যাক্‌ড়া গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি সব ভেড়ার দলকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়! তাই আজ ঘুম যখন এল না, তখন সে সঙ্কল্প করলে যে, আজ আর ঘুমাবে না। রোজই তার মনের একটা অংশ ছাড়া পেয়ে উধাও হয়ে

যায় ধোঁয়ার আবরণে, তার সন্ধান মেলে না। আজ রাত্রে একটী প্রজাপতি গুটী কেটে বেরিয়ে পড়ল, এই প্রজাপতির অভিসারের কথা সুরেশের জান্‌তে ইচ্ছা হল। কোথায় যাচ্ছে? কার উদ্দেশে? সেও ধীরে ধীরে উড়ল—এই যে তার দেহখানি বিছানায় পড়ে রয়েছে,—বাঃ, উড়ে যাওয়ায় কি আনন্দ! ঐ যে প্রজাপতি একটা নীল সাগরের ধারে এল, ঐ যাঃ, সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে—তার মন আর উড়তে পারে না, তাই ডাঙ্গার ধারে একটা কাঁটাবনের হল্‌দে ফুলের ওপর মনটী তার বসে রইল—প্রজাপতি উড়তে উড়তে এক জায়গায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেখানে একটা ঘূর্ণী—ঘন নীলের মধ্যে সাদা ফেনা গর্জ্জাচ্ছে! হঠাৎ সেই আবর্ত্তের মধ্য হতে সেই পুরাকালের সুন্দরীর মত এক অপরূপ মূর্ত্তি উঠল—ও যে মুখ্‌খী, মুখ্‌খীরাণী—সোনার দেহ, পেঁয়াজ রংএর সাড়ী পরা, তার কোলে একটি ছেলে। সে ছেলেটী তারই স্ত্রীর, বাণীর! কাঁটাগাছ ছেড়ে মন উড়তে চাইলে,—আর সে পারে না। ওগো ভেসে যেতে দাও—যেথা নিয়ে যাও আমাকে—ওগো প্রজাপতি, আমাকে ডাকো না, আরো জোরে—আরো জোরে—কাঁটাবনে আর বস্‌ব না... খোকা খুঁৎ খুঁৎ করে উঠল, সুরেশ তাকে থাবড়াতে আরম্ভ করলে। হঠাৎ বাণী ধীরে ধীরে সুরেশের গায়ে হাত দিলে—সুরেশ চম্‌কে উঠল।

"জেগে রয়েছ?"

"হাঁ বাণী—কেন?"

"অমনি।"

খানিক পরে বাণী আবার সুরেশের গায়ে হাত দিয়ে বল্‌লে, "যাবে ত? তেজপুরে?"

"গেলে হয়! কি জানো, নিমন্ত্রণ রক্ষা সামাজিকতার প্রধান অঙ্গ। তুমি যাবে?"

"নাঃ!"

সুরেশ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "যাবে না কেন?"

"অমনি।" তার পর বাণী হঠাৎ সুরেশের খুব বুকের কাছে সরে এসে বললে, "ওগো যেয়ো না।"

"কেন?"

"না, যেয়ো না।"

"আচ্ছা, না হয় তুমিই যেয়ো।"

আবার সব চুপ্ চাপ্। ভোর রাতে খোকা "বাবু" "বাবু" বলে কেঁদে উঠল—সুরেশ ধড়মড়িয়ে উঠল। খোকা আব্‌দার ধর্‌লে, তার মার কাছে যাবে অর্থাৎ নরেশের স্ত্রীর কাছে। কেউ তার কান্না থামাতে পার্‌লে না। মুখ্‌খী পাশের ঘর থেকে উঠে এল, "ছোড়্‌দি, ওকে আমার কাছে দাও, ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি—"

খোকা কিন্তু গেল না। বাণী বললে, "তুমি ঘুমোও গে—ওকে থামাতে পারবে না।"

"দ্যাখো না—"

খোকার কান্না বেড়ে চল্‌ল। শেষকালে বাণীর কাছে এল, খানিক পরে কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল। মুখ্‌খী ঘর থেকে চলে গেল। সুরেশ ঘুমন্ত খোকার মুখে চুমু খেয়ে বললে "নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে দিলিনি—সামাজিকতা রাখব কি করে? মুখ্‌খী পোড়ারমুখী, বাণী তোর মা—আর বাণী তোর মা—বুঝ্‌লি! ভুলিস্‌নি।"

পরদিন সকালে মুখ্‌খী বললে, "থাক্ ছোড়্‌দি, তুমি না হয় যেয়ো না—দাদায় মেশে খেলে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হবে।"

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সুখপর

আজকে সুখপর।
টিক্‌টিকী আজ পড়্‌লো দিদি,
পড়্‌লো মাথার পর।
বাছুরটীকে ভাই
দুধ দিতেছে গাই,
মুখের সে দুধ উপ্‌ছে পড়ে'
ঝরছে ঝর ঝর।
আজকে সুখপর!

নাইক দেরী আর
শঙ্খচিল ওই ডেকে ডেকে
আসছে বারম্বার !
বাঁ চোখটী ঐ নাচে,
আসছে কে আজ কাছে—
পথিক-বধূ, মন-ভুলানো
বেশটী আজি কর।
আজকে সুখপর।

লাবণ্যে ঢল ঢল
আজকে সিঁথির সিঁদুর তোমার
বড্ড যে উজ্জ্বল।
চকোরী বুক বাঁধ,
আসছে কাছে চাঁদ,
উঠছে কেঁপে পিপাসু তোর
রক্তিম অধর !
আজকে সুখপর।

জেনেছে তোর প্রাণ
উঠার আগেই সিন্ধু যে পায়
রাকা শশীর টান।
কাণের কাছে বোন
কি কয় ভ্রমর, শোন্,
কনক কলস পূর্ণ করে
আগিয়ে আনো ঘর।
আজকে সুখপর।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রাচীন ভারতের মণিরত্ন

ভারতবর্ষ রত্ন-প্রসূ বলিয়া আমাদের দেশে পরম্পরাগত একটি প্রবাদ-বাক্য চলিয়া আসিয়াছে। কোন্ আবহমান কাল হইতে এখানে রত্ন উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে, জানি না, তবে অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সুদূর বৈদিক যুগেও ভারতবর্ষে প্রচুর রত্ন উৎপন্ন হইত এবং ঐ মণিরত্নের সহিত সে সময়ের মানুষের বিশেষ পরিচয় ছিল। মহাভারত ও পৌরাণিক যুগে মণিরত্নের সহিত ভারতবাসীর সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ঐ যুগের ভারতীয়েরা স্বদেশ-জাত মণিরত্নগুলির নাম, গুণ, ব্যবহার, পরীক্ষা-প্রণালী এবং প্রাপ্তিস্থান আকরগুলির সহিত বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন; মহাভারতে ও পুরাণগুলিতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। মণিরত্নের সহিত এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে প্রাচীন ভারতের উচ্চ সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের উজ্জ্বল মণিরত্নগুলির ভিতরে মুক্তা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। মুক্তার আকার গোল এবং আভা শুক্লবর্ণ। মুক্তা, শুক্তি, শঙ্খ, মৎস্য, বেণু (বাঁশ), সর্প, হস্তী, মেঘ ও বরাহে উৎপন্ন হইত বলিয়া পুরাণ-কার নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। পুরাণ কারের মতে শুক্তি হইতে উৎপন্ন মুক্তাই শ্রেষ্ঠ এবং গজমুক্তা ও শঙ্খজাত মুক্তা নিকৃষ্ট। শুক্তিজাত মুক্তা অন্যান্য মুক্তা হইতে অধিক উজ্জ্বল ও গুরু। শঙ্খজাত মুক্তা পীতবর্ণ। গজমুক্তাও ঈষৎ পীতবর্ণ এবং প্রভাহীন। মৎস্য মুক্তা সামুদ্রিক মৎস্য হইতে উৎপন্ন হইত। মুক্তা গোল, লঘু ও সূক্ষ্ম। বরাহ মুক্তা প্রশস্ত এবং দেখিতে বরাহের নবোদ্গত দন্তের আভাবিশিষ্ট। বাঁশ হইতে যে মুক্তা উৎপন্ন হইত, উহা দেখিতে শ্বেত পাথরের মত ও অতি সুন্দর। এই মুক্তা সর্ব্বত্র পাওয়া যাইত না। সর্পমুক্তা মৎস্যমুক্তার ন্যায় বিশুদ্ধ ও গোল। ইহার আভা শাণিত খড়্গের মত। মেঘজাত মুক্তা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না বলিয়া পুরাণে উক্ত হইয়াছে। যত রকমের মুক্তা

আছে, তাহার মধ্যে কেবল শুক্তিজ মুক্তাই বেধ করা যাইত, অন্য মুক্তাগুলি অবেধ্য।

পুরাণ-রচয়িতার মত-অনুসারে প্রাচীন কালে আটটি দ্রব্যে মুক্তা উৎপন্ন হইত। তাহার ভিতর শুক্তিজ মুক্তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আধুনিক সময়ে মুক্তা শুক্তি ও শঙ্খে উৎপন্ন হয় বলিয়াই আমরা জানি। সামুদ্রিক মৎস্যে এবং বাঁশে মুক্তা উৎপন্ন হয় কি না, খনিজতত্ত্ববিৎ তাহার বিচার করিবেন। সর্প, হস্তী, মেঘ ও বরাহে কিরূপে সে সময় মুক্তা উৎপন্ন হইত বলিতে পারি না। বোধ হয় সর্প যে সকল শুক্তি ভক্ষণ করিত, তাহার পেটের ভিতর মুক্তার সহিত সেই শুক্তিগুলি পাওয়া যাইত ; এই জন্যই সর্পজ মুক্তার কথা বলা হইয়াছে। হস্তীর শুভ্র দন্ত এবং বরাহের নবোদ্গত ধবল দন্তাবলীর আভা মুক্তার ন্যায়।

ঐগুলি হইতে সে সময়ে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা নির্ম্মিত হইত বলিয়া বোধ হয়। শিলাবৃষ্টি হইলে মেঘ হইতে মুক্তার ন্যায় শিল পৃথিবীতে পতিত হয় ; কোন কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে মেঘ হইতে শ্বেত প্রস্তর বর্ষণও হইয়া থাকে শুনা যায়। শিশির-কণা ও তুষার দেখিতেও মুক্তা-ফলের মত। শুক্তির ভিতরে শিশির-কণা পতিত হইয়া মুক্তা উৎপন্ন হয় এইরূপ প্রবাদ আছে। সেই জন্যই বোধ হয় মেঘজ মুক্তার কথা লিখিত হইয়াছে।

সিংহল, পারলোক, সৌরাষ্ট্র, তাম্রপর্ণ, পারশব কৌবের, পাণ্ড্য, হাটক, ও হেমক এই আটটি দেশের নদী ও সাগরে মুক্তা পাওয়া যাইত বলিয়া ঐ দেশ কয়টি পুরাণে মুক্তার আকররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ দেশগুলি ব্যতীত পুণ্ড্রবর্দ্ধনেও সে সময়ে মুক্তা উৎপন্ন হইত। যে মুক্তা শ্বেতবর্ণ, বৃহৎ, স্নিগ্ধ, গুরু, স্বচ্ছ, নির্ম্মল, উজ্জ্বল, গোলাকার এবং যাহা দেখিলেই সকলের মনে আনন্দ হয় ও যে মুক্তার শুভ্রচ্ছটায় অন্ধকার গৃহও আলোকিত হইয়া যায় প্রাচীন কালে সেই মুক্তাই সর্ব্বগুণযুক্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। লবণ-মিশ্রিত জলে মুক্তা একরাত্রি রাখিয়া ধান্যের সহিত শুষ্ক বস্ত্রে বেষ্টন করিয়া রাখিলে যদি মুক্তা বিবর্ণ না হয়, তবে উহা অকৃত্রিম। তখন এই প্রণালীতে মুক্তার অকৃত্রিমতা পরীক্ষা করা হইত। মুক্তা বিশুদ্ধ করিতে হইলে মুক্তাগুলি লেবুর রসে মাখাইয়া থালায় রাখিয়া জ্বাল দিতে হয়, তারপর ঐগুলি ভেলার মূলে ঘষিলেই বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল হইত। উজ্জ্বলতা ও গুরুত্ব অনুসারে প্রাচীনকালে মুক্তার মূল্য নিরূপিত হইত। মণির পরিমাণ নিম্নলিখিত উপায়ে করা হইত :—চার মাষায় একশান্ (অর্দ্ধতোলা) ; ষোড়শ মাষায় এক সুবর্ণ ; পঞ্চ মাষায় এক কৃষ্ণল। একশান্ পরিমিত মুক্তার মূল্য নিরূপিত হইয়াছিল ১৩০৫ মুদ্রা।

পদ্মরাগ মণি :—পদ্মরাগ মণি উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, রক্তাভ, বন্ধূক ফুল, পলাশ ও জবাফুল, দাড়িম্ববীজ, সিন্দুর, রক্তপদ্ম, কুঙ্কুম ও লাক্ষারসের ন্যায় রক্তবর্ণ। পদ্মরাগ মণি, সৌগন্ধিক কুরুবিন্দ, সিন্দুর মণি, অরুণোপল, অর্কোপল, শোণিতোপল, মণিরাগ প্রভৃতি নামেও পরিচিত। বর্ণাধিক্য, গুরুত্ব, স্নিগ্ধতা, মসৃণতা, বর্ত্তুলতা, নির্ম্মলতা, তেজস্বিতা ও মহত্ত্ব অনুসারে প্রাচীন কালে পদ্মরাগ মণির উৎকৃষ্টতা বিচারিত হইত। এই মণি সিংহল, অন্ধ্রদেশ, মরুদেশ ও তুম্বরু দেশে পাওয়া যাইত। পুরাণে উক্ত হইয়াছে, যে পদ্মরাগ তৈল প্রভৃতি স্নেহ-পদার্থ দ্বারা মার্জ্জনা করিলে দীপ্ত হয়, কিন্তু স্পর্শ করিলেই দীপ্তিহীন হইয়া যায়, ঊর্দ্ধ অথবা অধোভাগ অঙ্গুলি দ্বারা ধারণ করিলে যাহার পার্শ্বদেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং যাহা ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিলে সর্ব্ববর্ণ-বিশিষ্ট হয়, মণি-পণ্ডিতেরা ঐরূপ পদ্মরাগ মণি পাইয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতেন। পদ্মরাগ মণিতে অন্য কোনও মণিদ্বারা লেখন হয় না। তণ্ডুলদ্বারা পরিমাণ করিয়া গুরুত্ব ও উজ্জ্বলতা অনুসারে পদ্মরাগের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইত। পদ্মরাগ মণি সকল মণিকেই কর্ত্তন করিতে পারিত। অধুনা পদ্মরাগ মণি চুনি পাথর নামে পরিচিত।

মরকত মণি :—মরকত মণি সবুজ বর্ণ ও কোমল। টিয়াপাখীর কণ্ঠে, শিরীষ ফুলে, জোনাকির পৃষ্ঠদেশে, শ্যামল তৃণক্ষেত্রে, শৈবলে, কহ্লারে, নূতন ঘাস ও ভুজঙ্গমে যে বর্ণ, মরকত মণিতেও সেই বর্ণ দেখা যাইত বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ণ এত উজ্জ্বল ও গাঢ় আভাযুক্ত যে শ্যামল তৃণক্ষেত্রে এই মণিটি রাখিলে ইহার দীপ্তিতে তৎক্ষণাৎ তৃণের শ্যামলতা তিরোহিত হইত। যে মরকত

মণি বিচিত্র, অমসৃণ, মলিন, রুক্ষ, পাষাণ ও কর্করপূর্ণ তাহা নিকৃষ্ট। যে মরকতে ভল্লাতক ফলের আভা দেখা যাইত তাহা বিজাতীয়। ভল্লাতকপত্রের বাতাসে যদি মণি বিবর্ণ হইত তাহা হইলে উহা কৃত্রিম। প্রায় সবগুলি মণির দীপ্তি উর্দ্ধগামিনী; অল্প কতকগুলির দীপ্তি সরলভাবে বহির্গত হইত। যে মণিগুলির প্রভা বক্রভাবে পতিত হইত তাহাদের দীপ্তি চিরকাল স্থায়ী হইত না। মরকত মণি সমুদ্রে পাওয়া যাইত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্যই সমুদ্র রত্নাকর আখ্যায় অভিহিত। পরিমাণ ও উজ্জ্বলতা অনুসারে পদ্মরাগ মণির ন্যায় প্রাচীন কালে ইহারও মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। মরকত মণি হরিণ্মণি ও গরুড় মণি নামেও পরিচিত। ইহার আধুনিক নাম পান্না।

ইন্দ্রনীল মণি :—ইন্দ্রনীল মণি নীলবর্ণ ও উজ্জ্বল। নীলপদ্মে, ভৃঙ্গে, অপরাজিতা ফুলে, জলধির জলে, ময়ূরের ও কোকিলের কণ্ঠে এবং নীলহংসে যে বর্ণ ইন্দ্রনীল মণিতেও সেই বর্ণ। যে ইন্দ্রনীল মণির মধ্যে ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় প্রভা দেখা যাইত, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, মহামূল্য ও ভূতলে দুর্ল্লভ বলিয়া পুরাণে কথিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ইন্দ্রনীল মণির দীপ্তি এত উজ্জ্বল যে শতগুণ দুগ্ধের মধ্যে রাখিলে ইন্দ্রনীল-মণির নীলিমায় দুগ্ধ নীলবর্ণে রঞ্জিত হইত। ঐরূপ মণিকে মহানীল-মণি বলা হইত। ইন্দ্রনীল-মণি সিংহলদ্বীপ ও শ্যামদেশে প্রচুর পাওয়া যাইত। যে ইন্দ্রনীল-মণি মৃত্তিকা ও পাষাণযুক্ত, সরন্ধ্র ও কর্করযুক্ত এবং যেগুলির রং মেঘমালার মতন সেইরূপ মণি দূষিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। পদ্মরাগ-মণি যে রকমে পরীক্ষা করা হইত ইন্দ্রনীল মণির পরীক্ষাও সেইরূপে হইত। গুরুত্ব ও উজ্জ্বলতা অনুসারে পদ্মরাগ মণির মত ইন্দ্রনীল-মণিরও মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইন্দ্রনীল-মণি, নীলোৎপল, নীলমণি, মহানীল মণি, নীলা, নীলরত্ন ও নীলকান্ত মণি নামেও পরিচিত।

বৈদূর্য্যমণি :—ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় বৈদূর্য্যমণিও গাঢ় নীল বর্ণ; ময়ূরকণ্ঠ বা বংশপত্রের বর্ণের মত সমুজ্জ্বল। ভারতভূতিক সীমার প্রান্তভাগে বিদুর পাহাড়ের অনতিদূরে এই মণির আকর ছিল। বিদুর পাহাড় হইতে মণিটির নাম বৈদূর্য্য হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পরিমাণ ও উজ্জ্বলতা অনুসারে ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় বৈদূর্য্য মণিরও মূল্য নিরূপিত হইয়াছিল।

পুষ্পরাগ মণি :—পুষ্পরাগ মণি পীতবর্ণ। পুষ্পরাগ মণি বিবিধ; যে মণির বর্ণ ঈষৎ পীত তাহার নাম পুষ্পরাগ। ঐ মণি পীত লোহিত আভাযুক্ত হইলে কোরণ্ডক মণি, লাল আভাযুক্ত হলুদে স্বচ্ছ হইলে কষায় মণি এবং নীলাভ শুক্লবর্ণ হইলে সোমানক মণি নামে পরিচিত হইত। সবগুলি পুষ্পরাগ মণি হিমালয়ে পাওয়া যাইত বলিয়া পুরাণে উক্ত হইয়াছে। এই মণির মূল্য বৈদূর্য্য মণির মতন। অধুনা পুষ্পরাগ মণির নাম পোখরাজ।

কর্কেতন মণি :—কর্কেতন মণি নানাবর্ণে বিভক্ত; রক্তবর্ণ, চন্দ্রপ্রভ, মধুর ন্যায় আভাযুক্ত, ঈষৎ তাম্রবর্ণ, পীত, অগ্নির মতন উজ্জ্বল বর্ণ, নীল ও শ্বেত। কর্কেতন মণি বিদ্ধ অথবা কর্কশ হইলে দীপ্তিহীন হয়। যে কর্কেতন মণি স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সমান-বর্ণ, ঈষৎ পীতাভ, গুরু ও বিচিত্র তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ-রচয়িতা বলিয়াছেন, সুবর্ণপাত্রে রাখিয়া অগ্নিতে তাপ দিলে কর্কেতন মণির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই মণিটি পদ্মবনে উৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার কোন মূল্য নিরূপিত হয় নাই। মণিশাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিতেরা কর্কেতন মণির মাহাত্ম্য ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন।

ভীষ্মক মণি :—ভীষ্মক মণি শুক্লবর্ণ। এই মণির প্রভা শঙ্খ ও শ্বেতপদ্মের বর্ণের ন্যায় শুক্ল। সুবর্ণের সহিত সম্বদ্ধ করিয়া কণ্ঠে অথবা অঙ্গুরীয়করূপে অঙ্গুলীতে ভীষ্মক মণি ধারণ করিলে মানুষের হিংস্রজন্তু অথবা অন্য কোন অমঙ্গলের ভয় থাকে না। হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর প্রদেশে ভীষ্মক মণির আকর ছিল। দেশকালভেদে এই মণির মূল্য নিরূপিত হইত। আকরের দূরবর্ত্তীস্থানে ভীষ্মক মণির মূল্য অধিক এবং নিকটবর্ত্তী দেশে অল্প হইত।

পুলক মণি :—পুলক মণি তাম্রবর্ণ। গুঞ্জা, মধু, মৃণাল, অগ্নি ও পক্বকদলী, শঙ্খ এবং সূর্য্যের আভার ন্যায়

বর্ণ বিশিষ্ট। পুলক মণি দশার্ণ, বাগ্‌দব, মেকল, কালগাদি প্রদেশের পাহাড়ে এবং নদীতে উৎপন্ন হইত। একপল পরিমিত পুলক মণির মূল্য নিরূপিত হইয়াছিল পঞ্চ শত মুদ্রা।

ইন্দ্রগোপ মণি :—ইন্দ্রগোপ মণি শুক পাখীর মুখের আভাবিশিষ্ট এবং দেখিতে পীলুফলের মতন। নর্ম্মদা নদীর তীরদেশে এই মণি পাওয়া যাইত।

তৈলস্ফটিক মণি :—তৈলস্ফটিক মণি ধবলবর্ণ। শ্বেত শঙ্খ ও পদ্মের বর্ণ বিশিষ্ট। এই মণিটি কাবেরী, বিন্ধ্য, যাবন, চীন ও নেপাল দেশে উৎপন্ন হইত। শিল্পকার সংস্কৃত করিলে তৈলস্ফটিক মণির মূল্য নিরূপিত হইত।

প্রবাল :—প্রবাল অতিশয় লাল আভাযুক্ত। ইহা দেখিতে জবাফুল ও গুঞ্জাফলের ন্যায় রক্তবর্ণ। দাক্ষিণাত্যে কেরলদেশে যে প্রবাল উৎপন্ন হইত তাহা উৎকৃষ্ট। পুরাণে কথিত হইয়াছে রোমক (রোম্) ও দেবক (গ্রীস্) দেশে নীলবর্ণের এক প্রকার প্রবাল উৎপন্ন হইত। প্রবাল প্রসন্ন, কোমল, স্নিগ্ধ ও গাঢ় রক্তবর্ণ হইলেই বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রবাল বিদ্রুম মণি নামেও পরিচিত।

হীরক :—পুরাণ শাস্ত্রে বিভিন্ন বর্ণের হীরকের বর্ণনা আছে। হিমালয়, মাতঙ্গপর্ব্বত, সুরাষ্ট্র, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, কোশল, বেণ্বাতট ও সৌবীর দেশে হীরকের আকর ছিল। এই আট্‌টি প্রদেশের এক এক আকরে এক এক বর্ণের হীরক উৎপন্ন হইত। হিমালয় পর্ব্বতে উৎপন্ন হীরক ঈষৎ তাম্রবর্ণ, বেণ্বাতটীর হীরক শশিপ্রভ, সৌবীরদেশের হীরক নীলপদ্ম ও মেঘমালার আভা-সম্পন্ন, সুরাষ্ট্রদেশজ হীরক তাম্রবর্ণ, কলিঙ্গদেশের সুবর্ণবর্ণ,কোশলের পীতবর্ণ, পুণ্ড্রদেশে উৎপন্ন হীরক শ্যামবর্ণ এবং মাতঙ্গদেশজ হীরক ঈষৎ পীতবর্ণ বলিয়া পুরাণে উক্ত হইয়াছে। যে হীরক অত্যন্ত লঘু, নিরেট, উজ্জ্বল, পার্শ্বদেশে সমান, রেখাবিন্দুও কলঙ্কহীন এবং তীক্ষ্ণধার সেই হীরকই উৎকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণের ব্যবহারের জন্য পুরাণে চতুর্ব্বর্ণ হীরক বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শঙ্খ, কুমুদ ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হীরক, ক্ষত্রিয় শশক ও নকুলনেত্রের আভাবিশিষ্ট হীরক, বৈশ্য কদলীপত্রের বর্ণযুক্ত শ্যামল এবং শূদ্র শাণিত খড়্গের ন্যায় শ্বেত আভাযুক্ত হীরক ব্যবহার করিবেন। রাজা দুই রকম হীরক ধারণ করিতে পারেন—জবাফুল ও প্রবালের মতন রক্তবর্ণ অথবা হরিদ্রা রসের ন্যায় পীতবর্ণ। রাজা সর্ব্ববর্ণের ঈশ্বর বলিয়া ইচ্ছা করিলে সকল বর্ণের হীরকই ধারণ করিতে পারিতেন। অন্য কোন বর্ণের এই অধিকারটুকু ছিল না। আকরের বিভিন্নতা অনুসারে হীরকের বিভিন্নতা হইত। পুরাণের মতে যে হীরক ষট্‌কোণ শুদ্ধ, নির্ম্মল, তীক্ষ্ণধার, উজ্জ্বলবর্ণ, লঘু, সুপার্শ্ব এবং দোষহীন এবং যাহার আভা ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় আকাশে প্রতিফলিত হইত, সেইরূপ হীরক সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং পৃথিবীতে দুর্লভ। হীরক যত লঘু হয় তাহার মূল্য তত বৃদ্ধি হয় কিন্তু পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিগুলির গুরুত্ব অনুসারে মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অন্যান্য মণিরত্নের গৌরববৃদ্ধি হইত তাহাদের গুরুতায়—হীরকের গৌরব বৃদ্ধি হইত ইহার লঘুতায়। পুরাণে কথিত হইয়াছে, হীরক সকল মণিরত্নকেই কর্ত্তন করিতে পারে; হীরককে কেবল হীরকদ্বারাই কাটা যায়। হীরকের আভা বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল ও ঊর্দ্ধগামিনী। বক্রভাবে ভগ্ন হইলে অথবা উহাতে কোন বক্র রেখা থাকিলে হীরকের পার্শ্বভাগে কোনও দীপ্তি থাকে না। জলে নিক্ষেপ করিলে হীরক নিমগ্ন হইত না। ক্ষারদ্বারা উল্লেখন করিয়া প্রাচীনকালে হীরক পরীক্ষা করা হইত। আটটি শ্বেতসর্ষপে এক তণ্ডুল; এইরূপ দ্বাদশ তণ্ডুল পরিমিত হীরক হইতে হীরকের মূল্য প্রথম নিরূপিত হইয়াছিল।

প্রাচীন গ্রন্থে কথিত আছে, হীরক ও অন্যান্য মণিরত্নের আকরগুলিতে অনেক বিষধর সর্প বাস করিত; এই সর্পগুলির ভয়ে তখন কেহই আকরে প্রবেশ করিতে সাহস পাইতেন না। যাঁহারা মণিরত্ন সংগ্রহ করিতেন, তাঁহারা সাপ তাড়াইবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করিতেন; সঙ্গে মাংসখণ্ড লইয়া আকরে ফেলিয়া দিতেন, নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ হইতে ঈগল পক্ষী নামিয়া আসিয়া আকরে প্রবেশ করিত। ঈগল পক্ষীগুলি সর্প বিনাশ করিলে তাঁহারা আকর হইতে মণিরত্ন সংগ্রহ করিতেন।

তাঁহাদের এই কৌশলটি হইতে ক্রমে রত্নের আকরে পশু-বলির প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত মণিরত্ন ব্যতীত কাঁচ, গিরিকাঁচ, শিশুপাল ও স্ফটিক নামে চারিটি দ্রব্য ছিল। ঐগুলি দেখিতে ঠিক মণির মতন, এমন কি অনেকে অনেক সময় মণি বলিয়া ভ্রম করিতেন। এইজন্য ঐ চারিটি দ্রব্য কৃত্রিম মণি নামে পরিচিত। পরিমাণে উহারা মণি হইতে অনেক লঘু এবং দীপ্তিহীন। কাঁচে কিছুই লেখা যায় না। শিশুপাল অতিশয় লঘু; গিরিকাঁচে কোন দীপ্তি নাই; স্ফটিক কিছু উজ্জ্বল। ঐ চারিটি পদার্থে যোজিত করিয়া মণিরত্ন ধারণ করিলে উহাদের শোভা বর্দ্ধিত হইত।

প্রাচীনকালে মণিরত্ন ভারতবাসীর বড়ই আদরের সামগ্রী ছিল। ভারতের শিল্পী ঐগুলি সোনা-রূপায় সংযুক্ত করিয়া নানারকমের সুন্দর অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতেন। সে সময়ে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলেরই অলঙ্কার পরিধানের রীতি সমাজে প্রচলিত ছিল। ঐ মণিরত্নগুলি মহামূল্য বসন ভূষণে খচিত হইয়া উহাদের শোভা বর্দ্ধন করিত। রাজসিংহাসন, রাজমুকুট, রাজপ্রাসাদ ও দেব মন্দিরগুলিও উজ্জ্বল রত্নে মণ্ডিত হইয়া শোভা পাইত। শুভ্র মুক্তাফলগুলি রেশমি সূতায় বাঁধিয়া মালার আকারে তাঁহারা কণ্ঠে ধারণ করিতেন। মণিরত্নের নানারকম অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করিয়া অঙ্গুলিতে ধারণ করিতেন। রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে রাজা ও প্রজাগণ নানাদেশ হইতে প্রচুর মণিরত্ন সংগ্রহ করিয়া সম্রাট্‌কে উপহার দিতেন। মণিরত্ন অঙ্গের ও গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিয়া মানুষের মনে আনন্দের সঞ্চার করিত। যাহাতে সকলেই ঐগুলি ব্যবহার করিয়া সমাজের, পরিবারের ও দেশের শোভা-সম্পদ্ এবং আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রাচীন ভারতের মণিশাস্ত্রকারেরা সর্ব্বসাধারণের ভিতরে মণিপ্রচলনের জন্য প্রমাণিত করিয়াছিলেন, মণিরত্ন ধারণ করিলে মানুষের প্রতিদিন আয়ু, সম্পৎ, স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধান্য, গো, পশু প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় এবং সাপ, অগ্নি, বিষ, ব্যাঘ্র, জল, তস্কর ও শত্রুর ভয় দূর হয়। রাজা মণিরত্ন ধারণ করিলে শত্রু ও সামন্তদিগকে দমন ও বশীভূত করিয়া সসাগরা পৃথিবী ভোগ করিতে পারেন। সন্তানাভিলাষিণী রমণী মণিরত্ন ধারণ করিলে পুত্রবতী হইতে পারেন। এমন কি দরিদ্র মানবও রত্ন ধারণ করিলে নিষ্কণ্টকে পৃথিবী ভোগ করিতে সমর্থ হয়। অগ্নিতে মণি নিক্ষেপ করিলে মণি দগ্ধ হইয়া যায়; মানুষ যাহাতে দেশের মণিরত্নগুলি ঐরূপে নষ্ট না করে, তাহার জন্য পুরাণশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অগ্নিতে মণিরত্ন নিক্ষেপ করিলে মানুষের অর্থহানি ও অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। বিজাতীয়, দোষযুক্ত এবং কাঁচ স্ফটিক প্রভৃতি কৃত্রিম মণিমুক্তা ধারণ করিলে ভারতের উজ্জ্বল উৎকৃষ্ট মণিরত্নগুলির আদর কমিয়া যাইবে এবং মানুষ প্রতারিত হইবে, এই ভয়ে যাহাতে কেহ ঐরূপ মণিমুক্তা ধারণ করিতে না পারে তজ্জন্য প্রাচীন ভারতের মণিশাস্ত্রকার বিজাতীয় এবং কৃত্রিম মণিরত্নের উপর প্রচুর পরিমাণে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক শুল্ক বসাইয়া ছিলেন। গভীর গবেষণার পর তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন, যদি কোন লোক জ্ঞান অথবা অজ্ঞানবশতঃ ঐরূপ মণিরত্ন ধারণ করে, তবে তাহার শোক, চিন্তা, রোগ, মৃত্যু ও বিত্তনাশ প্রভৃতি বিপদ ঘটিবে। রাজা ঐরূপ মণিরত্ন ধারণ করিলে রাজ্যহানি হইবে এবং স্ত্রীলোকের বৈধব্য ও পুত্রহানি ঘটিবে। শাস্ত্রের এই আদেশের পরেও ঐরূপ মণিমুক্তা ধারণ করিবার সাহস কাহারও হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

প্রাচীন ভারতে মণিরত্নের আকর লইয়া নরপতিদিগের ভিতরে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ একটি যুদ্ধের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মগধের নিকটে গঙ্গাতীরে এক পাহাড়ের পাদদেশে মূল্যবান্ রত্নের আকর ছিল। মগধরাজ অজাতশত্রু এবং বৈশালী ও লিচ্ছবীদিগের সহিত এই আকরটির জন্য খৃঃ-পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে যুদ্ধ হইয়াছিল। আকরের রত্নগুলি অজাতশত্রু ও লিচ্ছবীগণ প্রতিবৎসর সমানভাবে ভাগ করিয়া লইবেন, স্থির হয়। পরবৎসর এই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া অজাতশত্রুর অনুপস্থিতিতে লিচ্ছবী এবং বৈশালীরাজ আকরোৎপন্ন মণিরত্নগুলি লইয়া যান। ঘটনাটি জানিতে পারিয়া অজাতশত্রু বৈশালীরাজ বেড়কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন।

মণিরত্নগুলি মানুষের ভিতর ঈর্ষা ও হিংসার ভাব জাগাইয়া তাহাদের মধ্যে শত্রুতা ও দলাদলি সৃষ্টি করিত বলিয়া সে সময়ের ভারতীয় মণিশাস্ত্রকারেরা ভাবিতেন যে উহাদের ভিতর কোন আসুরিক তেজ নিহিত আছে। সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে বল নামক অসুরের মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া পৃথিবীর যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই প্রদেশে মণিরত্নের এক একটি আকর উৎপন্ন হইল। বলাসুরের শ্বেত অস্থিকণা যে সকল স্থানে পড়িয়াছিল, সেখানে হীরকের আকর হইল। তাহার শুক্লবর্ণ দন্ত হইতে মুক্তা, রক্তবর্ণ শোণিত হইতে পদ্মরাগ মণি, পিত্ত হইতে মরকত মণি, নীল নয়নদ্বয় হইতে ইন্দ্রনীল মণি, চর্ম্ম হইতে পুষ্পরাগ, নখ হইতে কর্কেতন ও পুলকমণি, বীর্য্য হইতে ভীষ্মকমণি, রূপ হইতে ইন্দ্রগোপমণি, মেদ হইতে তৈল স্ফটিক মণি এবং অস্ত্র হইতে প্রবালের আকর উৎপন্ন হইল।

খৃষ্টের জন্মের কিছু পূর্ব্বে ও পরে যে সকল বিদেশী বণিক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের ভারতীয় পণ্য-দ্রব্যের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন ভারতের এই মহামূল্য মণিরত্নগুলি গ্রীস্, রোম, মিশর, আরব ও সে সময়ের অন্যান্য সভ্যদেশ-সমূহের লোকেরা সমাদর করিতেন। ভারতবর্ষের রত্নগুলি তখন প্রচুর পরিমাণে ঐ ঐ দেশে প্রেরিত হইত। ঐ দেশের বণিকেরা তাঁহাদের স্বদেশজাত মণিরত্নগুলিও ভারতবর্ষে লইয়া আসিয়া বিক্রয় করিতেন। খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে 60A. D) "পেরিপ্লাস্ অব্ দি এরিথ্রিয়ান্ সি" (Periplus of the Erythrean Sea) নামক পুস্তকখানি হইতে আমরা জানিতে পারি যে দাক্ষিণাত্যের চের চোল পাণ্ড্য দেশ এবং সিংহল হইতে তখন transparent stones of all kind (সকল রকমের স্বচ্ছ প্রস্তর), diamonds (হীরক), sapphires (ইন্দ্রনীল মণি) fine pearls in great quantity (প্রচুর সুশোভন মুক্তা), এবং oyster (শুক্তি) বিদেশে রপ্তানি হইত। বিদেশ হইতে coral (প্রবাল) topaz (পুষ্পরাগ মণি) ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়া এ দেশের বাজারে বিক্রয় হইত।

শ্রীক্ষীরোদমোহন চক্রবর্ত্তী।

দত্তগিন্নী

১

দত্তগিন্নী তাঁর শুইবার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন। বেলা তখন দেড় প্রহর আন্দাজ হইয়াছে। দত্ত মশায় ধুলা পায় ছাতা হাতে বেকী বেড়া ঘুরিয়া হঠাৎ উঠানের ভিতর দেখা দিলেন। তাঁহাকে হঠাৎ দেখিয়া দত্তগিন্নী চমকাইয়া উঠিলেন, হাতটা একটু কাঁপিয়া উঠিল, একটা আঙ্গুল একটু কাটিয়া গেল। আঙ্গুলটা আর এক হাতে চাপিয়া ধরিয়া গিন্নী বলিলেন, "এ কি, আজই এসে পড়লে ?"

দত্তমশায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, "হাঁ, শালারা সব জোট করেছে খাজনা দেবে না। তিন দিন ঘোরা-ফেরা করে' কিছুই করতে পারলাম না, তাই চলে এলাম। দেখি, সান্যালদের সঙ্গে মিলে কিছু করতে পারি না কি।" এই বলিয়া ঘরে বিছানো মাদুরের উপর ছাতাটা ছুড়িয়া ফেলিয়া চাদর ও গায়ের জামাটা বিছানার উপর ফেলিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া পাখার হাওয়া খাইতে লাগিলেন।

দত্তগিন্নী পিছু পিছু ঘরে গিয়া জামাটা কুড়াইয়া তার পকেট হাতড়াইয়া পঁচিশটা টাকা সংগ্রহ করিলেন। টাকা কয়টা তাড়াতাড়ি সিন্দুকের ভিতর তুলিয়া রাখিয়া তিনি ফশ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

গিন্নী বাহির হইয়া গেলে দত্তমশায় দরজার কাছে আসিয়া একটু উঁকি মারিয়া দেখিলেন। গিন্নী ততক্ষণে অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া দত্তমশায় তাড়াতাড়ি

সান্ত্বনা

কোমরের কাপড় খুলিয়া একটা গাঁজিয়া বাহির করিয়া এক গোপন স্থানে লুকাইয়া রাখিলেন। গাঁজিয়ার মধ্যে প্রায় শ' খানেক টাকা ছিল।

তারপর তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক সাজিতে লাগিলেন, তামাকে আগুন ধরাইয়া দাওয়ার উপর কল্কেটা রাখিয়া তিনি হুঁকার জল বদলাইবার জন্য উঠিতেই তাঁর মনে একটু খটকা লাগিল। গিন্নী এই নিশ্চিন্তমনে কুটনা কুটিতেছিল, হঠাৎ লাউটাকে আধ-কোটা অবস্থায় রাখিয়া উঠিয়া নিরুদ্দেশ হইল কোথায়?

সন্দিগ্ধ চিত্তে হুঁকাটা হাতে করিয়া তিনি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাড়ীর পিছনে বেকী বেড়ার আড়াল হইতে ফিস্ ফিস্ শব্দে কথা শুনিতে পাওয়া গেল। দত্তমশায় পা টিপিয়া নিঃশব্দে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। বেড়ার আড়ালে কি ছিল স্পষ্ট দেখা গেল না, কিন্তু যাহা শুনিলেন, তাহাতে দত্তমহাশয় একেবারে ফোঁস-ফাঁস করিতে লাগিলেন।

দত্তগিন্নীর ব্যাপারটা এই। যাহাকে বলে, "স্বভাব-চরিত্র" সেটা ভাল নয়,—তাহা সবাই জানে। দত্তমহাশয়ও প্রত্যক্ষ না দেখিলেও অনুমানে বরাবরই জানেন। আজ তিন দিন দত্তমহাশয় বাড়ী-ছাড়া, সাত ক্রোশ দূরে তাঁর একখানা মহালে খাজনা আদায় করিতে গিয়াছিলেন। এই কয়দিন দ্বিপ্রহরে এবং রাত্রে দত্তগিন্নী ইচ্ছামত বাড়ীতে প্রণয়ীজনকে সম্ভাষণ করিয়াছেন। গোপাল ভাণ্ডারীর আজ দ্বিপ্রহরে আসিয়া দত্তগিন্নীর সঙ্গে আহারাদি করিয়া মধ্যাহ্ন-যাপনের কথা ছিল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামী আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় গৃহিণী তাই শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। স্বামীর নিকট হইতে টাকা কয়টা হস্তগত করিয়াই তিনি গোপালকে সংবাদ দিয়া নিরস্ত করিতে ছুটিলেন। গোপালের বাড়ী পাশেই, মাত্র বিঘা-খানেকের একটা নিভৃত আম-বাগান মধ্যে ব্যবধান। এই বেকী বেড়ার ওপারেই আমবাগান।

গোপালের বাড়ীর কাছে গিয়া একটা পরিচিত ইঙ্গিত করিতেই গোপাল বাহির হইয়া আসিল। সংবাদ দিয়া ফিরিবার সময় দত্তগিন্নীর সঙ্গে সঙ্গে গোপাল এই বেড়া পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

এইখানে তাহাদের প্রেমালাপের শেষ অংশ দত্তমহাশয় বেড়ার আড়াল হইতে শুনিলেন। দত্তমহাশয়ের রাগ বাড়িয়া উঠিল।

ক্রোধে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া দত্তমহাশয় কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। একবার ভাবিলেন, পাপিষ্ঠার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে হাতে নাতে ধরিয়া ফেলেন। কিন্তু গোপাল ভাণ্ডারী বিষম ষণ্ডা এবং সে অন্ততঃ তিনটা খুন করিয়াছে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। এ অবস্থায় দত্তমহাশয়ের যে সে সাহস হইল না, তাহাতে তাঁহাকে খুব দোষী করা যায় না। তাই তিনি কিছু স্থির করিতে না পারিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হঠাৎ দত্তগিন্নী বেড়া ঘুরিয়া তাঁর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরস্পরকে দেখিয়া প্রথমে একচোট্ চমকাইয়া উঠিলেন—দত্তমহাশয় এত চমকাইয়া গেলেন যে তাঁর হাত হইতে হুঁকাটা পড়িয়া ফাটিয়া গেল।

গিন্নী চট করিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া চোখ-মুখ গরম করিয়া বলিলেন, "এখানে কি হচ্ছে?"

সে আওয়াজ শুনিয়া দত্তর আত্মাপুরুষ চমকাইয়া উঠিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এই—না, এই, এই—"

আরও জোর ধমক দিয়া গিন্নী বলিলেন, "বলি, এখানে দাঁড়িয়ে কি করা হচ্ছিল?"

দত্তমহাশয় দুই পা পিছাইয়া গিয়া বলিলেন, "না, এই হুঁকোটায় জল ক'রতে এই।"

"হুঁকোয় জল করবে তো বেড়ার ধারে মরতে এসেছ কেন?"

"হ্যাঁ, তা, না,—" প্রভৃতি নানাবিধ অসংলগ্ন শব্দ করিতে করিতে দত্তজা পায় পায় প্রস্থান করিলেন। গৃহিণী মৃদু গর্জ্জনে তাঁহার চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে রান্নাঘরে ঢুকিলেন।

ঘরে ফিরিয়া দত্তমহাশয় দেখিলেন, তাঁহার তামাক ভস্ম হইয়া গিয়াছে, হুঁকাটিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাজেই তিনি পায় পায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পাশের ভট্টাচার্য্য-বাড়ী গিয়া হাজির হইলেন।

২

দত্ত পরিবারের একটু পরিচয় আবশ্যক। শরৎ দত্ত মহাশয় সামান্য তালুকদার। তাঁর তালুকের মুনাফা প্রায় হাজার টাকা হইবে। ইহাতে পাড়াগাঁয়ে বেশ স্বচ্ছন্দেই চলিবার কথা; বিশেষতঃ দত্ত মহাশয় তাঁর তালুকের গোমস্তাগিরি হইতে পাইকগিরি পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ নিজেই করেন। কিন্তু দত্তজার চেহারা দেখিয়া কেহই তাঁহার স্বচ্ছলতা অনুমান করিতে পারিত না। তাঁর শরীরে রোগ কিছুই নাই, তবু চল্লিশ বছর বয়সে তিনি জীর্ণ-শীর্ণ, শুষ্ক কাষ্ঠের তুল্য। তাঁর হাড়ে শক্তি আছে, তার পরিচয় তাঁর কষ্ট-সহিষ্ণুতায়। পাঁচ-সাত ক্রোশ হাঁটিতে তিনি কোনও দিন ক্লান্ত হন না। বাড়ীতে বসিয়া বেড়া টাটি দুরস্ত করা, "পালান" করা প্রভৃতি লইয়া তিনি সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকেন।

কিন্তু দত্ত মহাশয়ের শরীরে জোর বড় কম, আর মনের জোর তার চেয়েও কম। এই কম জোর ও আনুষঙ্গিক ভীরুতাই তাঁর জীবনটাকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁর পরাণের কাপড় যে ময়লা ও ছেঁড়া এবং বেশভূষা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত তাহার জন্য তাঁহার কৃপণতাই একমাত্র দায়ী নয়।

দত্ত মহাশয়ের স্ত্রী কৃপাময়ী তাঁর প্রতি খুব কৃপা-পরবশ ছিলেন না। অথচ দত্ত মহাশয় যেমন জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুদ্রকায়, কৃপাময়ী সেই পরিমাণে বৃহৎকায় ও বলবতী। কৃপাময়ীর মত খাটিতে পারে, এমন মেয়েমানুষ এ তল্লাটে নাই। তিন-চার শো লোকের নিমন্ত্রণের রান্না রাঁধিতে হইলে গ্রামের স্বজাতির মধ্যে কৃপাময়ী ছাড়া গতি ছিল না। আর কৃপাময়ী হেঁশেলে ঢুকিলে সে কাহাকেও কাছে অগ্রসর হইতে দিত না। একা সে সমস্ত রান্না করিত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডেকচি সে আলগোছে নামাইত, আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জনসহ তরকারী সে নিমেষে পরিপাটি রূপে রাঁধিয়া নামাইত। রান্নার উৎকর্ষ সম্বন্ধেও কৃপাময়ীর খুব নাম ছিল।

এ হেন শক্তিমতী ছিলেন দত্ত-গৃহিণী। দত্ত মহাশয়ের চেয়ে আধ হাত লম্বা, পরিধিতে প্রায় চতুর্গুণ, মাংসপেশীর দৃঢ়তায় অতুলনীয়। কাজেই গৃহিণীকে "শাসন" করিবার সঙ্কল্পও দত্ত মহাশয় কোন দিন মনে স্থান দিতে পারেন নাই—তিনি কৃপাময়ীকে রীতিমত ভয় করিয়া চলিতেন। কৃপাময়ী তাঁহাকে বেশ রীতিমত শাসনে রাখিত। তার জন্য তাহাকে খুব শক্ত কথা বা বাহু-বল কখনও প্রয়োগ করিতে হয় নাই, একবার চোখটা একটু গরম করিলেই দত্তজা একেবারে ভড়কাইয়া যাইতেন।

বলিয়াছি, দত্ত মহাশয় তাঁর তালুকের গোমস্তা পাইক প্রভৃতি সকলই ছিলেন, কিন্তু খাজাঞ্চী ছিল কৃপাময়ী। এমন অকরুণ কঠোর খাজাঞ্চী, যে বঙ্গদেশের একাউণ্টাণ্ট জেনারেল তার কাছে হার মানেন। যখন যেখান হইতে যে টাকা আসিত, তাহা অবিলম্বে দত্তগিন্নী আত্মসাৎ করিয়া সিন্দুকে পুরিত এবং চাবি যখের মত সঙ্গে সঙ্গে রাখিত। একবার সে সিন্দুকে টাকা ঢুকিলে তাহা বাহির করিতে দত্ত মহাশয়ের গলদঘর্ম্ম হইত—এবং তাহাতেও কোন ফল হইত না। প্রথম প্রথম এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে একবার দত্ত মহাশয় কাঁদিয়া কাটিয়া অনার্থ করিয়াও কৃপাময়ীর নিকট হইতে সদর খাজনার টাকা আদায় করিতে পারেন নাই। তার পর নাচার হইয়া জগন্নাথ সাহার নিকট তালুক বন্ধক রাখিয়া সদর খাজনার টাকা জোগান। সেই টাকা শোধ করিবার জন্য দত্ত মহাশয় প্রথমে চুরি করিতে আরম্ভ করেন, অর্থাৎ আদায়-পত্র করিয়া তাহার মধ্যে কতক টাকা নিজে লুকাইয়া রাখিয়া অবশিষ্ট গৃহিণীকে দিতেন। পরে দত্তগিন্নী সদর খাজনার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এমন বিপদে আর দত্ত মহাশয়কে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু চুরির অভ্যাসটা তাঁর রহিয়া গেল। ক্রমে সাহস পাইয়া কিছু বেশী হাতে টাকা লুকাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে চলিল না। দত্ত-গিন্নীর হিসাবের জ্ঞান বেশী ছিল না, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের খাজনার টাকার পরিমাণ তাঁর লেখা ছিল। যখন দেখিলেন যে সমস্ত বৎসরে প্রায় পঁচিশ টাকা কম পড়িয়া গেল তখন দত্তজার উপর চোটপাট আরম্ভ হইল। দত্ত মহাশয় বলিলেন, প্রজারা খাজনা দেয় নাই। প্রজাদের মধ্যে গ্রামের লোকই বেশী, কৃপাময়ী তাহাদের সকলকে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে তাহারা সবাই খাজনা দিয়াছে এবং কেহ কেহ দাখিল খারিজের নজর

পর্য্যন্ত দিয়াছে, তখন সে দত্তজাকে চাপিয়া ধরিল। শেষ পর্য্যন্ত দত্ত মহাশয়কে কবুল জবাব দিতে হইল এবং পোষ্টাফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের বহিখানা গৃহিণীর কাছে গচ্ছিত রাখিতে হইল।

তারপর দত্ত মহাশয় এমন বেশী হাতে চুরির চেষ্টা করেন নাই, তবে ছুটকো-ছাটকা চুরি করিয়া বছরে একশ' দেড়শো টাকা রাখিতেন। সে টাকা সেভিংস্-ব্যাঙ্কে রাখিবার উপায় ছিল না। কাপড়-চোপড়েও খরচ করিতে পারিতেন না, প্রায় কোন কাজেই তাহা লাগিত না। একবার কোন কার্য্যোপলক্ষে মহকুমায় গিয়া তাঁহার সঞ্চিতও অর্থ খরচ করিবার চেষ্টায় কয়েকজন বন্ধু বান্ধব লইয়া বেশ্যালয়ে কিছু আমোদ প্রমোদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হায়, তাঁর অদৃষ্ট! বাতাস বুঝি সে খবর কৃপাময়ীর কাছে পৌছাইয়া দিয়া যায়! সে যা' নাকাল দত্তজার হইতে হইয়াছিল তাহাতে তিনি জন্মের মত বেশ্যার নামে ভয় পাইতেন। কাজেই টাকা তাঁর বিশেষ কাজে লাগিত না।

যক্ষের মত যে টাকা কৃপাময়ী সংগ্রহ করিত তাহা বুদ্ধিমানের মত সব সময় রাখিতে পারিত না। স্বামীর জ্ঞাতসারে কতক টাকা প্রজাদের মধ্যে সুদে খাটাইত, কিন্তু সে অল্প। বেশীর ভাগ টাকা সে গোপনে "লাগাইত"। সেভিংস্ ব্যাঙ্কের বই দেখিয়া সে একখানা সেভিংস্ ব্যাঙ্কের বই করিল কিন্তু তা ছাড়া সে আরও অনেক টাকা বেশী সুদে গোপনে খাটাইতে লাগিল। সে নিজে হিসাব-কিতাব জানিত না, এ-সব কারবারও বুঝিত না, তাই সে গোপাল ভাণ্ডারীর সাহায্য লইতে লাগিল।

গোপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারী বলিয়াই গ্রামে পরিচিত, কিন্তু সে নিজের নাম লেখে, শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্র। তার পিতামহ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সান্যাল মহাশয়দের বাড়ীর ভাণ্ডারী ছিল। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া তাহার পৌত্র সামান্য কিছু বিষয়-সম্পত্তি করিয়া মিত্র উপাধি ধারণ করিয়াছে। গোপাল লেখাপড়া কিঞ্চিৎ শিখিয়াছিল এবং দলিল দস্তাবেজ লেখা ও জমিদারী-মহাজনী ও কিছু কিছু জানিত। সে গ্রামের সকল লোকের দলিল লিখিত। তাহা ছাড়া সে অর্থের জন্য না করিত, এমন কার্য্য নাই।

এ হেন গোপাল ভাণ্ডারীর কাছে কৃপাময়ী গেল পরামর্শের জন্য। গোপাল তার সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে ছাড়িল না। তাহাদের টাকাকড়ি খাটান সম্পর্কিত এই গোপন সম্পর্ক পারপক হইয়া অন্যরূপ দাঁড়াইল। এদিকে নানারূপ ফিকির-ফন্দীতে কৃপাময়ীর টাকা সিন্দুক ছাড়িয়া ক্রমে গোপাল ভাণ্ডারীর হস্তগত হইতে লাগিল। কিন্তু আমরা গোপাল ভাণ্ডারীর উপর অবিচার করিব না। কৃপাময়ীর যত টাকা সে আত্মসাৎ করিয়াছে তাহা সবই চুরি নয়। তার একখানা উৎকৃষ্ট টিনের ঘরের সমস্ত খরচ কৃপাময়ী স্বেচ্ছায় তাহাকে হাতে তুলিয়া দিয়াছে।

অথচ দত্ত মহাশয়ের নিজের বাড়ীতে টিনের ঘরের বংশও নাই। কাঁচা ভিটার উপর খড়ের তিনখানি ঘর অন্দর-মহল, আর বাহির-বাড়ীর একখানা ভঙ্গুর কুঁড়ে ঘর, ইহাই দত্ত-বাড়ীর ঘরের ফিরিস্তি।

দত্ত-পরিবারের পরিচয় পরিপূর্ণ করিবার জন্য বলা আবশ্যক যে দত্তমহাশয় নিঃসন্তান, কৃপাময়ী বন্ধ্যা।

ক্রমশঃ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

সঙ্কলন

গান

আপন হ'তে বাহির হ'য়ে
বাইরে দাঁড়া।
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া।
এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে,
সকল পরাণ দিক না নাড়া—
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া।

বোস্‌না ভ্রমর এই নীলিমায়
আসন ল'য়ে
অরুণ আলোর স্বর্ণ-রেণু—
মাখা হ'য়ে
যেখানেতে অগাধ ছুটি
মেল্ সেথা তোর ডানা দুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া;
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া।

শান্তিনিকেতন পৌষ, ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জল-বিহার

ভারতীয় পুরাতন সাহিত্যের বিবিধ গ্রন্থে আমোদপ্রিয় রাজাদিগের নানা প্রকার জল-বিহারের বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। রঘুবংশ কাব্যে কুশের জলবিহার বর্ণনা হইতে তদানীন্তন জলকেলির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সরযু নদীর জলে বিহারাভিলাষী হইয়া প্রথমতঃ নদীতীরে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া জালের দ্বারা কুম্ভীর প্রভৃতি ভয়ানক জলজন্তুগুলিকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের চতুর্ব্বর্ণসম্বন্ধ যাবতীয় ব্যাপারই শাস্ত্রশাসনের অধীন; সুতরাং জলকেলির নিয়ম-পদ্ধতিও অতি পূর্ব্বকালেই প্রণীত হইয়াছিল। প্রস্তাবিত স্থলের বর্ণনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কবি কামন্দকের নীতিশাস্ত্র হইতেই অত্রত্য বর্ণনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কামন্দক জলবিহারের ব্যবস্থায় লিখিয়াছেন যে,—

"পরিতাপিষু বাসরেষু পশ্যন্ তটলেখাস্থিতমাপ্তসৈন্যচক্রম্।

সুবিশোধিতমীননক্রজালং ব্যবগাহেত জলং সুহৃৎসমেতঃ॥

ইহার অর্থ—গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিবসে নদীর তটে বিশ্বাসভাজন সৈন্যসামন্তকে দৃষ্টিগোচরে স্থাপন করিয়া মীননক্রাদির বিতাড়নজনিত সুবিশুদ্ধ অর্থাৎ নিরাপদ জলে সুহৃদ্গণের সহিত ক্রীড়ার্থ প্রবেশ করিবে।

কালিদাসের লিপিভঙ্গী হইতে বুঝা যায় যে, অবস্থার তারতম্যানুসারে জলকেলির উপকরণেরও তারতম্য হইত। মহারাজ কুশ "চক্রধরপ্রভাব" অর্থাৎ বিষ্ণুসদৃশ প্রভুত্বশালী ছিলেন, তিনি "শ্রীমহিমানুরূপ" অর্থাৎ সম্পত্তির ও ক্ষমতার উপযুক্ত জলক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার জলবিহারে—"নৌ-বিমান অর্থাৎ বিমানসদৃশ নৌকা ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রস্তাবিতস্থলে "নৌ-বিমান" শব্দের অর্থের প্রতি প্রণিধান করিলে অতি প্রাচীনকালে বিলাসোপকরণ নৌকানির্ম্মাণে শিল্পীদিগের নিরতিশয় কৌশল প্রতিভাত হয়। কারণ—প্রসিদ্ধ পদার্থই উপমানরূপে উপন্যস্ত হইয়া থাকে; ইহাই দার্শনিকসম্মত সিদ্ধান্ত। সুতরাং কবির সময়ে বিমান বলিয়া যে পদার্থ টি প্রসিদ্ধ ছিল, তাহাই নৌকার উপমানরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কোষগ্রন্থে ও নানাশ্রেণীর কাব্যাদিতে দুই প্রকার বিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি "দেবযান" "ব্যোমযান" প্রভৃতি নামে অভিহিত, অপরটি "সপ্তভূমিক ভবন" অর্থাৎ সাততলা দালান অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান "ব্যোমযান" রূপ বিমানকে এখন সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া তুলিয়াছে; পক্ষান্তরে "সপ্তভূমিক ভবন"-রূপ বিমান কেবল সাহিত্যসেবীর নিকটেই নামত পরিচিত। কুশের জলবিহারনৌকার উপমানরূপে কোন বিমান অভিপ্রেত হইয়াছে? কবির অভিপ্রায় কি? তাহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে কবির সময়ে জলবিহার-নৌকা যে বিমানের অনুকরণে প্রস্তুত হইত, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যদি "সপ্তভূমিক ভবন" অত্রত্য বিমান শব্দের অর্থ হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, বিহার-নৌকাতে একটির উপরে অপরটি, এইভাবে সাতটি তালা বিন্যস্ত হইত, এবং ইহাতে নানাপ্রকার চিত্রের সন্নিবেশ হইত। কারণ—কালিদাস মেঘদূতে সপ্তভূমিকভবন বিমানে চিত্রবিন্যাসের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।—

"নেত্রানীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-

রালেখ্যানাং স্বজলকণাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।"

পক্ষান্তরে যদি "ব্যোমযান"রূপ বিমানই বিহার-নৌকার উপমানরূপে অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তাহাতেও ফলতঃ বিশেষ প্রভেদ হয় না। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে দেবহূতি কর্দ্দমের বিহারসাধন কামচারী বিমানের যে বর্ণনা দেখা যায়, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, সপ্তভূমিকভবন ও দেবযান বিমান এই উভয়ের অবয়বগত সৌসাদৃশ্যের অভাব নাই। সপ্তভূমিক ভবনে যেমন এক ভূমিকার উপর অপর ভূমিকার সন্নিবেশ, আকাশযান বিমানেও তেমনি গৃহোপরি গৃহসন্নিবেশ এবং তন্মধ্যে পৃথক পৃথক খট্বা নানাবিধ শয্যা পাখা ও নানাপ্রকার আসন বিন্যস্ত।

"উপর্য্যুপরি-বিন্যস্ত-নিলয়েষু পৃথক্।

কপ্তৈঃ কশিপুভিঃ কান্তং পর্য্যঙ্কব্যজনাসনৈঃ॥" ৩।২৩।১৬ ইহাতেও বিহারস্থান, শয়নগৃহ, উপভোগস্থান, প্রাঙ্গণ ও চত্বরের সমাবেশ আছে।

বিহার-স্থান-বিশ্রাম-সংবেশপ্রাঙ্গণাজিরৈঃ"। ৩।২৩।২১ ইহার মধ্যেও শোভাসম্পাদক নানাপ্রকার শিল্পের সমাবেশ, কতকস্থান মরকতমণি-নিবদ্ধ, তাহাতে আবার প্রবালের বেদী। দ্বারদেশে প্রবালের দেহলী অর্থাৎ রোয়াক্। হীরকনির্ম্মিত কপাট, ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত চূড়ার অগ্রভাগে স্বর্ণকলস সন্নিবিষ্ট, সুবর্ণময় ভিত্তিতে বিচিত্র পদ্মরাগমণির সন্নিবেশ, স্বর্ণময় তোরণে হারের বিন্যাস, বিচিত্রবর্ণ বিতানেরও অভাব নাই। বিতানের অগ্রভাগে সুনিহিত কৃত্রিম হংসপারাবতকে বাস্তবিক মনে করিয়া, হংসপরাবতগুলি তাহাদের নিকটে যাইয়া স্বজাতি-সুলভ শব্দ করিয়া থাকে। ৩।২৩।১৭-২০। সুতরাং দুই প্রকার বিমানই বিহার-নৌকার উপমান হইবার যোগ্য। অতএব "নৌ-বিমান" যে সাততলা জাহাজের আকারে প্রস্তুত হইত, এবং তাহাতে বিলাসোপযোগী শয্যাসনাদির বিন্যাস হইত, তাহার আভাস পাওয়া যায়।

বৌদ্ধসাহিত্যেও জলবিহার প্রসঙ্গে বিহারোপযোগী বিমানসদৃশ নৌকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। "দীপঙ্কর নামক পূর্ব্বতন বুদ্ধের মাতা সুদীপা দেবী "পদ্মসরোবরে" সখীবৃন্দের সহিত নৌকাযানের দ্বারা জলক্রীড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার কেলিনৌকাগুলির মধ্যে পূর্ব্বপশ্চিমে বেদিকা অর্থাৎ বসিবার উপযুক্ত বেঞ্চের মত আসন ছিল। স্থানে স্থানে বিতান ও বিচিত্র 'দুষ্য' অর্থাৎ তাঁবু খাটান ছিল। শোভা সম্পাদনার্থ 'পটবস্ত্ররাম' সম্ভবতঃ রেশমী রঙ্গীন কাপড়ের ঝালর টাঙ্গান ছিল। নৌকার মধ্যে বিলেপন দ্রব্য চন্দন প্রভৃতির লেপ ও সৌরভ-সম্পাদক

ধূপের ব্যবস্থা ছিল ; মুক্তাসদৃশ পুপ বিকীর্ণ ছিল এবং ছত্র, ধ্বজ ও পতাকা সুষমাসাধনরূপে বিন্যস্ত হইয়াছিল। নানাস্থানে বিহারোপযোগী বেদিকাসমূহের বিন্যাস ছিল।"

কাদম্বরী কাব্যে রাজা তারাপীড়ের ভবনদীর্ঘিকা মধ্যে অন্তঃপুরিকা-বর্গের সহিত জলবিহারের বর্ণনা আছে। উহাতে ক্রীড়াসাধন নৌকার সম্পর্ক নাই। পৌরাণিক গ্রন্থে কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতির বিস্তৃত জলবিহারের পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি সংস্কৃত সাহিত্যে আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ জলবিহারের বর্ণনা আছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র, ১৩২৯। শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

—

জাতীয় সঙ্গীত

মন্ত্রস্তব্ধ জড় কণ্ঠরুদ্ধ,
তেত্রিশকোটী আজ হও প্রবুদ্ধ!
পুণ্যস্মৃতি সেই আর্য্যাবর্ত্ত,
গ্রাসে গহন ভীম কাল আবর্ত্ত!
বেদঘোষ ওঙ্কার ধ্বনিতে
বীর হস্ত টঙ্কার স্বনিতে,
করহে কর পুনঃ দশদিশি ক্ষুব্ধ!
তেত্রিশ কোটী আজি হও প্রবুদ্ধ!
তেজধাম সেই ভারতবর্ষ
নাশে মূঢ়তা বৃথা সংঘর্ষ!
ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে ব্রাহ্মণে শূদ্রে
ধনী নির্ধনে মিলো বৃহতে ক্ষুদ্রে
মানবী প্রেমে উজ্জ্বল শুদ্ধ!
তেত্রিশকোটী আজি হও প্রবুদ্ধ!
কাম্যভূমি সেই হিন্দুস্থান!
উপবাসে করে মৃত্যু প্রয়াণ!
বহুমত, শরণ, বিশাল, ক্রোড়!
হতমান, নিপতিত দাস্যে ঘোর!
মুক্ত করহ, ছাড় ভাই ভাই যুদ্ধ!
তেত্রিশকোটী আজি হও প্রবুদ্ধ! (একত্রে গান)

(সঙ্গীত ও সঙ্ঘের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে রচিত)

শ্রীমতী সরলা দেবী।

—

অবতার-কথা

খৃষ্টানেরা যাহাকে incarnation (ইন্‌কারনেশন) কহেন, হিন্দুর অবতার-কথার অর্থ তাহা নহে। অবতার অর্থে নীচে নামিয়া আসা; যাহা সৃষ্টির অতীত, সৃষ্টিধারায় তাহার প্রকাশ। Incarnation এর অর্থ ইহা নহে। সমগ্র সৃষ্টি ব্যাপারই হিন্দুর চক্ষে অবতার-পর্য্যায়ভুক্ত। স্থাবরে জঙ্গমে সকলের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের অতীত যে পরম তত্ত্ব তাহাই সৃষ্টিধারাতে আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছেন। ইহাই হিন্দুর সৃষ্টি-তত্ত্বের মূল কথা। সুতরাং এক অর্থে এই বিশ্বের সমুদয় বস্তুই ভগবানের অবতার-পর্য্যায়ভুক্ত হয়।

কিন্তু এই অবতারের একটা লক্ষ্য আছে। লক্ষ্যবিহীন কর্ম চৈতন্যের বা জ্ঞানের ধর্ম্ম হইতে পারে না। অবতারের একটা লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্যের দ্বারাই অবতারের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। সেই লক্ষ্যটা কি? সেই লক্ষ্যটা আত্মপ্রকাশ। যিনি আপনার স্বরূপে নিত্যসিদ্ধ, তিনি তিলে তিলে এই পরিণামী জগতে আপনাকে প্রকট বা অভিব্যক্ত করিতেছেন, ইহাই সৃষ্টির মূল কথা। ইহার উপরেই হিন্দুর অবতারতত্ত্বেরও প্রতিষ্ঠা। অতএব সৃষ্টিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও বস্তুতে ভগবদ্‌স্বরূপ ফুটিয়া উঠিতে না আরম্ভ করে, ততক্ষণ তাহাকে ভগবানের অবতার পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যায় না। যে বস্তুতে ভগবদ-লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে, তাহাকেই অবতার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। অর্থাৎ সেই বস্তুতেই ভগবান আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য স্বকর্ম্ম সাধন কিম্বা স্বকীয়া লীলা সম্ভোগের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন, এই কথা কহিতে পারা যায়। সাধারণভাবে ইহাই হিন্দুর অবতার-কথা।

প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন, ১৩২৯। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পলাতক সা সুজা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে
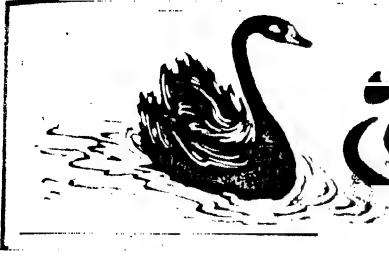
৪৭শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ { দ্বিতীয় সংখ্যা

বিদেশী কবিতা

গান

পুলক-ভরা পাখীর গানে
আর, আমরা কেন দিব গো কান ?
সবার চেয়ে সুকণ্ঠ পিক —
আজি, তোমার কণ্ঠে গাহিছে গান !
দেবতারা আকাশের তারা,
আজি, দেখান্ কিম্বা রাখুন ঢেকে,
সবার চেয়ে উজল তারা
ওই ফুটছে আজ তোমার চোখে !

বসন্ত আজ নূতন করে
ফিরে, ফুটাক যত ফুলের কলি ;
ফুলের সেরা ফুল যে, ওগো,
ওই, তোমার হৃদয়—আমি বলি !
গগন-শোভা দিনের রাজা,
ওই আবেগ-মাখা পাখীর ভাষা,
বিকশিত হৃদয়-কুসুম,
তাদের—আরেকটি নাম ভালবাসা !

Victor Hugo

ভুল-ভাঙা

হেসে গেলেন বাবু মোদের ভদ্রচূড়ামণি
ভেবেছিলেন তাঁরেই আমি করছি প্রণিপাত ;—
ফিরছি যখন পাগলা গারদ দেখে,—
আপন মনে তাদের দশা এঁকে,—
আমি কেবল কপাল-পানে তুলেছিলাম হাত !
আমি জানি স্বভাবটি তাঁর, হীনাবস্থ লোক,
জীবন গেলেও করেন না'ক প্রতি-নমস্কার ;
সেদিনকার সেই ভুল ঘোচাতে তাঁর,—
পথে কোথাও দেখ্‌লে তাঁরে আর,—
ফিরেও চাইনে, ঘুচেছে তার শিষ্ট ব্যবহার !

Giuseppe Giusti.

সুন্দরীর অর্থ

তোমরাই সুখী, ওহে, প্রাচীন কালের বীরগণ !
ভয়ঙ্কর পর্ব্বতের পদমূলে নিরজন পথে,
অন্ধকার গুহাতলে, শ্বাপদসঙ্কুল বনে কভু,
ভয়াল ভুজঙ্গ-সিংহ-ভল্লুকের আবাস-ভূমিতে—
দেখিতে—এখন যাহা প্রাসাদেও দেখা নাহি যায়,—
যদিও সতর্ক আঁখি সর্ব্বক্ষণ খোঁজে চারিভিতে !
দেখিতে সুন্দরী নারী যৌবনের নবীন প্রভাতে ;
সুন্দরীর অর্থ যা' তা' তোমরাই জান ভালমতে !

Aristo

নির্ব্বিরোধ ও স্বর্গ

হিন্দু সনে করিনে লড়াই—পার্সী সনে বিবাদ পরিহরি।
মন্দ কারো স্বপ্নে নাহি ভাবি—বিনিময়ে বরং ভালই করি।
বলেন যিনি করে' ভ্রম—এই দুনিয়া জাহান্নম,—
শুধু তিনি দেখে যান্ এসে—স্বর্গ-সুখ হেথায় ভোগ করি।

(হালি)

পাকা মুসলমান

আজকাল যত দিন কেহ—বিধর্ম্মীর শত্রু নাহি হয়।
ততদিন কোন লোক তারে—'পাকা মুসলমান' নাহি কয়।
বিভু-পদে কৃপা ভিক্ষা করি—এ জাতির ভবিষ্যৎ স্মরি,
যবে শুনি 'পাকা মুসলমান'—কেহ কারে কহে স্নেহ করি।

(হালি)

মৃত্যু ও টেক্স

"সবাই সময় লয়ে করে ছেলেখেলা—"
কহে বক্তা—"স্থির শুধু মৃত্যুর সময়!"
"টেক্সের সময় (ও) ওইরূপ মহাশয়"
শেঠ বলে,—"ভাঁড়াভাঁড়ি নাই তার (ও) বেলা!"

(হালি)

বিরাট মানব

হে অভিন্ন জাতি-সঙ্ঘ!
হে স্বাধীন বিরাট মানব!
স্বপ্নাবিষ্ট—হাস্যাস্পদ অন্ধ
মত্ত মোরা; মোরা দেখি সব!
তোমাদের আসিবারো—আগে দেখিতেছি মোরা,—
তোমাদের হইবে উদ্ভব!

কে বসি শ্মশান-বাসে?
কে দাঁড়ায়ে আছ কারাদ্বারে?
অগ্নিমুখ যুদ্ধ কারে গ্রাসে—
পাণ্ডুগণ্ড শাস্তি বাঁধে কারে?
নিবে যাবে চিতানল, যাবে যুদ্ধ-কোলাহল
না রবে অর্গল কোন দ্বারে!

ভাঙ্গিবে কবচ-যন্ত্র
ফাটিয়া পড়িবে কুক্ষি-কল,
উচ্চারিয়া নিজ মহামন্ত্র
কাল যবে স্পর্শিবে অর্গল!
আজ্ঞা দিবে সকলেরে—আসিবারে—পশিবারে—
নিশিবারে; বিস্মিত-বিহ্বল! * * *

Swinburne

শিশু

কে পারে করিতে মূল্য—স্বর্ণভার দিয়া নিখিলের—
আভাসে স্ফুরিত এক গোলাপ-দলের?
কপোলের হেথাহোথা—টোল দিয়া কিবা হাসি ফোটে—
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতি বাঁকে, প্রতি রেখাতটে!
অঙ্গে অঙ্গে কি লাবণ্য ছোটে!
কুসুম-সুন্দর তনু—এতটুকু সৌন্দর্য্য তাহার
হরিয়াছে কুসুমের সমস্ত বাহার!
মুঠা-করা দুটি হাত—ছোট ছোট গুটান' পা দুটি—
ঊষার গোলাপ দলি এসেছে রে ছুটি।
মার কোলে পড়িয়াছে লুটি!...

Surirburne

মূর্খ

ভাল যার নাহি লাগে—
সুরা, নারী, গান,
মানুষের সভাতে সে
গাধার সমান।

Luther

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

একটি ব্যাগের কাহিনী

নেহাৎ গল্প নয়, আমার এক বন্ধুর ব্যাপার।

বন্ধুর নাম কুমুদিনী। তিনি নারী নন্, পুরুষ। তবে তার চিঠি-পত্র নিয়ে আমার বাড়ীতে একবার এমন বিপ্লব বেধেছিল যে আমরা বন্ধুর দলে মিটিং ডেকে দস্তুরমত রেজলিউশন পাশ করি যে, ও-নামে তাকে ডাকা হবে না, আমরা নেউগী বলে ডাকব। আমাদের গিরিজাকে সে একবার চিঠি লিখে তলায় নাম দিয়েছিল,—'তোমার কুমুদিনী'। তার ফলে গিরিজা গৃহিণী অর্থাৎ শ্রীমতী বৌদি মানের ভরে পিত্রালয়ে চলে যান্ এবং দাদার কথাতেও ফেরেন নি! আমরা সদল-বলে গিয়ে নজীর-পত্র খুলে ওকালতি করি, শেষ কুমুদিনীকে সশরীরে সাক্ষী হাজির করতে তবে তার রাগ যায়, তিনি আবার গিরিজা-মন্দিরে এসে সিংহাসন আলো করে বসেন। কিন্তু সে কথা যাক্। যা বলছিলুম,—

নেউগী থাকে মফঃস্বলে, কলেজ ছাড়া-ইস্তক। রাজশাহীতে পৈত্রিক জমিদারী আছে, তাই দেখাশোনা করে, আর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে—কিন্তু এ কথাও বলতে আসিনি!

বাড়ীতে তার বোনের বিয়ে। এইটিই সব ছোট। বর-পক্ষ খাট-পালঙ ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রীর এক মস্ত ফিরিস্তি দিয়েছিল,—নগদ টাকার কামড় করেন নি, এইটেই পরম অনুগ্রহ। নেউগী এসেছিল কল্‌কাতায়, সেই সব জিনিষ নিজে দেখে পছন্দ করে কিন্‌তে। জমিদার লোক,কলকাতায় এক-গেশ বন্ধু-বান্ধব থাকা সত্ত্বেও তাদের কারো বাড়ী আতিথ্য না নিয়ে (যেমন গ্রহ!) সে এসে উঠল, প্যারাডাইস বোর্ডিংয়ে। ঘোরাঘুরির ফাঁকে আমাদের সঙ্গে টক্ করে এক-আধবার দেখা করে যেত! আমরা ঠাট্টা করতুম, দ্বিতীয় পক্ষর সঙ্গে বয়সে তারুণ্য এল বুঝি, তাই আমাদের প্রৌঢ়দের ভিড়েতে চায় না আর! সুরেন বললে,—তা নয় হে, ও রোজ আট পাতা করে চিঠি লেখে বৌকে রাত্রে শুতে যাবার আগে, আর সকালে তাঁর ষোল পাতা করে চিঠি প্রত্যহ, তার পর দুপুরে বাজারে ঘোরে, কাজেই দেখাশোনা করবার ফুরসৎ কোথা।

যাক্, সেদিন কোর্টে এক স্ত্রী-চুরির মকদ্দমায় জেরার ধারায় একখানি বিচিত্র রোমান্স বানিয়ে জুনিয়রদের মনে প্রচুর মিষ্ট রসের সৃষ্টি করে বেরিয়ে আসতেই সামনে দেখি, নেউগী। আমি বললুম,—ব্যাপার কি হে! কোর্টে হঠাৎ?

মুখে একটু কুণ্ঠিত হাসির রেখা টেনে নেউগী বললে,—আর বল কেন! কাল এক পকেট-মারের হাতে পড়েছিলুম।

আমি বললুম,—অর্থাৎ?

নেউগী বললে বড়বাজারে কতকগুলো জিনিষ কিনবো বলে কাল ট্রাম থেকে যেই নেমেছি, হ্যারিসন রোড আর চিৎপুরের মোড়ে, অমনি পকেটে টান্ পড়ল! ব্যস্, চেয়ে দেখি, ব্যাগ নেই! চীৎকার করলুম। দুটো-তিনটে, মুসলমান ছোক্‌রা ছুটালো চিৎপুর রোড ধরে, তাদের পিছনে তাড়া করলুম চোর-চোর বলে চেঁচাতে চেঁচাতে। হঠাৎ সামনে এক ট্যাক্সি! চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলুম। তার পর দেখি, পুলিশ একটাকে ধরেছে, আর পুলিশের হাতে মনি-ব্যাগ। ব্যাগটা আমারই। তবে ওরি মধ্যে খালি করে ফেলেছে!

আমি বললুম—হ্যাঁ, ওদের খুব হাত-সাফাই!

নেউগী বললে,—ব্যাগে ছিল একশো সাঁইত্রিশ টাকা তেরো আনা, আর কটা পয়সা। তার তো কিছুই মিললো না। তার পর আমি ফিরব বোর্ডিঙে, পুলিশ ছাড়ে না, নিয়ে চললো বড়বাজার থানায়। সেখানে কেশ লেখানো হলো। ইন্‌স্‌পেক্টরকে আমি বললুম,—মশায়, আমার টাকা গেল, ফিরে পেলুম না, মিছি-মিছি এখন কেশ লিখিয়ে কি হবে! ঐ ছেঁড়া ব্যাগ নিয়ে ঝামেলা করা পোষাবে না, সে সময়ও নেই আমার! তারা শোনেনা, বলে, সে কি মশায়, বামাল-সমেত আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে, আমরা তো ছেড়ে দিতে পারি না। তাই,—দেখ না, কোর্টে আসতে হয়েছে! পুলিশ আসামীকে কোর্টে চালান্ দিয়েছে—তার ওপর মামলারো তারিখ পড়ে গেল, বারোই জুন।...কি করি এখন? ১০ই জুন আমার বোনের বিয়ে, আজ তো ২৭শে মে।

আমি বললুম,—চলে যাও বাড়ী। পরে সফিনা পেলে এসো।

নেউগী চলে গেল।—তার পর তার মামলার কথা আমি ভুলেই গেলুম।

আরো দু'মাস কেটে গেছে। সেদিন কোর্টে যাইনি, অন্য কাজ ছিল। সন্ধ্যার পর বাহিরের ঘরে তাকিয়ায় মাথা রেখে একটা খপরের কাগজে মনোনিবেশ করেছি, এমন সময় নেউগী এসে হাজির। বাহিরে ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছিল,—জলো হাওয়াটুকু গায়ে মিঠে লাগছিল বেশ!

আমি বললুম,—এই বৃষ্টিতে আবার কোথা থেকে হে! কলকাতায় এলে কবে?…ভালো কথা, তোমার সে মামলার কি হলো?

নেউগী বললে,—সেইজন্যেই এসেছি তোমার কাছে, দুঃখ জানাতে। কম কম্মভোগ গেছে আজ! শুনলে এখনি কেঁদে ফেলবে।

আমি বললুম,—বসো, বসো—। কি পাগলের মত বকছ!

নেউগী পকেট থেকে রুমাল বার করে মাথার আর মুখের জল ঘসে-মুছে বল্‌লে,—পাগল করে দেছে, আর পাগলের মত বক্‌বো না! সেই কথাই বলতে এসেছি।.. জিজ্ঞাসা করছিলে না, কলকাতায় এলুম কবে? তা এবারে আমি কি নিজে কলকাতায় এসেছি ভাই? পুলিশ ওয়ারেণ্ট করে ধরে এনেছে।

আমি বললুম,—ওয়ারেণ্ট!

—হ্যাঁ, ওয়ারেণ্ট।

—ওয়ারেণ্ট কেন?…ও, তুমি বুঝি সে মামলায় হাজির হও নি সাক্ষী দিতে, তাই?

নেউগী বললে,—ঠিক। শোনো এখন ব্যাপার—সেই যে মামলার তারিখ পড়লো বারোই জুন, তা ১০ই তো গেল আমার বোনের বিয়ে। পাড়াগাঁর বিয়ের সমারোহ চুকতে কত সময় লাগে, তোমাদের জানা নেই, বোধ হয়! বাড়ীতে এক-বাড়ী লোক ঠাসা, তবু বারোই যে আমার মামলা, সে কথা মনেও ছিল। কোর্টে যখন তারিখ পড়ে, তখনি কোর্ট-ইনস্পেক্টরকে আমি বাড়ীর বিয়ের কথা বলেছিলুম। তা তিনি খ্যাঁক করে উঠলেন,—বললেন, দুটো মকদ্দমার তারিখ ঐ বলে উল্টে নিয়েছি মশায়,—আবার এটার নেব! ও কথা বল্‌লে সাহেব আমায় খেতে আসবে। আমি বললুম,—তা বলে আমি কি আসি কি করে? তিনি বললেন, আসতেই হবে। আমরা আনিয়ে নেব। কেশ্‌ করেছিলেন কেন?

আমি বললুম—মশায়, ঐ একটা ছেঁড়া খালি ব্যাগের জন্যে আমি কেশ্‌ করতে যাই নি—পুলিশ জোর করে কেশ করিয়েছে। আমি মানাও করেছিলুম, তা—

একটি উকিল বসেছিলেন কোর্ট-বাবুর পাশে। তিনি বললেন,—চলে যান্‌ না মশায়,—না হয় একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেবেন'খন। অত ভাবনা কেন? শুনে অবাক হয়ে গেলুম, অসুখ না থাকলেও মেডিকেল সার্টিফিকেট! কোন্‌ ভদ্র ডাক্তার এমন মিছে সার্টিফিকেট দেবেন? আর আমি তাঁকে তা দিতে বলবো কোন্‌ মুখে!…তখন অতগুলো টাকা বরবাদ গেল, মনটাও খারাপ ছিল বিলক্ষণ! ভাবলুম, দূর ছাই, লেঠায় কাজ নেই। ও বারো তারিখেই যা করবার তা তখনই দেখা যাবে, এখন থেকে মিছে ভাবি কেন! এই ভেবেই বাড়ী চলে গেলুম বাজার করে।…তারপর বিয়ে তো হয়ে গেল। একটা সফিনে গেছল ইতিমধ্যে, তা বিয়ের গোলে মামলার কথা মনেও ছিল না। শেষে পরশু হলো কি, শোনো,—বলে নেউগী চুপ করলে; একটা সিগারেট ধরিয়ে বল্‌লে,—একটু চায়ের ফরমাশ কর তো হে! বৃষ্টিতে ভিজেছি, নাকটা কেমন সড়্‌ সড়্‌ করছে!

আমি আকলুকে ডেকে বলে দিলুম, দু'পেয়ালা চা তোয়ের করিয়ে আন্‌তে! আকলু চলে গেল। নেউগী বললে,—পরশু বাড়ীতে একটা কুটুম্ব-ভোজনের আয়োজন ছিল। বিস্তর লোকজন এসেছে। তাদের নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় ওখানকার থানা থেকে ইন্‌স্পেক্টর এক চিঠি পাঠিয়ে দেছে,—থানায় আসবেন এখনি, ভারী দরকার! বুকটা ধড়াস করে উঠল। থানায় এত জোর তলব কেন রে বাপু!…কাকেও কিছু না বলে থানায় গেলুম। গিয়ে শুনি, আমার নামে ওয়ারেণ্ট

এসেছে। শুনে আমার হাত-পা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল, মাথা ঘুরে গেল। আমি কি চোর, না ঠক, না বাটপাড় যে আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা! ইন্‌স্‌পেক্টর বললে,—পঞ্চাশ টাকার জামিন দিতে হবে। আর আজ কলকাতার পুলিশ কোর্টে হাজির হতে হবে, সাক্ষী দিতে।...তবু ভালো! শুনে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বাড়ীতে লোক পাঠানো হলো। নায়েব এসে উপস্থিত। সে জামিনের কাগজ সই করলে বাড়ীতে ফিরলুম যখন, তখন আত্মীয়-কুটুম্বের দলে মহা-ভাবনা চলেছে, এই স্বদেশীর যুগে কোনো পলিটিক্যাল কেশে জড়িয়ে পড়লুম না কি! তারপর ওধারে আমার স্ত্রীর দুবার ফিট হয়েছে। ভাবো একবার ব্যাপারখানা!

হাস্‌তে হাস্‌তে আমি বললুম, —তারপর?

নেউগী বললে, —তারপর আজ এখানে এলুম। তোমায় তো কোর্টে পেলুম না,—কোর্টের দালালরা পড়ে এমন ভয় দেখিয়ে দিলে যে তখনি নগদ ষোল টাকা ব্যয় করে এক উকিল খাড়া করলুম।

আমি বললুম, —উকিল?

নেউগী বললে,—হ্যাঁ, উকিল। তারা বললে, ভারী বেইজ্জৎ হবেন মশায়। কাজেই উকিল দিতে হলো। দিয়ে ব্যাপার শুনলুম—মামলা এসেছিল এক অনারারী হাকিমের এজলাসে, তাঁর না কি ভারী খারাপ মেজাজ! সাক্ষী আসেনি—বটে? দাও ওয়ারেণ্ট! তাই ওয়ারেণ্ট হয়েছে। তারপর ভাই, উকিলটি আর তাঁর চেলারা বললে, পেস্কারের চাই চার টাকা, চাপরাশি দুজন দু'টাকা, সার্জেণ্ট এক টাকা আর পাহারওয়ালারা এক টাকা—এই বলে আরো আট টাকা নিলে! তারপর আমি জামিন আনিনি সঙ্গে! ওরা বললে,—এখনি জামিন দিতে হবে আদালতে, নাহলে হাজতে পুরবে। শুনে আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখলুম! ভালো ব্যাগ চুরি গেছল। এখন যে এ গোদের উপর বিষ-ফোড়া ভালো! তারা বললে, পেশাদার একটা লোককে পাঁচটা টাকা দিলেই সে জামিন দাঁড়াবে'খন, তাছাড়া তাকে সনাক্ত করতে আর একজন উকিল চাই! আমি বললুম, কেন, উকীল তো দিয়েছি। দালালরা হাসতে লাগল আর ষোল টাকার উকিল বাবুটি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন,—ও কাজ আমরা করি না, ওতে ইজ্জৎ যায়! সনাক্তের উকিল দোশরা আছে, দাও তার জন্যে চার টাকা, আর ষ্ট্যাম্প ইত্যাদির জন্যে এক টাকা,—আরো দশ টাকা খসল। সব-শুদ্ধ খরচ হলো চৌত্রিশ টাকা। তারপর মামলা উঠল। যা' যা' হয়েছিল সব বললুম, ব্যাগটাও চিনে identify করলুম। তখন আসামীর উকিলের জেরা—এতে কি চিহ্ন আছে? এ রকম ব্যাগ বাজারে হাজার হাজার পাওয়া যায় কি না? আমি বললুম, তা যায়, তবে এটা আমি বছর দুয়েক ব্যবহার করছি, তাই একে অমন পাঁচশো ব্যাগের মধ্যে থেকে চিনে নিতে পারি। আরো জেরা চললো। আসামী আর সাক্ষী ডাকলে না; একটু পরেই রায় বেরুলো। হাকিম আসামীকে খালাস দিলেন benefit of doubt বলে। তবে হুকুম হলো, ব্যাগটা আমাকে দেওয়া হবে। আমি ষোল টাকার উকিল বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করলুম,—আসামীকে ছেড়ে দিলে যদি, ব্যাগটাও ওকে দিলে না কেন? তিনি বললেন,—ব্যাগটা ও দাবী করে নি! আমি বললুম,—ব্যাগটা ওর কাছ থেকেই তো বেরিয়েছে! তিনি বললেন,—ও-সব আইনের কথা,—আপনি বুঝবেন না। তারপর আরো একটু ঝাঁঝালো সুরে বললেন—আপনার দোষ যে! অত করে বলে দিলুম,—বলবেন যে ঐ লোকটাকেই পকেট থেকে ব্যাগ নিয়ে দৌড়ে যেতে দেখেছি, তা আপনি সে কথাটা ভুলেই গেলেন! আমি বললুম আজ্ঞে, আমি তো ঠিক দেখিনি, তাছাড়া ট্যাক্‌সিটা হঠাৎ এসে পড়লো কি না, তাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে তখন আমি ব্যস্ত—

উকিলবাবু গরম হয়ে চলে গেলেন। তাঁর মুহুরি এসে বললে,—হাকিম অন্যায় করেছে, আপনি হাইকোর্ট করে দিন। দিন তো দেখি, সাড়ে দশ আনা পয়সা। নকলের দরখাস্ত করে দি, তারপর হাইকোর্টে যান,—এস্ কে সেন কৌশুলিকে দেবেন। এ হাকিমের উপর হাইকোর্ট ভারী চটা,—ওর

রায় পেলেই উল্‌টে দেয়। আমি তো তার কথা কাণে না তুলেই চলে এসেছি।

আমি হাসতে হাসতে বললুম,—ব্যাগটা কোথায়?

নেউগী পকেট থেকে সেটা বার করে বললে,—এই যে! ব্যাগটি আমার লক্ষ্মী—এর দৌলতে কম লাভ হলো! চোরে টাকা নিলে, তারপর এর জন্যে ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার হয়ে এলুম,—আর চৌত্রিশটা টাকা আমাকে বেকুব বানিয়ে উকিল-মুহুরিরা মিলে নিয়ে গেল হে!

আমি বললুম,—এই ব্যাগটি নিয়ে এক কাজ কর। ভালো ফ্রেমে কাঁচ দিয়ে বাঁধিয়ে ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখে দাওগে, নয় তো মিউজিয়মেও পাঠাতে পারো, কি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লে। অন্ততঃ এর ছবি তুলিয়ে বিলেতের কোনো ম্যাগাজিনে পাঠাও—তলায় লেখা থাকবে, A bag that cost so much!

নেউগী হাসতে লাগল।

আমি বললুম,—তোমার যেমন গ্রহ! না হলে মামলা তো আরো লোকে করে এবং করছেও।

নেউগী বললে,—সকলের কি মামলা করা সয়!

আমি বললুম,—যাক, এখন কি প্যারাডাইস বোর্ডিংএ যাবে, না, এই গরাবের কুঁড়েতেই—

আমার কথাটা ফুরোতে না দিয়েই নেউগী বললে,—এই গরাবের কুঁড়েতেই রাতটা কাটাব। মেম-সাহেবকে বলো; দুটি গরম ভাত আর মাছের ঝোল খাব,—আর কিছু দাও বা না দাও! তারপর কালই বাড়ী যেতে হবে, না হলে তাঁর যে রকম ফিট হচ্ছে দেখে এসেছি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বাঙালী পণ্ডিত অভয়কর গুপ্ত

তিব্বতী বৌদ্ধেরা এখনও যে সমস্ত মহাপুরুষদের সাধু বলে পূজা করেন, তার মধ্যে একজন বাঙালী পণ্ডিতও আছেন। তাঁর নাম—অভয়কর গুপ্ত। তিনি বিক্রম-শিলার মঠের সঙ্গে নানাভাবে সংসৃষ্ট ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল সিদ্ধ মহাপণ্ডিত।

৺শরৎচন্দ্র দাস বলেনযে অভয়কর বাংলা দেশে গৌড় সহরে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন *। বোধ হয় তিনি ইহার আরও পরে জন্মগ্রহণ করেন, কারণ তাঁর রচিত একখানি বই "মুনি-মতালঙ্কার" শ্রীমদ্ রামপালের ৩০শ বর্ষে রচিত হয়েছিল। অনেকে অনুমান করেন, বইখানি ১১২৫ খৃঃ অব্দে লিখিত হয়েছিল। তাহলে আমরা বলতে পারি যে নবম শতাব্দীতে অভয়কর জন্মান নি, তিনি বরং মোটামুটী ১০৮০-১১৩৫এর মধ্যে আবর্ভূত হয়েছিলেন। †

বাল্যকালে অভয়কর মগধে শিক্ষা পেয়েছিলেন। যখন তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন, তখন তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দলে যোগ দিলেন। ক্রমে পণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। রাজা রামপাল তাঁকে আহ্বান করেছিলেন রাজবাড়ীতে পূজাদি করবার জন্যে।

মহাপণ্ডিত অভয়কর সম্বন্ধে তিব্বতী বইয়ে নানা গল্প আছে। একবার নাকি এক ডাকিনী মোহিনী-বেশ ধরে তাঁকে প্রলুব্ধ করতে আসে। যখন সেই ডাকিনী দেখল যে তাঁকে প্রলুব্ধ করা শক্ত, তখন তাঁকে বলে যায় যে তিনি এমন ক্ষমতা পাবেন যার দ্বারা তিনি অনেক শাস্ত্রাদি লিখতে পাবেন।

রাজা রামপাল যখন মগধে ও বাংলা দেশে রাজত্ব করছিলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের খুব প্রাধান্য ছিল। সে সময় বৌদ্ধদের আড্ডা ছিল বিক্রমশিলার মঠ, ওদন্তপুরীর বিহার আর বুদ্ধগয়া। বিক্রমশিলাতে প্রায় তিন হাজার ভিক্ষু ছিল, ওদন্তপুরীতে এক হাজার এবং বুদ্ধগয়া বা বজ্রাসনে এক

---

* Cordie's Catatogue vol iv 314

† J. A. S. B. 1882 'p' 16

...র ভিক্ষু ছিল। এ ছাড়া বড় উৎসবে যখন সব বৌদ্ধ ...সী হাজির হতো, তখন তাদের সংখ্যা ৫০০০বা ১০,০০০ ...ত। রাজা রামপাল নিজে বৌদ্ধ ছিলেন বলে বুদ্ধগয়ায় ... জন মহাযন ও ২০০ জন শ্রাবক ভিক্ষুকে রোজ রাজ-...ণ্ডার থেকে আহার দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

মহা পণ্ডিত অভয়কর মহাযান বৌদ্ধদলের নেতা হলেও, অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাও তাঁকে সম্মান করত। তিনি বিক্রমশিলার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনেক কাল ছিলেন এবং সেখান থেকে নানা বৌদ্ধ বই লিখেছিলেন।

অভয়কর গুপ্ত নিজে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করবার জন্যে গিয়েছিলেন কি না জানা যায় না। তবে তিনি এখনও তিব্বতে সাধু মহাপুরুষ বলে পূজিত হন। তিনি তিব্বতী ভাষা খুব ভাল করে জানতেন এবং তিব্বতী ভাষাতে নিজের অনেক বই ও অন্যের বই অনুবাদ করেছিলেন।

তাঁর লেখা বা অনুবাদিত বইয়ে অনেক সময় তাঁর নাম অভয়কর গুপ্ত বা শুধু অভয়কর বলে পাওয়া যায়। দু-এক খানা বই সম্ভবতঃ তিনিই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে অনুবাদ করেছিলেন।

তিনি নিজে এই বইগুলি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন :

(১) শ্রীমহাকাল-সাধন নাম (Cordier Cat ২য়, ...৭ পৃঃ)
(২) শ্রীমহাকালান্তর-সাধন নাম (")
(৩) সিদ্ধেক-বীর-সাধন (" পৃঃ ৩৭৯)
(৪) বজ্র-যাগ-মুলাপত্তি-কর্ম্মশাস্ত্র (৩য়, পৃঃ ৮৫)
(৫) কালি-সূর্য্য-চক্র-বসক্রিয়া নাম (" পৃঃ ২১৯)
(৬) গণ-চক্র-পূজা-ক্রম-নাম ("পৃঃ ২৪৬)
(৭) সংক্ষিপ্ত-বজ্র-বারাহ-সাধন ("পৃঃ ২৫৭)

এই সাতখানা বই-যা তিনি সংস্কৃত থেকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন—তন্ত্রের বই। সে সময় তন্ত্র ধর্ম্মে প্রবেশ করে বুদ্ধের আসল ধর্ম্মকে অনেকটা ...রত করেছিল। আর সেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ... ছিল—মগধের ও বাংলার বৌদ্ধ বিহারগুলো— ...ঃ বিক্রমশিলার মঠ। এখান থেকে এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রবেশ করে। এখনও তিব্বতে তান্ত্রিক ক্রিয়া কাণ্ডের প্রভাব নিতান্ত কম নয়।

অভয়কর গুপ্ত নিজে বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয়ে একখানি বই সংস্কৃতে রচনা করেন, যা তিনি নিজেই তিব্বতী ভাষাতে অনুবাদ করেছিলেন। সে বইখানির নাম—"অভিষেক প্রকরণ"। ৩য় ভাগ, ২৬৭ পৃঃ)।

এ ছাড়া আরও ২৬ খানা বই তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। সেগুলি :—

(১) শ্রী-কাল-চক্রোদ্দান। ২য় ভাগ, পৃঃ ২২।
(২) শ্রী-চক্র-সম্বরাভিসময়। " পৃঃ ৪৭।
(৩) স্বাধিষ্ঠান-ক্রমোপদেশ—নাম (" ")
(৪) চক্র সম্বারি-সময়োপদেশ (")
(৫) শ্রীসম্পুট-তন্ত্র-রাজটীকা আম্নায়-মঞ্জরী নাম (" পৃঃ ৭১)
(৬) শ্রী-বুদ্ধ-কপাল-মহাতন্ত্ররাজটীকা অভয় পদ্ধতি নাম (" পৃঃ ১০৭)
(৭) পঞ্চ-ক্রম-মানা—টীকা চন্দ্র-প্রভা-নাম (" পৃঃ১৪২)
(৮) রক্ত-যমান্তক-নিষ্পন্ন-যোগ নাম (" পৃঃ ১৮০)
(৯) বজ্র-যানাপত্তি-মঞ্জরী-নাম (" পৃঃ ২৫৫)
(১০) গণ-চক্র-বিধি নাম (" পৃঃ ২৫৬)
(১১) বজ্রাবলি-নাম-মণ্ডলোপায়িকা (" পৃঃ ৩৭০)
(১২) নিষ্পন্ন-যোগাবলি-নাম ("পৃঃ ৩৭১)
(১৩) জ্যোতি-মঞ্জরী-নাম-হোমায়িকা (")
(১৪) উবুম্ন জম্ভল-সাধন-নাম (৩য় ভাগ, পৃঃ ৮৯)
(১৫) বোধি-পদ্ধতি-নাম (" পৃঃ ৯৪)
(১৬) শ্রীমহাকাল-কর্ম্ম সম্ভার (" পৃঃ ২০৯)
(১৭) বজ্র-মহাকাল কর্ম্মোচ্চাটনাভিচার নাম (")
(১৮) বজ্র-মহাকাল-কর্ম্ম-বিভঙ্গাভিচার নাম (")
(১৯) " " "—কায়-স্তম্ভ নাভিচার নাম (")
(২০) " " "—বাক্- " " (")
(২১) " " "—চিত্ত- " (পৃঃ ২১০)
(২২) " " "—ঘামাঞ্চাভিমায়-নাম (")
(২৩) " " কর্ম্মাভিচার প্রতিসংজীবন শান্তি কর্ম্মন নাম (")

(২৪) উপদেশ লঞ্জরী নাম-সর্ব্ব-তন্দ্রোৎপন্নোপন্নসামান্য ভাষ্য (")

এ ২৪ খানাই তন্ত্রের বই। এ থেকে আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারি বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তন্ত্র কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। গুলির তিব্বতী অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে-বৌদ্ধতন্ত্র তিব্বতেও প্রচারিত হয়েছিল।

বৌদ্ধ "সূত্র" সম্বন্ধে অভয়কর গুপ্ত মাত্র দু'খানি বই সংস্কৃতে রচনা করেন :—

(২৫) আর্য্যাষ্ট- সাহস্রিকা-প্রজ্ঞা-পারমিতা বৃত্তি মর্ম্মকৌমুদী নাম (৩য় পৃঃ ২৮২)

(২৬) মুনি-মতালঙ্কার (" পৃঃ ৩১৪

এই ২৬ খানা বই ছাড়াও তাঁর আর একখানা বই আছে, সেটী হচ্ছে-- বজ্র-মহাকালাভিচার হোম নাম (৩য়, পৃঃ ২১০)। আসলে তিনি এই বইখানিতে নাগার্জ্জুনের উপদেশ-সমূহ সংগ্রহ করেছিলেন।

অভয়কর গুপ্তের উপাধি ছিল—আর্য্য মহাপণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য আজও তিনি তিব্বতে একজন সাধু মহাপুরুষরূপে পূজিত হন।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

গোলাপকুঁড়ির দিন

ফোটা ফুলের দিন গেল রে
ফোটা ফুলের দিন গেল,
ফুটবে যারা আস্‌ছে তারা
চোখ মেল রে চোখ মেল।
পরীর পুরী বন্ধ রে,
গীত চলেছে অন্দরে,
পাই ভিয়েনের গন্ধ রে
পূর্ব্বরাগের পার্ব্বণে।
জিত্‌বি কে আজ হার মেনে!

দিন যে আজি ফুলকুঁড়িদের
ফুলকুঁড়িদের ছন্নলাপে
নিবিড় পুলক ফোটার উপর
অফোটাদের জয়লাভে।
ডাকছে ময়ূর-পক্ষী ভাই,
সঙ্গী চাই, সঙ্গী চাই,
সাগর দরী লঙ্ঘি যাই
গোলাপ কুঁড়ির মজলিসে—
রূপের নজর আয় দিসে।

মেঘদুতের ওই উঠছে রে মেঘ
কূটজ কুসুম ধূপ কোথা?
জ্বলছে ফানুষ চলছে নীরব
আরব নিশির রূপকথা!
ফুটবে যে আজ দিন তারি
নাই কিছু নাই নিন্দারি,
ভোজ চলেছে এন্তারই
গোলাপ কুঁড়ির ছত্তরে
আয় ছুটে আয় সত্বরে।

গোলাপ কুঁড়ির ইলসে গুঁড়ি
গোলাপ কুঁড়ির নৌরেজা,
গোলাপ কুঁড়ির দিলখুসাতে
কিশোর হিয়া দৌড়ে যা।
আজ ছেড়ে দে গুলতানী,
ভর্ হৃদয়ের ফুলদানী,
গোলাপ কুঁড়ির ভাণ্ডারা আজ
গোলাপ কুঁড়ির অর্দ্ধোদয়।
রূপ যমুনায় নাইতে হয়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মায়ের অনুগ্রহ

চীনে হোটেলের ছোট্ট একটা খোপের মধ্যে উপেন আর মন্মথ মুখোমুখি বসে জিন খাচ্ছিল।

তাদের সামনে একটা করে শূন্য পাত্র। মাঝখানে বড় একখানা তস্তরীতে একরাশ কড়া আলুভাজা। উপেন একটা সিগারেট ধরিয়ে মৌজ করে তাতে আস্তে আস্তে দম দিচ্ছিল, আর মন্মথ তস্তরী থেকে মধ্যে মধ্যে আলু-ভাজা তুলে নিয়ে দাঁতে কাটছিল।

আশপাশের ছোট-বড় খোপ থেকে নানা দেশের নর-নারীর বুক্‌নির এক-আধটা টুক্‌রো ছিট্‌কে তাদের কানে এসে লাগ্‌ছিল।

শনিবারের সন্ধ্যেটা খুব জমে উঠেছিল।

মন্মথ খানিকক্ষণ উপেনের দিকে চেয়ে থেকে বলে উঠ্‌ল—মাইরি, মায়ের নিগ্রহ হয়ে তোর চেহারাটা একদম মাটি করে দিয়েছে।

উপেন সিগারেটে একটা জোর-দম্ লাগিয়ে বল্লে—চেহারা be damned, মায়ের নিগ্রহ যদি আর এক দিন পরে আমায় আক্রমণ করত, তা হোলে প্রাণ দিতেও আমার আপত্তি ছিল না। আমার জীবনে সেইটেই সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

মন্মথ বল্লে—সে আবার কি রকম?

—আরে তা জানো না বুঝি? বলিনি তোমায়?

—কৈ, না!

—বল কি হে, তবে শোনো, বলি।

মন্মথ বল্লে—তবে আর একটা করে জিন দিয়ে যেতে বলি?

উপেন বল্লে—জিন তোমার ঘোড়ার পিঠে চাপিও, আমায় এক পেগ হুইস্কি দিতে বল। বাবা বিলেত থেকে ঘুরে এলে, অথচ হুইস্কি খেতে শিখলে না? আরে ছিঃ!

মন্মথ বল্লে—আমার লিবারে হুইস্কি সহ্য হয় না, ঐটেই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

মন্মথ হাঁক্‌লে—আ চুং—

হাস্য-মুখে একটি চীনে যুবক তাদের ঘরে প্রবেশ করতেই সে বল্লে - এক পেগ হুইস্কি আর এক পেগ জিন।

হুইস্কির গেলাসে একটি চুমুক মেরে উপেন বল্‌তে লাগ্‌ল—তোরা তখনো বিলেত থেকে ফিরিস্‌-নি, সে বছর মাঘ মাস কাবার হতে না হতে সহরের চারিদিকে ভয়ানক বসন্ত সুরু হলো। হঠাৎ এই রকম বসন্তের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সহরের স্বাস্থ্যরক্ষার অভিভাবকেরা তার কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য গবেষণা করতে বসে গেলেন। অনেক তদন্ত করে তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে, প্রত্যেক পাচ বছর সহরে বসন্ত রোগের এই রকম বাড়াবাড়ি হয়। অতএব এই একটা বছর কোনো রকমে চোখ-কান বুজে ওষুধ গেলার মত যদি বেঁচে যেতে পারো, তা হলে পরের চারটে বছর বসন্ত রোগে মরবার ভয় অপেক্ষাকৃত কম থাকবে। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তারা সহরের চারিদিকে বসন্ত রুগীর বড় বড় প্লাকার্ড মেরে দিয়ে টিকের বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন। বসন্ত যে সামান্য রোগ নয়, তা বোঝাবার জন্য বেচারার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছিল।

কয়েকদিনের মধ্যে সহরে একটা হুলুস্থূল কাণ্ড লেগে গেল। আজ যার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি, কাল তার বাড়ীতে গিয়ে শুনি যে, তার গায়ে গুটি বেরিয়েছে, দিন দশেক যেতো না যেতেই সে ব্যক্তি সরে পড়েছে!

ঠনঠনের শীতলা-তলায় পুজোর আর বিরাম নাই। দিন কয়েকের মধ্যেই সেই মান্ধাতার আমলের ছাত-ফুটো ভাঙা মন্দির মেরামত হোয়ে গেল। শুধু তাই নয়, কে একজন মাড়োয়ারী মন্দিরের চাতাল, সিঁড়ি, সব মার্ব্বেল পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে।

আমাদের মেস ছিল তখন একটা সরু গলির ভেতর ভদ্রপল্লীর মধ্যে। বাসার চারিদিকে গৃহস্থের বাড়ী। অফিস থেকে বাড়ীতে ফিরে একটু জিরোতে না জিরোতেই পুরাতন ভৃত্য রামদাস এসে খবর দিতে লাগ্‌ল—বাবু আজ ও-বাড়ীতে মায়ের আগমন হয়েছে।

যাদের বাড়ীতে বসন্ত হয়, তারা দিন দুয়েক ধরে শাঁথ ঘণ্টা বাজিয়ে পূজোর নাম করে রোগ তাড়াতে চেষ্টা করে, তারপরে দিন কয়েক ধরে রুগীর কাৎরানি, তারপরে এক দিন কান্নার রোলে পাড়া কেঁপে ওঠে!

পাড়ায় সবার মুখেই একটা সন্ত্রস্ত ভাব, কখন কাকে ধরে! সকলেই ধীরে ধীরে কথা কয়, কথায় কথায় ওপর দিকে আঙুল তুলে দেখায়, অতি সন্তর্পণে বলতে থাকে—মায়ের অনুগ্রহ!

—তোমায় বল্‌ব কি, মাস খানেকের মধ্যে সমস্ত জাতটাই ধার্ম্মিক হয়ে উঠ্‌ল!

দেবতাকে ঘুষ দেবার ঠেলায় বাজারে সন্দেশের দর আক্রা হয়ে গেল।

আমাদের বাসার কাছাকাছি তিন বাড়ীতে বসন্ত হয়েছিল। দিনের বেলা তো আপিসেই কাট্‌ত। রাত্রি এগারোটা বারোটা অবধি আড্ডা দিয়ে বাড়ীতে ফিরে একটু গা গড়াবার উপক্রম করেছি, আর রুগীর কাৎরাণি—বাবা গো, আর পারি না গো—

একদিন আপিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরেছি; বাসায় তখনো কেউ ফেরে-নি, ছাতের ওপর বসে একটু আরাম কর্‌ছি, এমন সময় রামদাস এসে খবর দিলে—ঘোষেদের বাড়ীতে মা এসেছেন। সেই মেয়েটীর—

ঘোষেদের বাড়ীটা একেবারে আমাদের লাগা বল্লেই হয়, মাঝে একটা সরু গলির ব্যবধান মাত্র। তাদের জানালা খুল্লে আমার ঘর থেকে বাড়ীর ভেতর পর্য্যন্ত দেখা যেত। কদিন থেকে দেখছিলুম ওদের বাড়ীর একটি মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে এসেছে! বাপের বাড়ীতে এসে সমস্ত বাড়ীখানাকে সে আনন্দে মাথায় করে রেখেছিল। আহা! মেয়েটির জন্য বড় কষ্ট হতে লাগ্‌ল।

মায়ের অনুগ্রহটা যতক্ষণ দূরে দূরে ঘুরছিল, ততক্ষণ আমাদের বাড়ীতে কোনো সাড়াই পড়ে-নি। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ একেবারে আমাদের গর্দ্দান পর্য্যন্ত নেমে আসতেই বাড়ী ছেড়ে যে যার লম্বা দিলে। আমরা তিন জন, বসন্তে মরার চেয়ে অনাহারে মরবার ভয় যাদের বেশী, তারাই শুধু রয়ে গেলুম।

আমার ঘরে একা আমি ছাড়া আর কেউ নেই। রাত্রে রুগীর কাৎরাণি শুনে চাঁৎকে উঠি; বাড়ীতে আরো যে দুজন ছিল তারা মাঝে মাঝে অন্যত্র রাত কাটায়; প্রভুভক্ত রামদাস আর আমি মায়ের অনুগ্রহের প্লাবনের ওপর আমাদের জীর্ণ জীবন-তরী নিয়ে টাল-মাটাল খেতে লাগলুম।

কিছুদিন এইভাবে কাটবার পর আমার পুরাতন অনিদ্রা রোগ আবার চেপে ধরলে। রাতে ঘুম হয় না, আপিসে গিয়ে ঘুমোলে বড়বাবু এমন বেসুরো চীৎকার করতে থাকে যে, স্বয়ং নিদ্রাদেবীর পক্ষেও তা সহ্য করা শক্ত! অনেক দেখে শুনে শেষকালে এক মতলব আবিষ্কার করা গেল। এগারোটার পর সিধে বাড়ী না ফিরে দু' ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ধরে সহরময় ঘুরে শরীরটাকে এমন অবসন্ন করে নিয়ে আসতে লাগলুম যে, বিছানায় পড়তে না পড়তে ঘুম আস্‌ত।

সেদিন ছিল শনিবার। রাত্রি প্রায় দেড়টা অবধি হনহন্ করে সহরটা টহল মেরে বাড়ীতে ঢোকবার আগে গলির মোড়ে সদর রাস্তার ওপর একটা রকে বসে সিগারেট টান্‌ছি, রাস্তায় একটা লোক নেই, কিছুক্ষণ আগে রাস্তা মাতিয়ে একদল লোক মড়া নিয়ে গেছে, দূর থেকে তাদের চীৎকার বাতাসে উড়ে এসে আমার কানে লাগ্‌ছিল। মৃদু বাতাস আমার অবসন্ন শরীরটাকে রাস্তাতেই ঘুম পাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে; উঠ্‌ব মনে করছি, এমন সময় আমার পাশ দিয়ে দুটি রমণী-মূর্ত্তি চলে গেল।

সেই রাত্রে জনপ্রাণীহীন রাস্তায় নারীমূর্ত্তি দেখে আমার জড়তা তখনি ছুটে গেল। পিছন থেকে তাদের পা দেখে যতটা বুঝতে পারা গেল, তাতে মনে হলো যে, তাদের মধ্যে একজন তরুণী, অপর জন বৃদ্ধা। তরুণীর বর্ণ গৌর!

ব্যাপার কি! জামাটা খুলে কাঁধে ফেলে রেখেছিলুম, তখনি সেটা পরতে পরতে এগিয়ে এসে একটা গ্যাসের কাছে দাঁড়ালুম। তারা আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। গ্যাসের আলোতে তরুণীকে দেখলুম, বেশ দেখতে সে! সে আমার রকম দেখে আমার মুখের দিকে চেয়ে যেন একটু হেসে মুখখানা ফিরিয়ে নিলে।

বুকের মধ্যে কে যেন হাততালি দিয়ে বলে উঠ্‌ল—বাস্‌, হেসেছে যখন —

আমি তাদের অনুসরণ করতে লাগলুম।

চলেছি তো চলেইছি। চলার যেন আর অন্ত নেই! বাঙালীর মেয়ে যে এত জোরে চলতে পারে, রাত-বেড়ানোর ইতিহাসে সে অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে আমার আর হয় নি। চল্‌তে চল্‌তে মাঝে মাঝে একবার তরুণীর পাশে গিয়ে পড়ি, সে বিলোল কটাক্ষে আমার দিকে চেয়ে হাসে, তখনি আবার সন্ত্রস্ত হয়ে বৃদ্ধার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার রকম দেখে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারি-না। সে কি ভদ্রলোকের মেয়ে! চেহারা দেখে তো ভদ্র বলেই মনে হয়। কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়ের পক্ষে আর একজন পুরুষকে এই রকম কটাক্ষ করা—তাও বা কি করে সম্ভব হতে পারে! মনের মধ্যে চিন্তার রাশি তালগোল পাকাতে লাগ্‌ল বটে, কিন্তু পা-দুখানা আমার সমান চালে কাজ করছিল।

বৃদ্ধা তরুণীর সঙ্গে সমান তালে চলতে পারছিল না। কখনো তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, কখনো সঙ্গে চলে, আবার কখনো বা দশ হাত পিছিয়ে পড়ে।

এমনি করে প্রায় ঘণ্টাখানেক পথ চলার পর বৃদ্ধা যেই একটু এগিয়েছে, সেই সুযোগে আমি তরুণীকে বলে ফেল্লুম—আর কতদূর ভাই! সারারাত্রি কি আজ পথে পথেই ঘুরবে?

তরুণী দ্বিধাহীন ভাবে আমার কথার উত্তর দিলে—এই যে, আর বেশী নেই, এই মোড়টা—

ঠিক সেই সময় বৃদ্ধা পেছন ফিরে দেখতে পেলে যে, তরুণী আমার সঙ্গে কথা বল্‌ছে। তার সেই বিশ্রী তোবড়ানো মুখের কুঞ্চনগুলো বিস্ময়ে এক অদ্ভুত আকার ধারণ করলে। সে দু-পা পেছনে এসে তরুণীর পাশে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও সিগারেট ধরাবার জন্য দাঁড়িয়ে গেলুম।

বৃদ্ধা একটু উচ্চ কণ্ঠে তরুণীকে কি বল্লে শুন্‌তে পেলুম —তরুণী কিছু বল্লে কি না, তাও বুঝতে পারা গেল না।

আবার চলা সুরু হলো। চলার আর বিরাম নেই। শূন্য রাস্তা, মধ্যে মধ্যে গ্যাসের থামগুলো পাহারার মতন চোখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে হেঁটে হেঁটে আমার হাঁটু দুটো ভেঙে পড়বার জোগাড়! এক জায়গায় এসে আবার একটা সুবিধা উপস্থিত হওয়ায় তাকে বল্লুম—আমি তা হলে চল্লুম, আর চলতে পাচ্ছি না।

তরুণী বল্লে—আর একটু চল না, এই তো এসে পড়েছি। দেখ, ঐ লোকটা অনেকক্ষণ থেকে আমাদের পেছু নিয়েছে, ওকে তাড়াতে পার?

হঠাৎ বৃদ্ধার করুণ কণ্ঠে চম্‌কে উঠলুম। সে বল্লে—বৌমা, এ কি হচ্ছে! ঐ জন্যেই তোমায় নিয়ে রাস্তায় বের হতে চাই-নি।

বৃদ্ধার কথায় কান না দিয়ে অগ্রসর হলুম। দু' এক পা চলেই দেখি অন্য ফুটপাথ দিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে একটা লোক এগিয়ে চলেছে। লোকটাকে এতক্ষণ একেবারে দেখতেই পাই-নি। আমি অন্য ফুটপাথে গিয়ে কোনো রকমের ভণিতা না করে একেবারে তার হাত চেপে ধরে বল্লুম—রাস্কেল, ভদ্রলোকের মেয়েছেলের পিছু নেওয়া! যাও, নিজের কাজে চলে যাও।

লোকটা বোধ হয় আমার কথার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে সে অবসর না দিয়ে আবার বল্লুম—এখান থেকে এক পা এগিয়েছ কি ছুরি দিয়ে পেট ফাঁসিয়ে দিব। খালিল গুণ্ডার নাম শুনেছ? বাঁচতে চাও তো সরে পড়।

লোকটা অবাক হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলো; আমি ছুটে রাস্তা পার হয়ে আবার তাদের অনুসরণ করতে লাগলুম। একবার ফিরে দেখলুম—লোকটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে।

আরও অনেকক্ষণ চলার পর তারা একটা সরু গলির মধ্যে ঢুক্‌ল। দু-পা গিয়েই বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে চারপাশের বাড়ীগুলো দেখতে লাগ্‌ল। তার রকম দেখে মনে হলো, যেন তারা ভুল করে এই গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

ঠিক সেই সময় বড় রাস্তায় একটা গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। গাড়ীর ভেতর থেকে একটা লোক চেঁচিয়ে গাড়োয়ানকে বল্‌ছিল—এই গলি—এই গলি—

ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে না দেখতে গাড়ীটা গলির মধ্যে

ঢুকে একেবারে আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়বার উপক্রম করলে। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি গাড়ীর একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। আমি আর তরুণী অন্য পাশে রইলুম।

গাড়ীর মধ্যে দেখি সেই লোকটা! সে আর পায়ে না হেঁটে একখানা গাড়ী ভাড়া করেছে। সে একদৃষ্টে তরুণীর দিকে তাকিয়েছিল, আমার চোখে চোখ পড়তেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

তরুণী এবার আগে আমায় বল্লে—বড় কষ্ট হয়েছে তোমার, না?

কষ্ট যে হচ্ছিল তা আর প্রকাশ করবার নয়। যেমন দেহে, তেমনি মনে; তবুও বলতে হলো—না, কষ্ট কিসের! আর কতদূর?

তরুণী হেসে বল্লে—এই যে এবার ঠিক এসে পড়েছি। ঠিক সেই সময় রাত্রির অন্ধকার তোলপাড় করে চীৎকার উঠল—ব্যায়লো হায়রি, হায়রি বোওওল।

শ্মশান-যাত্রীদের সেই বীভৎস চীৎকারে আমার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল। নিজেকে সাম্‌লে নেবার আগেই তরুণী "বাবা গো" বলে একটা অস্ফুট চীৎকার করে দু-হাত দিয়ে একেবারে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে—

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে বোধ হয় এক মিনিটের বেশী সময় লাগে-নি।

গাড়ীর ভেতর থেকে সেই লোকটা গলা বাড়িয়ে আমাদের দুজনকে সেই অবস্থায় দেখে হতাশভাবে ধপাস করে বসে পড়্‌ল!

গাড়ীখানা গড়্ গড়্ করে এগিয়ে গেল। তরুণীর একখানি শিথিল হাত তখনো আমার কাঁধের ওপর পড়েছিল। গাড়ীখানা সরে যেতেই বৃদ্ধা আমাদের সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে আমায় একটা বিশ্রী গালাগালি দিয়ে বল্লে—চল, তোমার দেখ্‌ছি—

তার কথা শুনে ক্রোধে আমার সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগ্‌ল। ইচ্ছে হচ্ছিল, তার গলাটা টিপে সেইখানেই শেষ করে ফেলি। আমার প্রতি বক্তব্য শেষ করে সে তরুণীকে বল্লে—রাস্তার মাঝে খুব ঢলানটাই ঢলালে যা হোক্! চল, এ গলি নয়—

তারা গলি থেকে বেরিয়ে আবার বড় রাস্তায় পড়ে চলতে লাগ্‌ল। সেই যে লোকটা গাড়ী নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, গলিটা সরু বলে কোচুয়ান আর গাড়ী ঘোরাতে পারলে না। গাড়ী সিধে গলির মধ্যে ঢুকে গেল। লোকটা একবার অজবুকের মত জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে শেষ দেখা দেখে নিলে।

বড় রাস্তায় পড়ে আবার চল সুরু হলো। কারো মুখে কোন কথা নেই! অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলেছি। আমার মনে হতে লাগ্‌ল, আমি যেন এই ধরার প্রথম পুরুষ, প্রথম-নারী-দরশ-মুগ্ধ আমার মন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে যার পেছনে...কে সে নারী? কোথায় সে যাবে? কেন যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, কিছুই জানি না। যুক্তি-তর্ক কিছুই নেই। নারীর পশ্চাতে পুরুষ এই ভাবেই ছুট্‌তে থাকবে, নারী ও পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তার এই বিধান; নারী ও পুরুষের মাঝে বিশাল সংসার বার বার বাধার দেওয়াল তুলে দেবার চেষ্টা করছে—ঐ বিশ্রী বুড়ীটা যেন তারই চিহ্ন!

চিন্তা করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেল। কত গলি পার হয়ে গেলুম, কিছুই দেখি-নি। হঠাৎ তরুণী এক জায়গায় এসে দাঁড়াল। বুড়ী বল্লে—আবার কি হলো? দাঁড়ালে কেন!

আমি তার কাছে এসে দাঁড়াতেই সে আমায় চুপি চুপি বল্লে—কাল রাত্রি এগারোটার পর আমাদের বাড়ীর নীচে এসে দাঁড়িও, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। বল, আসবে?

আমি বল্লুম—নিশ্চয় আসবো।

তরুণী বল্লে—তোমার জন্যে ওপরের একটা জানলায় আমি অপেক্ষা করবো।

বুড়ী বোধ হয় আর সহ্য করতে পারলে না। সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—ধন্যি মেয়ে যা হোক—

তরুণী আর কিছু না বলে এগিয়ে চল্লো। কিছুদূর গিয়ে তারা একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। ঢোকবার সময় সে আমাকে ইসারা করে চলে যেতে বল্লে।

তারা ভেতরে চলে গেলে আমি তাদের বাড়ীখানা

...স করে দেখতে লাগলুম। দোতলায় সারি সারি তিন ...রটে জানলা। উর্দ্ধমুণ্ড হয়ে জানলাগুলো দেখ্‌ছি এমন সময় বুড়ীর কণ্ঠস্বর কানে গেল—এই যে এখনো দাঁড়িয়ে আছে!

ওপরের একটা জানলায় সাদা মতন কি একটা দেখা গেল। কিন্তু সেদিকে দেখ্‌বার আর অবসর ছিল না। নীচে চোখ নামিয়ে দেখি, তাদের রকের ওপর দুটো ষণ্ডা লোক লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখ্‌ছে।

লোক দুটোকে দেখেই আমার শ্রান্ত লক্‌বগে পা দুটোতে কে যেন স্প্রিংয়ের দম্ লাগিয়ে দিলে। এক মুহূর্ত আর সেখানে অপেক্ষা না করে দৌড় দিলুম।

দূর থেকে—মারো মারো, পাহারওয়ালা, খুন করবো, ইত্যাদি নানাপ্রকার শ্রবণের পীড়াদায়ক কথা উড়ে আমার কানে এসে পৌছুতে লাগল।

দৌড়! দৌড়! দৌড়! আড়াই ঘণ্টা ধরে যে পথটা তাদের পেছন পেছন গিয়েছিলুম, ঠিক পনেরো মিনিটে সেই রাস্তা পার হয়ে ফিরে এলুম। বাড়ীতে এসে বিছানায় পড়তে না পড়তে ঘুম। সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে চিন্তা করবারও অবসর হলো না।

রবিবার সকালে রামদাস যখন এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল, তখন বোধ হয় বেলা দশটা। সর্বাঙ্গে দারুণ বেদনা, মাথাটা এত ভারী যে, তুলতে কষ্ট হতে লাগল। বিছানায় উঠে বসেই মনে হলো, যা থাকে কপালে আজ দেখা করতে যেতেই হবে। খাট থেকে নেমে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই নিজের দেহের দিকে চেয়ে দেখি, সর্বনাশ! বসন্তে আমার সর্বাঙ্গ ছেয়ে গিয়েছে।

তারপর প্রায় দু-মাস ধরে যমে-মানুষে টানাটানি। সে ইতিহাস আর শুনে কি হবে!

নিজের গায়ের বিকট গন্ধে দম্ বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে ...তুম। স্বপ্ন দেখতুম যে, সেই তরুণী তার অঞ্চল ভরে ...ফুল এনে আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিচ্ছে!

একদিন—রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর—রোগের যন্ত্রণা ... সহ্য করতে না পেরে আমি পরণের কাপড়খানা ... কাঠে ঝুলিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করবার উদ্যোগ করছি, ঘরের মধ্যে কেউ নেই, দরজাটা খোলা রয়েছে—গলায় ফাঁস পরাচ্ছি, এমন সময় স্পষ্ট দেখলুম, সেই তরুণী ছুটে এসে আমার হাতখানা ধরে দাঁড়াল!

সে বল্লে—এ কি করছ?

রোগের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় আমি তাকে এতবার দেখেছি যে, তার এই আসাটা আমার কাছে যেন খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হলো।

আমি বল্লুম—আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না, দু-দিন বাদে তো মরেই যাব, কেন এত কষ্ট সহ্য করি!

সে বল্লে—তবে! তোমাকে যে আমার অনেক কথা বলবার আছে। আমার কথা না শুনেই মরবে?

মনে হলো—তাইত সুন্দরী, তোমার কথা না শুনে কি করে মরি?

আমি বল্লুম—কবে তুমি তোমার কথা বলবে?

সে হেসে বল্লে—তুমি সেরে ওঠো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

আত্মহত্যা করা হলো না, আবার বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগলুম।

রোগ সেরে যাবার পর প্রথমেই আমি সেই সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু দেখলুম যে, সে বাড়ী ভেঙে ট্রামের আস্তাবল বাড়ানো হচ্ছে। সেখানে কত খোঁজ করলুম, কিন্তু কেউ তার সন্ধান দিতে পারলে না। তার পর কয়েকটা বছর ধরে তার দেখা পাবার আশায় সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি···কিন্তু দেখা পাই-নি!

জীবনে তারপর অনেক সুন্দরীর অনেক কথা শুনেছি, হয়তো আরও অনেকের অনেক কথা শুনতে হবে! কিন্তু সেদিন রাতের সেই অপরিচিত সুন্দরী আমায় যে কি বলতে চেয়েছিল, সে কথা চিরকাল রহস্যের আবরণেই ঢাকা রইলো!

উপেন চুপ করতে মন্মথ বল্লে—তোমার পলাতকা সুন্দরীর উদ্দেশ্যে এক পেগ হুইস্কি খাওয়া যাক। এই বো ই, দোঠো বড়া পেগ হুইস্কি—

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

রাজপুত রাজাদের খামখেয়ালি

কাছওয়ারের রাজা সংগ্রাম সিংহ এক দিন বৈকালে পাত্র-মিত্র-সর্দ্দারগণকে লইয়া দরবারে বসিয়া আছেন, আল-বোলাতে দিব্য সুগন্ধ অম্বুরী তামাক টানিতেছেন এবং নানারূপ হাস্যরসযুক্ত গাল গল্প চলিতেছে, ইতিমধ্যে মহারাজা তামাক টানিতে টানিতে সমস্ত সর্দ্দারকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—তোমাদের মধ্যে এমন কি কেহ আছেন, যিনি আমার সহিত চারদিন সমানভাবে যুদ্ধ করিয়া নিজ বল পরীক্ষা করাইতে পারেন ?

মহারাজের সমকক্ষ হইয়া বল পরীক্ষা করানো কাহার সাধ্য ! এই দাম্ভিকতার কথা শুনিয়া সকলেই হেঁট মুখ। অনেকক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কাহারও বাঙ্-নিষ্পত্তি নাই। মহারাজ সকলেরই স্তব্ধ ভাব দেখিয়া আত্ম-দর্পে তাকিয়া ঠেস দিয়া মনে মনে হাসিতেছেন, এমন সময় নিহারিকার রাও আর সহ্য করিতে না পারিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "চারদিন কেন ? এ দাস এক মাস পর্য্যন্ত আতিথি-সংকার করিতে পারে।" তাহার এই দাম্ভিকতার কথা শুনিয়া মহারাজ কেন, পাত্রমিত্র এবং সর্দ্দারগণ সকলেই চমৎকৃত ! কিন্তু ইহার যে একটু প্রকৃষ্ট কারণ ছিল, পাঠকগণ নিহারিকার গড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

সুবিস্তৃত কাছওয়ার রাজ্যের মধ্যে নিহারিকার রাও একটি সমস্ত জায়গীরদার। তাঁহার জায়গীর নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। নিহারিকা কাছওয়ার রাজ্যের দক্ষিণাংশে চম্বল নদের তীরে অবস্থিত। চম্বল নদের ধারগুলি কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা এবং গভীর নালায় পরিপূর্ণ। তাহারই মধ্যে একটি বিস্তৃত প্রান্তর আসিয়া পড়িয়াছে। প্রান্তরটির চতুর্দ্দিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতে বেষ্টিত। তাহারই মধ্যে একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বত অন্যগুলি হইতে স্বতন্ত্রভাবে প্রান্তরের মধ্যভাগে আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ পাহাড়কে এদেশে ডোঙ্গর বলে। উক্ত ডোঙ্গরের উপর নিহারিকার রাওএর গড়। ডোঙ্গরটি প্রায় ২৫০ হাত উচ্চ। তাহারই শীর্ষ দেশে এই গড় নির্ম্মিত। গড়ে উঠিবার একটি মাত্র সংকীর্ণ পথ, তাহাতে দুইজন মাত্র লোক পাশাপাশি যাইতে পারে ; যদি অর্দ্ধপথে কতকগুলি বৃহৎ প্রস্তর ফেলিয়া রাখা হয়, অথবা দুর্গের শীর্ষদেশ হইতে সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসমূহ শত্রুর উপর বর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে আততায়ীদের অগ্রসর হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। গড়ের এক দিকে পদ দেশ ধুইয়া চম্বল নদ বহিয়া গিয়াছে, অন্য দুই দিকে ডোঙ্গরটি ধরা-পৃষ্ঠ হইতে খাড়া ভাবে উঠিয়াছে। সুতরাং দেখিলেই বেশ বুঝা যায়, যে সময়কার কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে গড়টি দখল করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। এই কারণে নিহারিকার রাও সাহেব মহারাজকে এরূপ বীরদর্পে আমন্ত্রণ করিতে সাহস পাইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেন যে নিহারিকার গড় দখল করা নিতান্ত ছেলে খেলা নয়। মহারাজ তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না।

যাহা হউক মহারাজ এই দাম্ভিক উক্তি শুনিয়া ক্ষণমাত্র স্তম্ভিত থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেশ কথা। যদি এক মাসের মধ্যে আমি গড় দখল করিতে পারি, তাহা হইলে গড় আমার হইবে নতুবা তোমার গড় তোমাকেই ফেরত দেওয়া হইবে।" রাওজী তথাস্তু বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া নিহারিকা যাত্রা করিলেন এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, —আমার নিহারিকা পৌছিবার দুই-চারি ঘণ্টা পরেই আপনি আসিতে পারেন। আমি আপনার সম্পূর্ণ অতিথি সংকার করিব ; কোন রূপ ত্রুটী হইবে না। রাজাদের খামখেয়ালি ইহাকেই বলে। একটা তুচ্ছ কথায় কি প্রলয় কাণ্ড বাধিল !

পরদিন মহারাজা নিহারিকা যাত্রা করিলেন এবং স্বীয় সৈন্যদ্বারা গড়টি ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া গড় দখল করা দূরের কথা, গড়টি ঘিরিতেই প্রায় এক মাস লাগিয়া গেল। তাহার পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রোষে ও অপমানে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গড় প্রত্যর্পণ করিবার নামটি মাত্র নাই, এখন হইতে দ্বিগুণ তেজে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আরম্ভ

দুই মাস কাটিয়া গেল, কোন মতে গড় দখল হইল না। দেখিতে দেখিতে তৃতীয় মাসও কাটিয়া গেল। …রিকার গড়ে মহারাজ দন্তস্ফুটও করিতে পারিলেন না। …দিন যাইতে লাগিল, রাও সাহেবও অমিত তেজে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনিই বা হঠাৎ বশ্যতা স্বীকার করিয়া কিরূপে তাঁহার প্রাণের সম্বল গড়টি সমর্পণ করেন? উভয় পক্ষই মানের খাতিরে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধে রত।

সেকালের এই প্রচলিত প্রথা ছিল, কোন রাজ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ হইলে সেই রাজ্যের মিত্র রাজারাও আহূত না হইলেও সাহায্যার্থে নিজ দল-বল লইয়া বন্ধুতার খাতিরে যুদ্ধে আসিয়া যোগ দিতেন। নিকটবর্ত্তী যাদবরাজ যখন এই যুদ্ধ ব্যাপার শুনিলেন ও জানিতে পারিলেন যে চারিমাস ধরিয়া কাছওয়ার রাজা যুদ্ধে প্রবৃত্ত অথচ রাওকে কোন মতেই দমন করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া স্বীয় পুত্র গোবিন্দপালকে সৈন্য-বল সমেত যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন। যাদব সৈন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে রাও সাহেব প্রমাদ গণিলেন।

যাদব রাজকুমার এরূপ অধর্ম্ম-যুদ্ধে যোগ না দিয়া রাওজীকে বশ্যতা-স্বীকারের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন; রাওজী যাদব রাজকুমারের আগমনে দমিয়া গিয়াছিলেন; এখন তৎকর্ত্তৃক সন্ধির প্রস্তাব শুনিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। কিন্তু বলিয়া পাঠাইলেন যে বশ্যতা স্বীকার করিব বটে, কিন্তু যাদব রাজকুমারকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, যেন কাছওয়ার মহারাজা তাঁহাকে কোনরূপে অপমানিত না করেন। রাজকুমার সত্যবদ্ধ হইলেন।

পরদিন রাওজী গড় ছাড়িয়া দিয়া রাজকুমারের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত। কাছওয়ার মহারাজ সংবাদ পাইবামাত্র রাজকুমারকে বলিয়া পাঠাইলেন, যেন রাওজীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট পাঠানো হয়। রাজকুমার এ প্রস্তাবে কোনমতেই সম্মত হইলেন না। উত্তর পাঠাইলেন যে রাওজী তাঁহার শিবিরে আসিয়াছেন তিনি জীবিত থাকিতে এরূপ অপমান হইতে দিবেন না; বরং কাছওয়ার রাজা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করুন, তৎপরে রাওজী যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন।

কাছওয়ার রাজা বেগতিক দেখিয়া রাওজীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন; গড় প্রত্যর্পিত হইল; মহারাজা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং রাজকুমার গোবিন্দপালের যশ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল।

শ্রীরাও ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

কাঁচা ও পাকা

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা—ষ্ট্রীটের উপর কোম্পানি-বাগানের খুব নিকটে একটি দোতলা বাড়ী। বাড়ীর সামনে রাস্তার ঠিক উপরেই নাতিপ্রশস্ত রকের এক প্রান্তে বাড়ীতে ঢুকিবার দ্বার। দ্বারের পাশে …লের গায়ে পাথর বসানো। তার উপর লেখা—শ্রীহলধর চট্টোপাধ্যায়, বি-এল, উকিল, হাইকোর্ট। দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই সেটি কর্ত্তার বৈঠকখানা। ঘরটি বিশেষ বড় নয়। …হইতে প্রবেশের যে দ্বার তারই মুখোমুখি অপর দিকে দ্বিতীয় …র এইটি দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিতে হয়। বাড়ীর বাহিরের …কে দুইটি জানালা। ঘরে ঢুকিতে ডানহাতি একটি …ক্সেট টেবিল, তার উপরের নীল বনাত স্থানে স্থানে ছিন্ন, ধূলায় ও কালিতে বিবর্ণ। টেবিলের উপর দেওয়ালের ধারে ডানদিককার কোণে একরাশ মোকদ্দমার নথিপত্র লালফিতায় বাঁধা। পিতলের একটা দোয়াত-দান মাঝখানে, বহুদিন না মাজাতে তাহাতে কলঙ্ক ধরিয়াছে। একখানা Sun Life Assurance কোম্পানির ব্লটিং-প্যাড। টেবিলের উপর বামদিকে একটা চায়ের পেয়ালা। প্রাতঃকালে তাহাতে চা খাওয়া হইয়াছিল, এখনো সরানো হয় নাই। টেবিলের বাম দিকে একখানা বেঞ্চি ও সামনে একখানা কাঠের চেয়ার। অন্দরে যাইবার দ্বারের দিকে পিঠ-ফিরানো আর একখানা চেয়ার, কর্ত্তা তাহাতে বসেন। অন্দরের দিকের দেওয়ালের গায়ে দুইটা আলমারি, তার কাঁচ-বসানো দরজা। আলমারির মধ্যে বাঁধানো আইনের কেতাব, বেশী করিয়া চোখে পড়ে Calcutta Weekly Notes ও Law Reports।

ঘরে ঢুকিয়া ডানদিকের শেষ সীমায় একখানা তক্তাপোষ, তার উপর ফরাস বিছানা। তাকিয়ার খোল ও চাদর আধময়লা। আলমারির মাথার উপর দেওয়ালের গায়ে একখানা খেলো বিলিতি শীকারের ছবি, একদল ঘোড়সওয়ার আর আশেপাশে অনেক কুকুর। উল্‌টো দিকে কর্ত্তার টেবিলের উপরকার দেওয়ালে মহিলা-প্রেসের একখানা Almanac, তাতে মাসপঞ্জী, এখনো নভেম্বর যদিচ জানুআরি মাস প্রায় শেষ হয়। তার উপর Capstan Navy Cut Cigarette-এর একখানা ছবি—বিলিতি যুবতী মেমের দেহের উপরার্দ্ধ, পরিপুষ্ট গোলাপী স্কন্ধ ও নিটোল পরিপূর্ণ স্তনযুগের মূলদেশ অনাবৃত। এই ছবির পাশে West End Watch কোংর একটি ক্লক-ঘড়ি। ছবিগুলি ও ঘড়ির উপর ধুলা প্রচুর। জানালা ও দ্বারের খিলানে ঝুল জমিয়াছে।

হলধরের স্থূল দেহ, পরিপুষ্ট ভুঁড়ি, মুখ প্রচুর দাড়ি-গোঁফ সমাচ্ছন্ন। তাঁর পরণে একখানি লালপেড়ে ধুতি, অঙ্গে গলাবন্ধ গরম কালো কোট, গলদেশ বেষ্টন করিয়া উলের কম্ফর্টার। পায়ে কালো মোজা, গোড়ালির দিকে বড় বড় ফুটা। মোজার উপর K. M. Dass-এর কালো চটিজুতা। রুক্ষ অপ্রসন্ন মুখে তিনি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের রকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

রকের উপর একটি ক্ষীণকায় শ্যামবর্ণ যুবক, বয়স অনুমান ২১-২২, কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়াইয়া বসিয়া। সামনে পরামাণিক বসিয়া চুল ছাঁটিতেছে। কর্ত্তা তাহাই দেখিতেছেন।

মাঘের মাঝামাঝি, শীত সেদিন নাই বলিলেও চলে। রবিবার বেলা ৯ টা।

কর্ত্তা। (নাপিতের উদ্দেশে)—ওহে সামনের চুলটা আরো ছোট করো। আজকাল ঐ ছোটবড় ক'রে চুল ছাঁটা দুচোখে দেখতে পারিনে! মাথায় বড় চুল থাকলেই মাথার ব্যারাম হয়! আমি তো সেইজন্যে এত চুল ছাঁটি! ব্যস্, এইবার ঠিক হয়েছে! (নাপিত ক্ষুর দিয়া জুলপি দুটো একটু উঁচু করিয়া ছাঁটিবার উদ্‌যোগ করিতেছে দেখিয়া) আরে না, না...জুলপি কামাতে হবে না। উঁচু ক'রে জুলপি কাটা আজকালকার যত বাবুদের ফ্যাশান্ হয়েছে! ও-সব বাবুগিরি কিছু নয়! ক্ষুর রাখো! (পুত্রের উদ্দেশে) যাও গোপাল আর ঠাণ্ডা লাগিয়ো না। চট ক'রে জামা গায়ে দিয়ে আমার কাছে এস। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।

গোপাল উঠিয়া ভিতর-বাড়ীতে গেল। কর্ত্তা টেবিলের দেরাজ টানিয়া দুইটা পয়সা লইয়া নাপিতকে দিলেন।

নাপিত। না বাবু না। আজকাল দিনকাল যেমন পড়েছে আমরা ঠিক করেছি চার পয়সার কমে চুল কাটবো না! আর দুটো পয়সা দিন।

কর্ত্তা। চুল কাটার জন্যে চার পয়সা? বাপের জন্মে তো কখনো শুনিনি! ক্ষেপেছ নাকি হে! যাও যাও, আর হবে না!

নাপিত। আজ্ঞে না, চার পয়সাই দিতে হবে। এই আজকাল দর। যাচাই করতে পারেন।

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে কর্ত্তা আর দুইটা পয়সা ছুঁড়িয়া দিলেন। নাপিত চলিয়া গেল। চেয়ারের উপর বসিয়া—

কর্ত্তা। ছোটলোকগুলোর আস্পর্দ্ধা আজকাল বেড়ে চলেছে! বলে, দিতে হবে! সাধে আর আমাদের দেশে মুনিঋষিরা জাতিবিভাগ ক'রে যেখানে যার জায়গা সব ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন! আজকালকার ছোকরারা জাতিবিভাগ তুলে দিতে চান! না দিয়েই এই, দিলে তো ··

গোপাল একটি লংক্লথের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া ঘরে ঢুকিল। কর্ত্তা একদৃষ্টে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কর্ত্তা। তোমার ঐ ঠাণ্ডা লাগানো অভ্যেস! একটা সাদা জামা কোন্ হিসেবে প'রে এলে? কলকেতার ছেলে-গুলোর ঐ একটা ফ্যাশান্ হয়ে উঠেছে দেখছি! শীতকালে সাদা জামা!

গোপাল। আজ্ঞে, আজ শীত কোথায়?

কর্ত্তা। নাঃ, শীত কোথায়! মাঘ মাস, বলে শীত কোথায়! শীত না হ'লে আমি এতগুলো জামা শুধুশুধু পরেছি না কি?

গোপাল নীরবে গিয়া বেঞ্চের উপর বসিল, কোনো উত্তর দিল না।

কর্ত্তা। পড়াশুনো কেমন হচ্ছে?

গোপাল। (নতমুখে)—আজ্ঞে হচ্ছে এক রকম।

কর্ত্তা। এক রকম হলে চলবে না! পাশ করা চাই। ল' পাশ করতে পারলে তবে দুপয়সা আনবার উপায় করতে পারবে।

গোপাল। আজ্ঞে, ওকালতি করবার আমার ইচ্ছে হয় না। ল' একজামিনটা আর...

কর্ত্তা। কি? ল' একজামিনটা কি? ওকালতি করবে না তো কি করবে, শুনি?

গোপাল। আজ্ঞে এম-এ টা পাশ ক'রে কলেজে প্রোফেসারির জন্যে চেষ্টা করবো ভাবছিলুম। তাহলে পড়াশুনো নিয়ে থাকতে পারবো, অবসরও আছে......

কর্তা। ইস্কুল-মাষ্টারিতে আর কত টাকা হবে! পড়াশুনো তো এতকাল করলে, এখন বেশ দু'পয়সা যাতে উপায় হয় তার চেষ্টা করতে হবে! সংসার চালাতে হবে তো!

গোপাল। আজ্ঞে বেশী পয়সা নয় নাই হ'ল। চলে গেলেই হ'ল। পড়াশুনো করতে পারলে.. ...

কর্তা। পড়াশুনো! পড়াশুনো! আরে ঐ কম্মই তো এতকাল করলে, আবার পড়াশুনো কি?

গোপাল। আজ্ঞে এতদিন যা করলুম এ ত তাড়াতাড়ি; এখন থেকে, এর পরই তো জ্ঞান সঞ্চয় করবার সময়......

কর্তা। রাখো রাখো! পড়াশুনো আর আমরা করিনি! এতটা বয়েস হ'ল আমি আর ভালো-মন্দ কিছু বুঝি না! তোমরা সব সব-জান্তা হয়ে উঠেছ! ঐ সুধাংশুটার সঙ্গে মিশে মিশে এই সব মত্ হচ্ছে! বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছোঁড়া, জাতবিচার নেই, কিছু নেই...যত সব আজগুবি মত্...বলি ওর সঙ্গে অত মাখামাখি করো না......

গোপাল। আজ্ঞে জাতবিচার তো আমরা আজকাল কেউই বড় একটা করি না...তবে ও অবশ্য খোলাখুলি সব করে...বাড়ীতেই মুসলমান বাবুর্চি রেখেছে......

কর্তা। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বলছি! মুসলমানের হাতে রাঁধা মুর্গি কি আমিই খাইনা, খুব খাই...মফস্বলে বেরুলেই খাই...তবে সমাজ ব'লে তো একটা জিনিস আছে...খাই ব'লে কি সমাজের বুকে ব'সে খেতে হবে...অমন করলে সমাজ টেঁকবে কি ক'রে!

বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে একটি ৭-৮ বৎসরের ছেলে ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। কর্তা হুঙ্কার দিলেন—নেপাল সকাল বেলায় ছুটোছুটি ক'রে খেলা! যাঃ পড়্‌গে যা! বাঁদর কোথাকার! ছেলেটি পিতার মুখের দিকে চকিতে চাহিয়া যে দ্বার দিয়া ঢুকিয়া ছিল সেই দ্বারের দিয়েই অন্দরে দৌড় দিল।

কর্তা। আজকাল ছেলেরা বাপের চেয়ে বেশী বুঝতে শিখেছে! বাপের ওপর আবার কথা! লজ্জাও করে না! সুধাংশু ছোঁড়া দেখতে শুনতে অমন সুন্দর, বুদ্ধি-সুদ্ধিও আছে মনে হয়...অথচ ঘর বাড়ী সব ছেড়ে এলেন কেন, না, মতে মিলল না! আরে! মত্ আবার কি রে! অত মত্ মত্ করতে গেলে কি সংসারে চলে! আজকাল নিজেরটি হলেই হ'ল...ওসব ইংরাজি চাল...আমাদের সংসার আদর্শ সংসার...এখানে কতখানি ত্যাগ করতে হয়...নইলে পাঁচজনে মিলেমিশে থাকবে কেমন ক'রে...

অন্দর হইতে গ্রাম্য-কণ্ঠের উচ্চধ্বনি শোনা গেল—পোড়ারমুখি! ভাতার-খাকি! বড়দের কথার ওপর কথা বলবার তুই কে লা! তোর লাজ না শরম...বাছা! বেশ এখন আমাদের জ্বালাতে এসেছ!...ঝাঁটা মেরে ত তাড়াব না।

গোপালের মুখে স্পষ্ট বিরক্তি ও লজ্জার ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে রাস্তার পানে দৃষ্টি ফিরাইল। কর্তার মুখভাবের কোনো পরিবর্তন হইল না। কথাটা তাঁর কানে গেল এমনতর কোনো আভাসও পাওয়া গেল না। তাঁর কথা চলিতে লাগিল।

...ঐ ছোকরার সব অনাসৃষ্টি! সেদিন হেদোয় morning walk করতে গিয়ে দেখি, ছোকরা জলে প'ড়ে সাঁতার দিচ্ছে। কোন্ দিন নিউমোনিয়া হ'লে বুঝতে পারবেন! ঐ সাঁতারের ক্লাব হয়ে ছেলেগুলোর মাথা খাওয়া হচ্ছে। গরমের সময় দেখ লেখাপড়া বিসর্জন দিয়ে ২-৩ ঘণ্টা জলে ঝাঁপাই জোড়া হচ্ছে। তুমি জলের দিকে কখ্-খনো যাবে না...জলে আমার বড় ভয়...ঐ জন্যে কখনো সাঁতার শিখিনি...রোজ সকালে-বিকেলে পনেরো মিনিট ক'রে হেদোর বাগানে বেড়িয়ো দিব্যি, শরীর বেশ ভালো থাকবে...সুধাংশুর মত হতে যেয়োনা, ও একটা গুণ্ডো বিশেষ ...সেবার ফুটবলের ম্যাচ দিতে গিয়ে পা ভেঙে দুমাস প'ড়ে রইলো, তবুও কি লজ্জা আছে......

রাস্তায় দাঁড়াইয়া কে ডাকিল—গোপাল! বাড়ী আছ? গোপাল—হ্যাঁ যাই বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে গেল। কর্তা ঘাড় বাঁকাইয়া জানালার মধ্য দিয়া দেখিলেন। তারপর আপন মনে বলিলেন—

বল্‌তে বল্‌তেই ছোঁড়া এসে হাজির! ছেলেটার মাথা না খেয়ে ছাড়বে না!

টেবিল হইতে Bengalee তুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে গোপাল আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া কর্ত্তা বলিলেন—আবার কি হুজুগ?

গোপাল। আজ্ঞে, আজ একটা বক্তৃতা হবে তাই···

কর্ত্তা। (বিরক্তভাবে) বক্তৃতা? কার বক্তৃতা?

গোপাল। আজ্ঞে রবিবাবুর···

কর্ত্তা। রবিবাবুর! তোমাদের ঐ এক রবিবাবু! রবিবাবুর বক্তৃতা আর মোহন বাগানের ম্যাচ্ এইতেই আজকাল ছেলেগুলোর পরকাল ঝরঝরে হচ্ছে···কথা যদি কিছু থাকে তো ঐ এক···আরে, রবিবাবুর পয়সা কত! তার বক্তৃতা দেওয়াও পোষায়—আবার ষ্টেজের ওপর ধেই-ধেই নাচাও পোষায়···

গোপাল প্রতিবাদ করিতে গিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মুখ নত করিল।

—ল' পাশ ক'রে দু' পয়সা উপায়ের চেষ্টা দ্যাখো দিকি...তা কিসের বক্তৃতা হবে?

গোপাল। সঙ্গীতের মুক্তি।

কর্ত্তা। কিসের মুক্তি?

গোপাল। আজ্ঞে, সঙ্গীতের মুক্তি।

কর্ত্তা। সে আবার কি? যত সব অনাসৃষ্টি! সঙ্গীত! সঙ্গীত দিয়ে কি পেট ভরবে? কি এক কাগজ বার হয়েছে···নীল-পত্র না...কি, এও তেমনি না...কি? তবুও গুরুদাস বাবু ছিলেন ব'লে ও-কাগজ Institute-এ ঢুকতে পায় না! শুনেছি ও-কাগজ বাপবেটায় এক সঙ্গে ব'সে পড়া যায় না, না কি! ঐ কাগজেই না কি সীতাদেবীকে গাল দেওয়া হয়েছিল! রবিবাবুর পিছনে ছুটে না বেড়িয়ে গুরুদাসবাবুর মত হতে চেষ্টা করো দেখি! অমন মাতৃভক্ত, আহা!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কর্ত্তা নীরব হইলেন, গোপালও নিরুত্তরেই রহিল। ক্ষণকাল পরে বিদ্রূপের সুরে

কর্ত্তা। তা তোমাদের ঐ সুধাংশু তো হুট ক'রে বাপের বাড়া ভাত আর অমন আরাম ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এখন বুঝচেন বোধ হয় কত ধানে কত চাল!

গোপাল (বিরক্তি দমন করিয়া) সুধাংশু মাসে ২৫০৷ ৩০০ টাকা উপায় করচে।

কর্ত্তা (অবিশ্বাসের সুরে)। বলিস কি, কোথায়? কেমন ক'রে?

অন্দর—মহলে বাসন পড়ার একটা ঝনঝন শব্দ হইল।

গোপাল। St. Xavier's College-এ ইংরেজির প্রফেসার হয়েছে, তা ছাড়া ইংরেজি খবরের কাগজে লিখেও বেশ পায়।

কর্ত্তা (উদাসীনভাবে)। অঃ, তাই না-কি। (ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া যেন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িল এমনি ভাব দেখাইয়া) হ্যাঁ, আসচে রবিবার সকালবেলা রাধামাধব বাবুরা আসবেন। আমার ইচ্ছে ছিল, সন্ধ্যা-বেলাতেই, আসেন, তবে তাঁদের কি একটা কাজ আছে সন্ধ্যায়, তাই...

অন্দরের দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল। ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে ঢুকিল ইতিপূর্ব্বে-দৃষ্ট সেই ছোট ছেলেটি। ভয়ে তার মুখ পাংশুবর্ণ।

বালক। বাবা! অ বাবা! শীগ্‌গির এস। ছোট-পিসিমার মাথা দিয়ে ভল্‌ভল্ ক'রে রক্ত পড়ছে!

কর্ত্তা। রক্ত পড়ছে? কেন?

বালক। মা থালার বাড়ি মেরেছে। শীগ্‌গির এস বাবা!

কর্ত্তা ও গোপাল তাড়াতাড়ি উঠিল।

কর্ত্তা। যাও গোপাল, চট্ ক'রে একবার দ্যাখো নীরদ ডাক্তারকে পাও যদি। জ্বালাতন! দুটো মেয়ে এক সঙ্গে হয়েছে কি অমনি কামড়াকামড়ি! সংসারে এক দণ্ড শান্তি নেই! কেবল খেওখেঙ্গি...কেবল খেও খেঙ্গি!

কর্ত্তা অন্দরের দ্বার দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গোপাল সদর দরজা দিয়া দ্রুতগতি রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুধাংশু

(গান)

"ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ করে গেছ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে সেই খবর দিল মেলে,

জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে ॥
মনে হল আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে।
মনে হল সকল দেহ
পূর্ণ হল গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত
ফুটল পূজার ফুলের মত,
জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীম দেশে ॥

স্থান কলিকাতা,—ষ্ট্রীটে উঁচু ভিতের একতলা বাড়ী। বাড়ীর চারিদিকে বারান্দা, বারান্দায় রেলিং দেওয়া। বাড়ীর চাল্ ছাদ বার্ন্ কোম্পানির লাল টালি দিয়া আচ্ছাদিত। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ী। বারান্দার উপর রেলিংয়ের ধারে ধারে টবে নানাপ্রকার season flowers ও ক্রোটনের গাছ। বারান্দার থামের মধ্যে মধ্যে সবুজ রঙের জালি টাঙানো। বারান্দা অতিক্রম করিলেই ঘরের দ্বার। দ্বার খোলা। একখানি সবুজ রঙের বনাতের পর্দ্দা দ্বারে টাঙানো। পর্দ্দার তলায় চওড়া সোনালি পাড়। ঘরের মেঝে লাল রঙের, মর্ম্মরের মত মসৃণ। ঘরে ঢুকিলেই সামনের দেওয়ালে সাদা boxwood ফ্রেমে বাঁধানো রবিবাবুর একখানি পেনসিল-স্কেচ। কবিবরের গলায় ফুলের মালা, দৃষ্টি সুদূরে। পরস্পর-সংলগ্ন হাতদুখানি কোলে পড়িয়া আছে। ছবিখানির তলায় লেখা—ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি! ঘরে ঢুকিয়াই বাঁ ও ডানদিকের দেওয়ালের ধারে দুখানি পুরু কালো চামড়ার গদিমোড়া নীচু কোচ। কোচদুখানির মাঝামাঝি মেঝের উপর একখানি ছোট তেপায়া। তার উপর সাদা ধবধবে সূচের কারুকার্য্য খচিত একখানি আচ্ছাদন। তার উপর কাশির চ্যাপ্টা কাঁসার ফুলদানি মাজাঘষা ঝকঝক করিতেছে। এক গুচ্ছ রঙবেরঙের সদ্যতোলা season flowers তার মধ্যে। কোচ দুখানির উপরে দেওয়ালের গায়ে নন্দলালের 'সতীর দেহত্যাগ' ও অবনীন্দ্রনাথের 'পদ্মপত্রে অশ্রুবিন্দু' ছবি-দুখানি টাঙানো জানলার ফিকে নীল রঙের ছিটের উপর সোনালি ফুল ও পাতার নক্সাওয়ালা half curtain। ঘরের অপর প্রান্তে জানালার ধারে একখানি ছোট লিখিবার টেবিল, পরিষ্কার নীলবনাতে ঢাকা। তার উপর একখানি ছোট ব্লটার, একটি পিতলের দোয়াতদান, দুইটি দোয়াত, একটিতে লাল ও একটিতে কালো কালি। টেবিলের উপর বাঁদিকের কোণে ছোট একটি কাঠের পালিশকরা খুবরিকাটা letter case তার মধ্যে কয়েকখানি খাম ও চিঠির কাগজ। টেবিলের ধারে একখানি গদি-আঁটা revolving chair। চেয়ারের ডানদিকে একটি revolving book case। য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-রথীদের গ্রন্থাবলী। লিখিবার টেবিলের পাশেই কালো গালার পালিশকরা তেপায়ার উপর কয়েকখানি ইংরেজি দৈনিক ও বাংলা মাসিক পত্র। টেবিলের উপর দেওয়ালের গায়ে নন্দলালের ছবি 'সতীর' উপর পুবের জানালা দিয়া একটুখানি তরুণ রোদ আসিয়া পড়িয়া সতীর মুখের মহিমা উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘরের দেওয়াল, জানালা, মেঝে, আসবাব-পত্র সমস্তই এমন পরিচ্ছন্ন, মনে হয় এইমাত্র মাজিয়া ঘষিয়া পালিশ করিয়া সাজানো হইয়াছে। কোথাও এককণা ধূলা নাই, ঘরে ঢুকিলে জগতে যে কদর্য্যতা ও মলিনতা আছে সে কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। স্নিগ্ধ সরস পরিচ্ছন্নতা মন মুগ্ধ করে।

একখানি কোচের উপর বসিয়া সুধাংশু বেহালা বাজাইয়া গান গাহিতেছে। পরণে সাদা ধবধবে ধুতি, অঙ্গে কমলালেবুর রঙের পাতলা পাঞ্জাবি। অসাধারণ সুন্দর সে। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ। তাহাকে দেখিয়া বাঙালী বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মনে হইতেছে সে মানুষ নয়, যেন গ্রীক ভাস্করের খোদিত এক অপরূপ মর্ম্মরমূর্ত্তি।

মাঘমাসের শেষ, সকাল ৭টা। রবিবার।

বেহালার সুরে সুর মিলাইয়া গান চলিতে লাগিল। বারান্দায় গোপাল আসিয়া গান শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে ক্রমে তার মুখ একটি স্নিগ্ধ আবেশে ভরিয়া উঠিল। জানালার মধ্য দিয়া সহসা তাহাকে দেখিতে পাইয়া চোখের ইসারায় সুধাংশু তাহাকে আহ্বান করিল। গোপাল ধীরে ধীরে আসিয়া সুধাংশুর সম্মুখের সোফায় বসিল। গান আরো কিছুক্ষণ চলিল, তারপর সুধাংশু গান থামাইয়া বেহালাটি পাশে রাখিল।

সুধাংশু। জিতেন!

নেপথ্য হইতে 'আজ্ঞে যাই'

তারপর গোপাল, খবর কি বলো! তোমার বাবার মত ফিরলো? না, তোমায় উকিল না ক'রে ছাড়বেন না?

গোপাল। মত আর ফেরে কৈ? তবে আমি স্থির করেছি ওদিকে যাচ্ছি না। আমি লেখাপড়া নিয়েই থাকবো। নাই বা হ'ল বেশী টাকা!

সুধাংশু। সে বইখানা পড়লে?

গোপাল। না ভাই, এখনো শেষ করতে পারিনি। জানই তো, পড়বার ঘরে বাবা যখন-তখন এসে ঢুকছেন আর হাতে আইনের কেতাব না দেখলে বকাবকি। তাই রাত্তিরে তিনি ঘুমুলে পড়তে হয়। যে-টুকু পড়েছি

চমৎকার! বিশেষত যেখানটায় ছবির সমালোচনা করচে.. ...

সাদা ধবধবে কাপড় ও হাতকাটা জামাপরা একটি প্রিয়দর্শন আঠারো উনিশ বৎসরের যুবক একখানি গালা-করা জাপানী ট্রের উপর দুধ চিনি চায়ের কেটলি বাটি ও সরঞ্জাম লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তেপায়ার উপর হইতে ফুলদানি ও আচ্ছাদনী নামাইয়া লইয়া সেখানি শুধাংশুর সোফার সামনে রাখিল, তারপর চায়ের ট্রেখানি তাহার উপর রাখিয়া প্রস্থান করিল।

সুধাংশু (চায়ের পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে)। এস হে গোপাল, একটু চা খাওয়া যাক। (গোপাল উঠিয়া সুধাংশুর সোফায় তার পাশে গিয়া বসিল) এই মরুভূমির মত দেশটাতে চা আর চুরুটই একটুখানি ওয়েশিস্, কি বল?

সুধাংশু হাসিতে লাগিল। সে হাসিতে বালকের মত সহজ ও সরল আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। চায়ের পেয়ালায় কয়েক চুমুক দিয়া উভয়ে টোষ্টে মাখন লাগাইতে লাগিল। জিতেন হাতে মসলার ডিবা ও সিগারেট কেশ লইয়া প্রবেশ করিল। ডিবা ও কেশ তেপায়ার উপর রাখিয়া সুধাংশুর মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন বলিবার উপক্রম করিল।

সুধাংশু। (ঈষৎ হাসিয়া) বুঝেছি আর বলতে হবে না। থিয়েটার দেখতে যাবি?

জিতেন। না দাদাবাবু, ঠিক থিয়েটার নয়, আজ বায়োস্কোপ দেখতে যাব।

শুধাংশু। তা যাবি। তবে আমায় উপোস করাবিনি ত রাত্তিরে!

জিতেন। আজ্ঞে না, আপনাকে খাইয়ে তবে যাব।

রুক্ষকেশ, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পরিধানে আধময়লা ধুতি, গায়ে কালো গরম কোট, তার উপর রংচটা আলোয়ান, পায়ে মোজা ও বুটজুতা এক যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে প্রবেশ করিল। গোপাল সুধাংশু ও জিতেন আগন্তুকের দিকে চোখ তুলিল।

যুবক। বেঙ্গলী আছে? আজকের বেঙ্গলী?

সুধাংশু। ব্যাপার কি মহেশ্বর বাবু? হঠাৎ বেঙ্গলীর এত খোঁজ পড়লো কেন? এই নিন। (বেঙ্গলী হাতে দিল)

মহেশ্বর (কাগজে চোখ বুলাইতে বুলাইতে)। এই যে! পেয়েছি! আশ্চর্য্য! The Talking Cow...ওঃ ঠিকই বলেছে···হবে নাই বা কেন! (নিবিষ্ট মনে কাগজ পড়িতে লাগিল)

সুধাংশুর মুখে কৌতুক-হাস্য ফুটিয়া উঠিল। জিতেন ও গোপালের মুখে বিস্ময় প্রকাশ পাইল। সকলে ক্ষণকাল নীরব। চা-খাওয়া চলিতে লাগিল। মহেশ্বর কাগজ রাখিয়া সহসা সুধাংশুর মুখের পানে চাহিল।

মহেশ্বর। আপনি হিন্দু?

সুধাংশু। হাঁ।

মহেশ্বর। ব্রাহ্ম নয়?

সুধাংশু। না, আমি হিন্দু।

মহেশ্বর। কি রকম হিন্দু?

সুধাংশু। রকম-টকম জানি না। নিজেকে হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়ে থাকি এবং বিশ্বাসও তাই।

মহেশ্বর। না না, আমি জানতে চাইছি আমাদের মত হিন্দু কি না?

সুধাংশু। কার মতন তা বলতে পারিনে। তবে আপনার প্রশ্নের যদি মর্ম্ম হয় এই—গরু তোফা উর্দ্দু ভাষায় কথা কয়েছে সে কথা বিশ্বাস করি কি না, তাহলে বলছি মাথা আমার এখনো অতটা খারাপ হয়নি।

মহেশ্বর। গরু সাক্ষাৎ ভগবতী, তা জানেন! গরুর অসাধ্য কিছু আছে!

সুধাংশু। তা তো দেখতেই পাচ্ছি!

মহেশ্বর। অলৌকিক কাণ্ডে তাহলে আপনি বিশ্বাস করেন না? তবে শুনুন—সেবার আমাদের গাঁয়ে ভয়ানক কলেরা হ'ল। কত লোক যে রোজ মরতে লাগলো তা আর কি বলবো! কলেরা যখন কিছুতেই থামেনা তখন সময় এক সন্ন্যাসী ঠাকুর এসে উপস্থিত। গাঁয়ের লোক তাঁর পা জড়িয়ে পড়লো। একটা উপায় করতেই হবে! তিনি তখন গাঁয়ের চারটি কোণে রাখলেন চারখানি সরা, তার ওপর একটু ক'রে আগুন জ্বালিয়ে মন্তর প'ড়ে দিলেন। বাস্, কলেরা-ফলেরা আর কিচ্ছু নেই!

মহেশ্বরের মুখে মৃদু হাসি ও গর্ব্বিত ভাব ফুটিয়া উঠিল। সুধাংশু ও গোপাল কিছু বলিল না। জিতেন চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া চলিয়া গেল।

মহেশ্বর। এই সেদিন আর একটা ব্যাপার শুনলুম। অদ্ভুত ব্যাপার! তা শুনলে বুঝতে পারবেন, জগতে সব-কিছু ঘটাই সম্ভব। থিওসফিক্যাল সোসাইটির নাম শুনেছেন

সেই সোসাইটির একজন সভ্য—তিনি মহাপুরুষ, দূরদর্শী ঋষি সাতহাজার বছর আগেকার কথাও তাঁর স্পষ্ট মনে আছে! ভাবুন, সে কতদিন! তার পর কত জন্ম তাঁকে ঘুরে আসতে হয়েছে! সাতহাজার বছর আগে পশ্চিমের কোনো গ্রামে একবার আগুন লাগে…জায়গার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না…তিনি তখন সদ্যোজাত শিশু…দোলনায় শুয়ে ছিলেন…এমন সময় তাঁদের বাড়ীখানাও জ্বলে উঠলো… যে ঘরে তিনি ছিলেন সেখানে কেউ ছিল না…তাঁর মা, বয়েস তাঁর ষোল সতের'র বেশী নয়, তিনি অন্য ঘরে ছিলেন… তিনি যখন এই বিপদ জানতে পারলেন, অমনি ছুটে গিয়ে সেই জ্বলন্ত ঘরের ভিতর ঢুকে ছেলেটিকে বুকে কোরে নিয়ে আগুনের মাঝ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন…ছেলেটি বাঁচল কিন্তু তার মা পুড়ে মারা গেলেন।

সুধাংশু। তারপর?

মহেশ্বর। তারপর ছেলেটি বড় হ'ল, বুড় হ'ল, মরে গেল। তারপর কত জন্ম ঘুরে ঘুরে এ জন্মে ঋষি হয়ে কলেজে গিয়ে একটি যুবককে দেখেই চিনতে পারলেন সেই সাতহাজার বছর আগে তাঁর মা ছিল! তিনি নিজে তাকে দীক্ষা দিয়েছেন!

গোপাল। আচ্ছা, ঐ যুবক যে তাঁর মা ছিল তার প্রমাণ কি?

মহেশ্বর (রাগত ভাবে)। হুঃ—প্রমাণ কি! আরে, উনি বলছেন, সেই কথাই তো প্রমাণ! আবার প্রমাণ কি! সব কিছুই প্রমাণ করা যায় না কি?

মহেশ্বর Book case হইতে টপ করিয়া একখানা বই বাহির করিয়া লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।

মহেশ্বর। এখানা কি বই?

সুধাংশু। ও একটা Play, Monna Vanna

মহেশ্বর। কই মশায় কখনো তো নাম শুনিনি! আমাদের Syllabus-এ ছিল না!

সুধাংশু। আজ্ঞে না, ও একখানা অ-পাঠ্য কেতাব।

মহেশ্বর ঘরের চারিদিকে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে চাহিতে লাগিল। একবার ঘড়ির পানে চাহিল। তারপর তাহ'লে বহুন বেলা হ'ল বলিয়া প্রস্থান করিল।

সুধাংশু (গোপালকে লক্ষ্য করিয়া)। আমাদের সঙ্গে পড়তো। বি এস্‌সি, বি-এল্। এখন আলিপুরে বেরুচ্ছে। আইনও জানে, বিজ্ঞানও জানে!

গোপাল (হাসিয়া)। তা তো দেখতেই পেলুম!

সুধাংশু। হাঁ, তোমায় একটা ভালো কথা বলা হয় নি। আমি সেদিন মেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম।

গোপাল (সবিস্ময়ে)। মেয়ে দেখতে? কার জন্যে?

সুধাংশু। নিজের জন্যে, আবার কার জন্যে।

গোপাল। না না, সত্যি বল না। ঠাট্টা করচো!

সুধাংশু। ঠাট্টা নয়, সত্যি। সেদিন এক ভদ্রলোক এসে ধ্বস্তাধ্বস্তি করলে। তিনি আমার খবর কার কাছ থেকে পেয়েছেন এবং আমার মতামত জানেন। তিনি বল্লেন, তাঁর মেয়েটি আমার ঠিক উপযুক্ত হবে, রূপে গুণে এবং বয়সে। আমার একটু কৌতূহল হ'ল, ভাবলুম দেখেই আসি। জীবনে মাঝে মাঝে হাস্য-রসও তো চাই! তারপর ভদ্রলোক যে রকম বর্ণনা দিয়েছিলেন তাতে মনে হ'ল বাংলা দেশে এমন দুর্লভ বস্তু না ভাখা নিতান্ত বেকুবির কাজ হবে। গান জানেন, বাজনা জানেন, বেথুন ইস্কুলে কিছুকাল এবং তারপর বাড়ীতে রীতিমত লেখাপড়া শিখেছেন। বয়স ষোলো। তা ছাড়া রীতিমত সেলাই বুনন ইত্যাদি জানেন।

গোপাল। তা কি রকম দেখলে?

সুধাংশু। যা ভেবেছিলুম তাই, অর্থাৎ ঠিক উল্টো।

গোপাল। মানে?

সুধাংশু। মানে আর কি? বয়স বারো। বিদ্যে মহাকালী পাঠশালায় বছর দুই। হারমোনিয়মে অনেক কষ্টে 'আমার দেশ' বাজাতে পারেন। সেলাই বা বোনা জানেন না।

গোপাল। কি করে' এত কথা জানলে?

সুধাংশু। মেয়েটি সব বল্লে। ছেলেমানুষ কি না, ডিপ্লোম্যাসি শেখেনি, সরাসরি সত্যি কথাটা ব'লে ফেল্লে। বাপ নানারকম চোখের ইসারা করতে লাগলেন, কথায় বাধা দিতে লাগলেন…মেয়েটি কিছুতেই থামলো না। বাপ-ভদ্রলোক শেষটা আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগলেন। আমি একটু হেসে চলে' এলুম। সেখানে জলগ্রহণ করি নি।

গোপাল। তাহলে তুমি মেয়ের বাপকে বড় ক্ষুণ্ণ করেছ বলো!

সুধাংশু। তার আর কি। আবার শীকার ধরার চেষ্টা হবে। মত্ বুঝে টোপ ফেলতে হবে। গোঁড়া হিন্দু ছেলে হ'লে বাপ মেয়ের পরিচয় দেবেন এইরকম—লেখাপড়া? ইস্কুল? রামচন্দ্রঃ! ও-সব নেই মশায়। হিঁদুর মেয়ে লেখাপড়া শিখে করবে কি? চাকরি করবে নাকি! ওসব খেরেষ্টানি কাজ আমি করি না। রাঁধতে বাড়তে শিখেছে, শিবপূজো করতে শিখেছে, আর বুঝেচেন কি না, ঐ একটু পড়াশুনো…রামায়ণটা যাতে পড়তে পারে, ধোপার কাপড়টা যাতে লিখতে পারে, দিনের বাজারের হিসেবটা যাতে বুঝতে পারে……ইস্কুলে পাঠালে আর রক্ষে আছে! চেয়ার হেলান দিয়ে সারাদিন বিবি সেজে নভেল পড়বে। বয়েস? দশ পেরিয়ে এগারোয় পড়েছে…তবে বুঝেচেন কি না, একটু বাড়ন্ত গড়ন।…তারপর ব্রত উপবাস করতে শিখিয়েছি… ওসব না শেখালে ওই যে খাই-খাই ভাব ও হিঁদুঘরে চলবে না…মেয়েমানুষের আবার ক্ষিদে কি!…সবায়ের খাওয়া-দাওয়া হ'লে সে তো পাত চেটে খাবে…বাপ-পিতোমো যা ব্যবস্থা ক'রে গেছেন তা তো আর ঠেলতে পারিনে…আর তাঁরা সব ছিলেন জ্ঞানী-গুণী…তাঁরা তো আর দুপাতা ইংরিজি প'ড়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শেখেন নি…

সহসা দরজা সজোরে খুলিয়া গেল। তিন ব্যক্তি ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিলেন। দেহ ঘর্ম্মসিক্ত, মুখ দারুণ বিরক্তিপূর্ণ। সুধাংশু ও গোপাল তাঁহাদের দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। গোপালের দিকে ফিরিয়া তিন জনে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

এই যে! যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক তাই!

হলধর। আচ্ছা লোক তো তুই! ভদ্রলোকরা সকাল থেকে ব'সে আছেন, নাওয়া খাওয়াই নেই। চল্ বাড়ী চল্।

গোপাল। আজ্ঞে, আমি তো বলেছিলুম…

হলধর। তুই কি বলেছিলি তাতে যায় আসে না। আমার কথা-মত চল্‌তে হবে…

গোপাল। আজ্ঞে…

শশধর! তুই তো আচ্ছা ছেলে! দাদার মুখের ওপর কথা…বাপকে গ্রাহ্যি নেই…

গোপাল। আজ্ঞে, আমি পারবো না…

হলধর। পারবে না? তোমাকে এতদিন খাওয়ালুম পরালুম, লেখাপড়া শেখালুম, পারবে না! বল্‌তে লজ্জা করে না!

শশধর। পারবে না! লেখাপড়া শিখে খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি! বাঃ! বাঃ!

হলধর। যাকগে, কথা-কাটাকাটিতে দরকার নেই, এখন চল।

গোপাল। আজ্ঞে মাপ করুন। আমি পারবো না।

হলধর (ক্রোধ-কম্পিতস্বরে)। যদি না পারিস তাহলে আমিও আর তোকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারবো না! বুঝেছিস! দেখবি তোর কি দুর্দ্দশা হয়! দেখবি তোর ক'টা বন্ধু তখন ছুটে আসে তোকে খাওয়াতে পরাতে…দেখবি তখন দেখবি…

বলিতে বলিতে হলধর এণ্ড কোম্পানির ঝড়ের মত বেগে প্রস্থান।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

"নারী-সমস্যা"

উত্তর

চৈত্রের ভারতীতে "নারী-সমস্যা" নামে একটা আলোচনায় বিলাতী কাগজ হইতে কিছু তুলিয়া "নারীর স্বাধীনতা" ও "নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য"-বাদীদের ভয় দেখানো হইয়াছে। এই ধরণেরই একটী আলোচনার উত্তর গত মাসের "ভারতী"তে দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। তবু কিছু উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল।

প্রথমতঃ লেখক যেমন বিলাতী কাগজ হইতে "নারীর স্বাধীনতা", "নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে" আতঙ্ক জন্মাইবার নজীর সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সমর্থনে ও স্বপক্ষেও বহুগুণে উৎকৃষ্ট অসংখ্য প্রবন্ধের নজীর সহজেই সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, তাঁহার নজীরটীরই আলোচনা করা যাক। তাহাতে প্রথমেই বলা হইয়াছে, "সত্যই শতকরা নব্বই জন চঞ্চল-প্রকৃতি নব্যা নারী তাহাদের সংসারের প্রতি অদৃষ্টের প্রতি সব চেয়ে বেশী তাহাদের স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে।' ইহা "সত্যই" কি না, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ করিবার কারণ থাকিতে পারে। আর যদি "সত্যই" হয় তবে ত বড়ই গুরুতর কথা। তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাদের "অদৃষ্ট, সংসার ও স্বামী"দের পরিবর্ত্তন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ "শতকরা নব্বই জন নারীর" অভাব-অভিযোগ কিছু উপেক্ষা করিবার জিনিস নয়। আর বর্ত্তমানে যদি "চঞ্চল-প্রকৃতি"রই বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাহা কি কেবল "নব্যা নারীর"ই বাড়িয়াছে? নব্যপুরুষেরা কি সকলে ধীর, স্থির, গম্ভীর হইয়াই আছেন?

"পূর্ব্বে অসংখ্য স্ত্রী স্বামীর চরিত্রহীনতায় মনঃকষ্ট পাইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে স্ত্রীই ব্যভিচারিণী হইতেছে।" ইহা কি সত্য? এই প্রবন্ধেই ত ইহার বিপরীতই প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ একটু পরেই বলা হইয়াছে, "স্ত্রী সামাজিক কর্ত্তব্য বা কোন একটা পথ বা একটা-না-একটা-কিছু লইয়া" থাকিলেই "সেই সুযোগে" "স্বামী সচ্চরিত্র" হয়। সুতরাং এখনও "অসংখ্য স্ত্রী স্বামীর চরিত্রহীনতায় মনঃকষ্ট পাইতেছে" এবং স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইতেছে না দেখা যাইতেছে। এই রকম করিয়া স্বামী আগলাইতে হইলে কেন যে "নব্যা নারী" "অদৃষ্ট," "সংসার" ও "সব-চেয়ে-বেশী স্বামীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে" তাহার কারণ পাওয়া যায়। Girl-দের "প্রলুব্ধ" করা কাজটী খুব খারাপ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা কোন্ শ্রেণীর "girl"? আর যাঁহারা "সুযোগে" "প্রলুব্ধ" হন, তাঁহারা তাহা অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর বয়স্কা বিবাহিতা কি না?—সুতরাং বিবেচনা কোন্‌পক্ষে বেশী থাকা উচিত?

"তাড়াতাড়ি বিবাহ কর, আর যখন-খুসি বিবাহ-বন্ধন ছেদন কর" ইহা কি "নব্যা নারীর পক্ষে"ই "আদর্শ নিয়ম" হইয়াছে—তাহা হইলে নব্যপুরুষেরা তাঁহাদের বিবাহ করিতেছেন কেন? যাহাদেরই বড় বড় লোকদেরও এই motto দেখা যাইতেছে না কি? তাহারাই ত সকলকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। এ সব কথা গত বারেই কিছু বলা গিয়াছে। পুরুষের পাপ রুদ্ধ না হইলে "নারীর পাপ" ও রুদ্ধ হইতে পারেনা। এতদিনেও তাহা হয় নাই।—ভাল করিয়া রাখা হইয়াছিল মাত্র। নারী এখন একদিকে আপনার সমস্ত নারীত্ব, মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করিয়া তাহার খোরাক যোগাইতে ও অপরদিকে তাহার ফলে দগ্ধ হইয়া দুইভাবে তাহার মূল্য দিতে রাজী নয়।—কেবল উভয় পক্ষে নৈতিক সাম্য ও সংযমের প্রতিষ্ঠাতেই মাত্র ইহার প্রতিকারের আশা আছে।

"বর্ত্তমানে যদি শত শত অসুখী স্বামী-স্ত্রী যাহারা বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত"ই থাকে, তাহা হইলে "দীর্ঘকাল বিবাহ-বন্ধন-ছেদন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ" কিরূপে থাকিতে পারে? তবে "বিবাহ-বন্ধনে" বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা ও "ছেদন" করিতে হইলেও তাহার আবশ্যকতা যে যথেষ্টই আছে তাহাতে অবশ্য কোন সন্দেহই নাই।

"আমি সুখ চাই, আমার স্বামীর (বা স্ত্রীর) সুখের কথা ভাবিবার দরকার নাই" এ মনোভাব অতি নিকৃষ্ট। কিন্তু "স্ত্রীর" কথাটী বন্ধনীর মধ্যে আটকা পড়িল কেন?—দুইদিকেই সমান দৃষ্টি দিতে হইবে, ইহাই "এ সবের প্রতিকার।" তবে সদ্বিষয়ে আশা, আকাঙ্ক্ষার "অধিকার" অবশ্য সকলেরই আছে।

তারপর তাঁহার কথাতেই "নারীর আত্মা" যদি "জাগিয়া" থাকে, নারী যদি "আপন গৌরবে, আপন মহিমায় ফুটিয়া" থাকে ও "জীবনের" গূঢ়-অর্থই "বুঝিতে পারিয়া" থাকে, তাহা হইলে তাহা গালি দেওয়ার যোগ্য কি? "স্বাধীনতা ত্যাগ" ও "হার মানার" কথাই বা তবে ওঠে কেন? "পুরুষের স্বাধীনতা"ও ত কেহ কাড়িয়া লইতেছে না,—"নারীর স্বাধীনতা" সে গ্রাস করিয়া না রাখে, এই ত সে কেবল চাহিতেছে মাত্র। ইহাতে "হার মানা"-মানির কি আছে?, উভয়ে মিলিয়া, মিশিয়া, মানাইয়া চলাতেই ত "এ সবের প্রতিকার।" কিন্তু পাশ্চাত্য পুরুষ সে পথে না গিয়া "হার-মানা"ইতে ও নারীর "স্বাধীনতা ত্যাগ" করাইতে চাহিতেছে বলিয়াই ত এত গোল বাধিতেছে। এবং আপনাদের কোন পাপ, অন্যায় এতটুকু সংযত না করিয়া নারীর এক একটা অধিকার দেওয়ার পরিবর্ত্তে যত রকমে সম্ভব তাহার কাছ হইতে অন্যদিকে তাহার সুদ আদায় করিতে পারে, তাহারই ফিকির দেখিতেছে মাত্র। নারীর প্রাণের দায়ে, প্রথম উৎসাহে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাতেও বেতন কম দিয়া, রূপযৌবনের দর দিয়া কি ভাবে আদায়ের চেষ্টা চলে, তাহা এক কথায় বলিবার নয়। তাহার পর ভোট দেওয়ার সময় পোষাকের প্রদর্শনী খুলিয়া সর্ব্বত্র আপনাদের লাভের জন্য তাহাতেও কি ভাবে তাহাদের ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা হয়, তাহাও বলিতে গেলে কথা ফুরাইবে না।

শেষকালে যে "নৈতিক শিথিলতার" কথা বলা হইয়াছে, তাহাই ত এ-সবের মূল কারণ। "নব্যা নারী" মাত্র নয়। তাঁহাদের সমস্ত সভ্যতা ও জাতীয় চরিত্রের মধ্যে ইহা রহিয়াছে। যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে "নারী-স্বাতন্ত্র্যের" সাধনায় আছেন তাঁহারাই বরং ইহার বিশেষ উৎকৃষ্ট ভাগ।

ইহা দেখিয়া আমাদের শিক্ষা হওয়া উচিত যে নারীর কাছে যাহা চাহিতে হইবে, আপনারাও তাহাই হইতে ও তাঁহাকে দিতে হইবে। এক-তরফা দান নারী যুগযুগান্ত ধরিয়া করিয়া আসিলেও পাপ-স্রোত এক-তিল রুদ্ধ হয় নাই এবং তাঁহাকেই সকল রকমে তাহার মূল্য দিতে হইয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তী আলোচনাটীর কথায় নারীকে সে ভাবে

"দাবিয়া রাখা" আর চলিবে না। কিন্তু পুরুষ তাঁহাকে বিশ্বাস, প্রেম, শ্রদ্ধা, সহযোগ দিলে তাঁহার নিকট হইতেও ঐগুলি পাওয়া তাঁহার পক্ষে এতটুকুও কঠিন হইবে না। "প্রতিকার" ও মীমাংসা এই পথেই,—"নান্যোঽপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

বঙ্গনারী।

প্রত্যুত্তর

"পারিবারিক নারী-সমস্যার" উত্তরের প্রত্যুত্তরে বলিতে হয়, মূল প্রবন্ধটীর মধ্যে আলোচনার যোগ্য বিষয় অল্পই আছে। উহা পাশ্চাত্য কতকগুলি মতবাদের অপরিপক্ক উদ্গীরণ মাত্র। ইহার উল্লেখ গতবারেই করা হইয়াছে। কিন্তু লেখক যে ভাবে "স্বাধীনতা"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোন স্বাধীনতা-কামীই যে সে-ভাবে ঐ শব্দটী ব্যবহার করেন না, ইহা অবশ্য তিনি জানেন। সুতরাং উহার দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কাহারও কোন অবস্থা ঘটিলে যদি তাহা তাহার ইচ্ছাকৃত, প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট ও তাহাই চিরদিন চলা উচিত বলিয়া ধরিতে হয়,—তাহা হইলে সভ্যতা-সৃষ্টিরও কোন প্রয়োজন থাকে না।—গুহাবাস ও অমাংসাশীত্বই মানুষের "প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট" বলিতে হয়। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা ত তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, কারণ ইংরাজ রাজত্ব যে একরকম আমাদের স্বেচ্ছাবৃত, তাহার প্রত্যক্ষ দলিল, দস্তাবেজ বিদ্যমান। বরং ইহাই কি সর্ব্বত্র দেখা যায় না, যে বাধ্য হইয়া সহিতে হইলে এমন দুর্দ্দশা নাই যে মানুষ না সহিত পারে। কিন্তু "বাধ্য হইয়া অধীনতা স্বীকার করিতে হইলে তাহাকে "বরণ" করা বলে না। এমন কি এক সময়ে যাহা "বরণ" ও করা যায়, তাহাও যে পরে গলার ফাঁসি হইয়া উঠিতে পারে, ইহারও অসংখ্য দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ। কিন্তু নারীর সেরূপ স্বেচ্ছা-বরণের প্রমাণও পাওয়া যায় না। পুরুষের ঈর্ষামূলক যৌন প্রবৃত্তি তাঁহাকে অধীনতাবদ্ধ করিয়াছে এবং দুর্ব্বলতর ও মাতৃত্ব-বদ্ধ নারী সেই অধীনতায় আরও দুর্ব্বল হইয়া পুরুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণরূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছেন। সভ্যতার উদয়ে এবং নরনারীর প্রকৃত সম্বন্ধ সাম্যমূলক বলিয়া ইহা কতকটা ঢাকা পড়িয়া থাকে মাত্র। আর নারীর যে গুণগুলি পুরুষের আবশ্যক, তাহাই ক্রমে তাঁহার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ও সাহিত্যে কীর্ত্তিত হইয়া আসিয়া বহুকাল হইতেই তাঁহাকে তাহাতে অভ্যস্ত ও গঠিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু তথাপি উহা যে"প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট" নয়, এ আশঙ্কা পুরুষের মনে থাকায় রাষ্ট্রসমাজের বিপুল শক্তিও তাঁহাকে "দাবিয়া রাখার" জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; এবং সভ্যতার প্রধান ফল মনশ্চর্য্যা হইতে চিরদিনই তাঁহাকে যথাসম্ভব বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সভ্যতার মধ্যে যখন সর্ব্বত্র সাম্য, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে তাহাতেই যদি নারীর অধিকার লইয়া এত যুদ্ধ করিতে হয়, যুদ্ধ ও বলপ্রাধান্যের সময় ইহা কি করিয়া সম্ভব হইত? আর সভ্যতা পুরুষের সৃষ্টি বলিয়া নারীর বিষয়টী স্বভাবতঃই তাঁহার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা কম মনোযোগ পাইয়া আসিয়াছে।

নরনারীর কর্ম্মবিভাগটী বরং মূলতঃ স্বাভাবিক। সন্তানের জন্মের জন্য যখন উভয়েই দায়ী এবং নারীকে তাহার জন্ম-পালনের ভার লইতে হয়, তখন ভরণপোষণের ভার পুরুষের গ্রহণ করা অবশ্যই সঙ্গত। সেইজন্যই নারী সন্তানজন্ম দিলেও পালন করিলে তাঁহাকে যেমন পুরুষের দাসী বলা যায় না, তাহা মাতার কর্ত্তব্য মাত্র;—পুরুষও তেমনি অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পিতার কর্ত্তব্য করেন বলিয়া তাঁহাকেও "নারীর দাস" বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার যদি সন্তানে অধিকার না থাকিত, নারীর আজ্ঞায় চলিতে এবং তাঁহারই নির্দ্দেশমতে মাত্র অর্থোপার্জ্জনও করিতে হইত, বাহির ভিন্ন "ঘরে" তিনি না আসিতে পারিতেন;—রাষ্ট্রসমাজে নারীই মানুষ ও অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইয়া কেবল তাঁহারই স্বার্থ সুবিধা অনুসারে আইন, কানুন, ধর্ম্ম, আচার, বিচার, ব্যবহারের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে তাঁহাকেও অবশ্যই "নারীর দাস" বলিতে হইত। কিন্তু নারীর যখন এ সকলগুলিই ঘটিয়াছে, তখন তাঁহার অধীনতা-স্থলে প্রশ্নচিহ্ন বা "কতক পরিমাণে নির্ভরশীলা হইয়া পড়িয়াছেন" মাত্র বলা চলে কি?

এই কর্ম্মবিভাগও কি এখন স্বাভাবিক আছে? পুরুষের কাজ যখন যুদ্ধ, শিকার হইতে হল-চালন মাত্র ছিল, তখন তাহা কেবল তাঁহারই উপযোগী ছিল সন্দেহ নাই। সে সময়ে নারীর কার্য্যক্ষেত্রও কেবল ঘর ছিল না। বাহিরেরও অনেক কাজ তাঁহাকে করিতে হইত। এমন কি কৃষি তাঁহারই আবিষ্কৃত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু সভ্যতার সহিত পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি এখন আর কেবল তাঁহার আদিম বৃত্তি লইয়া বদ্ধ নাই। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রও এখন আর কেবল "বাহির" নয়। তাহা বৈদ্যুতিক আলো-পাখা-সম্বলিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিচিত্র প্রাসাদ ইত্যাদি। সুতরাং তাহাও "ঘর"। কিন্তু নারী তাঁহার সেই আদিম কার্য্যই প্রায় সেই আদিম-যুগের ব্যবস্থামতই করিয়া আসিতেছেন। ইহাও মনে রাখা উচিত-নারী কেবল সন্তান-পালনমাত্র করেন না, আরও অনেক কাজ তাঁহার করিতে হয়। কিন্তু পুরুষ আপনাপন শক্তি, প্রকৃতিও প্রয়োজনানুসারে কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, নারীর কোন সুবিধাই নাই। তাঁহার কাজ কেবল পুরুষের অবস্থা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে মাত্র। সেইজন্য কোথাও তাহা তাঁহার শারীরিক, মানসিক শক্তি প্রভৃতির প্রতিকূল হইয়া পড়ে, কোথাও বা তিনি নিছক আলস্য ও বাজে কাজে কালক্ষেপ করেন। ইহাতে দারিদ্র্যে সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও

কোথাও পুরুষকে প্রকৃত সাহায্য করিতে পারেন না, কোথাও বা যেখানে আপনারই অর্থোপার্জ্জন করা (কারণ অনেক সময় এখনও তাঁহার তাহা প্রয়োজন হয়) আবশ্যক হয়, সেখানেও ক্ষেত্র ও শিক্ষা না পাইয়া পরের গলগ্রহ হইয়া একান্ত হীনভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন। এদিকে সম্পদে যেখানে অবসর আছে, সেখানেও ঠিক ঐ কারণেই কোন উচ্চতর কাজ নারী করিতে পারেন না। এইরূপেই আবার রাষ্ট্রসমাজে আপনার কোন হাত না রাখিতে পারিয়া আপনাদেরও দুর্দ্দশা দূর বা সদ্বিচারের কোন উপায়ই করিতে পারেন না। এই সকল কথা এখন এত বেশী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে যে "ঘর" বাহির মতবাদ (theory) দ্বারা তাহা চাপা দেওয়া চলে না। ইহাও এখন আর কাহারও জানিতে বাকি নাই যে কোন বিষয়ই কাহারও একচেটিয়া থাকা উচিত নয়, তাহাতে কার্যসৌষ্ঠবও হয় না। বিশেষতঃ নরনারীর মধ্যে সাদৃশ্য ও সমতার সহিত উভয়সম্পূর্ণকারী গুণও আছে। [illegible] পুরুষের বা নারীর দ্বারা হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। সেইজন্য ঘর ও বাহির স্বতন্ত্র বেড়া দিয়া না রাখিয়া নারীর বাহিরে আসা এবং পুরুষের "ঘরের" কাজের সাহায্য করা আবশ্যক হইয়াছে। এমন কি যে সন্তান-পালন নারীরই কাজ, তাহাতেও একা অতিরিক্ত বদ্ধ থাকিলে উহাতেও তাঁহার শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা হ্রাস পাইয়া থাকে। অন্য চিন্তা, অন্য কাজ ও বিশ্রাম দ্বারা তাহা সজীব সম্পূর্ণ করিয়া তোলার প্রয়োজন হয়। আর পুরুষও কেবল বাহিরে থাকেন না, বরং সম্ভবতঃ তিনিও ঘরেই বেশী থাকেন। এদিকে নারীরও বাহিরের আলো-বাতাস অপেক্ষা ঘরের বদ্ধ থাকাতেই স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে দেখা যায়। সুতরাং তাহাই যে তাঁহার পক্ষে বিশেষ রকম উপযোগী এ-কথাও বলা যায় না।

আর প্রকৃতপক্ষে বাহিরের—যেমন শ্রমিকের—কাজ নারী বরাবরই করিয়াও আসিতেছেন, কিন্তু ঐ সকল বাহিরের অর্থোপার্জ্জনের কাজ করিয়া আসিলেও কেবল তাঁহারই উপর সেই সময় রন্ধনাদির ভার পড়ে এবং তখন পুরুষদের তাঁহাদের কোন সাহায্য না করিয়া মদ্যপানাদিতে ঐরূপ কষ্টার্জ্জিত অর্থধ্বংস এবং নানা অবস্থায় দুষ্ট ও স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয়। নারীকে ঘরে বদ্ধ রাখা যে প্রকৃত প্রকৃষ্ট-উপায় নয় তাহাও এখন ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে একেবারে স্বামী ইত্যাদি আত্মীয়স্বজনের সাহায্য ও সাহচর্য্য লাভ ও দুর্নীতিস্রোতও বন্ধ হয়। এবং যে-ক্ষেত্রে তাহার পরে উভয়ে মিলিয়া ঘরের কাজও করিয়া থাকে, তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য এই যে নারী শারীরিক শক্তির দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও যাহা তাঁহার একান্ত অসাধ্য তাহা ব্যতীত শারীরিক পরিশ্রমের সকল কাজই প্রায় করিয়া থাকেন ; কিন্তু মানসিক মনো-বৃত্তির চর্চ্চার নামমাত্রেই বাহিরের প্রশ্ন উঠে। কিন্তু নারীর মন নামক পদার্থটাও যে একেবারেই নাই, এমনও বলা যায় না। সুতরাং দুর্ব্বলতর শারীরিক শক্তি দ্বারাও যখন তিনি শারীরিক এত কাজ করিতে পারিতেছেন, তখন মনের কাজও তাঁহার কিছু না পারিবার কারণ দেখা যায় না।

তবে অর্থোপার্জ্জন পিতারই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পুরুষ স্বভাবতঃই তাহাতে অধিকতর নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া নারীকে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইতে বঞ্চিত কিম্বা কোন এক-প্রকার নির্দ্দিষ্ট কাজে মাত্র বদ্ধ রাখা চলিতে পারে না। তাঁহাদেরও যখন শক্তি প্রকৃতি, প্রয়োজন সকলের সমান নয়,—তখন সেই অনুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লওয়ার সুযোগ থাকা আবশ্যক। এদিকে অসহায় মাতৃত্বের স্বত্বে উহাদের রাষ্ট্রসাহায্যও [illegible]। গৃহকর্ম্ম, সন্তানপালন প্রণালীরও অনেক উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইতে পারে ;—তাহা দ্বারা এ সকলও অনেক সহজ, সুশৃঙ্খল হওয়া সম্ভব।

আর পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতিতে নারীর প্রাধান্য প্রবর্ত্তিত হইলে "নব-সমস্যার" সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু "নারীর প্রাধান্য প্রবর্ত্তিত" করিতে ত কেহ চাহিতেছেন না,—সাম্যের প্রতিষ্ঠাই বর্ত্তমান আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

শেষে বলিতে হয় "বিচিত্র বেশভূষা" সবই "মোহিনী-বিদ্যার মিথ্যাচার" অবশ্য নয় ; কিন্তু নারীর অবস্থাগতিকে তাঁহার সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা এমন কি প্রয়োজনের জন্যও কেবল অন্যের খেয়াল ও ইচ্ছার উপর মাত্র নির্ভর করিতে হয় বলিয়া একান্ত অনিচ্ছার সহিতকে যে তাঁহার "ছলা-কলার আশ্রয়" লইতে হয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা হইতেই লতাবৃক্ষমূলক অপূর্ণ সম্বন্ধের সৃষ্টি। আপনার ইচ্ছামত চলিতে বা কিছু করিতে না পারিলে স্বভাবতঃই অন্যকে দিয়া তাহা করানো আবশ্যক হইয়া পড়ে। তাহাতে একদিকে জড়াইবার চেষ্টা, অন্যদিকে কাটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা চলে। দাম্পত্য সম্বন্ধ ইহাতে বড়ই ক্ষুন্ন হইয়া থাকে। উভয়েরই চলিবার পথ থাকিলে ইহা নিবারিত হইতে পারে।

বঙ্গনারী।

কাশ্মীর-চিত্র

('কলিকাতা রিভিউ'এর সৌজন্যে)
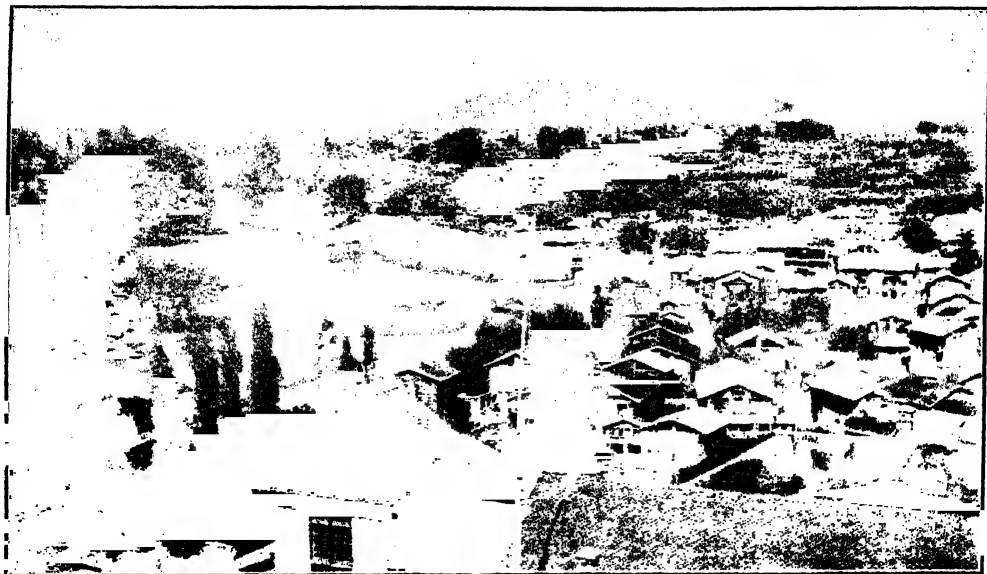
শ্রীনগর

অবন্তীপুরের মন্দির
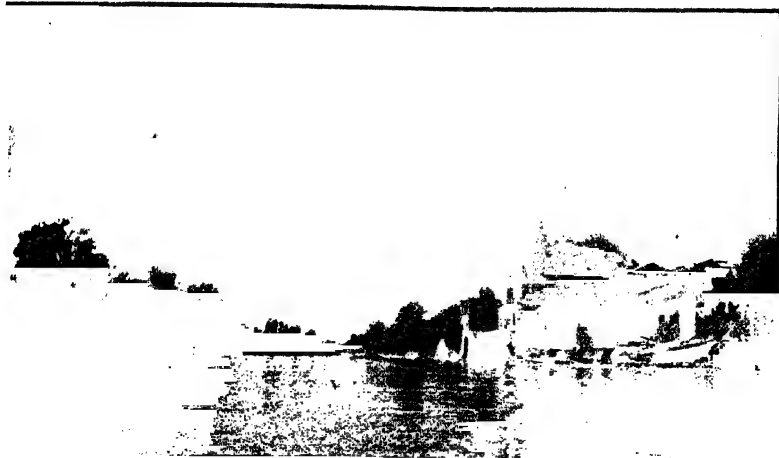
পঞ্চম সেতু—শ্রীনগর

ঝিলাম নদী

দ্বিতীয় সেতু, শ্রীনগর

টানেল, ঝিলাম ভ্যালির পথে
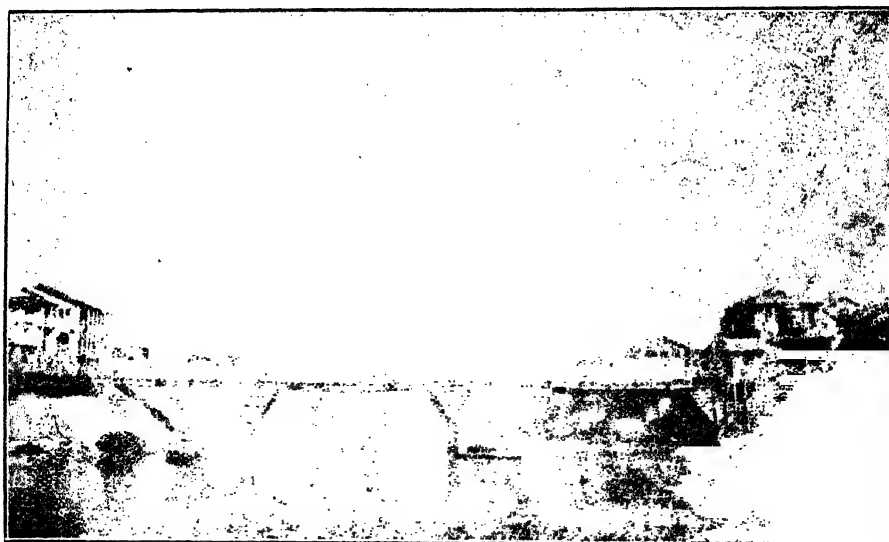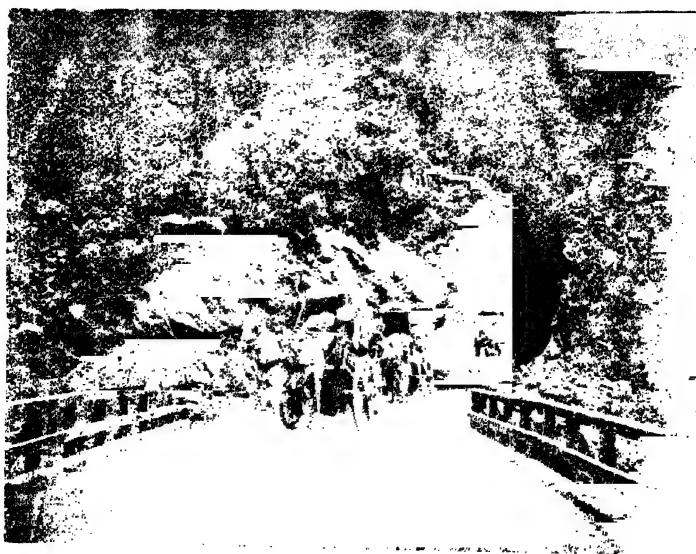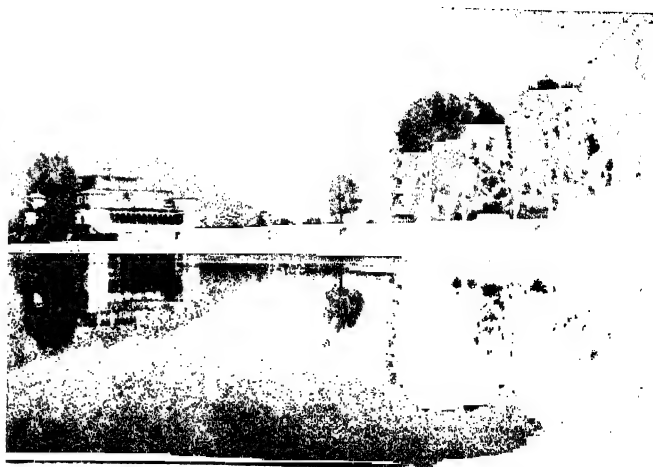
লালমণ্ডি মিউজিয়ম, শ্রীনগর

তখ্‌ত্‌-ই সুলেমান—শ্রীনগর
বহু-প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরে ঘণ্টা আছে, সে ঘণ্টা
বাজাইলে ভূত ভাগে, গ্রহ শান্তি হয়।
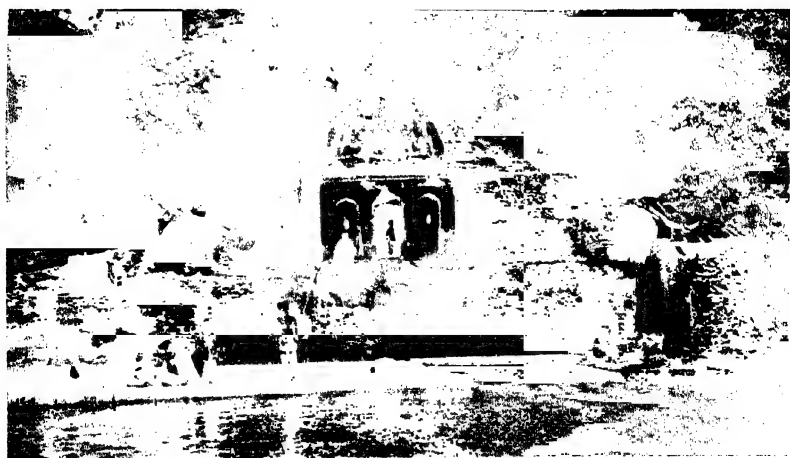
অনন্তনাগের মন্দির, কাশ্মীর

হরি-পর্ব্বত দুর্গ, শ্রীনগর

খুব মজবুত—এই দুর্গে অনেক কামান আছে। লুঠ-বাজের হাত হইতে রক্ষা করিতে এইদুর্গ যেন সশস্ত্র প্রহরীর মত উদ্যত আছে।

বীণার গান

সুর বেঁধেছি বীণায়, ওগো দখিন হাওয়ার তানে,
হাল্কা আমার গানের ভেতর কেউ পাবেনা মানে!
শিশুর হাসি, সন্ধ্যাতারা,
গোলাপ যেমন অর্থহারা,
তেম্‌নি আমার সুরের ধারা
বুকের মধ্যিখানে,—
ও মোর, দখিন হাওয়ার তানে!

•

সুর বেঁধেছি বীণায়, তাতে নেইকো নয়ন-বারি,
মন যে আমার হাসির দোসর, দুখের কি ধার ধারি?
স্রোতের মালা রঙ্গে ভাসে,
দোদুল নদীর নৃত্য-রাসে,
তেম্‌নি মাতি স্নিগ্ধ হাসে,
মন করিনা ভারি,—
বীণে নেইকো নয়ন বারি!

সুর বেঁধেছি বীণায়, তারে বাজ্‌বে আজ কানাড়া।
অচিন-প্রিয়া, আমার আছে কে আর তোমা-ছাড়া?
তারার বাঁশীর কাঁপন-তালে,
উঠ্‌বে কুহু আমের ডালে,
তেম্‌নি আমি গান শোনালে
জাগ্‌বে তোমার সাড়া,
সখি, বাজ্‌বে আজ কানাড়া!

সুর বেঁধেছি বীণায়, সুধু একলা শোনো তুমি!
সহজ কবির মানস-লোকে নেই গো মরুভূমি!
গুন্‌গুনিয়ে গায়ক অলি,
শিউরে তোলে কমল-কলি,
তেম্‌নি প্রেমে গেয়ে চলি
অধর-কুসুম চুমি,—
বধূ, একলা শোনো তুমি!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

নারীর অধিকার

[সম্প্রতি মানসী ও মর্ম্মবাণীতে শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের সহিত আমার একটু সামান্য বাগ্‌যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটী এই, "সতীত্ব" বড়, না, মনুষ্যত্ব বড়? এই কথা লইয়া দুই পক্ষে বাগ্‌বিতণ্ডা হইতেছিল; আমি মধ্যবর্ত্তী হইয়া সে সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই:—

সতীত্ব—অর্থাৎ যাহাকে আমি আসল সতীত্ব বলি—তাহা মনুষ্যত্বের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। কিন্তু মনুষ্যত্ব কেহ সর্ব্বাঙ্গীনভাবে লাভ করিতে পারে না, যেমন, একটি নারী সতীত্বে বড় হইয়া অন্যবিধ মনুষ্যত্বে হীন হীন হইতে পারে। তেমনি আর একটি নারী অন্য গুণে বরণীয়া হইয়াও সতীত্বে হীন হইতে পারে। এরূপস্থলে আমাদের দেশী শাস্ত্রমতে অসতী নারীকে সমস্ত গুণরাশি-সত্ত্বেও তাহাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী শাস্ত্রের এই বিধান আর মানিলে চলিবে না। মনুষ্যত্বের হিসবে সতীত্বের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে এই মত পরিবর্ত্তন করিবার দরকার হইয়াছে, এবং এই জন্য মনুষ্যত্বের অপরাপর বিকাশগুলি স্পষ্টভাবে নারী-সমাজের সম্মুখে ধরিবার সময় আসিয়াছে। নারীর আদর্শটা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সে আদর্শের ভিতর সতীত্বের স্থান থাকিবে কিন্তু সে স্থান অপর সকল গুণের মাথার উপর থাকিবে না। এই হিসাবে সতীত্বের আপেক্ষিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। সতীত্বের মর্য্যাদা এইরূপে ক্ষুণ্ণ করিয়াও নারীকে মনুষ্যত্বের পথে ঠেলিয়া দিতে হইবে।

আমি আরও বলিয়াছিলাম যে খাঁটি সতীত্ব মানে একটা আভ্যন্তরীণ শুচিতা, স্বামীর প্রতি প্রেমে তাহার প্রতিষ্ঠা। সুতরাং যে নারীকে "ধরিয়া বাঁধিয়া" সতী করিয়া রাখা হইয়াছে, তিনিই যে অসতী বলিয়া খ্যাতা নারীর চেয়ে কোনও গুণে শ্রেষ্ঠ, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। এই আসল সতীত্বের আদর্শের পাশে আমাদের দেশী শাস্ত্রে আর একটা মেকি সতীত্বের আদর্শ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বাহ্যিক শুচিতা এবং একান্ত স্বামীপারতন্ত্র্যই ইহার প্রধান লক্ষণ। এই সতীত্বের আদর্শ আমাদের সমাজকে পাইয়া বসিয়াছে, কিন্তু ইহা খাঁটি সতীত্বের আদর্শ নয়।

আমার প্রবন্ধের উত্তরে শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর এক প্রত্যুত্তর লিখিয়াছেন। তাহার ভিতরকার কুযুক্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া আমি মানসী ও মর্ম্মবাণীর সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সম্পাদক মহাশয় জানাইয়াছেন যে right of reply ছিল যতীন্দ্রবাবুর ; সুতরাং এ বিষয়ে তিনি আর প্রবন্ধ ছাপিতে পারেন না ! মানসী-সম্পাদক মহাশয় আইন-ব্যবসায়ী, তাঁহার কাছে right of reqly এর এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা পাইয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছি !

সে বাদানুবাদের পুনরাবৃত্তি অন্য পত্রিকায় করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু মানসী ও মর্ম্মবাণীর প্রবন্ধে রায় বাহাদুর আমাকে একটা Challenge করিয়াছেন ; সে কথাটার জবাব দেওয়া সঙ্গত।

তাঁহার বক্তব্য স্থূলতঃ এই যে হিন্দুনারী মাত্রেই বিধবা ও নিরাশ্রয় হইলে আত্মীয়-কুটুম্বের আশ্রিতা হইয়া থাকিবে, স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনের কোন চেষ্টাই করিবে না। আমি এই কথাটা ভাষান্তর করিয়া বলিয়াছিলাম যে নারী দূর-কুটুম্বের কাছে ঝাঁটা-লাথি খাইয়াও জীবকার্জ্জন করিবে, তবু স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে না,—ইহাই যতীন্দ্র বাবুর prescription. কেন না, তাহাতে যতীন্দ্র বাবুর মতে সতীত্ব-হানির সম্ভাবনা আছে সতীত্ব-হানি যে হইবেই, এমন কথা নাই, তবে সম্ভাবনা আছে। সে সম্ভাবনা যে গুপ্তা বিধবাদের বেলাতেও আছে—এবং অনেক স্থলে কুটুম্বের ঘরে বিধবা যে কার্য্যতঃ বৈধব্য বর্জ্জন করিয়া বাস করেন, এ কথা বলিয়াছিলাম।

যতীন্দ্রবাবু আমার এই কথার উত্তরে হিন্দুনারীর স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের বিরুদ্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন এবং হিন্দুনারীর যে স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের অধিকার আছে তাহা প্রমাণ করিতে আমাকে challenge করিয়াছেন।

এ বিষয়টি অতি গুরুতর এবং উপস্থিত বাদানুবাদের অনেকটা নিরপেক্ষ। কাজেই—"ভারতী"-সম্পাদকের অনুকম্পায় এ বিষয় আমি পূর্ব্বকথিত প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইতি লেখক।]

স্ত্রীলোকের স্বাধীন জীবিকার কথায় যতীন্দ্র বাবু এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে আমাদের দেশে বিধবা নারী অনেক স্থলে আত্মীয়-কুটুম্বের আশ্রয়ে ঝাঁটা লাথি খাইতে বাধ্য হন। অনেক স্থলে যে তাঁহারা সম্মানের সহিত গৃহকর্ত্রী হইয়া বাস করেন, সে কথা আমি কোথাও অস্বীকার করি নাই। কিন্তু যাহারা ঝাঁটা-লাথি খায়, তাদের কি ব্যবস্থা তিনি করিতে চান? কিছুই না। তাঁর একমাত্র জবাব এই যে "আমরা যদি আবার মানুষ হইতে পারি, তবে আবার আশ্রিত প্রতিপালন করিতে শিখিব।"

কথাটার মধ্যে কতগুলি কুযুক্তি লুকানো আছে কেবল তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিব। "আবার" কথাটায় লক্ষিত হইতেছে যে একদিন আমরা এমন ছিলাম যে কোনও গৃহেই বিধবা কুটুম্বিনীকে "ঝাঁটা লাথি" খাইতে হয় নাই। বলা বাহুল্য, ইহা নিছক কল্পনা। অন্ততঃ পাঁচ ছয় পুরুষ সম্বন্ধে আমরা সমাজের অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংবাদ রাখি, তাহাতে দেখা যায় যে আমাদের স্বর্ণ-প্রতিম অতীতেও অনেক বিধবাই কুটুম্বগৃহে লাঞ্ছিত হইয়া জীবন যাপন করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ আমরা মানুষ হইলে আশ্রিত প্রতিপালন করিব, আর না হইলে পিতামাতাকে Alms Houseএ পাঠাইব—এই কথা বলিয়া যতীন্দ্র বাবু প্রসঙ্গ চাপা দিয়াছেন। কিন্তু একটা তৃতীয় পন্থা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরা সবাই এমন 'মানুষ' না হইয়া উঠিতে পারি যে সকল বিধবাকে সম্মানের সহিত খাইতে দিব, আবার এমন অধমও না হইতে পারি যে বাপ-মাকে Alms Houseএ পাঠাইব। অর্থাৎ আমরা যদি ঠিক চিরদিনের অভিশপ্ত এই বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিতে পারি, তবে কি ব্যবস্থা হইবে?

তার পর, ধরিয়া লইলাম যে আমরা, অর্থাৎ পুরুষেরা এতদূর দেবত্ব লাভ করিলাম যে সকলেই বিধবা আশ্রিতদের সযত্নে প্রতিপালন করিব। তাহাতেই কি চরম সার্থকতা লাভ হইবে? পরের আশ্রিত হওয়ার ভিতর কি কোনও অগৌরব নাই? স্বামী স্ত্রী, মাতা পুত্র প্রভৃতি সম্পর্কের ভিতর এই আশ্রয়-সম্বন্ধে দান-গ্রহণের কথা ওঠে না, কিন্তু দূর কুটুম্বিনী বা নিঃসম্পর্কিত বিধবা আমার গৃহে আশ্রয় চাহিলে, আশ্রয়-দান আমার পক্ষে মহত্ত্বের কথা হইতে পারে, সেই বিধবার পক্ষে তাহা গৌরবের কথা হয় না। তার চেয়ে সে যদি নিজে রোজগার করিয়া খায়, তবে তার মনুষ্যত্বের গৌরব অনেক বেশী হইবে।

যতীন্দ্র বাবুর অবশিষ্ট যুক্তিও এই গোত্রের। তিনি বিপিন বাবুর উক্তি উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন, "মার্কিণীয় স্ত্রীলোকের আগে ছিল পরিবারের দাস্যতা (?) এখন হইয়াছে দোকানের বা কল-কারখানার দাস্যতা।" ইহা ইহতেই

তিনি বলিতেছেন, "আফিসের সাহেব বা দোকান বা কলকারখানার মালিকের লাথি ঝাঁটা খাওয়া অপেক্ষা নিজের দেবর ভাসুর ভাই ভাইপোর লাথি ঝাঁটা খাওয়া অনেক গুণে ভাল।"

প্রথমতঃ ইহা ঠিক নয়। লাথি ঝাঁটা যেখান হইতেই আসুক, ঘা সমানই লাগে; বরং যার কাছে স্নেহ সম্পর্কে দাবী আছে, তার লাথি ঝাঁটায় ব্যথা বেশী।

দ্বিতীয়তঃ দাস্য হইলেই লাথি ঝাঁটা খাইতে হয় না। মার্কিণে অন্ততঃ নারী কর্ম্মীদের লাথি ঝাঁটা খাইতে হয় না। আমাদের দেশে অনেক নারী স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদের লাথি ঝাঁটা খাওয়ার কথা আমার জানা নাই।

তৃতীয়তঃ আমাদের দেশে অনেক নারীকে যদি স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবার সুযোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে এখানে যে ঠিক মার্কিণ দেশের সব নকল হইবে তার কোন মানে নাই।

চতুর্থতঃ আমরা মানুষ হইলে ঘরে বসিয়া বিধবাদের লাথি ঝাঁটা খাইতে হইবে না। ইহাই যদি যতীন্দ্র বাবুর মতে চরম জবাব হয়, তবে এ কথাও ঠিক যে আমরা যদি মানুষ হই তবে আমাদের নারীরা অপমান বা লাঞ্ছনা না সহিয়াও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। যতীন্দ্র বাবুকে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিই। স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী নারীর কথা মনে হইতেই তাঁর মনে ইংরেজ বা মার্কিণ নারীর কথা মনে হয় কেন? ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথে মান্দ্রাজে ও মহারাষ্ট্রে স্বাধীন নারী আছেন, তাহা তাহার জানা নাই কি? তেমনি নারীর প্রতি সহজ শ্রদ্ধার কথায় যে তাঁহার কেবল ইংরাজী কায়দায় রুমাল কুড়াইবার কথা মনে হয়, তাও কি এই অজ্ঞতা-প্রসূত?

স্বাধীন জীবিকায় সতীত্ব-নাশের আশঙ্কার কথায় তিনি এবার বিপিন বাবুর উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। আমি সে সত্য চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছি, তাহার কোনও উত্তর দেন নাই। "চরিত্র-ভ্রষ্ট হওয়া না হওয়া নিজের উপর যেমন নির্ভর করে, তেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।" সত্য; কিন্তু স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কি খুব গুরুতর প্রভেদ হয়? গৃহের ভিতরে থাকিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা কখনও চরিত্র-হানির অনুকূল হয় না কি? ঘরে বসিয়া নারী কি পুরুষের মুখ দেখিতে পায় না? না, পুরুষ সংসর্গের অবসর পায় না? যতীন্দ্র বাবু খবর রাখেন কি যে অবরোধটাই মানুষের ভিতর কাম-প্রবৃত্তি কতটা সতেজ করিয়া দেয়? মহারাষ্ট্রে বা মান্দ্রাজে সম্ভ্রান্ত মহিলা পথে চলিয়া যান, পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করেন, তাহাতে কাহারও মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। যেখানে অবরোধ-প্রথা আছে, সেখানে এ ভাব কম দেখা যায় কেন, ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

যতীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, তিনি যে নারীকে গুপ্তা করিতে চান তাহাতে নারীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব সূচনা করে না? তিনি নারীকে রক্ষা করিতে চান নারীকে সন্দেহ করিয়া নয়, পুরুষকে সন্দেহ করিয়া। কথাটা বুঝিলাম না। নারীর সতীত্ব যদি above suspicion হয়, তবে পুরুষের উপর সন্দেহ করিয়া নারীকে ঘরে বন্ধ করিবে কেন? পুরুষের পক্ষে নারীর উপর পথে ঘাটে, আফিসে কর্ম্মশালায় বলপ্রয়োগ করা এই বিংশ শতাব্দীতে কি এতই সহজ! তা' ছাড়া নারীর স্বাধীনতা-সঙ্কোচ-বিধি আমাদের সমাজে পুরুষের উপর সন্দেহ-প্রসূত, এ কথা কি যতীন্দ্রবাবুর নিজের, না, এটা হিন্দু সমাজ বা শাস্ত্রের মত?

আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই ব্যবস্থা আছে কি? দেখিতে পাইতেছি, যতীন্দ্র বাবু কথায় কথায় মনু-সংহিতার বচন উদ্ধার করিয়াছেন। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"। মনুর এই কথা যতীন্দ্র বাবুর সমস্ত যুক্তির ভিত্তি। এ কথাটা কোথায় আছে, যতীন্দ্র বাবু দেখিয়াছেন কি? যেখানে এ কথা আছে, সেখানে ইহার হেতু দেওয়া আছে। নবম অধ্যায়ে মনু স্ত্রীপুংযোগ-ধর্ম্ম প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিয়াছেন—

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈ র্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা হ্যাত্মনো বশে ॥
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষতি স্থবিরে পুত্রাঃ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

ইহার হেতু মনু কয়েক শ্লোক পরে দিয়াছেন—

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।

সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ॥
পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তত্বান্নৈস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোঽপীহ ভর্তৃষ্বেতা বিকুর্ব্বতে ॥
এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতিনিসর্গজম্।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ পুরুষো রক্ষণং প্রতি ॥

স্ত্রীগণের অবরোধ স্ত্রীজাতির উপর অশ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; পুরুষের প্রতিসন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত,এ কথা বড় গলায় বলিবার আগে যতীন্দ্র বাবু তাঁহার একান্ত শরণ্য মনুসংহিতাখানাও একবার পড়িয়া লইলে পারিতেন। বাহুল্য-ভয়ে আমি শাস্ত্রান্তর হইতে এই প্রকারের অন্য বাক্য উদ্ধার করিয়া সময়-ক্ষেপ করিব না। শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই এ সব বাক্য জানেন।

শাস্ত্রের খবর না রাখিয়াই যতীন্দ্র বাবু অজ্ঞতার অসীম বিশ্বাসের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি—অর্থাৎ স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে। নরেশ বাবু কোন্ শাস্ত্রের বলে তাহাদিগকে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে আদেশ দেন?" বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে আমি আদেশ দিবার স্পর্দ্ধা করি নাই, সে সাহস যতীন্দ্র বাবুর দলেরই আছে। আমি কেবল আমার জ্ঞানবুদ্ধি-অনুসারে উপদেশ দিয়াছি। যতীন্দ্র বাবু আমার প্রবন্ধ পড়িয়াও কি বুঝেন নাই যে কোন্ শাস্ত্রের জোরে আমি এ উপদেশ দিয়াছি? সে শাস্ত্র সংস্কৃতে লেখা নয়, মানুষের রক্তমাংসে গাঁথা। সে শাস্ত্র মনুর শাস্ত্র নয়, তাহা মনুষ্যত্বের শাস্ত্র।

কিন্তু যদি যতীন্দ্র বাবু সংস্কৃত অক্ষরে লেখা শাস্ত্র ছাড়া কোনও শাস্ত্রই আমলে আনিতে না চান, তবে সে বিষয়েও আমি তাঁহার পরিতৃপ্তি সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি। দীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাই না; কেন না, অশাস্ত্রজ্ঞের পক্ষে এ আলোচনা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য হইবার কথা, সংক্ষেপে আমি এ কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে যাহা কিছু লিখিত হয় তাহাই বাধ্যতা-মূলক শাস্ত্র বা আইন নহে। শ্রুত্যাদিতে কতকগুলি কথা আছে যাহাকে অর্থবাদ বলে। যে সব দৃষ্টার্থক নিয়ম শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, সেগুলো শাস্ত্রে লিখিত হওয়াতেই বাধ্যতামুলক হইয়া যায় না। দৃষ্টান্ত-স্থলে যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিতে বিবাহ্যা কন্যার গুণ-বর্ণনায় "ভ্রাতৃমতীম্" কথাটার উল্লেখ বিবেচনা করা যাক। ইহার হেতু দৃষ্ট অর্থাৎ লৌকিক, অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব কিছু নয়। কন্যার ভ্রাতা না থাকিলে তাহাকে পুত্রিকা করা যাইতে পারে, সেইজন্য লোকে অভ্রাতৃকা কন্যা বিবাহ করিতে চাহে না। সেই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছে, ভ্রাতৃমতী কন্যা বিবাহ্যা। ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নহে।

নেতি-বাচক শাস্ত্রোক্তি তিন প্রকারের হইতে পারে, পর্য্যুদাস, প্রতিষেধ অথবা অর্থবাদ। যেখানে বিধি শাস্ত্র প্রাপ্ত, অর্থাৎ কোনও লৌকিক হেতু-মূলক নহে, সেখানে সেই বিধি-সম্পর্কিত বিষয়ক কোনও নিষেধ থাকিলে পর্য্যুদাস বা সেই বিধির মধ্যে exception বলিয়া ধরিতে হইবে। যেমন শ্রাদ্ধ একটা শাস্ত্র-প্রাপ্ত অনুষ্ঠান, যদি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনও দিবস বা কোনও প্রক্রিয়া-ঘটিত নিষেধ থাকে তবে তাহাকে পর্য্যুদাস বলিয়া গণন করিতে হইবে। অর্থাৎ সে নিষেধ অমান্য করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্যটাই বাতিল হইবে। সেইরূপ বিবাহ সম্বন্ধে কোনও পর্য্যুদাস অগ্রাহ্য করিলে সে বিবাহ বিবাহই হইবে না।

রাগপ্রাপ্তের নিষেধ প্রতিষেধ। খাইবার আকাঙ্ক্ষা রাগ-প্রাপ্ত অর্থাৎ স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার ফল। সুতরাং খাওয়া বিষয় যত মানা থাকুক, তাহা প্রতিষেধ বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ তাহা না মানিলে পাপ হইবে কিন্তু খাওয়াটা বাতিল হইবে না, কেন না উদর ও রসনার তৃপ্তি হইবেই।

অনুবাদ বা অর্থবাদ কাহাকে বলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এখন দেখা যাক, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য যে স্ত্রীগণের স্বাতন্ত্র্য দিতে অস্বীকার করিয়াছেন এই কথাটা কোন্ শ্রেণীতে পড়ে। বলা বাহুল্য, ইহা দৃষ্টার্থক। ইহার হেতু এই যে স্ত্রীগণের বুদ্ধি ও শিক্ষার অল্পতা-হেতু এবং (মনুর মতে) তাহাদের স্বাভাবিক পাপাকাঙ্ক্ষা-বশতঃ স্বামী প্রভৃতির তাহাদিগকে রক্ষা করা অর্থাৎ অকার্য্যকরণ হইতে রক্ষা করা উচিত। সুতরাং ইহা পর্য্যুদাস নয়, প্রতিষেধও নয়।

ইহার দ্বারা স্বামী প্রভৃতিকে স্ত্রীগণকে অকার্য্য-করণ হইতে রক্ষা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে মাত্র, বিহিত বা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কার্য্যকরণে কোনও বাধা দিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। এ বিষয়ে "সংস্কার-কৌস্তুভ" নামক প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিব। অনন্তদেব বলিল, "রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিপুত্রাদি বার্দ্ধকে অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং ন স্বাতন্ত্র্যং কচিৎ স্ত্রিয়ঃ—ইতি যাজ্ঞবল্ক্য-বচস্তব্যাখ্যানোপ-ক্রমে চ মিতাক্ষরা-কারেণোক্তং পাণি গ্রহণাৎ প্রাক্ পিতা কন্যাং'অকার্য্যাকরণাৎ' রক্ষেদিতি। এবঞ্চ নিষিদ্ধাচরণাৎ স্ত্রী নিবর্ত্ততে তত্তদবস্থায়াং তত্তদধিকার ইতি বচনস্বরসাদ্ব্যাখ্যানাচ্চ প্রতীয়তে। 'ন তু বিহিতাচরণ-প্রতিবন্ধোঽপি।' সুতরাং কথা ওঠে, নারীদিগের জীবিকা উপার্জ্জন বা পথে ঘাটে যাওয়া শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কার্য্য কি না! যদি শাস্ত্রে এ বিষয়ে কোনও বাধা না থাকে, তবে মনু বা যাজ্ঞবল্ক্যের "নস্বাতন্ত্র্যং কচিৎস্ত্রিয়ঃ" এই কথায় স্বামীদিগ তাহাদিগের নিবৃত্ত করিবার কোনও অধিকার হয় না। জীবিকার্জ্জনের জন্য অপকার্য্য করা বা পথে যাইয়া পাপাচার করা তাঁহারা নিবারণ করিতে পারেন মাত্র।

যতীন্দ্র বাবু স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন, অমুক কথা শাস্ত্রে নাই! কিন্তু আমি শাস্ত্র যত্নের সহিত পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এমন কথা কখনই বলিতে পারি না। খুব জোর করিয়া বলিতে পারে এমন পণ্ডিত আজকাল জগতে আছে কিনা জানি না! আমি কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে বহু স্মৃতি-গ্রন্থ পাঠ করিয়াও স্ত্রীজাতির জীবিকার্জ্জন বা অনবরোধের বিরুদ্ধ কোনও শ্রুতি বা স্মৃতি দেখিতে পাই নাই। যতীন্দ্র বাবু কোথাও এমন শাস্ত্র দেখাইতে পারেন কি? পক্ষান্তরে স্ত্রীধনাধিকারে গৌণ ভাবে স্ত্রীগণের জীবিকার্জ্জনের স্বীকার দেখা যায়। সুতরাং আমার যত দূর জ্ঞান তাহাতে হিন্দুনারীর পক্ষে স্বচ্ছন্দে পথে ঘাটে চলা ফেরা করা বা সদুপায়ে জীবিকা উপার্জ্জনের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

এইরূপ স্বচ্ছন্দ বিচরণের কথা মনে হইলেই দৃষ্টান্তের জন্য যতীন্দ্রবাবু মার্কিণে বা ইংলণ্ডে ছুটিয়া যান। কিন্তু মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় ও তেলেগু দেশে উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র মহিলারা স্বচ্ছন্দে পথে ঘাটে চলেন ও অপরিচিত পুরুষের সঙ্গও বাক্যালাপ করেন। বাঙ্গলা ও মার্কিণ মুলুকের মাঝামাঝি যে একটা half-way house আছে, যতীন্দ্র বাবু তাহা স্মরণ রাখিলে ভাল হয়।

যতীন্দ্র বাবু আমাকে আর একটা challenge করিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া বোধ হয় আমার উচিত। আমি এক পক্ষের মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছি, "পুরুষ নিজে পত্নীপরায়ণ হইতে চায় না, অথচ পত্নীর কাছে পরিপূর্ণ সতীত্ব আদায় করিতে চায় লাঠির জোরে।"

এ কথায় যতীন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন, "এ সকল কথা লেখক কোথায় পাইলেন জানি না...যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা দেশের ও সমাজের কোনও খবর রাখেন না।" যে কথাটায় যতীন্দ্র বাবু এতখানি অবাক হইয়াছেন, সে কথাটা তাঁহার বিরুদ্ধ দলের মত বলিয়া লিখিয়াছি, আমার মত বলিয়া নহে। আমার মতটা ইহার কিছু পরেই আছে। "এই যে 'দেশী' শাস্ত্রের পরিকল্পিত সতীত্ব, এটা যে নিতান্তই গায়ের জোরের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কথা কি বলিয়া দিতে হইবে?" এ কথাতেও কি যতীন্দ্র বাবু আশ্চর্য্য হইয়াছেন? হইয়া থাকিলে তাঁর বিস্ময়টাই একটা বিস্ময়ের জিনিষ! আমি বলিয়াছি যে আসল খাঁটি সতীত্ব যেটা মনের জিনিষ এবং যাহার আশ্রয় প্রেম তার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না, খাটে এই মেকি সতীত্ব —এই সমস্ত বিচার বুদ্ধি ন্যায়ান্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিতার এই কল্পিত আদর্শের সম্বন্ধে।

এ কথা কি যতীন্দ্র বাবু কখনও শোনেন নাই? এ কথা যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা তিনি জানেন না? মানুষের লাঠির জোরে যে নানা দেশে প্রচলিত এই মেকি আদর্শের মূল, তাহা মানবতত্ত্বের যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন।

অনেক কথাই আরও বলিবার আছে কিন্তু আর প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইব না। যতীন্দ্র বাবুর প্রত্যেক তর্কের যথেষ্ট উত্তর আমার প্রথম প্রবন্ধেই আছে, বিজ্ঞ পাঠককে সেই প্রবন্ধটি যত্ন করিয়া পড়িতে অনুরোধ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

বাঙলার প্রথম

একখানি পুরাতন ফরাসী-বাঙলা অভিধান

[ভারতীর ১৩২৯ পৌষ সংখ্যায় প্রথম বাঙলা অভিধান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। প্রথম বাঙলা অভিধান প্রসঙ্গে আমি যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে সে গ্রন্থগুলি না থাকায় আমি সে সম্বন্ধে কোন কথাই লিখিতে পারি নাই। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন উপাদান জানিতে পারিয়াছি। তাঁহাকে অভিধান বিষয়ে কিছু লিখিতে অনুরোধ করায় তিনি যাহা লিখিয়া দিয়াছেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল। শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।]

বাঙ্গলার প্রথম অভিধান বা শব্দসংগ্রহের আলোচনায়, খ্রীষ্টীয় ১৭৮০ সালের দিকে ফরাসী ওগুস্ত্যাঁ ওসাঁ (Augustin Aussant) যে ফরাসী-বাঙ্গলা অভিধান প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। ওগুস্ত্যাঁ ওসাঁ চন্দননগরে ফরাসী সরকারের নিযুক্ত দোভাষী ছিলেন; তিনি তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থে নিজেকে interprete jure des langues de l'Inde, pour les langues persanne, maure et bengale অর্থাৎ ভারতীয় ভাষার হলফ-পড়া দোভাষী, ফারসী, মুসলমানী (maure = Moorish) অর্থাৎ উর্দু ভাষার ও বাঙ্গলার দোভাষী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কোনও কারণে তিনি কলিকাতার নূতন জেলে কারারুদ্ধ হন; কি কারণে জানা নাই। জেলে অবস্থান কালে, জেলে প্রবেশের প্রথম দিন হইতে (১৭৮১ সালের ১০ই মার্চ্চ হইতে) আরম্ভ করিয়া প্রায় ছয় মাসে একখানি ফরাসী বাঙ্গলা শব্দ-কোষ প্রস্তুত করেন। ওসাঁ-র অন্য পরিচয় আমার জানা নাই।

ওসাঁ-র হাতের লেখা চারিখানি শব্দ-সংগ্রহ ও অভিধান আছে; ইহার একখানিও কখনও মুদ্রিত হয় নাই। হাতের লেখা বই কয়খানি পারিসের জাতীয় পুস্তকাগার বিব্লিওতেক্ নাসিওনালে (Bibliotheque Nationale) রক্ষিত আছে। অতএব এই পুস্তকগুলি সম্বন্ধে এদেশে তাদৃশ পরিচয় না থাকার কারণ যথেষ্ট আছে দেখা যাইতেছে। বিব্লিওতেক্ নাসিওনালের ভারতীয়, ইন্দোচীনীয় ও মালয় ভাষার পুথির সংক্ষিপ্ত তালিকায় (Catalogue sommaire des Manuscrits indiens, indo-chinois et malayo-polynesiens, par A. Cabaton, Paris, 1912) ওসাঁ-র বইগুলির পরিচয় দেওয়া আছে। বইগুলি এই: কাবাতঁ-র তালিকা হইতে তাহাদের ফরাসী ভাষায় লিখিত পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই, খালি বাঙ্গলায় সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

[১] ফরাসী, ফারসী, উর্দু ও বাঙ্গলার গোত্র-সম্পর্ক ও কুটুম্বিতা সম্বন্ধীয় শব্দাবলীর সংগ্রহ: ১৭৮২ সালে কৃত; ফারসী ও বাঙ্গলা হরফে লিখিত; ১২ পৃষ্ঠা।

[বিব্লিওতেক নাসিওনালের পুঁথীশালার সংখ্যা ১২৭, ভারতীয় পুঁথীবিভাগে ৮১]

[২] ফরাসী ও বাঙ্গলা অভিধান, প্রায় ১১,০০০ ফরাসী শব্দ ও তাহার বাঙ্গলা প্রতিশব্দ, আনুমানিক ৩০,০০০; ১৭৮৩ সালে বিলাতী কাগজে লেখা; ৩৮৪ পৃষ্ঠা, বড় বই। বাঙ্গলা শব্দগুলি রোমান হরফে লেখা।

[সংখ্যা ১২৯, ভারতীয় ৮৩]

[৩] ফরাসী ও বাঙ্গলা শব্দকোষ, প্রায় ১২৫০০ ফরাসী শব্দ ও তাহার দুগুণ বা তিন গুণ বাঙ্গলা প্রতিশব্দ। কলিকাতার নূতন জেলে ১০ই মার্চ্চ ১৭৮১ সাল জেলে প্রথম প্রবেশের দিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া, জেলেই ৩১শে আগষ্ট ১৭৮১ সালে সমাপ্ত। বাঙ্গলা কাগজে ১৭৮৩ সালে পুনর্লিখিত। ৩৬০ পৃষ্ঠা। বাঙ্গলা শব্দগুলি রোমান হরফে লেখা।

[সংখ্যা ১৩০, ভারতীয় ৮৪]

[৪] ফরাসী, ইংরেজি, ভারতে প্রচলিত পর্তুগীজ, ফারসী, উর্দু ও বাঙ্গলা শব্দসংগ্রহ; শব্দ-সংখ্যা ৩৭০০ হইতে ৩৮০০; ১৭৮২ সালে চন্দননগরে বিলাতী কাগজে রোমান অক্ষরে লেখা; ১৯৬ পৃষ্ঠা। [সংখ্যা ১৩১, ভারতীয় ৮৫]

পারিসে অবস্থান কালে বিব্লিওতেক নাসিওনালে এই শব্দকোষগুলি দেখিবার সুযোগ পাই। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মানুএল-দা-অস্‌সুম্পসাঁও লিসবনে রোমান অক্ষরে যে বাঙ্গলা পোর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ ও অভিধান ছাপান, তাহাতে বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারণ ধরিয়া, পোর্ত্তুগীজ ভাষার রীতি অনুসারে বানান করা হইয়াছে। ওর্সাঁ-ও তাঁহার সঙ্কলিত সংগ্রহে নিজ মাতৃভাষা ফরাসীর উচ্চারণ অনুসারে রোমান অক্ষরে বাঙ্গলা শব্দের বানান করিয়াছেন। এই দুই প্রকার বানান, তথা বহু বাঙ্গলা প্রতিশব্দ এখন আমাদের চোখে বিশেষ কৌতুককর লাগিবে। পাদ্রী মানুএলের বানান-রীতি লইয়া পূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৩ সাল, তৃতীয় সংখ্যা] ওর্সাঁ-র বানানের নমুনা হিসাবে তাঁহার (অভিধান উপরে উল্লিখিত ৭২৯ সংখ্যার পুস্তক) হইতে কতকগুলি শব্দ নকল করিয়া আনিয়াছি ; নিম্নে কিছু দেওয়া গেল। ওর্সাঁ, পাদ্রী মানুএলের বই ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় ; কারণ দু এক জায়গায় পাদ্রী মানুএল যে বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ওর্সাঁ-ও সেই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (যেমন 'দরিদ্র' অর্থে 'ক্ষুধার্ত্ত', খ্রীষ্টানী purgatory অর্থে 'শোধন অগ্নি,' 'বস্তু' স্থলে 'বস্ত')।

ফরাসী শব্দ	বাঙ্গলা শব্দপ্রতি
Accident	achombite (আচম্বিত), afote (আফৎ), atchaneque (অচানক)
Bon nom (অর্থ, 'সুনাম')	protichtitto (প্রতিষ্ঠিত), pitichta (পিতিষ্ঠা = প্রতিষ্ঠা), protichta (প্রতিষ্ঠা)
Boire, sucer	tchoumouq dite (চুমুক দিতে), chouchite (শুষিতে)
Bochtom, (= বষ্টম) faquir, Dervice (= দরবেশ)	Boechnob (বৈষ্ণ্যব = বৈষ্ণব)
Depence aisee	Goudzerane (গুজরান)
Dejeuner, Gouster	dzolpane corite (জলপান করিতে), adzeri qhaite (হাজেরি খাইতে)
Parente (= আত্মীয়)	coutoumbie (কুটুম্বী), gouchtie (গুষ্ঠী), pourouche (পুরুষ)
Pauvre diable, pauvre, deperi	qhidarto (খিদার্ত্ত = ক্ষুধার্ত্ত), doriddro (দরিদ্র), cangal (কাঙ্গাল)
Sans employ, service	nichtchenndy (নিশ্চিন্দি)
Trouee, cassee ch(ose)	tchira (চিরা, ছিঁড়া), bhanga bost (ভাঙ্গা বস্ত = বস্তু)
Tremblement de terre	Bhouin chal (ভুঁই চাল), bhouin commpo (ভুঁই কম্প)
Tranquille, quiet	tchoupia (চুপিয়া), chamio (শাম্য), nibbrode (নিব্‌রোদ = নির্ব্বিরোধ)
Viande de boucherie (অর্থ, 'কসাইখানার মাংস')	ocaddy (অখাদ্যি), heira (এড়া), mangcho (মাংস), gocht (গোস্ত)
Villaine, ch(ose) villaine	couroupa (কুরূপা), coutchitta bost (কুচ্ছিতা বস্ত = কুৎসিত বস্তু)

বাহুল্য-ভয়ে আর অধিক দেওয়া গেল না।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সচিত্র পুস্তক

আজকাল বাঙ্‌লা পুস্তকে ও সাময়িক পত্রে ছবির ছড়াছড়ি, বাঙ্‌লা পুস্তকে প্রথম ছবি যখন ছাপা হয়, তখন ছবি করিবার সাজ-সরঞ্জাম অদ্ভুত রকমের ছিল। কাঠের ব্লক ক্ষুদিয়া প্রথম ছবি তৈয়ারী করা হয়। Steeliographও চলিত ছিল। অন্নদামঙ্গল নামক গ্রন্থ ১৮১৬ সালে ফেরিস কোম্পানীর ছাপাখানা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ছয়খানি ছবি ছাপা হইয়াছিল।

নিম্নে গ্রন্থখানির পরিচয় পৃষ্ঠার (title-page) অনুলিপি দেওয়া হইল :—

পরিচয় পত্রের অনুলিপি।

OONOODAH MONGUL,
exhibiting
the
TALES
of
BIDDAH AND SOONDER
To which is added,
The
Memoirs
of
Rajah Prutapaditya.
Embellished
with six cuts
Caclutta
From the Press of Ferris and Co.
1816

গ্রন্থের পরিচয় পত্রের সম্মুখে একখানি অন্নপূর্ণার ছবি আছে। আসনের উপর একটি পদ্ম, পদ্মের উপরে অন্নপূর্ণা বসিয়া আছেন। তাঁহার ডান হাতে হাতা, বাম হাতে হাঁড়ি। মূর্ত্তির শিরোভূষণ মুকুট। অন্নপূর্ণা জামা ও ঘাগ্‌রা পরিয়া আছেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ।—

শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ।—

হৃদয়ন্তেঃ সদামে।—

অথ গণেশ বন্দনা।—

গণেশায় নমোনমঃ॥

বইখানি আট পেজি রয়াল কাগজে ছাপা। পৃষ্ঠা ৩১৮।

এই পুস্তকের ১৫০ পৃষ্ঠার সম্মুখে একখানি ছবি আছে। ছবির নীচে লেখা :—

Soonder সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা।

ছবির কোণে আছে—Engraved by Ram Chand Roy।

১৫২ পৃষ্ঠার সম্মুখে যে ছবি আছে, তাহার নীচে এইরূপ লেখা আছে :—

Soonder & Durroawn
সুন্দরের বর্দ্ধমান পুর প্রবেশ।
Engraved by Ram Chand Roy

১৭২ পৃষ্ঠার সম্মুখে যে ছবিখানি আছে, সেখানি কাঠে ক্ষোদাই করা। Steeliograph নয়। ছবির নীচে লেখা :—

Biddah and Soonder
বিদ্যাসুন্দরের দর্শন।

সুন্দরের পার্শ্বে একখানি জগন্নাথের রথের মত রথ।

১৫৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে কাঠে ক্ষোদাই করা ছবি। ছবির নীচে এইরূপ লেখা :—

Soonder সুন্দরের বকুলতলায় বৈশন।

সুন্দর হাতে ফুল লইয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন।

এই বইয়ের ষষ্ঠ ছবি ২০৬ পৃষ্ঠার সম্মুখে। এখানি কাঠে ক্ষোদাই করা।

Soonder and Cotaul
সুন্দর চোর ধরা

গ্রন্থখানি কাহার রচিত, গ্রন্থ হইতে ঠিক করিবার কোন উপায় নাই। তবে সমসাময়িক লেখকগণের বিবৃতি হইতে জানিতে পারা যায় যে, এখানি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে মুদ্রিত। পাদ্‌রি লঙ্‌ সাহেবের তালিকায় ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতির চিত্রযুক্ত পুস্তক বিক্রয় করিয়া বেশ দুপয়সা করিয়াছিলেন। গঙ্গাধরের সচিত্র সংস্করণের কথা

আরও দু'এক জায়গায় আছে। এ সময় আর কেহ যে সচিত্র সংস্করণ বাহির করে নাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের মনে হয়, লঙ্ সাহেব ভ্রমক্রমে গঙ্গাকিশোরের নাম গঙ্গাধর* লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

* Gangadhar Bhattacharjea who had gained much money by popular editions of the Vidya Sundar, Betal and other works illustrated with wood cuts, the paper was short lived.

এই অন্নদামঙ্গল গ্রন্থখানি স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের বাণী-ভাণ্ডার (Library) ব্যতীত অন্য কোথাও পাই নাই। বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারিগণ পুস্তকখানি বাহিরে লইয়া যাইতে আদেশ না দেওয়ায় ইচ্ছা সত্ত্বেও পুস্তকের অদ্ভুত চিত্রগুলির প্রতিলিপি দিতে পারিলাম না।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

মমতার দান

হৃদি-পদ্মপাতে মম গলিত মুকুতাসম হেরি কি ও করে টলমল?
অমৃতসাগর মথি কে পাঠাল মহানিধি কোঁটা দুই ঐ আঁখিজল!
কোন্ সে করুণাময়ী অমরার কোন্ পুরে কোন্ খানে করে সেবা?
হৃদি কি গঠিত তার চন্দনের সুরভিতে কণ্ঠে তার সদা মধুভাষ?
সে কি ছিল শুকতারা উষা হয়ে ছিনু যবে কত শত লক্ষ যুগ আগে?
ছিনু যবে একদিন সরসী-সলিল হয়ে ফুটে ছিল সে কি রক্তরাগে—
শত দিকে দল তার করিয়া বিস্তার করেছিল হৃদি মোর আলো
শতদলরূপে সে কি ছিল বুক জুড়ে মনে তাহা পড়েনাক ভালো!
স্মরণ-অতীত কালে ছিনু যবে কোনকালে বারিধর শ্যাম মেঘরাশি
অমল-কমল-বিভা সে কি ছিল ক্ষণপ্রভা বুকে মোর চমকিত আসি?
বেণুরূপে ছিনু যবে সমীরণ হয়ে সে কি বাজাইত মোরে নিশিদিন
রন্ধ্রে মোর প্রবেশিয়া রভসে ভরিয়া হিয়া শ্রান্তিহীন বিরামবিহীন?
বিহঙ্গ আছিনু যবে কণ্ঠে মোর গান হয়ে করিত কি মুগ্ধ বিশ্বজন—
ভ্রমিতাম বনে বনে কুরঙ্গ হইয়া যবে ছিল সে কি আমার নয়ন?
প্রখর বৈশাখছায়ে দারুণ তৃষার ঘায়ে বিশ্ব যবে হইল বিকল
অন্তর গুমরি মরে এক কোঁটা স্নেহতরে কে পাঠাল নয়নের জল!
কে বলিবে সে কল্যাণী নহেক কৌস্তুভ-মণি মহানীল অতলেতে বাস
অভাগা কবির তরে চোখে যার জল ঝরে মুখে যার সদা মধুভাষ!
এ পৃথিবী অকরুণ তৃষা হেথা নিদারুণ বৈশাখের দাহ চিরদিন—
মমতার আঁখিবারি স্বরগ-সুধার ঝারি যুগে যুগে রবে অমলিন!

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪

যখন কোন বালক বা যুবকের মুখে এই কথা শুনিতে পাও :—

— "আমি এটা কিংবা ওটা শিখিতে পারি না !"

অথবা :—

"আমি কিছুই শিখিতে পারি না !"

তখন নিশ্চিত জানিবে যে ঐ শিক্ষানবীশ, যুবক হোক বা পরিণত বয়স্কই হোক, তাহার শিক্ষানবীশি অবস্থায়, হয় ইচ্ছার নিয়ম লঙ্ঘন করে, নয়-শৃঙ্খলার নিয়ম লঙ্ঘন করে, নয় সময়ের নিয়ম লঙ্ঘন করে।

শিখিতে ইচ্ছার অভাব, এই গুরুতর দোষটা যে একটা বিশেষ-আকারে দেখা দিয়া থাকে—তাহার নাম আলস্য। কতকগুলি অলস ব্যক্তি আছে যাহারা অজ্ঞান অলস; অর্থাৎ তাহারা জানে যে তাহারা অলস। আমি কবুল করিতেছি, এই জাতীয় অলসের প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই। আমার পঠদ্দশায়, আমার সহপাঠীদের মধ্যে দেখিতাম, এই ধরণের কতকগুলি অলস ছাত্র বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে। তাহাদের কিছু-না-করিবার প্রবৃত্তিটা তাহারা অস্বীকার করিত না, ঢাকিতেও চেষ্টা করিত না। সঙ্গীর হিসাবে তাহাদের বেশ ভদ্র ব্যবহার ছিল; সকলেই তাহাদিগকে ভাল বাসিত।

আলস্যের জন্য তাহারা পুনঃপুনঃ দণ্ড ভোগ করিত; কিন্তু এই দণ্ড উহাদের শ্রেণী প্রতিযোগীদের নিকটেও অন্যায় বলিয়া মনে হইত। আসলে ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তাহারা স্বভাবতই হীন, কোন বিষয়ে মন দেওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। ইহারা কৃপা পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্যের স্বভাবতই এতটা ইচ্ছাশক্তি আছে যে ইচ্ছা করিলেই তাহারা শিখিতে পারে। কেবল তাহারা প্রারম্ভিক চেষ্টাটা করিয়া দেখে নাই। তাহারা মনে করে তাহারা অধ্যয়নে বেশ মনোনিবেশ করিতেছে, কিন্তু আসলে করে নাই। এই জাতীয় অনেক অজ্ঞান-অলসও আছে, ছদ্ম-অলসও আছে।

ছদ্ম-অলসেরা ঘৃণার পাত্র; অলীক-পণ্ডিতের মত আমি উহাদিগকে ঘৃণা করি, উহারা দেখায় যেন কত শ্রমস্বীকার করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে, অধ্যয়নে উহাদের কতই রুচি আছে। পক্ষান্তরে অজ্ঞান-অলসেরা মমতার যোগ্য :— উহারা মনে করে খুব চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আসলে খুব চেষ্টা করিতেছে না, কিংবা কু-প্রণালীক্রমে চেষ্টা করিতেছে। তাই, উহারা ইচ্ছাশক্তির হীনতার দোষটা স্বীয় বুদ্ধিশক্তির উপর আরোপ করে।

যাহারা জানে কি-করিয়া ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিতে হয়, হায়! তাহাদের সংখ্যা কত কম!

প্রকৃতি দেবী আমাদিগকে যে সকল ভৌতিক ও মানসিক সম্ভাব্যতার অধিকারী করিয়াছেন, যথা-পরিমাণ প্রযত্ন সহকারে সেই সব সম্ভাব্যতা অর্থাৎ গূঢ় শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োগ করিতে কত অল্প লোকই জানে। এই সত্যটি প্রধানতঃ ভৌতিক সম্ভাব্যতা-শ্রেণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

যখনই কোন ব্যক্তি তাহার কোন অঙ্গকে অতিরিক্ত রকম কাজে খাটাইতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে শীঘ্রই তাহার সফলতা দেখিয়া বিস্মিত হয়। সে তখন মনে মনে বেশ অনুভব করে যে, সে আপনাকে আপনি অতিক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ আপনার শক্তিকে সে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। একজন দ্বিচক্র-রথী পারী হইতে বর্দো পর্য্যন্ত পথ ১৫ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়াছিল—ইহার পূর্ব্বে আমরা কখন কি মনে করিতে পারিতাম কোন মনুষ্য এতটা শ্রমকষ্ট সহনে সমর্থ? মানসিক ব্যাপার সম্বন্ধেও এইরূপ। ছাত্রদিগের মধ্যে যে খুব স্থূলবুদ্ধি ও বোকা সে যদি ভিন্ন ভাষাভাষা কোন দেশে গিয়া বাস করে, সেও কয়েক মাসের মধ্যেই সে দেশের কথা বুঝিতে পারে, আপনার কথাও সে-দেশবাসীকে বুঝাইতে পারে। আসলে তাহার স্বাভাবিক ভাষা শক্তিতে যে কোন তারতম্য উপস্থিত হয় তাহা নহে; কেবল, তাহার সুপ্ত ইচ্ছাশক্তিকে চেতাইয়া তুলিবার প্রয়োজন হওয়ায়, লোকের কথা কান দিয়া শুনিতে, সেই সব কথা মনে রাখিতে, তদনু

কতকগুলা কথা "কপ্‌চাইতে" সে বাধ্য হয়...ইচ্ছাশক্তি ব্যতীত শিক্ষানবীসির কোন মূল্য নাই; প্রথমে এই কথাটিতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে তাহার পর শিক্ষা আরম্ভ হয়।

যদি শৈশবাবধি আমরা এই ইচ্ছাপ্রয়োগ করিবার শিক্ষা পাইতাম (প্রথমেই এই শিক্ষা গুরুমহাশয়দিগের দেওয়া উচিত) তাহলে আর কোন ভাবনা থাকিত না, শিখিবার যে প্রধান "হাতিয়ার" তাহা প্রথম হইতেই বাগাইয়া ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারিতাম। যদি ঘুমন্ত ইচ্ছাকে চেতাইয়া তুলিতে হয়—শিক্ষাই তার প্রধান সাধন। ইচ্ছাকে খাড়া করিয়া তোলা, ইচ্ছাকে কাজে খাটানো, ইচ্ছাকে দৃঢ় করা, ইচ্ছাকে সংযত করা—এই মন্ত্রটীর ভিতর সমস্ত ভাবী সফলতা নিহিত রহিয়াছে। ইহা কতটা বড় রকমের কথা তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। আলস্যকে জয় করিবার জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রযত্ন আবশ্যক; বলা বাহুল্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগেই এই আলস্য-রোগের প্রতিকার হইয়া থাকে, পরিশেষে ইহারই যোগে চিত্তে একটা সর্ব্বসামঞ্জস্যের আবির্ভাব হয়। এইরূপ সাধকই পরে জার্ম্মান কবি গয়টের ন্যায় উচ্চতর সুখের নিকটবর্ত্তী হয়—পূর্ব্ব কথিত কুষ্ঠ রোগীর নিম্নতর সুখের অবস্থা হইতে বহুদূরে চলিয়া যায়...

এই স্বেচ্ছাকৃত নূতন যাত্রাটা একবার সুরু হইয়া গেলে, তখন খুব দ্রুত চলার আর দরকার হইবে না। আজকাল যে সকল ব্যায়াম ক্রীড়া খুব আশ্চর্য্য রকম শেখান হইয়া থাকে, সেই সব ব্যায়ামক্রীড়া এই বিষয়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত! এই সকল কসরতের অভ্যাস ও শিক্ষা কখনও দমকাভাবে হয় না। সিদ্ধিলাভের জন্য আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়া একান্ত আবশ্যক ও অপরিহার্য্য। ইচ্ছা-সাধনার নবব্রতী! তোমরা এই ইচ্ছাশক্তির নিকট প্রথম দিনে বেশী কিছু প্রার্থনা করিও না। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই (শুধু ছাত্রদের কথা বলিতেছি না) এমন-কি সওয়া ঘণ্টা কালও কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক লাগিয়া থাকিতে পারে না। যেদিন তুমি এই সওয়া ঘণ্টাকাল সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিতে পারিবে, সেই দিন জানিবে "কেল্লা ফতে" হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। অভ্যাসটা যদি পদ্ধতিপূর্ব্বক বরাবর চালাইতে পার, তাহা হইলে কালের সাহায্যে কাল-ক্রমে তুমি তোমার সম্ভাব্যতার সীমায় আসিয়া পৌছিবে! আমি তোমাদিগকে আবার বলিতেছি—

তোমরা যতটা আশা করিতেছ তাহা অপেক্ষাও বেশী পরিমাণে তোমাদের সম্ভাব্যতার ক্ষেত্র তোমাদের সম্মুখে প্রসারিত হইবে।

কোন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি,—যে স্বীয় আয়ত্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পরিমাণ করিতে অনভ্যস্ত, কোন বিষয়ে বল পূর্ব্বক মনঃ-সংযোগ করিতে অনভ্যস্ত, তাহাকে একটা সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি, তাহা এই!—

কতকগুলি ভাল ভাল কবিতা, তাহার পর কতকগুলি প্রখ্যাত গদ্য-লেখকদিগের সুন্দর সুন্দর বাক্য কণ্ঠস্থ করিবে।

ইহাতে কিছুই সময় নষ্ট হইবে না; শীঘ্রই জানিতে পারা যাইবে (স্মৃতিশক্তির ন্যূনাধিক্যের কথা ছাড়িয়া দাও) অভ্যাসের দ্বারা মনঃসংযোগ কতটা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। তখন শীঘ্রই ইচ্ছাশক্তি বিপুলতালাভ করিবে, সহজ হইয়া উঠিবে।

কিন্তু আমার পাঠক যে ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন শুনিতেছি।

তিনি বলেন,—ইচ্ছাশক্তির বিন্দুমাত্র প্রয়োগ না করিয়াও ত আমরা অনেক জিনিস শিখিয়া থাকি। আর আমার মনে হয়,—আমরা ঠিক সেই সব জিনিসই শিখি যাহা আমাদের জানা আছে। যেমন মনে কর—শৈশবে আমরা যাহা শিক্ষা করিয়াছি:—চলা,বলা ইত্যাদি...অথবা যে সকল খেলায় আমরা আমোদ পাই অথচ যে সকল খেলা এক এক সময় কঠিন বলিয়া মনে হয়; দেখনা কেন,রাস্তায় ছোঁড়াগুলো অর্দ্ধ-বিনষ্ট পা-গাড়ার উপর কত রকম আশ্চর্য্য কসরৎ দেখায়। তাছাড়া, যে সকল কলা বিদ্যায় আমাদের ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা থাকে,—যথা চিত্রকলা বিশেষতঃ সঙ্গীত কলা...আপনার মতবাদের ঠিক একটা উল্টো মতবাদ কি প্রতিপাদন করা যায় না? শিক্ষানবীসী যতটা অজ্ঞানকৃত হয়, ততটাই কি কার্য্যপটুতা লাভ করে না?—ততটাই কি উহা পদার্থবিশেষের পূর্ণজ্ঞানে পর্য্যবসিত হয় না?

না প্রিয় পাঠক, তা নয়।

ও-সমস্ত হেত্বাভাস—কুতর্ক। ও সমস্ত অসম্যক্-দর্শনের কথা, সরাসরি বিচারের কথা।

৭ বৎসর বয়স্ক সঙ্গীত কলাবিৎ Mozart কিংবা ১২ বৎসর বয়স্ক জ্যামিতিবেত্তা Pascalএর ন্যায় আমাদেরও ত প্রতিভা থাকিতে পারে;—হয়তো থাকিতে পারে, আমি তার প্রতিবাদ করিতেছি না। সঙ্গীতবেত্তা মোজার কিংবা জ্যামিতিবেত্তা পাস্‌কাল—ইঁহারা এক-একজন দিগ্‌গজ ব্যক্তি। ইঁহাদের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক লেখা হয় নাই। ধীশক্তি সম্পন্ন মানবমণ্ডলীর যে সব মাঝামাঝি নমুনা—তাহাদেরই জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। আমার কথা বিশ্বাস কর;—এই সব লোকের সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে, তাহারা যাহা কিছু শিখিয়াছে তাহারই অনুরূপ তাহাদের ইচ্ছাশক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছে।

যে শিশু চলিতে শিখিয়াছে ও কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার পক্ষেও এই কথা খাটে। ঐ শিশুর বয়স যখন তোমার ছিল, তোমার ইচ্ছাশক্তিতে কতটা টান পড়িয়াছিল তাহা তোমার এখন স্মরণ নাই! যখন কোন শিশু চলিতে ও কথা কহিতে আরম্ভ করে, তখন লক্ষ্য করিয়া একবার দেখিও:—তাহার চেষ্টা পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইতেছে—মাঝে মাঝে থামিতেছে, গোলমাল বাধিয়া যাইতেছে; কিন্তু তবু থাকিয়া থাকিয়া সে প্রবল চেষ্টা করিতেছে, চেষ্টা করিতে বিরত হইতেছে না! তা ছাড়া এই শিশুর হিতের জন্য আবার অন্য লোকেরও ইচ্ছাশক্তি ব্যয় হইয়া থাকে!—মা, দাই, সমস্ত বাড়ীর লোকের; আরো কিছু পরে আমরা দেখিতে পাইব, শিক্ষানবীশের ইচ্ছাশক্তির সহিত অন্যের ইচ্ছাশক্তি যুক্ত হইলে, তাহার ইচ্ছার বল কতটা বৃদ্ধি পায়...না,খোকার শিক্ষানবীসী ইচ্ছা নিরপেক্ষ আদৌ নহে! ব্যায়াম ক্রীড়াদির শিক্ষানবিসী, কলা-বিদ্যাদির শিক্ষানবিশীও তথৈবচ। কলানুশীলনে,—বাসনার আবেগ বশে, অজস্র ইচ্ছাশক্তি ব্যয় হইয় থাকে। এই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিতে সব সময় কি কষ্ট হয়? না, তা হয় না। যে সকল খেলা ও যে সকল কলার অনুশীলনে আমরা আমোদ পাই, তাহার অনুশীলনজনিত কষ্ট আমরা অনুভব করিতে পারি না, এই মাত্র।

আবার, কোন কোন স্থলে, এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের নিকট আত্মগোপন করে। তাহার দৃষ্টান্ত,—যে স্থলে অগত্যা আমাদের কোন কাজ করিতে হয়;—যে কাজ না করিলেই নয়, নিতান্তই আবশ্যক;—যেমন মরে কর,-বিপদের সময় দৌড়িয়া পলায়ন করা, কিংবা অন্যভাষাভাষী দেশের লোকের ভাষা শিক্ষা করা। শেষোক্ত স্থলে, একটা আশ্বাসের কথা এই আছে:—নিয়ম মত পরকীয় ভাষা শিক্ষা করিবার সময় যে ইচ্ছাশক্তি ব্যয় হয় তাহা ক্রমে একটা অভ্যাসের সামিল হইয়া দাঁড়ায়! যাহারা এই ইচ্ছাশক্তিরূপ হাতিয়ারটি দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রযত্ন সহকারে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের নিকট এমন একটা সময় আসে যখন এই ব্যবহারটা তাহাদের কাছে খুব পরিচিত হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের এই কার্য্য বিনা কষ্টে সম্পন্ন হয়, এমন-কি আনন্দের সহিত সম্পন্ন হয়, :—একজন ভাল জিম্‌ন্যাষ্টিকওয়ালা "লৌহ কন্দুকের ব্যায়াম," "দোল-দণ্ডের ব্যায়াম," "কড়ার ব্যায়াম," বেশ আমোদের সহিত সম্পাদন করিয়া থাকে। ভাই শিক্ষানবীশ! যখন তুমি খুব কষ্ট করিয়া টেবিলের ধারে বসিয়া, কোন একটা দুর্ব্বোধ্য পুস্তক খুলিয়া, দুইহাতে মাথা ধরিয়া, পাঠে মনোনিবেশ কর তখন আপনাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত দূরবর্ত্তী সুখের পরিণামটির কথা একবার ভাবিয়া দেখিও। তোমার এই প্রযত্ন, এই প্রয়াস, এক দিন নিশ্চয়ই সুখের জিনিস হইয়া দাঁড়াইবে। তখন তোমার কাজ সহজে আনন্দের সহিত সম্পাদিত হইবে। তখন তুমি উহাকে আর ছাড়িতে পারিবে না। তখন উহা না হইলে তোমার আর চলিবে না।

ভাই শিক্ষানবীশ, তোমায় শ্রমকষ্টের আর একটা পুরস্কারের কথা তোমাকে বলি শোনো। কোন বিশেষ আয়াস-সাধ্য শিক্ষার কাজে, ক্রমে তোমার ইচ্ছাশক্তি শুধু যে বিনা-প্রয়াসে পরিচালিত হইবে তাহা নহে;—ইহার দরুন তোমাকে যে নিয়মশাসনের অধীনে থাকিতে হইয়াছিল, সেই নিয়ম-শাসনের ভাব ক্রমশঃ তোমার সমস্ত চরিত্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইবে। কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে নহে, তোমার সমস্ত জীবন-ক্ষেত্রে একটা প্রবল সজাগ স্বায়ত্ত ইচ্ছাশক্তি তুমি অর্জ্জন করিতে পারিবে। কেননা ইহা

শক্তি একটীমাত্র। আমার "গাসকোইং" প্রদেশে যেখানকার অধিবাসীরা যত না শ্রমী তাহা অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান —তাহাদের মধ্যে একটা বেশ জোরালো কথা প্রচলিত আছে :—কোনও কর্ম্মিষ্ঠ চাষার সম্বন্ধে তাহারা বলিয়া থাকে—"ও নিজের উপর হুকুম জারি করিতে জানে"—নিজের উপর হুকুম জারি করা—আত্মশাসন করা—ইহার ভিতরেই সব কথা নিহিত আছে। অধ্যয়নের জন্য টেবিলের ধারে বলপূর্ব্বক আসিয়া বসা এবং তোপের আগুনের সম্মুখীন হওয়া,—এই দুই কার্য্যের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নাই।

শিক্ষাব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত ইচ্ছা-উপাদানটির মাহাত্ম্য পুনঃপুনঃ প্রতিপাদন করা অন্যায় নহে; কারণ ইচ্ছাই সমস্তের মূলীভূত। কিন্তু যে ইচ্ছা বিশৃঙ্খলভাবে নিয়োজিত ও পরিচালিত হয়, সে ইচ্ছা শীঘ্রই ক্ষীণ হইয়া পড়ে, ভাঙ্গিয়া যায়। তদ্‌বিপরীতে, শৃঙ্খলাই ইচ্ছাশক্তির একটা আশ্রয়, একটা সহায়।

শিখিবার সমগ্র প্রয়াসকে শৃঙ্খলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-প্রয়াসে বিভক্ত করে; এই প্রয়াসগুলি অপেক্ষাকৃত কার্য্যপটু, অপেক্ষাকৃত সহজ—অল্প অল্প করিয়া প্রযুক্ত হয় বলিয়া প্রায় বেমালুম।

হায়! সাধারণত এই শিক্ষার প্রয়াস কি বিশৃঙ্খলতার সহিতই সংসাধিত হইয়া থাকে এবং এই বিশৃঙ্খলার দোষেই ইচ্ছাশক্তি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খলতার কৃপায়, ছাত্রদিগের কৌতূহল ও উদ্যমউৎসাহ যে কতটা লোপ পায় তাহা গণনার অতীত। এই ক্ষতির জন্য ছাত্রেরা দায়ী নহে। প্রোগ্রামের ভিতরেই কত বিশৃঙ্খলা। একজন অধ্যাপক—"গুরু মহাশয়" নহেন বলিয়া যাঁহার অভিমান আছে—তিনি হয়ত এই সকল প্রোগ্রাম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলা এবং ছাত্রের স্বাভাবিক শক্তি সামর্থ্য এই উভয়ের মধ্যে কোনও যোগ নাই। তারপর, পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত কতই বিশৃঙ্খলা। গ্রন্থকার হইতে সংস্করণকর্ত্তা পর্য্যন্ত সকলের রচিত পুস্তকই তাড়াতাড়ি পাঠ্যভুক্ত করা হইয়া থাকে। ঐ পুস্তকগুলি অসঙ্গত রকম বৃহদায়তন ও বাতুলবৎ গোলমেলে ধরণের। শিক্ষকদের অধ্যাপনাতেও প্রভূত বিশৃঙ্খলা। তাঁহারা এক বৎসরের ভিতরেও তাঁহাদের ধারাবাহী বক্তৃতার শেষে আসিয়া পৌছিতে পারেন না। আরম্ভে তাঁহারা আগড়ম-বাগড়ম বকিয়া পরে "তালি-তুলি" দিয়া ধ্যাবড়া রকমে কাজ শেষ করেন। শিক্ষার নির্দ্দিষ্ট সময় বণ্টনেও গোলমাল; কোন কোন বিষয় দশবারো বার পড়ানো হইয়া থাকে—আবার কোন কোন বিষয়ে একেবারেই হাত দেওয়া হয় না। সব শিক্ষাই যেন "উড়ো উড়ো" খাপছাড়া ধরণের; যাহা পূর্ব্বে শেখা হইয়াছে এবং যাহা পরে শেখা হইবে—এই দুয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকে না। অমুক ক্লাসের যে ছাত্র ইতিহাসের একটা টুকরা শিখিয়াছে সে ধারাবহিক ইতিহাসের সহিত এই টুকরাকে যুড়িয়া দিতে অসমর্থ। প্রত্যেক বৎসরেই নূতন শিক্ষক, নূতন পুস্তক, নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি। বেচারা শিক্ষার্থী! একজন সচরাচর বি-এ উপাধিধারী যাহা জানে তাহা শিখিতে দশ বৎসর কাটিয়া যায়—বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে এই তথ্যটিই ত যারপর নাই একটা কঠোর সমালোচনা। শৃঙ্খলার সহিত অধ্যয়ন করিলে দ্বন্দ্ব দুই বৎসর লাগে। কতকগুলি ছাত্র অধ্যাপনা কালের প্রতিবৎসরই এই কথা সপ্রমাণ করিয়া থাকে। তাহারা ঐ সময়ের মধ্যে সহজেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষাসংস্কার করিতে হইলে, শিক্ষাকার্য্যে আবশ্যকীয় শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হইলে, হাতে কর্ত্তৃত্ব থাকা দরকার। সে কর্ত্তৃত্ব, পাঠক তোমারও নাই আমারও নাই। অরণ্যের মাঝে কোন কথা প্রচার করা নিষ্ফল; বাস্তবে যেমনটি আছে তাহাই ধরা যাক্। বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিতেছে কিংবা করিয়াছে অথচ বিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন এইরূপ কোন ছাত্র, বিশেষ কিছু শিখিবার সময় স্বীয় শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে কিরূপ শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারে তাহাই বিচার করিয়া দেখা যাক্।

ইচ্ছাশক্তি ব্যয় করিবার পূর্ব্বে, কোন প্রকার প্রয়াস প্রযত্ন করিবার পূর্ব্বে, একটা শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করা আবশ্যক। শিক্ষা করিবার সময় অতিরিক্ত শ্রম করা ঠিক নহে; আস্তে আস্তে, অল্পে অল্পে, ক্রমশঃ অভ্যাস সাধন করিবে। যে দিন সত্য সত্যই তুমি শিখিবার জন্য সঙ্কল্প

করিবে, সেদিন হইতে "দৈব-সম্ভাবনা"র কথা কখনও মনে আনিবে না। একটা সুপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তোমার সেচ্ছাকৃত প্রয়াসকে সাহায্য করিবে। অভ্যাসকে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তুলিবে। এই অপরিচিত অভ্যাগতকে তোমার গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবে। "প্রতিদিন, একই সময়ে"—এই মন্ত্রটিই ইচ্ছাশক্তির প্রবল সহায়। অভ্যাস গ'ড়িয়া তুলিবার জন্য, বিশ্বজনীন শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য এই মন্ত্রটির প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রকৃতির সহিত মিলিয়া একযোগে কাজ করা চাই। প্রকৃতির প্রক্রিয়া অনুসারে, প্রতিদিন শ্রম সংক্রান্ত একই নিয়ম পালন করিয়া চলিবে। একবার নির্ব্বাচন হইয়া গেলে যতটাসম্ভব পুস্তক পরিবর্ত্তন করিবে না—শিক্ষক পরিবর্ত্তন করিবে না। কোন ভবঘুরে যেমন জানে না, কোথায় যাইবে, কোথায় গিয়া থামিবে,—এই জ্ঞানানুশীলনে সেরূপ ভব ঘুরেবৃত্তি অবলম্বন করিবে না। প্রত্যুত যে বিষয়ের অনুশীলন আরম্ভ করিবে সর্ব্বাগ্রে তাহার একটা সাধারণ ধারণা, তদন্তর্গত বিভাগসমূহের একটা ধারণা মনোমধ্যে ঠিক করিয়া লইবে। শিক্ষকের সমস্ত প্রথম-পাঠই,পাঠ্যগ্রন্থের সমস্ত প্রথম-পরিচ্ছেদেই আরব্ধ বিষয়ের একটা বিস্তৃত আলোচনা স্বরূপ হওয়া চাই; হায়! কিন্তু সচরাচর, কেতাব ও শিক্ষক উভয়ই একটা বাঁধাবাঁধি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াই স্বীয় উপদেশ আরম্ভ করিয়া থাকে। শিক্ষানবীসী তোমরা সাবধানী নাবিকের মত সর্ব্বদাই গম্য পথ চিহ্নিত করিতে করিতে অগ্রসর হইবে; যাত্রাপথ কতটা অতিক্রম করিয়াছে, যাত্রাপথের আর কতকটা বাকী আছে তাহা অনুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবে। পূর্ব্বে যাহা শিখিয়াছ তাহার সহিত কোন যোগ নাই এরূপ কোন কিছু শিখিবে না। যাহা উড়োউড়ো ভাবে খাপছাড়া ভাবে শেখা যায়, তাহা না শেখারই সামিল...সকল শিক্ষানবীসির মূলে এইরূপ কতকগুলি শৃঙ্খলার নিয়ম থাকা নিতান্তই আবশ্যক; কিয়ৎকাল পরে যখন আমরা ব্যবহারিক শিক্ষার প্রকরণগুলি ও শিখিবার বিভিন্ন বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিব তখন আবার এই শৃঙ্খলাসম্বন্ধীয় নিয়মের খুঁটিনাটি আরও বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত হইবে।

কিন্তু শিক্ষার শৃঙ্খলা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বে, ইচ্ছা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছিল তাহারই অনুরূপ এই শৃঙ্খলা সম্বন্ধেও একই কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বলিয়াছিলাম, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ শিক্ষা কার্য্যে আরম্ভ হয়, কিন্তু শেষে শিক্ষাকার্য্যকেও ছাড়াইয়া উঠে; সমগ্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারা শিক্ষার্থীর সমস্ত জীবন অনুশাসিত হইয়া থাকে। জ্ঞানানুশীলনের এই শৃঙ্খলাও ঐ একই কাজ সম্পন্ন করে। শৃঙ্খলার দ্বারা সমস্ত চিন্তাধারা পূর্ণতা লাভ করে; শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীর সমস্ত ব্যক্তিটাকে সংশোধিত করে। জীবনে শৃঙ্খলা অর্জ্জন করা বড় কম লাভ নহে। শৃঙ্খলাই মানব সুখের যে একটী মূল-নিয়ম এই কথা প্রমাণ করিবার এ স্থান নহে। কিন্তু ইহাই আমার মত; যে যে বিষয়ে আমি ভুল করি নাই বলিয়া নিশ্চয় জানি তাহার মধ্যে ইহাও একটি।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে শিক্ষার যে অপরিহার্য্য তৃতীয় উপাদান—সময়, সেই সময়সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহা বংবুম্ হক্ষীয় সিড়প প্রশ্নোত্তরমালা

[অর্থাৎ মহা বংগ-ভূম হক্ষিয় (যক্ষীয় !!) শিল্প প্রশ্নোত্তর-মালা। তীব্বতের মানস-সরোবরের নিকটবর্ত্তী পদ্দ্‌ম-সরোবরের (পদ্মসরোবর) কর্দ্দমে এই অমূল্য গ্রন্থ এতদিন যক্ষের ধনের মতো প্রোথিত রহিয়াছিল, পুঁথিখানি কষ্টি-পাথরের ফলকে লিখিত। কষ্টি-পাথর এক প্রকার প্রস্তরীভূত কর্দ্দম—স্নিগ্ধ এবং কৃষ্ণবর্ণ সুতরাং এই বংবুম হক্ষিয় সিড়প প্রশ্নোত্তর-মালা প্রস্তরীভূত বলিয়া কঠিন, কর্দ্দম-মূলক বলিয়া কোমল; সুতরাং অন্যান্য প্রদেশের শিল্প-শাস্ত্র হইতে সহজেই ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তাহা বিশিষ্টতা-মণ্ডিত, সুতরাং ইহা সত্বরপ্রকাশের আয়োজনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে বোধে ভারত-শিল্পের ইতিহাস নামধেয় অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড রূপে ইহা সাধারণে প্রকাশ করা গেল। ইতি প্রকাশক ও আবিষ্কর্ত্তা (একাধারে প্রস্তর ও কর্দ্দম) ইব—অবনীন্দ্র সি আই ই বাগেশ্বরী প্রোফেসার ডি-লিট-লং-লুং-লোট-লুট আশীলিং বিধিলিং ইত্যাদি ইত্যাদি।]

মহা-বংবুম সিড়প প্রশ্নোত্তর-মালা

প্রথম দিনের বিচার :—

প্রশ্ন—শিল্প কি?

উত্তর—"শিল্প একশ্রেণীর নীরব ভাষা।"

প্রশ্ন—যাহা নীরব তাহা নীরব এবং যাহা ভাষিত তাহা ভাষিত; সুতরাং নীরব ভাষা বলিয়া কোন পদার্থ নাই।

উত্তর—নীরব ভাষা অসম্ভব নহে—কেননা দেখ পদ্দ্‌ম-সরোবরে পদ্ম ভাসিতেছে কিন্তু নীরব রহিয়াছে, শিলা জলে ভাসিতেছে ইব ইহা এক শ্রেণীর ভাষা, বুঝিলে।

প্রশ্ন—ইহা যে ভাষা তাহার প্রত্যয়?

উত্তর—বানরে সঙ্গীত গায় দেখিলেও না হয় প্রত্যয়! বুঝিলে তো,—যাও পদ্দ্‌ম-সরোবরে অবগাহন করিয়া বুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া আইস।

দ্বিতীয় দিনের বিচার :—

প্রশ্ন—শিল্প শাস্ত্র কি পদার্থ?

উত্তর—"শিল্পের ব্যাকরণ শিল্প শাস্ত্র।"

প্রশ্ন—আজ্ঞে উপক্রমণিকা ব্যাকরণ, উপনিষদ হইতে ভিন্ন বস্তু?

উত্তর—আজ্ঞে না। "ইহা মানিতে হইবে, মানিবার জন্ম জানিতে হইবে, বুঝিবার জন্ম অধ্যয়নশীল হইতে হইবে।" হক্ষিয় ব্যাকরণ কাহাকে বলে, এতদিনেও বুঝিলে না! যাও—আহারান্তে পুনরায় আইস এবং আমারও আহারের জন্য প্রয়োজনের আয়োজন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

তৃতীয় দিনের বিচার :—

প্রশ্ন—শিল্প কি? ব্যাকরণ কি?

উত্তর—ও প্রশ্নের জবাব কাল দিয়াছি, অন্য প্রশ্ন করহ।

প্রশ্ন—সাদৃশ্য কাহাকে বলি?

উত্তর—হক্ষিয়, "ভারত শিল্পশাস্ত্রে বা শিল্পের ব্যাকরণে বলা হইয়াছে 'সাদৃশ্যই শিল্প'।"

প্রশ্ন—আজ্ঞে!

উত্তর—"'দৃশ্য' শিল্প নহে"—কথার উপর কথা কও কেন? মন দিয়া শ্রবণ কর—"ফটোগ্রাফ দৃশ্য, তাহা সাদৃশ্য হইতে পৃথক; সুতরাং তাহা শিল্প নহে।"

প্রশ্ন—সাদৃশ্য যদি শিল্প হয় তবে বলিতে হয় সাদৃশ্যের সদৃশ যাহা, তাহাও শিল্প।

উত্তর—হাঁ।

প্রশ্ন—যাহা সদৃশ নয় তাহা শিল্প নয়।

উত্তর—না।

প্রশ্ন—যাহা শিল্প নয় তাহা সদৃশ নয়।

উত্তর—কখনই নয়।

প্রশ্ন—শিল্প কাহার বা কিসের সদৃশ, জানিতে ইচ্ছা করি।

উত্তর—এই সহজ কথাটা বুঝিলে না! 'শিল্প' হইল 'ইবের' সদৃশ; ইব হইল পাণিণী-সূত্রোক্ত-'ইব', পাণিণী সূত্র হইল তাহার কাশিকাবৃত্তির সদৃশ, ইতি হক্ষিয়। বুঝিলে?

প্রশ্ন—আজ্ঞে না।

উত্তর—তুমি অত্যন্ত অর্ব্বাচীন।

প্রশ্ন—আপনি বলিলেন দৃশ্য শিল্প নহে, সাদৃশ্যই শিল্প!

উত্তর—এই প্রকারই শাস্ত্রে লিখিয়াছে।

প্রশ্ন—ফটোগ্রাফ দৃশ্য সেই জন্য সে শিল্প নয়।

উত্তর—ঠিক।

প্রশ্ন—সদৃশ হলেই যদি শিল্প হয় তবে একটি দৃশ্যের ফটোর সদৃশ যে আর একটি ফটো সেটি শিল্প এবং সেই ফটোর সদৃশ যে ফটো তার সদৃশ যে তার ফটো, তাও শিল্প কিন্তু সেই প্রথম ফটোখানি—সে শিল্প নয়?

উত্তর—অনুযোগে ফটো প্রতিযোগে পোন্‌ট্রেট—এ যে না জানে, সে—

প্রশ্ন—দৃশ্য কি, তাহা না জানিলে—

উত্তর—তোমার মাথা! যাও মধ্যম-নারায়ণ তৈলের আয়োজন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে—তোমারপক্ষে।

চতুর্থ দিনের বিচার :—

প্রশ্ন—দৃষ্টই বা কি? অদৃষ্টই বা কি?

উত্তর—গত কল্য যাহা বলিয়াছি তাহা বুঝিয়াছ কি?

প্রশ্ন—বুঝিয়াছি।

উত্তর—অনুযোগে ফটো, প্রতিযোগে প্যোন্‌ট্রেট; দৃশ্য এবং সাদৃশ্য—একটা নকল আর-একটা সৃষ্টি, অনুকৃতি-অনুকরণ প্রতিকৃতিসাদৃশ্য করণ, "সাদৃশ্য ইংরেজী similitude নহে" তাহা ইবার্থে কন্ প্রত্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়, এই সব কথা বুঝিয়াছ?

প্রশ্ন—কথা বুঝিলাম সহজে কিন্তু উহার ব্যঞ্জনাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হইল না।

উত্তর—মূর্খ! "দেশ-কাল-পাত্র ছাড়িয়া কেবল রচনা ধরিয়া সকল ব্যঞ্জনা সকল অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না" বুঝিলে?

প্রশ্ন—আজ্ঞে, রচনা ধরিয়াই তো ব্যঞ্জনা চিরকাল বর্তমান, একটা উদাহরণ দেন।

উত্তর—হ ক্ষি য় এর ব্যঞ্জনাও নাই এর অভিব্যক্তিও নাই।

প্রশ্ন—আজ্ঞে, হ ক্ষি য় একটা শব্দ রচনা হল সুতরাং ওর ব্যঞ্জনা নানা রকম, যথা—গলা সুড়-সুড় করছে, কাশি আসছে, স্থানটা স্যেৎ স্যেৎ করছে, কালটা শীতকাল ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ওর অভিব্যক্তি—

উত্তর—এরূপ ক্ষেত্রে উপহাসের অশোভন দশন-বিকাশ অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস!

প্রশ্ন—দৃষ্ট কি অদৃষ্ট কি তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

উত্তর—তবে মুখবন্ধ করিয়া শ্রবণ করহ—যে সকল "চিত্রবস্তু বাস্তব জগতে বর্তমান অপিচ সুপরিচিত তাহা 'দৃষ্ট' যাহা সর্বথা কাল্পনিক অথবা বস্তু-জগতে বর্তমান থাকিলেও অপরিচিত তাহার নাম 'অদৃষ্ট'—মনুষ্য গো অশ্ব দৃষ্ট, দেবতা কল্পলতা সিংহ অদৃষ্ট—"

প্রশ্ন—আজ্ঞে, এ কারিকা দ্বারা দৃষ্ট যে অদৃষ্ট, অদৃষ্ট যে দৃষ্ট হয় তাহাই বুঝিলাম। সিংহ শাস্ত্রকারের অদৃষ্ট ছিল, এখন সকলের দৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এই কারিকায় যেন কিছু ভ্রম আছে—

উত্তর—শাস্ত্রের উপদেশকে অমান্য করিয়া অদৃষ্ট সিংহ কখনই দৃষ্ট হইতে পারেনা এ বিষয়ে শাস্ত্রকারের ভ্রম হয় হয় নাই, তোমারই ভ্রম হইতেছে—যাহা সিংহ নহে তাহাকে সিংহ বলিয়া!

প্রশ্ন—যদি খাঁচার গায়ে lion বলিয়া লেখা থাকে?

উত্তর—"বুঝাইবার জন্যই শিল্পশাস্ত্র সমগ্র চিত্র-বস্তুকে দৃষ্টাদৃষ্ট দুইটি পৃথকভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছে" তুমি না বুঝিলে কাহারো ক্ষতি নাই। যাও, শাস্ত্রের প্রদীপ হস্তে দৃষ্ট অদৃষ্টকে চিনিয়া লও।

প্রশ্ন—স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, সুতরাং—

উত্তর—তাহা দৃষ্ট বলিয়াই ধরিবে।

প্রশ্ন—কল্পনায় নানা বস্তু দৃষ্ট হয়—

উত্তর—তাহাও হক্ষিয়—যাও, বৃথা বাক্য ব্যয় করিতেছ, তুমি বুঝিবেনা।

প্রশ্ন—আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে দৃষ্ট, অদৃষ্ট এবং দৃষ্টাদৃষ্ট অর্থাৎ দৃষ্ট হইয়াও অদৃষ্ট এবং অদৃষ্ট হইয়াও দৃষ্ট এই তিন বস্তু আছে বোঝা গেল।

পঞ্চম দিনের বিচার :—

প্রশ্ন—জীব ও অজীব ও তাহাদের সম্বন্ধে উপদেশ চাই।

উত্তর—"জীবের গতি-ভঙ্গী চিত্রিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু সজীবের স্থিতি-ভঙ্গী চিত্রিত করাও কঠিন।"

প্রশ্ন—অজীবের গতি তো সম্ভবে না।

উত্তর—কেন সম্ভবে না? ঢেলা ছুঁড়িয়া দিলে গতিলাভ করে তাহা আঁকা সহজ কিন্তু ঘোড়া চলিতেছে আঁকা শক্ত, বুঝিলে?

প্রশ্ন—রূপ কি?

উত্তর—"তাহা একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা", বুঝিলে?

প্রশ্ন—আজ্ঞে না।

উত্তর—"প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক-একটি রূপের আধার," বুঝিলে?

প্রশ্ন—আজ্ঞে না।

উত্তর—"চিত্র ষড়ঙ্গে যাহা রূপভেদ, চিত্রগুণ কীর্ত্তনে তাহাই 'বিভক্ততা'" বুঝিলে?

প্রশ্ন—আপনি বলে যান।

উত্তর—"এই রূপভেদ বা বিভক্ততা ইহা সাধারণভাবে রেখা বিন্যাস বলিয়া কথিত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে রূপ ভেদের পদ্ধতি সূচিত হইলেও রূপের অর্থ সুব্যক্ত হয় না।"

প্রশ্ন—পমানে?

উত্তর—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনরূপ ভূষণে ভূষিত না হইয়াও বিভূষিত-বৎ প্রতিভাত হয় যাহার প্রভাবে, তাহার নাম রূপ।

প্রশ্ন - সেই প্রভাবান্বিত বস্তুটি কি?

উত্তর—স্ত্রীলোকদের মুখে দিবার রূপটান্‌ এবং মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির উপরে মাখাইবার তীক্ষ্ণী বলিয়া পদার্থ। শরীরে সরিষা তৈল ব্যবহার করিলে রূপ ফাটিয়া পড়ে—মুক্তা-ফলেযু ছায়ায়াস্তারল্যমিব।

প্রশ্ন—ইবের অর্থ করিয়াছেন, রূপের বুঝান।

উত্তর—"রূপ রূপ নহে অ-রূপ, তজ্জন্য ভারত-চিত্রে রেখা রেখা নহে তাহা রূপ-রেখা" বুঝিলে?

প্রশ্ন—রূপকথার 'রূপরেখার' স্বরূপ এত দিনে হৃদয়ঙ্গম হইল।

উত্তর—আরো শোনো, "শরীরের সকল অঙ্গকেই রূপভেদে প্রদর্শিত করিতে হয়না, কারণ সকল অঙ্গ রূপের আধার নহে।"

প্রশ্ন—আজ্ঞে একটু পূর্ব্বে বলিলেন, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক একটি রূপের আধার!

উত্তর—শোনো, ব্যাঘাত দিও না, "লাবণ্য যোজন ও-একটি পারিভাষিক শব্দ। উহা এক শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্য সাধন" পালিস করা বলিতে পার।

প্রশ্ন—প্রমাণ?

উত্তর—"তালহীন সঙ্গীতের ন্যায় মানহীন চিত্র রসবোধের অন্তরায়।"

প্রশ্ন—বলেন কি?

উত্তর—"কেবল একস্থানে ইহার ব্যতিক্রম—"

প্রশ্ন—কোথায়?

উত্তর—"হাস্যরসের অবতারণায়।"

প্রশ্ন—বালকের নৃত্য গীত করতালি দিয়া কিন্তু রস-বোধ তো যথেষ্ট হয় তাহাতে! আপনি এ কি বৃক্ষের তাল এবং গভর্ণমেণ্ট দত্ত সি আই ই মানের কথা বলিতেছেন?

উত্তর—তবে শুন অর্ব্বাচান কুলাঙ্গার, চক্ষু একটি "সুপরিচিত শরীরেন্দ্রিয় ভাবের প্রভাবে তাহার বিকারসাধিত হয় এবং তদনুসারে তাহার আকার পরিবর্ত্তিত হয়। যোগ-ভূমি নিরীক্ষণের অভ্যাসে নেত্র ধনুকাকৃতি লাভ করে।"

প্রশ্ন—ভ্রূ ধনুক নয়, নেত্র ধনুক!

উত্তর—শোনো পাষণ্ড, "কামি-জনের এবং কামিনীগণের নেত্র (লালসাপূর্ণ বলিয়া) মৎস্যোদরাকৃতিঃ, নির্ব্বিকার চিত্তের নেত্র উৎপল দল সদৃশ এবং যে ত্রস্ত বা রুদ্যমান তাহার নেত্র পদ্মদলের ন্যায়—"

প্রশ্ন—তাহার কারণ?

উত্তর—কারণ আবার কি! শাস্ত্রে আছে। শোনো মূর্খ, গর্দ্দভ ম্লেচ্ছ অসভ্য অভদ্র!—"ক্রুদ্ধের এবং বেদনা গ্রস্তের নেত্র শশকাকৃতি!"

প্রশ্ন—আপনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন আমিও বেদনাগ্রস্ত হইয়াছি। কিন্তু দর্পণে দেখুন কাহারো নেত্র শশকাকৃতি হয় নাই, হইতে পারে না, পারিবে না, চক্ষু জলে আমার নেত্র এবং ক্রোধে আপনারও নেত্র শশকের নেত্রের ন্যায় রক্তবর্ণ হইতে পারে, কিন্তু শশকাকৃতি কিছুতেই হইতে পারে না।

উত্তর—তুমি তুমি তুই—

ইতি পঞ্চম অঙ্ক যবনিকা-পাত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরের ছেলে

একাদশ পরিচ্ছেদ

"আঃ—। মামিমা—আর কেন! এই তো, ওই তো তোমার কিশোর!—আমার মাণিক আর তো নেই, নেই—! মাণিক নেই—ঐ তো তোমার কিশোর! তবে আর কেন!…কে? ঝরণা?—মা, মা, আমার মা, ঝরণা তুই! মাগো তুই? তবে আর কেন! এসেছিস্ তুই? আঃ, তাই! তাই! না, না, কিশোরই তো—কিশোরই তো—হ্যাঁ, কিশোরই তো—ওঃ—"

রোগী প্রচণ্ড বিকারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "কে তুমি…? কে…? কে?" তাহার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া রুদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে কিশোর মৃদু স্বরে বলিতেছিল, "আমি, আমি মাণিক।"

"মাণিক? আমার মাণিক? কই আমার মাণিক—কই আমার খোকা? সরযূ—কই? কই? দাও, আমার বুকে দাও,—দাও, দাও—"

রোগীর প্রসারিত শীর্ণ বাহু-যুগলের মধ্যে—মৃত্যুর করাল আকর্ষণের বেগে কম্পিত বক্ষপঞ্জরের মধ্যে নিজের মুখখানা ও মাথাটাকে পাতিয়া দিয়া কিশোরও মুমূর্ষুর সঙ্গে একই সুরে জ্ঞানহারার মতই গোঁঙাইতেছিল। কি বলিতেছিল, বোঝা যায় না। সেবক যুবকটি অতিকষ্টে কিশোরকে সেই বাহু-বন্ধনের মধ্য হইতে টানিয়া লইয়া করুণা-কম্পিত অথচ দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল, "মশায়, এমন করলে কর্ত্তৃপক্ষ আপনাকে এখানে থাকতে দেবেন না। আপনাকে একটু সংযত হতে হবে! রোগীর সঙ্গে আপনিও রোগী হলেন যে!"

কিশোর উঠিয়া বসিল, ক্ষণপরে সে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছে বুঝিয়া সেবক যুবক বলিলেন, "আপনার টেলিগ্রাম দুটো কাল রাত্রেই রওনা হয়েছে—এই তার রসিদ। রাত্রে আর দিয়ে যেতে পারিনি।"

"আপনি বল্‌তে পারেন, মশায়, ডাক্তার কি বলছেন? কোন উপায় আছে কি এখনো?—কিছু করবার থাকে যদি—"

কিশোরের ভগ্ন কণ্ঠে বোধ হয় ব্যথিত হইয়া যুবক উত্তর দিল, "অন্যত্র নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবে যে-কোন ডাক্তারকে এনে দেখাতে পারেন যদি ইচ্ছা করেন,—কিন্তু আমাদের মনে হয় সেও অনর্থক! আশা পাওয়া গেলে আমরা নিজেরাই আপনাকে বলব! তবে ভগবানের ইচ্ছায় সবই সম্ভব—"এই স্তোকবাণীর দিকে কান না দিয়া কিশোর বলিল, "কিন্তু ঐ টেলিগ্রাম দুটো পৌঁছে—"

"সেও কেউ বল্‌তে পারে না—সবই ভগবানের উপর নির্ভর। তবে বিকারের যে রকম উত্তরোত্তর জোর দেখা যাচ্ছে, তাতে খানিকটা সময় পেতেও পারেন! এই জোরটাতে যতক্ষণ না অজ্ঞানের অবসাদ আসে, ততক্ষণ তো সময় পেতেই পারবেন্। চাই কি, দু'তিন দিনও কাটতে পারে, আবার এ বেলা ও বেলাতেও নষ্ট হওয়া সম্ভব।"

কিশোর আর কোন প্রশ্ন না করিয়া নিঃশব্দে রোগীর মাথার কাছে বসিল। তখনো রোগী একই ভাবে বকিয়া যাইতেছেন! সে প্রলাপ কখনো স্পষ্ট, কখনো অব্যক্ত আর্ত্তনাদে প্রকাশ পাইতেছিল। সেবাকারী যুবক বলিল, "আপনি কাল থেকে একভাবে দিন-রাত্রি বসে আছেন,—এইবার উঠুন, স্নান-টান করে দুটি খাওয়ার—"

কিশোর হাত দুটী জোড় করিবামাত্র যুবক সহানুভূতির ভাবে বলিল, "আপনাকে বেশী দূরে যেতে বলছিনে মশায়—আমাদেরই কাছে একটু নেয়ে খেয়ে নিন্। এখানে ব্রাহ্মণই রাঁধে। আমি এখন এঁর কাছে নিযুক্তই থাকব! আপনি উঠুন। কর্ত্তৃপক্ষরা এঁর জন্যে সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। হয় আপনি নিজের বাসায় গিয়ে স্নানাহার করে আসুন—নয়তো এইখানেই যা হয় শেষ করে ফেলুন।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া কিশোর একবার রোগীকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া উঠিবার জন্য স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিবা মাত্র তাহার যেন মনে হইল, রোগীও তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

যুবকটিও তাহা লক্ষ্য করিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "তাই তো জ্ঞান এল নাকি! দৃষ্টিতো অনেকটা পরিষ্কার।"—কিশোরের মনে হইল, সে চোখে যেন একটা প্রশ্নও ফুটিয়া উঠিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের চক্ষু নত হইয়া গেল। যদি সত্যই ইঁহার জ্ঞান আসিয়া থাকে! উঃ—কি করিয়া সে চাহিবে? সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে? ঠোঁট নড়িল, মৃদু প্রশ্ন হইল, "কে?"

অজ্ঞানকে যে উত্তর সে দিয়াছে, এখন এই অর্দ্ধ-সজ্ঞানকে সে উত্তর দিবার শক্তি কিশোরের কোথায়! সে শুনিল, ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন চলিতেছে,—"ঝরণা? মোহিনী দাদা?" কিশোর বুঝিল না, ততখানি ভয়ের এখনো তাহার কারণ নাই! উত্তর দিল,"তাঁরা আস্‌বেন শীগ্‌গিরই।" আবার ও কি যেন বলিবার চেষ্টায় বুঝিবার চেষ্টায় রোগীর ঠোঁট ঘন নড়িতেছে দেখিয়া কিশোর তাঁহার মাথার দিকে সরিয়া দাঁড়াইল। না জানি, এবার সে কি প্রশ্ন শুনিবে! ক্ষণেক পরে সেবক বলিল, "চলুন এইবার। আচ্ছা মশায়, যদি কিছু মনে না করেন তো—"

"না, না—" দুই হাতে মুখ ও কর্ণ ঢাকিয়া কিশোর প্রায় আর্ত্ত স্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "দয়া করে কোন প্রশ্ন কর্‌বেন না আমায়।"

"মাপ করুন। চলুন, আপনাকে আর একজনের জিম্মা করে দিই, সেই আপনার স্নানাহারের—"

"ওঃ—"তীব্র আর্ত্তনাদের সঙ্গে রোগীর মস্তক উপাধান হইতে লুটাইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া কিশোর ত্রস্তে তাঁহার মুখের নিকটে গিয়া দুই হাতে অতি-সন্তর্পণে মাথাটি বালিশে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, ইতিমধ্যে বিকার-গ্রস্ত অর্দ্ধমৃত রোগী দুই হাতে তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "না, না, আমায় যেতেই হবে যে মা,—কিশোর লজ্জা পাবে—রাগ কর্‌বে। না, আবার কেন—আর কেন!"

জড়িত স্বর—অন্যের সম্পূর্ণ পত্র বুঝিয়া লইবার উপায় নাই, কিন্তু কিশোরের বুঝিতে একটুও বাধিতেছিল না। রোগীকে সান্ত্বনার্থে আবার সে বলিল, "খবর দিয়েছি তাঁদের, আসবেন তাঁরা শীগ্‌গিরই—।"

"কে—মামিমা? না, না, তাঁর সামনেও আমি আর যাব না, কিশোর কি ভাব্‌বে!"

"তিনিও আসবেন শীগ্‌গিরই।"

"কে আস্‌বে? কিশোর? কিশোর? আমি জান্‌তাম না। তাহলে আর তো ফির্‌তাম না। তাকে লজ্জা পেতে দুঃখ পেতে আর দিতাম কি? আমি যাচ্চি, আবার যাচ্চি মা। তুই—তুই—"

কিশোরের হাত ছাড়িয়া দিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া লইয়া রোগী আবার নিজ মনেই বলিলেন, "বেঁচে থাকি তো আবার—আবার একবার দেখে যাব—তোদের। তখন তুই কিশোরের—কিন্তু লজ্জা পেতে আর দেব না, লুকিয়ে দেখে যাব। দেখ্‌ব না? আমার সেই রাঁচির কতদিনের সাধ আজ পুরবে। আমার—আমার সেই সরযুর কোলের মাণিককেই তো,—যাই করুক সে—ওঃ!"

অব্যক্ত আর্ত্তনাদের সঙ্গে কিশোর একেবার বিনয়ের পায়ের উপরই পড়িয়া গেল—ধৈর্য্য সংযম লজ্জা কিছুই আর তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিল না। সেবক যুবকটি ত্রস্তে কিশোরকে টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল,—"এ সময়ে ধৈর্য্য ধরুন! রোগীর বেশ জ্ঞান হয়েছে, এ সময়ে আপনার অধৈর্য্যে রোগীর ক্ষতি হবে। আপনাকে তাহলে এখন এখানে রাখা চল্‌বে না। বুঝে চলুন।"

চোখের জল মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিয়া ভগ্ন স্বরে কিশোর বলিল, "বলুন, আমায় কি কর্‌তে হবে—"

"আর কিছু না—স্থির হয়ে বসে উনি যা বল্‌ছেন, শুনুন, দরকার বুঝলে একটু আধটু উত্তর দিন—কিছু বল্‌বার থাকে, তাও বলুন।"

"বল্‌বার?—কিছু যে আমার বল্‌বার নেই—

"তবে চুপ করে বসে থাকুন। ঐ শুনুন, উনি কোথায় আছেন, প্রশ্ন করছেন—পরিষ্কার জ্ঞান হচ্ছে ক্রমে! আপনি ভাল জায়গায়ই আছেন—এই ওষুধটা খান দেখি! মশায়, আমি একবার ডাক্তারকে খবর দি; স্থিরভাবে থাকবেন কিন্তু আপনি, বুঝেছেন?"

যুবক চলিয়া গেলে কিশোর লক্ষ্য করিল, এতক্ষ

ধরিয়া রোগী বিস্ফারিত চক্ষে তাহাকেই দেখিতেছিল। আবার সে প্রশ্ন করিল, "কোথায় আমি? কল্‌কাতায়?"

"না, কাশীতে।"

"কাশীতে কোথায়?"

"রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে।"

"কে তবে তুমি?"

"উনি একজন সেবা কর্‌বার লোক।"

"কিন্তু তুমিও, না—কে তুমি?"

সচকিতে কিশোর দুই হাতে মুখ ঢাকিল, আর বুঝি লুকাইবার উপায় নাই! এ দৃষ্টি হইতে কোথায় সে লুকাইবে!

"কতকাল কতযুগ পরে, ওঃ, এই যে সে দিন দেখ্‌লাম! রাজকান্তি, আমার রাজকান্তি—কত বড়—কত সুন্দর আমার সোনার মাণিক! কিন্তু আমার দেখ্‌তে পাবার নয়—আমি দেখ্‌তে পাব না আর। পরের, পরের সে!—কে তুমি তবে? সে নও তো—কিশোর নও তো?"

"না, না, আমি মাণিক—তোমার মাণিক—"বলিতে বলিতে কিশোর আবার জ্ঞান-হারা হইয়া পিতার বক্ষের নিকটে আছ্‌ড়াইয়া পড়িল, "বাবা, আমার বাবা।"

কতক্ষণ পরে নিকটে লোক-সমাগমের শব্দে কিশোর যখন পিতার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, বিনয়ের তখন আর কোন চাঞ্চল্য নাই,—দুই হাতে তাহার মাথাটা সেই জীর্ণ পঞ্জরের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সে নিমীলিত নেত্রে স্তব্ধ হইয়া আছে। কেবল মাঝে মাঝে ঠোঁট একটু একটু নড়িয়া যে শব্দটুকু উচ্চারিত হইতেছিল, তাহা কেবল কিশোরেরই বোধগম্য। তাহা "সরযূ—খোকা—আমার মাণিক"—এমনি টুক্‌রা-টুক্‌রা গোটাকয়েক শব্দ মাত্র।

দিনের পর রাত্রিও কাটিতে চলিল। ডাক্তার এমন কিছু ভরসা দিতে পারেন নাই। ও-সব জ্ঞান সাময়িক, উহার দ্বারা কোন সুফলের আশা এখনো করা যায় না। হার্টের অবস্থা খুবই আশঙ্কা-জনক,মস্তিষ্কেও বোধ হয় গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। কিশোর বসিয়া ভাবিতেছিল, মস্তিষ্কের আর অন্তরের এ আঘাতের কথা অন্যে কি বুঝিবে! এই দশ-এগারো বৎসর যে এই জীর্ণ-শীর্ণ শরীর ঐ ভগ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণিত বস্তু দুটিকে এই পঞ্জরের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্য! নির্নিমেষ নেত্রে সেই অর্দ্ধ-জ্ঞান-অজ্ঞানে মিশ্রিত দেহখানির দিকে চাহিয়া কিশোর ভাবিতেছিল, এই জীর্ণ ঘরের ভিতরে যিনি এখন ঐ আধি-ব্যাধি-পীড়িত তাপ-জর্জ্জরিত আতুর দেহ-মনকে ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তিনি গত দিনের কথা, গত স্নেহ-মমতার কথা একবারও কি এখন আর ভাবিতেছেন না? যাহার জন্য তাঁহার এই অকাল-মৃত্যু সেই তাঁহার বক্ষ-কোটরবাসী সর্পের দংশনের জ্বালা কি তিনি এখন ভুলিতে পারিয়াছেন? তাহাকে কি ক্ষমা করিয়াছেন? ক্ষমা যদি না করিতেন, তাহা হইলে "আমার মাণিক" বলিয়া আবার কি তাহাকে বক্ষে স্থান দিতেন? কিম্বা এ সমস্তই চিরদিনের সংস্কার বশেই করিয়া গেলেন? আজন্ম প্রগাঢ় স্নেহ যে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার মধ্যেও প্রাণাধিক স্নেহাস্পদের গভীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে বক্ষে উঠাইয়া লইতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করে নাই! কিশোর যাহা পাইল, ইহাও কি তাহাই মাত্র?

হউক্,—তাহাতেই বা এমন কি! এত বড় পিতৃহত্যার অপরাধের একদিনেই মোচন হইবে! সে যে অসম্ভব! আর ইহারই জন্য তো কিশোরের জীবনও এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে! এই হত্যার পাপও কিশোরের জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং তার পরে ইহার প্রায়শ্চিত্তও সারা জীবন ধরিয়া তাহাকে করিতে হইবে, সেজন্য কাতর হইলে চলিবে কেন! তাহার জীবনের দেবতা, তাহার ঈশ্বর যে এইজন্যই তাহাকে পরের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজে পর হইয়া শেষে এমনি করিয়া বাকি কাজটুকুও শেষ করিয়া যাইবেন, এ যেন কিশোরের কতকটা জানাই ছিল! কেবল সে জানিত না যে তাহাকে এতটুকু সুযোগও শেষে তিনি দিবেন! তিনি পথে পড়িয়া না মরিয়া এই অনাথ-সেবাশ্রমে কিশোরের হাতেরই একটু শুশ্রূষা, একটু জল-গণ্ডুষ লইয়া যে তিনি যাইবেন, এইটুকুই কিশোর জানিত না। তাই কল্পনায় ইহার অন্য একটা রূপ চিন্তা করিয়া দেহে মনে সে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল।—কিন্তু কেন এই অনর্থক

চিন্তা—কেন এ ভয়? এইই বা সে কেন পাইবে না? এটুকু যে তার প্রাপ্য, নহিলে কে তাহাকে সেই কলিকাতা-যাত্রার পথ হইতে পশ্চিমের গাড়ীতে তুলিয়া দিল? সে তো রাজেশ্বরীর মুখে অজিতের কথিত "মোগলসরাই ষ্টেশনে তাহাকে দেখা গিয়াছিল" এইটুকু মাত্রই শুনিয়াছিল! ইহাতে তাহার অন্তর এমন কি জানিল যে যৌবনের অদম্য মনোবৃত্তিরও হাত এড়াইয়া এই দিকেই ছুটিয়া আসিয়াছে! এই চির-অত্যাচার-প্রাপ্ত স্নেহশীল অন্তর যেমন স্নেহাস্পদের এত অপরাধেও তাঁহার নিজের অন্তরের বৃত্তিকে শুষ্ক করিতে পারে নাই, এই মৃত্যু-উন্মুখ প্রাণও যেমন 'আমার মাণিক' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে তেমনি এই কিশোরের অন্তর-গুহা-বাসী সেই শিশু মাণিকও এপর্যন্ত একদিনও কি ইহাকে ছাড়িয়াছিল? ছাড়ে নাই, তবে সেটা যে কি, তাহাই সে চিনিতে পারিত না। এই ভ্রমেই আগাগোড়া সব গোল হইয়া গিয়াছে। সেই যে বন্ধন—বৈরীরূপে বিদ্বিষ্টভাবে অহরহ কিশোরকে জর্জ্জরিত করিত, স্বভাবজাত আকর্ষণের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা বিপ্রকর্ষণরূপে অন্তরকে উদ্যত রাখিত, তাহাকেই কিশোর বুঝিতে পারে নাই। বহুদিন পূর্ব্বে একবার রাজেশ্বরী বাড়ীতে পণ্ডিত দ্বারা ভাগবত ব্যাখ্যা পাঠ করাইয়া ছিলেন,—তাহাতে সেই পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপাল প্রভৃতির বৈরানুবন্ধের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাই আজ কিশোরের মনে পড়িতেছিল। যাহা হইতে জীব উদ্ভূত, জীবের জীবত্ব বা আত্মত্ব যাহাতে পর্য্যবসিত, সেই পরমাত্মার উপরই তাহার এই বিদ্বেষ, এই বিপ্রকর্ষণ, ইহা আত্মার আকর্ষণেরই রূপান্তর মাত্র। তাই 'প্রেমানুবন্ধ' আর 'বৈরানুবন্ধের' গতি একই, প্রাপ্তি একই!—নহিলে শিশুপালের আত্মা, জ্যোতিরূপে আবার যিনি তাহাকে হত করিলেন, তাহাতেই গিয়া মিশিল কেন? কিশোরেরও পিতার উপর এই বিদ্বেষ, সে যে গাঢ় আকর্ষণের রূপান্তর, অভিমানেরই ক্রিয়া মাত্র! কেন তুমি আমায় পরকে দিয়া নিজে পর হইলে! তোমার সাক্ষাতে আমায় পরের পরিচয়ে পরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়, এ দুঃখ এ লজ্জা যে জগতে রাখিবার স্থান নাই! তুচ্ছ এ বিষয়ে কি হইবে—যদি আমি তোমারই হারাইলাম—তোমায় বাবা বলিতে না পাইলাম? এ কথা তুমি একবারও ভাবিলে না! যদি নাই ভাবিয়াছ, বিষয়কেই যদি এত বড় দেখিয়াছ, তবে আর কেন? অহরহ নিকটে থাকার এ লজ্জা, এ বেদনা আর আমি সহিতে পারি না—যাও, তুমি যাও। কিশোরের কিশোর হৃদয় অহরহ এই কথাই না বলিয়াছে! ইহাকে দূরে সরাইয়া দিয়াও কি কিশোর একদিনও নিজেকে ভুলিতে পারিয়াছে? পিতৃপরিত্যক্ত হতভাগ্য বলিয়া পরের দেওয়া এত সুখ-সম্পদও যে তাহার বিষের তুল্য হইয়াছিল। রাজেশ্বরীর এতখানি স্নেহকেও যে সে মাথা পাতিয়া লইতে পারে নাই। শুধুই কি তাই? নিজের যৌবনোচ্ছল জীবনের সর্ব্বোত্তম সার্থকতা তাহার বুঝি দুয়ারে আসিয়াও দাঁড়াইয়াছিল—সে তবু তাহাকেও ফিরাইয়া দিয়াছে! এমন অভিশপ্ত বিষময় জীবন কিজন্য হইয়াছিল? শুধু এই জায়গায় পর হইয়াই ত! এত বড় বেদনার অভিমানের স্বরূপকেই যে সে চিনিতে পারে নাই, ইহাই তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অভিশাপ, সব চেয়ে ভ্রম।

গাঢ় চিন্তায় তন্ময় কিশোর সহসা এক সময় চমকিত হইয়া দেখিল, রাজেশ্বরী ও মোহিনী বাবু ঝরণাকে লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী

প্রভু-মনোভাব *

(Master-Mentality.)

"Slave-Mentality' বা দাস-মনোভাবের মতন ইংরাজিতে 'Master-Mentality' বা প্রভু-মনোভাব বলে' কোনো শব্দের অস্তিত্ব আছে কি না, জানি না। তবে এ শব্দটির অস্তিত্ব থাকুক্ আর নাই থাকুক্, এ শব্দ যে-বস্তুর বাহন, সে-বস্তুটি ইংরাজ-চরিত্রে এমন মূর্ত্ত হয়ে আছে যে, আর ইংরাজের অস্থি-মজ্জায় এমন ওত-প্রোত-ভাবে প্রবিষ্ট

* ১৩২৭ সনের মাঘের 'সবুজ-পত্রে' প্রকাশিত আমার লেখা 'দাসমনোভাব' নামক প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

হয়ে রয়েছে যে, তাকে ইংরাজী-ভাষা খারিজ ক'রে দিলেও ইংরাজ-জাতি কোনোমতেই বাতিল করতে পারে না।

দাসত্ব আর প্রভুত্ব 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ।' দাস যে আছে বিদ্যমান—এইত পরিষ্কার প্রমাণ যে, প্রভুও আছেন, খোস-মেজাজে বাহাল-তবিয়তে বিরাজমান। সুতরাং দাস মনোভাবের স্বত্ব ও সত্তা স্বীকার করে নিয়ে প্রভু-মনোভাবের অধিকার ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করা অসম্ভব। দাস আর প্রভু—এ দু'জনার Status বা পদ-মর্য্যাদার মধ্যে আস্‌মান্-জমিন্ ফারাক্ হলেও, দাস-মনোভাব আর প্রভু-মনোভাব—এ দু'য়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এ দু'টি বস্তু একই অবস্থা হ'তে সঞ্জাত, এ দু'টি মনোভাবই মানব-মনের বিকৃতির দ্যোতনা ও অবনতির অভিব্যঞ্জনা। আসল কথা, দাস-মনোভাব আর প্রভু-মনোভাব একই বিষ-বৃক্ষের ফল—তবে কিনা ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উৎপন্ন।

দাসত্বের সৃষ্টি স্বাধীনতার অভাবে, আর প্রভুত্বের উৎপত্তি স্বাধীনতার অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের প্রভাবে। সুতরাং স্বাধীনতার সত্য ও সনাতন আদর্শের সামনে দাসত্ব যেমনি দূষণীয়, প্রভুত্বও তেমনি ঘৃণার্হ। বিশ্ব-মানবতার মহান্ আদর্শের অনুবর্ত্তন যাঁরা করেন, তাঁদের সাধন-পথে দাসত্ব যেমনি অন্তরায়, প্রভুত্বও তেমনি পরিপন্থী। স্বাধীনতা-বাদীর চোখে দাস যেমন কৃপার পাত্র, প্রভুও তেমনি জঘন্য জীব। তাই দাসত্বের উচ্ছেদ স্বাধীনতা-বাদীর যেমন ধর্ম্ম, প্রভুত্বের বিনাশও তেমনি তার কর্ম্ম—আর এ দু'টি বস্তুর উচ্ছেদ ও বিনাশ স্বাধীনতা-সাধনার মর্ম্ম। কিন্তু দাসত্বের উচ্ছেদ করতে হলে তার মূল (১) যে দাস-মনোভাব, সেটিকে উন্মূলিত করতে হবে; আর প্রভুত্বের বিনাশ-সাধন করতে হলেও প্রভু-মনোভাবকে নির্ম্মূল করা আবশ্যক।

দাস-মনোভাবের অভাব প্রভু-মনোভাবের প্রভাবকে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে সমূলে নষ্ট করতে না পারলেও অনেকটা খর্ব্ব করে দেয়। দাস-জাতি দাস-মনোভাবের প্রভাব থেকে মুক্ত হ'য়ে যেদিন দাসত্বের বিনাশ ও বিলোপ সাধন করে, সেদিন প্রভু-জাতির প্রভুত্বও খোলা-শিশির কর্পূরের মত আপনা-আপনি উড়ে যায়, আর প্রভু-মনোভাব অস্তগামী সূর্য্যের ন্যায় দেখতে না দেখতে ডুবে যায়। তবে সাধারণতঃ প্রভু-জাতি প্রভু-মনোভাবের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে প্রভুত্বের ধ্বংস-সাধনের কোনো চেষ্টা-চরিত্র করে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে, দাসত্বের ফলে দাস-জাতি যেমন ভিতরে-বাইরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার যেমন শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—সব দিক দিয়ে সর্ব্বনাশ হয়ে থাকে, প্রভুত্বের ফলে প্রভু-জাতির ঠিক তেমনটি হয় না। বাইরের দিক দিয়ে প্রভু-জাতি যথেষ্ট লাভবান হয়—যদিও ভিতরের ক্ষতির পরিমাণ দাস-জাতির চেয়েও অনেক বেশী। প্রভু-মনোভাবের প্ররোচনায় প্রভুত্ব করে করে প্রভু-জাতির চিত্ত-বিকার জন্মে, আত্মার অবনতি ঘটে, অন্তর অশুদ্ধ হয়—মোটের উপর লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখলে পারমার্থিক ক্ষতি হয় তার বিস্তর, কিন্তু আর্থিক লাভ হয় অনেক।

অর্থকে পরমার্থের চেয়ে বেশী মনে করে বলেই প্রভু-মনোভাব প্রভু-জাতিকে একেবারে পেয়ে'-বসে। এই পেয়ে'-বসার সোজা মানে এই যে, প্রভু-মনোভাব ব্যাসিলি (Bacilli) বা রোগের বীজাণুর মত প্রভু-জাতির মনের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে তাকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে। এর ফলে তার মনের আকৃতি ও প্রকৃতি—দুই-ই হুবহু বদলে যায়। বস্তুতঃ প্রভু-মনোভাবের প্রভাবে প্রভু-জাতির এমনি মানসিক পরিবর্ত্তনই হয় যে, তার চিত্তবিত্ত-হীন হয়ে একেবারেই দেউলে সেজে বসে। দাসত্বের জঘন্য কাজ-কারবারে প্রভু-জাতির লাভ বাইরে যা-ই হোক্ না কেন, ভিতরের লোকসান এত বেশী হয় যে, কিছুকাল পরে

(১) দাসত্বই দাস-মনোভাবের অব্যবহিত কারণ বা immediate cause. কিন্তু এই দাস-মনোভাব শাখা-প্রশাখায়, পত্রে-পল্লবে, ফলে-ফুলে বৃক্ষাকারে পূর্ণ-পরিণতি লাভ করলে পর, দাস-মনোভাবই দাসত্বকে বাঁচিয়ে রাখে। যেমন—কোনো বৃক্ষের সৃষ্টির আদি কল্পনা করতে গেলে বীজ বই আর কিছুই থাকে না; কিন্তু সেই বীজ বৃক্ষে পরিণত হলে, তখন বৃক্ষই বীজকে প্রসব করে থাকে—সেই জন্য এক-হিসাবে বৃক্ষকেই বীজের 'প্রসূতি' বলা যেতে পারে; ঠিক তেমনি দাস-মনোভাবই দাসত্বের কারণ বলা যায়। যেমন—এক-জাতীয় বীজকে পৃথিবী থেকে লোপ করে দিতে হ'লে সেই জাতীয় যাবতীয় বৃক্ষকে ধ্বংস করা আবশ্যক, তেমনি দাসত্বের উচ্ছেদ করতে হ'লে দাস-মনোভাবকে উন্মূলিত করা চাই।

তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেও সেই দেউলে-মনের কোনোখানেই স্বাধীন-জাতির স্বভাব-জাত গুণ-গ্রামের নাম-গন্ধও মিলবে না।

প্রভু-মনোভাব মানুষকে প্রভুত্ব-প্রিয় করে' তোলে। প্রভুত্ব-প্রিয়তা মানবের সদ্‌বৃত্তি-বিকাশের পরিপন্থী; কর্তৃত্বানুরাগের ফলে মানুষের অসদ্‌বৃত্তির উন্মেষ হয়, কুপ্রবৃত্তি প্রসার লাভ করে। প্রভুত্ব-প্রিয় ব্যক্তি কখনও সদ্ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে' জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না; মনুষ্যত্বের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে' চলা তার পক্ষে অসম্ভব। কারণ কর্তৃত্বানুরাগ মানুষের প্রকৃতিকে নিষ্ঠুরতা, কপটতা, অহঙ্কার প্রভৃতি অসদ্ভাব দ্বারা অভিভূত করে' ফেলে; প্রভুত্ব-প্রিয়তা মানবের স্বচ্ছ জীবন-ধারাকে আবিলতায় আচ্ছন্ন করে, জীবন-প্রবাহের সরল গতি কে কুটিল ক'রে তোলে, বহমান জীবন-স্রোতকে বন্ধ করে' দেয়। তাইত মানবের মঙ্গলার্থে প্রতীচ্য ঋষির মুক্ত-কণ্ঠ হ'তে নিঃসৃত হয়েছে এই সত্য বাণী—

"the love of power is incompatible with goodness; it accords with the opposite qualities of pride, duplicity and cruelty" ("Kingdom of Heaven"—Leo Tolstoy)

প্রভু-মনোভাবের মদিরা-পানে প্রভু-জাতি এম্‌নি বেহদ্দ মাতাল হয়ে' পড়ে যে, তার মুখ দিয়ে বেরুতে থাকে বেপরোয়া বোতল-বুলি। তার কাছ থেকে তখন আর স্বাধীনতার শাশ্বতী বাণী শুনতে পাওয়া যায় না, সে আর তখন শান্তি ও প্রীতির বার্ত্তা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ প্রচার করে না। তার মুখ দিয়ে বের হয় যে-বাক্য, যে-উক্তি, সে দাস-জাতির মুক্তি নিয়ে নয়, সে হচ্ছে দাস-জাতির উপর আধিপত্যের মিথ্যা দাবী-দাওয়া নিয়ে, সে হচ্ছে প্রভুত্বের দর্পের আর পশু-বলের অহঙ্কার। মোটের উপর, প্রভু মনোভাবের প্রভাবে প্রভু-জাতির মতি-গতি, আচার-ব্যবহার, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি এমন বদ্‌লে যায় যে, স্বাধীন-জাতির সঙ্গে এক পংক্তিতে আসন পাওয়ার যোগ্যতা আর দাবী-দাওয়া তার একেবারেই থাকে না; তবুও যে সে অপাংক্তেয় হয় না, সে তার সত্যিকার অধিকারের জোরে নয়, পশু-বলের ফলে। ইংলণ্ড থেকে যে-সব ইংরাজ সরকারী চাকরী কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের সংস্রবে এদেশে এসে ভারতবাসীর উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব বিস্তার করে' বসে' আছেন, তাঁদের চরিত্র আলোচনা ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ কর্‌লে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। স্বাধীনতা-বাদী ইংরাজ-মনীষী জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ পরাধীন দেশের শাসন-পদ্ধতির আলোচনায় ভারতবর্ষে "European Settlers" বা ভারতপ্রবাসী ইউরোপীয়ান্‌দের প্রভুত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে' স্পষ্ট বলে' গিয়েছেন যে, প্রভু-জাতির অন্তর্ভুক্ত লোক যখন দাস জাতির অধ্যুষিত দেশে অর্থোপার্জ্জনের জন্যে যায়, তখন আর সবাইয়ের চেয়ে তাদেরই বিশেষ সংযত করে' রাখা আবশ্যক। কারণ বিজেতা-জাতির পদোচিত মান-মর্য্যাদার প্রভাবে শক্তিমান হ'য়ে ও বিদ্বেষ-ভরা দাম্ভিকতায় ভরপুর হ'য়ে তারা শুধু সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের কথাই ভাবে—কর্তৃত্বের দায়িত্ব-বোধ তাদের মনে আদৌ জাগে না।

"Armed with the prestige and filled with the scornful overbearingness of the conquering nation, they have the feelings inspired by absolute power without its sense of responsibility. তিনি আরো বলেছেন যে, ভারতপ্রবাসী ইউরোপীয়ান্‌রা এই বিকৃত মনোভাবে মশ্‌গুল হ'য়ে ভারত-বাসীদের মনে করে, তাদের পায়ের তলার ময়লা; ভারতীয়দের কোনো ন্যায্য অধিকার যে তাদের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মিথ্যা দাবী-দাওয়ার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াতে পারে—এ যেন তাঁদের কাছে ভয়ানক বলে' বোধ হয়; ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে স্বার্থ-সাধনের অনুকূল বিদেশীদের যে-কোনো কর্ত্তৃত্বের প্রতিকূলে সরকার যদি দেশী লোকদের বাঁচাবার জন্যে সামান্য কোন একটা কাজও করে, তবে এরা সে-কাজটাকে দোষারোপ ত করেই—এমন কি, সেটাকে সত্যি সত্যি সাংঘাতিক ক্ষতি বলে' মনে করে। They think the people of the country were dirt under their feet: it seems to them monstrous that any rights of the natives should stand in the way of their smallest

pretentions : the simplest act of protection to the inhabitants against any act of power on their part which they may consider useful to their commercial objects, they denounce and sincerely regard as as injury." ('Representative Government'—Chap. XVIII—John Stuart Mill). তারপর দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ-ঔপনিবেশিকগণ সেখানকার প্রবাসী ভারতবাসীদের উপর আজ পর্য্যন্ত যে ব্যবহার করে আসছে, সে থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে—প্রভু-মনোভাবের প্রভাবে ইংরাজের ন্যায় স্বাধীন-জাতির কি অধঃপতনই না হয়েছে, তাদের জাতীয় চরিত্র কতদূর কলুষিত হয়ে পড়েছে!

এস্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে একটা গল্প বল্‌তে চাই। সওদাগর-অফিসের এক সাহেব নাকি একদিন কি একটা সামান্য ত্রুটির জন্য তাঁর ভারতীয় কেরাণীর উপর রাগ করে তাঁকে বেদম্ লাথি মার্‌তে লাগ্‌লেন। সাহেবের বুট-জুতা-পরা পায়ের লাথির চোটে কেরাণী ভূতল-শায়ী হলেন; তবে প্রাক্তনের পূর্ব্ব-প্রভাবে তাঁর প্লীহা ফাটে নি, খানিক পরে কেরাণীটি দাঁড়িয়ে উঠে' গায়ের ধূলা-মাটি ঝেড়ে' হাত জোড় করে সাহেবকে যা' নিবেদন করলেন, তার মর্ম্ম অনেকটা এই ধরণের—হুজুর, আমার লাথি মেরেছেন, তাতে দুঃখ নাই! আমার ভয় হচ্ছে হুজুরের পায়ে বুঝি বা চোট লেগেছে, জুতো হয় তো ছিঁড়ে গিয়েছে! হুজুর, গোলামের গোস্তাকি মাপ করুন। কথাগুলি শুনতে কানে বাজ্‌লেও একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় যে, অমন-কথা গোলামের মুখ দিয়ে বের হওয়া অসম্ভব কিংবা অস্বাভাবিক নয়। কারণ দাসত্ব দাসকে দিয়ে না করাতে পারে এমন-কোনো কর্ম্মই নাই, আর গোলামী গোলামকে দিয়ে না বলাতে পারে, এমন্-কোনো কথাই নাই। কেরাণীর এই দাসজনোচিত কথায় সাহেবের গোঁস্‌সা নাকি দূর হয়ে গেল—রুষ্ট মনিব তুষ্ট হলেন। সে ত হওয়ার কথাই। প্রভু-পাদের জন্য পর্য্যন্ত এত দরদ—এটা প্রভু ভক্তির পরিচয় না হোক্, প্রভু-শক্তির যে জয়, সে ত নিশ্চয়। এই গল্পটি সত্য কি না জানিনা। তবে ভারতবর্ষে প্রভু-জাতি আর দাস-জাতির মধ্যে নিত্য যে সব কাণ্ড-কারখানা হয়ে থাকে, তাতে মনে হয়, এমন ব্যাপার সংঘটিত হওয়া একটা অসম্ভব কিছু নয়। গল্পের বর্ণিত ঘটনায় দুটী বিষয় লক্ষ্য কর্‌বার আছে—আত্ম সম্মান-বোধ-হীন গোলামের সরমের-স্বভাব-প্রাপ্তি, আর মনুষ্যত্ব-জ্ঞান-হীন মনিবের সেই ঘৃণিত আচরণে পরিতৃপ্তি। দাস-মনোভাবের ফলে একের কি শোচনীয় অধোগতি, আর প্রভু মনোভাবের প্রভাবে অপরের স্বাধীন প্রকৃতির কি ভীষণ বিকৃতি!

প্রভু-মনোভাবকে ভাল করে' বুঝতে হলে' প্রভুকে চিন্‌তে হলে দাসেরও স্বরূপ জানা চাই। প্রভু ও দাস এ দু'জনার তুলনামূলক বিচার করা আবশ্যক।

প্রভু-জাতির মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান করলে সাধারণতঃ তিন রকমের লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়—অধম, মধ্যম, উত্তম। অধম যারা—তারা মনে করে দাস-জাতির স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নাই, তার অস্তিত্বই হচ্ছে প্রভু-জাতির জন্য, প্রভুত্ব প্রভু-জাতির জন্মগত অধিকার, বিধি-দত্ত সত্তা মধ্যম যারা—তারা বুঝে দাস-জাতি আর প্রভু-জাতি ভগবানের দুটো পৃথক সৃষ্টি নয়, আর এটাও জানে যে, দাস-জাতিরও স্বতন্ত্র সত্তা আছে; কিন্তু তা বুঝে-সুঝেও দাস-জাতির অধিকার পাওয়ার ন্যায্য দাবী দাওয়া অগ্রাহ্য করে কতকটা স্বার্থ-হানির আশঙ্কায়, আর কিছুটা প্রভুত্ব-নাশের ভয়ে এরা চায় একটা আপেক্ষিক রফা করে' দাসজাতির দাবী-দাওয়া এমন্-ভাবে মঞ্জুর করতে, যাতে নিজেদের স্বার্থ-হানি না হয়; এরা প্রভুত্ব বজায় রাখ্‌তে ইচ্ছুক, তবে কিনা অভিভাবকত্বের আবরণে। মোটের উপর মধ্যমরা চায়, সাপও মরুক, লাঠিও না ভাঙ্গুক, আর চায়—দাসত্বের ভার কিছু কমুক, কিন্তু প্রভুত্বের ধার ঠিক থাকুক! উত্তম যারা—তাঁরা এটা প্রাণে-প্রাণে সত্য বলে উপলব্ধি করেন যে, স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার আর দাস-জাতি প্রভু-জাতির মতন মানব-জাতিরই অন্তর্ভুক্ত।

দাস-জাতির মনোভাবকে বিশ্লেষণ করলেও তিন শ্রেণীর লোকের খোঁজ মিল্‌বে—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়।

প্রথম-শ্রেণীর দাস তাঁরাই—যাঁরা মনে করে দাস হ'য়েই তারা জন্মেছে, বিশ্বকর্ম্মা তাদের পড়্‌বার সময়েই তাঁর ফ্যাক্‌টরী থেকে 'দাস' মার্কা দিয়ে দিয়েছেন, দেব-লোকের এই ট্রেড্‌-মার্ক্‌ বদ্‌লাবার ক্ষমতা নর-লোকের মানুষের নাই; তারা জন্ম-দাগী—তাদের এ দাগ এ জন্মে আর মুছবেনা, এ কলঙ্ক এ জীবনে আর ঘুচ্‌বে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর যারা—তারা নিজেদের জন্ম-দাগী মনে করে না। তবে তাদের ধারণা, প্রভু-জাতিকে সৃষ্টি-কর্ত্তা বিশেষ শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন—সে শক্তির অধিকারী হওয়া দাস-জাতির পক্ষে অসম্ভব না হ'লেও বড় শক্ত। এরা স্বভাবতই স্বার্থপর ও আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস-হীন। কাজেই স্বাধিকার পাওয়ার দাবী-দাওয়া ন্যায্য জেনেও প্রভু-জাতির সঙ্গে লড়্‌তে ডরায় প্রাণের মায়ায়, আর স্বার্থ-হানির আশঙ্কায়। এরা স্বাধিকার পেতে চায় আত্ম-শক্তির বলে নয়, প্রভু-ভক্তির ছলে; এরা কাজ হাসিল করতে চায় ফিকির-ফন্দী কিংবা সন্ধির ভিতর দিয়ে।

তারপর তৃতীয়-শ্রেণীর দাস. তাঁরাই যাঁদের কাছে এ সনাতন সত্যটা একেবারে মূর্ত্ত ও জীবন্ত হয়ে প্রকট হয়েছে যে, বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে মানুষে-মানুষে কোনো পার্থক্য থাক্‌তেই পারে না; দুনিয়ার সব মানুষই সমান—চাই তারা কালোই হোক্‌ আর সাদাই হোক্‌। বড় ছোট, ধনী নির্ধন, মনিব গোলাম, প্রভু আর দাস—এ মিথ্যা বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের বিকৃত মনোভাব থেকে। বৈষম্যের এই মিথ্যা মনোভাব সৃষ্টিকে ভেঙ্গে চুরমার করে' তারই ধ্বংসাবশেষের উপর সাম্য ও স্বাধীনতার সত্য সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠা করাই তাদের ধর্ম্ম।

প্রথম-শ্রেণীর দাস আর অধম-প্রভুর মনোভাবের যেমনি মিল আছে, দ্বিতীয়-শ্রেণীর দাস আর মধ্যম-প্রভুর মনোভাবে তেমনি কোনো গরমিল দেখতে পাওয়া যায় না; আবার তৃতীয় শ্রেণীর দাস আর উত্তম-প্রভুর মনোভাবেই দিব্যি সামঞ্জস্য রয়েছে। এখানে একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে যে প্রভু-মনোভাব অধম-প্রভুর জন্ম-দাতা, তার বিকাশ হয় প্রথম-শ্রেণীর দাসের মনোভাবের ভিতর দিয়ে; সুতরাং এই প্রভু-মনোভাবের জন্য বেশীর ভাগ দোষই আরোপ করা যায়. প্রথম-শ্রেণীর দাসের 'পরে। তারপর দাস-জাতির দাসত্ব-মোচন বা স্বাধীনতা-লাভের পক্ষে মধ্যম-প্রভু আর দ্বিতীয় শ্রেণীর দাস—উভয়ই সমান অন্তরায়। স্বাধীনতার সাধনায় প্রথম-শ্রেণীর দাস ও অধম-প্রভুর চেয়ে এরা বিভীষিকার সৃষ্টি করে অনেক বেশী। এরা স্বাধীনতার গুপ্ত শত্রু—কাজেই বড় সাংঘাতিক ও মারাত্মক। মধ্যম-প্রভু নিজের মনকে চোখ ঠারে, আর দ্বিতীয়-শ্রেণীর দাস ঐ ভাবেই কাজ সারে—দুজনেই যখন জেগে' ঘুমায় তখন কার সাধ্য যে তাদের জাগায়? প্রভু-মনোভাবের তীব্র মদিরা পান করে 'অধম' 'মধ্যম' দু'জনাই। তবে অধম-প্রভু একেবারে মাতাল হ'য়ে মাতলামি সুরু করে' দেয়; আর মধ্যম-প্রভু মাতালও হয় না, মাতলামিও করে না সত্য, কিন্তু তা বলে' তিনিও একেবারে প্রকৃতিস্থ থাক্‌তে পারেন না—তাঁরও একটা নেসার ভাব হয়, যাকে মাতাল-তন্ত্রে গোলাপী নেশা বলে। প্রভু-মনোভাবের তীব্র মদিরা প্রভু-জাতির মনে অর্থ-গৃধ্নুতা, পরস্বাপহরণ, দুর্ব্বল দাস-জাতির নিপীড়ন ও শোষণ এবং প্রভুত্ব-প্রসারের লালসার উদ্রেক করে' দেয়। ভারতীর মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধী এই সব মদিরা-মত্ত প্রভুদের এই বলে' সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আজ তক্‌ জগতে কোনো সাম্রাজ্যই প্রভুত্ব ও পরস্বাপহরণের উগ্র সুরা পানে মাতাল হ'য়ে বেশীদিন প্রাণে বাঁচতে পারে নি।

তারপর, তৃতীয়-শ্রেণীর দাস ও উত্তম-প্রভুর প্রসঙ্গে আসা যাক্‌। এ দু'জনার উপর যথাক্রমে দাস-মনোভাব ও প্রভু-মনোভাব কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। তৃতীয় শ্রেণীর দাস যাঁরা, তাঁদের সুস্থ, সবল মন দাস-মনোভাবের দূষিত আব্‌-হাওয়ার মধ্যেও ব্যাধিগ্রস্ত হয় না; প্রতিকূল অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরও তাঁরা নিজের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখাতে পারেন। তবে এঁদের সংখ্যা অতি কম—'কোটিকে-গোটিক'। প্রভু ও দাসের তুলনা-মূলক বিচার এঁদের "তৃতীয়-শ্রেণী"-ভুক্ত করা হ'য়েছে এই জন্যই যে—এঁরা প্রভু-জাতির কোনো কাজেই আসে না, প্রভু-ভক্তি এঁদের মনের

ছায়াও স্পর্শ করতে পারে না, প্রভু-শক্তি যত বলশালী হোক্ না কেন,—এঁদের অজেয় মনকে জয় করতে পারে না। সুতরাং তৃতীয়-শ্রেণীর দাসের যে মনোভাব, সেটা দাস-মনোভাব নয়—তাঁর সুস্থ মন যে সদ্‌ভাবের প্রভাবে পরিচালিত, সেইটি স্বাধীন-মনোভাব বা ফ্রি-মেন্‌টালিটি। এখানে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে, তা' হ'লে 'এঁদের কেন দাসের পর্য্যায়-ভুক্ত করা হয়েছে। কথা হল এই—এঁরা নিজেরা বস্তুতই স্বাধীন, তবে ব্যক্তিগত-ভাবে স্বাধীন হ'লেও জাতিগত-ভাবে পরাধীন। ব্যষ্টি-হিসাবে স্বাধীন হয়ে যাঁরা তুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ করতে পারেন না, তাঁদের আদর্শ—বৃহত্তর স্বাধীনতা, সমষ্টির মুক্তি। সুতরাং বন্দিনী স্বদেশ-জননীকে দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ না করা পর্য্যন্ত তাঁরাও পরাধীন-দাস বলে গণ্য।

এখন উত্তম-প্রভুর মনোভাবের কথা। উত্তম-প্রভু যাঁরা, তাঁরা দাস-মনোভাবের দূষিত আব্‌-হাওয়া কিংবা প্রভু মনোভাবের কলুষিত প্রতিবেশ প্রভাবের (environments এর) মধ্যে থেকেও স্বাধীন-জাতির প্রকৃতিগত স্বাধীন-মনোভাবকে অবিকৃত রাখ্‌তে পারেন। এঁরাই স্বাধীনতার সত্য আদর্শের অনুবর্ত্তন করে' স্বাধীন-জাতির মহিমামণ্ডিত অতীত-ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। তবে এঁদের সংখ্যা এত কম যে, সেটা 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম'। বস্তুত-পক্ষে উত্তম-প্রভুদের প্রভু-জাতির অন্তর্ভুক্ত করে' 'প্রভু' নাম দেওয়া আর অপনামে (misnomer) অভিহিত করা একই কথা। তবে স্বজাতির অপকর্ম্মের সহকর্ম্মী বা সহায়ক না হলেও অপযশের অংশী না হয়ে তাঁদের নিস্তার নাই। তার কারণ, স্বদেশ-প্রাণ, স্বজাতি-বৎসল যাঁরা, তাঁদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই স্বদেশ ও স্বজাতির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নয়! এই যে মুক্ত-মনের অধিকারী স্বাধীনতার ভক্ত পূজারী—এঁরাই ত জাতীয় স্বাধীনতার ছায়া-শীতল, প্রশস্ত রাজ-পথ দিয়ে সার্ব্বভৌমিক স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হন—মহা-মানবতার পুণ্য তীর্থে শুভ যাত্রা করেন।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়।

অভিমানে

যে পথ-পানে চাইবনা আর
করেছিলাম পণ—
(এখন) চম্‌কে দেখি সেই পথেতেই
আকুল দু'নয়ন।
ভেবেছিলাম নিবিড় রাতে
তার রবনা অপেক্ষাতে,
অভিমানের দুরন্তরে
করব আমন্ত্রণ।
আমার, পথ চাওয়া এই চোখের তরে
রইল না সে পণ!

'আমার' কথা ভাবতে বসে'
গভীর অভিমানে,
তা'র কথাতেই সব ভরা যে
তাকিয়ে দেখি প্রাণে!
ভাব্‌তে গেলেই চোখের আগে
সেই অজানার রূপ যে জাগে,
হায়, এখানে ভালবাসার
মরম যে না জানে!
সেই বলে গো তার কথাটি
ভুল্‌তে অভিমানে!

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

দত্তগিন্নী

৩

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রামের পণ্ডিত। তাঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডিত্যের জোরে বেশ কিছু ব্রহ্মোত্তর হস্তগত করিয়া বংশধরদের জন্য রাখিয়া যান। বংশলোচন ভট্টাচার্য্য তাঁহার সপ্তম বংশধর। তাঁহার সেই উর্দ্ধতন পূর্ব্ব-পুরুষের মতই বংশলোচন গ্রামের লোককে পাঁজি দেখিয়া ব্যবস্থা দেন, ধর্ম্মাধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করেন এবং আশে-পাশে চতুর্ব্বিংশতি গ্রামে পণ্ডিত বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। তবে সাত পুরুষে পাণ্ডিত্য অনেকটা জলীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। বংশলোচন ব্যাকরণ-শাস্ত্রে যৎকিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া রঘুবংশের এক সর্গ সমাপ্ত করিয়াই স্মৃতি পড়িবার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ যাত্রা করেন; সেখানে রঘুনন্দনের উদ্বাহ-তত্ত্ব ও শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেক পড়িতে আরম্ভ করেন। মাসখানেক ব্যর্থ পরিশ্রমের পর তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে বিদায় করেন।

বংশলোচন অবিলম্বে দেশে না ফিরিয়া কাশী যান এবং সেখানে বৎসর খানেক কাটাইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গ্রামের লোকে তাঁহাকে একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া জানে, নবদ্বীপ ও কাশীতে তাঁহার প্রতিভাব প্রকাশ সম্বন্ধে নানারূপ কথা গ্রামে চলিত ছিল।

বংশলোচন এখন বৃদ্ধ। যে কিছু বিদ্যা তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা এতদিনে নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু গ্রাম্য শাস্ত্রে তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল। তিনি যে সকল ব্যবস্থা দিতেন, তাহা যদিচ প্রায়ই শূলপাণি বা রঘুনন্দনের অনুমত হইত না, তথাপি গ্রামের লোক তাহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মতের চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধার সহিত পালন করিত!

ইহা ছাড়া ভট্টাচার্য্য বেশ সঙ্গতিপন্ন ও রীতিমত বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। মামলা-মোকদ্দমায় ও গ্রামিক ঘোঁট পাকানোয় তাঁহার সমান পারদর্শিতা ছিল। সকল বিষয়েই তিনি গ্রামের একজন মাতব্বর। কাজেই তাঁহার বৈঠকখানা প্রায়ই নানারকম লোকজনে সর্ব্বক্ষণ বোঝাই থাকিত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৈঠকখানা একখানা টিনের আট-চালায়, তার পৈঠা বাঁধানো এবং মেজে সিমেণ্ট করা। ঘর খানার ঠিক মধ্যে বিস্তৃত ফরাশ, তাহার উপর ময়লা চাদর বিছানো। সেই ফরাশের কেন্দ্র-স্থলে ছোট একখানা সাধারণ মির্জ্জাপুরী গালিচা পাতা। সেই গালিচার উপর ঠাকুর মহাশয়ের আসন। তার চারিদিকে—অর্থাৎ গালিচার বাহিরে তাঁহার পারিষদবর্গ। তক্তাপোষের বাহিরে চ্যাটাই ফেলিয়া গ্রামের মুসলমান ও মাঝি মালা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রজা।

দত্ত মহাশয় আসিতেই ভট্টাচার্য্য সমস্ত মুখ বিস্ফারিত করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "এই যে দত্ত ভায়া, ভাল সময়ে এসে পড়েছ।"

তাঁহার কথার ইঙ্গিত বুঝিয়া সকলেই মৃদু হাস্য করিল। দত্তজা কিছুই না বুঝিয়া সে কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, "হাঁ, এসে পড়লাম, প্রজারা সব জোট করেছে, খাজনা দেবে না। কি আর করবো বসে' থেকে!"

বলিতে বলিতে ফরাশের উপর হাত বাড়াইয়া দত্তজা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত সদয়ভাবে এক পা বাড়াইয়া দিলেন। তাঁর এক পাশে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বসিয়াছিলেন, দত্তজা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তারপর আর কোন কথা-বার্ত্তা না বলিয়া ঝাঁ করিয়া গুপী দত্তের হাত হইতে হুঁকাটা এক রকম ছিনাইয়া লইয়া একটা থামের আড়ালে গিয়া ভট্টাচার্য্যের দিকে পিছন ফিরিয়া প্রাণপণে টানিতে লাগিল।

এই কার্য্য সমাধা করিয়া আসন গ্রহণ করিলে ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "শুনেছ ভায়া, তোমার গোপাল ভাণ্ডারীর কাণ্ড খানা। তার যন্ত্রণায় তো লোকে গ্রামে টিঁকতে না পারার দাখিল!"

শরৎ দত্তের বুকের ভিতরটা গোপাল ভাণ্ডারীর নামে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আজ এই প্রকাশ্য সভায় কি ভট্টাচার্য্য

গোপাল ভাণ্ডারীর সঙ্গে দত্তগিন্নীর প্রণয়-কাহিনী বলিয়া বসিবেন না কি ?

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কাল সন্ধ্যা বেলায় রামজয় মালীর বউ পুকুরে জল আনতে গিয়েছিল, ও বেটা নাকি তাকে বে-ইজ্জত করবার চেষ্টা করে। করিম মণ্ডল আর কাঞ্চি সেখ সেখান দিয়ে হঠাৎ যাচ্ছিল, তাই রক্ষা হলো। কি বল করিম ?"

চ্যাটাইয়ের উপর বসিয়া করিম তাম্রকূটানন্দ উপভোগ করিতেছিল। দাও-কাটা তামাকের উগ্র ধোঁয়ার ঝাঁঝে মুখখানা লাল করিয়া সে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, কর্ত্তা। আমরা দেখি যে ভালো মানুষের বেটীর কি নাকাল! কাঞ্চি ভাই তখনি গিয়ে তার পিঠের উপর পড়ে পিছমোড়া দিয়ে ধরলো, আর আমি মেয়েটাকে নিয়ে গেলাম।"

ফরাশের কোণায় বসিয়াছিল নটবর দাস,—স্বল্পভাষী লোক, কিন্তু নানারসে রসিক। সে একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "কোথায় ?"

সকলে হাসিয়া উঠিল। করিম মণ্ডল মুখ লাল করিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, এমন কথা কইবেন না। আমি তেমন মানুষ না। হাঁ।"

নটবর। ভাল রে ভাল, আমি বল্লাম কি ? বলে, ঠাকুর-ঘরে কে রে ? না, আমি কলা খাই না !"

আবার হাসির গর্‌রা পড়িয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আরে রও নটবর, তোমার বাঁদরামি রাখো। ভাণ্ডারীর পোর তো কেবল এই এক কীর্ত্তি নয়, আরও কত কীর্ত্তিই তো আছে। রোজ রোজ যে রকম উৎপাত আরম্ভ করেছে, তাতে গ্রামে বাস করা অসহ্য হয়ে উঠবে। এর একটা প্রতিকার চাই।"

শরৎ দত্ত বড় গলায় বলিল, "আপনি ঐ সব কথায় বিশ্বাস করেন ? গরীবের ছেলে নিজের চেষ্টার দু পয়সা করেছে দেখে লোকের চোখ টাটায়, তাই অমন কথা বলে। গোপাল মিত্তির সে রকমেরই নয়। আমি তো তার সঙ্গে হামেসা মিশছি, কারবার করছি,—অমন সৎস্বভাবের ছেলে আজ-কাল হয় না।"

ভট্টাচার্য্য। অবাক করলে দত্তজা! নবীন ভাণ্ডারীর ছেলে গোপলাকে অবশেষে তুমিও মিত্তির বলতে আরম্ভ করলে যে! কালে কালে কতই শুনবো! কোন্‌দিন দেখবো তুমিই শরৎ বান্দুরজী হয়ে উঠেছ!

দত্ত মহাশয়। আজ্ঞে না, আমি ওর ফুরসী-নামা দেখেছি, ওরা ফুলতলার মিত্তিরদের জ্ঞাতি। ওর ঠাকুরদা ঝগড়া করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে সান্ন্যাল-বাড়ীতে ভাণ্ডারী-গিরী করে।

ভট্টাচার্য্য। একবার ফুলতলার মিত্তিরদের কাছে ঐ কথা বলো দিকিনি, তারা কি বলে।

দত্ত। আমি কি তাদের সঙ্গে কথা না কয়েই বলছি। এই তো পরশুদিন ফুলতলা গিয়েছিলাম। নবীন ভাণ্ডারীর বাপ যে ফুলতলা থেকে পালিয়ে এসেছিল, তা' তারা স্বীকার করে, কিন্তু তারা তাকে জ্ঞাতি বলে মানতে চায় না।

ভট্টাচার্য্য। আর তোমার এই মিত্তির মশায়ের ঠাকুরদাদা বিয়ে করেছিলেন কোন্ কুলীন-সমাজে ? ত্রিপুরা দিদিকে তো সেদিনও আমাদের বাড়া বাসন মাজতে দেখেছি। তার বাপেরা যে চৌদ্দপুরুষ আমাদের বাড়ী ভাণ্ডারী-গিরী করেছে। তার পর নবীন ভাণ্ডারীর মাগ, তাকে তো গোবিন্দপুরের চৌধুরী-বাড়ী থেকে কিনে এনেছে, তার বাপেরা চৌধুরী বাড়ীর চৌদ্দপুরুষের গোলাম। সেই কুলীন-বংশে জন্মালেন কি না গোপাল মিত্তির!

দত্ত। ঠাকুর মশায়ের ঐ তো রোগ! আমি কাগজ-পত্তর দেখে বলছি, আর আপনি যা খুসী তাই বলে আমার কথা ভাসিয়ে দিলেই হবে! ফুলতলার মিত্তিরদের আদিপুরুষ—

ভট্টাচার্য্য। রাখো তোমার আদিপুরুষ। পাঁচশো ফুরসী-নামা হাজির করলে আমার চোখের নজীর ভুলতে পারবো না। ত্রিপুরা দিদির নাতি নবীন ভাণ্ডারীর ছেলেকে তুমি মিত্তির মশায় বলে' মাথায় রাখ, আমি যে এদের তিন পুরুষ দেখে আসছি, আমার কাছে ও সব চলবে কেন!

নটবর দাস এমন সময় বলিল, "আজ্ঞে দত্ত মশায় ঠিক বলেছেন। গোপালের ঠাকুরদাদার বাপ ফুলতলায় মিত্তির-দের জ্ঞাতি।"

দত্ত মহাশয় বুক সোজা করিয়া বলিলেন, "ঐ শুনুন। নটবর কখনও বাজে কথা কয় না। বলতো ভাই, তুমি তো ফুলতলার কুটুম্ব।"

নটবর বলিল, "যা' বলেছি সত্যি, তবে—"

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন, "তবে কি নটবর?"

নট। তবে তার মা ছিল তাঁতির মেয়ে আর তার বাপ-মার বিয়ে হয়নি।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শরৎ দত্ত তাহাতে মাথা নীচু করিল না। সে আরও তেজের সহিত তর্ক করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিল যে গোপাল ভাণ্ডারী সদ্বংশজাত, সে সচ্চরিত্র ও বিনয়ী এবং গ্রামের লোক অযথা তাহাকে হিংসা করে। বিশেষ করিয়া শক্তি ও বুদ্ধিতে কেহ তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই সকলে তাহাকে খাটো করিতে চায় ইত্যাদি।

এই তর্কে তার ঝাঁজ যতই বাড়িতে লাগিল, ততই চারিদিকের চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। প্রত্যেকের হাসি শরৎ দত্তের গায় ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল! যতই সে ইহাদের হাসির ভিতরকার শ্লেষটা উপলব্ধি করিতে লাগিল ততই তাহার রক্ত গরম হইতে থাকিল। সে প্রাণপণ করিয়া গোপাল ভাণ্ডারীর পক্ষে সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর মত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গ-ক্রমে সে রামজয় মালীর বউ প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোককে মুক্ত কণ্ঠে কুলটা বলিয়া প্রচার করিয়া বসিল, করিম ও কাঞ্চিকে এক নম্বরের ফেরেববাজ ও কুচরিত্র বলিয়া প্রকাশ করিল, এক কথায় গ্রামবাসী কাহারও চরিত্রে কালিমা লেপন করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

নটবর দাস মাঝে মাঝে ফোড়ন দিতে লাগিল, আর সকলে মজাটা বেশ উপভোগ করিল।

এমন সময় হঠাৎ সেখানে গোপাল ভাণ্ডারী আসিয়া উপস্থিত হইতে কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। গোপাল দত্ত-মহাশয়কে ডাকিয়া বলিল, "দত্ত মশায়, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

দত্ত মহাশয় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি কথা গোপাল?"

—"সান্ন্যাল মশায় আপনাকে বলতে বলেছেন। পাকদিঘির প্রজারা যে জোট করেছে, সেই সম্বন্ধে তিনি আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করছিলেন। তা' আপনার সঙ্গে কথা না বল্লে তো সে সম্বন্ধে কিছু ঠিক করা যাচ্ছে না।"

—"হাঁ চল, চল," বলিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দত্ত মহাশয় গোপালের সঙ্গে বাড়ী চলিলেন। তাহারা চক্ষের অন্তরাল হইবামাত্র সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "হাসির কথা নয়। বেটাকে জব্দ না করলে ভদ্রলোকের পক্ষে গ্রামে বাস করা কঠিন।"

অথচ গোপালকে জব্দ করার কথা মুখে বলা যত সহজ, কাজে যে তত সহজ নয় তাহা সবাই জানিতেন। বাহুবলে সে অজেয়,—দুষ্ট বুদ্ধিতে সে স্বয়ং বৃহস্পতি, আর তার সহায় প্রবল-প্রতাপান্বিত সান্ন্যাল মহাশয়।

৪

দত্ত মহাশয়ের বাড়ীর পরামর্শ-সভা বসিল,—বৈঠকখানায় নয়, দত্তজার শয়ন গৃহে। এ প্রস্তাব করিল গোপাল ভাণ্ডারী। দত্ত মহাশয়ের মনটা ইহাতে একটু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি একবাক্যে সম্মত হইলেন।

পরামর্শ করিবার বিশেষ কিছু ছিল না। গোপাল দুই কথায় তাহার অভিপ্রায় জানাইল, আর দত্ত মহাশয় তাহাতে সায় দিয়া গেলেন। পরামর্শ শেষ হইলে গোপাল বলিল, "আপনি বাড়ী ফিরেই হঠাৎ না বলে না কয়ে কোথায় চলে গেলেন, তাই বৌ-ঠাকরুণ আমাকে ডেকে বললেন আপনাকে খুঁজে আনতে। আমি গিয়ে দেখি, আপনি ভীমরুলের চাকে খোঁচা মেরে বসে' আছেন। তাই আপনাকে উঠিয়ে আনলাম।"

এই বলিয়া গোপাল সোজা রান্নাঘরের দিকে চলিল। সেখানে গিয়া সে কৃপাময়ীকে ডাকিয়া বলিল, "বৌ-ঠাকরুণ তোমার আসামী হাজির করে দিলাম; এখন কি বকশিশ দেবে দাও,—" বলিয়া রান্নাঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিল।

দত্ত মহাশয় এক মুহূর্ত্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেদিকে চাহিলেন। কি বেহায়া এই দুইটা! এতদিন কখনও ইহারা একেবারে দত্ত মহাশয়ের চক্ষের উপর একটা

মেশা-মেশি করিতে সাহস করে নাই। আজ বড় বেশী রকম সাহস! দত্ত মহাশয়ের কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি জানাজানি হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে বলিয়া মনে হইল। এতটা বরদাস্ত করিতে দত্ত মহাশয়ের ইচ্ছা হইল না। কিন্তু উপায় কি? তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া বাহির-বাড়ীর দিকে চলিলেন, যেন কিছুই দেখেন নাই, এমনি ভাবখানা!

কিন্তু রান্নাঘর হইতে বড় হাসির শব্দ আসিতে লাগিল। কৃপাময়ী ও গোপাল বড় আনন্দ করিতেছে বলিয়া মনে হইল—দত্তজার মনের ভিতর বড় বিঁধিল। একটু ভাবিয়া তিনি একটা বুদ্ধি ঠাওরাইয়া রান্নাঘরের দিকে খুব কাশির শব্দ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। তার পর দরজার কাছাকাছি আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "গোপাল ভায়া, স্নান করতে যাবে না? চল না, আজ নদীতে ডুব দিয়ে আসি।"

এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, কৃপাময়ীর সঙ্গে গোপালের এখনকার আলাপটা বন্ধ করা তাহাতে কোন পরমার্থ লাভ হইবে, এমন কথা দত্তজার মনে হয় নাই, কিন্তু এই দুজনকার এখনকার সম্ভাষণটা কি জানি কেন তাঁর মনের ভিতর কাঁটার মত বিঁধিয়া বসিয়াছিল। এই উপস্থিত বেদনা দূর করিবার জন্য দত্ত মহাশয় এই উপায় স্থির করিয়াছিলেন।

—"পোড়ারমুখো আবার মরতে এসেছে," অস্পষ্ট স্বরে এই কথা আবৃত্তি করিয়া কৃপাময়ী বলিল, "না, গোপাল এখন একেবারে খেয়ে যাবে। তুমি যাও, তাড়াতাড়ি নদীতে ডুব দিয়ে এসো গিয়ে। রান্না হয়ে গেছে।"

দত্ত মহাশয়ের বুকে এ কথায় যেন বিষের ছুরি বসিয়া গেল। নদীতে স্নান করিতে যাওয়ার মানে প্রায় আধঘণ্টার ফের। এ প্রস্তাবের মধ্যে কুচক্রান্তটা দত্তজার চক্ষে ধরা পড়িল।

ভারি বিষণ্ণ মনে দত্ত মহাশয় ঘরে গিয়া বিছানার উপর হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে গোপালের হাত ধরিয়া কৃপাময়ী সেই ঘরের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল। দত্ত মহাশয়কে সেখানে শয়ান দেখিয়া তাহারা চমকাইয়া উঠিল, ততোধিক চমকাইয়া উঠিলেন দত্ত মহাশয়।

চট করিয়া গোপালের হাত ছাড়িয়া দিয়া দত্ত-গিন্নী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "এখনো পড়ে রয়েছ! স্নান করতে যাবে কখন?"

"এই যাচ্ছি" বলিয়া ত্রস্তে ব্যস্তে উঠিয়া দত্ত মহাশয় মাথায় তৈল ঠাসিতে ঠাসিতে দূরবর্ত্তী নদীর ঘাটের দিকে চলিলেন,—বড় বিষণ্ণ মনে চলিলেন।

কৃপাময়ীর স্বভাব-চরিত্র যে ভাল নয় তাহা তিনি অনেকদিন হইতে জানেন। কিন্তু এতদিন সে কথাটা কৃপাময়ী যে যত্ন করিয়া তাঁহার কাছে গোপন করিত, তাতে তাঁর একটু এই আত্মপ্রসাদ ছিল যে, স্ত্রী অন্ততঃ তাঁকে এইটুকু খাতির করে। আজ হঠাৎ এরা এ কি আরম্ভ করিল? লুকাচুরির পরদাটুকুও যে রাখিল না! এখন তাঁহাকেই চক্ষু বুজিয়া না দেখিবার ভাণ করিয়া ইজ্জত বজায় রাখিতে হইবে।

বিষণ্ণ মনে নদীর ঘাটে যাইতে যাইতে পথে তাঁহার বাল্যবন্ধু কানাই নাপিতের সঙ্গে দেখা হইল। কানাই এখন সান্যাল-বাড়ীর হাপ্ গোমস্তা, হাপ পাইকের কাজ করে, আর অবসর-সময়ে ক্ষুর ও কাঁচি লইয়া পৈতৃক যজমানদের ঘরগুলি বজায় রাখে। রীতিমত ব্যবসা করে তার ভাই।

কানাইয়ের সঙ্গে দত্তজার শৈশবে অভিন্ন-হৃদয় সৌহার্দ্দ্য ছিল। দত্তজা কায়স্থ এবং ভদ্রলোক, কানাই নাপিত এবং ছোট লোক, এ ভেদ পাড়া-গাঁয়ে ছেলে বেলায় ছিল না। ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত তাহারা এই রকম একেবারে সম্পূর্ণ একাত্মভাবে মানুষ হইয়াছিল। তাহাদের দুইজনের শিক্ষাও প্রায় সমান, কারণ দত্তজা ও কানাই গ্রামের স্কুলে ছাত্রবৃত্তি ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, দুজনেই পরীক্ষা দিয়াছিল। দত্তজা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কানাই পারে নাই। তাহার পর দত্তজার পিতার মৃত্যুতে তাঁহাকে বিষয়-কর্ম্ম দেখিতে হইল; কানাইকে চাকরী ও ব্যবসা করিতে হইল, কাজেই বিদ্যা আর কাহারও বাড়িল না।

ক্রমে অবস্থা-ভেদে দুই জনে অনেকটা তফাৎ হইয়া গেল। এখন দত্তজা যেখানে ফরাসে বসেন, কানাই সেখানে চাটাই পাড়িয়া বসে। কানাই শরৎ দত্তর পায়ের ধূলাও লয়, সমীহ করিয়া কথাও বলে। তবু আজ পর্য্যন্ত সেই আবাল্য-সৌহার্দ্দ্যের কিছু অবশিষ্ট আছে।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে কানাইয়ের বিবাহ হয়। নাপিতের ঘরে বিবাহ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, কাজেই সুযোগ-মত একটি মেয়ে যদি বিনা-পয়সায় বা অল্প পয়সায় পাওয়া যায়, তবে তাহাকে হাত-ছাড়া করা যুক্তি-যুক্ত নয়। এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। কানাইয়ের শাশুড়ী বিধবা হইয়া বিপন্ন ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছিল। সাত বছরের মেয়ে লইয়া তাহার দাঁড়াইবার ঠাঁই ছিল না। কানাইয়ের পিতা তাহার মেয়েটির সঙ্গে কানাইয়ের বিবাহ দিয়া বিধবাকে ঘরে রাখিল। তাহার নিজের গৃহ শূন্য হইয়াছিল; পয়সা খরচ করিয়া বিবাহ করিবার তাহার অবস্থা ছিল না। বিশেষতঃ কানাইয়ের শাশুড়ী সুন্দরী ও গুণবতী। সুতরাং এই বিধবা নামে বিধবা থাকিয়াও কানাইয়ের বিমাতার স্থলবর্ত্তী হইল। বলা বাহুল্য, সমাজে এজন্য কানাইয়ের পিতা বা বিধবা নিন্দার্হ হইল না।

কানাই যখন বিবাহ করিল, তখন সে তার স্ত্রীর কথা বলিত শরৎ দত্তের কাছে—সঙ্গে সঙ্গে তার শাশুড়ীর কথাও বলিত। শরৎ দত্তের বিবাহ হইল ইহার বৎসর খানেক পরে, তখন সেও তার স্ত্রীর কথা গল্প করিত কানাই নাপিতের সঙ্গে। এই সব গোপন বিষয় লইয়া আলাপ বয়সের সঙ্গে কমিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু—তবু এই দুই জনের মধ্যে যতটা মন খুলিয়া কথা-বলাবলি হইত, তেমন আর কাহারও সঙ্গে হইত না।

শরৎ দত্তকে দেখিয়া কানাই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। শরৎ দত্ত বলিলেন, "কি রে কানাই, রায়গঞ্জ থেকে কবে এলি?"

"এই এলাম। আপনার মুখখানা এত ভার কেন দত্ত মশায়? বৌ-ঠাকরুণ কি কিছু বকুনি দিয়েছেন না কি?"

"হাঁ,—না,—তা ঠিক নয়।"

"হাঁ তা ঠিক নয়টা কি রকম হ'ল, বুঝলাম না।"

"সবই তো জানিস কানাই যে দজ্জাল স্ত্রী নিয়ে আমায় ঘর করতে হয়!"

"তা আর জানি না? তোমার স্ত্রী কি গোড়ায় আমার স্ত্রীর চেয়ে বেশী দজ্জাল ছিল? তুমি তাকে আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে দিয়েছ, তাই সে অমন করে। মেয়েমানুষ জাত, তাকে যেখানে রাখবে সেইখানেই শিকড় গেড়ে বসবে। মাথায় একবার চড়ালে সেখান থেকে তাকে নামায় কে! দেখ দেখি আমার পরিবারকে! আমি সাত চড় মারলেও তবু মুখে রা'টি শুনবে না।"

"তা দেখেছি। সে তোর বরাত রে ভাই, আর এই আমার বরাত।"

"বরাত নয় দাদা, আমার বেত। বিয়ের পর কয়েক দিন মাগী বড় তিড়িং তিড়িং করতে লেগেছিল। তার মা আমার বাবাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাত, তাই দেখে দেখে মাগী শিখতো, আমার সঙ্গে সেই চাল ছাড়তো। আমি যাই একদিন চটাং চটাং বেত কষিয়ে দিলাম, সেই থেকে দুরস্ত হয়ে গেল। মেয়েমানুষকে শাসনে রাখতে হয়।"

"ও সব তোরা পারিস। নাপিতের ছেলে, পরিবারের গায়ে হাত তুললে লোকে কিছু বলবে না। আমরা তা করতে গেলে যে কেলেঙ্কারী হবে।" (বলা বাহুল্য কেলেঙ্কারীর চেয়ে শক্তির অভাব কথাটাই দত্তজা বেশী ভাবিতেছিলেন।)

"কেন? ওই নরহরি দাস যে উঠতে বসতে তার বউকে গুঁতুচ্ছে, তাতে তার কোন্ কলঙ্কটা হয়েছে আর জাতই বা কই গেল! তা' আমিই কি আর দিন-রাত বউকে পিটছি। ভর-জন্মে বড় জোর তিন দিন মেরেছি, তাও দুদিন কেবল চড়টা থাবড়াটা। মারই খালি আসল কথা নয়। কোন-কিছুতেই আস্কারা দিতে নেই। সব বিষয়েই দাপটে রাখতে হয়! ধমকের মুখে রাখলে ওরা ভয় করতে শেখে। ভয় যদি না থাকে, তবে একেবারে ঘাড়ে চড়ে' বসে।"

তার পর দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ বসিয়া সলা-পরামর্শ হইল। দত্ত মহাশয় অবশ্য তাহার কাছে প্রকাশ করিলেন না যে তাঁহার স্ত্রী অসতী, যদিও সেটা কানাইয়ের আগে হইতে জানা ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে যে মারামারিতে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, এ লজ্জার কথাটাও তিনি স্বীকার করিলেন না। ভয়কে করুণা ও ভদ্রস্থতার আবরণে ঢাকিয়া তিনি নাপিত বন্ধুর উপদেশ শুনিলেন। ফল কথা, স্নান করিয়া ঘরে ফিরিবার সময় তিনি মন স্থির করিয়া ফিরিলেন যে, আর স্ত্রীকে কোন বিষয়ে আস্কারা দিবেন না।

একে তো নদী অনেকদূর। তার পর আবার কানাইয়ের সঙ্গে মন্ত্রণায় দত্তজা অনেকটা সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, তাই তাঁর বাড়ী ফিরিতে অনেকটা দেরী হইল। বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলেন, দত্ত-গিন্নী চাদর মুড়ি দিয়া বিছানায় ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। গোপাল বাড়ী গিয়াছে।

বন্ধুর উপদেশ স্মরণ হইল। এখনি স্ত্রীকে ডাকিয়া ধমকাধমকি করিয়া তাহার দ্বারা ভাত বাড়াইয়া লওয়া আবশ্যক মনে হইল, কিন্তু সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দত্তজা স্থির করিলেন, হঠাৎ কোন কাজ না করিয়া একটু পর্য্যবেক্ষণ করা দরকার।

রান্নাঘরে গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, হাঁড়িকুড়ি সব পরিষ্কার হইয়া গেছে। ঘরের এক কোণে দুই খানা এঁটো থালা রহিয়াছে। আর মধ্যস্থলে আসন করিয়া সামনে একথালা ভাত বাড়া ও ঢাকা রহিয়াছে। ইহা হইতে স্বরূপ সিদ্ধান্ত করিতে দত্ত মহাশয়ের Sherlock Holmesএর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল না। তিনি বুঝিলেন, গৃহিণী গোপালকে খাওয়াইয়া এবং নিজে খাইয়া পাক সারিয়া দত্ত মহাশয়ের জন্য ভাত বাড়িয়া রাখিয়া নিদ্রা গিয়াছেন। এ অবস্থায় নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইবে। কাজেই তাঁহার শাসন-প্রচেষ্টা স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গের কাল পর্য্যন্ত মুলতবী রাখিয়া তিনি আহারে বসিলেন। খাইয়া দাইয়া শুইবার ঘরে নিঃশব্দ পদ-বিক্ষেপে প্রবেশ করিয়া পাণ ও তামাকের যোগাড় করিয়া শেষে নিঃশব্দেই গিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সঙ্কলন

পাক-রহস্য

আমাদের দেশের সামাজিক নিয়মানুসারে এবং অবরোধ-প্রথা প্রচলিত থাকায় পূর্ব্বাপর হইতে মহিলারা পাক-কার্য্য করিয়া আসিতেছেন ; বোধ হয়, ইহার কারণ এই যে পুরুষেরা অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজে বাহিরে নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া স্ত্রীলোকেরাই বাড়ীতে পাকের কার্য্য করিতেন। ইহার অন্য কারণ থাকাও বিচিত্র নহে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের অপেক্ষা ধৈর্য্যশীলা বলিয়া হয় তো পাক-কার্য্য তাঁহাদেরই অধিকারভুক্ত ছিল।

পাকে মসলা নির্ব্বাচন,—আদিম যুগে সিদ্ধ এবং পোড়া এই দুই রকম পাক ছিল। বেদে পিষ্টকাদির উল্লেখ আছে (অপূপ)। মসলা প্রভৃতির ব্যবহার ক্রমে প্রচলিত হইয়াছিল। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার, ধুবড়ী প্রভৃতি স্থানে "প্যালকা" বালয়া একরূপ ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয়। ইহাও আদিম যুগের পাক। "পাটের কচিপাতা" বা "লাফার শাক" কলার ক্ষার ছাঁকিয়া লইয়া সিদ্ধ করিয়া পাক হয়। ইহাতে তৈল বা হরিদ্রা ব্যবহৃত হয় না। এ পাকেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায়। ক্ষারের সহিত হরিদ্রা যোগ হইলে লাল রং হয় এবং তৈল মিশ্রিত হইলে সাবানের পাক হয়। বোধ হয় সেই জন্য "প্যাল্কা" পাকে তৈল এবং হরিদ্রা ব্যবহৃত হয় না।

মসলা নির্ব্বাচন কিরূপ বিজ্ঞান-সম্মত, তাহার দুই একটি উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। কাঁচা কলাইএর দাইল শ্লেষ্মা-বর্দ্ধক; আদা এবং মৌরী শ্লেষ্মা-নিবারক। সেই জন্য কাঁচা কলাইয়ের সহিত আদা এবং মৌরী ব্যবহৃত হয়। অথচ আদা মৌরী দিয়া কলাইয়ের দাইল পাক করিলে অতি সুখাদ্য হয়। "বোয়াল" মাছ শ্লেষ্মা-বর্দ্ধক; কিন্তু ইহাকে মৌরী দিয়া পাক করিলে অখাদ্য হয়। অথচ শ্লেষ্মার প্রতিষেধক কোন মসলা দিয়া পাক না করিলে স্বাস্থ্য-হানি হইবার সম্ভাবনা, সেইজন্য কালজিরা বাটা দিয়া বোয়াল মাছ পাক করা

হইয়া থাকে। কালজিরা শ্লেষ্মা-নিবারক এবং ইহা দ্বারা পাক করিলে বোয়াল মাছ সুখাদ্য হয়। আমাদের দেশের প্রত্যেক ব্যঞ্জন পাকেরই এইরূপ ব্যবস্থা আছে, যাহাতে উপযুক্ত মস্‌লা সংযোগে ঐ ব্যঞ্জনাদির উপকরণের দোষ নষ্ট করা হয় এবং ব্যঞ্জনাদিকে সুখাদ্যে পরিণত করা হয়। মস্‌লা মাত্রেই হজমী। কিন্তু সমস্ত ব্যঞ্জনে সমস্ত মস্‌লা দিলে ব্যঞ্জন সুখাদ্য হয় না, সেইজন্য ব্যঞ্জন-পাকে মস্‌লা নির্ব্বাচনের জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

নানাবিধ আহারের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করে; এই জন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, একজন অভিজ্ঞ বৈদ্যকে পাকশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা বিধেয়। আমাদের দেশে এই পাক-কার্য্যকে এখন হেয় কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। আমাদের বেশ-বিন্যাসাদির পারিপাট্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু আহারাদির উপকরণ সেই অনুপাতে হ্রাস করা হইয়াছে। আহার-কার্য্যটি কোনরূপে শেষ হইলেই হইল। ইহার উপর আবার সাংসারিক সমস্ত অশান্তিকর ব্যাপারের আলোচনা আহারের সময়ই হইয়া থাকে। ইহাতে মন তিক্ত হয় এবং সেই জন্য ভুক্ত দ্রব্য ভাল পরিপাক হয় না। শাস্ত্রকার বলেন, অন্নকে পূজা করিয়া গ্রহণ করিবে। অপূজিত অন্নগ্রহণে বল-বীর্য্য নষ্ট হয়।

পাক-কার্য্য হীন কার্য্য নহে। ইহা একটা সাধনা। ধৈর্য্যশীলতা, আলস্যহীনতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি গুণের বিকাশ ইহা হইতে হইয়া থাকে। পরসেবা, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি গুণ ইহার গৌণ ফল। যাহাতে চরিত্রের এতগুলি মহৎ গুণের বিকাশ হয়, তাহাকে হেয় কার্য্য বলা যাইতে পারে না।

শিক্ষিতা মহিলারা পাকশালাকে চিত্রশালায় পরিণত করিতে পারেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের পাকশালা দেখিলে তাহাতে প্রবেশ করিতে কাহারও ইচ্ছা যায় না। পাকশালায় নানাবিধ সুদৃশ্য "সিকা" ঝুলাইয়া রাখা উচিত এবং পাক করিবার পরে গরম জল ও ক্ষার একত্র করিয়া পাক পাত্র ধুইয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া ঐ সিকায় তুলিয়া রাখা উচিত।

অপচয়-নিবারণ,—আজকাল প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যই যেরূপ দুর্ম্মূল্য, তাহাতে পাকঘরে কোন দ্রব্যেরই যাহাতে অপচয় না হয় সে বিষয় গৃহিণীদের খর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অনেক বাড়ীতেই দেখা যায়, রাত্রের ভাত তরকারী প্রভৃতি উদ্বর্ত্ত হইলে পরদিন প্রাতে সেই সমস্ত ফেলিয়া দেওয়া হয়। একটু চেষ্টা করিলেই এই সমস্ত দ্রব্যাদি পরদিন ব্যবহার করা যাইতে পারে। অতিরিক্ত ব্যঞ্জনাদি একটি গামলায় জল দিয়া জ্বলন্ত উনুনের উপর রাখিয়া ব্যঞ্জনাদির পাত্রগুলি তাহাতে বসাইয়া রাখিলে সমস্ত রাত্রি ঐ ব্যঞ্জনাদি গরম রাখা যাইতে পারে। যদি কোন দ্রব্য ঐরূপ জ্বালে অতিরিক্ত সিদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে গরম জলের গামলার ভিতর আর একটি আধার রাখিয়া তাহাতে ব্যঞ্জনাদির পাত্র বসাইয়া রাখিলে অতিরিক্ত সিদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। অনেক সময় পোলাও, ভাত বা খিচুড়ী "ঢেঁক" চাল হইলে অর্থাৎ কতক সিদ্ধ কতক অর্দ্ধ সিদ্ধ হইলে এইরূপ গরমজলে পাত্রে বসাইয়া রাখিলে অর্দ্ধ সিদ্ধ ভাত সিদ্ধ হইয়া যায়। অতিরিক্ত লবণ হইলে তৈল বা ঘৃত দ্বারা তাহার কতকাংশ নিবারণ করা যায়। মাছের ঝোল প্রভৃতিতে লবণাধিক্য হইলে কতকগুলি লাউয়ের পাতা তাহার সহিত সিদ্ধ করিলে লাউ পাতা লবণরস টানিয়া লয়। অতিরিক্ত হরিদ্রার গন্ধ হইলে কচি কলার পাতা বা পানের সহিত জ্বাল দিয়া হরিদ্রার গন্ধ নিবারণ করা যায়। অতিরিক্ত ঝাল হইলে স্নেহ পদার্থের দ্বারা কিম্বা অম্ল ও মধুর রস দ্বারা তাহার প্রশমন করা যায়। পোড়া লাগিলে উপর উপর দ্রব্যাংশ ঢালিয়া লইতে হয়। তৎপর তৈলে হরিদ্রা ও রাঁধুনী বাটা সাঁৎলাইয়া তাহাতে ফোড়ন দিয়া নামাইলে পোড়া গন্ধ নষ্ট হয়। মাংস পোড়া লাগিলে কুঙ্কুম (জাফ্রাণ) দধিতে পিশিয়া লইয়া ঘৃতের সহিত দিতে হয়। এইরূপ সমস্ত ব্যঞ্জনাদির নষ্ট উদ্ধার করিবার জন্য প্রক্রিয়া করা হইয়া থাকে, অভিজ্ঞ পাচকেরা এ সকল বিষয় অবগত আছেন।

বাঙ্গলা ভাষায় "পাক রাজেশ্বর" প্রথম পাকের গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বোধ হয় ১২৭০ সালে প্রকাশিত হয়, ইহার পর "পাক প্রণালী" "আমিষ নিরামিষ পাক" "বরেন্দ্র রন্ধন" প্রভৃতি অনেকগুলি পাকের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃতে যে সমস্ত পাকের গ্রন্থের উল্লেখ আছে সে সমস্ত গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন যে মনুসংহিতায় ভীমসেন-কৃত সূপ-শাস্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থ পাওয়া যায় কি না তাহা তিনি বলিতে পারেন না। এই দেহ ধারণের মূলাধার আহার। অতএব সর্ব্ব-উপভোগযোগ্য মানবদিগের নিমিত্ত অন্নপূর্ণারূপ ধারণ পূর্ব্বক অম্ল, তিক্ত, মধুর লবণ, কটু, কষায় এই ষড়রসযুক্ত চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় দ্রব্য সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ত্রিবিধ প্রকার বিভাগ করিয়া অন্নদা-সূপ নামক শাস্ত্রে প্রকাশ করিলেন। ঐ শাস্ত্র সর্ব্বসাধারণের বোধের উপযোগী না হওয়ায় ও তৎকর্ম্ম সুসম্পন্নভাবে প্রচণ্ড প্রতাপবান্ সকল গুণ-বিধান শ্রীমান্ মহারাজা নল মহাশয় এবং পাণ্ডবীয় ভীম ও দ্রৌপদী প্রভৃতি স্ব স্ব নামে সূপ-শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং উত্তরোত্তর সুগমোপায় নিমিত্ত অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরা নানাবিধ কুতূহল নামে সূপশাস্ত্র প্রকাশে পাকশাস্ত্রের সুলভ প্রচার করিয়াছেন। তৎপরে যবনাধিকারে ঐ সকল সূপ-শাস্ত্র হইতে প্রয়োজন-মত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইয়া পারসী ভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। এইক্ষণে হিন্দু রাজ্য বহুকাল অবধি ভ্রষ্ট হওয়ায়, ঐ সকল সংস্কৃত সূপ-শাস্ত্র এতদ্দেশে প্রায় লোপ হইয়াছে; অতএব মহানুভব শ্রীযুক্ত বিক্রমাদিত্য

মহারাজাধিকারে সংস্কৃত সুপ-শাস্ত্র, সংক্ষেপ-সংগ্রহ-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত ক্ষেমশর্ম্ম-কৃত ক্ষেমকুতূহল নামক গ্রন্থ (পাকরাজেশ্বর ভূমিকা) প্রভৃতি এখন দুষ্প্রাপ্য। আয়ুর্ব্বেদে নানাবিধ পাকের উল্লেখ আছে।

ভদ্রাসনের অগ্নিকোণে রন্ধনের ঘর করা উচিত সেই ঘরে বহুতর ধূমপথ ও গবাক্ষ রাখিতে হইবে এবং মস্তক পর্য্যন্ত ভিত্তি লেপন করিবে। পূর্ব্ব বা পশ্চিম মুখ করিয়া চূলা প্রস্তুত করিবে। মাটির হাঁড়ি ধুইয়া রাখিতে হইবে। মৃত্তিকা হাঁড়ির রন্ধন উপকারী; অভাবে লৌহ পাত্রে। লৌহ পাত্রের রন্ধনে চক্ষুর বিকার এবং অর্শরোগ ক্ষয় হয়। পিতলের পাত্রের পাক হিতকারী। ইহাতে বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তাম্র পাত্রের পাকে অরুচি জন্মায় এবং অম্লপিত্ত বৃদ্ধি করে। সোনার এবং রূপার পাত্রের পাকে আনন্দ এবং বীর্য্য বৃদ্ধি করে।

আহারের দ্রব্য কিরূপে সাজাইতে হইবে,—মনোরম থালের মধ্যভাগে অন্ন দিতে হইবে। দাল, ঘৃত, মাংস, শাক, পিষ্টক, মৎস্য ভোক্তার দক্ষিণে ক্রমে রাখিতে হইবে। ঝোল প্রভৃতি দ্রব্য দুগ্ধ, জল, আচার প্রভৃতিক্রমে ভোক্তার বামে রাখিতে হইবে, পকান্ন, পায়স, দধি, ইক্ষু, গুড় উপরোক্ত দুই সারির মধ্যে সাজাইতে হইবে।

পূর্ব্বে বাম হস্তে জলপাত্র লইয়া মুখের সঙ্গে পাত্র না লাগাইয়া জল-পানের প্রথা ছিল। তখন গেলাস ছিল না।

কিরূপে লোকের পরিবেশন করা উচিত। সরল সহাস্যবদন প্রৌঢ় প্রসন্নহৃদয় লক্ষ্মীমন্ত বিষ্ণু-পূজারত ভাগ্যবন্ত পাকে নিপুণ শুদ্ধমতি বদান্য দ্বিজ কিম্বা সৎকুলজাত ব্যক্তি স্নান করিয়া দিব্যবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অঙ্গে চন্দন চর্চ্চিত করিয়া এবং পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়া রাজাকে পরিবেশন করিবে।

সুন্দরী বিম্বাধরা রাজপরিবেশিকা স্নান করিয়া চুয়াতে অঙ্গ চর্চ্চিত করিয়া মুখে কর্পূর সৌরভ বিশুদ্ধ বসন পরিধানপূর্ব্বক কবরীতে পুষ্পমাল্যের বেষ্টনী দিয়া মৃদু মন্দ হাস্য মুখে পরিবেশন করিবে।

ইহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে রন্ধনবিদ্যার কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল। নানা দেশের লোকের সংস্রবে আসিয়া আমাদের পাকের মৌলিকতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করিয়া আমাদের পাকের মধ্যেও কতকগুলি পাশ্চাত্য পাকপ্রণালী প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

মাছ—বাঙ্গালীর মৎস্যই প্রধান এবং প্রিয় খাদ্য। মৎস্যের নানাবিধ ব্যঞ্জন পাক হইয়া থাকে। এই মাছ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, মাছের মধ্যে Phosphorus আছে, সেই জন্য মস্তিষ্কের এবং চক্ষের পক্ষে মাছ অত্যন্ত উপকারী, এবং ইহা Proteid diet পর্য্যায়ভুক্ত।

হিন্দুশাস্ত্রে মাছ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করা হইয়াছে।

রোহিত মৎস্য—রক্তোদর, রক্তচক্ষু, রক্তপক্ষ, কৃষ্ণপুচ্ছ, ঝষশ্রেষ্ঠ এবং রোহিত এই কয়েকটী পণ্ডিতগণ একপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। রোহিত মৎস্য সকল মৎস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শুক্রবর্দ্ধক, অর্দ্দিত, রোগনাশক, ঈষৎ কষায় সংযুক্ত মধুর রস, বায়ুনাশক, ঈষৎ পিত্ত-কারক। রোহিত মৎস্যের মস্তক ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগনাশক।

শিলন্দমাছ কফবর্দ্ধক, বলকারক, মধুর বিপাক, গুরু, বায়ুপিত্ত নাশক, হৃদয়গ্রাহী এবং আমবাতজ।

ভেট্‌কীমাছ—মধুর রস, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, গুরু, বিষ্টম্ভজনক এবং রক্তপিত্ত-নাশক।

বোয়ালমাছ—কফবর্দ্ধক, বলকারক, নিদ্রাজনক, রক্তদূষক এবং পিত্ত ও কুষ্ঠ-রোগজনক।

শিঙ্গীমাছ—বায়ুপ্রশমক, স্নিগ্ধ, কফ প্রকোপকারক, তিক্ত কষায়রস লঘু এবং রুচিকারক।

ইলিশমাছ—মধুর রস স্নিগ্ধ, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্ত ও কফজনক, কিঞ্চিৎ লঘু, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু-নাশক।

কইমাছ—মধুর রস, স্নিগ্ধ, কফনাশক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

বাইণ মাছ—বায়ুপিত্তনাশক, রুচিকারক এবং লঘু।

এরং মাছ—মধুর রস, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী শীতবীর্য্য এবং লঘু।

বড় পুঁঠী মাছ—তিক্ত, মধুর রস, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, শীতল, রুচিকারক এবং বায়ুর স্বধর্ম্ম-সংস্থাপক।

গরাইমাছ—মধুর তিক্ত কষায় রস, বাতপিত্তনাশক, কফঘ্ন রুচি-কারক লঘু, অগ্নিপ্রদীপক এবং বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

মাগুরমাছ—বায়ুনাশক, বলকারক, শুক্রজনক, কফকারক এবং লঘু।

টেঙ্গরামাছ—মেধাজনক, মেদক্ষয়কারী, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক এবং রুচিজনক।

পুঁঠিমাছ—তিক্ত কটু, মধুর রস, শুক্র কফ ও বায়ুনাশক, মুখরোচক ও কণ্ঠরোগ নাশক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক এবং লঘু।

ক্ষুদ্রমৎস্য—মধুর রস, ত্রিদোষ-নাশক, লঘুপাক, রুচিকারক এবং বলজনক। ইহা সর্ব্ব প্রকারে হিতকর।

অতিক্ষুদ্রমাছ—পুংস্ত্বনাশক, রুচিজনক এবং কাশ ও বায়ুনাশক।

মাছের ডিম্—অত্যন্ত শুক্রজনক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, লঘু, কফ, মেদ, বল ও গ্লানিজনক এবং প্রমেহ-নাশক।

বঙ্গসাহিত্য শ্রীপ্রমথনাথ মৈত্র।

সময় হারা

যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মত ;
তখন স্কুলে নেইবা গেলেম ; কেউ যদি কয় মন্দ,
আমি বলব, "দশটা বাজাই বন্ধ !"
তাধিন্ তাধিন্ তাধিন !

শুইনে বলে' রাগিস্ যদি, আমি বলব তোরে,
"রাত না হ'লে রাত হ'বে কি করে ?
ন'টা বাজাই থাম্‌ল যখন, কেমন ক'রে শুই !
দেরি বলে' নেইত, মা, কিচ্ছু ই !"
তাধিন্ তাধিন্ তাধিন্ !

যত জানিস্ রূপকথা, মা, সব যদি যাস্ বলে'
রাত হ'বে না, রাত যাবে না চলে' ;
সময় যদি ফুরোয় তবে ফুরোয় নাত খেলা,
ফুরোয় না ত গল্প বলার বেলা !
তাধিন্ তাধিন্, তাধিন্ !

সন্দেশ, বৈশাখ, ১৩৩০ ।   শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

দর্শন-দরবাজা

স্থান কাল পাত্রের হিসাবের উপরে জিনিষটা ভাল লাগা না লাগা অনেক সময়ে নির্ভর করে। যে জিনিষ শোবার ঘরে মানায় সেটা বসবার ঘরে মানায় না। যেটা খেলা ঘরে মানায় সেটা আফিস ঘরের টেবিলে মানায় না ; আফিসে যাবার বেলা যে কাপড় বিয়ের বেলায় সে কাপড়ে গেলে বর বলে লোকে চিনতেই পারে না ; মদের পাত্রে গঙ্গাজল, কোশার মধ্যে মদ যেমন অশোভন, তেমনি যে সব শিল্পের জিনিষ স্থান কাল পাত্রের অপেক্ষা রাখে, তাদের উপযোগীতা সুন্দরতা এ সব বুঝতে দেরী লাগে, যদি সেই সামগ্রীগুলিকে ঠিক জায়গা থেকে বেঠিক জায়গায়, ঠিক কাল থেকে অকালের মধ্যে, পাত্র থেকে অপাত্রে ধরে দেখা হয়। গালার রং দেওয়া মাটির খেলনা বিশেষ করে খেলা ঘরের ছেলে-মেয়ের খেলবার সময় ব্যবহারে লাগে। টকটকে রং পাকা রং রঞ্জ ভাঙ্গে না এমন খেলনা ছেলে সেটা নিয়ে খেলছে ঘাটে মাঠে, কিম্বা স্তূপাকার রঙ্গিন খেলনার দোকানের সামনে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখছে মাটির আম জাম বা ময়ুরা পাখিটার দিকে, এ মানায় ; কিন্তু বৈঠকখানায় যেখানে লাট-বেলাটের আসা-যাওয়া, বুড়োদের আসা-যাওয়া, যেখানে বৈঠকি গান, হুঁকোর বৈঠক, পের্দা, কোচ, ম্যাজ, ম্যাকেব ঘড়ি, এমন কি পাথরের ঘোড়া, তাও মানিয়ে যায়। খালি পা মানায় না, খালি মাথা খালি গা মানায় না, কাঁথা মানায় না, কম্বল মানায় না, হাঁড়ি মানায় না, ছিঁকে মানায় না, তা যত সুন্দর করেই প্রস্তুত হোক। "যার যাহা তারে সাজে !" পাখি সাজে গাছের ডালে, বাবু সাজে কেদারায় আর মটর গাড়িতে, হঠাৎ পাখিকে খাঁচায় ভরলে দুমিনিটে পাখিটার চেহারা বেয়াড়া রকম হয়ে যায়, এবং বাবুকে নিয়ে মাঠে ছেড়ে দিলে গরুর চেয়ে বিশ্রী দেখতে হয় তাকে। জিনিষটার যথার্থ মূল্য সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে বোঝবার বাধা হয় অনেক সময় এই স্থান কালও পাত্রের ওলট-পালটের দরুণ। পল্লীর ঘরে যে সব জিনিস শোভা ধরে, যেমন দড়ির ছিঁকে, শীতলপাটী—এগুলোকে হুবহু সহরের টাউন-হলে এনে ধরে দেখলে মনে হবে দরিদ্র ; কিম্বা টাউন হলের মোটা থামটা নিয়ে চালা ঘরের খোঁটার জায়গায় বসালে ঘণ্টার গলায় হাতী বাঁধার মত হাস্যকর ব্যাপার না হয়ে যাবে না, এই হল স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে একই জিনিষের সু কু দুই প্রকার শ্রী ও রূপ-ভেদের পাকা নিয়ম। পাত্র-ভেদে একটা আর্টের জিনিষ কারু লাগে ভাল কারু লাগে মন্দ, কালভেদে এককালে সুন্দর আর এককালে বাঁদর বলে প্রতিপন্ন হয়ে যায়, স্থান ভেদে যা সাহেবের ঘরে মানায় তা বাঙ্গালীর ঘরে মানায় না। ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমের গায়ে যে রং করা কাঁচের টালি মানায়, তা কালীঘাটের মন্দিরের গায়ে একেবারেই মানায় না। কোন কিছুর সৌন্দর্য্য সঠিক ভাবে বোধ করতে হলে এই স্থান কাল পাত্রের তারতম্য দিয়ে সেটা বোঝার কতখানি ব্যাঘাত বা সুযোগ হচ্ছে সেটা আগে বিবেচনা করা চাই, না হলে ঠকতে হয়। প্রদর্শনীতে এসে অনেক ভাল জিনিস চোখ এড়িয়ে যায় এবং যা সত্যিই ভাল নয়, তাও শুধু স্থান কাল পাত্র বুঝে সাজিয়ে গুজিয়ে সামনে ধরার দরুণ ফস্ করে চোখে লেগে যায়। সাহেব বাড়ীর দোকানে সাজানো জিনিষ এত যে বিকোয়, তার কারণ আর কিছুই নয়, তারা এই স্থান কাল পাত্র বুঝে সাজিয়ে ধরতে জানে ; পচা মালও চোখের সামনে কিনে ফেলি ; হঠাৎ বাড়ি এসে দেখি জিনিষটা যে দরের বোধ হয়েছিল তখন, এখন আর তার কাছেও পৌঁছতে পারছে না।

এক আবহাওয়ায় এক জিনিষ মানালো, অন্য আবহাওয়াতে এসে সে জিনিষ একেবারেই মানালোনা, এ হল নিম্নস্তরের আর্টের জিনিষের কথা। উচ্চতর আর্ট সে এই স্থানকালপাত্রের বাধাকে অতিক্রম করে বর্ত্তমান থাকে। জিনিষটা যতই আর্টের সম্পর্কে আসে, ততই স্থান কাল পাত্রের বাঁধন মুক্ত হয়ে সেটি অনেক স্থান অনেক কাল অনেক পাত্রের মধ্যে বিস্তৃতি পেতে থাকে। পশ্চিমের আর্টকে পুবের লোকের, পুবের আর্টকে পশ্চিমের লোকের, সেকালের আর্টকে একালের

সামনে ধরে দিলে তার সৌন্দর্য্য-হানি হয় না এবং তার বাণী মনের থেকে মনে চলাচল করবার বাধাও পায় না। আর্টের দ্বারায় রূপ যখন মুক্তি পায় স্থান কাল পাত্রের বাঁধা নিয়ম থেকে, খেলনাটা শুধু তখন আর ছেলে-খেলার মধ্যেই বদ্ধ থাকে না, বুড়ার মন মাতায়, যুবার মন ভোলায় এবং কাজে লেগে যায়, বেশ সেজে যায় খড়ের ঘরে, রাজার প্রাসাদে, পর্ব্বতের গুহায়, কাদার দেওয়ালে, কোথাও তার প্রবেশের বাধা থাকে না, যখনি দেখ যতবারই দেখ সে নূতনই থাকে, যার কাছেই রাখে সেখানে যতন পায়।

রূপের নিয়মে বদ্ধ কালের নিয়মে বদ্ধ কাযের নিয়মে বদ্ধ হয়ে রয়েছে মানুষ এবং তার সৃষ্টি ; এই যে একটা সঙ্কীর্ণতা যা ঘিরে আছে মানুষকে এবং তার নিজের কাযের ও ভোগের উপকরণসমূহকে তার থেকে মুক্তি হল আর্ট পেয়ে। মানুষের কায এবং তার সৃষ্টিও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পেলে। রূপ এইভাবে বিকীর্ণ করলে আপনার যথার্থ শ্রী, কর্ম্ম পেলে বড় বিস্তার, ভোগ দিলে অবাধ অবিচ্ছিন্ন আনন্দ। সঙ্গীতকে স্থান কাল পাত্রের নিয়ম বেশী মেনে চলতে হয়না, কেননা সেটা যুক্ত একেবারে মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে। বাউলের গানে আর রাগ-রাগিণীর গানে তফাৎ শুধু সুরের ওলট-পালটে, কিন্তু হৃদয়স্পর্শী দুইই, কিন্তু সঙ্গীত ও একেবারে মুক্তিলাভ করেনি, এখনো পশ্চিমের সঙ্গীত পূবের লোকের, পূবের সঙ্গীত পশ্চিমের লোকের কাছে যথার্থ ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে বাধা পাচ্ছে, ছবির বেলাতেও এই কথা! সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আর্টকে বুঝতে গেলে কতকটা নিজেকে স্থান কাল পাত্র ভেদের নিয়ম থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জিনিষটি দেখতে শুনতে হবে। শিল্প প্রদর্শনীগুলো কতকটা এই শিক্ষার সহায়। দেশ বিদেশের ঘরের এবং ঘরের বাইরের, আপনার এবং অপরের সহরের এবং পল্লীর নানা জিনিষ ; কাজের জিনিষ, সাযের জিনিস খেলার জিনিষ একত্র করা হয় সেখানে। অবশ্য প্রদর্শনীতে সব জিনিষকে তাদের স্থান কাল পাত্র বুঝে সাজিয়ে ধরা যায় না, রং করা আয়নার সঙ্গে রঙিন সাড়ি পরা ছোট একটি পাড়াগাঁয়ের বৌকে প্রদর্শনীতে এনে বসিয়ে দেওয়া তো চলে না, দড়ির ছিঁকের সঙ্গে খড়ের চালকে তো উপড়ে দেখানো চলে না, বাঘ-গুহার বহুশতাব্দী পূর্ব্বেকার ছবির সঙ্গে পর্ব্বতটা, গুহাবাসী ভিক্ষু এবং বাঘের গর্জ্জনও জুড়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং অনেক জিনিষ প্রদর্শনীতে নিজের কল্পনায় জুড়ে দেখতে হয় তাদের আশপাশের সঙ্গে, কতক জিনিষ তার নিজের আর্ট দিয়েই আপনাকে ধরে আমাদের সামনে, আশপাশের অপেক্ষা না রেখে। সব প্রদর্শনীতেই এই ভাবে কতক জিনিষ আশপাশের সঙ্গে বেখাপ হয়ে দেখা যায়, কতক নিজের সৌন্দর্য্যে নিজেই প্রকাশমান হয়। এই যে শেষোক্ত প্রকারের আশপাশ থেকে মুক্ত জিনিষ, এই হল আর্টের উচ্চতর দিকের জিনিষ, যা সহরেও মানায়, পল্লীতেও মানায়, সাহেবের ঘরেও মানায়, হিঁদু মুসলমান মগ সবার ঘরেই মানায় এবং সেকাল একাল দুই কালেই মানিয়া চলছে ও চলবে ভবিষ্যৎ কালে। প্রদর্শনীতে গিয়ে শুধু কতক-রকম জিনিস এল তাতো দেখা নয়, কেমন জিনিষ এল এবং জিনিসের মত জিনিষ কত এল বা কটি এলো, এটাও দেখার বিষয়। না হলে প্রদর্শনী দেখা সম্পূর্ণ হয় না। স্থান কাল পাত্র ভেদে জিনিষটি কি ভাবে চোখে পড়ছে, সেটাকে অতিক্রম করে দেখা চাই, ঠিক যে ভাবে শুভদৃষ্টি বদল হয় সুন্দর কালো এমনি নানা রূপের সঙ্গে বর-কন্যার, আর্টের জিনিষের সঙ্গে ঠিক সেই ভাবের পরিচয় করে নিতে হয় আমাদের— প্রদর্শনীর দর্শন-দরবাজা আর্টের চাবি দিয়ে খুলে দেখলে, তবেই দেখা যায় যথার্থ রূপ ছোট-বড় দেশের-বিদেশের সব জিনিষের।

অঘ্রণ, বৈশাখ ১৩৩০। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান

আজি মর্ম্মর ধ্বনি কেন জাগিলরে।
মম পল্লবে পল্লবে হিল্লোলে হিল্লোলে
থর থর কম্পন লাগিল রে!
কোন্ ভিখারী হায়রে
এল আমারি এ অঙ্গন দ্বারে,
বুঝি সব মন ধন মম মাগিলরে!
হৃদয় বুঝি তারে জানে,
কুসুম ফোটায় তারি গানে।
আজি মম অন্তর মাঝে,
সেই পথিকেরি পদধ্বনি বাজে,
তাই চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙিলরে।

অঘ্রণ, বৈশাখ ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে,
পূর্ণ কর হিয়া মঙ্গল কিরণে
রাখ মোরে তব কাজে,
নবীন কর এ জীবনে হে
খুলি মোর গৃহদ্বার
ডাক তোমারি ভবনে হে

প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই
নীড়-বিরাগী হৃদয় আমার উধাও হল সেই

নীল অতলের কোথা থেকে
উদাস তারে করল যে কে
গোপনবাসী সেই উদাসীর ঠিক-ঠিকানা নেই!
"সুপ্তিশয়ন আয় ছেড়ে আয়"
জাগে তার ভাষা
সে বলে, "চল্ আছে যেথায়
সাগর পারে বাসা।"
দেশ বিদেশের সকল ধারা
সেইখানে হয় বাঁধন-হারা
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতি সমুদ্রেই!

জয় হোক্ জয় হোক্ নবঅরুণোদয়
পূর্ব্ব-দিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্ম্ময়!
এস অপরাজিত বাণী
অসত্য হানি
অপহত শঙ্কা অপগত সংশয়
এস নব জাগ্রত প্রাণ
চির যৌবন-জয়গান।
এস মৃত্যুঞ্জয় আশা
জড়ত্ব নাশা
ক্রন্দন দূর হোক্ বন্ধন হোক্ ক্ষয়!

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক্ জয়।
এস দুঃসহ, এস এস নির্দ্দয়,
তোমারি হউক্ জয়!
এস নির্ম্মল এস নির্ভয়
তোমারি হউক জয়!
প্রভাত সূর্য্য এসেছে রুদ্র সাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে
মৃত্যুর হোক্ লয়।
তোমারি হউক্ জয়।

শান্তিনিকেতন, পৌষ ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুরাণ পরিচয়

হিন্দুজাতির পুরাণশাস্ত্র যেমন অতিপুরাতন, সেইরূপ অতিবিস্তৃত। অনুষ্ঠান প্রধান হিন্দুধর্ম্মের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় পুরাণে যেরূপ বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে, সেরূপ আর কুত্রাপি হয় নাই। এই উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পুরাণকার বেদব্যাস পুরাণসংখ্যাদি নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে,—

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
বিষ্ণুধর্ম্মাদিশাস্ত্রাণি শিবধর্ম্মাশ্চ ভারত॥
কার্ষ্ণং চ পঞ্চমো বেদঃ যন্মহাভারতং স্মৃতম্।
সৌরাশ্চ ধর্ম্মা রাজেন্দ্র! মানবোক্তা মহীপতে!॥
জয়েতি নাম চৈতেষাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।"

মনীষিগণ পুরাণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থনিচয়কে "জয়" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। জয়শব্দের অর্থ সংসার জয়ের কারণ। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সংসারজয় করিতে হইলে, পুরাণজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। সংসারজয় শব্দের অর্থ—সুখ-স্বচ্ছন্দে খ্যাতি প্রতিপত্তির সহিত ইহলৌকিক কার্য্যকলাপের নির্ব্বাহ ও পরিণামে স্বর্গাপবর্গ-প্রাপ্তি।

পুরাণানুশীলন প্রাচীন হিন্দু গৃহস্থের দৈনিক কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ।"

এই ঋষিবাক্যটি বলিয়া দিতেছে যে, গৃহস্থ অষ্টধাবিভক্ত দিবসের ষষ্ঠ ভাগ ও সপ্তম ভাগ ইতিহাস-পুরাণের আলোচনার দ্বারা অতিবাহিত করিবে। এইরূপে প্রতিদিবসের কিয়দংশ ইতিহাস-পুরাণের আলোচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া প্রাচীন ভারত যেরূপ ইতিহাস-পুরাণের প্রতি অনুরাগের পরিচয় দান করিয়াছিল, তাহা অন্যান্য সভ্যদেশে অপরিচিত।

নীতিশাস্ত্রবিশারদ কামন্দক অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় পুরাণশাস্ত্রকে বেদের সমকক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে,—বিদ্যা লোকের উপকারিণী, রাজা সেই বিদ্যার রক্ষক; উদারচেতা মানব সেই সকল বিদ্যার দ্বারা চতুর্ব্বর্গ জানিতে পারেন, ইহাই বিদ্যার বিদ্যাত্ব।

মৎস্যপুরাণে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে,—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সর্ব্বশাস্ত্রের প্রথম পুরাণশাস্ত্রকেই স্মরণ করিয়াছিলেন। শব্দময় এই পুরাণশাস্ত্র শতকোটি বিস্তারযুক্ত।

অধুনাতন পুরাণে বেদের ব্রাহ্মণভাগে ও স্মৃতিসংহিতায় যে সকল গল্প দেখিতে পাওয়া যায়, লোকপ্রসিদ্ধ সেই গল্পগুলি 'অতি প্রাচীনতম যুগে' "পুরাণ" নামে অভিহিত হইয়াছিল।

পুরাণের "পুরাণ" এই সাধারণ নাম এবং মহাপুরাণ উপপুরাণ সংজ্ঞা ও ব্রহ্মপুরাণ লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি নামবিশেষ লোকব্যবহারমূলক। এমন

কি, যে বেদ হিন্দুর নিকট অপৌরুষেয় বলিয়া পরিচিত, অহিন্দুও যাহাকে অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করে, সেই বেদের ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতি সংজ্ঞাবিশেষও একমাত্র লোকব্যবহারমূলক।

পুরাণের কতক অংশ ইতিহাসাত্মক আর কতক অংশ ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদক। ইতিহাসাত্মক ভাগে বংশ মন্বন্তর ও সৃষ্টিপ্রলয়ের বিবরণ এবং সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি, প্রভৃতির কার্য্যকলাপ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী স্থান পাইয়াছে। সুতরাং এই অংশ পরিবর্দ্ধনশীল। ইহার গল্পগুলি গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে নানা দেশে লোকের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল, তন্নিবন্ধনই নানা পুরাণে এক গল্পেরই অনেক বৈষম্য দেখা যায়। এই বৈষম্য যে কেবল "পুরাণ" নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থেই লক্ষিত হয়, তাহা নহে। তন্ত্রের গল্প, উপনিষদের গল্প এবং বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ব্রাহ্মণের গল্পও বিভিন্নাকার দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদক অংশবিশেষ স্থিরতর। উহাতে আগন্তুক ঘটনার বিশেষ সম্পর্ক নাই।

কোন্ কর্ম্মের কি ফল, বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানপ্রণালী, স্বর্গনরকের প্রকারভেদ, শৌচ, আচার, রীতিনীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় এই ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং পুরাণশাস্ত্র মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ ইতিহাসকাণ্ড, অপরভাগ কর্ম্মকাণ্ড। এই কর্ম্মকাণ্ডের সহিত হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কারণ বেদশাস্ত্র কেবল দ্বিজাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বিশেষ ধর্ম্ম যাগ প্রভৃতির উপদেশদানে ব্যাপৃত। পক্ষান্তরে পুরাণশাস্ত্র মানব মাত্রের অভ্যুদয়-নিশ্রেয়সের উপদেশ দানে বদ্ধপরিকর।

অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম যেমন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, কর্ম্মের অঙ্গভূত মন্ত্রগুলিও সেইরূপ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী "বেদ-মন্ত্র", অপর শ্রেণী "পৌরাণিক-মন্ত্র।

অনেক বৈদিক মন্ত্র ও তান্ত্রিক মন্ত্রও পুরাণে স্থান পাইয়াছে; এই হেতু পুরাণের অপর নাম "মিশ্র"। সুতরাং বৈদিক মন্ত্র বেদের নিজস্ব, তান্ত্রিক মন্ত্র তন্ত্রের নিজস্ব, আর পৌরাণিক মন্ত্র পুরাণের নিজস্ব।

পুরাণ সার্ব্বজনীন। পুরাণের মত তন্ত্রও সার্ব্বজনীন শাস্ত্র। ধরাধামে মানবের অবস্থান হইতেই ধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রগ্রন্থও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে। শাস্ত্রের সঙ্কলন-বিভাগ ও প্রতিসংস্কারই কেবল পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান।

বেদে যাহা অতি অল্পাক্ষরে সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে, পুরাণে তাহাই অতিবিস্তৃত আখ্যায়িকা প্রভৃতির সাহায্যে বিশদভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই রহস্য বুঝাইবার জন্যই মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে—

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি"॥

ইহার অর্থ—বৈদিক-মার্গপ্রবর্ত্তক নিপুণগণ ইতিহাসপুরাণের দ্বারা বেদের সমুপবৃংহন অর্থাৎ বর্দ্ধন করিবেন। কারণ অল্পবিদ্য মানব হইতে বেদ নিজেই ভয় পাইয়া থাকেন যে, এই অল্পবিদ্য আমাকে প্রহার করিবে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বশিষ্ঠ ইঙ্গিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইতিহাস পুরাণ না জানিয়া কেহ বেদের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইও না। যদি এই উপদেশ গ্রহণ না কর, তবে বেদের তাৎপর্য্য অন্যথারূপে বর্ণনা করিয়া ধর্ম্মের বিপ্লব ও সমাজের উৎসাদ ঘটাইবে।

বৈদিক-মার্গ-প্রবর্ত্তক মহাত্মা মাধবাচার্য্য ঋষিবাক্যের প্রতি আস্থাবশতই পুরাণসারাদির তাৎপর্য্য অবগত হইয়া পরে বেদব্যাখ্যানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তদীয় স্মৃতিনিবন্ধ পরাশরমাধবে ও কালমাধবে শত শত পুরাণবচন দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, তাঁহার গ্রন্থে এমন অনেক পুরাণ বচন দেখিতে পাওয়া যায় যাহার অস্তিত্ব তদীয় আবির্ভাবের পূর্ব্বতন আর্য্যাবর্ত্তীয় নিবন্ধে দৃষ্টিগোচর হয় না।

আর একটা কথা বলা আবশ্যক যে—"ত্রয়ীধর্ম্ম" অর্থাৎ ঋক-সাম-যজুর্ব্বেদীয় অনুষ্ঠান পৃথক পৃথক, অর্থাৎ ঋগ্‌বেদিগণ ঋগ্বেদবিহিত নিয়মানুসারে এবং অন্যান্য বেদীয়গণ তত্তদ্বেদবিধানানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহাদের স্ব-স্ব বেদোক্ত মন্ত্রও পৃথক পৃথক। কিন্তু পৌরাণিক মন্ত্র ও অনুষ্ঠান সর্ব্ববেদীয় ব্যক্তির পক্ষেই সমান।

কিন্তু প্রত্যেক বেদেরই যেমন শাখাবিশেষে অনুষ্ঠানের প্রভেদ আছে, এক শাখীর অনুষ্ঠান যেমন অপর শাখীর অনুষ্ঠান হইতে স্বতন্ত্র, তেমনই পৌরাণিক পূজাপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির অনুষ্ঠানাদিও পুরাণভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। এ বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যে সম্প্রদায়ে যে পুরাণের সমাদর হইয়া আসিতেছে, সেই সম্প্রদায়ে তাহার অন্যথা হইতে পারে না। এই তথ্যের নির্ণয় করিতে হইলে বিভিন্ন দেশবাসী আনুষ্ঠানিক হিন্দুদিগের ক্ষুদ্র-বৃহৎ ক্রিয়াকলাপের প্রতিপাদক পদ্ধতিগুলির বিবরণ সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে হয়। কারণ, এই সকল পদ্ধতিতে তত্তৎপ্রদেশপ্রচলিত পুরাণের নিজস্ব যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মুদ্রিত অমুদ্রিত পুরাণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তত্তৎ প্রদেশপ্রচলিত স্মৃতিনিবন্ধেও বিভিন্ন পুরাণের যে সকল বচন দেখিতে হওয়া যায়, সেগুলি আর অধুনাতন মুল পুস্তকে খুজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয় যে, স্মৃতিনিবন্ধের ও ক্রিয়ানুষ্ঠান-পদ্ধতির রচনাসময়ে পুরাণের যে অবস্থা ছিল, সুদীর্ঘকালের আবর্ত্তনে লেখকের অনবধানতা প্রভৃতি কারণে তাহার যথেষ্ট বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। হস্তলিখিত ৫।৭ খানা আদর্শ পুস্তক দেখিয়া কোনও পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতে হইলে, আদর্শ পুস্তকগুলির এতই অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় যে, এইগুলি একই পুস্তকের আদর্শ কি না, এমত সন্দেহও অনেক স্থলে উপস্থিত হয়।

অধুনা মুদ্রাযন্ত্রের বাহুল্যে পুস্তকবিক্রয়ব্যবসায়ীর কৃপায়, যথাদৃষ্ট

লিখিত ও মুদ্রিত পুস্তকের প্রভাবে, পাঠ-বৈষম্যের অসুবিধা মিটিয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহার ফলে অনেক অদ্ভুত সিদ্ধান্তের আবির্ভাব হইতেছে। যেমন—অমুক পুরাণ অনুসারে অমুক পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে তাহার প্রসঙ্গ নাই; অতএব উহা নির্মূল অথবা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে আনিয়া পুরাণবিশেষের নাম জাল করিয়া হিন্দুরা নিজস্ব করিয়া লইয়াছে, ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেও উপবিভাগে অনেক প্রকার পুরাণসম্মত দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ময়মনসিংহ, ঢাকায় কিয়দংশ ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট এই কয়টি জেলার অনেক স্থলেই মৎস্যপুরাণোক্ত বিধির মতে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। আমি এ পর্য্যন্ত বিবিধ-পুরাণসম্মত আট প্রকার দুর্গোৎসবপদ্ধতি দেখিয়াছি। কিন্তু মৎস্যপুরাণোক্ত পদ্ধতির মত এমন সুসঙ্গত সম্পূর্ণ পদ্ধতি আর দেখিতে পাই নাই। কিন্তু অধুনা দৃশ্যমান মুদ্রিত-অমুদ্রিত মৎস্যপুরাণে দুর্গাপূজার কোনও প্রসঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাতে মনে হয় যে, আমরা এখন যে মৎস্যপুরাণ দেখিতে পাই, উহা স্বল্প মৎস্যপুরাণ। পক্ষান্তরে যাহা হইতে দুর্গোৎসবপদ্ধতি সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা বৃহন্মৎস্যপুরাণ অথবা মূল অসংক্ষিপ্ত মৎস্যপুরাণ।

এরূপ কল্পনার অনুকূল হেতুর অভাব নাই। প্রায় প্রত্যেক পুরাণেরই যে, স্বল্প, বৃহৎ ও সাধারণ বা মধ্যম এই তিন প্রকার বিভাগ আছে। অনেক গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "বৃষোৎসর্গতত্ত্বে" "স্বল্পমৎস্যপুরাণীয়" পাঠ মত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিবিধ নিবন্ধগ্রন্থেও নানা স্থানে অনেক পুরাণেরই বৃহৎ স্বল্প প্রভৃতি বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

দানসাগরের উপক্রমে বল্লালসেন বিবিধ পুরাণের প্রমাণ্যাপ্রামাণ্য বিবেচনাপ্রসঙ্গে অষ্ট প্রকার—গরুড়পুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, তেইশ হাজার শ্লোকযুক্ত অপর বিষ্ণুপুরাণ ও ছয় হাজার শ্লোকযুক্ত অপর লিঙ্গপুরাণ, ও স্কন্দপুরাণের লোকপ্রচলিত অংশবিশেষের অতিরিক্ত "পৌণ্ড্রখণ্ড" "রেবাখণ্ড" ও অবন্তিখণ্ড"কে অপ্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে দীক্ষা, প্রতিষ্ঠা, পাষণ্ডদিগের যুক্তি, রত্নপরীক্ষা, মিথ্যা বংশবর্ণনা, অভিধান, ব্যাকরণ প্রভৃতির কথা আছে—ইত্যাদি কারণে এই সকল গ্রন্থে উপেক্ষিত হইয়াছে। তিনি পুরাণোপপুরাণের সংখ্যাবহির্ভূত বলিয়া এবং নানা প্রকার কলুষিত কার্য্যের প্রবর্তক বলিয়া দেবীপুরাণকে পাষণ্ডানুমত মনে করিয়া দানসাগরে উহার প্রমাণ সংগ্রহ করেন নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, বল্লালসেন অপ্রমাণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করাতেই উল্লিখিত পুরাণগুলির কিছুই মূল্য নাই, এমত সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। অভিধানসংগ্রহকার প্রভৃতির গ্রন্থে এবং বিভিন্ন দেশীয় নিবন্ধে এই সকল পুরাণেরও প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। দেবীপুরাণের অপ্রামাণ্যস্বীকার বাঙ্গালাদেশে কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। কারণ বাঙ্গলার অনেক স্থানেই দেবীপুরাণোক্ত দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুর্গোৎসবতত্ত্বে ও অন্যান্য নিবন্ধে দেবীপুরাণ প্রমাণরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে।

বিশেষতঃ বল্লালসেন অষ্টাদশ মহাপুরাণের ও উপপুরাণের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া দেবীপুরাণের যে অপ্রমাণ্য স্থাপন করিয়াছেন, ইহা কিছুতেই সঙ্গত হয় না। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত ধর্ম্মপুরাণ, মহাভাগবত, তোতলাপুরাণ, গৌতমপুরাণ প্রভৃতি অনেক পুরাণের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশভেদে প্রত্যেক পুরাণেরই বর্ণনীয় বিষয়গত পার্থক্য আছে। একদেশে যে দেবতা যে ব্রত সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত, অপর দেশে তাহার নামও কেহই জানে না। বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্কটেশ্বরের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় নাই; বাঙ্গালার মনসা বোম্বেবাসীর পরিচিত নহেন।

মনসার মাহাত্ম্যে বাঙ্গালার গরুড়পুরাণ গৌতমপুরাণ তোতলাপুরাণ পরিপূর্ণ; এমন কি "পদ্মাপুরাণ" নামে পরিচিত মনসার যে ভাষাগ্রন্থ বাঙ্গালার নানাস্থানে গীত হইয়া থাকে, তাহারও মূলস্বরূপ সংস্কৃত "পদ্মা"-পুরাণের অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

পদ্মপুরাণীয় বলিয়া মনসা পূজার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, উহার মূল সম্ভবতঃ "পদ্মাপুরাণ", পদ্মপুরাণ নহে। লেখকের অনবধানতার ফলে "পদ্মাপুরাণ"ই পদ্মপুরাণ হইয়া পড়িয়াছে।

অনেক পদ্ধতির উপক্রমে মনসাপূজার কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে যে সকল বচন পদ্মপুরাণোক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলিও "পদ্মাপুরাণীয়" বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, সাধারণ প্রচলিত পদ্মপুরাণে ইহার প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না।

বলা বাহুল্য যে, দেশে দেশে দেবতা যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমন তাহাদের পূজাপদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন।

অধিকন্তু তত্তৎ দেবতার মহাত্ম্য, উৎপত্তি বিবরণ, ব্রতানুষ্ঠান, মূর্ত্তিনির্ম্মাণ, মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি তত্তৎপ্রদেশে-প্রচলিত পুরাণ বিশেষের অথবা প্রসিদ্ধ পুরাণের অংশান্তরে নিজস্ব। এই কারণেই এক দেশের পুরাণের সহিত অপর দেশের পুরাণের বিষয়সাম্য অধ্যায়সংখ্যা ও শ্লোকসাম্য দৃষ্ট হয় না। এই পৌরাণিক প্রাদেশিকতার প্রতি অনবধান বশতই অনেক গ্রন্থকার অনেক পুরাণের ও পুরাণ বিশেষের অংশান্তরের নির্ম্মূলতা ঘোষণা করিয়া সাধারণের ভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন।

তন্ত্রশাস্ত্রের আধুনিক অংশবিশেষে অশ্বক্রান্তাদি ভূভাগে বিশিষ্ট ফলদায়ক চতুঃষষ্টি তন্ত্রের নামনির্দ্দেশ অনেকের মনেই ভ্রান্ত সংস্কার নিহিত করিয়াছে যে, চতুষ্টির অতিরিক্ত তন্ত্র নাই। কিন্তু অন্য

শাস্ত্রেরই নানা স্থানে কোটি কোটি তন্ত্রের যে উল্লেখ আছে, এমন কি, তন্ত্রসার, তারা রহস্যবৃত্তি, তন্ত্ররত্ন তন্ত্রপ্রদীপ, পুরশ্চর্য্যার্ণব, শ্যামা রহস্য, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, প্রভৃতি নিবন্ধেই যে হাজার হাজার তন্ত্রের নামসম্বন্ধ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার খবর অনেকেই রাখেন না। ঠিক সেইরূপ অষ্টাদশ মহাপুরাণের ও উপপুরাণের নাম নির্দ্দেশ হইতে সাধারণের এই ভ্রান্তি জন্মিয়াছে যে এতদতিরিক্ত আর পুরাণ নাই।

তত্ত্ববোধিনী বৈশাখ ১৩৩০। শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

রিক্তা

১৭

পুলকের জ্বরটা প্রায় সপ্তাহ-খানেক খুব বেশী থাকিয়া তার পর ক্রমশঃ কমিয়া আসিল, কিন্তু অল্প অল্প জ্বর যেন আর ছাড়িতে চায় না। প্রতিদিনই একটু করিয়া জ্বর হইত। সবিতা মনে মনে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু শ্বশুরের শরীর ভাল নয় বলিয়া তাঁর কাছে কিছু বলিতে পারিত না।

এই একটুখানি পুলকই তার অনেকখানি সান্ত্বনা, বড় সম্বল, যথা-সর্ব্বস্ব! এই পুলক না থাকিলে সে যে এই অকরুণ বাড়ীতে কি করিয়া দিন কাটাইত, তাহা সে ভাবিয়া পায় না! শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে কি পুলককেও হারাইতে হইবে? মনে করিলেও তার চোখ জলে ভরিয়া আসে!

বিছানার উপর বসিয়া পুলক খেলা করিতেছিল। রংটি ফেকাসে সাদা হইয়া গিয়াছে, মুখের রং আরো বেশী সাদা,—হাত-পাগুলি শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কেবল শুকায় নাই তার মুখের হাসিটুকু! আর সামর্থ্যে কুলাক্ বা না কুলাক্, মনে মনে ছুটাছুটী করিবার ইচ্ছাটুকু খুবই আছে এখনো।

সবিতা ঘরে ঢুকিয়া তাকে বুকে চাপিয়া চুমু দিতেই অকস্মাৎ অকারণ আদর পাইয়া পুলক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—কি বৌমা!

সবিতা মুখে হাত বুলাইয়া বলিল,—না বাবা, কিছু নয়, এমনিই তোমাকে একটু আদর করলুম।

—ওঃ! বলিয়া সে আবার খেলিতে লাগিল। সবিতা স্নেহ-মুগ্ধ চক্ষে তার খেলা দেখিতেছিল, এমন সময়ে গুপী আসিয়া জানাইল, কর্ত্তা ডাকিয়াছেন!

সবিতা ব্যস্ত হইয়া শুনিতে গেল।

বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়াই কর্ত্তা সেই পোষাকে কাগজ-পত্র সব দেখিতেছিলেন। কয়েক দিন হইতেই ইনি দেশে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। কাজকর্ম্ম ফেলিয়া বিশ্রাম লওয়া ভাল লাগিতেছিল না। কেবল পুলকের জ্বরটুকু ছাড়িতেছে না বলিয়াই যাওয়া স্থগিত আছে। পুলকের সামান্য জ্বরটুকু বন্ধ হইলেই দেশে রওনা হওয়া যায়! দেশ হইতে নায়েব বাবু চিঠি দিয়াছেন, সেখানে বিষয়-কর্ম্মে কি গোলযোগ ঘটিয়াছে—একজন কোন মনিব না গেলে তিনি কিছু ঠিক করিতে পারিতেছেন না। হয় অরুণকে, নয় তাঁকেই দেশে যাইতে হইবে। পুরাতন নায়েব মারা যাওয়ায় এই নূতন নায়েবকে রাখা হইয়াছিল, এর উপর নির্ভর করা মোটেই সুযুক্তি নয়!

সবিতাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—এই দ্যাখো মা, এই নায়েবের চিঠি পড়ে দ্যাখো,—না গেলে তো আর কিছুতেই চলে না,—বল তো, কি করি!

সবিতা চিঠি পড়িয়া কি যে বলিবে বুঝিতে পারিল না। পুলকের জন্যই ভাবনা, না হইলে তো সকলেই যাইতে পারিত। কর্ত্তা বলিলেন,—তা হ'লে আমি এখন যাই, পুলক সারলে অরুণ তোমাদের নিয়ে যাবে।

—কিন্তু আপনার তো শরীর ভাল নয় বাবা, কোথায় একটু কি ত্রুটি হবে আবার ব্যারাম বাড়বে,—সে কাজ নেই।

—কাজ নেই কি মা? পড়লে তো চিঠিখানা! সামনে কিস্তি, আদায় যদি ঠিকমত না হয় তো শেষটা যে মারা পড়তে হবে! তুমি তো বোঝো, বুঝেই দ্যাখোনা মনে করে।

সবিতা চুপ করিয়া রহিল। যদি অরুণ গেলেই চলে,

তার তাকেই পাঠানো হউক, এই কথাটা মনে আনিয়াও মুখে বলিতে তার কেমন লজ্জায় বাধিতেছিল। শ্বশুরের সুমুখে স্বামী-সম্বন্ধে কোনো কথা কখনো তো সে বলে নাই!

কর্তা বোধ হয় সেটুকু বুঝিতে পারিয়াই বলিলেন,—হ্যাঁ, অরুণকে পাঠাতে লিখেছে বটে,—কিন্তু ও গিয়ে করবে কি! ও কি কখনো করেছে এ সব, না, বোঝে কিছু? আমার না গেলে কিছুতেই চলবেনা।

সবিতা ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল,—অনেক কাণ্ড করে সবে মাত্র আপনার শরীর একটু সারছিল, হয়তো আবার খারাপ হয়ে যাবে,—কবে যাবেন?

কর্তা বলিলেন,—দিন সাতেকের মধ্যেই একটা বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলতে পারবো; তারপরেও যদি তোমাদের ফিরতে দেরী থাকে তো এখানেই নয় ফিরে আসবো। এতে আর শরীর কি এত খারাপ হবে?

—সঙ্গে কি শুধু গোপীই যাবে?

—তা বৈ কি,—কতকগুলো লোক গিয়ে কি হবে? সেখানে যারা আছে, তারাই সব চালিয়ে দেবে।

সেই দিনই গুপী চাকরকে সঙ্গে করিয়া কর্তা বাড়ী চলিয়া গেলেন। অরুণও সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ধমক খাইয়া তাকে থামিয়া যাইতে হইল। কনক খুব খুসী হইয়া একমুখ হাসিয়া বলিল,—বেশ হয়েছে, ন্যাকামীর উপযুক্ত পুরস্কার! দেশে থেকে বলবে বিদেশে যাব, আর বিদেশে এসে বলবে দেশে যাব!

অরুণ গম্ভীর মুখে ষ্টেশনে পিতাকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে গেল। ফিরিবার সময় তারা যে পথে আসিল, সে পথে অরুণ এর আগে বড় একটা আসে নাই; তাই চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে আসিতেছিল।

রাস্তা হইতে একটু উঁচুতে, হলদে লতায় মোড়া ছোট একটা সাদা বাড়ীর লম্বা বারান্দায় পাৎলা গড়নের এক সুন্দরী তরুণী একটী পাঁচ ছয় মাসের শিশু কোলে করিয়া ব্যস্ত পায়ে এমুড়ো ওমুড়ো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

শিশুটীর তীব্র চীৎকার কিছুতে থামাইতে না পারিয়া মায়ের মুখ অবধি কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিয়াছে,—কোন দিকে যেন আর চাহিয়া দেখিবার তার অবসর নাই।

ঠিক এই সময়ে একজন সাহেবী পোষাক-পরা স্নিগ্ধ-কান্তি যুবা হন্‌হন্ করিয়া বাড়ী ঢুকিয়াই পিছন দিক হইতে ছেলে কাড়িয়া লইয়া বিপন্না জননীকে হাসাইয়া দিল!

কনক অরুণকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল,—কি অরুণ, দেখছো তো!

—দেখছি। কে উনি,—চেনা না কি?

—উনি এখানকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ জ্ঞানেন্দ্র বাবু, আর উনি জ্যোতি,—বুঝলে? যার তুলনা তুমি এ জগতে খুঁজে পাওনা, সেই জ্যোতি! এখন জ্ঞানেন্দ্র বাবুর স্ত্রী!

লজ্জায় অরুণের মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল,—আরে! ও কি বলছিস তুই,—ছাই-ভস্ম!

—কেন, ছাই-ভস্ম ভাবা ভালো—আর বলাই বুঝি বড় খারাপ?

এ সময়ে তারা সে বাড়ীটা ছাড়াইয়া আসিয়াছিল। কনক জ্যোতিকে দেখিয়াছিল, কিন্তু জ্যোতি কনককে দেখে নাই, দেখিলে কনকদা বলিয়া ডাকিত। তবে সঙ্গে অপরিচিত লোক দেখিয়া যদি না ডাকিয়া থাকে! অরুণই জ্যোতিকে চিনিতে পারে নাই, তা জ্যোতি অরুণকে চিনিবে কি করিয়া?

কনক এই সব কথাই ভাবিতেছিল। অরুণ চুপ করিয়া আছে দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল,—কি হল ভাই তোমার? আবার এক ঘা লাগলো না কি?

—পাগল আর কি! যা তা বকে সময় নষ্ট করছো কেন, বল দেখি? ছেলের বাপ হয়ে যে আমার চেয়ে চল্লিশ বছরের বড় হয়ে গেছ,—এখন বসে বসে হরিনাম কর।

—হরিনাম! কনক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল;—হরিনাম করবো? কি করে বল তো! বোল হরি,—হরিবোল!

অরুণ বলিল,—রাস্তার লোকে যে পাগল বলবে।

—কাকে?

—তোমাকে,—আবার কাকে! যে পাগলামী করছো!

—আমি তখন বলবো, আমি তো কিছু করছিনে, এইই সব করছে, ওর একটু মাথার গোলমাল আছে কি না!

অরুণ হাসিয়া বলিল,—বাঃ! ভগবান ঘোর কলির এই যুধিষ্ঠিরটীকে বাঁচিয়ে রাখুন!

বাড়ী পৌছিয়া বৈকালের জল-খাবার খাইয়া কনক বলিল,—আমি এখন আর একবার বেরুবো, একজন বন্ধু এসেছে সেনিটেরিয়মে,—একবার দেখা করে আসি!

পুলকের ঝি তারা বলিল,—বৌমা বললেন আর একটু পরে বেরুতে,—এখনি ডাক্তার বাবু আসবেন, পুলককে দেখাতে হবে।

অরুণের মুখপানে চাহিয়া কনক বলিল,—কেন, অরুণ তো রইল।

অরুণ বলিল—হ্যাঁ, আমিই তো রইলুম।

—তবে আর কি! বলিয়া কনক বাহির হইয়া গেল। অরুণ সবিতার ঘরে গিয়া দেখিল, বিছানার একপাশে শুইয়া পুলক অকাতরে ঘুমাইতেছে। ঘরের এক কোণে একটী পিতলের ধুনুচি হইতে ধূপের ধোঁয়া উঠিয়া মৃদুগন্ধে ঘরের বাতাসকে সুরভি করিয়া তুলিয়াছে। টেবিলের উপর ল্যাম্পের কাছে সাজানো পুলকের ঔষধের শিশি, মেজর গ্লাস, আধখানা ভাঙ্গা বেদানা, এই সব খুঁটি-নাটি জিনিষের মাঝে খামে আঁটা একখানি চিঠিও ছিল। অসময়ে লেখা হওয়ায় বোধ হয় ডাকে যায় নাই। অরুণ চিঠি-খানি হাতে করিয়া দেখিল। খামের উপরে অতি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে আশার নাম লেখা, নামের নীচে ইংরাজিতে ঠিকানা লেখা। সে লেখাও পরিষ্কার, অশিক্ষিতের হস্তাক্ষর নয়!

চিঠিখানা রাখিয়া দিয়া অরুণ এটা-সেটা নাড়িতে লাগিল।

সবিতা তখন সে ঘরে ছিল না। সংসারের অন্য কোন্ কাজে ব্যস্ত ছিল। অরুণ তখন বারান্দায় একখানা চেয়ারে হাত দিয়া ডাকিল,—গুপী,—এই গুপী!

সবিতা বাহিরে আসিয়া বলিল,—গুপী যে বাবার সঙ্গে গেল, সে তো নেই!

অরুণ হাসিয়া বলিল,—ওহো! তাইতো! আমারই ভুল হয়েছে,—তা আর কেউ নেই? তুমি ওখানে কি করছো?

—কেন, কোনো দরকার আছে কি?

—নাঃ, থাক— বলিয়া সে একটুখানি দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তারপর সেই বারান্দার চেয়ারখানা নিজেই তুলিয়া লইয়া গিয়া সবিতার ঘরে নামাইয়া রাখিল।

সবিতা আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া দেখিল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তরকারি কুটিতে বসিল।

তার ঘরে চেয়ার রাখিবার এমন কি দরকার যে, নিজের হাতেই চেয়ার টানিয়া লইয়া যাওয়া হইল? ঘরখানার উপর দয়া? না, তার উপরে?

নিজের কথা মনে হইতেই সবিতার মন আবার বাঁকিয়া বসিল। তার তো সেই কত লাঞ্ছনা, কত নির্য্যাতন, বিনা-দোষে কি অপমানের বোঝা বহিয়া চোখের জলে ভিজিয়া দিন কাটিয়াছে। একদিন নহে, দুইদিন নহে, এমনি গভীর দুঃখে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যখন কাটিয়াছে, নিতান্ত পরেও শুনিয়া 'আ'হা' বলিয়াছে, সেই সময়েই তো সে দয়ার পাত্রী ছিল। এখন আবার তার উপরে দয়া প্রকাশ করিবার কি আছে?

এদিককার কাজ সারিয়া খানিক বাদে সবিতা নিজের ঘরে গিয়া সার্শির কাঁচের এদিকে থাকিয়াই দেখিল, প্রকাণ্ড ওভারকোট গায়ে দিয়া মৃদু মধুর সুরে গান করিতে করিতে অরুণ বাগানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঝাপ্‌সা জ্যোৎস্নাতে বাগান বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল।

পথ দিয়া নেপালী কুলিরা দল বাঁধিয়া সমস্বরে বাংলা সুরে হিন্দি গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে।

উঁচু রাস্তায় জুতা মস্ মস্ করিতে করিতে কনক বাসায় নামিতেছিল, অরুণকে দেখিয়া বলিল,—ও কি,—তুমি ঠাণ্ডায় বেড়াচ্ছো যে! ডাক্তার আসেননি কি এখনো?

অরুণ বেড়াইতে বেড়াইতে বলিল,—না, আজ আর কখন্ আসবেন!

—তা হলে তিনি আসবেন না, তুমি এসো। বলিয়া কনক বারান্দায় উঠিতে উঠিতে বলিল—এই, আর ঠাণ্ডায় থেকো না!

অরুণ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া চুপচাপ্ জ্যোৎস্নালোকিত বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

১৮

খোলা জানালার কাছে বসিয়া সবিতা কয়েকটা জামায় বোতাম বসাইতেছিল। কাজ শেষ না হইতেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া নীলাম্বরী সাড়ীর উপর চুম্কির মত, কালো আকাশের গায়ে অজস্র নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। কাজেই সবিতা ছুঁচ-সুতা তুলিয়া রাখিল।

পুলকের জ্বর সারিয়াছে। সে অন্য ঘরে তার ছোকরা চাকরের কাছে খেলিতেছিল, মাঝে মাঝে তার উচ্ছ্বসিত হাসির কলধ্বনি শুনা যাইতেছিল;—তা ছাড়া আর সব অন্ধকার, স্তব্ধ!

চাকরে আলো দিতে আসিল, সবিতা বলিল,—এখন থাক্—আর একটু পরে দিয়ো।

তার যেন এই অতল গহন অন্ধকারই ভাল লাগিতেছিল! আপনাকে ছদ্মবেশের আবরণে মানুষ যত কঠোরভাবেই ঢাকিয়া রাখুক, একটুখানি ফাঁক পাইলে নিবিড় অন্ধকারের গায়েও প্রাণের স্বরূপ ফুটিয়া উঠে!

দেয়ালের গায়ে হেলিয়া বসিয়া সবিতা তার নগ্ন প্রাণের মাঝে ডুব দিয়াছিল। অরুণ নিঃশব্দে আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল; বরাবর ঢুকিয়া পড়িতে পারিল না, একটু ইতস্ততঃ করিয়া স্বগতভাবে বলিল,—উঃ! এত অন্ধকার কেন?

সবিতা চমকিয়া সোজা হইয়া বসিল, বলিল,—কিছু চাই কি? বারান্দায় যাবো?

—না, না,—আমার কিছু চাইনে, তোমায় বাইরে আসতেও হবে না,—ঘরে আলো নেই কেন? চাকরগুলো সব গেল কোথায়?

—চাকরদের দোষ নেই। আমি ইচ্ছে করেই আলো নিই নি।

—কেন?

—এমনিই, আমার অন্ধকারই ভাল লাগ্ছিল, তাই,—আলো আনাবো?

—আমার জন্যে? না।

—ঘুম 'লেক্' দেখে ফিরতে রাত দশটা হবার কথা ছিল, তা—

—অতদূর আমি যেতে পারি নি,—পথ থেকেই ফিরতে হলো তাই এত শীগ্গির আসতে পেরেছি।

সবিতা ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। অরুণের প্রসন্ন চক্ষু দুটী একেবারে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

চাকর আসিয়া সবিতার ঘরে আলো জ্বালাইয়া দেওয়া মাত্র সে ঘরে ঢুকিয়া চেয়ারখানিতে বসিয়া পড়িল, একটু থামিয়া বলিল,—কই, তুমি তো জিজ্ঞাসা করলে না যে, এই আধা পথ থেকে ফিরলুম কেন?

সবিতা একটু হাসিয়া মুখ নামাইয়া বলিল,—কেন? কিন্তু তার স্বরে আগ্রহ ফুটিল না।

অরুণ বলিল,—একে বাবা বাড়ীতে নেই,—তোমাদের একেবারে খালি বাড়ীতে ফেলে রেখে যাওয়া—

—তাতে কি! এইটুকু সময়ের জন্যে!

—কিন্তু এরি জন্যে হয়তো বাবা এসে রাগ করতেন! অনর্থক বকুনি খেয়ে মরতে হতো! কেমন? ফিরে এসে ভাল কাজ করিনি কি?

—হ্যাঁ, বেশ করেছ বলিয়া সবিতা চলিয়া যাইতেছিল। অরুণ পায়ের উপর পা তুলিয়া ছাতার ফিতা খুলিতে খুলিতে বলিল, ওকি! কোথায় যাও? দাঁড়াও,—শোনো!

সবিতা থামিয়া বলিল,—বল;—শুন্ছি!

—অতদূরে থেকে হবেনা,—সরে এস এদিকে!

সবিতা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া সহসা ব্যাথাহত তীব্রস্বরে বলিল,—কি,—কি বলবে তুমি?

অরুণ একটু অপ্রভিত হইল বলিল,—আমার কথাটা পুরোপুরি দেখাব মাত্র। এই ছাখো!

সবিতা দেখিল, অরুণের পায়ের একটা নখ ছেঁচিয়া গিয়া মোজাটা রক্তে মাখামাখি হইয়াছে সে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল,—ও মাগো! এ কি হয়েছে?

—একটা ভারী পাথর তুলে বীরত্ব করতে গিয়ে শেষটা পায়ের উপর ফেলেছি.আর কি!

—এখনি জলপটী না দিলে যে পাক্‌বে!

অরুণ একটু হাসল। সবিতা একটু পরিষ্কার ন্যাকড়া ও জল আনিয়া অরুণের সামনে টেবিলে রাখল। অরুণ বলিল—এতখান পথ যদি এই খোঁড়া পায়ে হেঁটে এসেছি তবে এখন আর জলপটী দিয়ে কি হবে?"

—দিলে বোধ হয় ব্যথাটা একটু কম হতো।

অরুণ বলিল,—আপনিই সেরে যাবে।

সবিতা আর কিছু বলিল না। এর উপর কোনো কথা কহিতে গেলেই কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটি চলিবে বুঝিয়া সে নীরবে নীজের সেলাই-পত্র নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

এই দুঃসহ স্তব্ধতা অরুণ একেবারেই পছন্দ করিত না। সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—নাঃ, বাড়ীতে চুপ করে বসে থাকা যায়না তো! আমি একটু বেরুই—

সবিতার জিভের ডগায় কথা আসিল, তবে এলে কেন? কিন্তু সে তা বলিল না, একটু হাসিয়া বলিল,—পায়ে যে ব্যথা, বেড়াতে পারবে কি?

—ওঃ,—তাও তো বটে! বলিয়া অরুণ আবার চেয়ারেই বসিল। এমন সময়ে পুলকের কান্না শুনিয়া সবিতা ছুটিয়া গেল। চৌকাঠে পা বাধিয়া পড়িয়া গিয়া সে কাঁদিতেছিল।

সবিতা তাকে কোলে করিয়া তুলিল, কিন্তু স্বামীর সামনে অনর্গল আবোল-তাবোল বকিয়া তাকে তখনি ভুলাইয়া দিতে পারিল না, তাই পুলকের কান্নাও থামিল না। অরুণ বিরক্ত হইয়া ধম্‌কাইয়া উঠিল,—এই, অত করে চেঁচাসনে, থাম্, চুপ কর, এবার!

পুলক ভয়ে সবিতার বুকে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিল। অরুণ বলিল,—তুমি ওকে যে-রকম আদুরে করে তুলছো, কি যে হবে এরপর!

—কি আর হবে! এর পরে বাপের কাছে গিয়ে সৎমার আদর পাওয়া আর সম্ভব হবে না!

অরুণ হাসিয়া বলিল,—বাপের কাছে যাবে কি! তুমি কি ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে? কাশীতেও তো যেতে পারো না ওর জন্যে!

—আমার কথা থাক্,—ওর কথাই হচ্ছিল—

—তোমার কথাই বা থাকবে কেন?

—আমার কথা বলবার ভাব্‌বার কিছুই নেই, কোন দরকার নেই!

তেজ দেখাইয়া সদর্পে কথা বলিতে গিয়াও সবিতার আহত কণ্ঠে বেদনার সুর বাজিয়া উঠিল। লজ্জায় মুখ লাল করিয়া কথান্তর পাড়িবার জন্য বেশ সহজভাবে সে বলিল,—কনক বাবু আসবেন কখন্?

—রাত দশটায়! বলিয়া অরুণ উঠিয়া গেল। তারও প্রসন্ন হাসিমাখা সুন্দর মুখখানিতে চিন্তা বা বেদনার ম্লান ছায়া পড়িয়াছিল।

যেদিন কর্ত্তা বাড়ী হইতে আবার দারজিলিংএ ফিরিয়া আসিলেন, সেই দিনই কনকও কটক চলিয়া গেল। যাইবার সময় ট্রেণে বসিয়া কনক বলিল,—বেশ ক'দিন কাটানো গেল,—নয় অরুণ?

অরুণ হাসিল, বলিল,—তোমার আর মন্দ কাটে কোন্‌খানে?

—কিন্তু, আমার যেন মনে হচ্ছে, তোমারও মন্দ কাটছে না, কিছু পরিবর্ত্তন এনেছো!

অরুণ একটু চমকিল,পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল,—পাগল! আমার আবার পরিবর্ত্তন কোথায় কি দেখলে? আমি সং নাকি?

—না ভাই, সত্যি বলো,—এমন জায়গাতেও তোমার কিছু স্ফূর্ত্তি আসে না?

—চুলোয় যাক্ তোমার স্ফূর্ত্তি,—আর স্ফূর্ত্তি! তোমাদের ঐ স্ফূর্ত্তির জ্বালায় গেলুম আমি!

—সে তো একেবারে তোমার নিজের ইচ্ছায়—

—ব্যস্! ইতি কর,—ইতি কর, ভাই,—তোমার ট্রেণ দুলে উঠলো যে!—বলিয়া অরুণ ট্রেণের হাতল ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—এই দেখা বোধ হয় অনেক দিনের মতন?

কনক তখনো ট্রেণের মুখের কাছে দাঁড়াইয়াছিল বলিল, সম্ভবত—

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। অরুণ রেল লাইনের পথ ধরিয়া খানিকটা আসিয়া তারপর বাড়ীর পথ ধরিল।

কর্ত্তা বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, সবিতা

পুলকের কাজের চেয়েও সংসারের কাজ লইয়াই বেশী ব্যস্ত! সর্ব্বদাই তার হাতে একটা না একটা কাজ লাগিয়াই আছে।

বেশ-ভূষা সম্বন্ধে কিছুই সে কখনো গ্রাহ্য করিতনা, তবে স্বেচ্ছায় অবহেলা করিয়া নিতান্ত অপরিচ্ছন্নও কখনো থাকিত না,—এবারে তাও থাকিতে আরম্ভ করিয়াছে! দেখিলেই মনে হয়, বিশ্বের যত ব্যর্থতা, দীনতা সকল কিছুর পুঞ্জীভূত আশ্রয় সে!

বাস্তবিকই ইদানীং সবিতা ফর্সা কাপড় পরিতে গেলেই লজ্জিত হইত। কেন না, আজকাল স্বামীর চোখের আড়ালে থাকা যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও তার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে!

এমন অবস্থায় যদি তার কাপড়-চোপড়ের পারিপাট্য বলিয়াও তিনি কিছু মনে করেন তো, সে লজ্জা যে অসহ্য! স্বামীর কথায় বিদ্রূপের ঝাঁজটা তো তার যথেষ্টই জানা ছিল. সে ওই জিনিষটাকে যথেষ্ট ভয়ও করিত! কিন্তু সে শ্বশুরের কথা এড়াইতে পারিল না। বিশেষ তাঁর মত গম্ভীর মানুষের এক কথাকেই অকাট্য হুকুম বলিয়া মানিয়া লইতে হইত। তাই কর্ত্তা যখন বলিলেন,—কাপড় গুলো বড় ময়লা হয়েছে বৌমা, ওগুলো ছেড়ে ফেলো,—অত অপরিষ্কার থাক্‌তে নেই! বাধ্য হইয়া সবিতা তখন কাপড় ছাড়িল। কিন্তু অরুণের চোখ এড়াইতে পারিল না। বাড়ীর ভিতর হইতে একখানি বই হাতে করিয়া বাহিরে যাইবার সময় অরুণ সবিতাকে দেখিয়া একটু দাঁড়াইয়া মুগ্ধভাবে হাসিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—এখন এ বাড়ীতে ধোপার যাতায়াত সুরু হয়েছে দেখ্‌ছি যে!

সবিতা মাথা হেঁট করিয়া মুখ ফিরাইল। কোলে পুলক ছিল, সে বলিল,—না বৌমা, তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে,—খুব ভাল দেখাচ্ছে।

অরুণ তেমনি হাসিমুখে বলিল,—তাই তো দেখ্‌ছি!

সবিতা পুলককে নামাইয়া দিয়া হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিল,—কেন, কি দেখছো তুমি?

—ও কি, রাগ হয়ে গেল নাকি, এই সামান্য কথায়?

—লজ্জায়, ক্ষোভে, সবিতার মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল,—না, রাগ কেন হবে? আমি জানি যে আমার রাগ হতে নেই,—আর রাগ করতে যাবো কার ওপর?

—কেন, এই তো রাগ করেছ! বোঝোনা, কার উপর করেছ?

—কারো ওপরে নয়, বল্‌ছি। আমি রাগ করিনি।

—করেছ বৈ কি একটু! আচ্ছা,—আমি যাচ্ছি—

অরুণ বই হাতে করিয়া সোজা গেটের দিকে গেল। সবিতা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

পঞ্চাশৎ

পঞ্চাশ বছর গেল চলে,
কোন্ পথে গেল তারা যায় নাই বলে!
শুধু সাথে নিয়ে গেছে অনেক আমার,
সুখের দুখের সাথী, স্বপ্ন সুকুমার!

নয়নে কুয়াশা ছেয়ে আসে,
ছায়া করা বনে, ঝরা কুসুমের বাসে,
শুকান পাতার গাঁথা কাঁদনের সুরে,
কি কথা হিয়ার মাঝে বাজে ঘুরে ঘুরে?

ভোরের সে আলো-লিপিখানি,
আলো তার মুছে গেছে, মনে আছে বাণী,
সে বাণী উষার ভাষা, কিশলয় কথা
বসন্তের যাত্রা পথে ফুলের বারতা!

বর্ণ গন্ধ হাসিরাশি তার,
নিদাঘের দাবদাহ করিল নিস্তার!
চাঁপার আঙুলে খোলা বনের অন্তরে,
বকুল ফুলের শয্যা রচিল আদরে!

ঘুম ভেঙ্গে গেছে দিন শেষে,
গোধূলির রাঙা আলো চোখে ওঠে ভেসে,
নবীন উষার মত; এবার যে গান,
যে ফুল ফুটিবে, কোথা তার অবসান?

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বায়োস্কোপের কথা

সে আজ পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের কথা—আমরা তখন স্কুলে পড়ি, কলিকাতার ষ্টার থিয়েটারে প্রফেসর ষ্টীভেন্‌সন আসেন বায়োস্কোপ দেখাইতে। সে যেন একটা ইন্দ্রজাল! ছবির পটে লোক চলিতেছে, গাড়ী ছুটিতেছে, জলে ঢেউ খেলিতেছে—দেখিয়া সহর-শুদ্ধ লোকের তাক্ লাগিয়া গেল। ছবিগুলি ছিল আকারে ছোট একশো পারে নাই, এই ছোট ছোট চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ আজ এত বড় হইবে! ষ্টীভেন্‌সন ঐ ছবি দেখাইয়া বহুৎ টাকা লইয়া দেশে ফিরিলেন।

পরের বৎসর সাহেব আবার আসিলেন,—আসিয়া বিলাতী ছবি যা' দেখাইলেন, সেগুলা আকারে বাড়িয়াছে। তার উপর তিনি এখানকার পরেশনাথের শোভাযাত্রা,
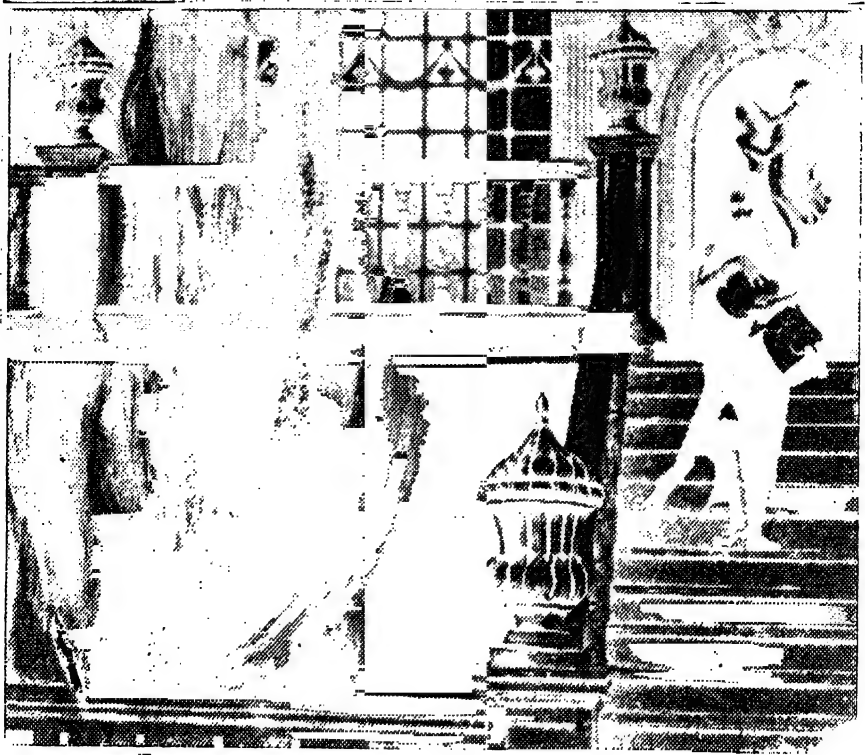
মাতৃস্নেহ প্রজ্বলিত আগুনের মধ্যে ছেলে-কোলে মা

ফুট দেড়শো ফুটের বেশী নয়, আর সে ছবি একটু ঝাপ্‌সাও ছিল। তার উপর ছবি চলিতে চলিতে চট্ করিয়া কোথাও জোড় কাটিয়া গেল! ছবির পর্দ্দায় কে যেন প্রকাণ্ড কালির দোয়াত উল্টাইয়া দিল,—পট অমনি কালোয় কালো। এ বিপত্তি হামেশাই ঘটিত! তবু সে তখন এই প্রকাণ্ড প্রচেষ্টার সূত্রপাত মাত্র। তখন কেহ ভাবিতে খিদিরপুরের ডকে জাহাজ সারানো হইতেছে, মিউনিসিপাল মার্কেটে কুলিরা তরমুজ খাইতেছে—এই সব ছোট ছোট দেশী ছবিও দেখাইলেন। ছবির পটে এদেশী লোককে জীবন্ত দেখিয়া আমরা ভারী বিস্মিত হইলাম। তবুও তখন এটা ভাবি নাই যে এই বায়োস্কোপের ছবিতে সারা বার্ণহার্ড, মাথিশন ল্যাং বা ওটিস
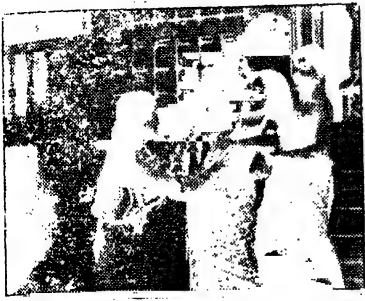
মাতৃস্নেহ—মাকে বাধা দেওয়া

স্কিনারের অভিনয়-কলা দেখিয়া একদিন প্রচুর আনন্দ পাইব!

হু হু করিয়া বায়োস্কোপের প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিল! মাঝে মাঝে বিলাতী কোম্পানি আসিয়া বড় বড় ছবি দেখাইয়া যান্—প্রতিবারেই ছবির মধ্যে একটু অভিনবত্ব থাকে—প্রতিবারেই দেখি, ছবির জগৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে! তারপর পাথি কোম্পানি কলিকাতার বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে ছোট-খাট একটা আস্তানা খুলিলেন। ১৯০৮ সালের কথা বলিতেছি; সে আস্তানায় দেখিবার শুনিবার একটু সুযোগ আমাদের ঘটিয়াছিল। তখন বায়োস্কোপে ছোট-খাট নাট্‌লীলার অভিনয় দেখানো সুরু হইয়াছে। তাঁহাদের অফিসে গিয়া ছবির পটে দেখিলাম, এক হিন্দু নাট্যের অভিনয়। নাটকটি করুণ রসাশ্রিত; তবে হিন্দুরাজার আকৃতিতে ও পোষাকে হিন্দু ঠাট্ রক্ষিত হয় নাই। রাজা নামে 'চন্দর সেন' হইলেও রাজাটিকে দেখিবামাত্র মুসলমান বাদশা বলিয়া ভ্রম হয়—মুখে মুসলমানী দাড়ি, মাথায় মুসলমানী ফেজ্, ও পোষাক-পরিচ্ছদ সবই মুসলমানী কায়দার। রাণীর বেশভূষাও তেমনি—আর রাজোদ্যানে নর্ত্তকীদের নাচ হুবহু বিলাতী ধরণের। এই ত্রুটিগুলির আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম, সাহেব-অধ্যক্ষের কাছে। তিনি বলিলেন,—ছবি তোলা হয় বিদেশে, তাঁদের এদেশের প্রাচীন আচার-ব্যবহার ব

বেদৌরা—পরীর ভূমিকায় মিস্ পেসেন্স কুপার

রীতি-নীতির সহিত তেমন পরিচয় নাই, অথচ এই-গুলার হদিশই বা সে দেশে দেয় কে! এ কথায় ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়াছিলাম—যে কাজের যা দস্তর, তা তো করা উচিত। হিন্দুনাট্য দেখাইতে চাও যদি তবে এমন একজন বিশেষজ্ঞ রাখো যিনি এই সব হাস্যকর ত্রুটিগুলা ঘটিতে দিবেন না, ছবিকে আর্টের দিক দিয়া নিখুঁৎ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া তুলিবেন। অধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন,—ইচ্ছা আছে তেমনি করার, তবে অসুবিধা বিস্তর।

ছবি দেখাইলেন, জে. এফ, ম্যাডান কোম্পানি তাঁর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বায়োস্কোপে।

ম্যাডান কোম্পানি সাধারণভাবে বায়োস্কোপ দেখাইতে সুরু করেন, গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলিয়া। শুধু শীতকালে সার্কাসের তাঁবুর পাশে বায়োস্কোপের তাঁবু পড়িত, আর প্রতি অভিনয়ে প্রকাণ্ড তাঁবু একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত। এমন লোক ছিল না যে এই বায়োস্কোপ দেখিতে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তাঁবুতে গিয়া না ঢুকিত।

বেদোরা

তারপরেই প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত জে, এফ ম্যাডান এলফিনষ্টোন্ বায়োস্কোপ খোলেন। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে আরো দুই-চারিজন বাঙালী বায়োস্কোপের ফিল্‌ম্ আনাইয়া ব্যবসায় সুরু করিয়াছিলেন। তাঁদের বায়োস্কোপ দু-একটা বাঙ্‌লা থিয়েটারে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হইত, কিন্তু ব্যবসায়ে তাঁরা লাভ করিলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তাঁদের ছবি সাধারণের দৃষ্টিকে তেমন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, কারণ ছবি ছিল অত্যন্ত ঝাপ্‌সা আর তার আলোর জোরও ছিল কম! প্রথম ভালো এই বায়োস্কোপ কোম্পানিই ভালো ভালো বিচিত্র নাটক ছবিতে দেখাইতে লাগিলেন—বায়োস্কোপের নেশা তখন বাঙালীকে এমন পাইয়া বসিল যে অতি-দরিদ্র যে, সেও চারি আনা মাত্র ব্যয় করিয়া তাঁবুতে বায়োস্কোপ দেখিয়া তার দারিদ্র্যের দুঃখ ভুলিত, দিনের শ্রান্তি মুছিত, আর বিচিত্র আলোয় আলো করা কল্পলোকে দুই ঘণ্টা বিচরণ করিয়া পুলক-ভরা প্রাণে বাড়ী ফিরিত!

বায়োস্কোপ যখন সাধারণের কাছে দস্তরমত সেলামী আদায় করিতে লাগিল, ম্যাডান কোম্পানি তখন এই

বেদৌরা—সাহাজাদা কামারাল জামান

কলকাতা সহরের বুকে অসংখ্য সিনেমা-হাউস তৈয়ার করাইতে লাগিলেন। শুধু কলিকাতাতেই বা বলি কেন, সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া প্রত্যেক বড় সহরে—বম্বায়, সিলোনে, অবধি অসংখ্য সিনেমা-হাউস গড়িয়া তুলিলেন। এই হাউসে বসিয়া নিত্য দুইটী করিয়া অভিনয়ে রাজা-মহারাজা হইতে সামান্য কুলি-মজুর পর্য্যন্ত সকলেই যে যার সাধ্যানুরূপ পয়সা ফেলিয়া ছবি দেখিতেছে!

এই যে লাভ হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া উদ্যোগী ম্যাডান সাহেব তখন এইখানেই ছবিতে দেশী নাটকের অভিনয়-লীলা তুলিবার দিকে মন দিলেন। এই ছবি তোলার ব্যাপারটি আনাড়ির দ্বারা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে প্রথমেই দরকার একজন ভালো ফটোগ্রাফার। বিলাত হইতে ফটোগ্রাফার আনিলেও ম্যাডান কোম্পানি সৌভাগ্যক্রমে বাঙালী ফটোগ্রাফারও পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র সরকার মহাশয়কে। জ্যোতিশ বাবু পাথি কোম্পানির কাজের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কল নাড়িয়া ফিল্ম খাটাইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক ছিলেন না। এই বায়োস্কোপ ব্যাপারটাকে তিনি পুরা রকমে আয়ত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ তিনি প্রথম হইতে দেখিতেছিলেন, এই বায়োস্কোপ ধীরে ধীরে ছোট একটু গণ্ডী হইতে যাত্রা সুরু করিয়া কি অসীমের পথে চলিয়াছে। বায়োস্কোপ দেখিবার লোক বাড়িয়াছে, এবং দিন দিন বাড়িতেছে। তাই বায়োস্কোপের ভবিষ্যৎটুকু তাঁর চোখে পড়িয়াছিল—সেই ১৯০৯ সালেই; এবং তিনি তাঁর সময় ও সুযোগের এতটুকু অপব্যবহার করেন নাই। ছবি তোলার কায়দাকে অভিনিবেশ-সহকারে এমন আয়ত্ত করিয়া লইলেন, এর ত্রুটি কোথায় তাও নির্দ্ধারণ করিয়া, ছবির ক্যামেরাকে এমন দুরস্ত করিয়া একেবারে হাতের মুঠির মধ্যে আনিলেন যে ক্যামেরায় আজ তিনি ভেল্কী খেলিতে পারেন। আজ তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ফিল্ম্-ফটোগ্রাফার!

ফিল্ম্ তুলিতে অনেক সময় এমন হয় যে কোথাও কোথাও ছবি অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়া পড়ে, তাহাতে দর্শকের কাছে ছবি dull হইয়া যায়—ছবিতে খুঁত আসিয়া পড়ে, এবং এই খুঁত সারিতে ফিল্মের অমন বহু শত ফিট অংশ

ছাঁটিয়া বাদ দিতে হয়। এই বাদ দেওয়া সহজ কথা নয়—কারণ তাতে খরচ আছে। এক হাজার ফুট ছবি তুলিতে গিয়া যদি সেটা বারোশো ফুট হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে এই যে দু'শো ফুট বাদ যায়, তার দাম সামান্য নয়।

এই অনুপাতে যদি আট-দশ হাজার ফুটের ছবিতে ১৫০০। ১৬০০ ফুট বাদ দিতে হয়,তাহা হইলে লোকসান বড় অল্প দাঁড়ায় না। ফটোগ্রাফারের কৌশলে এই লোকসানটাকে বাঁচানো যায়। ভালো এবং যা-তা ফটোগ্রাফারে প্রভেদ এইখানেই। তাঁর হাতে এত ফুট ছবি বাদ যাইতে পায় না, তাই লোকসানের আশঙ্কাও কম থাকে। জ্যোতিশ বাবুর হাত এমন পাকা যে এই বাড়তি-বাদের ভাগ তাঁর ছবিতে বড় দাঁড়ায় না। তার পর ফোকাশিং, সেটিং—এগুলাতেও ফটোগ্রাফারের হাত বড় অল্প নয়। ছবি আগাগোড়া sharp হওয়া চাই, কোথাও ঝাপসা ঠেকিবে না! তবেই তার আদর হইবে। কেমন আলোয় ছবি খুলিবে, close-up কতটা তফাৎ হইতে লইতে হইবে,—লইলে মুখের-চোখের ভাবভঙ্গী ছবিতে কেমন স্পষ্ট খুলিবে, সেগুলার জ্ঞান ফটোগ্রাফারের নখ-দর্পণে থাকিবে। তাছাড়া অভিনয়টি কেমন হইতেছে তার রস গ্রহণ করিবার শক্তিও তাঁর প্রচুর থাকা চাই। কেননা, ক্যামেরার সাম্‌নে যে অভিনয় চলিতেছে, ক্যামেরার লেন্‌সে একমাত্র-তিনিই তাহা দেখিতেছেন। অতএব ফটোগ্রাফারের দস্তুরমত রসজ্ঞ ও আর্টিষ্ট হওয়া চাই। তার পর যন্ত্রটি নিখুঁত রাখাও তাঁর কাজ। ফটোগ্রাফারের judgment-এর জ্ঞান খুব তীক্ষ্ণ থাকা দরকার। জ্যোতিশবাবুর তোলা "মাতৃস্নেহ," "বেদৌরা", "নর্ত্তকী তারা" ও "নুর জাহান" প্রভৃতি ছবি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, এগুলার ফটোগ্রাফি খুব নিখুঁৎ,—ছবিও বেশ sharp—বিলাতী উৎকৃষ্ট ছবির অনুরূপ।

বেদৌরা—চীন-সম্রাট

ফটোগ্রাফারের সঙ্গে সমান শক্তিশালী হওয়া চাই directorএর বা নাট্যাধ্যক্ষের। কোথায় কোন্ দৃশ্য কি, কি আসবাব দরকার, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া কেমন হইবে, অভিনয়ে ভঙ্গী ফুটানো, ভাব দেখানো,—এ সবগুলা

বেদৌরা—নর্ত্তকীর ভূমিকায় মিস্ টোকা হড্‌সন্

ডিরেক্টরের নির্দ্দেশে। ফিল্মের নাট্যকার যে scenario লিখিবেন, তিনি খুঁটিনাটি সব কথা লিখিয়া দিবেন—কোন্ দৃশ্যে কে আসিবে, কি করিবে,—কখনকার কি পোষাক, কি বেশ,—এগুলা তিনি ছকিয়া দিয়া খালাস পাইতে পারেন। যাহারা আসিবে, যাহারা অভিনয় করিবে, তাহারা কোথা দিয়া কেমন করিয়া আসিবে বা কাজ করিবে, তাহাই বা কেমন করিয়া করিবে, এগুলার নির্দ্দেশ করিবেন director. একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক্—'মাতৃস্নেহ' ফিল্মে আছে—প্রজ্বলিত গৃহ হইতে সন্তান-স্নেহ-উন্মাদিনী মা তাঁর সন্তানকে বহিয়া আনিতেছে। যিনি নাট্যকার নাটক লিখিয়াছেন, তিনি এইটুকু লিখিয়া দিলেন—'দেখাও, একটি গৃহে আগুন জ্বলিতেছে,—সোপানশ্রেণী ধূ-ধূ আগুন জ্বলিতেছে—মা আসিয়া দাঁড়াইল, ব্যাকুল দৃষ্টিতে আগুনের দিকে চাহিল, তার পর সেই অগ্নির মধ্য দিয়াই অধীর আকুল গতিতে ছুটিল। আগুন জ্বলিতে লাগিল তীব্র হইতে তীব্রতর তেজে। তার পর দেখাও সন্তানকে বুকে চাপিয়া মা আসিয়া উপরকার সিঁড়িতে দাঁড়াইল, আগুন, আগুন—সন্তানকে বেশ করিয়া ঢাকিয়া বুকে চাপিয়া মা ঐ অগ্নিময় সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া নীচে নামিল। দুই-চারিজন লোক সোপানের নীচে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, শিশুকে লইল; মাও অমনি মূর্চ্ছিতা হইল।" এতটা না লিখিলেও চলে। এখন ডিরেক্টরকে এইগুলি সাজাইতে হইবে—মার মুখের-চোখের ভাব তিনিই দেখাইয়া ফুটাইয়া দিবেন,তার পর এমন কৌশলে মাকে সিঁড়ি দিয়া উঠাইবেন, নামাইবেন, যাহাতে লোকে মার মুখের অধীর আকুল ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া ব্যাপারটার গুরুত্ব ও করুণ কঠোর ভাব বুঝিতে পারে। তারপর হয়তো তিনি আরো যোগ করিয়া দিলেন, মা যখন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবে, তখন চার-পাঁচ জন লোক এই নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে এই অতি ভয়ঙ্কর অগ্নিসাগরে ঝাঁপ দেওয়া হইতে মাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে,—কিন্তু মার প্রাণ সন্তানের প্রতি মমতায় এমন প্রবণ যে সে-সব বাধা ঠেলিয়াও তিনি উঠিলেন। অভিনয়ে এইটুকু যোগ করিয়া দেওয়ায় মার প্রাণটুকু দর্শকের চোখের সামনে আরো গভীর গাঢ় বর্ণে ফুটিল। এইজন্যই ভালো ডিরেক্টর না হইলে অনেক সময় ভালো লেখা Scenario মাটী হইয়া

যাইতে পারে। নাটক লেখা হইলে উচিত, যে যে অভিনেতা-অভিনেত্রী যে যে ভূমিকায় নামিবেন, তাঁহাদিগকে সেই সেই ভূমিকা ন্যস্ত করা। তাঁহারা পড়িয়া বুঝিয়া সামঞ্জস্য রাখিয়া অভিনয় দুরস্ত করিয়া ফেলিবেন; তারপর ছবি তোলার সময় ডিরেক্টর রিহার্শাল দেওয়াইয়া লইবেন। এই সময় বেশভূষা কেমন হইবে, বলিয়া দেওয়া দরকার। ধরুন, কোন অভিনেত্রীকে মাথার চুল আলুলায়িত করিয়া অভিনয় করিতে হইবে; সেদিকে কাহারো প্রথমে হুঁস

নর্ত্তকী তারা—জমিদার পৌত্রী শান্তির ভূমিকায় মিস্ সিলভিয়া বেল

পড়িল না। খানিকটা অভিনয়ের পর হুঁস হইল, তাইতো, খোঁপা থাকা উচিত নয় যে! তখন তিনি খোঁপা খুলিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ছবির রস কাটিয়া যায়। তারপর আর এক কাজ—নাটকের title লেখা। অল্প কথায় ছবির দৃশ্যের একটু পরিচয় দিয়া যাইতে হয়! এই titleই [illegible] নির্বাক [illegible] কাটাইয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ও সকলের বোধগম্য করে। "মাতৃস্নেহের" কথা বলিতেছি। অজ্ঞাত-পরিচয় লীলা তার শিশুপুত্রকে জমিদার-স্বামীর হাতে তুলিয়া দিলে, জমিদার-স্বামী যখন শিশুকে লইয়া চলিয়া গেল, তখন লীলার মাতৃ-হৃদয় শোকের আর্ত্তনাদে ভরিয়া উঠিল। শিশু জমিদার-পিতার গৃহে আদরে আছে, তা থাক—তবু লীলা থাকিয়া থাকিয়া জমিদার-বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—দাসী শিশুকে লইয়া বেড়াইতে যাইবে, অমনি সে দূর হইতে দৃষ্টির একটা ঝলকে তার মুখখানি দেখিয়া লইবে। এই দৃশ্যটি ছবিতে দেখানো হইয়াছে এইরূপ—জমিদার-বাড়ীর পিছনে একটা বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া লীলা ব্যাকুল দৃষ্টিতে এধারে ওধারে চাহিতেছে, কখন্ দাসীর সঙ্গে ছেলে আসিবে!

এই দৃশ্যটুকু দেখাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণেই পটে একটা লেখা দেখানো হয়—"মায়ের প্রাণ।" এই যে লেখা-

টুকু, এইটাই title। এখন, পটে এই titleটুকু দেখিবামাত্র দর্শকের মনে আপনা হইতে অনেকখানি ভাব অনেকখানি সহানুভূতি উৎসারিত হইয়া উঠিবে! 'মায়ের প্রাণ' বলিতে মার ব্যাকুলতা,—সন্তানকে দেখিতে না পাইয়া কতখানি বেদনা মার মনে, এই সবগুলা মিলিয়া দর্শকের মনকে এমন করুণ, আগ্রহান্বিত করিয়া তোলে যে সে অস্থির হইয়া থাকে—তাই তো, এরপর কি? তারপর কি?—এই লেখাটুকুর পরেই দৃশ্য ফুটিল, বেড়ার ধারে এইখানে "মায়ের প্রাণ" title না হইয়া যদি title হইত,—"লীলা প্রত্যহ আসিয়া জমিদার-বাড়ীর পিছনে বেড়ার ধারে দাঁড়াইত ছেলেকে দেখিবার জন্য—" তাহা হইলে ব্যাপারটা বেমানান্ হইত না বটে, তবে প্রাণে এতটা সহানুভূতি জাগাইত না! অল্প কথা, মৃদু ইঙ্গিত এগুলায় আর্টের লীলা চমৎকার খোলে! এই অল্পের ইঙ্গিতে এত প্রচুর ভাব পুঞ্জিত হইয়া ওঠে—যে তা too deep for tears.

নর্ত্তকী তারা—শান্তির অন্তিম শয্যায় গৃহিণীর ভূমিকায় মিস্ আলবার্টিনা

চঞ্চল চিত্তে লীলা এধারে ওধারে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছে। ঐ লেখাটুকু আছে, সেই সঙ্গে লীলার এই ভঙ্গী—দুয়ে মিশিয়া একটা পরিপূর্ণ ছবি ফুটাইয়া তুলিল।—এ ছবি মার অন্তরের ও বাহিরের—এ মাতৃস্নেহের মা'ই নয়—এ মা শাশ্বত মা, সন্তানের জন্য শাশ্বত অধীরতা বুকে লইয়া দাঁড়াইয়া—তবেই না দর্শকের মন গলিল!

বায়োস্কোপের ছবিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে বেশ বিচক্ষণ রসজ্ঞ লোক দিয়া title লেখাইতে হয়। বিলাতী ছবিতে আমরা দেখি, প্লটে তেমন বিশেষত্ব না থাকিলেও ঐ title গুলিতেই অনেক সময় বই ভারী জমিয়া ওঠে।

এ ছাড়া ভালো ক্যামেরা, ভালো অভিনেতা এ সব, তো চাইই—তবে যেমন-তেমন অভিনেতার দ্বারাও ভালো

মাতৃস্নেহ—ধীবর কর্ত্তৃক জলমগ্না বালিকার উদ্ধার

কাজ পাওয়া যায় যদি ডিরেক্টর ও ফটোগ্রাফার বেশ নিপুণ ওস্তাদ হন, সমজদার হন!

ম্যাডান কোম্পানি এই ছবি তোলার ব্যাপারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন—প্রকাণ্ড ষ্টুডিও করিয়াছেন, কলিকাতার দক্ষিণে টালিগঞ্জে। সেখানে নানা আসবাব সাজ-সরঞ্জাম ও দৃশ্য-পট আছে, আঁকা চলিতেছেও। যে নাটকে যেমন দৃশ্য প্রয়োজন, তেমনি পট সাজাইয়া আসর সাজাইয়া ফটোগ্রাফার ফুটের পর ফুট ফিল্‌ম্ ঘুরাইয়া ছবি তুলিতেছেন তারপর ছাঁট কাট জোড়-তাড় দিয়া নানা শিল্পীর হাতে ঘুরিয়া ছবি তৈয়ার হইতেছে, পটে পড়িতেছে, দর্শকেরা দেখিয়া প্রীতিলাভ করিতেছে।

ম্যাডান কোম্পানির সরঞ্জাম উৎকৃষ্ট, এবং তাঁদের ফটোগ্রাফারও ফিল্‌মের ছবি তোলায় ওস্তাদ। এ ওস্তাদী হাতের নিদর্শন আমরা ম্যাডান কোম্পানির তোলা বহু চিত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ম্যাডান কোম্পানির ছবি বিচক্ষণ সাহেবেও তোলে, জ্যোতিশবাবুও তোলেন। জ্যোতিশবাবুর ছবি একচুল নিরেস নয়, বাঙালীর পক্ষে ইহা সুখের কথা, গৌরবের কথা।

এ সবগুলার পর পাকা লোকের দরকার বিষয়-নির্ব্বাচন করিয়া নাটক লিখিতে। দেখা যাক্, ম্যাডান কোম্পানি এ বিষয়ে কতদূর সফলকাম হইয়াছেন।

তাঁরা বহু ছবি তুলিয়াছেন। তবে আমরা যেগুলি দেখিয়াছি, সেইগুলা লইয়া আলোচনা করিব।

প্রথমেই আমরা দেখি "শিবরাত্রি"—পয়সা এ ফিল্‌মে কোম্পানি যতই পান ছবি আর্ট-হিসাবে কিছুই নয়—না খুলিয়াছে অভিনয়, না খুলিয়াছে নাট্যবস্তু। তাহা অত্যন্ত নির্জীব, প্রাণহীন। তারপর দেখি, "বিষবৃক্ষ"। ছবি কে তুলিয়াছেন মনে নাই,—তবে সে ছবিখানিতে কতকগুলি অসামঞ্জস্য ছিল—সেগুলির জন্য যথেষ্ট রসহানি হইয়াছে। যেমন ঝড়ের মুখে নগেন্দ্র দত্তর নৌকার দোলন। গঙ্গায় ঢেউ ছিল না, অথচ আরোহীর পায়ের দোলায় নৌকা দুলিতেছিল বিষম। ঝড়ে নৌকা তেমন ভাবে দোলে না। এ খুঁত অমার্জ্জনীয়। ডিরেক্টরের উচিত ছিল, ঝড়ের সময় ছবি তোলা। যা হইয়াছে, সে আনাড়ির কাজ! এই একটু খুঁতে পরের ছবি ঘা খায়, অর্থাৎ দর্শক ভাবে, সেই সব অসামঞ্জস্য তো আবার দেখি! ব্যবসা-হিসাবে এই সব খুঁত দারুণ ক্ষতিকর, আর্ট হিসাবে তো বটেই! তার পর পাত্রপাত্রী-নির্ব্বাচনেও গলদ ছিল। কুন্দর চেহারা খাপ খায় নাই। কবি-বর্ণিত চরিত্রের অনুরূপ চেহারা খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। থিয়েটারেও এ দোষ ঘটে প্রচুর—তবে তার একটা কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে এই যে শুধু চেহারা দেখিতে গেলে অভিনয়ে খুঁৎ ঘটিতে পারে। কিন্তু বায়োস্কোপের বাক্‌হীন অভিনয়ে এ খুঁতের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম।

'বিষবৃক্ষে'র পর দেখি, 'মোহিনী।' মোহিনী-নাট্যে ডিরেক্টর ছিলেন বাঙলার কৃতবিদ্য প্রতিভাশালী তরুণ অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তিনিই রাজা-রুক্মাঙ্গদের ভূমিকায় নামিয়াছিলেন। তাঁর অভিনয় শেষ দৃশ্যে—যেখানে নারী-রূপমুগ্ধ রুক্মাঙ্গদ প্রণয়িনীর তৃপ্তির জন্য, নিজের প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য একমাত্র পুত্রকে স্বহস্তে তরবারির ঘায়ে বধ করিতেছেন—প্রাণে তখন নানা ভাবের প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছে!—ভারী চমৎকার হইয়াছিল—যে কোন বিদেশী উৎকৃষ্ট ফিলম্-অভিনেতার অভিনয়ের মতই তাহা হৃদয়গ্রাহী, আর্টিষ্টিক। মোহিনীকে বনমধ্যে প্রথম দেখিয়া তাঁর বিভ্রম, ছেলেকে আদর করিতে গিয়া মোহিনীর ইঙ্গিতে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, আর তাঁর সে সময়কার সেই অসহায় ভাব, মনের ভিতরকার সেই দ্বন্দ্ব মুখের ভঙ্গীতে

পরিস্ফুট হইয়াছিল এমন সুন্দর ভাবে যে দেখিয়া মনে হইয়াছিল,—ফিল্‌মের সভায় বাঙালী নহে খর্ব্ব! তবে মোহিনীতে খুঁত ছিল setting-এর। দৃশ্য-সংস্থানে সেকালের রাজোদ্যানে একালের লোহার রেলিঙ মনটাকে একেবারে খোঁচাইয়া থেঁতো করিয়া দিয়াছিল; title ও ছিল কম—এবং সে title খুব সুসমঞ্জস হয় নাই। এই ফিল্‌মে একটি তরুণী অভিনেত্রীও চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন,—তাঁর নাম পেসেন্স কুপার। বিদেশিনীর এদেশী চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় ভালই হইয়াছিল। এই অভিনেত্রীর চোখে এমন একটি স্নিগ্ধ করুণতা জাগিয়া ছিল—যে সেইটুকুই অভিনয়টিকে জমাট করিয়া দিয়াছিল।

এই অভিনেত্রী পরে আরো বহু চিত্রে বিচিত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং ফিল্‌ম্-অভিনয়ে তাঁর দক্ষতা এখন যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

মোহিনীর পর 'বেদৌরা' দেখি। এই ছবিখানির জাঁক-জমক, ঐশ্বর্য্য, চীনা আব-হাওয়া মনকে সত্যই বিমুগ্ধ করিয়া দেয়। তিনজন বিদেশিনী অভিনেত্রী ইহাতে চীনা নারীর ভূমিকায় নামিয়াছিলেন। তাঁদের ভাব-ভঙ্গী চীনা রমণের—এবং নাটকটি দেখিয়া একবারো মনে হয় নাই, এই কলিকাতা সহরের বুকের উপরই তার দৃশ্যাবলী ছবির পটে ছাপিয়া লওয়া হইয়াছে! মনে হইয়াছিল, চীনা দেশের চীনা নর-নারীর মেলায় চীনার প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি!

বিদেশী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কৃতিত্ব আমরা নিত্য দেখিতেছি নব নব বিদেশী চিত্রে। তার ঘটনা-সংস্থান, দৃশ্যাবলী যতদূর সম্ভব দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষেই দেখানো হয়। সে আয়োজনও যেমন প্রচুর, তার ফলনও তেমনি অপূর্ব্ব। 'থিওডোরা', 'লাষ্ট ডেজ অফ পম্পিআই' প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ে সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত হই, এ কি সম্ভব ছবিতে তোলা,—? না, এ তখনকারই দিনের সেই লীলা-খেলা তখনই ক্যামেরায় তুলিয়া লওয়া হইয়াছে!

সে-সব ফিল্‌মে অজস্র টাকা খরচ হয়। খরচ করিতেও বাধা নাই, কারণ, পৃথিবী জুড়িয়া ইহার দর্শক মিলিবে, খরচ উঠিয়া আসিবে, অর্থাগম হইবে। আর আমাদের বাঙ্‌লা উপন্যাস কাব্য বা নাটকও যেমন বাঙ্‌লা-জানা লোক ছাড়া পড়িবার পাঠক নাই, দেশী ছবি সম্বন্ধেও ঐ একই সমস্যা। কাজেই ভরসা করিয়া কোন্ ফিল্‌ম্-কোম্পানিই বা অত টাকা ব্যয় করিবে? না হইলে নাটকের অভাব কি? অশোক, বুদ্ধ প্রভৃতি চরিত্র তো আছেই, তাছাড়া প্রাচীন কাব্য নাটক ইতিহাস ও পুরাণ, প্রচুর মালমশলা মজুত রাখিয়াছে।

বেদৌরার পর ম্যাডান কোম্পানি "নর্ত্তকী তারার ছবি দেখান। গল্পাংশ মামুলি—তবু ইহার মধ্যে অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন,—মিস্ পেসেন্স কুপার, মিস সিলভিয়া বেল, বাঙালী অভিনেতা শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, মিস্ এ্যালবার্টিনা ও মিস্ চন্দা। এ বইয়ে ছোট-খাট খুঁত ছিল,—তবে ফটোগ্রাফি প্রথম শ্রেণীর। খুঁত যেটুকু, সেটুকু লেখার দোষেই ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ নাটকের লেখা জুৎসই হয় নাই। মান্ধাতার আমলের পুরানো ভাবের কাসুন্দি ঘাঁটা আজকালকার দর্শকের রোচে না।

'বেদৌরা'র পরই আমাদের ভালো লাগিয়াছে "মাতৃস্নেহ।" ইহার Scenario লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নাট্যাধ্যক্ষতা তিনিই করিয়া ছিলেন। ফিল্‌ম্ তোলা ও ফিল্‌মের কারবারের ব্যাপারে প্রিয়নাথ বাবুর ভূয়োদর্শিতা প্রচুর! তবু দুই-চারিটা খুঁত ইহাতেও যে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। লীলার পিঠে ধীবরের ছবি আঁকিয়া দেওয়া একেবারে আজগুবি ব্যাপার, অসম্ভবের সৃষ্টি! এদেশের জেলের ঘরে অত টাকা থাকে না, থাকিতে পারে না, এবং থাকিলেও তার মাথায় অত বুদ্ধি খেলে না। এ চিত্রে ধীবরের অভিনয় হইয়াছিল সবার সেরা। ধীবরের ভূমিকা লইয়াছিলেন, বাঙলা রঙ্গমঞ্চের প্রবীণ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী। ষ্টেজে ইনি যে অভিনয় করেন, তার চেয়ে ঢের ভালো হইয়াছিল তাঁর ফিলমের অভিনয়। এই অভিনেতাই কৃতিত্ব দেখাইয়া-

ছিলেন, মেয়ের বাপের ভূমিকায় "বরের বাজার" নামক নাট্য-চিত্রে। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, ভঙ্গী-কায়দা সমস্তই ঠিক-ঠিক বিষয়ানুরূপ হয়। 'মাতৃস্নেহে' জেলে সাজিয়া মাছ ধরিতে গিয়া জাল ঘুরাইয়া জলে ফেলা ও সঙ্গে সঙ্গে কুলকুচা করা, তাঁর বাজারে ঘোরা—এবং মৃত্যু-দৃশ্য ভারী চমৎকার হইয়াছিল। তার পর কৃতিত্ব দেখান্ মিস্ পেসেন্স কুপার। ধীবরের ঘরে পালিতা লীলার ভূমিকায় সংসার-অনভিজ্ঞ সরলা বালিকার সরল ভঙ্গী, নির্দ্দোষ সঙ্গ, জমিদার-পুত্র নির্ম্মলের শুশ্রূষা—এগুলা বনপালিতা বালিকার সারল্যের সঙ্গে চমৎকার খাপ খাইয়াছিল; তার পর শিশুকে স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া খাটিয়ায় শূন্য মনে বসিয়া পড়া, পরে মার প্রাণ ছেলের জন্য অধীর আবেগে প্রতীক্ষা জমিদারের বাড়ীর ধারে-ধারে—সে ভাবাভিনয়,—পরে বাড়ীতে আগুন লাগিলে ছেলের উদ্ধারে উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আগুনের মধ্যে প্রবেশ ও ছেলে লইয়া নিষ্ক্রমণ—দর্শকের চিত্তে অধীরতার বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল। দুলালের ভূমিকায় মায়ার্সও খুব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই তরুণ অভিনেতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

তার পর 'নূর জাহান'। এ চিত্রে মোগল-আমলের জাঁক-জমক, পর্ব্বতান্তরালে যুদ্ধের দৃশ্য, শের আফগানের ব্যাঘ্র-শীকার, আকবরের অভিনয় ভালো হইয়াছে। এ ছবিখানির ফটোগ্রাফি বিলাতী ছবির অনুরূপ, চমৎকার—এ বড় অল্প প্রশংসার কথা নয়। এ ছবিতে নূরজাহানের ভূমিকা লইয়াছেন মিস্ পেসেন্স কুপার। জাহাঙ্গীরের প্রেমের প্রথম নর্ত্তকী মেহেরুন্নিসার চিত্তে যে আলো জাগিল,—তাহার পরশে ছটা তার মুখে-চোখে নিমেষে যে পরিবর্ত্তন আনিল,—যাহার স্পর্শে বালিকার সারল্য ঘুচিয়া একমুহূর্ত্তে মেহেরকে সরম-কুণ্ঠিতা তরুণী নারীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল,—সেই ভাবটুকু মিস্ কুপার এমন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে তাহা সত্যই উপভোগ করিবার বস্তু। আকবর, শের আফগান, খশরু ও কুতবুদ্দিনের অভিনয় চলনসই হইয়াছিল। আর এই ছবিতে দৃশ্য-সংস্থান নিখুঁত। শিশু মেহেরকে বনমধ্যে ফেলিয়া যাইবার সময় মার ভূমিকায় মিস্ এ্যালবার্টিনার অভিনয় উপভোগ্য। স্নেহের মায়ার সে গভীর আকর্ষণ,—মিস্ আলবার্টিনা প্রাণস্পর্শী অভিনয়ে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। রসহানি করিয়াছে কিন্তু জাহাঙ্গীর। তার চেহারা মোটেই মানায় নাই—আর অভিনয়েও মুখে-চোখে কোন ভাব খেলে নাই। নিতান্ত আড়ষ্ট, নির্জ্জীব অভিনয়! এই অভিনেতার আরো অভিনয় যে-কয়টি চিত্রে দেখিয়াছি, কোনটিই চিত্তে এতটুকু রেখাপাত করিতে পারে নাই,—বরং বইয়ের রস কাটিয়া দিয়াছে। সকলকে চিত্রাভিনয়ে মানায় না—এই কথাটি ম্যাডান কোম্পানিকে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে বলি। এ ছাড়া "বরের বাজার" ছবি খুব ভালো হইয়াছে। 'পতিভক্তি' চলনসই।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে; বারান্তরে আরো কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। সেই সঙ্গে যে-সব বাঙালী ফিল্ম্ কোম্পানি,—অরোরা, ফটো-প্লে-সিণ্ডিকেট, তাজমহল ফিল্ম্—নূতন খোলা হইয়াছে, সেগুলির সম্বন্ধেও বিশদ আলোচনার ইচ্ছা রহিল। শিবসুন্দর।

চয়ন

ফুলের বেশাতি—

মৌমাছির কাণ্ড

নানা ফুলের এই যে নানা রঙ, এ বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ কি? ইহা লইয়া বৈজ্ঞানিক ও কবির দলে নানা গবেষণা হইয়াছে। কবির দল যে কারণ নির্দ্দেশ করেন, অকবি জগৎ সেটাকে আমোল দেয় না! তা না দিক্—বৈজ্ঞানিকদের কারণ-নির্দ্দেশ সারা জগৎ এতদিন মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন, কিন্তু সেদিকেও আজ বিরুদ্ধ মতের ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে।

ডারুইন-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরীক্ষার পর বলিয়াছিলেন যে ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র্যের ও বর্ণ-গভীরতার প্রধান

কারণ এই যে অন্ধকারেও ছোট ছোট কীটপতঙ্গেরা রেণু বহিয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ছুটিবে ঘটকালী করিয়া, আর তাহার ফলে ফুলের জগৎ বিরাট হইয়া উঠিবে, ফুলের বিকাশ চলিবে ফুল হইতে, এই সব কীট-পতঙ্গেরই দুতীয়ালীতে। গাঢ় ঘন অন্ধকারেও ফুলের বর্ণ কীট-পতঙ্গের চোখে পড়িবে এবং কেশর বা রেণু বহিবার পক্ষে তাহাদের কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। কীটপতঙ্গের চোখ লইয়া নানা রকমের পরীক্ষা সম্প্রতি হইয়াছে, এবং দেখা গিয়াছে, কোন পতঙ্গ সাদা রঙ দেখিতে পায় না, কতকগুলো মৌমাছি আছে যারা ফুলের লাল রঙ দেখিতে পায় না, তা সে লালবর্ণের ছটা আমাদের মানুষের চোখে যত উজ্জ্বলই ঠেকুক্। তাই ফুলের বাজারে ফুলেরা যে রঙের বাহার খুলিয়া বসে মৌমাছিদের লুব্ধ করিতে, তা কেমন করিয়া বলিব! আমরাও তো খোলা চোখে দেখিতে পাই, বাগানে কত ফুলে অমন মৌমাছি বসেও না। মধু নাই, ইহাই তার একমাত্র কারণ নয়,—কারণ, সে ফুলের রঙ মৌমাছির চোখে পড়ে না, কাজেই সে-ফুলের অস্তিত্বও সে বোঝে না, তাই সেধারে ঘেঁষ দেয় না। তীব্র নীল রঙ বহু কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট ও লুব্ধ করে। সম্প্রতি ডাক্তার রিট্-মায়ার এই তীব্র নীল রঙ (ultra-violet colour) সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া এ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং ডারুইনের দুতীয়ালীর থিওরি খাটে কৈ!

তারপর আজ এক বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা নোট-বহি লইয়া ফুল-ফোটা বাগানে মৌমাছির পিছু পিছু ধাওয়া করিয়া শুধু লক্ষ্য করিয়াছেন, বাগানের অসংখ্য বিচিত্রের ফুলের মধ্যে মৌমাছি কোনগুলাতে গিয়া বসিল, কোনগুলাকে বাদ দিল। কিন্তু পরীক্ষায় বহু বাধা! তা ছাড়া একটা মৌমাছির পিছনে কতদুরই বা ধাওয়া করা যায়! এ ফুল হইতে চকিতে উড়িয়া কোথায় সে কোন্ দিকে নূতন ফুলে চলিয়া গেল, আবার সেইটাই ফিরিয়া আসল কি না, সনাক্ত করা সে এক ভারী কঠিন ব্যাপার। এভাবে পরীক্ষা করিতে গেলে কত বহু বহু বৎসর কাটিয়া যাইবে, অথচ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে না।

ডাক্তার লুজ্ আর-এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিলেন, মৌমাছির একটি ডায়েরি আছে। কথাটা শুনিতে তাজ্জব লাগে! কিন্তু সত্যই ডায়েরি আছে। সেই ডায়েরি হইতে কোথায় সে কত ফুলে ঘুরিয়া আসিল, তাহা বলা যায়। এ ডায়েরি কাগজের পৃষ্ঠায় পেন্সিলে বা কলমের অক্ষরে লেখা নয় অবশ্য, এ ডায়েরি রাখার ধরণও একটু স্বতন্ত্র রকমের। মৌমাছি যে-ফুলে যখন গিয়া বসে তাহার রেণু তার পায়ে মিহিভাবে লাগিয়া যায়; এবং যখন মধু সংগ্রহ করিয়া সে চাকে ভরে, পায়ের সেই মিহি রেণুটুকু লাগিয়া থাকে; দিনের পর দিন মধুও যেমন সঞ্চিত হইতে থাকে, তার পায়ে সেই রেণুরাগ চাকের গায়ে চিহ্নিত থাকিয়া যায়। তাহা হইতে ধরা যায় সে কোন্ ফুলে মধু-আহরণে গিয়াছিল। প্রতি ফুলের স্বতন্ত্র রকমের রেণু—কোনটার আকার চাকার মত, কোনটার কেশের মত, কোনটা বা বাঙলা ৪এর মত দুমড়ানো। এক ফুলের রেণু অপর ফুলের রেণু হইতে বাছিয়া বাহির করা যায়।

ডাক্তার লুজ্ করিলেন কি,—না, একটি মৌমাছিকে ধরিয়া তার পা ব্রশে করিয়া ঝাড়িয়া লইলেন এবং তাহা আছাড়িয়া যে চুর্ণটুকু পাইলেন, সেটুকু মাইক্রস্‌কোপের তলায় ধরিলেন। ইহা হইতে ধরা গেল সে কোন ফুল হইতে সদ্য ঘুরিয়া আসিয়াছে। এমনি ভাবে মাস-মাস ধরিয়া পরীক্ষা চলিতে পারে। এ ব্যাপার লইয়া ফুলের বর্ণ-বিজ্ঞানের বিভাগে এখন বহু গবেষণা চলিতেছে; তবে বৈজ্ঞানিকেরা মৌমাছির কর্ম্ম-শৃঙ্খলা যেমন অবাক হইয়াছেন, তার চেয়ে ঢের বেশী অবাক হইয়াছেন তার ঐটুকু পায়ের সৃষ্টি চাতুর্য্য দেখিয়া।

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

শ্রান্তির শান্তি

আমরা যে কাজকর্ম্মের চাপে শ্রান্ত হয়ে পড়ি,—সম্প্রতি আবিষ্কার হয়েছে যে, তার কারণ অতিরিক্ত খাটুনির দোষে আমাদের পেশীসমূহ বিষিয়ে ওঠে। এই যে বিষ, এর নাম কেনা-টক্সিন। বিলিতী ইঁদুর, গিনি-পিগ আরো ছোট-খাট জানোয়ারকে ছ'ঘণ্টা খাটাবার পর জার্ম্মান

বৈজ্ঞানিক ডাক্তার উইসার্ট তাদের পেশী কুঁচকে দিয়েছিলেন, তার ফলে তারা মারা যায়। এ সম্বন্ধে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন, যদি কোন সুস্থ সবল প্রাণীর চামড়া ফুঁড়ে কেনা-টক্সিন ইন্‌জেক্‌সন করে দেওয়া হয়, তবে তার পেশীগুলি তখনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে। এই কেনা-টক্সিন অল্প মাত্রায় ইন্‌জেক্‌সন করলে শ্রান্তির মাত্রাও কম হয়; আর অল্প ইন্‌জেক্‌সনে তাদের সহ্যশক্তিও বাড়ে। এই থেকে তিনি এ্যাণ্টি-কেনাটক্সিন আবিষ্কার করেছেন—পিচকারি দিয়ে নিজের গা ফুঁড়ে এই এ্যাণ্টি-কেনাটক্সিন চালিয়ে তিনি দেখেছেন, এই ইন্‌জেক্‌সনের ফলে পরিশ্রম করবার শক্তি দ্বিগুণ বাড়ে। তাঁর এক বন্ধু ডাক্তার লোরেন এই ওষুধ গায়ে ফুঁড়ে বারো ঘণ্টা ধরে একরাশ খুব জটিল অঙ্ক কষে ছিলেন। তা ছাড়া এক স্কুলে স্প্রেতে করে ছেলেদের গায়ে এই এ্যাণ্টি-কেনাটক্সিন ছিটিয়ে দিয়ে তিনি দেখেছেন, যে-সব ছেলের অল্প পড়াশুনার পর চোখ বুজে ঝিমিয়ে পড়ত, তাদের চোখ সেদিন আর ঘুমে বুজে আসেনি এবং তাদের পড়ার উৎসাহ-আগ্রহও বাড়িল অসাধারণ রকমের, পড়াতেও শ্রান্তি ধরে নি। তবে ডাক্তার উইসার্ট বলেন যে, সঙ্গীন অবস্থা ছাড়া এ দাওয়াই প্রয়োগ করা ঠিক নয়। কারণ, তাতে পেশী এই দাওয়াইয়ের উত্তেজনা পেয়ে পেয়ে তার নিজস্ব শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। তিনি বলেন, এ দাওয়াই প্রয়োগের দরকার হয় যুদ্ধের সময়,—যখন হাজার হাজার সৈন্যকে অমন বহু ঘণ্টা ধরে অদম্য বিক্রমে যুদ্ধ করতে হবে। তাতে তারা শ্রান্ত হবে না।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

বে-পরোয়া উপন্যাস

পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই সাহিত্যের রাজ্যে উপন্যাসের মাত্রা রীতিমত বাড়িয়া গিয়াছে। এ লইয়া বাংলা দেশেই যে শুধু হৈ-চৈ উঠিয়াছে, তা নয়। আমেরিকার মত সৌখীন দেশেও এই ব্যাপার প্রচুর আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। দায়িত্ব ও কাণ্ডজ্ঞানহীন লেখকমাত্রেই উপন্যাস লিখিতে সুরু করিয়াছে; আর Sex-problem এর দোহাই দিয়া অনেকে এমন উপন্যাস লিখিতেছে, যাহাতে রচনা-কৌশল মোটেই নাই, এবং যেগুলি দেশের নীতির মাথায় কুঠারাঘাত করিতেছে। শস্তায় এই-সব উপন্যাস বাজারে বিকাইতেছে খুবই এবং এ-সব উপন্যাসের পাঠক বেশীর ভাগই অশিক্ষিত বা দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক, যারা শুধু কোনরকম ঝাঁঝালো একটা গল্প পাইলেই তৃপ্ত, আর যদি সে গল্পে দুর্নীতির আবহাওয়া সঞ্চিত থাকে, তবে তো কথাই নাই। সে সব পড়িতে তাহাদের উত্তেজনা ও আগ্রহের আর সীমা থাকে না।

এই সকল উপন্যাসে যে সব মানুষের জীবন-ধারার কথা থাকে, তাহাদের কস্মিনকালে কোথাও দেখা যায় না। পাত্র-পাত্রী আজগুবি দেশ ও কালের কাঠামোয় খাড়া হইয়া যা-তা বকিয়া ও করিয়া যায়! এই উপন্যাসের প্রাচুর্য্যে আতঙ্ক জাগিয়াছে দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা তরুণী-তরুণদের জন্য। তারা এই সব কাল্পনিক জাবের বিধি-নিষেধহীন যথেচ্ছ জীবন-যাত্রার প্রণালীর পরিচয় লাভ করিয়া বিকশমান তরুণ চিত্তকে এক আজগুবি আশার নেশায় মাতাইয়া তোলে এবং ফলে এই হয় যে বাস্তব জীবনে তারা বিধি-নিষেধের গণ্ডী ছাড়াইতে গিয়া অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, ও তাহার ফলে নিজেরাও ক্ষুণ্ণ হয়, অপরকে ক্ষুণ্ণ করে এবং তা ছাড়া সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বসে।

উত্তেজক সুরার মত এই শ্রেণীর উপন্যাস পাঠককে দ্বিধাহীন মাতালে পরিণত করিয়া তোলে! এই সব উপন্যাস পড়িয়া তারা বিবাহ-বন্ধনকে অত্যন্ত শিথিল করিয়া চক্ষে দেখে,—মন যা চায় বে-পরোয়া তাহাই করিয়া যাও—এমনি ভাবে চিত্তকে বিভোর করিয়া তোলে! এই সকল উপন্যাস নারীর প্রতি শ্রদ্ধা কমাইয়া নারীকে শুধু লালসার চোখে, আত্ম-পরিতৃপ্তির যন্ত্রভাবেই দেখাইতে সহায়তা করে। পৃথিবীতে এই বাধাহীন কুণ্ঠাহীন প্রেম ছাড়া যেন আর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই। মা বাপ ভাই বোন প্রতিবেশী—ইহাদের প্রতি যে মানুষের বিবিধ কর্ত্তব্য আছে, সে সব কথা ভুলাইয়া দিতে চায়।

আর্টের খোলস পরিয়া এই সব রচনা যে ভাবের প্রশ্রয় দিতেছে তাহাকে জোর করিয়া দাবিয়া না দিলে কালে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিবার আশঙ্কা আছে। মামলা মোকদ্দমা খুন জালিয়াতী এগুলা সারা পৃথিবীতে বাড়িয়াই যাইতেছে—এর হেতু নির্দ্দেশ করিতে গেলে দেখা যায় মূলে আছে পর-নারী-লাভের বাসনা! নারী যে শ্রদ্ধার পাত্রী, Chivalric Age-এর এই কথাটি মানুষ ভুলিতে বসিয়াছে। আমেরিকায় তাই এই শ্রেণীর উপন্যাসকে দাবিয়া দিবার জন্য সেখানকার কাগজের সম্পাদক ও সমালোচকের দল রণ-সাজে সজ্জিত হইতেছেন। শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

চীনার বৈশিষ্ট্য

সম্প্রতি ওয়াশিংটনের "জর্নাল অফ হেরেডিটি" পত্রিকায় শো ওআং নামে এক তরুণ লেখক লিখিয়াছেন, শরীরের ও মনের গঠনে চীনাদের মত সুস্থ সবল জাতি আর নাই! পুরুষানুক্রমেই যেমন তাহাদের বলিষ্ঠ শরীর, নৈতিক চরিত্রও তেমনি নির্দ্দোষ। চীনার রাষ্ট্র-ইতিহাসের মত এমন সুদীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসও অপর কোন জাতির নাই। জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্প-কলার চীনার মাথা খেলিয়াছে চিরদিন; এবং চীনারা শিল্প-কলার দিক দিয়াও এমন বৈশিষ্ট্য জগতে চিরকাল দেখাইয়া আসিয়াছে, যাহা দেখিয়া বিশ্ববাসী মুগ্ধ হৃদয়ে তার তারিফ করিয়াছে।

অনেকে বলেন, চীনারা সভ্যতার হিসাবে অনেক ধাপ পিছাইয়া আছে। এ কথা সত্য, প্রাচীন যুগে চীনা-সভ্যতা যে-পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছিল, তাহার তুলনায় মধ্যপথে সে গতির বেগ কমিয়া যায়—শুধু কমা নয়, গতি রুদ্ধও হইয়াছিল। এর কারণ চীনার ভৌগোলিক অবস্থান। প্রকৃতির নির্দ্দেশে চীনাকে সমস্ত জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন একা থাকিতে হইয়াছে বহুদিন; কিন্তু সম্প্রতি পাশ্চাত্য শক্তির সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে চীনারা চকিতে নিজেদের সামলাইয়া লইয়া অপর বিশ্ব-পথ-যাত্রীর সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়া যাত্রা সুরু করিয়াছে।

চীনার নৈতিক চরিত্র অকলঙ্ক—এটা প্রবাদ-বাক্যের মতই দাঁড়াইয়াছে! চল্লিশ শতাব্দী ধরিয়া চীনা শান্তি ও শিল্প-কলারই পূজা করিয়া আসিয়াছে। বিচারে চীনা নিরপেক্ষ। চীনার পারিবারিক কর্ত্তব্যজ্ঞান, বন্ধুত্ব, আতিথ্য ও অমায়িকতা জগৎ-প্রসিদ্ধ। কয়জন মাত্র চীনা হকার বা ফোড়ের ব্যবহারে সমগ্র চীনা জাতির চরিত্রের বিষয় যদি কেহ ধারণ করিতে যান তবে তিনি ভুল করিবেন। তারা চীনাকুলের কলঙ্ক—সে সব চীনা গৃহ হারা, দেশ-ছাড়া, সামাজিক জীবন বলিয়া তাহাদের কিছুই নাই! তবুও আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, হাওয়াই দ্বীপে চীনা ব্যবসাদারদের যাঁরা দেখিয়াছেন, তাঁরা এ কথা হলফ্ করিয়া বলিবেন যে তারা খুবই সজ্জন ও অমায়িক।

চীনে যে সব মিশনারী স্কুল আছে তার অধ্যক্ষেরা বলেন, মানসিক উৎকর্ষে চীনা ছাত্র মার্কিন ছাত্রের অনুরূপ, কোন বিষয়ে তাহাদের চেয়ে এক তিল ছোট নয়। তারা বিশ্ব-সাহিত্যে প্রচুর জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। আমেরিকায় কোন প্রসিদ্ধ কলেজের অধ্যক্ষ বলিয়াছেন—আমার চীনা-ছাত্রেরা সকলের সেরা। বিজ্ঞানে চীনা আজো বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই সত্য, ইহার কারণ বৈজ্ঞানিক আব্-হাওয়ার অভাব। হোমস্, পোশল্ জনশন, পোপিনোর মত মনীষীবর্গও স্বীকার করিয়াছেন, মানসিক উৎকর্ষে চীনা কোন জাতির চেয়ে খাটো নয়।

আকারে খাটো হইলেও চীনারা খুব পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী। আর তাহাদের দেহে শক্তিও প্রচুর। তাদের সবল পেশী, স্বাস্থ্য ভালো—'পুঁয়ে-রোগা' চীনা বড় একটা দেখা যায় না। চীনার এই নৈতিক ও শারীরিক শক্তির কারণও লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

১। বহু উন্নত জাতির সংমিশ্রণে চীনার জন্ম।

২। জনবহুল দেশে আধি-ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বেশী বলিয়া চীনারা কর্ম্মী, সংযমী এবং পরের দিকে চাহিয়া চলে।

৩। চীনাদের মধ্যে প্রচলিত পূর্ব্ব-পুরুষের পূজা, একান্ন-বর্ত্তিতা, বাল্য বিবাহ তাহাদিগকে স্বার্থপর হইতে দেয় না।

৪। কৃষিকার্য্য চীনার দেশে গৌরবের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

ঘর ও বাহির

নারী-প্রসঙ্গ

১লা বৈশাখ হইতে দিল্লীতে একটী কন্যা গুরুকুল খোলা হইবে। "জ্যোতিঃ"পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত বৈদ্যনাথ শেঠ এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী রাধারাণী দেবী গুরুকুলের আশ্রমের কার্য্য পরিচালনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ৩ বৎসর হইতে ১১ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কা বালিকাকে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হইবে। বর্ত্তমানে বালিকাগণের দশ বৎসরের জন্য অধ্যয়ন করিবার বন্দোবস্ত করা হইবে। পাঞ্জাবের আর্য্য প্রতিনিধি সভার উদ্যোগেই এই বিদ্যালয় খোলা হইবে। দিল্লীর প্রসিদ্ধ-ধনী শেঠ রঘুনাথ এই বিদ্যালয়ের জন্য আর্য্য-প্রতিনিধি সভাকে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত প্রথম বৎসর এই গুরুকুলের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা ইত্যাদি বিষয় জানিতে হইলে, কাঙ্গরী গুরুকুলের অধ্যক্ষের নামে চিঠি লিখিলে জানা যাইবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

—

গত ১১ই চৈত্র ১৩২৯ সন, কুচবিহারাধিপতির ৺কাশীস্থ ৺কালী বাড়ীতে ৺কাশী আয়ুর্ব্বেদ মহিলা-বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ৺কাশীস্থ সম্ভ্রান্ত রাজা, জমিদার, অধ্যাপক ডাক্তার কবিরাজ ও অনেক ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের সহ-সভানেত্রী কবিরাজ শ্রীমতী প্রমীলাবালা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী মহাশয়া সম্পাদকীয় রিপোর্ট পাঠ-ব্যপদেশে বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা, উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলীর বিষয় সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া সভার যাবতীয় জনগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন উকিল ৺কাশীবাসী শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় ৺কাশী-আয়ুর্ব্বেদ মহিলা বিদ্যালয়কে কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের একখানি বাড়ী দান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন ; এবং মাসিক দশ টাকা হিসাবে চাঁদা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

চারুমিহির।

—

প্রাচ্য দেশের সাতটি মহিলা-কলেজের জন্য আমেরিকার নারী-সমাজ প্রায় এক কোটী টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, এই টাকা নাকি সমস্তই সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে। যে সাতটী কলেজের জন্য ইঁহারা টাকা তুলিতেছিলেন, তাহার তিনটি ভারতবর্ষে, তিনটী চীনে, একটি হইতেছে জাপানে। ভারতবর্ষের এই তিনটী কলেজের একটি মাদ্রাজের উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, দ্বিতীয়টী ভেলোর মেডিকেল স্কুল, তৃতীয়টী লক্ষ্ণৌয়ের ইসাবেলা থাবার্ণ কলেজ। অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ সংগৃহীত হইয়াছে সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া এবং এক-তৃতীয়াংশ পাওয়া গিয়াছে মিঃ রক্‌ফেলারের পত্নী মিসেস রকফেলারের ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে। আমেরিকার মহিলাদের এই সহৃদয়তা বিশেষ ভাবেই প্রশংসার্হ। ভারতবর্ষের নারীদের শিক্ষার যেরূপ অভাব, তাহাদের শিক্ষার জন্য দেশবাসীর তাগিদও সেইরূপ কম। ইহা দেশের পক্ষে সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে। ইহার উপর অর্থ-সমস্যা ত আছেই। আমেরিকার মহিলাদের সংগৃহীত এই দানের অর্থে অর্থ-সমস্যার সমাধান না হইলেও দেশের যে একটা সম্প্রদায়ের রমণীদিগের উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। তদ্ব্যতীত এ দেশের শিক্ষার জন্য বিদেশের রমণীদের এই আগ্রহ ও তাগিদ দেখিয়া হয় ত আমাদের একটু চেতনার সঞ্চারও হইতে পারে। যদি হয়, সেটাও কম লাভ বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

সময়।

—

লোক-সেবা

গত ২৫শে মার্চ্চ রবিবার যশোহরে চাঁচড়া রাজ কাছারীর প্রাঙ্গণে যশোহরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের সভাপতিত্বে নবীনচন্দ্র মিত্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব হইয়া গিয়াছে।

অনেকেই পুস্তক, পদক, পুরস্কার এবং মাসিক চাঁদা দিবেন বলিয়া সভায় প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ডাক্তার এস্, সি, ঘোষ এম্, বি, স্কুলের মেডিক্যাল লাইব্রেরীর জন্য প্রায় ২০০০৲ টাকা মূল্যের পুস্তক দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং হ্যারিসন রোডের খ্যাতনামা পরলোক-গত ডাক্তার এস্ মিত্রের পুত্র মিঃ মণীন্দ্রনাথ মিত্র এটর্ণী অনেক পুস্তক ও টাকা দান করিয়াছেন।

স্বরাজ।

—

সদনুষ্ঠান :—আমাদের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সম্প্রতি কয়েকটী আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন শুনিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। এই শ্রেণীর চিকিৎসালয়ে সুফল ফলিলে আমরা ততোধিক আনন্দ লাভ করিব।

পল্লীবাসী।

—

স্থানীয় হাসপাতালের রোগীদিগের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য (বাঁকুড়া অন্তঃপুর মহিলা) সমিতির সভ্যাদিগের নিকট হইতে গত ফেব্রুয়ারী মাসে ৮ সাল ১২ পাই ১১ ছটাক চাউল আদায় হইয়াছে এবং উহা টাকায় ৭ পাই হিসাবে বিক্রয় হইয়া ২৪৷৶১৩ টাকা মূল্য পাওয়া গিয়াছে। খুচরা চাঁদা ৩৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বসমেত ২৭৷৷৵১৫ টাকা হইল। ফেব্রুয়ারী মাসে হাসপাতালে ২০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বাকী সমিতির হাতে মজুত ৭৷৷৵১৫ টাকা আছে। হাসপাতালে যে টাকা দেওয়া হইতেছে, তাহার সদ্ব্যবহার হইতেছে কি না দেখিবার জন্য সমিতির কয়েকজন সভ্য সমিতির সভাপতি মহোদয়ার সহিত সপ্তাহে একবার করিয়া হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে যাইবেন স্থির হইল। তদনুসারে সমিতির পাঁচজন সভ্য সমিতির সভাপতি মহোদয়ার সহিত এই মাসে হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া রোগীদিগের অবস্থা ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত ইত্যাদি দেখিয়া আসিয়াছেন।

—বাঁকুড়া দর্পণ।

মালদহের ক্ষ্যাপা বাবাজী দ্বাদশ বৎসর ভিক্ষা করিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা অন্নকূটের আয়োজন করিয়াছেন। প্রত্যহ ১৫।২০ হাজার লোককে এই অন্নকূট হইতে অন্ন বিতরণ করা হইতেছে। বাবাজীর মহৎ কার্য্য দেখিয়া মালদহের বহু ধনী লোক তাঁহাকে অর্থ সাহায্য দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

সংপ্রতি রেঙ্গুনে জাতীয় শিক্ষা প্রদান সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের সহিত একটা আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। উগ্রপন্থী দলের লোকেরা উহাতে আদৌ সন্তুষ্ট নহে। তাঁহারা উহার নিন্দা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। এই মাসের শেষাশেষি প্রোমেতে এই সম্পর্কে এক কনফারেন্সের আয়োজন হইতেছে। গত সপ্তাহে প্রোমেতে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের এক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা এই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকও এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মিলনে যে বক্তৃতা হইয়াছে, উহাতে এই কথাটা জোর করিয়া বলা হইয়াছে যে, জাতীয় বিদ্যালয়গুলি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত নহে। জাতীয় দলের মধ্যে কোন প্রকার ঝগড়া হউক কি না হউক শিক্ষাকে সকল প্রকার রাজনৈতিক দলের বাহিরে রাখা কর্ত্তব্য। সম্মিলনে এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, জাতীয় শিক্ষা-সংসদের নিয়মাবলী অনুসারে পরিচালিত হইবে। অন্য আর একটী প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, জাতীয় শিক্ষা সংসদ গবর্ণমেন্টের নিকট সাহায্য চাহিতে পারে।

রায়ত বন্ধু।

রিলিফ কমিটী বন্যাপীড়িত লোকদিগকে ধান দিয়া চাউল ভাঙ্গাইয়া লইয়া মজুরী দিয়া তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিতেছেন। কলিকাতা হইতে ধান্য আনিয়া দেওয়া হইতেছে এবং চাউল করাইয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া তাহা বিক্রয় করা হইতেছে। প্রায় বারো-হাজার লোক সাহায্য পাইতেছে। আশা করা যায়, দুই সপ্তাহের মধ্যে চারি শত মণ চাউল হইবে এবং রেলে কলিকাতায় পাঠানো যাইবে। এইরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা অতি উত্তম হইয়াছে। কারণ ইহাতে লোক অলস হয় না এবং ভিক্ষার লজ্জা হইতে লোক বাঁচে। এখনও আর ছয় মাস কাল সাহায্য নিশ্চয়ই করিতে হইবে। বালক-বালিকার স্বাস্থ্য খুব খারাপ। প্রায় সকলেরই প্লীহা-যকৃত আছে, পানীয় জল ভাল না পাওয়াই ইহার কারণ। আত্রাই গ্রামে একটী টিউব কুপ করা হইয়াছে। তাহাতে লোকের যে উপকার হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ এ সময় কলেরা আরম্ভ হইয়াছে, নদীর জল ব্যবহার করা উচিত নয়। রিলিফ কমিটির সাহায্যে অন্যত্র আরও এইরূপ টিউব কুপ প্রস্তুতের বন্দোবস্ত করা যাইতেছে। কাপড়ের অভাবে স্ত্রীলোক সাহায্য লইতে খুব কম আইসে।

— বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি গেজেট।

জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত থানা জলঙ্গি এবং তত্রত্য পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বর্ত্তমানে খুব কলেরার প্রাদুর্ভাব।

বিশেষতঃ চিকিৎসক ডাক্তারেরও এমন অভাব যে, ধনবান লোক ব্যতিরেকে, এক দাগ ঔষধ মিলে এমন আশা নাই। না না! কেননা যদি ষোল টাকা ভিজিট জুটে, তবে ১০ মাইল দূরে যমশেরপুরের ডাক্তার, কিম্বা সুন্দলপুরের পাঁচ টাকা ভিজিটের ডাক্তার ডাকান হয়, আর রোগীকে সমস্ত দিন ১৩ ঘণ্টা বিনা-ঔষধে থাকিতে হয়। অবসর-মত রাত্রিতে কোন সময় ডাক্তার আসিয়া রোগীর ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ দেন। নচেৎ রোগীর মহাপ্রস্থান অনিবার্য্য। দরিদ্র, কাঙ্গাল গরিবের তো কোন কথাই নাই। বেঙ্গলগবর্ণমেণ্ট জলঙ্গী এলাকার অভাগা দরিদ্র প্রজাদিগের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিয়া, কৃপা-দৃষ্টিপাত করেন এবং যে প্রকারে হউক এইখানে একটি সরকারী ডাক্তারখানা হয়।

রায়ত বন্ধু।

কালাজ্বর আসামের উপত্যকা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কিরূপে আমাদের ভিতর ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহার পরিচয় আমরা তেমন ভাবে পাইতেছি না। কারণ বাহিরের চেহারায় কালাজ্বর অনেকটা ম্যালেরিয়ারই অনুরূপ এবং বিশেষ পরীক্ষা ছাড়া এ দুইটি ব্যাধির ভিতরকার পার্থক্য ধরা যায় না। কিন্তু বাংলার স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের রিপোর্টে ইহার স্বরূপটা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। এই

রিপোর্টটী সদ্যসদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। কালাজ্বরের সম্পর্কে বাংলার বারোটি জেলা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছে, ২,৮০৭ গ্রামের ভিতর ৬৩৯টি গ্রামে এই ব্যাধির ছোঁয়াচ স্পর্শ করিয়াছে।

রোগী অন্যূন ৫০০০০ এবং এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা অন্যূন দশহাজার।

যে ব্যাধি প্রত্যেক বৎসর দশ-পনেরো হাজার লোককে পরলোকের পথের যাত্রী করিয়া তোলে তাহাকে দেশের সহজ শত্রু বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ নাই। এই ব্যাধিটী নিঃশব্দে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে দেশের বুকের উপর আসন গাড়িয়া বসিয়াছে, আমরা তাহা খেয়াল করি নাই। কিন্তু খেয়াল না করিলেও ইহার বিষ দেশের ভিতর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেদিক দিয়া ইহার তৎপরতার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। অথচ চেষ্টা করিলে এ ব্যাধিটির প্রসার বন্ধ করা অসম্ভব হইত না এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিলে এখনও ইহাকে নির্ব্বাসিত করা অসম্ভব হয় না। ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সম্প্রতি দোগাছিতে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দেশেরই একজন তরুণ কর্ম্মী ডাঃ নীরদবন্ধু ভট্টাচার্য্য তাঁহার কতকগুলি কর্ম্মী বন্ধুকে লইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। রোগের পরীক্ষা, ঔষধের ব্যবস্থা ইন্‌জেকসন এখানে সমস্তই চলিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটিকেই আদর্শ করিয়া দেশের অন্যান্য স্থানেও কালাজ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য আরো অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা দরকার। পরের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদেরই যে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়া প্রয়োজন হইয়াছে, এ কথা যদি এখনও আমরা না বুঝি, তবে এ সব দুঃখ আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহাদের মার হইতে কেহ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

স্বরাজ।

—

জনগণ-মন

আজ দুই কোটি বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে এক কোটী এগারোলক্ষ মানুষকে জল অনাচরণীয় বলিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া, অবশিষ্ট দুর্ব্বল নীতিহীন সঙ্কীর্ণচেতা কাপুরুষ-দল, এই অতীত গৌরবের মহাশ্মশানে আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে! আজিও বাঙ্গলায় নাকি ব্রাহ্মণ আছে, তাই লক্ষ লক্ষ অনাচরণীয় জাতি গললগ্নীকৃতবাসে তাহাদের সম্মুখে সামাজিক ও ধর্ম্মসাধনায় ন্যায্য অধিকারের আবেদন করিতেছে,—কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ সন্তানগণ শাস্ত্রহীন যুক্তি ও যুক্তিহীন শাস্ত্র, দেশাচার-লোকাচার এবং স্ত্রী-আচারের মোহে—সমাজ জীবনের কোন সমস্যার মীমাংসাই করিতে পারিতেছে না। মুসলমান যুগে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের অনুশাসন মাথা পাতিয়া লইয়া বাঙ্গালী বৌদ্ধ হিন্দু হইয়াছে। রাজনৈতিক প্রয়োজনে, দেশরক্ষার জন্য, হিন্দুসম্রাটের সহিত গ্রীক যবন-কন্যার বিবাহ দিতেও যে ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করেন নাই, সেই ব্রাহ্মণ, আজ আসন্ন সমাজ-বিপ্লবের মুখে দাঁড়াইয়া সমাজ জীবনের কোন সমস্যা মীমাংসা করা দূরে থাক্—ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণ কন্যার (রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক) বিবাহ পর্য্যন্ত দিতে পারিতেছেন না। এমতাবস্থায় হিন্দুর ভবিষ্যৎ কোথায়, বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ কোথায়! যদি ব্রাহ্মণ পঙ্গু হইয়া থাকে,—তবে তথাকথিত ব্রাহ্মণগণকে উপেক্ষা করিয়া দেশে নূতন ব্রহ্মণ্য-শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। ত্যাগী ক্ষমাশীল, বিলাস-বিতৃষ্ণ নবযুগের অগ্রদূতগণ অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

—

পুনা মিউনিসিপ্যালিটিতে সম্প্রতি অস্পৃশ্যদিগকে অন্যান্য জাতির অনুরূপ 'মিউনিসিপ্যাল ট্যাঙ্ক' 'পাইপ' প্রভৃতি ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য এক প্রস্তাব উথাপন করা হইয়াছিল। সভ্যদের ভোটে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন ভারতবর্ষে ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তাঁহাদের ব্যবহারের দ্বারা এই অনুন্নত সম্প্রদায়কে ক্রমেই বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছেন। যেরূপ অবিচার ও অন্যায় তাহাদের উপর করা হয়, বাস্তবিক পক্ষে তাহা সহ্য করাও কঠিন। তাহা ছাড়া উচ্চ সম্প্রদায়ের ব্যবহারের ভিতর যে অপমানের ঝাঁঝটা আছে তা সহ্য করার দ্বারা আত্মারও অবনতি ঘটে। কিন্তু সে কথা যাক, মিউনিসিপ্যাল ট্যাঙ্ক বা পাইপ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের এক-চেটিয়া সম্পদ নহে। তাহা সাধারণের সম্পত্তি। তাঁহাদেরও যেমন তাহা ব্যবহার করিবার অধিকার আছে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের ও তেমনি অধিকার আছে। কারণ ট্যাক্স কেবল তাঁহারাই দেন না—অনুন্নত সম্প্রদায়ও দিয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যাপারের পিছনে যে গভীর অন্যায় রহিয়াছে, উচ্চশ্রেণীর লোকেরা স্বার্থের খাতিরে আজ তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। হয়তো ইহাকে জয় মনে করিয়াই তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়াও উঠিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি ইহার সত্যকার চেহারা দেখিতে জানিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন, এই জয়ের পিছনে লুকাইয়া আছে তাঁহাদেরই পরাজয়।

স্বরাজ।

—

আমাদের সকল কাজ নিজেরাই করিতে থাকা ও তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই আমাদের বর্ত্তমান কাজ—ইহাই আমাদের স্বরাজ সাধনা। সকলকে এই কাজে সুযোগ দিবার জন্য প্রতি গ্রামে ও নগরে স্বরাজ কেন্দ্র রাষ্ট্রীয় সমিতি এবং প্রতি পল্লীতে স্বাবলম্বন-মূলক শি[illegible]কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এই দুইটিই স্বরাজ লাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। এই দুই কেন্দ্রের কর্ম্মিগণের সহযোগিতা চাই অথচ স্বাতন্ত্র্যও আবশ্যক। পল্লীবাসিগণকে এই দুই কাজের জন্য অন্ততঃ দুইজন চরিত্রবান্ উৎসাহী কর্ম্মীকে নিশ্চিন্তভাবে এই কাজে নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীর দশ-পনর জন গৃহস্থ এক একটী শিক্ষাকেন্দ্রের ভার গ্রহণ করিবেন। পল্লীর শিক্ষায়তনই পল্লীবালকগণের দ্বিতীয় গৃহ হইবে এবং শিক্ষক মহাশয় সর্ব্বতোভাবে পল্লী-বালকগণকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য সম্ভবত সর্ব্বদাই তাহাদিগকে আপনার কাছে রাখিবেন ও যথাসম্ভব তাহাদের খেলাধূলা, আমোদেও যোগ দিবেন। প্রাতে মানসিক শিক্ষা—অপরাহ্নে ব্যবহারিক শিক্ষা চলিবে। অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যচিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মী প্রতিষ্ঠা—কাজের গোড়ার কথা এবং অবিলম্বে হওয়া আবশ্যক। পরে ক্রমশঃ এইগুলি সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিবে ও স্বরাজ ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হইবে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

হিন্দু মুসলমান দায়ে পড়ে ভাই ভাই হয়েছি—যেহেতু আমাদের এজমালি বাপ ইংরেজ বর্ত্তমান—এরূপ ভাবলে চলবে না। হিন্দু মনে করে, ইংরেজ গেলে চারি পাশের মুসলমান রাজাদের সাহায্যে ভারতে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তার চেয়ে ইংরেজ থাকাই তো ভাল। মুসলমান ভাবে, একবার ইংরেজকে তাড়াতে পারলে কাবুলি গুণ্ডা এনে হিন্দুদের জব্দ ক'রে দেবে। পরস্পরের এই সন্দেহের ভাব দূর ক'রে একটা খোলসা বোঝা-পড়া ক'রে নিতে হবে। মুসলমান যদি গোরু কাটেই—তা সহ্য করতে হবে। আবার হিন্দু যদি মসজিদের সামনে দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যায়, সেটুকুও মুসলমানকে সইতে হবে। রাজকুমার এসে যখন জুতোর উপর একটা আবরণ প'রে দিল্লীর জুম্মা মসজিদ দেখতে গেলেন—তখন তো মুসলমান বেশ হজম ক'রে গেল। আবার ইংরেজ যখন গোরু কাটে, তখন হিন্দুরা বেশ চুপ ক'রে যায়। পরম হিন্দু গোশালা স্থাপনকারী মাড়োয়ারী ঘিয়ে গোরুর চর্ব্বি মিশাতে দ্বিধা করে না, কসাইখানায় হাড়গোড় জমা নিয়ে টাকা করতে সঙ্কোচ বোধ করে না—অথচ ধর্ম্মের জন্য মুসলমান লুকিয়ে একটা আধটা গোরু যদি কাটে তো অমনি হিন্দুর জাত যায়!

আত্মশক্তি।

গত ২০শে তারিখ নারিন্দায় এক জন-সভার অধিবেশন হয়। সহযোগী, অসহযোগী, উকীল, ডাক্তার, মোক্তার, সদাগর, শিক্ষক, অধ্যাপক, অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন, ঢাকা সহরের প্রায় সমুদয় গবর্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশন ও জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে অনেক ছাত্র সভায় যোগদান করেন, ঢাকাবাসী বিদ্যার্থীগণ কিরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন, সভায় তাহারই আলোচনা হয়।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর ঢাকা ছাত্রসঙ্ঘ নামে একটি সমিতি গঠিত হয়, সভাস্থলেই অনেকে সঙ্ঘের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হয়েন।

উদ্দেশ্য (১) ঢাকাবাসী ছাত্রগণের মধ্যে সঙ্ঘ জীবনের উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা। (২) বালক ও যুবকগণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ-সাধন।

করণীয়—(ক) লাইব্রেরী। (খ) স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা। (গ) সাহিত্য-চর্চ্চা—রচনা, পাঠ, আলোচনা। (ঘ) মাসিক পত্রিকা প্রচার। (ঙ) দরিদ্র বিদ্যার্থীদের সাহায্য। (চ) অসহায় পীড়িত ও মুমূর্ষুর সেবা। (ছ) মৃতের সৎকার।

উপরি-লিখিত উদ্দেশ্য ও করণীয় মানিয়া লইয়া ঢাকাবাসী বিদ্যার্থীগণ এই সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারিবেন। প্রত্যেক সাধারণ সভ্যকে মাসিক অন্যূন এক আনা বা এককালীন বার্ষিক অন্যূন আট আনা চাঁদা দিতে হইবে। কেহ মাসিক অন্যূন দুই আনা বা এককালীন বার্ষিক অন্যূন এক টাকা চাঁদা দিলে তিনি সঙ্ঘের বিশেষ সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

রায়ত বন্ধু।

বাংলা দেশে—এমন কি হতভাগ্য অধঃপতিত মুসলমান সমাজেও কয়েকখানি নূতন সংবাদপত্র প্রচারিত হইতে যাইতেছে। আমরা আশান্বিত হইয়াছি এই কারণে যে, সমাজে যত অধিক সংখ্যক দেশের যথার্থ কল্যাণকামী সংবাদপত্রের প্রচার হয়, ততই মঙ্গল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই ভাবিয়া শঙ্কিতও হইতেছি যে প্রস্তাবিত কাগজগুলির পরিচালকেরা হয়ত তাঁহাদের গুরুতর দায়িত্বের সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন না। তাঁহারা খোশখেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কিছুদিন মাত্র কাগজ প্রকাশ করিয়া তারপর তাহা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলে সংবাদপত্র-সেবীদের প্রতি সমাজের জনসাধারণের সন্দেহ ও অবিশ্বাস বাড়িয়া যাইবে মাত্র। ইহার ফলে ভবিষ্যতে অন্য কোন যথার্থ আন্তরিক হিতকামী ব্যক্তিও কোন কাগজ প্রচার করিতে চাহিলে শুধু লোকের অবিশ্বাস-মূলক উদাসীনতার জন্যই তিনি সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং যাঁহারা সংবাদপত্র-প্রচারে উদ্যোগী হইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বন্ধুভাবে এ কথা জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি যে, সংবাদপত্র-প্রকাশের কার্য্য যতই বাহ্যতঃ লোভনীয় ও আনন্দ-প্রদ বলিয়া প্রতীয়মান হোক না কেন, প্রকৃত পক্ষে উহা একই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ, এতই বিপদ-সঙ্কুল এবং লোকসানের নিশ্চিত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ যে, বিরাট ক্ষতি স্বীকার দিতে

প্রস্তুত না হইয়া কোন ক্রমেই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আসা সমীচীন নহে।

একখানির স্থলে জাতীয় দলভুক্ত স্পষ্টবাদী সংবাদপত্র দশখানি বাহির হোক, তাহাতে বরং আমরা আনন্দিতই হইব এবং তাহাদের ও আমাদের স্বার্থ ও কল্যাণ সমান মনে করিব। কিন্তু একটা খোশ-খেয়ালের উত্তেজনায় বা বসিয়া থাকা অপেক্ষা যাহা হয় একটা কিছু করার মতলবে সমাজের স্থায়ী মঙ্গলকে ক্ষুণ্ণ করিবার অধিকার কাহারও নাই, ইহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

মোহাম্মদী।

—

মনুষ্যত্ব

আর্ত্ত ও বিপন্নের সেবা সকল দেশেই প্রশংসার্হ। সে সেবায় যখন আবার সেবক নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, তখন তাহা স্বর্গীয় ও মনুষ্যলোকে আদর্শস্থানীয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ফরিদপুর সহরে কলেরা দেখা দেওয়ায় স্থানীয় সেবা-সমিতির যুবকগণ এমনই মহা-প্রাণতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইঁহারা রাত্রি জাগিয়া কলেরা রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। বাঙ্গালার পল্লী মফঃস্বলের যুবকমণ্ডলী ফরিদপুরের আদর্শ গ্রহণ করিলে দেশ আবার আরামের নিশ্বাস ফেলিবে, নানা রোগ-শোক-প্রপীড়িত পল্লী-ভূমি আবার বাসের যোগ্য হইবে। দেশে এমন নিঃস্বার্থ, পরহিতব্রত যুবকমণ্ডলীর যত আবশ্যক, তত বুঝি আর কিছুই নহে।

বসুমতী।

—

১৯২২ সালের ৮ই নভেম্বর পোর্ট কমিশনারের ফেরী ষ্টীমার 'নলিনী' যখন কাশীপুর ঘাটের সামনে আসিতেছিল তখন গঙ্গাবক্ষে একটী নিমজ্জিত-প্রায় স্ত্রীলোককে দেখা যায়। দুলমিয়া নামক জাহাজের একজন মুসলমান লস্কর নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া স্ত্রীলোকটাকে উদ্ধার করে।

এই ঘটনা বিলাতের রয়াল হিউম্যান সোসাইটীর নিকট জানান হইলে তাঁহারা সৎ সাহসের জন্য দুলমিয়াকে মখমলের উপর লিখিত একখানি প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। স্বরাজ।

—

ঘর-সংসার

লর্ড কার্জ্জন আর কিছু করুন না করুন লবণ শুল্ক কমাইয়া গিয়াছিলেন। ১৮৯০ সাল হইতে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত দেশে প্লেগ অত্যন্ত বেশী হয়। লবণ শুল্ক কমাইবার পর প্লেগ কমিয়া যায়। শুল্ক কমিবার পর হইতেই লবণের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। সুস্থ ও সবল হইতে হইলে লবণের ব্যবহার বৃদ্ধি করিতেই হইবে। নিম্নে কোন দেশে বৎসরে প্রত্যেকের পিছু কি পরিমাণে লবণ ব্যবহৃত হয় ও গড়ে তাহাদের আয়ু কত, তাহার হিসাব দেওয়া গেল :—

দেশ	লবণের পরিমাণ	আয়ু
ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড আয়র্ল্যাণ্ড	৩৬ সের	৪৫ বৎসর
আমেরিকা	২৪ „	৪৫ „
কানাডা	২২॥ „	৪৫ „
নরওয়ে সুইডেন	২২ „	৪৫ „
ফ্রান্স	১৭॥ „	৪০ „
জার্ম্মাণী	১৭॥ „	৪০ „
রুসিয়া	১৬। „	২৪ „
ভারতবর্ষ	৬ „	২৩ „

পাঠক বোধ হয় জানেন ইংলণ্ডে লবণ শুল্ক নাই।

হিন্দুরঞ্জিকা।

—

ছোট ছোট ছেলে-পিলেদের মধ্যে কলম বা পেন্সিল মুখে দেওয়া একটী মুদ্রাদোষ। অনেক পিতা মাতা বা শিক্ষক ছেলেদের মধ্যে এই দোষ দেখিয়াও কোন প্রতিকার করেন না ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয় পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোন পিতা-মাতারই বিষয়টীর প্রতি উদাসীন থাকা উচিত নয়। ছেলে-পিলেদের মধ্য হইতে এই দোষ যতদিন দূরীভূত না হইবে, ততদিন অন্ততঃ পক্ষে কাহারও পেন্সিল বা কলম হস্তান্তর করিতে দেওয়া অন্যায়। সাধারণতঃ আমাদের রোগের বীজাণু আমাদের মুখের লালাতেই বেশীর ভাগ থাকে। পেন্সিল বা কলম মুখে দিলে লালার সহিত বীজাণুগুলি ঐ পেন্সিল বা কলমে লাগিয়া যায়। পরে যে কেহ মুখে দেয়, উক্ত বীজাণু সকল তাহার মুখে প্রবেশ করে এবং এই প্রকারে নানারূপ ব্যাধি বিস্তার লাভ করে। এই সামান্য দোষটুকু যা অনেকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন তাহা দূরীভূত করা একান্ত দরকার—ইহা একটী প্রমাণিত বিষয়। খুলনা।

—

আসামের কর্ত্তারা কচুরী পানা বধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কিন্তু কি আসাম কি বাঙ্গালা—কোন স্থানের কর্ত্তারাই কচুরীকে কাবু করিবার ওষুধ খুঁজিয়া পাইতেছেন না—অগত্যা অগ্নিদানের ব্যবস্থা দিয়াই আপাততঃ নিশ্চিন্ত আছেন। মিঃ টি, এস গ্রিফিথ্‌স্ নাকি এক প্রকার আরক আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা ছিটাইয়া দিলেই কচুরী পানা প্রাণে মরে। ঢাকায় এই আরকের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে নাকি এখনও নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় নাই যে,

এই আরক কচুরী পানার পরমায়ু নাশ করিবার প্রকৃষ্ট ঔষধ। আগামী বৎসরে অনেকটা বিস্তৃত জায়গায় এই আরক ছিটাইয়া পরীক্ষা করিবার আয়োজন হইতেছে।

হিন্দুস্থান।

আমরা যদি বাঁচিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের যেটুকু ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে, তাহা কার্য্যে নিয়োগ করিয়া জাতিকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। স্বাস্থ্যহীন হইলে মন দুর্ব্বল হয়, মানুষ নীচ হয়। নীচ জাতি জগতে কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারে না। আমরা যদি মানুষের অধিকার ভোগ করিয়া জগতে মানব-জন্ম সফল করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে নিজেদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য এ কার্য্যে কোন উন্মাদনা নাই; কোন উত্তেজনা নাই—এ কার্য্য নীরবে, দেশের নিভৃত কোণে বসিয়া করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না—আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সৎকার্য্য কখনও ক্ষণিক উত্তেজনার বশে করিলে হয় না, মহৎ কার্য্য ধীরে ধীরে যুগ-যুগান্তরের পরিশ্রমে করিতে হয়। আমরা দেশবাসীকে স্বাবলম্বী হইয়া এ মহৎ কার্য্যে নামিতে বলি এখনও বসিয়া ক্রন্দন করিলে আমাদের মরিতেই হইবে, আমরা পৃথিবীতে কখনই বাঁচিব না।

—'বন্দেমাতরম্'।

সমালোচনা

শশিনাথ।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। সিদ্ধেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আড়াই টাকা। এখানি উপন্যাস; চমৎকার, সুলিখিত, মনোরম। সামাজিক সমস্যার সুললিত সমাধানে যেমন উপভোগ্য, চরিত্রের অপরূপ বিকাশে তেমনি বিচিত্র। সোমনাথ ও শশিনাথ দুই ভাই; দুটি ভাইই মানুষ, তবে সোমনাথের চিত্তে কতকগুলি সংস্কার এখনো ক্রিয়া করিতে ছাড়ে না; আর শশিনাথ ন্যায়ের পথে, কর্ত্তব্যের পথে বিনা-দ্বিধায় চলিয়া যায়; সে পথে সে কাহারো পানে দৃকপাত করে না, কাহারো আহ্বানে ফিরিয়া তাকায় না। শশিনাথ আগাগোড়া খোলা প্রাণের, দরদী চিত্তের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছে, তাহা কোথাও সম্ভাবনার গণ্ডী অতিক্রম করে নাই; অথচ বাঙলার নব্য সমাজে সে বহুদিক দিয়া বহু আলোক-রশ্মি সঞ্চারিত করিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের খোলস ছাড়িয়া সত্যের দীপ্ত তেজ লইয়া সে সমাজের যা-কিছু অন্ধকার আবর্জ্জনা সমস্ত হঠাইয়া চলিয়াছে। পিসিমা দেখা দিয়াছেন অল্প—কিন্তু তাঁর দরাজ প্রাণের মহিমা সমস্ত বইখানিতে হিল্লোলিত রহিয়াছে! তারপর ঊর্ম্মিলা ও লীলা—ঊর্ম্মিলা বাঙালীর ঘরের লক্ষ্মী বৌ, লক্ষ্মী মেয়ে। আর লীলা—তার জন্মের ইতিহাসে একটু কালি ছিটানো ছিল,—সেটা গোঁড়ার কাছে মস্ত দোষ - কিন্তু 'মানুষের' দরবারে কিছুই নয়! এই লীলাও প্রেমে মমতায় তেজে চমৎকার ফুটিয়াছে লেখকের ওস্তাদী তুলির লেখায়। তারপর সরযূ। সরযূ যখন চট্ করিয়া প্রথম আসিয়া আমাদের সামনে দাঁড়ায়, তখন তাহাকে একটু প্রগল্‌ভা বলিয়া মনে হয়—এইটুকুই যা অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে তার চরিত্রে; তবে সেও নিজেকে চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছে লেখকের তুলির পরশে। এক কথায় বইখানিকে সমাজের সকল প্রকার ভণ্ডামি, বদিয়তি আর সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেখকও কোথাও এই দোষগুলাকে চাব্‌কাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই—একেবারে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন. অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে, নির্ভীকভাবে; এক কথায় বলিতে পারি, উপন্যাসখানি স্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়ায় ভরপুর, আশার বাণীতে উজ্জ্বল—pessimism-এর কুণো কান্না ইহার কোথাও নাই; তাছাড়া রচনার ভঙ্গী, উপাখ্যানের বৈচিত্র্য এমনি যে পাঠক-পাঠিকাদের একাসনে বসিয়াই মুগ্ধ তন্ময় হইয়া ইহা পড়িয়া শেষ করিতে হইবে।

চামেলী।—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি এ প্রণীত। প্রকাশক রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। বেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা দশ পয়সা। এখানি উপন্যাস। ডুমা-রচিত 'কেমিও' উপন্যাস অবলম্বনে 'চামেলী' রচিত। আবহাওয়া ও ঘটনা-সংস্থান দেশী ছাঁচের হইয়াছে—এবং বাহিরের ঘটনাগুলিকে ঠেলিয়া পতিতা নারীর চরিত্র ও তাহারি ফাঁকে যে-সব প্রাণী তাহাদের চারিধারে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ায়, মৃদু ইঙ্গিতে তাহাদের চরিত্র-চিত্রও বেশ জ্বলজ্বলে হইয়া ফুটিয়াছে। পতিতার মনস্তত্ত্ব—তাহাদের সুখ-দুঃখ, আচার-ব্যবহার রেশমী শাড়ী ও পরিপাটি সাজ-সজ্জার অন্তরালে প্রাণে দোলা দিয়া যায়—সময় সময় দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে পুঞ্জিত হইয়া ওঠে, তাহাদের ছলাকলার একটা নিবিড় করুণ অর্থও এমনি পরিস্ফুট হয় যে সেগুলার জন্য রাগ হয় না, প্রাণে সমবেদনা জাগে। এদিকটার চিত্র দেখিয়া যাঁহারা শিহরিয়া ওঠেন, তাঁহারা এ কথা ভুলিয়া যান যে পতিতারাও মানুষ,—তারা ঘৃণার পাত্রী নয়,—বেচারী, দুর্ভাগিনী। সাহিত্যের মন্দির হইতে যদি তাহাদের উপর প্রদীপের আলোর দুই-চারিটা মৃদু রশ্মি গিয়া পড়ে, তাহাতে আলো দূষিত হয় না, বরং তাহাদের আঁধার-বুকের মধ্যে যে বেদনা অহর্নিশি জাগিয়া আছে, সেটুকু সকলের চোখে পড়ে—

তাহারাও সহানুভূতির দুই-চারিটা ছিটা পাইয়া সান্ত্বনা লাভ করে। চামেলী বইখানি করুণ রসে স্নিগ্ধ, সহানুভূতির ধারায় নির্ম্মল, বৈচিত্র্যে ভরা। ভাষার দুই-চারি জায়গায় অস্ফুটতা আছে, আড়ষ্ট ভাবও আছে, এইটুকুই যা' ত্রুটি! তবে লেখকের এই প্রথম লেখা বলিয়া সেটুকু উপেক্ষা করা চলে।

অরুণিমা। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি হইতে প্রকাশিত। ধন্বন্তরি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। বহু খণ্ড-কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলিতে বৈচিত্র্য আছে এবং অধিকাংশ কবিতাই ভাবে ছন্দে, ভাষায় ভঙ্গীতে উপভোগ্যও হইয়াছে।

স্রোতের ঢেউ। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ প্রণীত। চন্দননগর পুস্তকাগার হইতে প্রকাশিত ও চন্দননগর সাধনা প্রেসে মুদ্রিত। লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"সংসারের পথে চল্‌তে চল্‌তে যখন যেটা দেখেছি বা দেখে ঠেকেছি এবং শিখেছি তখনই সেগুলি মনের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যত্ন করে সংগ্রহ করে রেখেছি।" ছোট কথায় মনের নানা বিক্ষিপ্ত চিন্তা এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এগুলি সুপাঠ্য এবং অনেকে এগুলি পড়িয়া তৃপ্তি ও সান্ত্বনা পাইবেন। ছাপা কাগজ ভারী মনোরম হইয়াছে।

চিঠি। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরণজিৎ কাঞ্জিলাল, ৯৩।১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সখা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এই বহিখানিতে পত্রচ্ছলে ছোট-খাট একখানি উপন্যাসের মধ্য দিয়া নব্য বঙ্গের চিত্তে সম্প্রতি যে নর-নারী-সমস্যার কথা জাগিয়াছে, লেখক তাহার পরিচয় দিয়াছেন। বিভিন্ন চরিত্রের বিকাশে সমস্যার নানা দিকেরই তিনি আলোচনা করিয়াছেন। ভাষা যেমন সরস, মিষ্ট, যুক্তিও তেমনি সুনিপুণ। উপন্যাসের আর্ট কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই; রচনা-কৌশলের যে পরিচয় পাই তাহা অপূর্ব্ব। নীহার, কনক, বৌদি, মোহিত, নরেশ—সমস্ত চরিত্রগুলিই ছাড়া-ছাড়া চিঠির ভিতর দিয়া বেশ ফুটিয়াছে—স্বকীয় বিশেষত্বে। চরিত্রগুলি জীবন্ত, সমাজে প্রাচীন ও নবীন চিন্তার সংমিশ্রনে সেগুলির সৃষ্টি! বইখানিতে পড়িবার ও ভাবিবার বস্তু আছে প্রচুর। আরো একটি বিশেষত্ব এই যে সকল দিকই লেখক বেশ প্রাণের গভীর সহানুভূতির ধারায় সিঞ্চিত করিয়া আমাদের চোখের সামনে ধরিয়াছেন,কোনো দিকে পক্ষপাতিতায় চলেন নাই। তার ফল হইয়াছে এই যে পাঠক স্বাধীনভাবে সকল দিকের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া একটা মীমাংসা করিতে পারিবেন। বহিখানির ছাপা কাগজ ভালো।

শ্রীভরত। শ্রীমতী মানময়ী দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এল, ১৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ষ্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি সমালোচনা-গ্রন্থ, অথচ নারীর লেখা। কবিতা ও উপন্যাসের মায়া কাটাইয়া লেখিকা চরিত-সমালোচনার পথে আসিয়াছেন, ইহাতে প্রথমে একটু বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম। বইখানি পড়িয়া প্রীত হইলাম। এ গ্রন্থে লেখিকা দক্ষতার সহিত ভরত-চরিত্রের আলোচনা করিয়াছেন। লেখিকার বিশ্লেষণ-শক্তি আছে, এবং চরিত্রালোচনায় বেশ নৈপুণ্যও তিনি দেখাইয়াছেন। বহিখানি ২৪০ পৃষ্ঠায় শেষ এবং তাহা লেখিকার চিন্তাশীলতারই পরিচায়ক।

ত্রিসন্ধ্যা-তত্ত্ব। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন লিখিত। কাশীধাম, ব্রাহ্মণ সভার আনুকূল্যে তত্ত্ব-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড কার্য্যালয়ের মহামণ্ডল মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। ব্রাহ্মণের ছেলেকে ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করিতে হয়। কেন করিতে হয়, সন্ধ্যার অর্থ কি—তাহাই শাস্ত্র পুরাণ পাড়িয়া লেখক এই পুস্তিকায় বুঝাইয়া দিয়াছেন;—কিন্তু কথা উঠিবে, এই জীবন-সংগ্রামের দিনে মানুষের যেমন সময়-সংক্ষেপ, তাহাতে ইহার সার্থকতা বুঝিলেও কয়জন সে অনুষ্ঠান করিবেন? তবে শাস্ত্র-কথার মর্য্যাদা যিনি বোঝেন, যিনি বুঝিতে চান, তিনি এ পুস্তিকা-পাঠে উপকৃত হইবেন।

তুলসী-মাহাত্ম্য। শ্রী কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সঙ্কলিত। কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা হইতে প্রকাশিত ও মহামণ্ডল মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা।

পুরুরাজ। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, বি, এন, ঘোষ, কলিকাতা লাইব্রেরী, ৪৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি নাটক। গান আছে, রাজা আছে, সেনাপতি আছে, রাজমহিষী, রাজকন্যা, নর্ত্তকী আছে, সখী আছে, তবুও নাটক হয় নাই। কথা-বার্ত্তার রিপোর্ট মাত্রই নাটক নয়—কাজেই এখানিকে নাটক বলিতে পারিলাম না।

দেবীর দুয়ারে। শ্রীযুক্ত রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত। প্রকাশক,রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। দেবীর দুয়ারে, তেজারতি, গরীবের মেয়ে, ভায়ের কোলে, অরুণা, সকল-হারা, সোনার তরী ও ঘরের লক্ষ্মী—এই কয়টি ছোট গল্প এই বইয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলিতে ছোটগল্পের আর্ট পুরামাত্রায় বজায় না থাকিলেও সেগুলির উপাখ্যানে বৈচিত্র্য আছে; নেহাৎ মামুলি নয়। আর মাঝে মাঝে লেখক ছবি আঁকিয়াছেন বেশ। মোটের উপর বইখানি সুপাঠ্য।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

বংশী ধ্বনি

প্রাচীন চিত্র হইতে

৪৭শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৩০ { তৃতীয় সংখ্যা

গান

ওগো সন্ধ্যারাণী মাথায় তোমার কুন্তলেরি ভার।
কেউ বোঝে না—বলে অন্ধকার।
স্নিগ্ধ ঘন গন্ধটি তার
তন্দ্রা ঢালে চক্ষে আমার,
আনে বাতাস তোমার নিশাস-পরশ করুণার।

শূন্য করে কুঞ্জ-ভবন চলে গেছে সে।
চলে গেছে—চলে গেছে—চলে গেছে রে!
কাঁদ্‌রে নয়ন কাঁদ্—
ভাঙ্‌রে পাষাণ-বাঁধ,
সারাবেলার গাঁথা মালা বিফল হল সে!

চেয়ে তোমার চাঁচর চুলে—নয়ন আমার এল ঢুলে।
অতলে ডুবিল পরাণ-মন ভেসে গেল অকূলে।
কাল-মেঘে চন্দ্র ঢল-ঢল,
কাল জলে ফুল্ল শতদল,
নিবল রবি, মৌন ছবি—চেয়ে আছি জগৎ ভুলে।

চাঁদের কলঙ্ক দেখে মিটমিটে ওই তারাগুলো
মিটমিটিয়ে চেয়ে চেয়ে হেসে ম'ল—হেসে ম'ল!
না হন্ তাঁরা রূপবতী,
তবু তাঁরা মস্ত সতী,
ভাবটা যেন—চোখে কাপড় দেবেন এবং কাণে তুলো!
হঠাৎ রাকা এল দেশে
তারার দলটি গেল ভেসে,
উঠল হেসে কলঙ্কী সেই চাঁদের অকলঙ্ক আলো!
মিটমিটে সব তারাগুলো—পুড়ে ম'ল—জ্বলে ম'ল।

মধুর প্রণয়—মিথ্যা সে নয়, মিথ্যা নহে প্রেমের আশা।
দুঃখ-স্বপন নয়গো জীবন, জগৎ নহে দুখের বাসা।
মর্ত্ত্যে প্রণয় স্বর্গে রচে
প্রেমেই প্রাণের দৈন্য ঘোচে,
আর্ত্তজনের নয়ন মোছে, শোনায় ফিরে আশার ভাষা।
ক্ষুদ্র মনের দুর্ব্বলতা,—
আবিল-করা পঙ্কিলতা—
প্রেমের স্রোতে সব ভেসে যায়, কোথায় লুকায় পাইনা দিশা।
মানব-জীবন তুচ্ছ সে নয়,
এই জীবনেই জন্মে প্রণয়,
তুচ্ছ নহে নিখিল ধরা—যেথায় জুড়ায় প্রেমের তৃষা।

সখী, তারে বলে আয়—
আমার মনের আশা অভিলাষ—আমারে যেন সে না সুধায়।
তৃষিত নয়ন যার পথ চায়,
যার রূপ লাগি প্রাণ কাঁদে হায়,
তারে আঁখি ভরি না পারি দেখিতে—এ ব্যথা কহিব কায়।
হাসিবারে চাই হাসি সে ফোটে না,
দেখিবারে চাই নয়ন ওঠে না,
কত শত কথা মরমে উঠিয়া,—সরমে মিলায় হায়!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯

চার-পাঁচ মাস দারজিলিংয়ে কাটাইয়া কর্ত্তার সঙ্গে সকলে দেশের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার দিন-কয়েক পরে পুলকের পিতা প্রভাত ও তার মা পুলককে লইতে আসিলেন।

দিদিমা-অভাবে সবিতা যে পুলককে যত্ন করিবে বা আদর করিবে, এ কথা প্রভাত বা তার মা কেহ বিশ্বাস করিলেন না। বিশেষ, সম্প্রতি ব্যারাম হইতে উঠিয়া পুলকের শরীর দুর্ব্বল হওয়ায় এঁরা যত্নের অভাবটাই ধরিয়া লইলেন।

যখন পুলক নিতান্ত শিশু ছিল, বাঁচিবার আশা মাত্র ছিল না, তখন কেহ তার খোঁজ-খবর করাও দরকার মনে করেন নাই,—এখন মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাঁদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধিও জাগিয়া উঠিয়াছে! মনে পড়িয়াছে যে এই নধর-কান্তি শিশু যে তাঁদেরই নিজস্ব ধন! পরের ঘরকেই কি সে শেষে আপন বলিয়া বুঝিবে?

প্রভাত যখন আদর দেখাইয়া পুলককে ডাকিল,—এই খোকা,—খোকা! পুলক তখন অপ্রসন্ন মুখ বাঁকাইয়া বলিল,—আহা, আমার নাম যেন খোকা!

প্রভাতের মা আদর করিয়া তাকে কোলে করিতে গেলে সে রীতিমত চেঁচাইয়া ডাকিল,—ও বৌমা, শীগ্‌গির এসো!

সবিতা মলিন মুখে বলিল,—কি হলো বাবা?

পুলক মুখ ভার করিয়া বলিল,—আমাকে উনি ধরে নিয়ে যাবেন।

তার ঠাকুমা বলিলেন,—তা নিয়ে যাবো বই কি! আমার সৃষ্টিধর, বংশধর, দুলাল তুমি,—তোমার ঘরে তুমি যাবে না?

বাস্তবিক এখন এঁদের ভাবী বংশধর বলিতে এক পুলক ছাড়া আর কেহ নাই! প্রভাতের এ-পক্ষে দুটী কন্যা হইয়াছে, পুত্র হইতেও পারে, কিন্তু এখনো হয় নাই! বাড়ীতে আর ছেলে নাই বলিয়াই পুলকের জন্য তাঁদের এ আগ্রহ!

পুলক একবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—না, আমি যাবো না তোমাদের ঘরে।

পরক্ষণেই সে অবাক্ হইয়া তাঁর আদর করিবার ভঙ্গী দেখিতে লাগিল। সবিতা এঁদের অভ্যর্থনার আয়োজনে একটু সরিয়া যাইতেই পুলক চীৎকার করিয়া বলিল,—বৌমা? আমার বৌমা কোথায় গেল!

তার ঠাকুমা বলিলেন,—উনি বুঝি তোমার বৌমা? আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাব।

পুলক চারিদিকে চাহিয়া বলিল,—মা? কোথায় মা? মা কটকে গিয়েছেন,—মা নেই।

সকলের মুখে শুনিয়া শুনিয়া পুলক মেনকাকেই মা বলিয়া ডাকিত, আর সবিতাকে মামীমা না বলিয়া বৌমাই বলিত। সে 'মা' শুনিয়া মনে করিল যে, বুঝি ইনি মেনকার কথাই বলিতেছেন, তাই অবিশ্বাস করিয়া বলিল, মা নেই।

সবিতা ঘুরিয়া আসিয়া দেখিল, বাজারের ভাজা খাবারে পুলকের হাত দুটী ভরিয়া উঠিয়াছে,—সে শশব্যস্তে বলিল, —ওর যে অসুখ,—ও তো ও-সব খায় না। পুলকও এতক্ষণ অবাক্ হইয়া খাবারগুলির দিকে চাহিয়া ছিল। সবিতাকে দেখিয়াই ভয়ে সব খাবার ফেলিয়া দিল। তাতে তার পিতামহীর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

প্রভাতের মা ও প্রভাত অরুণকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তার কাছে অনুমতি চাহিতে গেলেন, পুলককে লইয়া যাইবার জন্য! সবিতা তখন সেইখানেই বসিয়া শ্বশুরের জন্য সানাটোজেন তৈয়ার করিতেছিল!

প্রভাতের মায়ের কথার উত্তরে কর্ত্তা বলিলেন,—আমার কোনো কথাই বলবার নেই, তবে বৌমা যদি কিছু বলেন—

সবিতা কৃতজ্ঞভাবে মাথা নামাইল। এইবারেই তো তার পরীক্ষা! পুলককে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া যে তার পক্ষে কি ত্যাগ স্বীকার, সে কেবল তার অন্তর্যামীই বুঝিতেছিলেন! কিন্তু যদি সত্যই পুলক তার বাপের

কাছে, ঠাকুমায়ের কাছে আদর-যত্ন পায়, তবে সে তাকে রাখিতে চায় কি অধিকারে? তবুও প্রভাতের অনর্গল বাক্যস্রোতের উত্তরে তার রুদ্ধ ওষ্ঠে 'না!' কথাটাই ফুটিয়া উঠিল।

প্রভাতের মা বিরক্ত হইয়া অরুণের দিকে চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ সবিতার সমস্ত মন সচেতন হইয়া উঠিল। এখানে তো তার পরাজয় একেবারেই নিশ্চিত। সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও তার স্বামী তার পক্ষ হইয়া একটী কথাও বলিবেন না, বরং বিপক্ষেই বলিবেন! এই এক-হাট লোকের মাঝে আবার সেই দুর্ভাগ্যের, সেই লজ্জার আর সীমা থাকিবে না! এই সঙ্কটের মাঝে অব্যাহতি পাইবার জন্য সে বুক-ফাটা হাহাকার কান্না থামাইয়া আর্ত্তস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল,—আচ্ছা, আচ্ছা,—নিয়ে যান আপনারা ওকে, আমার কোন আপত্তি নেই!

তার গলার স্বরে ও কথায় অরুণ আশ্চর্য্য হইয়া তারা দিকে চাহিয়া দেখিল। অস্ফুট রোদনের উচ্ছ্বাসে সে ফুলিতেছিল, তার মুখ দেখা গেল না! হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে বসিয়াছিল। যতক্ষণ না তাঁরা পুলককে লইয়া চলিয়া গেলেন, ততক্ষণ আর সে মাথা তুলিল না।

অনেকক্ষণ পরেও পুলকের কান্নার শব্দ যেন তার দুই কাণে আসিয়া বিঁধিতে লাগিল। নির্জ্জন ঘরে বসিয়া সে ট্রেণ-ছাড়া বাঁশীর শব্দে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল।

হেমন্ত-শেষের রৌদ্রটুকু দ্রুতগতিতে খেয়ার পারে ঢলিয়া পড়িল, তবু সেদিন তার চৈতন্য নাই! মনে হইতেছিল, সব কাজই বুঝি শেষ হইয়া গিয়াছে! আর সেই আবদারে ভরা কচি কণ্ঠের ঝঙ্কার তাকে জোর করিয়া সংসারের সব কাজে দাঁড় করাইবে না!

হঠাৎ ঝীয়ের ডাকে সম্বিত পাইয়া সে মুখ তুলিয়া বলিল,—কি চাই?

ঝী বলিল,—ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা একবার দিতে হবে।

আঁচল হইতে চাবি খুলিতে খুলিতে সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণে তার মনে হইল, দাদামশায় যে কতবার শিখাইয়াছেন, হর্ষ বা বেদনায় মুহ্য হইতে নাই! সে ঝীকে বলিল,—চাবি এখন কি হবে?

—বড় বাবু চা চাইছেন। চায়ের টিন, চিনি, সব বের করতে হবে, তাই—

ঝী চাবি লইয়া চলিয়া গেল। তখনি চাকর আসিয়া জানাইল,—ধোপানী কাপড় দিয়ে গেল, তা কর্ত্তাবাবুর বিছানার চাদরখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা যে!

—চল, দিচ্ছি আমি খুঁজে। বলিয়া সবিতা চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সে যখন কর্ত্তার ঘরের আল্‌মারি খুলিয়া চাদর বাহির করিতেছিল, তখন কর্ত্তা বলিলেন,—এইবারে ছোট বৌমাকে আনাই,—কি বল মা? নইলে তোমার যে বড্ড কষ্ট হবে!

সবিতা বলিল,—সে তো এই সেদিন গিয়েছে, এরি মধ্যে আনাবেন বাবা?

—তাতে কি! তিনি তো তবু যাচ্ছেন আসছেন,—তুমি তো একেবারেই যাওনি।

—এইবারে আমিও যাব বাবা!

নিজের কথা বলিয়া ফেলিয়াই সবিতার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। কর্ত্তা বলিলেন,—তা যাবে বই কি মা,—তবে অরুণ কি আর তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে! যদি পণ্ডিত-মশায় এসে নিয়ে যান, তবেই হয়!

সবিতার মাতামহ অধ্যাপক ছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁকে পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন, কর্ত্তাও তাই বলিতেন। সবিতা চুপ করিয়া রহিল।

সেই দিনই সে মায়ের চিঠি পাইয়াছিল। শ্বশুরের সঙ্গে কথা-বার্ত্তার পর সে মাকে উত্তর লিখিল। লিখিল,—শ্বশুর মত করিয়াছেন, এখন আর কোন বাধা নাই, যদি তোমরা কেউ আসিয়া লইয়া যাইতে পারো, তবেই আমার যাওয়া হয়! কিন্তু দাদামশায় কি তা পারিবেন? তা যদি পারেন, তবে তাঁকেই বলিয়ো, যেন আমাকে লইয়া যান। শ্বশুর আপত্তি করিবেন না।

তিন-চার দিন পরেই সবিতার দাদামশায়ের পত্র আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, তিন-চার দিনের মধ্যেই তিনি সবিতাকে দেখিতে আসিবেন,—লইতে আসিবেন, এ কথা লিখিবার সাহস তাঁর হয় নাই!

সে-চিঠিখানি হাতে করিয়াও সবিতার বুক পুলক-উচ্ছ্বাসে ফুলিয়া উঠিল না তো! সে তখন ভাবিতেছিল, পুলক সেখানে কেমন আছে? তার কোন খবর আসিল না কেন?

এ বাড়ীতে সবিতা সেই বিবাহের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত একই ভাবে আছে! কেবল শাশুড়ীর অভাবে ঝী-চাকরদের প্রতি কর্তৃত্ব-ভার কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র। তারা কথায় কথায় কর্ত্তার কাছে নালিশ জানাইতে পারে না,—তাই তাদের আবেদন-নিবেদনটা সবিতারই শুনিতে হইত। একজন ঝীয়ের জ্বর হওয়ায় আজ চার-পাঁচ দিন আসিতে পারে নাই,—আর একজনকে দিয়া সবিতা তার কাজ করাইয়া লইতেছিল।

একটি সাত-আট বছরের মেয়েকে সঙ্গে করিয়া সেই ঝী বোধ হয় সবিতার কাছেই আসিতেছিল। আর একজন তাকে ডাকিয়া বলিল,—হ্যাঁরে কাদু, সুরিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্?

কাদু স্বর নামাইয়া বলিল,—ওপরে,—বৌমার কাছে।

—কেন রে?

—ওর মা নাকি মর-মর—কিছু টাকার দরকার—

—পোড়াকপাল! তা বৌমার কাছে কেন? বলিয়া গলার স্বর নামাইয়া সে বলিল,—এসে অবধি এক পয়সার পোষ্ট কার্ড কখনো ত কিনতে দেখলুম না! উনি আবার দান করবেন!

কাদু সতর্ক স্বর আরো নামাইয়া দু-একটী কথার পর মেয়েটীকে সঙ্গে করিয়া সবিতার কাছে গেল। মেয়েটীর হতশ্রী ম্লান চেহারা ও কাপড়ের দুর্দ্দশার একশেষ দেখিয়া সবিতার বড় দয়া হইল, কিন্তু সে তো কিছুই দিতে পারে না! সত্যই যে তার কাছে কিছুই নাই!

এর দুরবস্থা অন্তরে অন্তরে তাকে যত পীড়াই দিক, একটী পয়সা দিয়া তার উপকার করিবার ক্ষমতা সবিতার নাই। সবিতার নিজেরই চোখে জল আসিতেছিল!

মেয়েটা হাত পাতিয়া প্রথমে টাকা চাহিল,—পরে ঢোক গিলিয়া কাদুর শিক্ষা-মত আট আনা চাহিল, পরে হতাশ হইয়া 'যা হয় কিছু' চাহিল।

সবিতা মলিন মুখে বলিল,—আমি তো কিছুই দিতে পারিনে,—তুমি বাবার কাছে চাও,—তিনি দেবেন।

মেয়েটী শুষ্ক মুখে বলিল,—আমাকে যা দেবার তা আপনিই দিন।

সবিতা বড় বিপদেই পড়িল। তার কাছে যে কিছু নাই, এ কথা এরা বিশ্বাস করিতে চায় না! মেয়েটা কান্না-কাটী করিয়াও যখন কিছু পাইল না, তখন কাদু তাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে অস্ফুট স্বরে বলিল,—উঃ বাপ্‌রে,—কি শক্ত মেয়ে, বাবা!

পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—বৌমা, আপনার ছেঁড়া কাপড়খানা, বলেন যদি তো—ওকে দিয়ে দি?

সবিতা বলিল,—না, না, তা দিয়োনা। তা নিয়ে ও কি করবে?

—আপনারও তো কোন কাজে লাগ্‌বেনা সেখানা!

—তা না লাগুক,- সে যে বড্ড ছেঁড়া!

যে জিনিষ সকল দরকারের বাহিরে গিয়াছে, তাই দিয়া অক্ষমতা ঢাকা দিয়া দাতা হইতে তার প্রবৃত্তি চাহিল না। কাদু বলিল,—তবে কি ওকে দাদাবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেব? তিনি কিছু দয়া করলেও করতে পারেন,—ওর মায়ের যে দুর্দ্দশা দেখে এলুম! ভাঙ্গা ঘরের চারিদিক থেকে হিম-জল লাগ্‌ছে,—ঘরে এক-মুঠো ক্ষুদ-কুঁড়ো অবধি নেই যে খেয়ে জল খাবে,—তার ওপর বেহুঁস জ্বর,—তোমরা সুখী লোক মা, অমন অবস্থা কখনো চক্ষে দেখওনি,—দেখ্‌লে দয়া না হয়ে যায় না! তা, কি বল,—ওকে পাঠাব দাদাবাবুর কাছে?

সবিতা ভাবিল, তিনি কিছু দেন বা না দেন, তাঁর কাছে ভিক্ষা চাহিতে যাইবে, তাতে আমি কেন বাধা দি? তাই বলিল,—তা নিয়ে যেতে পারো।

কিন্তু কাদু সেই মেয়েটাকে লইয়া চোখের বাহিরে যাইতেই সবিতা শঙ্কিত মনে জান্‌লা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। সে পাঠাইয়াছে শুনিয়া যদি কিছু মনে করেন!

ভয়ে, লজ্জায় তার মুখ শুকাইয়া উঠিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হইতেছিল, অরুণ বুঝি কাদুকে ধমকাইয়া ফিরাইয়া দ্যায়!

বাহিরের বারান্দায় বসিয়া অরুণ খবরের কাগজ পড়িতেছিল, কাদুকে দেখিয়া সোনার চশ্‌মার ভিতর হইতে হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটী তুলিয়া বলিল,—কি ?

মেয়েটী উপুড় হইয়া আড়ষ্ট মাথা নামাইয়া তাকে প্রণাম করিল। কাদু তার বিপদের সব কথা বলিয়া বলিল,—ও কিছু ভিক্ষে চায় !

অরুণ বলিল,—আমি তো ভিক্ষে টিক্ষে দিইনে, আমার কাছে কেন ? ওকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও।

—বৌমা আপনার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন, তিনি কিছু দিলেন না। এর মা অনেক দিন কাজ করেছিল বাবু, এখন মরতে বসেছে—

অরুণ কাগজ রাখিয়া ঘর হইতে একটী টাকা দিয়া মেয়েটীকে বিদায় করিল ; তারপর আবার কাগজ পড়িতে বসিল।

কাদুর মুখে এ কথা শুনিয়া সবিতা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। মেয়েটার জন্য তার মনে মনে যে ব্যথা লাগিয়াছিল, তা থেকেও সে কিছু বাঁচিল। মনে মনে এজন্য অরুণের কাছে একটু কৃতজ্ঞও হইল।

২০

সবিতার দাদামশায় আসিয়াছেন। তিনি পূজাহ্নিক না করিয়া জল খান না, সবিতা তা জানিত। পূর্ব্বে চিরদিনই সে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফুল তুলিত, স্তব পাঠ করিত। সে সব কথা এই কয় দিনেই সে ভোলে নাই।

খুব ভোরে উঠিয়া স্নানান্তে সে দাদামশায়ের জন্য পূজার সাজ করিতে গেল। সোনার মত ঝকঝকে মাজা তামার টাটে-পাত্রে ফুল-চন্দন সাজাইতে সাজাইতে ছেলে-বেলাকার মত স্নিগ্ধ আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল।

চন্দনের স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ ক্ষণেকের জন্য তার মনের উত্তাপ জুড়াইয়া দিয়াছিল। ছেলেবেলায় এই আনন্দ সে প্রতিদিনই পাইয়াছে, আর পাইয়াছে দাদামশায়ের সেই একঘেয়ে উপদেশ !

তাঁর উপদেশের জ্বালাতেই তো সবিতা তখন তাঁর কাছে ঘেঁসিতে চাহিত না। এখন মনে হয়, তাঁর সেই উপদেশগুলি, সংসারে যেন দৈববাণীর মত অভ্রান্ত !

শ্বশুরের ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই আর সব কাজ সারিয়া ফেলিবার জন্য সবিতা খুব ভোরে উঠিয়াছিল। তখনও সে বাড়ীর ঝী-চাকরদেরও দু-একজনের বেশী ওঠে নাই !

দালানের একদিকে একখানি চৌকি পাতা ছিল, সদ্য ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া অরুণ সেই চৌকিতে আসিয়া বসিল। সবিতা তার বিপর্য্যস্ত এলোমেলো মাথাটার দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্যভাবে বলিল,—ব্যাপার কি,—এখানে যে !

—কেন,—কোন বাধা আছে নাকি ?

—কিছু মাত্র না। বিছানা ছেড়েই তো কোনো দিন এখানে আসনা, তাই বলছিলুম !

—তা, মনে কর, যদি আমার এখানেই দরকার থাকে !

—স্বচ্ছন্দে বসো, আমি সে কথা তো বলিনি।

অরুণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—তুমি কাশী যাচ্ছো ?

সবিতা ঢোক গিলিয়া বলিল,—বাবা তো বলেছেন !

—মা থাকলে কিন্তু যেতে দিতেন না, পুলক থাকলেও তোমার যাওয়া চলতো না !

সবিতা কোনো কথা বলিল না। তার বিক্ষুব্ধ মনটা আবার ঝাঁঝিয়া উঠিল। তীব্র সংশয়ের বেদনা মনে চাপিয়া সে ভাবিল, এই অকারণ ঘনিষ্ঠতার কারণ কি ? এ কি মিথ্যা প্রলোভনে মজা ? সে কি শুধু খেলিবার পুতুল না কি ? সে স্বামীর মুখপানে চাহিল, কিছু বুঝিল না। মাথা নামাইয়া হাতের কাজগুলি সারিয়া ফেলিল। একটু বিপন্নভাবে সে ভাবিতেছিল, এখন কি করিবে ? বিনা-দরকারে অরুণের সামনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে কি করিয়া ?—

অরুণ বলিল,—তোমার কাজ শেষ হয়ে গেল ?

—কতক। এখনো বাবা ওঠেন নি, তিনি উঠ্‌লে তাঁকে ওষুধপত্র দিতে হবে, তা ছাড়া এখনো অল্প-কিছু দিনের কাজ পড়ে আছে।

—তুমি না থাক্‌লে তোমার এই অফুরন্ত কাজের কি হবে ? বাবাকেই বা কে দেখবে শুনবে ! বাবা তো কারো কথা শোনেন না !

অরুণের হাসি-মুখে একটু উদ্বিগ্নতার কালো ছায়া দে

গেল। সবিতার স্নিগ্ধ শান্ত চোখ দুটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে এ বাড়ীতে কিছুই চায় না,—এমন কি একটু শ্রদ্ধা-সহানুভূতিও না,—তবুও তো শূন্য প্রাণের ভিক্ষা-পাত্রটা যেন উন্মুখ হইয়াই আছে। দ্রুত নিশ্বাসে সবিতার ঠোঁট দুটী জ্বালা করিতেছিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, কথা বলিল না।

অরুণ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—শোনো সবিতা!

অরুণের অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে সবিতা কাঁপিয়া উঠিল। স্বামীর মুখে নিজের নাম আর কোনো দিন সে শোনে নাই! একটু আশ্চর্য্যভাবে মুক্ত চক্ষে চাহিয়া সে বলিল,—বল—

—তুমি মুখ তোলো—শোনো, আমি কি বলি—

সবিতা মুখ তুলিল; স্থির দৃষ্টিতেই স্বামীর দিকে চাহিয়া ক্ষোভ-তীব্র কণ্ঠে বলিল,—কি বলবে? আবার সেই,—সেই কথা তো? তা ছাড়া আমাকে বলবার আর কোনো কথা নেই তোমার? কিন্তু বৃথা আমাকে আঘাত দেওয়া! আমি জানি যে, আমি তোমাদের—

—ছি,—ছি, ও কি বলছো তুমি!—থামো। আমি অন্য কিছু বলতে চাচ্ছিলুম—অরুণের এ স্বরও স্বাভাবিক নয়।

সবিতার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল; সে বলিল,—বল, কি বলবে?

—নাঃ, সে শোন্‌বার মত মন এখন তোমার নেই,—তুমি বড় রাগী!

সবিতা হাসিল, বলিল—তবে এখন বলবে না?

—না,—বললুম তো, সে আজ আর হয় না! তুমি আজকের দিনটা আছ তো?

—যতক্ষণ আশা এসে না পৌছয়, ততক্ষণ আছি। কেন তুমি কি আমাকে কাশী যেতে বারণ কর?

—না,—আমি বারণ কর্‌বো কেন?

দোতলার উপর হইতে এই সময়ে কর্ত্তা ডাকিলেন,—এই গুপী,—গুপী!

অরুণ চৌকি ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সবিতা হেঁট মুখ তুলিয়া দেখিল, ভোরের তরুণ আলো পুষ্পপাত্রের অম্লান ফুলগুলির উপর যেন দেবতার প্রসন্ন হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে!

ঘরের সিঁড়ির নীচে মুকুলিত বেল গাছটায় মদির গন্ধ-মাখা বাতাস ঝির ঝির করিয়া কপোত-দম্পতীর অশ্রান্ত প্রণয়-গুঞ্জনে তান দিতেছিল!

সবিতার বিমুগ্ধ কানে সেদিন তার নিজের নামটাই যেন কি মধুর সুর ধরিয়া বাজিতেছিল। তার তুচ্ছ নাম-টাই যে এমন মিষ্ট, তা তো সে এতদিন টের পায় নাই!

কতদিন,—কতদিন এই তুচ্ছ নামটীও সে কারো মুখে শুনিতে পায় নাই,—ছদ্ম বেশে, ছদ্ম নামেই তার দিন কাটে। এখানে যে সে বৌ! আর নিজেও বুঝি সে তার আসল-টাকে হারাইতে বসিয়াছে! যেমন আসিয়াছিল, যেমন ছিল,—তেমনিই কি আজও আছে?

এই যে তিন বর্ণের নামটাতে থামা গানের মূর্চ্ছনা ধরিয়াছে, এ কি তার সেই চির-নীরব হৃদ্-যন্ত্রটার!

শত কাজ-কর্ম্মের মাঝেও সারাদিনটা যেন ঝড়ের মত উচ্ছ্বাস তুলিয়া তাকে ক্লান্ত, পীড়িত করিয়া দিয়া গেল!

বেলা দুইটার সময় আশা আসিয়া পৌছিলে সবিতা যখন আশাকে কাজ-কর্ম্ম বলিয়া দিতে গেল, আশা তখন সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল,—ওমা, তুমি না থাক্‌লে আমি থাকবো কি করে?

সবিতা বলিল,—তা বেশ থাক্‌বে, অভ্যাস হোক,—এই দেখ, এইগুলি সব বাবার ওষুধ,—শোনো, এই শিশির এই সাদা গুঁড়োটা দু'বেলা খাওয়ার পরে খান,—বড় চামচের এক চামচে নিয়ে গরম জলে গুলে,—প্রথমে অল্প জল দিয়ে কাই করে না নিলে আবার ডেলা বেধে যায়—

—ও-সব গুপী পারবে দিদি,—আমার তো বাবার সামনে যেতেই ভয় করে। শেষটায় নষ্টটষ্ট করে ফেলি,—বাপ্‌রে! আমার বুক কাঁপে ভয়ে—

—তা হবে না,—তোমাকেই করতে হবে। তুমি থাকতে গুপীই বা সব করতে যাবে কেন? সব তুমি দেবে,

ভয় ক'রবে কেন? আমার তো ভয় করে না,—আর কখনো বকুনি কি খাই,—দেখেছো কোনো দিন?

—তোমার সঙ্গে আর আমার তুলনা কয়োনা ভাই, তোমার কথা আলাদা,—তুমি মানুষ নও দিদি!

সবিতা হাসিল,—মানুষ নই তো কি আমি ভূত? না মরতেই কি ভূত হবো?

—ভূত কেন হবে দিদি,—তুমি দেবতা।

—উল্টো। আমি উপদেবতা,—এই ঘাড় থেকে নেমে গেলেই সবাই বুঝতে পারবি। ভূতে যখন ধরে থাকে, তখন তো বোঝা যায় না,—ছেড়ে গেলে তবে লোকে টের পায়!"

আশা বলিল,—যাও,—কি যে তুমি বল দিদি,—কথা শুনে হাসবো কি কাঁদবো,তাই ভেবে ঠিক করা যায়না!

আহারে বসিয়া কর্ত্তা সবিতাকে বলিলেন,—ছোট বৌমা তো ছেলেমানুষ,—তুমি বেশী দিন গিয়ে থেকোনা বৌমা, তোমারি তো ঘর-সংসার সব,—তুমি নইলে বেশীদিন টি'কতে পারবো না মা,—কত সাধ করে তোমাকে এনে ছিলুম, তা—

সবিতা তাড়াতাড়ি বলিল,—না বাবা আমি দেরী করবো না। যখনি বলবেন, তখনি তাঁরা পাঠিয়ে দেবেন।

কর্ত্তা চিন্তিত মনে থামিলেন। বোধ হয় তাঁর মনে হইতেছিল যে যার অভাব এই সংসারের মর্ম্মে মর্ম্মে লাগিবে, এই সংসার তাকে কি দিয়াছে? শুধু দুঃখ, শুধু সন্তাপ! তবে যেখানে থাকিয়া সে সুখী হয়, সেইখানেই সে থাকুক না কেন! তাকে ধরিয়া রাখা কি নির্ম্মমতা নয়? তাঁর ছেলে হইয়া অরুণ যে এমন করিয়া তাকে জব্দ করিতে পারিবে,—নিজের জেদের বশে এত বড় অকর্ত্তব্য অবিচার করিতে পারিবে, তা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই! দোষ না হয় তারই হইল,—কিন্তু ওই যে একটা প্রাণ—এ কি সে দেখিয়াও দেখে না! এক-বাড়ীতে একত্রে থাকিয়াও এতদিনে একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিল না?

রূপ! তাঁর সন্তান এমন করিয়া তুচ্ছ রূপের ভক্ত হবে হইল? তবু তাঁর এই কাজকে এখনো তিনি অন্যায় মনে করেন না। এত বড় অন্যায়ও তাঁর সংসারে ঘটিতেছে!

কিন্তু এখন তো আর কোনো আদেশ করিবারও পথ নাই,—সে তো নীরব নির্ব্বাকভাবে তাঁরই আদেশ পালন করিয়াছে,—তবে?

সবিতা বলিল,—পুলক কেমন আছে খবর এলে আমাকে জানাবেন বাবা,—আমি ব্যস্ত হয়ে থাকবো নইলে।

—প্রভাত তো আমাকে চিঠি-পত্র বড় একটা দ্যায়না,—তবে যদি দ্যায়ই, তা তোমাকে জানাবো বই কি!

সবিতা একটা নিশ্বাস ফেলিল। পুলকের হাসিমুখ, কল-ঝঙ্কার মনে পড়িতেই তার যেন শোকের মত ব্যথা লাগিল। পুলক তার—পর! এই পরের ঘরেরও পর! কর্ত্তা আহার শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সবিতা তার কল্পনার ছবিতে রং ফলাইয়া কাশীবাসের চিত্র দেখিতে লাগিল। কেমন দেখায়? ভাল কি লাগে? দরিদ্র ব্রাহ্মণের আড়ম্বরহীন সহজ সরল ঘর-করণার কথাই মনে পড়ে, সে মন্দ কি!

অন্ততঃ এ সুখ-ঐশ্বর্য্যের খোলস ছাড়িয়া তো দিন-কতক বাঁচা যাইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল যে, সে আর কয়টা দিন বা! আবার তো ফিরিতে হইবে!

যদি এমন হয়, আর সে না ফেরে, সে কি ভাল হয় না? সে আসিয়া এ সংসারে যে ক্ষতি করিয়াছে, তাও মিটিয়া যায়! তার বদলে আর একজনকে আনিয়া স্বামী সুখী হইতে পারেন। সে হয় তো তাঁর উপযুক্ত স্ত্রী হইতে পারে!

কিন্তু তা তিনি এখনো তো স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন, সে তো কোনো অধিকার চায় না, চাহিবেও না। কিন্তু তিনি তা করেন না,—বরং নির্লজ্জ আলাপে তাকে কঠোর পরিহাস করিয়া বিঁধিয়াও বুঝি তিনি আজকাল আমোদ অনুভব করেন!

হায়রে,—এর প্রতিশোধ কি সেও দিতে পারিত না? পারিত। কিন্তু এই সকল লাঞ্ছনা যে সে অবনত হইয়া সহ্য করে সে কেন? বিদ্রোহের ঝাঁজে মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিলেও সে হাসি দিয়া তা চাপে কেন? ক্ষণিকের জন্যও সে তার প্রাণে যে জোয়ারের উচ্ছ্বাস বুঝিতে পারে, সে প্লাবন কিসের? এই প্লাবনের মুখেই তো বিশ্ব-সংসারের সকল ব্যর্থতা খরবেগে ভাসিয়া যায়!

অবিচারক, নির্ম্মম, পাষাণ বলিয়া যাকে সে ভাবিতে চায়, সেই বিষই অন্তর-বাষ্পে মধু হইয়া ক্ষরিয়া পড়ে,—মনটাকে মধুময় করিয়া দেয়!

সে ভাবিয়াছিল যে, যখন পুলক এখানে নাই, তার যাওয়ার আর কোনো বাধাই নাই,—এখন দেখিল যে, তার সে ধারণা পরিপূর্ণ সত্য নহে। জাল পাতিয়া সংসার তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে!

গুপীর সঙ্গে তার দাদামশায় আসিয়া তাকে ডাকিলেন, বলিলেন,—তোর শ্বশুরের সঙ্গে এইমাত্র কথা-বার্ত্তা ঠিক করে এলুম,—কালই সন্ধ্যের ট্রেণে যাবো। তোর কিছু গুছিয়ে গাছিয়ে রাখবার হয়, রাখিস্।

সবিতা বলিল,—আপনি বুঝি বাড়ী যাবেন?

—হ্যাঁ,—কিন্তু কাল ঠিক সময়ে এসে তোকে নিয়ে যাব, যেন বসে না থাকতে হয়! কিছু খেয়ে নিস্।

—তা নেব। আপনি এখনি বাড়ী যাচ্ছেন নাকি?

—দেরী করে লাভ তো নেই,—বিশেষ সেখানে পাঁচ-জনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হবে,—তাই এখনি যাচ্চি।

সবিতার দাদামশায়ের জন্মভূমি মাত্র দুই ক্রোশ দূরে! ঘোড়ার গাড়ী করিয়াই যাতায়াত চলে। সবিতার সঙ্গে দেখা করিয়াই তিনি দেশে চলিয়া গেলেন।

কাশী হইতে আসিলেও তিনি তাঁর জন্মভূমির মায়া ছাড়েন নাই! যদিও বিশ্বনাথের কাশীধামে মৃত্যু-বাসনা তাঁকে স্বর্গের শিবলোকের লোভ দেখাইত, তবুও জন্মভূমির শ্যামল কোল তাঁকে আনন্দের ডাক দিত!

দেশে গিয়া দাঁড়াইলেই তাঁর সেখানকার খড়গাছিও মনে হইত, আপনার ধন!

শ্যাওলা-ধরা, একতলা ছোট বাড়ীখানিতে তাঁর চার পুরুষ বাস করিয়া শেষ স্বর্গে গিয়াছেন,—তাঁরও ইচ্ছা ছিল তাই! কিন্তু একমাত্র বিধবা কন্যার আগ্রহই তাঁকে ঠেলিয়াছিল। তিনি আপন মনে ভাবিতেন যে, দেহত্যাগ তো অনিবার্য্য, তবে গৃহত্যাগেই বা এত মমতা হয় কেন? এই মমতাকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল! পাষাণময়ী পুণ্য-তীর্থের বুকে বসিয়াও তিনি অনেক সময়েই নিজের সেই গঙ্গাতীরের ছোট গ্রামখানিকেই সকল দেশের রাণী বলিয়া গর্ব্ব করিতেন।

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

গোয়ালিয়রে প্রথম প্রবাসী বাঙ্গালী

মহারাষ্ট্র জাতির পতনের পর গোয়ালিয়রের নাম বাংলায় তখন অপরিচিত থাকাই সম্ভব। অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বে এই 'জল-হীন' পাহাড়-ঘেরা দেশে যে কোন বাঙালী থাকিত, চট্ করিয়া এমন বিশ্বাসও হয় না। কিন্তু ভারতের সেই চিরস্মরণীয় দিন, সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে, বাঙালীর দৃষ্টির বহির্ভূত, এই জন-বিরল দেশে, টুপি-পাগড়ীর মধ্যেও যে একঘর বাঙালী বাস করিত, সে কথা শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁর "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকে বলিয়া গিয়াছেন; আজ সেই 'এক-ঘর' 'গোয়ালিয়রের প্রথম প্রবাসী বাঙ্গালীর' কিছু পরিচয় দিব।

নপাড়া মুলাজোড়-নিবাসী স্বর্গীয় তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্বপ্রথা-অনুযায়ী দশটি বিবাহ ছিল। দ্বিতীয় পরিবার শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী পাথুরিয়াঘাটার দেওয়ান শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের ভগ্নী ছিলেন। হরসুন্দরী দেবীর গর্ভে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চার পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়।

ইঁহাদের সকলেরই জন্ম হয় পাথুরিয়াঘাটায় এবং শিক্ষার জন্য ইঁহারা সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করিতেন।

প্রথম পুত্র মহেশচন্দ্র এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ঢাকার কালেক্‌টারীতে কাজ করিতেন। তাঁহার বিবাহ হয় বরানগরে। কয়েক বৎসর ঢাকায় কাজ করিবার পর সহসা সেখানে কি গোলযোগ হওয়ার দরুণ তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, একদিন প্রাতে চিরদিনের জন্য বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া কতক নৌকাযোগে, কতক হাঁটা পথে, কতক বা গো-শকটে একটি ঘটি ও একটি কম্বলমাত্র সম্বল করিয়া, এই জনবিরল, "পাহাড় দিয়ে ঘেরা" 'গোয়ালিয়রে', আসিয়া পদার্পণ করেন। ইনিই এ স্থানের সর্ব্ব-প্রথম বাসিন্দা বাঙালী।

আত্মীয়-বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বাংলা দেশ হইতে এই সুদূর নির্জ্জন স্থানে সহসা আগমন করিয়াছেন—তাঁর মনের অবস্থা সে সময় কিরূপ ভয়ানক, তাহা সহজে অনুমেয়। এই বিপন্ন অবস্থায় এই অচেনা বিদেশী পথিককে কেই বা সাহায্য করিবে! খোট্টা হইলেও এ দেশে প্রায় সকলেরই তখন প্রাণ ছিল ;—আমাদের বাঙালীর ন্যায় ইহারা হৃদয়হীন নয়,—এখনও ইহাদের মনে বিদ্বেষ ও হিংসার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় নাই। এক অচেনা বঙ্গ যুবাকে দারিদ্র্যের আবর্ত্তে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, মহান-হৃদয় সর্দ্দার রাজসাহেব জিন্সিবালা ১০০৲ টাকা মাসিক বেতনে নিজের পুত্রদ্বয়ের শিক্ষকতায় তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে কিন্তু তাঁর মন শান্ত হইল না। তিনি কোথায় এক অজানা অচেনা দেশে পড়িয়া রহিলেন, আর তাঁর পুত্র-কন্যা তথা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বাংলা দেশে রহিয়া গেলেন,—এই বিচ্ছেদ তাঁর মনে অত্যন্ত খোঁচা দিত। কার্য্যতঃ কিন্তু তিনি কিছুই করিতে পারিতেন না ; দুঃখ-কষ্ট নীরবে সহ্য করিতেন ; কারণ আজকালকার মত রেল তখন সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া মহা-মিলনের শৃঙ্খল পাতিয়া বসে নাই যে, মনে করিলেই তিনি সকলকে এখানে লইয়া আসিবেন!

পুত্র বিদেশে কষ্ট ভোগ করিতেছে শুনিয়া স্নেহময়ী মার প্রাণ বিচলিত হইল। সুখ-ঐশ্বর্য্যে লালিতা-পালিতা মা হরসুন্দরী পুত্রের নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। যত শীঘ্র পারিলেন তিনি গোয়ালিয়রে রওনা হইলেন ; সঙ্গে চলিলেন পুত্রবধূ, নাতি, নাত্নি ও কনিষ্ঠ পুত্র রমেশচন্দ্র। নৌকায় করিয়া তাঁহারা প্রায় তিন মাস পরে কাশীধামে পৌঁছিলেন ; সে স্থান হইতে কতক ঘোড়ার ডাকে, কতক বলদ-গাড়ীতে, কতক বা উঠের গাড়ীতে চড়িয়া প্রায় মাসখানেকের পর একদিন আসিয়া গোয়ালিয়রে উপস্থিত হইলেন। গোয়ালিয়রে সেকালে বাড়ীর চেয়ে বৃক্ষই অধিক ছিল,—পুরাতন গোয়ালিয়র হইতে নূতন সহর প্রায় তিন মাইল দূরে,—তখন ইহার জন-সংখ্যাও অতি অল্প। তাঁহারা সদ্য কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন—সেখানে গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি কাণে তালা ধরাইয়া দেয়,—সে-সহর সব সময় কোলাহলে মুখরিত থাকে, সহসা সে স্থান হইতে এরূপ জন-বিরল গভীর অরণ্যের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাঁহাদের কিছুই ভাল লাগিত না,—বিশেষতঃ মহেশবাবুর স্ত্রী ধনীর কন্যা,—গোয়ালিয়র তাঁর মোটেই পছন্দ হইল না। তাঁর মন তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিল।

মহেশ বাবু নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্ত্রী ও সন্তানাদির চেয়েও অধিক স্নেহ করিতেন। দুজনেরই এক প্রকারের মন ছিল, অতিথি-সৎকারে দুজনেই সমান পটু ছিলেন—। প্রত্যহ তাঁহাদের বাসায় ১০-১২ জন অতিথি না ভোজন করিলে দুইজনের কাহারও তৃপ্তি হইত না। এই কারণে মহেশবাবু বাধ্য হইয়া পুত্র-কন্যাদিগকে কাশী পাঠাইয়া দিলেন। নিকটে রহিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমেশবাবু ও মধ্যম পুত্র দীননাথ। প্রতি মাসে তিনি পরিবারবর্গের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য টাকা পাঠাইয়া দিতেন।

মধ্যম গিরীশ বাবু কলিকাতার গৃহে থাকিতেন। তাঁহার বিবাহ হয় খড়দহে। গিরীশচন্দ্র ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। একটি নীলকুঠীতে তাঁহার অর্দ্ধেক শেয়ার ছিল, তাছাড়া তিনি তেজারতিও করিতেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা।

সেজ উমেশ ও কনিষ্ঠ রমেশচন্দ্র পূর্ব্বে নিজের মামার নিকটেই ছিলেন। তার পর সংসারের ভার আসিয়া পড়িল গিরীশবাবুর উপর। পিতা-বর্ত্তমানেই সেজ ও ছোটর বিবাহ হয়। সেজর বিবাহ হয় কাঁঠালপাড়ায় ; তাঁর একটি-

মাত্র পুত্র। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় গোয়ালিয়রেই অতিবাহিত হয়।

কনিষ্ঠ রমেশচন্দ্রের বিবাহ হয় খিদিরপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর সহিত। তিনি মহেশবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎচন্দ্রের চেয়ে চার বৎসরের ছোট ছিলেন, মধ্যম ভ্রাতা গিরীশচন্দ্রের নিকট থাকিয়া লেখা-পড়া শিখিতেন। ক্লাশে উঠিয়া তিনি গিরীশবাবুর কাছে বহির দাম চান। সে সময় গিরীশবাবু কাজে ব্যস্ত ছিলেন; তিনি বলিলেন, "অমুক স্থানে আমার বাড়ীতে এক বেশ্যা-ভাড়াটে আছে, সে অনেকদিন বাড়ীর ভাড়া দেয়নি—তুমি ভাড়াটা নিয়ে এসে বহি কেনো।" শুনিয়া রমেশবাবু বলিলেন, "আমি পতিতার কাছ থেকে টাকা এনে মা-সরস্বতীর অর্চ্চনা করব? তার চেয়ে না পড়াই ভাল।" বলিয়া সমস্ত পুস্তক ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ও বাল-সুলভ ক্রোধবশে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"জীবনে আর মা-সরস্বতীর আরাধনা করব না,—তাঁকে আজ থেকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করলুম। আর না জীবনে এ-মুখো কখনও আসতে হয়!" সেই সময় তাঁর মা ও ভ্রাতৃবধূ গোয়ালিয়রে আসিবার জন্য উৎসুক ছিলেন,—রমেশবাবু চিরদিনের জন্য বাংলাদেশ ও মা-সরস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহিত গোয়ালিয়রে আসিয়া হাজির হইলেন,—সে সময় তাঁর বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র।

তার পর নানা কার্য্য-উপলক্ষে মোরার ক্যান্টে বাঙালীরা আসিয়া থাকিতে লাগিলেন। এ সব সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বেকার কথা।—

২৮এ মে ১৮৫৭ সালের রাত্রিকাল গোয়ালিয়রের একটি স্মরণীয় তিথি। সে দিন মোরারে সহসা সিপাহীরা বিদ্রোহী হইল। বিদ্রোহীদিগের কামান-বন্দুকের গর্জ্জনে আফিসরেরা জাগিয়া উঠিলেন; ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহারা ছাউনির দিকে চলিলেন, সিপাহীরা তাঁহাদের গুলি করিয়া মারিল; স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা আশ্রয়-অন্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিলেন;—কিন্তু গোয়ালিয়রের সিপাহীরা স্ত্রীলোকের রক্তপাতে অথবা বালক-হননে এতদূর লোলুপ হয় নাই, যতদূর তাঁহাদের অলঙ্কারের উপর তাহাদের লোভ ছিল। ৩০এ মে তাহাও পূর্ণ হইল—যখন তাঁত্যা টোপী ইত্যাদি গোয়ালিয়র আক্রমণ করিলেন। যখন গোয়ালিয়রে সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা হয়, তখন এই কয়েক ঘর নিরীহ বাঙ্গালীর সে প্রবাসে কিরূপ দুর্দ্দিন গিয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের বোধগম্য হইবে না।

মোরারের বাঙ্গালীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিয়া মহেশ বাবুর গৃহে আশ্রয়লাভ করিলেন। ডাক্তার মাধবচন্দ্র বাবুর মা একটি অশ্বপৃষ্ঠে দুইটা থলিতে করিয়া মোহর লইয়া মোরার হইতে গোয়ালিয়রে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক বিদ্রোহী-দল তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি আছে মায়ী?" তিনি উত্তর দিলেন, "কিছু নয়, বাবা।"

তাহারা বলিল, "তবে ঐ থলে দুটোতে কি আছে?" এবং জবাব শুনিবার পূর্ব্বেই সমস্ত মোহর তাহারা কাড়িয়া লইল।

বিদ্রোহী-দল বাঙ্গালীদের ইংরাজের "গুরু" বলিয়া জানিত। তাহারা মহেশ বাবুর গৃহ আক্রমণ করিল; গৃহে তখন কেষ্টা নামে হিন্দুস্থানী চাকর ছিল। বিদ্রোহী-দল তাহার হাত-পা কাটিয়া সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিল। চাকরকে শাস্তি দেওয়া হইল,—কারণ, তাহাকে বিদ্রোহী দলেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, বাবুরা কোথায়? প্রভুভক্ত ভৃত্য তাহাদের কোন সমাচার দেয় নাই।

আর একটী মজার কথা। বিদ্রোহের সময় গোয়ালিয়রের প্রজারা মহেশ বাবুকে ইংরাজের চর বলিয়া জানিত; তাই কাহারও কিছু জিনিষ চুরি গেলেই তারা মহেশবাবুর কাছে আসিয়া নালিশ করিত। কেহ বলিত, "আমার ঘোড়া চুরি গেছে।" কেহ বা—"আমার হাতী চুরি গেছে।" আবার কেহ কেহ বা বলিত, "আমার টাকা-কড়ি গেছে।" মহেশবাবু অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন; তিনি সকলকেই আশ্বাস দিতেন, "কোন ভয় নেই—আমি সব দেবো।" এরূপ সান্ত্বনা পাইয়া তাহারা ফিরিয়া যাইত।

তখন বিদ্রোহের শান্তি হইল, তখন সকলে নিজ নিজ জিনিষের দাবী করিল—কিন্তু পয়সা-অভাবে তিনি কিছুই দিতে পারিলেন না। ক্রমে এই কথাটি মহারাজ জিয়াজী রাও সিন্ধিয়ার কাণে উঠিল। তিনি ব্যাপার জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মহেশবাবু আগ্রায় সরিয়া পড়িলেন! "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা!" ভাবিয়া-চিন্তিয়া রমেশবাবুও বড় ভাইয়ের পন্থা অবলম্বন করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনিও গোয়ালিয়র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঝাঁসী চলিয়া গেলেন। মহেশবাবুর মধ্যম পুত্র দীননাথ বাবু পূর্ব্ব হইতেই আগ্রায় কর্ম্ম করিতেন; তিনি সেই স্থানেই প্রায় তিন বৎসর কাটাইলেন।

মহেশবাবুর তিন পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ জগৎচন্দ্রের বিবাহ হয় সিপাহী-বিদ্রোহের সময়, লাহোর-নিবাসী ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মহারাজ্ঞী দেবীর সহিত। ইনি এখনও জীবিতা। ইহারই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, বিবাহের পূর্ব্বে তিনি খুব ঘোড়ায় চড়িতেন; এবং তিনি একজন ভাল ঘোড়-সওয়ার ছিলেন। জগৎচন্দ্রের বিবাহে উমেশচন্দ্র কাশী হইতে গিয়াছিলেন এবং বালা নামীয় এক ভৃত্যও আগ্রা হইতে লাহোরে যায়। এখন বর কোথাও হাতি চড়িয়া বিবাহ করিতে যায়,—কেহ মোটরে, কেহ তাঞ্জামে, কেহ বা গাড়ীতে—কিন্তু জগৎবাবুর ভাগ্যে কিছুই না জোটার দরুণ তিনি এই বালা চাকরের কাঁধে চড়িয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন। এটা গল্প-কথা বলিয়াই মনে হয়,—কতদূর সত্য, জানি না—। কিন্তু জগৎবাবুর স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছি যে তিনি বেশ ধুমধামের সহিতই বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন। জগৎচন্দ্র প্রায়ই গোয়ালিয়রে আসিতেন। ৺ রমেশ বাবুর স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছি, জগৎবাবু এক-একমুঠা বাদাম-পেস্তা মুখে দিয়া ফু-ফু করিয়া উড়াইয়া দিতেন। রান্নাঘরে এক কড়া দুধ ফুটিতেছে, তিনি পা টিপিয়া আসিয়া সব খাইয়া ফেলিলেন—প্রায়ই এরূপভাবে তিনি সকলকে নাকাল করিতেন।

এই সময় দীননাথ বাবু গোয়ালিয়রেই অধিক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁর মৃত্যুও হয় গোয়ালিয়রে—তাঁর কোন সন্তানাদি নাই।

প্রায় তিন বৎসর পরে যখন সমস্ত গোলমাল চুকিল, তখন মহেশবাবু ফিরিয়া আসিলেন। কিছু দিন পরে সহসা দীননাথবাবুর মৃত্যু হয়। পুত্রের মৃত্যুতে মহেশবাবু অতিশয় কাতর হইলেন। দুঃখে শোকে রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনিও শয্যা গ্রহণ করিলেন,—ভ্রাতা রমেশচন্দ্র প্রকৃত ভাইয়ের কর্ত্তব্য করিয়াছিলেন। মহেশবাবু রমেশচন্দ্রকে "ভাই লক্ষ্মণ" বলিয়া ডাকিতেন;—রমেশবাবুও বড় ভাইয়ের সেবা লক্ষ্মণের মতই করিতেন। পূর্ব্বে যখন মহেশবাবু নিজের ছাত্রদ্বয়কে পড়াইয়া গৃহে ফিরিতেন, ভাই রমেশচন্দ্র পথে দাঁড়াইয়া ভাইয়ের প্রতীক্ষা করিতেন। মহেশ বাবু গ্রীষ্মের আতিশয্যে কাতর হইয়া জামা কোট ইত্যাদি খুলিতে খুলিতে আসিতেন,—রমেশ বাবু পেছু পেছু সমস্ত সংগ্রহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। মহেশ বাবু এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িলেন;—কিছুদিন পরেই তিনি সংসারের সকল দুঃখ সকল জ্বালার হাত হইতে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

ভ্রাতা-বর্ত্তমানে রমেশচন্দ্র অর্থ-উপার্জ্জনের কোন চেষ্টাই করেন নাই, সহসা ভাইয়ের মৃত্যুতে তিনি দিশেহারা হইয়া পড়িলেন। আবার "বোঝার উপর শাকের আঁটি।"—সেই সময় তাঁর শ্যালক তাঁর পরিবারকে লইয়া গোয়ালিয়রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা সাহেব ঝিন্সিবালা মহেশ বাবুর মৃত্যুর পরও ৬০৲ মাসিক দিয়া রমেশবাবুকে সাহায্য করিতেন। প্রায় ১৪।১৫ বৎসর তিনি এরূপ সাহায্য পান। যদি কখনও ঝিন্সিবালা তিন-চার মাস টাকা দেওয়া বন্ধ করিতেন, তাহা হইলে তাঁর কাছ হইতে তিনি অদ্ভুত রকমেই টাকা আদায় করিতেন। যতদিন ঝিন্সিবালা টাকা দিতেন না, ততদিন ধারেই তাঁর সংসার চলিত,—যদি পাওনাদারেরা আসিয়া তাগাদা করিত, তা হইলেই তারা নির্ঘাৎ বেদম মার খাইয়া বাড়ী ফিরিত। তারা গিয়া সর্দ্দার রমেশবাবুর বিরুদ্ধে নালিশ করিলে, তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। রমেশচন্দ্র স্পষ্ট জবাব দিতেন, "আমি কি করি! তুমি যদি টাকা

দেওয়া বন্ধ করতে পার—আমি কি ওদের মারতে পারি না ?"

ইহাতে কিন্তু তাঁর সংসারের ব্যয়-সঙ্কুলান হইত না। এইরূপে যখন বিপদের ঢেউ তাঁর মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল,—সেই সময় তাঁর এক কন্যার জন্ম হয়, এবং অনতিকাল পরেই তাঁর তৃতীয় অগ্রজ উমেশবাবু সস্ত্রীক গোয়ালিয়রে আসিলেন। রমেশ বাবুর দুই হাতই মুক্ত ছিল,—আয় বৃদ্ধি পাইত না—কিন্তু ব্যয় দিনদিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতিথি-সৎকারও সে এক অদ্ভুত রকমের! এধারে গৃহে কিছু নাই, ওধারে অতিথি আসিয়াছে—তার উপযুক্ত সম্মান দিতে হইবে। বাধ্য হইয়া পুণ্যশীলা পত্নীকে ঘরের ঘটি-বাটি বিক্রয় করিয়াও অতিথি-সৎকারে স্বামীর সাহায্য করিতে হইত।

অবশেষে তিনি কণ্ট্রাক্টারীর কাজে মনোযোগ দিলেন এবং কিছুকালের মধ্যেই বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ক্রমে তেজেন্দ্র, মণীন্দ্র, খগেন্দ্র ও কন্যা অটল-নন্দিনীর জন্ম হয়।

রমেশবাবুর পুত্রেরা সকলে শিক্ষার জন্য আগ্রায় থাকিত। একবার জিয়াজী রাও সিন্ধিয়া রমেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, —"তুমি আমার কাছে চাকরী করবে? যদি কর, তাহলে ১০০৲ টাকা মাসিক বেতন দেবো।" রমেশ বাবু জবাব দিলেন, "১০০ টাকা তো ছেলেদের পড়াবারই খরচ—আগ্রায় পাঠাতে হয়—এ সামান্য টাকা নিয়ে কি করব?" কিছুদিন পর তিনি 'নূতন বাজারে' আবাস-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া গোয়ালিয়রে স্থায়ী বাস-স্থাপনা করিলেন। এই ভবনেই তিনি শেষ কয়েকদিন বাস করিবার পর তাঁহার জীবন-প্রদীপ এক নিশীথে নির্ব্বাপিত হইল। কবে কোন্‌দিন তিনি বঙ্গজননীর স্নেহালিঙ্গন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তার ঠিক নাই,—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আর সে-মুখো হন নাই। যখন তিনি রুগ্ন ছিলেন, তখন সকলেই কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু অভিমানী রমেশচন্দ্র জবাব দেন, "যখন মেজদাকে একবার বলে এসেছি, জীবনে ও-মুখো হব না— তখন আর কেন?" সে সময়ে গিরীশবাবু জীবিত ছিলেন না—তাঁর পুত্রেরা ছিলেন। সকলে তখন রমেশ বাবুকে বলেন, "অন্তত গিয়ে নামলেই হবে—সে বাড়ীতে নিয়ে যাব না।" তিনি জবাব দিলেন, "সেটা কি ভাল হবে? ছেলেরা শেষে বলবে,—কাকাবাবু এত পর হয়ে গিয়েছেন যে আমাদের বাড়ীতে এসে রইলেন না!"

তিনি ইংরাজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ছিলেন, সে অর্দ্ধ শতাব্দীর কথা। তখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মুক্ত বাতাস দেশের উপর দিয়া অবাধে বহিতে আরম্ভ করে নাই। তাই দুই ভ্রাতারই মেজাজে ইংরাজী গন্ধ পাওয়া যাইত না;—তাঁহারা সেকেলে লোক ছিলেন। নিজ চরিত্র-বলে রমেশবাবু সকলের নিকট পরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার মধুর স্বভাবে সকলেই মুগ্ধ হইতেন, সরল প্রকৃতির জন্য তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বজাতির প্রতি তাঁহার যথার্থ অনুরাগ ছিল, তাঁহার গৃহে আজও বাঙ্গালী অতিথি-অভ্যাগতের জন্য দ্বার অবারিত। কত অজ্ঞাত-কুলশীল প্রবাসী তাঁহার গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তার ঠিকানা নাই।

কলিকাতায় শ্যামবাজারস্থ ভবনে তখন গিরীশবাবুর চার পুত্র ও দুই কন্যা অবস্থান করিতেছিলেন। প্রথম পুত্র দেবেন্দ্রনাথ।

মধ্যম নগেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ভবানীপুরে শ্রীমতী নৃত্যকালী দেবীর সহিত ও কিরণচন্দ্রের বিবাহ হয় কালীঘাটে অবিনাশ হালদারের ভগ্নী শ্রীমতী সোনামণির সহিত। এই দুই ভ্রাতা বাংলার অনেকের নিকট পরিচিত। ইঁহারা বাংলা দেশে প্রথম সাধারণ নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠাতাদের অগ্রণী ছিলেন। এই নগেন্দ্রনাথই নটরাজ অর্দ্ধেন্দুশেখর ও নটসম্রাট গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়া বাঙ্‌লায় সাধারণ থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম যখন এই নাট্যসমাজ লীলাবতীর অভিনয় করে, তখন নগেন্দ্রবাবুর উপরই সমস্ত ব্যবস্থার ভার পড়িয়াছিল। ১৮৭২ সালের নভেম্বর মাসে নীলদর্পণে নগেন্দ্রনাথ নবীনমাধব ও কিরণ বাবু বিন্দুমাধব সাজিয়াছিলেন। ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ এই National Theatre-এর অন্যতম ডাইরেক্টর ছিলেন।

অমৃতবাবু "পুরাতন প্রসঙ্গে" এক স্থানে বলিয়াছেন, "অর্দ্ধেন্দু ছিলেন আমাদের general master; কিন্তু সব

বিষয়েই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মত Organiser বাঙ্গালীদের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ৭ ডিসেম্বর, শনিবার ১৮৭২ খৃঃ বাঙ্গালীর পাবলিক ষ্টেজের একটি স্মরণীয় দিন, সেদিন সমস্ত ব্যবস্থার ভার নগেন্দ্রর উপর ন্যস্ত হইল।" আবার এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "আজ আমি একটুও অতিরঞ্জিত করিয়া আপনাকে বলিতেছি না। প্রত্যেক অ্যাক্টর যেন নিপুণ শিল্পীর মত দীনবন্ধুর "নীলদর্পণকে" নিজের মনের মত করিয়া ষ্টেজের উপর গড়িয়া তুলিল। কোন্ অভিনেতাকে বিশেষভাবে সুখ্যাতি করিব, জানিনা। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সুপুরুষ নগেন্দ্রনাথকে নবীনমাধবের ভূমিকায় যেমন মানাইয়াছিল, তেমন নবীনমাধব আর জীবনে দেখি নাই।"

৮ গিরীশ বাবু ঠাট্টা করিয়া ইহাদের নামে একটি গান রচনা করিয়াছিলেন :—

"লুপ্ত বেণী বইছে তিরোধার।
তাতে পূর্ণ অর্দ্ধ ইন্দু "কিরণ" সিঁদুর-
মাখা মতির হার।
'নগ'হতে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণকায়—"ইত্যাদি।

এই কিরণই কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর "নগ" নগেন্দ্রবাবু।

নগেন্দ্রবাবুর তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠা ধরাসুন্দরীর বিবাহ হয় পূজাপাদ স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব বাবুর সহিত; বিখ্যাত লেখিকা ইন্দিরা (সুরূপা) দেবী ও অনুরূপা দেবী ধরাসুন্দরীর কন্যা। নগেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা পুরসুন্দরী দেবীর বিবাহ হয় ইছাপুরে ৺কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাস বাবুর সহিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সৌরীন্দ্রমোহন "ভারতীর" অন্যতম সম্পাদক।

তৃতীয় Lieut-Col হেমচন্দ্র আই, এম, এস, চিকিৎসক ছিলেন। মোরারে পূর্ব্বে যখন ছাউনী ছিল, তখন তিনি মোরারে বাস করিতেন, পরে গুনারে বদলি হইয়া যান। চীনা যুদ্ধেও তিনি গিয়াছিলেন।

৺ তারাচাঁদ বাবুর তৃতীয় পুত্র উমেশ বাবু গোয়ালিয়রেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন—। রমেশবাবুর পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র গঙ্গাধরবাবু রমেশ বাবুর নিকটেই থাকিতেন। তাঁহার বিবাহ হয় মীরাট-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর সহিত। জ্ঞানেন্দ্র বাবু "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থে ইঁহার বিষয়ে লিখিয়াছেন, "বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।" গঙ্গাধরবাবু এই কলেজে অধ্যাপনা করেন নাই। তিনি সম্প্রতি "গোয়ালিয়র দুর্গে সর্দ্দার স্কুলের" ছাত্রদিগের গার্জেন।

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর আঘাত অনেকেরই প্রাণে বাজিয়াছিল —বিশেষতঃ তাঁহার সন্তানদিগের মনে। পিতার মৃত্যুর সময় সকলেরই বয়স অল্প; ভগ্নী অটলনন্দিনী অবিবাহিতা। খগেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র দ্বাদশ বৎসর। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তেজেন্দ্রবাবু ও মণীন্দ্রবাবুর উপর পড়িল। পূর্ব্বে সকলেই আগ্রায় শিক্ষার জন্য বাস করিতেন। পিতা যখন ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন, মণীন্দ্রবাবু তাঁহাকে সাহায্য করেন,—পিতার মৃত্যুর পর তিনি সেই কাজই করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্রবাবু তাঁহাকে সাহায্য করিতে তেজেন্দ্রবাবু Municipalityতে সেক্রেটারীর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। খগেন্দ্রবাবুও গঙ্গাধরবাবু আগ্রায় অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।*

তেজেন্দ্রবাবুর Municipaltyর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রায় সাত বৎসর গৃহে বসিয়া কাটান—পরে সহসা লক্ষ্মী তাঁর উপর প্রসন্ন হন—তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন।—তিনি আজও গরীব-দুঃখীকে মুক্ত হস্তে দান করেন,—সময় সময় শীতকালে কম্বলও বিতরণ করেন,—নিজের সাধ্যমত তিনি গরীবদিগের অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করেন।

মণীন্দ্রবাবু প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন।

---

* বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—পুস্তকে ৫১৩ পৃষ্ঠায় আরও লিখিয়াছেন, "প্রিন্সিপাল বাবু জানকীনাথ দত্ত।" জানকীবাবু কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন না, বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। সম্প্রতি তিনি D. I. G. Education Department, জ্ঞানেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "গোয়ালিয়র-প্রবাসী প্রাচীন বাঙ্গালীদের মধ্যে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা উমেশবাবু এবং মহেশ বাবু অন্যতম।"

পিতার সব গুণই তিনি বিশেষ করিয়া পাইয়াছিলেন। তিনি আপন চরিত্র-গুণে এ প্রদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পরোপকারী ইঁহাদের বংশে প্রায় সকলেই, কিন্তু ইঁহার ন্যায় কেহই ছিলেন না। তিনি নিজে গাড়ী লইয়া ট্রেনের সময় ষ্টেশনে যাইতেন এবং কোনো বিদেশী বাঙ্গালী দেখিলেই সাদরে আহ্বান করিয়া গৃহে আনিতেন। মণীন্দ্রবাবুর সাদর আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই, এমন বাঙ্গালী পরিব্রাজক এখানে অল্পই আসিয়াছেন। কত দীন-দুঃখীকে যে তিনি মুক্ত হস্তে দান করিয়াছেন, তাহার অন্ত নাই। মহারাষ্ট্র-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং আজীবন এখানে বাস করিয়াও তিনি মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা করেন নাই। তিনি স্বয়ং মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়াছিলেন, এবং ছেলে-মেয়েদের যাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা হয়, তাহার জন্য একজন বাঙ্গালী শিক্ষককে গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী, সদাহাস্যোজ্জ্বল-মুখ ও অতি মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কোন প্রকার গর্ব্ব বা অহঙ্কার তাঁহার চরিত্রে স্থান পায় নাই। তাঁহার ন্যায় সম্মান সমাদর লাভও অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। আজও মধ্য ভারতের অনেকে তাঁহাকে বিশেষরূপে চেনে। তাঁহার মিতাচার, অমায়িকতা, বিনয়-নম্রতা, সৌজন্য ও আতিথেয়তা আদর্শ হইবার যোগ্য। ১৩১৮ সালে ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পরিজনবর্গ ও আত্মীয়বন্ধু-বান্ধবকে শোকাভিভূত করিয়া তিনি চিরবিদায় লইলেন।

রমেশবাবুর তৃতীয় পুত্র উপেন্দ্রবাবু পিতার মৃত্যুর পর লেখা-পড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্যম ভ্রাতাকে কণ্ট্রাক্টরী কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায়ই পাহার নামীয় গোয়ালিয়র প্রান্তের একটি পল্লীগ্রামে বাস করিতেন—তিনি সেই স্থানের প্রথম প্রবাসী বাঙ্গালী। সম্প্রতি তিনি সেই স্থানেই কিছু গাঁ ও জমি খরিদ করিয়া চাষ-বাসে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

রমেশবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র খগেন্দ্রবাবুর পিতার মৃত্যুর সময় খগেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র দ্বাদশ ছিল।—পিতা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।—পিতার মৃত্যুর পর ভাইয়েরা তাঁহাকে আগ্রায় পড়াইতে লাগিলেন। বিশ বৎসর বয়সে বি, এ পাস করিয়া তিনি এম, এ. ও ল পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—কিন্তু তাঁহার পড়া বেশী অগ্রসর হইল না। সহসা কি মনে করিয়া, কলেজ ত্যাগপূর্ব্বক চাকরী করিতে লাগিলেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "রমেশ বাবুর চারি পুত্র তেজেন্দ্র, মণীন্দ্র, উপেন্দ্র এবং খগেন্দ্র। ইঁহারা সকলেই কণ্ট্রাক্টরী করেন।" কিন্তু ইনি কখনও কণ্ট্রাক্টরী কার্য্যে যোগ দেন নাই। জ্ঞানেন্দ্র বাবু-বর্ণিত, পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের অফিসের হেড একাউণ্টাণ্ট কে, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এ, ও "অনুবাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একই ব্যক্তি। তিনি মহারাজ সিন্ধিয়ার ভগ্নাপতির (Revenue member) প্রাইভেট সেক্রেটারী হন, কিছু দিন ল্যাণ্ড রেকর্ডেও কাজ করিয়াছিলেন,—পরে মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত হন। সম্প্রতি তিনি Army and Police Training College-এর প্রিন্সিপাল। আপন চরিত্রবলে আজ তিনি গোয়ালিয়রের সকলের নিকট পরিচিত ও সম্মানিত। সাহিত্যচর্চ্চায় আজও তিনি আনন্দ অনুভব করেন। হিন্দি, ফার্সী, উর্দ্দু, মারাঠী, গুজরাতী, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি আছে। তিনি খুব পরোপকারী।

গোয়ালিয়রে আজকাল রমেশবাবুর বংশধরগণই পুরাতন প্রতিষ্ঠাবান প্রবাসী বাঙ্গালী। তিনি এস্থানেই গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা এখানেই স্থায়ী বাসিন্দা।—গোয়ালিয়রে ইঁহাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি খুবই। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর প্রবাস-বাসের ফলেও রমেশবাবুর পুত্রগণ ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ প্রাদেশিক ভাব মোটেই আত্মস্থ করিতে পারেন নাই,—তাঁহাদের বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে ভ্রম হয় না। এই বাঙ্গালী-বিরল স্থানে প্রবাসীর মাতৃভাষা যে বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই, তা বলাই বাহুল্য—তাঁহাদের গৃহে বাঙ্গালা পুস্তকের প্রকাণ্ড পাঠাগার আছে। এখানে বাড়ী-ঘর করিয়া স্থায়ী হইয়াছেন বটে, কিন্তু দেশের সহিত ইঁহাদের কোন সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হয় নাই। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অগ্নি-বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১ মণ্ডল ১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মধুচ্ছন্দা ঋষি]

বন্দি অগ্নি যজ্ঞ-যাজক,
দীপ্ত, দেবতা-মিলন-সাধক,
রম্য ধনের শ্রেষ্ঠ ধারক।

বন্দনীয় সে পূর্ব্ব ঋষির,
নবীন তাহারে পূজে নতশির,
দেবে আহ্বানি' আসুন্ অচির।

অগ্নি-কৃপায় লভি যেন ধন,
দিনে দিনে পাই পুষ্টি পোষণ,
লভি যশ, বীর সন্ততি, জন।

অগ্নি, যে যাগে অহিংসিত
চৌদিকে তুমি থাক বেষ্টিত,
দেবপানে তাহা যায় নিশ্চিত।

দেব-আহ্বানী কবি সে আগুন
সত্য সিদ্ধকর্ম্মা স ' ণ,
দেবগণ সহ যজ্ঞে আসুন্।

ওগো হুতাশন হব্যদাতায়
দিবে যেই শুভ হইবে তাহায়
সত্য শুভ সে তোমার কৃপায়।

অগ্নি, আমরা দিন দিন ধরি'
দিবারাতি মনে প্রণাম করি'
তোমার সমীপে আসিয়া পড়ি।

যজ্ঞে দীপ্ত সুধারক্ষক,
তুমি সত্যের সুপ্রকাশক,
স্বীয় গৃহে স্বীয় দেহবর্দ্ধক।

পুত্র-সমীপে পিতার সমান
তুমি অনায়াসলভ্য, বিধান
কর মঙ্গল, থাক এইখান।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

পরের ছেলে

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাত হইতেছে। মুমূর্ষুর পাশে বসিয়া তাহার মুখ চাহিয়াই কয়টি প্রাণীর সে দিন রাত্রি কাটিল। উষার আভাষের সঙ্গেই সেই অজ্ঞান অচৈতন্য দেহে জ্ঞানের আভাষ দেখা দিল! ক্রমে পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে চোখ্ মেলিয়া বিনয় ডাকিল, "মাণিক, আয়, একবার কাছে আয়"। নির্ব্বাক মাণিক পিতার তুষার-শীতল হস্ত-পদে ঈষৎ উত্তাপ আনিবার জন্য ও সকলের অজ্ঞাতে সমস্ত রাত্রি কোথায় না তাহাদের চাপিয়া চাপিয়া ধরিতেছিল, সহসা এই পরিষ্কার কণ্ঠের সতেজ আহ্বানে মূঢ়ের মত কেবল চাহিয়া রহিল! এ কোন্ আহ্বান সে তখনো বুঝিতে পারিতেছিল না! সে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই রাজেশ্বরী তাহার মুখের কাছে যাইবা মাত্র বিনয় বলিল, "কে?— মামিমা! তোমাকেই একবার চাইছিলুম যে মনে মনে, পায়ের ধুলো দাও।" হাত বাড়াইয়া মাতুলানীর পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহার কালিমাময় বিশুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া বিনয় সকরুণ কণ্ঠে বলিল, "এইবার মাপ্ কর আমায়, বড় কষ্ট দিয়েছি তোমায়—জানি।"

"বিনয়—" রাজেশ্বরীর অন্তরের রোদন এইবার শতধা হইয়াই ফাটিয়া পড়িল।

"আজ তো আমি আমার মাণিককে পেয়েছি, আর

কান্না কিসের মা ? এই নাও, আবার তাকে তোমার দিয়ে যাচ্চি—আমার তো আর কোন কষ্ট নেই ! তুমিও—তুমিও এমনি আমার মত সুখী হও—সব পাও !”

“বিনয়, আমি যে পরের ছেলের লোভে নিজের সন্তানকে এমন করে মেরেছি, তার ফল আমার সমস্ত জীবন ধরে চল্‌ছে,—এখন—”

“আমার মাণিককে আমি আজ যে তোমায় দিয়ে যাচ্ছ মামিমা,—কেড়ে নিয়ে ছিলে, তাই সইতে পারিনি ! আজ থেকে মাণিক তোমার—তোমার—”

“বিনয়,—ভাই—আমায় কিছু বল্‌বে না—একবার চাইবে না ?” মোহিনী বাবুর গম্ভীর স্বরে চক্ষু মেলিয়া হাসি-মুখে বিনয় বলিল, “দাদাও এসেছ আমায় দেখ্‌তে ? পায়ের ধূলো দাও ভাই। নিতে পারছিনা যে—”

“তোমার ঝরণাকে এনেছি যে ভাই—তাকে নাকি ডেকেছিলে ! তাকে কই দেখ্‌ছনা যে আর !”

“কই—আমার মা-ঝরণা ! কই মা ? এসেছিস ? সত্যি ? আঃ—আমার যে—আমার যে মাণিকের গাছে মুক্তার লতা কল্পনায় জড়িয়েছিলুম—সেই রাঁচিতেই ! সেইখানে যে খুঁজে-খুঁজে গিয়েছিলুম—! দাদা—মামিমা—তোমরা দেখো—আমার তো—আমি তো সে ভাগ্য করিনি ! —কেন কাঁদছিস মা ? অজ্ঞানেও তোকে খুঁজেছি যে, আয়,—আমার মাণিক—আয়—”

ডাক্তার এবার শেষ কর্ত্তব্য করিতে আসিয়া বলিল, “দরজা-জানলাগুলো খুলে দিন্” —তারপরে আশ্রমের সেবকদের পানে চাহিয়া বলিল, “এইখানেই ? মোক্ষ-মন্দিরে ?” সকলেই “না—না” বলিয়া কথাটাকে আর শেষ হইতে দিল না। তারপরে ঝরণা ও মাণিকের হাতে হাত রাখিয়াই ঈষৎ হাসি-মুখে বিনয় সর্ব্ব আধি-ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইল।

* * * * *

পিতৃহীন হতভাগ্যের বেশে কিশোরকে দেখিয়া রাজেশ্বরী আবার বহুক্ষণ বিবশা হইয়া কাঁদিলেন। তাঁহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়া মোহিনী বাবু বলিলেন, “এইবার আমরা যেতে পারি কি ?”

রাজেশ্বরী চোখের জল মুছিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, “আমার তো বল্‌বার কোন মুখ নেই—তবে বিনয়ের আপনি দাদা হয়েছিলেন, সেই সাহসে বল্‌ছি—বিনয়ের সাধ তো শুনেছেন ? আর দুদিন থেকে কিশোরকে পিতৃকৃত্য করিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যান নিয়ে গিয়ে যা উচিত মনে করেন, করুন ! আমার কোন-কিছুরই ঠিক্ নেই—”

“কিসের ঠিক্ নেই ?—শুনছি, আপনি নাকি এখানেই বাস কর্‌বেন, বলেছেন ? এও কি কখনো হয়, দিদি ? আপনি কিশোরের আর ঝরণার মা,—আপনার কোল ছাড়া ঝরণাকে আমরা কোথায় দিতে পারি ? কিশোরের পিতৃ-কৃত্যের পরে আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, এ জেনে রাখুন।”

“কিশোরকে মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পার্‌ছি না—আপনাকেই ভার দিই। ঐ সেবাশ্রমে বিনয়ের নামে সেদিন হাজার কতক টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন্—অনাথ-সেবার ঐ-রকম একটা চত্বর যেন বিনয়ের নামে দেওয়া হয় ! আর তার শ্রাদ্ধ- ”

“দেখুন, কিশোরের যে রকম প্রকৃতি—এখনো সে কি করবে বুঝ্‌ছি না। কে পুরোহিত শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ করতে এসেছিলেন—তাঁকে সে বল্‌লে, তিল-কাঞ্চনের ফর্দ্দ করুন। আপনি নিজে বলুন একবার তাকে এ বিষয়ে।”

কিশোরকে ডাকাইয়া অতি সংক্ষিপ্তভাবে রাজেশ্বরী বলিলেন, “বিনয়ের নামে কর্ত্তার উইলে যে সম্পত্তি দেওয়া আছে, তা থেকে তার নিয়মিত ভাবে শ্রাদ্ধ, আর বাকি সবটা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তার স্মরণ-কৃত্যে উৎসর্গ করাতে হবে ঐ দিনে। তারই বন্দোবস্ত কর।”

কিশোর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বিষাদ-ক্লিষ্ট স্বরে বলিল, “আর কেন মা ? তিনি ছেলে-বিক্রির অর্থ জীবনে যখন স্পর্শ করেননি, তখন আর কেন তাঁকে তার ভাগী কর ? তাঁর শ্রাদ্ধ তিল-কাঞ্চনেও না করে শাস্ত্রের যে সর্ব্বশেষ ব্যবস্থা, তাই-ই আমার করতে ইচ্ছে হচ্চে ! তাঁর তো কিছুই নেই !—তাঁর ছেলে মাণিক তাঁর শ্রাদ্ধই বা কোন্ অর্থে করবে ? এ তিল-কাঞ্চনে যা ব্যয় হবে, এ আমার তোমার এষ্টেট থেকে ধার বলে লেখা থাকবে,—আমার

শরীর দিয়ে খেটে এ আমি শোধ দেব। মা, দুঃখ পেয়ো না, রাগ করো না—ভেবে দ্যাখো ভাল করে, তিনি জীবনে যা স্পর্শ করলেন না, তা কি এখন তাঁর নামে ছোঁয়ানো উচিত? একান্ত অশক্তের পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ বনে গিয়ে কেঁদে এলেও যে সিদ্ধ হয়। আমি তাই করব,—তিনিও তাতেই বেশী খুসী হবেন, জেনো! তুমি অনুমতি দিলেই পারি।"

"কিশোর, কিশোর, ওরে—তারই যে সর্ব্বস্ব! আমার নয়, তোর নয়, সব তার—তার! তার মামা তাকেই সব দিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ভয়-দেখানিতে অন্য পোষ্যপুত্র নিলে মাণিকের সব যাবে, এই ভয় যদি সে না করত, সবাই তাকে যদি এই ভয় না দেখাত, তাহলে আমার সাধ্যও ছিল না, অন্যের ছেলেকে পোষ্য নি! তার মামা যদি বিনয় ছেলে দের তবেই, নইলে বিনয়ই আমার সর্ব্বস্বের মালিক থাকবে—এই প্রতিজ্ঞা আমায় করিয়ে তবে তিনি আমার দৌরাত্ম্যে বাধ্য হয়ে তোমায় ছেলে করে নিতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তোমায় কেবল আমার সাধ মিটুবার খেলনা করে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি,—তিনি জানতেন, বিনয়ই তাঁর ছেলে. বিনয়কেই তিনি সর্ব্বস্ব দিয়ে গিয়েছেন। ওরে, বিনয়ের নামে আজ তাঁর সব সম্পত্তি দান করলেও সে নেবে। সে তো আজ সব জেনেছে! চলে যাবার সময়ও বুঝি সে সব বুঝতে পেরেছিল—তার মামা তার কাণে কাণে সব বুঝি বলে দিচ্ছিলেন, তাই হেসে নিজের ধন এইবার আমাদের দান করে গেছে। এখনও আমার কথা শোন্ কিশোর,—এতে তার কিছু অতৃপ্ত হবে না।"

আবার এক নূতন তরঙ্গ! সবই তার ছিল! সে কেবল তার একের অভাবেই জগৎকে তৃণের মত পায়ে দলিয়াছিল! সেই একই তার জীবনের পরশ-মণি, সাত-রাজার ধন মাণিক ছিল যে!

কাঁপিতে কাঁপিতে আবার বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে কিশোর বলিল, "তাই হবে মা।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জানালার কাছে ঝরণা দাঁড়াইয়া ছিল—জানালার নীচেই কাশীতল-বাহিনী ভাগীরথীর বেগবতী জল-ধারা পোস্তায় আঘাত করিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। দুইদিকে অগণ্য সোপান-শ্রেণী, তাহাতে কাশী-বাসীর স্নান-আহ্নিক পূজার কলরব বিচিত্র সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, ঝরণা জানালা হইতে মুখ ঝুঁকাইয়া তাহাই দেখিতে ও শুনিতেছিল। মুণ্ডিত মস্তকে নত মুখে কিশোর আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। পদশব্দে ফিরিয়া দেখিয়া ঝরণা কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা বুঝিয়া কিশোর বলিল, "জীবনে যা কখনো করতে পারব বলে মনে করিনে, আজ তাই করতে এসেছি। অবস্থা বুঝে মাপ করো ঝরণা।"

কিশোরের কণ্ঠস্বরে ব্যথিতা ঝরণা কি করিবে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, কেবল দ্বিগুণ কুণ্ঠিত মুখে একবার তাহার পানে চাহিয়া আবার মাথা নীচু করিল। কিশোরের বিবর্ণ মুখ-কান্তি এখন যেন আরও কি এক রকম হইয়া উঠিয়াছে! ঝরণার একটা অতীত দিনের স্মৃতি মনে পড়িল,—যেদিন সে তাহার কাকাবাবুর প্রত্যাগমনের সংবাদে তাহাদের সেদিনের নিমন্ত্রণ রহিত করিবার জন্য রাজেশ্বরীকে বলিতে গিয়াছিল। সিঁড়িতে সেই অতর্কিত সাক্ষাতের পর কারে' বসিয়া উর্দ্ধ-দৃষ্টি যে উদাস ব্যথা-পাণ্ডুর মুখচ্ছবি বিনয়কে গবাক্ষ-পথে দেখিয়া বেদনা পাইয়াছিল, তাহার অন্তর অন্তরে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিয়াছিল,—সেই মুখ, সেই দৃষ্টি আজ এই শোক-শান্ত সংযত-কান্তি কিশোরেও ফুটিয়া উঠিয়াছে! মৃদুস্বরে ঝরণা বলিল, "কেন?"

"কি 'কেন' বলছ, ঝরণা?—কেন এই ভাবে কথা কইতে এসেছি—কেন তোমায় ব্যস্ত করতে এসেছি?"

"না, তা নয়!—কেন—কেন আপনি—"

"কি কেন আমি—বল?"

"এমন ভাবে কথা কইছেন কেন?"

"তাইতো বলতে এসেছি। সবই তো নিজের কাণে তুমি শুনেছ,—কিন্তু তবু আমার এখনো একটু বলবার আছে! আমাকে আমাদের গুরুজনেরা যা দিতে চাচ্ছেন, এ সৌভাগ্য-সম্ভাবনার আভাষ কলকাতাতেও আমি একটু যেন পেয়েছিলুম—কিন্তু তা সহ্য করতে পারিনি বলে যে আমি পালিয়ে আসি, তা কি তোমরা আন্দাজ করতেও পারো ঝরণা?"

"পেয়েছিলুম,—কিন্তু এ কথা আমায় না বলে এখন বাবাকে জানানোই আপনার উচিত।"

"তা জানি, তবু একবার তোমাকেও আজ জানাতে দাও। সেই রাঁচির—সেই এক যুগের—"

"আপনার সে আষাঢ়ে গল্প মার মুখে আমাদের বাড়ীর কারুরই জান্‌তে বাকি ছিল না—কিন্তু কি দরকার ছিল আপনার এ আরব্যোপন্যাস তৈরী করে সকলকে জানাবার? নিজের মাকে বোঝাবার?"

ঝরণার উত্তেজিত আরক্ত মুখের দিকে স্বপ্নাভিভূতের মত চাহিয়া কিশোর যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বরেই বলিল, "আরব্যোপন্যাস? তাতেও কি এমন অসঙ্গত স্বপ্নের কাহিনী আছে ঝরণা? আমার মত কোন ঘৃণ্য হতভাগ্য পথের কাঙাল কি এমন দুর্লভ স্বপ্ন দেখেছিল?"

ঝরণা আবার কি-একটা শক্ত কথা বলিতে গিয়া কিশোরের মুখের পানে মুখ তুলিয়া সহসা থামিয়া একদৃষ্টে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সত্যই কি কিশোর এখনো স্বপ্নই দেখিতেছে?—যত অন্যায়ই করুক, ইহাকে কি আর কঠিন কথা বলা যায়?—কিশোর বলিয়া চলিল, "কিন্তু তবু—তবুও এই সাধারণ হতে শত ক্রোশ দূরের নিজের জীবন, এর কথা কি ভোলার সম্ভাবনা ছিল আমার পক্ষে? লোকের চোখের আড়ালে সারা জীবন ধরে যে স্বপ্ন দেখ্‌তে পারি—জাগ্রত জীবনে যদি তা সত্য হয়ে উঠতে যায়, তখন কি —"

"তখন তাকে লাথি মেরেই ছুড়ে ফেলে পালিয়ে যেতে হবে। কিশোর বাবু, আপনার যে দুঃখের জীবন, তা আমরাও বুঝি, তবু আপনার অন্যায়ও বড্ড বেশী। তারই বাড়াবাড়িতে নিজেও সুখী হতে পারেন না—যারা আপনার আপন-লোক, তাদেরও কষ্ট দেন্। এই যে নিজেকে ঘৃণ্য বল্লেন, কত কি বল্লেন, এও কি সবই ঠিক্? দুঃখী হতে পারেন, ঘৃণ্য কিসে হলেন?"

"নই কি ঝরণা? নিজের কথা মনে করে ছাখো—সেই রাঁচিতে যেদিন—যেদিন বাবার মুখে আমার কথা শোনো—সেদিন থেকে কি ঘৃণার—"

"কি আশ্চর্য্য! আপনি বলেন কি! তার নাম ঘৃণা? কতটুকু তখন আমি? সেও কি ঘৃণা কর্‌বার বয়স? হয়ত আশ্চর্য্য হয়েছিলুম, কাকার কাছে সব কথা শুনে খুবই একটা ধাক্কা লেগেছিল মনে—এ বেশ মনে আছে। কিন্তু তার নাম কি ঘৃণাই বল্‌তে পারেন? আপনাদের কথা ভেবে একটা দুঃখ, কষ্ট—"

"হতে পারে ঝরণা, সে বয়সে তোমার পক্ষে তাইই ভাবা সম্ভব। কিন্তু আমার যে ও ভুল হয়েছিল, তার কারণ, আমি তো সাধারণ বালক-বালিকার মত সৌভাগ্য করিনি, তাই অকাল-কুটিলতায় আমার জীবন ভারাক্রান্ত ছিল। কিন্তু এখন? এখন তো তুমি আর সে সরলা বালিকা নেই ঝরণা, এখন তো বুঝেছ, আমি কি! তুমি না বল্লে এখনি, 'আপনার অন্যায় বড় বেশী' কিন্তু তোমার উপর তো কোন অন্যায় করিনি, ঝরণা। জানি আমি তুমি এমন হয়েও ঠিক আমাদের ঘরের দশ বছরের মেয়ের মতই, মা-বাপের আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছার কাছে নিজের স্বাতন্ত্র্য বলে স্বপ্নেও কিছু জানো না,—তাঁরা যা কর্‌বেন তাই মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছ! কিন্তু তবু আমার কি সারা জীবনের অন্যায়ের ওপরেও তোমার জীবনকে এমন করে বিফল করে দেওয়াই সব-চেয়ে বেশী অন্যায় হবে না?'

"অন্যায়! যদি অন্যায় বলে মনে করেন, তবে—"

"হাঁ, করি! তুমি না এখনি রাগের মত করেই আমার সকল স্বপ্নকে ছুড়ে ফেলার কথা বললে! যা মাথায় ধরবারও আমি নিজেকে যোগ্য মনে করি না, তাকে কোন্ সাহসে হাত বাড়িয়ে ধর্‌ব? হয়ত তুমি দুঃখী ব'লে হতভাগ্য ব'লে আমার দয়াও কর্‌তে পারো ঝরণা, কিন্তু তাঁরা যা আমায় দিতে চাচ্ছেন, তাতে এইটুকুই কি পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারব? যাকে জীবনে কখনো শ্রদ্ধা করা বা কিছুই তোমার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না, তাকেই—"

ঝরণা এবার উত্তেজনায় একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "আপনি কি বল্‌তে চান্ যে আমাদের গুরুজনরা এতই অবিবেচক যে যা এতখানি অসম্ভব তাইই তাঁরা কর্‌তে চাচ্ছেন? তবে এ হতে দেওয়া যে আপনার পক্ষেই অসম্ভব, আপনার তাঁদের একবার এখন সেটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। কেননা আপনার সেই আজগুবি গল্পের অন্যায়েই আপনার মা এ ভ্রমটা করেছেন

আর আমাদেরও তাই বুঝিয়েছিলেন। এখনো বোধ হয় সেই ভ্রমেই তাঁরা আছেন—"

"আমার পক্ষে অসম্ভব! তোমায় শ্রদ্ধা করা—তোমায়—তোমায়—কি বলছ ঝরণা? যদি সে আজগুবি গল্প তোমরা জান্তেই, তবে এমন কথা কি করে বলছ?"

"কেন বল্‌ব না? আপনার আগাগোড়া সবই যে আজগুবি! জগতের সমস্ত সত্যকেই এমনি ক'রে অস্বীকার করে-করেই আপনার এমন দশা! নিজে এত দুঃখ পেলেন—দুঃখ দিলেন। তবে এও মনে হয়, আপনার অবস্থায় পড়্‌লে আমিও হয়ত এমন কর্‌তুম!"

ঝরণার উত্তেজনা-ভরা কণ্ঠস্বর ক্রমে যেন বুজিয়া আসিল। আর সেই কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি-ভরা মুখকান্তিতে কিশোর যেন একটা অজ্ঞাত তত্ত্বও খুঁজিয়া পাইল। অনিমেষ চক্ষে সেই মমতায় ভরা মুখের পানে চাহিয়া সবই যেন সম্ভব বলিয়া তাহার মনে হইল।

ঝরণা আবার বলিল, "কিন্তু ভগবানের বিধানের উপর একটু নির্ভর করতে শিখুন। তিনিই তো সব করান্—নৈলে এ-সব কি মানুষের দ্বারা সম্ভব? তার পরে—ভগবান আপনাদের এত কষ্ট দিয়ে শেষটা কতখানি দয়া দেখালেন, বলুন তো? তাঁকে কতখানি শান্তি দিলেন, সুখ দিলেন তিনি! আর আমাদেরও! ওঃ কাকাকে যদি এটুকুও দেখ্‌তে না পেতুম! স্বপ্নেও জান্‌তুম না, তিনি আমাকেও দুদিনের দেখায় এত ভাল বেসেছিলেন,—যাতে জীবনের শেষ সময় আমাদেরই কাছে ছুটে গেলেন! স্বপ্নেও জানতুম না যে কাকাই রাঁচির সেই তিনি—যাঁকে আমার মোটেই মনে ছিল না। বলিতে বলিতে ঝরণার ব্যথা-পাণ্ডুর মুখ আবার আরক্ত হইয়া উঠিয়া চোখে অশ্রুর রেখা আনিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সেটুকু কয়েকটা ফোঁটার আকারে ঝরিয়া কিশোরের মনের জলন্ত আগুনে যেন সুধাধারা-পাত হইয়া গেল। সে স্বপ্নাভিভূতের মত বলিল, "তিনি বরাবরই মনের মধ্যে এই ইচ্ছা করতেন,—তাঁর এই সাধের কথা কত বার অজ্ঞানের মধ্যেও বলেছেন। তিনি যেন জেনেই গেছেন—"

"তাও কি আপনার মনে পড়ছে না? তাই তো সবই আপনার বাড়াবাড়ি বলতে ইচ্ছা হয়। আর আপনার যিনি চিরদিন মা হয়ে আছেন, তাঁর কথাও একবার আপনার মনে হচ্ছে না? তিনি যে—"

"সবই মনে হচ্ছে ঝরণা, তবু একবার বল, আবার সবই সম্ভব! আমাদের গুরুজনরা, আমার স্বর্গের দেবতা, তাঁরা দেখ্‌তে পাচ্ছেন সবই, বুঝতে পেরেছেন সব, তাই আমাদের এই আসল মিলন তাঁরাই নিজ-হাতে বেঁধে দিচ্ছেন! আমি তোমার শুধু দয়া নয়, মায়া নয়—স্নেহও পেতে পারি—আমার কথা তুমি জান্‌তে এতদিন, জান্‌তে আমার এই আরব্য উপন্যাসের গল্পকে, তাই ঘৃণা করনি—তাই দয়া করে এই অসঙ্গত আশাকে—"

"যা খুসি করুন আপনি! আপনার মিছে বকুনি আর শুন্‌তে চাই না। মা আসছেন—" বলিতে বলিতে ঝরণা, সেই রাঁচির ছোট্ট ঝরণাটির মতই ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সমাপ্ত

শ্রীনিরুপমা দেবী।

চাঁপা কুষ্ঠাশ্রম

অধর্ম্ম, অত্যাচার এবং প্রাণিপীড়ন-দমনার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যদি বীরত্বের পরিচায়ক হয়, তবে দীন-হীন নিরাশ্রয় রোগশোকজীর্ণ ব্যক্তিগণের উপকারার্থ কর্ম্ম-ভূমিতে কর্ম্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া অল্প পৌরুষের বিষয় নহে। যে জাতির মধ্যে লোকসেবা ও আর্ত্তের উপকার-প্রচেষ্টা অধিক, সেই জাতি তত মহৎ এবং উদার। আধুনিক সময়ের খৃষ্টান-সম্প্রদায় লোকসেবার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়া আমাদের দেশে যে-যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছেন, আজ আমরা তাহারি একটির পরিচয় প্রদান করিব।

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিলাসপুর জেলার মধ্যে চাঁপা নামে একটি ক্ষুদ্র জমিদারী আছে। তাহার সদর-ষ্টেশনের নামও চাঁপা। বেঙ্গল নাগপুর রেল লাইনের উপর চাঁপা একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে একটু দূরেই হাঁসদী নদীর তীরে চাঁপার বস্তী। রেশমের কাপড় ও কাঁসার বাসনের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

বাংলার নিকটেই আশ্রম-ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। এই আশ্রম-ভবনগুলির নিকট দিয়াই আম্র-মধুকবনসঞ্চারিণী কোকিল-কুল-গুঞ্জরিতা হাঁসদী নদীর রজত-ধারা কল কল নাদে প্রবাহিত হইতেছে।

উক্ত হাঁসদী নদীর তীরে একটি বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দুইটি রোগিনিবাস প্রস্তুত হইয়াছে। একটিতে পুরুষ-রোগী ও অন্যটিতে স্ত্রী-রোগীরা অবস্থান করে। এই দুইখানি ভবনের মধ্যে এক প্রশস্ত অঙ্গন।
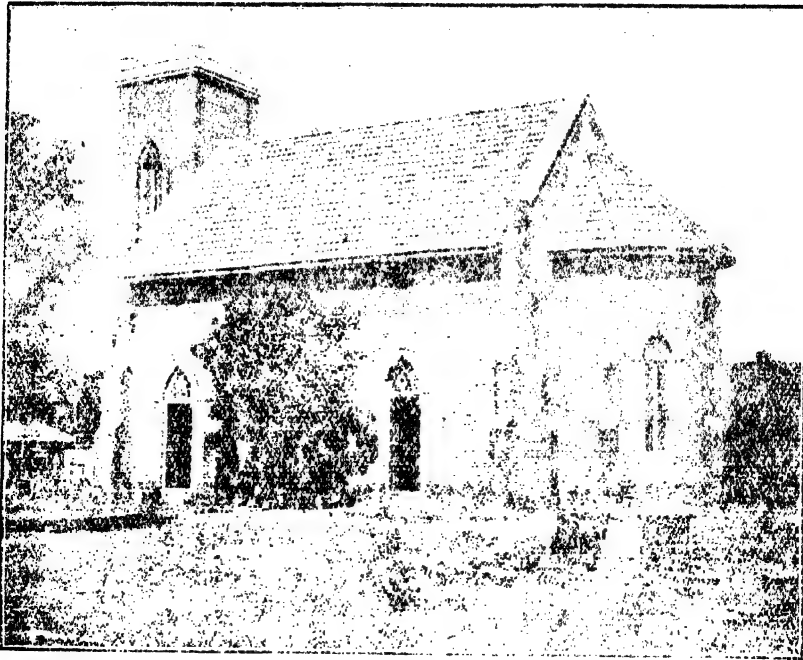
চাঁপা কুষ্ঠাশ্রম ও গির্জ্জা

এই চাঁপা নামক স্থানের নিকটেই খৃষ্টান পাদরি মহোদয়গণের প্রতিষ্ঠিত এক কুষ্ঠাশ্রম আছে। এই কুষ্ঠাশ্রমের নাম Bethesda Leper Home। আমেরিকার মেনোনাইট মিশন (Mennonite Mission) এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। ঐ মিশনের ব্যয়েই এই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে। চাঁপা রেল ষ্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই অদূরে এক বাংলা দেখা যায়। এই বাংলায় আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ বাস করেন। এই

এই অঙ্গনের মধ্যে একটি ছোট গির্জ্জা। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী রোগীরা এখানে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকে। খৃষ্টানেতর অন্যান্য রোগিগণের উপর কোনোরূপ জোর-জুলুম করা হয় না। সকলেই যাহাতে তাহাদের জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে রোগিনিবাসে বাস করিতে পারে—তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থাও আছে। আশ্রমের প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি বেশ পরিষ্কার বাড়ী। তাহার একটিতে আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষের অফিস ও অন্যটি কম্পাউণ্ডারের ড্রেসিং রুম।

আশ্রম-ভবন, অঙ্গন, গির্জ্জা, হাসপাতাল এবং অফিস-গৃহগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

এই আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ ও সঞ্চালক রেভারেণ্ড পেনর (Rev. Penner) সাহেব অতিশয় সজ্জন ও দয়ালু। তিনি আর্ত্তের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির প্রভাবে চাঁপার সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে দেবতার আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইরূপে তিনি চাঁপা ও তদ্দেশবাসী জনগণের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছেন। আশ্রমে সমাগত রোগীদিগের সহিত বড় সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাহাকেও ঔষধ দিয়া সাহায্য করিতেছেন—কাহাকেও সৎপরামর্শ দিয়া বিদায় করিতেছেন—কাহাকেও বা আর্থিক সাহায্য করিয়া সন্তুষ্ট করিতেছেন। ইঁহাদের একমাত্র কন্যা এখন অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পাইতেছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম এখন ২২।২৩ বৎসর।

চাঁপা কুষ্ঠাশ্রম রোগিগণের চিকিৎসা বিনাব্যয়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের পচা ঘায়ে

আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ পেনর সাহেব, তাঁহার পত্নী ও কন্যা

দিগকে তিনি স্বহস্তে ঔষধ দিয়া থাকেন। দীনহীন বিপন্ন ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য করেন এবং শোকজীর্ণ হতভাগ্যকে প্রচুর আশ্বাসে সান্ত্বনা দিয়া থাকেন। দীনহীন ও পীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য রেভাণ্ডের পেনর সাহেবের গৃহদ্বার সদা-উন্মুক্ত। পেনর সাহেব ইতিমধ্যেই ছত্রিশগড়ী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন। সমাগত রোগীদিগের সহিত তিনি দেশীয় ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন।

পেনর সাহেবের পত্নীও অতিশয় দয়াবতী এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা। স্বামীর অনুপস্থিতি-কালে ইনি আশ্রম-সমাগত আইডোফর্ম্ ও চালমুগ্‌রার তৈল ব্যবহার করানো হইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন খাইবার ঔষধও দেওয়া হয়। চালমুগ্‌রার তৈল দিয়া এ পর্য্যন্ত অনেক রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। যদিও তাহারা তাহাতে সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই, তথাপি ঐ তৈল ব্যবহারে রোগীদের রোগাক্রান্ত অবশ অঙ্গে স্পর্শজ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছে।

নূতন সমাগত রোগীদের থাকিবার ও ভর্ত্তি হইবার ব্যবস্থা পেনর সাহেব নিজেই করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার এতদ্দেশীয় এ্যাসিষ্ট্যাণ্টের উপর ভার দেন না। ভারতীয়েরা

কুষ্ঠরোগীদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন; এজন্য পেনর সাহেব মনে করেন, কোনো ভারতীয় এ্যাসিষ্ট্যান্টের উপর এই ভার দিলে যদি সেই ব্যক্তি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া কোনো কুষ্ঠরোগীকে তাড়াইয়া দেন বা তাহার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা সমুচিত না করেন তবে তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে।

এই আশ্রমে এখন প্রায় ৪০০ কুষ্ঠরোগী বাস করিতেছে। প্রতিদিনই রোগীর সংখ্যা বাড়িতেছে। স্ত্রী-রোগীদের জন্য ১০।১২ খানি নূতন গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য অনূন ১৫০০৲ টাকা করিয়া খরচ পড়িয়াছে। রোগীদের থাকিবার জন্য শীঘ্রই নূতন গৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে। আমেরিকার এক বিধবা এই পুণ্যকর আশ্রম-প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত পেনর সাহেবকে ৯০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেদিন পেনর সাহেবের এক আমেরিকান্ বন্ধু কুষ্ঠরোগীদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ৪০০০৲ চার হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। আমাদের দেশের রোগীদের জন্য সুদূর আমেরিকার অধিবাসিগণের এত দরদ, আর আমরা আমাদের বিপন্ন, রোগাক্রান্ত ভ্রাতৃগণের জন্য কি করিতেছি! পেনর সাহেব তাঁহার এক বন্ধুকে এজন্য দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—"*** But until now I have not received a single pie from an Indian. I have to pay rent even for the land which the Champa Zamindar has given to the Mission.—" ইহা অপেক্ষা আমাদের আর কি শোচনীয় অধঃপতন হইতে পারে!

পেনর সাহেব

আশ্রমের রোগীদের পরিচর্য্যার জন্য ব্রহ্মদেশবাসী এক আশ্রম-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন। তাঁহার নাম মিঃ ডি, এস, পল (Mr. D. S. Paul)। মিষ্টার পল অতিশয় বিনয়ী ও সজ্জন। তাঁহার সাহায্যকারী আছেন এতদ্দেশবাসী এক দেশীয় খৃষ্টান কম্পাউণ্ডার। তিনিও সপরিবারে এই আশ্রমের একাংশে বাস করেন।

যে-সব কুষ্ঠরোগী এই আশ্রমে বাস করে তাহাদের অবস্থা এখন বেশ ভাল। যাহারা এইরূপ ঘৃণ্য পীড়ায় পীড়িত হইয়া আপনাদের জীবনকে ভারস্বরূপ মনে করিয়া মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছিল, এখন তাহারা আশ্রমের

রঙ্গমে মধুর স্বরে ভগবানের নাম গান করিতেছে। এই আশ্রমে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার কোনো ত্রুটিই হয় না। কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ এই আশ্রমে আসিয়া আরোগ্যলাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে—কেহ কেহ বা তাহাদের পীড়িত ভ্রাতা-ভগিনীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সেই আশ্রমেই কালাতিপাত করিতেছে। একটি স্ত্রী-রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া আশ্রমস্থ স্ত্রী-রোগীগণের সেবা ও চিকিৎসার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। রোগীদের আহারাদির ব্যবস্থা সুন্দর। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ব্যক্তিকেই এই আশ্রমে স্থান দেওয়া হয়। এই আশ্রম ও আশ্রমস্থ রোগীদিগকে দেখিবার জন্য বিলাসপুর জেলার সিবিল সার্জ্জন, ডেপুটী কমিশনর এবং বিভাগীয় শাসন-কর্ত্তা সময়ে সময়ে এখানে বেড়াইয়া যান্। শ্রীযুক্ত পেনর সাহেবের অনুরোধে অল্পদিন হইল ছত্রিশগড় বিভাগের কমিশনর মহাশয় এই আশ্রম পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

এই আশ্রম-সম্পর্কে আমাদের কি করা উচিত তাহা প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিই অনুমান করিতে পারেন। যদি আমাদের দেশের ধনিগণের সদয় দৃষ্টি এই অনাথ রোগিগণের ও এই পুণ্যময় আশ্রমের প্রতি পতিত হইত তাহা হইলে শ্রীযুক্ত পেনর সাহেবকে লিখিতে হইত না—"Here is a chance for Indian charity. * * * until now I have not received a single pie from an Indian—"!

চাঁপা কুষ্ঠাশ্রমের নিকটস্থ প্রদেশে অনেকগুলি ধনী জমিদার আছেন। তাঁহারা কি এই সকল বিপন্ন রোগজীর্ণ অনাথগণের সাহায্যার্থ বার্ষিক অন্ততঃ ১০০৲ একশত টাকাও সাহায্য করিতে পারেন না! আমেরিকার সদাশয় ব্যক্তিগণ আমাদের বিপন্ন ভ্রাতা-ভগিনীগণের সেবার জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করিতেছেন—আর আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া আমাদের রোগকাতর ভ্রাতা-ভগিনীদের প্রতি অবহেলাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি। এই কি আমাদের মনুষ্যত্ব!

চাপা কুষ্ঠাশ্রমের কম্পাউণ্ডার ও তাঁর পত্নী

আমাদের জাতীয় চরিত্রে এমনি দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে যে, কোনো একটা শুভকর প্রতিষ্ঠান আমরা

নিজে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি না, কিন্তু কোনো বিদেশীয়ের সাহায্যে আমরা তাহা চালাইতে পারি। চাঁপার কুষ্ঠাশ্রম আমেরিকান্ পাদ্‌রি পেনর সাহেবের একটি মহীয়সী কীর্ত্তি। উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া যদি আমরা শ্রীযুক্ত পেনর সাহেবের সহকারিরূপে উক্ত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তবে এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আরো কত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। আমরা 'ভারতীর' পৃষ্ঠায় এই চাঁপা কুষ্ঠাশ্রমের পরিচয় দিয়া এ বিষয়ে আমাদের দেশের ধনী ও দয়ালু সজ্জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বুক-ভাঙা

(গল্প)

শিল্পী সুকুমার তাঁর কলা-ভবনে প্রবেশ ক'রে সবে মাত্র রংয়ের বাক্সটা টেনে নিয়ে সিক্ত তুলি-স্পর্শে একটা করুণ বর্ণের সন্ধান করছিলেন, এমন সময় তাঁর আবাল্য-সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাক্তার অরুণ সেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

"আরে! অরুণ যে! আজ একেবারে ভোর-বেলা এসে হাজির! ব্যাপার কি, বল তো!"

অরুণ কোন কথা না বলে সুকুমারের তুলি-সমেত হাতখানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে খুব জোরে বার-কতক ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌লে,—"ব্যস্, আর কি—তোর নাম বেরিয়ে গেছে!—কাল আর্ট-একজিবিশন দেখতে গেছলুম, বুঝলি, সবাই দেখলুম একবাক্যে তোর সেই "বুক-ভাঙা" ছবি-খানার প্রশংসা করছে! শুনলুম নাকি একজন আমেরিকান টুরিষ্ট তোর ওই ছবিখানার জন্যে পাঁচশো টাকা দিতে চেয়েছিল!—কিন্তু তুই তাকে ছবি বেচিস্‌নি?"

"তুই বলিস কি! ও ছবি কি আমি বেচ্‌তে পারি? ও কার ছবি, তুই ভুলে গেলি অরুণ?"

"আরে হলোই বা, পাঁচশো টাকা নগদ হাতে এসে যেতো। তুই বড় বোকা! বেচে দিতে হয়! ও মর্ম্মঘাতী বেদনার ছবি সর্ব্বদা সাম্‌নে ঝুলিয়ে না রাখলেই কি নয়?"

"আমি যে কিছুতেই ভুলতে পার্ব্বনা অরুণ যে মনোরমা আমারই অবহেলায় অভিমানে প্রাণ দিয়েছে। আমারই বিশ্বাস-ঘাতকতায় যে তার বুক ভেঙে ছিল, ভাই!"

"এত যদি মনোরমার প্রতি তোমার দরদ ছিল, তবে তাকেই বিবাহ না ক'রে শেফালিকে বিবাহ করলে কেন?"

"আমার এই পাপের জন্যে তোমাদের হিন্দু সমাজ অনেকখানি দায়ী! সব দোষটাই আমার ঘাড়ে চাপিয়ো না। লীলার মুখ চেয়েই তো আমি মোনোকে বিবাহ করতে সাহস করলুম না!—তোমরাই তো অনেকে তখন আমাকে ভয় দেখালে যে বিধবা বিবাহ করলে বোনের বিয়ে দেওয়া দায় হয়ে উঠবে।"

"আমরা ভেবেছিলুম, শেফালির মত সুন্দরী গুণবতী মেয়েকে পত্নীরূপে পেয়ে তুমি মনোরমার রোমান্স ভুলতে পার্‌বে। তাছাড়া এ কথা তো মিছে নয় সুকুমার যে বিধবা-বিবাহ আইন-সিদ্ধ হলেও হিন্দুসমাজ ওটাকে এখনও সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেনি! তুমি মনোরমাকে বিবাহ করলে লীলার বিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই বিশেষ শক্ত হয়ে উঠতো।"

"সমস্তই বুঝি অরুণ, কিন্তু মন কিছুতেই মানতে চায় না! আমার উচিত ছিল, হিন্দুসমাজ ত্যাগ ক'রে অন্য কোন সমাজে মেশা—যেখানে বিধবাকে বিবাহ করলে ভগ্নীর বিবাহ দেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে না!—যেখানে সমাজের ভয়ে অন্তরের পরম-প্রেমাস্পদকে ত্যাগ করতে হয় না, যেখানে বুকভাঙা প্রণয়িণীর করুণ স্মৃতি জীবনের সমস্ত সুখ হরণ করে নেবার সুযোগ পায় না—"

সুকুমারের কথায় বাধা দিয়ে অরুণ বললে—"সেটা কে

তুমি ইচ্ছে করেই ডেকে এনেছো বন্ধু! মনোরমাকে দেখতে যাওয়াটা তোমার আর-এক মস্ত ভুল হয়েছিল।"

বিস্মিত সুকুমার বলে উঠল, "বল কি—অরুণ! সে মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে আমাকে একবার শেষ দেখা দেখে যাবার জন্য অনুরোধ ক'রে পাঠালে, আহা! তার সে অন্তিম অনুরোধ আমি কি ঠেল্‌তে পারি? এত-বড় হৃদয়-হীন পাষণ্ড আমি নই অরুণ, বুঝলে!"

অরুণ একটু অপ্রতিভ হয়ে বললে, "আচ্ছা, বেশ, গেলে তো গেলে—তাকে দেখে চলে এলেই তো হতো—তার সেই আশাহত ম্লান মুখের মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন মূর্ত্তিখানি এঁকে রাখবার কি প্রয়োজন ছিল!"

পাণ্ডুর মুখে একটু বিবর্ণ হাসি ফুটিয়ে সুকুমার বললে, "বন্ধু, আমি তখন বুঝতে পারিনি যে মরণোন্মুখ মনোরমা আমাকে অমর করে দিয়ে যাবার জন্যই তার অন্তিম শয্যা থেকে আমার দুটি হাত ধ'রে সেদিন বলেছিল, —এখন আর একদিনও বোধ হয় তোমার মনোর ছবি আঁকবার সাধ হয় না—না? আমি কিন্তু আমার জীবনের সেই সব-চেয়ে সুখের দিনগুলোকে কিছুতেই ভুলতে পারিনি! সেই যে তুমি কত অনুনয়-বিনয় ক'রে, কত তোষামোদ ক'রে কত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে প্রতি দিন টেনে নিয়ে যেতে, তোমার সেই সুন্দর সাজানো বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত মর্ম্মর বেদীর উপর আমাকে বসিয়ে তন্ময় হয়ে আমার ছবি আঁকতে! এক-একদিন এক এক রকম করে আমাকে সাজিয়ে আমার কত ভাবের কত ভঙ্গীর ছবিই না তুল্‌তে তখন! সেই শান্ত মধুর নির্জ্জন ছবির ঘরখানিতে তোমার সঙ্গে আমার এই বিড়ম্বিত জীবনের কত সুদীর্ঘ দিন আনন্দের বিহ্বলতার মধ্যে যেন স্বপ্নের মতো কেটে গেছল!—তোমার সে ছবির ঘর আজ আমার কাছে তীর্থের চেয়েও লোভনীয় বলে মনে হচ্ছে! দেখ, আমি ত চলেইছি, পরপারের যাত্রী—কিন্তু যাবার আগে—একবার—একটিবার শুধু দয়া করে— আমাকে তোমার সেই কলা-ভবনে নিয়ে যাবে? তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আমায় একবার নিয়ে চল!—অরুণ, মনুষ্যত্ব যদি কোন মানুষ না হারিয়ে থাকে, তা'হলে সেদিন সে-অবস্থায় আমি যা করেছিলুম, সেও নিশ্চয় তাই করতো। সযত্নে সাবধানে মনোরমাকে আমার স্নেহ-বাহুর মধ্যে ঘিরে নিয়ে এসে যখন এই কলা-ভবনে তার ওই চির-পরিচিত বেদীটির উপর 'কুশন্' পেতে শুইয়ে দিলুম, সে একবার তার সেই কালো দুটি ডাগর চোখ মেলে চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখে—সে হায়, কি অপূর্ব্ব তৃপ্তির হাসিই না হেসেছিল! এ ঘরের আকাশে বাতাসে, প্রাচীরে মুকুরে, প্রত্যেক চিত্রের প্রত্যেক মূর্ত্তির চোখে-মুখে যেন এখনও সেটি লেগে রয়েছে!—তারপর অনেকক্ষণ বাদে সে আমার দিকে একটা কাতর মিনতি-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল্‌লে,—এতো যদি অনুগ্রহ করলে এ অভাগিনাকে, তাহলে আর একটা অনুরোধ রাখ্‌বে কি? বল্‌বো কি সাহস করে?—

আমি তখন কি বল্লুম তাকে, জানো অরুণ?—সেই মরণ-পথ-যাত্রিনী সঙ্গিনীর কাতর মুখের দিকে চেয়ে আমার দেহ-মন সেদিন এমনই বিকল হয়ে পড়েছিল যে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে আমি তাকে বলে ফেললুম,—মনো, কি চাও তুমি, আমাকে আজ তা অসঙ্কোচ বল! আমার ওপর তোমার চেয়ে বড় অধিকার, তোমার চেয়ে বেশী দাবী আর কারুর নেই! মৃত্যুর উপকূলে দাঁড়িয়ে ওগো আমার জন্ম-দুঃখিনী রাণী, তুমি আমাকে আজ যে আদেশ করবে, সে যদি অসম্ভবও হয়, তবু আমি তাকে প্রাণ দিয়েও সম্ভব করে তুল্‌বো!

আমার কথা শুনে আবার তার মুখে সেই করুণ হাসি ফুটে উঠল! সে বল্লে,—আমি যে তা জানি—আর জানি বলেই আজ মরণকে এমন হাসি-মুখে বরণ করে নিতে পারছি! নইলে কি আমি একদণ্ড স্থির হয়ে থাকতে পারতুম? বুকের ভেতর যে শত বজ্রের বিদ্যুতানল জ্বলে উঠতো!—যাক্ সে কথা—আজ জীবনের এই অবেলায় তোমায় অসুখী দেখ্‌লে আমি আর ধৈর্য্য ধর্‌তে পারবো না। তুমি তোমাকে দেখ—আর কিছু না—কেবল যদি— একখানা এই—আমার একখানা শেষ ছবি—দয়া করে— এঁকে দাও—এখানে এমনি করে আমাকে বসিয়ে— তুমি যদি সেই রকম করে—

তার কথা শেষ না হতে-হতে আমি সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে বসে গেলুম। সমস্ত দিন ধরে এক-মনে তন্ময় হয়ে তার ছবি আঁকলুম, কোথা দিয়ে কখন যে প্রভাত-সূর্য্য মধ্যাহ্ন-গগন পার হয়ে পশ্চিমের রক্তাক্ত আকাশে ঢলে পড়েছিল, কিছু টের পাই নি! বার-বার শুধু সেই বুকভাঙা নারীর করুণ কাতর ম্লান মুখের দিকে চেয়েছি আর তুলির পর তুলি নিয়ে রংয়ের পর রং বদলে সেই বিষাদের আঁধার-স্নিগ্ধ রূপটির,—সেই পুঞ্জীভূত হতাশের জমাট অশ্রু-বিন্দুটির সব-কটি রং প্রত্যেক টানে প্রত্যেক রেখায় ফুটিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করেছি! তারপর সব-শেষ টানটি দিয়ে ছবি ছেড়ে যখন উঠে দাঁড়ালুম—শেফালি এসে বললে—কি পাগলামি করছো? সেই যে সকালে এ ঘরে এসে ঢুকেছো আর সমস্ত দিনে একবারও বেরুলে না! সন্ধ্যে হয়ে এলো যে, সে হুঁসও নেই বুঝি! আজ একেবারে নাওয়া খাওয়া পর্য্যন্ত ভুলে, কি ছবি আঁকছিলে, বল দেখি?—

চিত্রের সফলতায় আমার চিত্ত তখন প্রফুল্ল ছিল, আমি প্রসন্ন হাস্যে শেফালির মুখখানি দু'হাতে ধরে তার অধর-প্রান্তে একটি গাঢ় চুম্বন এঁকে-দিয়ে বললুম,—তোমার সতীনের—! কথাটা বলেই লজ্জিত হয়ে আমি বেদীর উপর লীলায়িত ভঙ্গীতে অর্দ্ধশয়ানা মোনোর দিকে ফিরে চাইলুম!—চেয়ে দেখি, আহা, রোগশীর্ণ দুর্ব্বল বেচারী সমস্ত দিনের ক্লান্তি আর অবসাদে তখন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে!

আমার দৃষ্টির অনুসরণ করে শেফালিও সেদিকে ফিরে দেখে কৌতূহলোদ্দীপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—উনি কে গা? সত্যি, বল না!—

আমি তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললুম,—আঃ, কর কি!—আস্তে কথা কও! দেখছ না, মনোরমা ঘুমিয়ে পড়েছে—একে ওর অসুস্থ শরীর, তার ওপর হঠাৎ ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে অসুখ বেড়ে যেতে পারে।

পা টিপে টিপে শেফালি মনোরমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি বললুম,—ওই উত্তরের জান্‌লাটা দিয়ে বড় ঠাণ্ডা হাওয়া আস্‌ছে, ওটাকে খুব আস্তে বন্ধ করে দিয়ে এসো।—আমি ততক্ষণ আমার শালখানা ওর গায়ে চাপা দিয়ে দিই। একটু ভাল করে ঘুমুক!—

তার পর নিদ্রিতা মনোরমার ঘুমের পরিচর্য্যা করবার জন্য আমি সযত্নে আমার শালখানি ভাঁজ করে তার গায়ে চাপা দিতে যাচ্ছি—তখনও বুঝতে পারিনি যে সে আজ আমারই ঘরে আমারই চোখের সম্মুখে চিরনিদ্রায় ঢুলে পড়েছে! জন্ম-দুঃখিনীর সকল দুঃখ তার এই তীর্থে ফেলে রেখে হাসি-মুখে সে চলে গেছে!—"

বলতে বলতে সুকুমারের কণ্ঠস্বর গাঢ় বেদনায় ঘন হয়ে আসছিল, চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে উঠছিল—অরুণ স্তব্ধ হৃদয়ে নির্ব্বাক সম্ভ্রমে বন্ধুকে বাহুর মধ্যে টেনে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

আলোচনা

কুমারী-সমাজ ও বিবাহ-সমস্যা

(১)

বিবাহ-সমস্যা আজকাল আমাদের নিকট বিশ্ব-সমস্যার চেয়ে বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্যার আশু সমাধান করা দরকার; তাহা না হইলে পূর্ব্বে কোনও সমাজে যেরূপ কন্যা-হত্যা করা হইত, আমাদের সমাজেও তাহা আরম্ভ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। আজ এই পণ-প্রথার উৎপত্তির কারণ ও তন্নিবারণের উপায় সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিব। কেহ কেহ বলেন যে "দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন-সমন্বিতা" সূত্র হইতেই পণ প্রথার সৃষ্টি। দান করিলে শাস্ত্রানুসারে দক্ষিণা দিতে হয় বটে—কিন্তু 'কন্যা-দানের' আজকাল যে দক্ষিণা দাঁড়াইয়াছে, তাহা সমাজের সুস্থ অবস্থার লক্ষণ নহে—আর 'ধনরত্ন সমন্বিতা' এর উপর এই লজ্জাজনক ব্যবসায়ের ভিত্তি নয়। বর্ত্তমান অবস্থার কি কি কারণ, তাহা আমরা একে একে দেখিতেছি।

বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ

প্রথমে আমরা সাধারণতঃ নির্দ্ধারিত কয়েকটি উপায়ের আলোচনা করিয়া নিজেদের বক্তব্য বলিব। প্রথম উপায়,—পুরুষের বহুবিবাহ।

ইহার যুক্তি এই যে পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে—তবে ফলে স্ত্রীর সংখ্যা কম হইবে সুতরাং কন্যার আদর বাড়িবে। অর্থাৎ বহুবিবাহ হইলে দু-তিনটি কন্যার জন্য মাত্র একজন বরের দরকার পড়িবে। তাহার ফলে পণ-প্রথা উঠিয়া যাইবে। ইহা অর্থনীতির একটা মূল principle (নীতি ?) এর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই মতবাদীগণ উহার জন্য বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধতা ও সত্যের দাবী করেন। বহুবিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কুলীন-প্রবরগণ প্রত্যেকে ১০০।১৫০ পর্য্যন্ত বিবাহ করিলেও কোন কোন কুলীন-কুমারীর ৫০।৬০ বৎসর বয়সে গঙ্গালাভের কথা শুনা গিয়াছে। বহুবিবাহ দ্বারা যে পণ-প্রথা নিবারিত হইবে না, সে সম্বন্ধে একমাত্র এই প্রমাণের উপর যথেষ্ট নির্ভর করা যায়। তারপর বহুবিবাহ হইলে যদি অমন লাভ-জনক ব্যবসাটা মাটী হইয়া যায়, তবে পুরুষ বহুবিবাহ করিতে সম্মত হইবে কেন? একে ত অর্থ-নষ্ট তার উপর বহুপোষ্য-পোষণ! আট টাকা যে চাউলের মণ!

বহুবিবাহ দ্বারা পণপ্রথা নিবারিত ত হইবেই না, লাভের মধ্যে উহাতে অনিষ্ট ও অশান্তির আমদানি হইবে মাত্র। প্রথম বিবাহে পাঁচ হাজার পাওয়া গিয়াছিল, এবার না হয় চারি হাজার নয় শত নিরানব্বই টাকা পনর আনা তিন পয়সা লওয়া যাইবে। আর ঘরে সপত্নী থাকা সত্ত্বেও মহাপুরুষদের শ্রীচরণে বলি দেওয়ার উপযোগী মেয়ের অভাব মোটেই হইবে না! তারপর একাধিক পত্নী গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনটা যে অতি-মোলায়েম বোধ হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ "সোনার সংসার ছারেখারে" দেওয়ার এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। এমন সৎ-পরামর্শ-দানে যাঁহারা আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন, তাঁহা-দিগকে ধন্যবাদ। একটা পাপ প্রথা দ্বারা অন্য ক্ষুদ্রতর পাপের বিনাশ সম্ভবপর হইলেও তাহা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। নবযুগ-তরণীর নূতন নাবিকগণ এরূপ উপদেষ্টাদিগকে দূর হইতেই প্রণাম করিবেন।

তারপর তাঁহারা একটা কথা বেমালুম হজম করিয়া যান—সেটা মেয়েদের কথা। অবশ্য যাঁহারা এই মতাবলম্বী তাঁহারা মেয়েদের যে কোন স্বতন্ত্র সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ কিছু আছে, ইহা স্বীকার করেন না—অন্ততঃ কাজের বেলায়। কিন্তু আমাদের বুঝা উচিত যে পুরুষের বহু-বিবাহে তাঁহাদের কোথায় আঘাত লাগে। যাহা হউক সমাজের গতি এদিকে নয়—যাইবে না—সুতরাং হিতৈষী মহাশয়েরা যত ইচ্ছা উপদেশ বিতরণ করিতে পারেন, আমাদের কোন আপত্তি নাই।

আর এক উপায় তাঁরা বাহির করিয়াছেন—সেটি বাল্যবিবাহ। এতদিন ত এই কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম যে বাল্যবিবাহই পণপ্রথার একটী কারণ। এখন শুনিতেছি যে বাল্যবিবাহ দ্বারাই পণপ্রথা নিবারিত হইবে। বহুবিবাহের যুক্তিতর্ক বরং কিছু বোঝা যায়, কিন্তু এ যুক্তি বুঝা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে এটাও হয়ত অর্থনীতির সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুই বৎসরের বাছুরের দাম ছয় বৎসরের ষাঁড়ের দামের চেয়ে কম; সুতরাং ষোল বৎসরের বরের দাম চব্বিশ বৎসরের বরের দামের চেয়ে কম হইবে। কথাটা শুনিতে মন্দ নয়, তবে মুস্কিল এই যে ষোল বৎসরের মেয়ের জন্য যদি পাঁচ হাজার টাকায় বর পাওয়া যায় তবে আট বৎসরের "গৌরী"র জন্য বরের দাম দশ হাজারের দিকে যাইতেছে। কারণ হিতৈষীদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যুবকগণ "গৌরী-লাভে"র জন্য বেশী ব্যাকুল বলিয়া মনে হয় না—। যাক্, আমি অর্থনীতি ভাল বুঝি না—তাই বোধ হয় গোলমাল করিয়া ফেলিলাম। তা না হইলে "অভিজ্ঞ"গণ যাহা বলিবেন, তাহাতে গলদ থাকিবে কিরূপে? অর্থাৎ গলদ থাকা অসম্ভব।

বহুবিবাহ বা বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে এত কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই কলিকাতাতেই কোন কোন সমাজ-হিতৈষীর দল—বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের ওকালতি করিতে যেরূপ লাগিয়া পড়িয়াছেন এবং ভাবাবেশে প্রতিপক্ষও সঙ্গে সঙ্গে নারীদের সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে যে সব মন্তব্য উচ্চারণ করেন, তাহা কেবল মাত্র এই সমাজেই সম্ভব।

মেয়ের প্রাপ্য অর্থ

আবার কেহ কেহ নানা কারণে পণপ্রথার সমর্থনও করিয়া থাকেন। প্রথম যুক্তি এই যে কন্যার পিতার সম্পত্তি তাহার ছেলেরা পাইবে—কন্যাকে তিনি বঞ্চিত করিবেন কেন? অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কন্যার পিতার প্রদত্ত অর্থ কন্যার স্ত্রীধনে পরিণত হয় না; উহা বারো ভূতের সেবায় ব্যয়িত হয়। তারপর উত্তরাধিকার আইন সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রযুজ্য—সুতরাং এ যুক্তির কোন সার্থকতা থাকে না। পণপ্রথার সমর্থক আর একটী যুক্তি এই যে ছেলের শিক্ষায় যথেষ্ট টাকা খরচ হইয়াছে কিন্তু মেয়ের বেলায় কিছুই হয় নাই। পণের জন্য যে টাকা পাওয়া যায়, তাহা কি মেয়ের শিক্ষার জন্য, মেয়ের উপকারের জন্য ব্যয়িত হয়? যদি না হয়, তবে শিক্ষার অজুহাতে টাকা আদায়ের অর্থ কি?

আবার অনেকে বলেন যে ছেলে ও মেয়ের পৈত্রিক সম্পত্তিতে তুল্যাধিকার থাকিলে পণপ্রথা নিবারিত হইবে। অর্থাৎ কন্যার পিতা নগদ টাকা বরের পিতাকে না দিয়া নিজের সম্পত্তির অংশ দিবেন। পণপ্রথার কিছুই হইল না—তবে উহাতে মেয়েদের সুবিধা বটে। আমা-দের দেশে সম্পত্তির মধ্যে মাটী আর চাকরী। সুতরাং এই সম্পত্তির অংশ মেয়ের সঙ্গে তাহার শ্বশুরবাড়ী পাঠানো খুব মোলায়েম ব্যাপার হইবে না। আর তাহা হইলেও ছেলের স্ত্রীর স্ত্রীধনে ছেলের বাবার রাক্ষুসে ক্ষুধা মিটিবার সম্ভাবনা নাই। পণপ্রথা দ্বারা যাহারা নিপীড়িত

অর্থাৎ দরিদ্র, তাহাদের কোন উপকারই হইবে না। বরের পিতার দৃষ্টি থাকিবে ঐ চার-তলা বাড়ী, বাগান, জমিদারী—প্রভৃতির উপর। সুতরাং এ ব্যবস্থাতেও সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

সুতরাং এ সমস্ত উপায় কার্য্যকরী নয়। কারণ এগুলির দ্বারা রোগের জড় মরিবে না। রোগের মূল অনুসন্ধান করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে পণপ্রথার মূল কারণ নারী-সমাজের হীনতা ও পুরুষদের টাকা-আদায়ের সুযোগ। নারীদিগকে আমরা যেরূপ হীন ও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছি, তাহাই এই পণপ্রথার সৃষ্টির একটী প্রধান কারণ, তার উপর আমাদের লোভ উহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়াছে। পুরুষের যেমন স্ত্রীর দরকার, স্ত্রীরও তেমন স্বামীর দরকার। কেবল স্ত্রী বা পুরুষ লইয়া সংসার চলে না। তবে বিবাহের সময় পুরুষ-পক্ষ স্ত্রী-পক্ষের নিকট হইতে কসাইএর মত টাকা আদায় করে কেন? বর কনেকে "কায়দায়" পাইয়া টাকা আদায় করে। ক্রমশঃ আমরা তাহার আলোচনা করিতেছি।

স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহ বয়স

প্রথমেই বিবাহের বয়স। মেয়েদের বেলায় "ততঃ উর্দ্ধরজস্বলা—" ধরিয়া দশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিতে হইবে। আমরা শাস্ত্রভক্ত হিন্দু, সুতরাং দশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিতে যাওয়ায় একটা ফল হইল এই যে, গণিত-শাস্ত্রের নিয়ম ওলটপালট হইয়া গেল। ধরুন মেয়ের জন্ম যদি ১৩১০ সালে হয় তাহা হইলে ১৩২৪ বা ২৬ সালেও তাহার বিবাহ-কালীন বয়স ঠিক দশ বৎসর হইবে; কারণ শাস্ত্রের আদেশ দশ বৎসর বয়সে বিবাহ দেওয়া চাই। যাক্‌ ও কথা। পুরুষের বেলায় কিন্তু ও-সব আপদ মোটেই নাই। আশী বৎসর বয়সে গঙ্গাযাত্রা করিয়াও বর-মহাশয় নির্ব্বিবাদে 'গৌরী' লাভ করিতে পারেন তাহাতে ধর্ম্ম বা সমাজ কাহারও বাধা নাই,—কারণ তিনি পুরুষ। কিন্তু মেয়েদের বেলায় সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিবাহ না হইলে মেয়ের বিয়াল্লিশ পুরুষের দুর্দ্দশার আর সীমা নাই—স্বর্গে গেলেও হুড়মুড় করিয়া নামিয়া নরকে যাইতে হইবে—গোটা হিন্দু-জাতিটা (অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সমস্ত জাতি) একদম রসাতলে গিয়া উপস্থিত হইবে। এটা হইল 'কায়দা' নম্বর পহিলা।

তারপর বর মহাশয় ইচ্ছা না করিলে বিবাহ না করিতে পারেন; তাহাতে কোন আপত্তি ত নাই-ই বরং নিরাপত্তিতে বাহবা পাইবার সুযোগ প্রচুর। কিন্তু কোন মেয়ে যদি এরূপ 'খিরিষ্টানী' কথা জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ মাত্র করেন তবেই বিপদ! অমনি তাঁহার গোষ্ঠীবর্গকে নাকানি-চোবানি খাইতে হইবে। এই হইল 'কায়দা' নম্বর দোসরা।

বর মহাশয় যদি আবার অনুগ্রহ করিয়া বিবাহের রাত্রে চুক্তির অতিরিক্ত আরও হাজার খানেক টাকা আদায় করিতে না পারিয়া বিবাহ না করিয়া চলিয়া যান, তবে ত সোনায় সোহাগা। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই কন্যাকে 'পাত্রস্থ' করিতে না পারিলে জাতি যাইবে। মাতাল কুষ্ঠরোগী যেই হউক না কেন, একটাকে ধরিয়া আনিয়া—না হয় তো নিমতলার ঘাটে গিয়া পাত্রস্থ করা চাই। কিন্তু বর মহাশয় বহাল তবিয়তে যত ইচ্ছা 'দায় উদ্ধার' করিতে পারেন। এটা হইল 'কায়দা' তেসরা।

অর্থনীতির দোহাই দিয়া যাহারা বহুবিবাহের পক্ষপাতী, তাঁহারা কি বলেন? বিক্রেতা যদি জানে যে তাহার মাল চিরদিন অবিক্রীত থাকিলেও কোন আপত্তি নাই, পরন্তু ক্রেতাকে তাহার নিকট হইতে লইতেই হইবে—আর লইতে হইবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, তাহা হইলে বিক্রেতা কি যথেচ্ছ দাম আদায় করিবে না? এখানে law of demand and supply খাটে কি?

প্রেম ও পরিণয়

তারপর গোড়াতেই গলদ। পরিণয় প্রেমের পূর্ণ পরিণতি। প্রেম জিনিসটা না কি বেচা-কেনার জিনিষ নয়, এবং ধরে-বেঁধেও নাকি প্রণয় হয় না। কিন্তু আমাদের সব ব্যবস্থাই সনাতন হিন্দু ব্যবস্থা কি না, সুতরাং বিজ্ঞাপনের জোরে দালালীর প্রভাবে বাজারে প্রেম বিক্রয় হইতেছে। বর এম, এ, পাশ, সুতরাং তাহার প্রেমও এম-এ না হউক বি-এ পাশের যোগ্য ত বটেই সুতরাং দাম হইল দশ হাজার। যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ, সেখানে দর কসাকসি, প্যাঁচ-খেলা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কেহ কেহ ছেলেদিগকে দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে গালি দেন। আমরা বলি, যুবকেরা টাকা লইবে না কেন? বিবাহ ত আজ ব্যবসায় মাত্র। সেই 'ব্যবসায়' করিতে বসিয়া সে টাকা ছাড়িবে কেন? তোমার মেয়েকে যে তাহার হাতে দিতেই হইবে, তুমি অষ্টবন্ধনে বদ্ধ যুবক মুক্ত। আরও, তুমি কাপুরুষ—সমাজের মৃত প্রেতাত্মার দৃষ্টি পাছে তোমার উপর পতিত হয়, সে জন্য তুমি জীয়ন্তে মৃত। যুবক জানে, টাকা চাহিলেই পাইবে—তুমি না দিয়া পারিবে না—কারণ তোমার ঐ ভূতের ভয় আছে। সুতরাং সে টাকা ছাড়িবে কেন? ডাক্তার উকীল, কুসীদজীবি—কেহ কি মক্কেলের দুর্দ্দশা দেখিয়া এক পয়সা ছাড়ে?—তবে বরই বা ছাড়িবে কেন?—যুবক এ কথা বলিতে পারেন। কিন্তু যুবকেরা ছাড়িতে পারেন, যদি বিবাহ একটা ব্যবসায় না হয়—বিবাহ যদি প্রণয়ের পরিণাম হয়। কারণ প্রণয়াস্পদের পিতাকে অর্থাৎ প্রণয়াস্পদকে কষ্ট দিলে তাহা যে নিজের বুকে শতগুণ অধিক হইয়া বাজিবে! কিন্তু বর্ত্তমান বিবাহ পদ্ধতিতে তাহা হইবার উপায় নাই। বিবাহে কনের-তো দূরের কথা, বরেরই কোন হাত থাকে না—মিছামিছি বরদিগকে গালি দেওয়ায় কোন ফল নাই যদি না তাহাদিগকে বিবাহে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আমাদের ধারণা বিবাহে স্বাধীনতার ফলে পণ-প্রথার হ্রাস হইবে। কিন্তু মেয়েদের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে বিশেষ কিছু হইবে না।

পণ প্রথা দূর করিতে হইলে উহার মূল জড় নষ্ট করিতে হইবে। াজ-শরীরকে এই ব্যাধি হইতে মুক্ত করিতে হইলে হোমিওপ্যাথি-ত "সম সমং শময়তি" নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। একটা একটা রিয়া আলোচনা করা যাক।

বিবাহের বয়স—চিরকৌমার্য্য

প্রথমতঃ মেয়েদের বয়স। পুরুষের যদি বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট না কে তবে মেয়েদেরই বা থাকিবে কেন? আর পুরুষ যদি স্বচ্ছন্দ ত্ত বহাল তবিয়তে আজীবন বিবাহ না করিতে পারে, তাহাতে াজ কোনও আপত্তি করে না; কিন্তু মেয়েদের গলা টিপিয়া য়া কোন পুরুষের গলায় ঝুলাইয়া দিয়া তাহার বাপের ভিটায় চরাইতে সমাজের এত আগ্রহ কেন? যদি পুরুষের মত মেয়েদেরও াহের বয়স বৃদ্ধি করা হয়, অথবা প্রয়োজন হইলে আজীবন কুমারী া যায়, তাহা হইলে কনের পিতাকে এই অসম-প্রতিযোগিতার হাত তে রক্ষা করা যাইতে পারে। বর বা বরের পিতা "দাঁও" মারিবার যোগ পাইবেন না। কিন্তু এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার যে মেয়েদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিলেই হইবে না—চির-কৌমার্য্য-ও বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কারণ এ কথা জানা থাকে যে একদিন মেয়ের বিবাহ দিতে হইবেই—তাহা লে বয়স-বৃদ্ধি শুধু দুঃখ-বৃদ্ধির অর্থাৎ পণের মাত্রা-বৃদ্ধির হেতু বে মাত্র।

একটা আপত্তি বালিকাদের চির-কৌমার্য্যের বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়। উহার আলোচনা করিতে ঘৃণা হয় কিন্তু আমাদের এই াগা সমাজের মধ্যে উহা প্রচার করিবার মত মহাপুরুষের অভাব নাই। য়রা যদি চিরকুমারী থাকেন তবে তাঁহাদেয় ভ্রষ্টা হইবার সম্ভাবনা ছে। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে এই ঘৃণিত আলোচনা শেষ করিব। মতঃ কুমারী কুলীন-কন্যাদের কথা বলিয়াছি—। তাহাতে দোষ নাই। কারণ উহা সমাজের প্রবর্ত্তিত বিকৃত কৌলীন্য পাপের ফল। জ তার সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু স্বেচ্ছায় কুমারী থাকিলেই র্নাশ! তারপর দ্বিতীয়তঃ বালবিধবাদের উদাহরণ—বিধবাদের ত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে সমাজ সন্দেহ করেন না। আমাদের বাদের চরিত্র যে পবিত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।—কিন্তু সেই য়েই কুমারী থাকিতে চাহিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে? আট বৎসর ষোলবৎসর বয়সে বিবাহ হইল,—দুইমাস পরে কন্যা বিধবা হইয়া জীবন পবিত্র থাকিবেন—সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন না—কিন্তু মেয়েই এই দুই মাস পূর্ব্বেই যদি কুমারী থাকিতে চাহেন অর্থাৎ খানে দুইমাস বিবাহ-খেলা না খেলেন, তবেই সর্ব্বনাশ হইবে! নি ভ্রষ্টা হইবেন নিশ্চয়? যুক্তি অতি চমৎকার।

তারপর একটী যুক্তি দেখানো হয় যে কুমারী ও বিধবাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতা তাহাদের মনোভাব-গঠনের সহায়তা করে। শিক্ষা, বিশিষ্ট ধরণের জীবন-যাত্রা-প্রণালী যে বিশেষ মনোভাব-গঠনের সহায়তা করে এ বিষয়ে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কুমারী ও বিধবাদের বে য় এ কথা কতদূর প্রযোজ্য, তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। শুধু abstract principle লইয়া কাজ চলে না, বাস্তব জগতের সঙ্গে তাহার মিল থাকা চাই।

প্রথমেই বিধবাদের শিক্ষা। বিধবাদের সম্বন্ধে সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা ত্যাগ করিতে বাধ্য করা ছাড়া অন্য কিছুই করা হয় না। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে বিধবাদের জন্য বিশেষভাবে সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে কুমারীদের জন্যও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইবে না কেন?

তারপর মনোবৃত্তি-গঠনের কথা। যিনি বিলাস-ভোগে জীবন কাটাইয়া বিধবা হওয়ার পর-মুহূর্ত্তেই সংযমী হইতে চেষ্টা করিবেন এবং প্রথম হইতে কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প করিবেন—এই দুই জনের মধ্যে কে বেশী সফল-কাম হইবেন? কেহ কেহ বলেন যে উপবাসের দিনে খাদ্য-দ্রব্যের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে—আমরা এই অদ্ভুত মনোবৈজ্ঞানিক তর্কের উপরে শুধু ইহাই বলিতে চাই যে কুমারী ও বিধবা উভয়েই ত একাদশীর উপবাসী। অন্য আলোচনা থাক্। তবে আসঙ্গ-লিপ্সা ও খাদ্যে-ক্ষণিক-বিতৃষ্ণাকে যাঁহারা এক শ্রেণীতে ফেলিতে চান, তাঁহাদের বুদ্ধির তারিফ না করিয়া পারা যায় না।

এই সঙ্গে শিক্ষার কথা আসে। পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে এই শিক্ষা-দীক্ষায় আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকে। এই ব্যবধান পণ-প্রথার মূল কারণ না হইলেও উহার পরিমাণ-নির্দ্দেশক বটে। যাহাতে মেয়েরা কর্ম্মঠ ও আত্ম-নির্ভরশীল হইতে পারেন, সেরূপ শিক্ষার দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-লাভের কথা বলা হইতেছে না। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী যে পুরুষের পক্ষেই সন্তোষজনক নয়, মেয়েদের কথা ত দূরে। নিজের পায়ে দাঁড়াইবার, নিজের পবিত্রতা রক্ষা করিবার শক্তি যাহাতে জন্মে সেই শিক্ষা চাই, তাহা ডিগ্রীলাভ করিয়াই হউক বা না করিয়াই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কুমারী থাকিতে হইলে ভবিষ্যৎ সংস্থানের দরকার। বিবাহিত বা অবিবাহিত অবস্থায় মেয়েরা যাহাতে স্বামী বা পিতার সম্পত্তির অংশ লাভ করেন, সে বিষয়ে সমাজ তথা গবর্ণমেন্টের চেষ্টা করা প্রয়োজন। হিন্দু মহিলাদের মত এমন নিরাশ্রয়া প্রাণী জগতে আর নাই। আমরা পরের নিকট শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত ব্যাধি গোপন করিতে চাহিলে ফল হইবে অকাল-মৃত্যু।

বর্ত্তমান পণ প্রথার আর একটী কারণ এই যে সকলেই ধনী, বিদ্বান

ও সুন্দর পাত্র সংগ্রহ করিতে চান্। এরূপ বরের সংখ্যা খুব বেশী নয়। সুতরাং তাহাদের দর বাড়িয়াই চলে। আমাদের বর্ত্তমান পণ-প্রথার মূলে ছিল এই প্রতিযোগিতা সমাজ বিভিন্ন ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় প্রত্যেক ভাগের পরিসর অত্যন্ত ছোট হইয়া পড়িয়াছে। এক জাতির বা শ্রেণীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইলে সুফলের বিশেষ সম্ভাবনা। এক ব্রাহ্মণ সমাজ রাঢ়ীয় বারেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতি নানা উপবিভাগে বিভক্ত এবং তাহার উপর উত্তর-বঙ্গ পূর্ব্ব-বঙ্গ ইত্যাদি ভৌগোলিক বিভাগও আছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হয় না। অনেকগুলি যুক্তিও অতি চমৎকার। একজন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার-শ্রেণীর আর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ চাকুরীজীবি সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি বিভিন্ন, কাজেই বিবাহ হইতে পারে না। এমন বালকোচিত যুক্তির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন! একজন ব্রাহ্মণ—তাঁহার নিবাস চব্বিশ পরগণা জিলা—তিনি এই জিলার পূর্ব্বসীমা—(অবশ্য গবর্ণমেন্ট-নির্দ্দিষ্ট সীমা—) অতিক্রম করিবেন না : কারণ, এই বৃটিশ রাজ-অঙ্কিত সীমার পূর্ব্বে যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই 'বাঙ্গাল'। যাহা হউক সেদিন পত্রিকায় দেখিলাম যে কয়েকজন পণ্ডিত একটা সভা ডাকিয়া স্থির করিয়াছেন যে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে। শুভস্য শীঘ্রম্। কিন্তু আমাদের মতে আর কাজে আশমান-জমিন তফাৎ—এই যা দুঃখ।

বৈদ্য ও কায়স্থের বৈবাহিক মিলন

তারপর বৈদ্য ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের কথা। ব্রাহ্মণ সমাজের উপরিভাগের চেয়ে এখানের বিভাগ একটু শক্ত আর গোঁড়ামীর জন্য এই দুই সম্প্রদায় একেবারে পৃথক হইয়া পড়িতেছেন। বৈদ্য নিজের শেষে 'শর্ম্মা,' এবং কায়স্থ 'বর্ম্মণ' যোজনা করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতেছেন। অর্থাৎ কলম ও মুখের জোরে 'শর্ম্মা' ও 'বর্ম্মণ' লিখিয়া ও বলিয়া—বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ ও ভীষ্ম অর্জ্জুন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিবেন। তা করুন, আমাদের তাতে কোন আপত্তি ত নাইই, বরং আনন্দ আছে। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রাপ্তির ভিতরে যে একটা রেষারেষি আছে, তাহাই অনিষ্টজনক। কোন বৈদ্য-প্রবর আদেশ দিতেছেন যে বৈদ্যরা ব্রাহ্মণ সুতরাং ব্রাহ্মণেরা যেন তাঁহাদের সহিত বিবাহাদি আদান-প্রদান করেন—তিনি অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের নজিরও শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিতে ছাড়েন নাই অথচ তিনিই কায়স্থের সঙ্গে মিলনের বিরোধী—অন্ততঃ এ বিষয়ে নির্ব্বাক্। উঁহাদের মনোবৃত্তি বোঝা আমাদের সাধ্যের বাহিরে। বৈদ্য ও কায়স্থ প্রত্যেকেই নিজকে বড় বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি—এক গালাগালির বহর ছাড়া এই 'বড়ত্বের' প্রমাণ আর কিছু পাওয়া যায় না।

এই বৈদ্য ও কায়স্থের বিবাহ-মিলনের কথায় কেহ কেহ হয়ত আঁৎকাইয়া উঠিবেন এবং হিন্দু সমাজটা যে অচিরেই রসাতলে যাইবে তদ্বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে ভুলিবেন না। কিন্তু তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকুন—। বৈদ্য ও কায়স্থের বৈবাহিক মিলন নূতন নয়। শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ ত্রিপুরা জিলার সর্ব্বত্র, ঢাকার মহেশ্বরদি পরগণায় (এবং বিক্রমপুরেও আজকাল দুই-এক জায়গায়) নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের কোন কোন স্থানে উহা প্রচলিত আছে এবং সে জন্য সমাজের রসাতলে যাইবার আশঙ্কাও মোটেই নাই। উপযুক্ত স্থান-সমূহে পণের ঝাঁকতিও কম। অন্য কারণও থাকিতে পারে। সমাজের পরিধির বিস্তৃতি ঘটিলে পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনেরও সুবিধা হইবে। এই শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, ভৌগোলিক বিভাগ সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে।

রক্তের মিশ্রণে যে কুফল হইবে এরূপ আশঙ্কা নাই। কাহারও রক্ত অন্যের রক্ত অপেক্ষা হীন নহে। তারপর এই উভয় সম্প্রদায় মিলিত হইলে পরস্পরের প্রতি রেষারেষি প্রভৃতি দূর হইয়া সমাজের অন্তর্বিধ প্রভূত মঙ্গলও সাধিত হইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত।

নারীর স্বাধীনতা

নারীর স্বাধীনতা আজকাল নানা কাগজে আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। নারীকে স্বাধীনতা দান করিবার জন্য আমাদের সাহিত্যিক-গণের অনেকেই উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। কাগজে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে-সকল আলোচনা চলিতেছে, তাহার কোন-কিছুর সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এ বিষয়ে যে-সব কথা-কাটা-কাটি হইয়াছে বা হইতেছে, সে-বিষয়ে আমি কোন কথাই বলিব না।

স্বাধীনতা কথাটার মানে কি? উদ্দাম স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা বলা ঠিক নয়। সেটা উচ্ছৃঙ্খলতা। তাহাতে স্বাধীনতা উপভোগ্য হয় না, তাহার মাধুর্য্য থাকে না। কাহাকেও গাছে উঠাইয়া দিয়া মই কাড়িয়া লইলে তাহার যে অবস্থা হয়, আত্মরক্ষার জন্য পুরুষের সহায়তা না পাইলে নারীর অবস্থা তাহাই হইবে। সে যাহা হউক, একটু বুঝিয়া দেখিলেই স্বীকার করিতে হইবে যে মানুষের প্রকৃত বল অর্থ-বল। অর্থ-বল যাহার আছে,—নারীই হউক, আর পুরুষই হউক,—সেই আত্মরক্ষায় সমর্থ। যাহার সে বল নাই, সে শারীরিক শক্তিতে ভীমতুল্য হইলেও তাহার অবস্থা শোচনীয়। রাজনৈতিক নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার পাইলে নারীর অর্থকষ্ট নিবারণ হইবে না। সুতরাং নারীর স্বাধীনতা দান করিতে হইলে একটু স্বার্থ-বলিদান করিতে হইবে। দায়ভাগের ব্যবস্থার একটু সংস্কার করিতে হইবে। সম্পত্তির অধিকারে নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। নতুবা সব আন্দোলন, সব কথা-কাটাকাটি বৃথা হইবে।

নারী আমাদের দেশে কোন সম্পত্তির মালিক হইতে পারেন না। বিধবা রমণী যতই বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা হউন না কেন, তিনি স্বামী-পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইবেন না। তাঁহার যদি না-বালক পুত্র থাকে, তবে সম্পত্তি পুত্রেরই হইবে, মাতার হইবে না। সম্পত্তি দেখা-শুনা করিবেন মাতা, লাভ-লোকসান বুঝিয়া বন্দোবস্ত করিবেন মাতা, পুত্রের অভিভাবক-স্থানীয়া হইবেন তিনিই, কিন্তু নিজে তিনি সে সম্পত্তির কোন অংশ পাইবেন না। পুত্র সা-বালক হইলে মাতার পরামর্শ ও অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করিয়াই সম্পত্তি দান-বিক্রয় করিবার অধিকারী হইবে। বুদ্ধি-দোষে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া দিলেও কাহারও নিকট সে কৈফিয়ং দিবে না। আর তাঁহার মাতা নিজের স্বামীর সম্পত্তি থাকিতেও বিরলে অশ্রুবিসর্জ্জন ভিন্ন পুত্রের অত্যাচারের কোন প্রতিকার পাইবে না।* ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়, এবং নারীকে স্বাধীনতা দিবার ইচ্ছা থাকিলে সর্ব্ব-প্রথমে ভাবিবার বিষয় ইহাই।

কালের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। আবার সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধানের পরিবর্ত্তন না করিলে সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। ইতিহাস এ বিষয়ে অবিসংবাদী প্রমাণ দেয়। যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতীয় ও ইরাণীয় আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষেরা একসঙ্গে বাস করিতেন, সে যুগে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও চিন্তা ছিল না বলিয়াই মনে হয়। তাই তাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ক চিন্তায় সারাজীবন যাপন করিয়া আনন্দ পাইতেন। ধর্ম্ম-বিষয়ে মতভেদ হইলেই তখন সমাজ ও জাতির মধ্যে ভয়ঙ্কর বিবাদ উপস্থিত হইত। ভারতীয় ও ইরাণীয়-গণের মধ্যে এই প্রকার বিবাদই সংঘটিত হইয়াছিল। ভারতীয়গণ এ সংসারের সুখ-দুঃখকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিতে চাহিলেন না। তাঁহাদের মতে হইল এ সংসারটা "মায়া" অর্থাৎ 'কিছু না'। এই সংসার ত্যাগ করিয়া বাসনার নিবৃত্তি করিতে পারিলেই মানুষের মুক্তি বা নির্ব্বাণ হয়। আধিভৌতিককে ত্যাগ ও আধ্যাত্মিকের আলোচনাই ছিল তাঁহাদের ধর্ম্ম। ইরাণীয়গণ কিন্তু এ মতে মত দিলেন না। তাঁহাদের মতে আধিভৌতিক জগৎ উপভোগ্য ; এ সংসার একটা 'কিছু—না' নহে। তাই তাঁহারা আধিভৌতিক বিধানে যত্নবান্ হইলেন ; রমণীর গৌরব রক্ষা সেইজন্য তাঁহাদের ধর্ম্মচিন্তায় বিষয়ীভূত হইল। তাই সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও অন্যান্য সর্ব্ববিষয়ে রমণী পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিলেন। আর আমাদের দেশে বেদের যুগ পর্য্যন্ত রমণী পুরুষের সমকক্ষ থাকিলেও তাহার পরের যুগেই রমণীর অনাদর হইতে লাগিল।

বেদের যুগে মন্ত্ররচনা করিয়াও রমণী মনু-শাস্ত্রের যুগে নিতান্ত অনাদৃত ও অপদার্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আমরা মনুর সিদ্ধান্ত বা তাঁহার যুক্তির কিছুই বুঝিতে পারি না। তিনি রমণীর হীনতা প্রতি-পাদনের জন্য তাঁহাকে স্নেহ-শূন্যা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই! তাঁহার মতে নারীর স্নেহ নাই, পতি-ভক্তি নাই, সুরূপ ও কুরূপের ভেদ-জ্ঞানও নাই, আছে কেবল ন্যায়বিরুদ্ধ ভোগাসক্তি ও স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার-প্রবৃত্তি। মনুর নবম অধ্যায় পাঠ করিবার সময় তাঁহার প্রতি ভক্তি উড়িয়া যায়, হৃদয় উত্তেজিত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠে।† সুতরাং সে বিষয়েও বেশী আলোচনা না করাই শ্রেয়ঃ।

ইতিহাসের দিক দিয়া দেখা যায়, মনু বেদ হইতে ভ্রষ্ট-চরিত্রা রমণীর উদাহরণ বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া নিজের মতের পোষণ করিয়াছেন।‡

---

* সে সম্পত্তিতে মাতার জীবন-স্বত্ব থাকিবে। এবং একাধিক পুত্র থাকিলে পুত্রেরা যদি সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে, তবে মাও পুত্রদের সঙ্গে সমান একটি অংশ পাইবেন। একটিমাত্র পুত্র থাকিলে মা সম্পত্তি পার্টিশন করাইতে পারিবেন না—তবে তাঁর জীবন-ভর maintenance পুত্র উড়াইয়া দিতে পারিবে না—সম্পত্তির উপর মার খোর-পোষ বাবদ একটা দাবী চিরদিন, তাঁর জীবিতকাল পর্য্যন্ত থাকিবে,—ইহাই দায়ভাগের ব্যবস্থা। ভাঃ সঃ

† অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে ॥২॥
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥৩॥
* * *
সূক্ষ্মেভ্যোপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুর রক্ষিতাঃ ॥৫॥
* * *
পানংদুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহ-বাসশ্চ নারী সংদূষণানি ষট্ ॥১৩॥
নৈতারূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ॥১৪॥
পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোঽপীহ ভর্ত্তৃষ্বেতা বিকুর্ব্বতে ॥১৫॥
* * *
নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়ো নৃতমিতি স্থিতিঃ।

‡ তথা চ শ্রুতয়ো বহ্ব্যো নিগীতা নিগমেষ্বপি।
স্বালক্ষণ্য পরীক্ষার্থং তাসাং শৃণুত নিস্কৃতিম্ ॥১৯॥
যন্মে মাতা প্রলুলুভে বিচরন্ত্যা পতিব্রতা।
তন্মে রেতঃ পিতা বৃঙক্তামিত্যস্যৈ তন্নিদর্শনম্ ॥২০॥
ধ্যায়ত্যনিষ্টং যৎকিঞ্চিৎ পাণিগ্রাহস্য চেতসা।
তস্যৈষ ব্যভিচারস্য চিহ্নবঃ সম্যগুচ্যতে ॥২১॥

তিনি বলেন, বেদে ভ্রষ্টা রমণীর উল্লেখ আছে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্রও আছে। যাহাই হউক মনুর যুগে সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে যে সকল সামাজিক বিধি কার্য্যকর ছিল, এ যুগের সমাজে সে আইনে কাজ চলে না। সুতরাং সামাজিক বিধির কালানুযায়ী পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের যুগে আন্দোলন করিলে হয়ত ইহায় ফল পাওয়া যাইতে পারে।

সমাজে নারীর দুরবস্থায় যাঁহারা বাস্তবিক সহানুভূতি করেন, তাঁহারা আন্দোলন করিয়া আইনের সংস্কারের চেষ্টা করুন। রমণীর হাতে সম্পত্তি পড়িলে তাহা উড়িয়া যাইবার কোন হেতু দেখা যায় না। এলিজাবেথ বা ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাণী হইয়া রাজ্যের যেরূপ উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, সেরূপ উন্নতি আর কোন্ রাজার আমলে ঘটিয়াছে? রাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী ভবানী হাতে সম্পত্তি পাইয়া তাহার কোন অমর্য্যাদা করেন নাই। আবার অন্যপক্ষে ইহাও দেখা যায় যে অনেক পুরুষের হাতে সম্পত্তির অপব্যবহার হইয়া থাকে। সম্পত্তির অধিকার হইতে রমণীকে বঞ্চিত করিবার কোনও ন্যায়-সঙ্গত হেতু নাই। এ বিষয়ে আন্দোলন করিলে রমণী-কুলের খাঁটি উপকার করা হইবে বলিয়া মনে করি। ভোট দিবার অধিকারে বঙ্গমহিলার বড় বিশেষ লাভ হইবে না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বিরাগ

আলো আর লাগেনাক ভালো,
শ্রান্ত চোখ বুজে আসে, শীতল ছায়ার আশে,
চায় তার আশে-পাশে শান্ত নীল কালো!
কেবলি অধীর তেজে, বাঁচিনা নয়ন মেজে'
চাহনি যে, কাজলে জুড়ালো!
আলো বড় তড়ি-ঘড়ি, আসে সপ্ত অশ্বে চড়ি,
পলকে নিমেষগুলি স্ফুলিঙ্গ ছড়ালো!
প্রভাত না হতে এ কি, চকিতে চাহিয়া দেখি,
দীপ্ত ভানু, মাথায় দাঁড়ালো!
সাধের আবীর খেলা, ভোরের ফুলের মেলা
হাসির একটি বেলা, কখন্ ফুরালো!
গোধূলির গৈরিক উড়ালো॥

দিন-তরী হল খেয়া পার,
সন্ধ্যা আসে ধীরে ধীরে অস্ত-সাগরের তীরে,
মুদিত কমলফুল, মৃদু তনু ভার!
আতপ আবেগে ম্লান, শ্যামাঞ্চল-পুটে লীন,
চায় স্নিগ্ধ শিশির আসার,
নিশীথের নীলিমায়, আঁধারে মিলায়ে কায়,
যেথা ছায়, ছায়াপথ অসীম বিস্তার,
ধূলো পায়ে লগ্ন করে' তারার দেউটি করে,
সেই পথে, সন্ধ্যা আগুসার!
পথ যে কোথায় শেষ, সে বারতা সবিশেষ,
আজিও হ'লনা কারো সাধ্য জানিবার!
আলোকিত অথবা আঁধার!

চলেনাত; তবু না চলিলে!
সেই কোন ভোর হতে, এলো চলে এই পথে,
নির্ম্মালি করিয়া ফুল কত গলে দিলে,
ধূপ-শিখা সম তায়, জ্বালি দিল কতবার
নিবাইল নয়ন সলিলে!
দুটি করপুট পাতি, অমল কর্পূর ভাতি,
উজল বরণ-বাতি কত জেলে দিলে!
দিনের চেতন তারে, সে আরতি ডালি ধীরে
আনমনে আজি নামাইলে,
পূজা সমাপন আর, হলনাক এইবার,
কে জানে, আবার কবে, কোথা দিন মিলে,
কোথা উষা, সে নিশা নামিলে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

শিখিবার কলা-কৌশল

৫

একটা কথা খুবই লক্ষ্য করা যায়—বেশীর ভাগ লোকই সময়ের উপর অযথা দোষারোপ করে :—

শীতাতপঘটিত দিনের অবস্থা বা আকাশের অবস্থা—যাহাকে ফরাসীভাষায় "সময়" বলে—সেরূপ "সময়ের" কথা এখানে আমার বলিবার অভিপ্রায় নহে। ঘণ্টার গতি, ঘণ্টার স্থায়িত্বের দ্বারা যে-সময় সূচিত হয়, আমি সেই সময়ের কথা বলিতেছি। এই সময় যে ভাবে অতিবাহিত হয়, তাহাতে মানুষ কখনই সন্তুষ্ট হয় না। মানুষ সময়ের উপর ক্রমাগত গালি বর্ষণ করে। সময় বেচারী একই সঙ্গে রামের কাছেও গালি খায়, শ্যামের কাছেও গালি খায়। রাম বলে সময়টা বড় আস্তে আস্তে যাচ্চে, শ্যাম বলে সময়টা খুবই দ্রুত যাচ্চে। আবার হয়ত পরক্ষণেই ঠিক্ তাহার উল্টা কথাও শুনা যায়। কখনও বা ছুটিয়া চলিবার জন্য সময়কে তাগিদ করা হয়; আবার যখন সে দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন আবার তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, আদর কিংবা তিরস্কারের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া সময় সমান-পদক্ষেপেই চলিয়াছে...এবং সময়ের এই দিব্য সমদৃষ্টিরই কৃপায়, আমাদের মানব-নিয়তির যে উপাদানটি পরিবর্ত্তনশীল ও পারম্পর্য্য-বিশিষ্ট, বিজ্ঞজনের মতে তাহাই আমাদের জীবনের একটা চিরস্থির ধ্রুব জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা সময়কে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, তাহার সহিত মিত্রের মত, বন্ধুর মত ব্যবহার করেন। ইহা প্রকৃতিরই কার্য্য ;—সময়ের হাতে নির্ব্বিচারে আত্মসমর্পণ করিলে,—সময় অপরিবর্ত্তনীয়, ক্রমে এইরূপ একটা আমাদের অনুভূতি হয়। আমরা দেখিয়াছি, ইচ্ছাবৃত্তি ও শৃঙ্খলার অভ্যাস ও সাধনা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা হইতেই হইয়া থাকে। তাছাড়া, সময়ের সহিত যোগ নিয়মিত করিবার জন্যও শিক্ষা একটা প্রকৃষ্ট উপায়। অধিকাংশ লোক খুব দ্রুত শিখিতে চাহে, অথবা খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জিনিষ শিখিতে চাহে। তারপর যখন দেখে কোন ফল হইল না, হয় তাহারা তখন হতাশ হইয়া পড়ে, নয় উহারা বিশ্বাস করে, শিক্ষা জিনিষটা অস্পষ্ট ছায়াবাজির মত শুধু একটা আমোদের জিনিস।

এই শেষোক্ত অবস্থাটা অধিকাংশ শিক্ষার্থী—এমন কি শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের মধ্যেও দেখা যায়। কারণ, সবচেয়ে সময়ের অপব্যবহার হয় বিদ্যালয়ে; সময়ের সঙ্গে শিক্ষকদিগের যেন চির-বিবাদ; উহারা সময়কে ঘৃণাদৃষ্টিতে দেখে—সময়ের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিলেই যেন সুখী হয়। যে সময়ের মধ্যে যাহা কুলানো যায় না তাহারা উহা জেদ করিয়া তাহার ভিতরে পুরিয়া দিতে চাহে ;—বৎসরে কেবল দুই ঘণ্টা করিয়া, উচ্চশ্রেণীতে "কর্ণেই" Corneille পড়ান হইয়া থাকে, আবার বিদ্যালয়ে যেমন সময় নষ্ট করা হয় এমন আর কোথাও না ;—

একজন বি-এ, তাহার পরীক্ষার জন্য যে ল্যাটিন শিক্ষা করে তাহাতে বৎসরের মধ্যে বড় জোর ১০০ ঘণ্টা করিয়া খাটিলেই যথেষ্ট হয়, সেই জায়গায় ৮।১০ বৎসর অতিবাহিত হয়।

কোন প্রকার শিক্ষানবীশী করিবার পূর্ব্বে প্রিয় পাঠক—আমার কথা যদি বিশ্বাস কর—সময়ের সহিত বন্ধুভাবে একটা বুঝা পড়া করিয়া লইতে হইবে। সময়ের হাত খুবই দরাজ; যে যাহাই বলুক না কেন,—অধিকাংশ লোকের হাতেদিনের মধ্যে অনেকটা সময় থাকে। তিনবার এমন-কি দুইবার দিনের মধ্যে আধঘণ্টা করিয়া সময় দিলে ফলদায়ক অধ্যয়নের পক্ষে যথেষ্ট হয়। যদি তারও অধিক সময় তোমার হাতে থাকে সে ত আহ্লাদের বিষয়—সে সময়টার সদ্ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু গোড়ার সময়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা নিতান্তই দরকার। গোড়ার সময়ের পর্য্যায় ও বিভাগের হিসাবে একটা নিয়ম বাঁধিয়া লইতে হইবে। এ কথা বলিও না :—

—"যখনই আমি সময় পাইব তখনই এ কাজটা করিব।"

কাজের হিসাবে উহার কোন অর্থ নাই। এই কথা বলিবে :—

—"আমি এই কাজটা প্রতিদিন এই সময়ে করিব—কিংবা এত ঘণ্টা করিয়া করিব।"

এই কথাটা স্থির হইয়া গেলে,তখন তুমি অধ্যয়ন ও সময়—এই দুয়ের সাক্ষাৎ ভাবে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিবে। আমার বলিবার অভিপ্রায়:—তোমার হাতে যে সময়টা থাকিবে, সেই সময়ের মধ্যে তোমার সাধ্যমত অধ্যয়ন করিবে, তাহার পর যাচাই করিয়া দেখিবে, সেই সময়ের মধ্যে তুমি কতদূর অগ্রসর হইয়াছ। শীঘ্রই তুমি উপলব্ধি করিবে, ঐ সময়ের মধ্যে খুব সামান্যই অগ্রসর হইয়াছ।

কোনও ব্যক্তি প্রতিভাবান হইলেও, শিক্ষায় কলা-কৌশলে অভ্যস্ত হইলেও, একঘণ্টার মধ্যে খুব অল্প-পরিমাণ জ্ঞানই আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়। এই কথাটা পাঠক যেন সর্ব্বদা স্মরণে রাখেন। এই বিষয় সম্বন্ধে একটা ভুল বুঝিবার দরুণ অধ্যয়নে গোলযোগ বাধে, অধ্যয়নে নিরুৎসাহ উপস্থিত হয়, পরিশেষে অধ্যয়ন একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে কাজটা হয় তাহা স্বল্প। তেমনি আবার ইহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে:—"আমরা যতটা মনে করি তাহা অপেক্ষা বেশী সময় আমাদের হাতে থাকে।" আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন সুনিয়ন্ত্রিত জীবনের মধ্যে, অনেক বিষয় শিখিবার পক্ষে যথেষ্ট সময় থাকে—কেবল যদি সময় নষ্ট করা না হয়।

তা ছাড়া একটা সময়ের মধ্যে যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয় তাহা যতই অল্প হোক না কেন কোন অধ্যয়ন বিশেষের চাল-চলন একবার বুঝিয়া লইলে তারপর যখন যাচাই করিয়া দেখা যায়, ঐ অধ্যয়ন জীবনের কোন্ কোন স্থান অধিকার করিবে, তখন অনপেক্ষিত বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সকল বিষয় যাচাই করা অসম্ভব (অন্য বিষয়ের মধ্যে কলা-বিদ্যাসমূহ)—কিন্তু যেমন মনেকর, কোন কেতাবের বিষয় স্বায়ীকৃত হইয়াছে কি না, তাহা যাচাই করা সম্ভব। জীবনের কত অল্প সময় এই কাজের জন্য যথেষ্ট তাহা জানিলে আশ্চর্য্য হইবে—অবশ্য যদি প্রতিদিনের জন্য এই কাজটা নিয়মিতরূপে বাঁটিয়া দেওয়া যায়। সময়ের হিসাবে দৈহিক শক্তির বৃদ্ধি দেখিয়া যেরূপ আমরা হঠাৎ বিস্মিত হই, ইহাও কতকটা সেইরূপ। একজন মাঝামাঝি হাঁটিয়ে-লোক, যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে হাঁটা অভ্যাস করিয়াছে, সে এক রবিবারে "কং কর্ড" নগরাঙ্গন হইতে যাত্রা করিয়া তাহার পর দেখিল, পরবর্ত্তী রবিবারের মধ্যে সে বোর্দো নগরে আসিয়া পৌছিয়াছে।

এইরূপে আমাদের খাটুনির কাজটা বেশ আরামে, বেশ সহজভাবে সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং এইরূপে অধৈর্য্য হইতে,বিবিধ বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা পাইয়া আর একটা জিনিস আমাদের হস্তগত হইবে;-পারম্পর্য্যের নিয়ম, সাময়িকতার নিয়ম আমরা সময়ের কাছে শিখিতে পারিব। সমস্ত জড়-জগৎ কালের নিয়মাধীন; সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই পারম্পর্য্য-বিশিষ্ট ও সাময়িক। ঋতুরা যাত্রা আরম্ভ করে, থামিয়া যায়--আবার যাত্রা আরম্ভ করে। গাছে কুঁড়ি হয়, পাতা হয়, ফল হয়,—থামিয়া যায়, আবার আরম্ভ করে। ভূমি হইতে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া, মেঘাকারে সঞ্চিত হয়, বৃষ্টির আকারে আসিয়া পড়ে, জলস্রোতরূপে প্রবাহিত হয়, সমুদ্র রচনা করে, তারপর আবার মেঘের রূপ ধারণ করে,আবার নূতন করিয়া কাজ আরম্ভ করে। প্রকৃতির যে কোন কাজই হোক না,—সমস্তই কাল-চক্র নিয়মিত! কখন কখন মনে হয় যেন অ-সাময়িক; কারণ সেইসব স্থলে কালের স্থায়িত্বটা এত দীর্ঘকালব্যাপী যে উহা আমরা ধরিতে পারি না--উহা আমাদের পর্য্যবেক্ষণের অতীত।

এস আমরা এই সাময়িকতার দ্বারা আমাদের সমস্ত প্রযত্নকে নিয়মিত করি; এস আমরা জোর করিয়া চেষ্টা করি, বিশ্রাম করি, আবার আরম্ভ করি। ক্লান্ত না হইয়া যতক্ষণ অধ্যয়ন করা যায় তাহা সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

যে সকল শিক্ষানবীশ আশা-প্রবণ-প্রকৃতির লোক নহে, যাহারা অল্পতেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে এখনই বলিয়া রাখিতেছি যে এই সময়টা স্বল্পস্থায়ী। কোন অধ্যাপকের বক্তৃতা বরাবর একাগ্রচিত্তে শুনিতে হইলে, বড় জোর এক ঘণ্টা কাল শুনা যাইতে পারে। খুব একাগ্রচিত্ত হইয়া কোন পুস্তক আধ ঘণ্টা অধ্যয়ন করিলে, অধিকাংশ লোকের

শক্তিসামর্থ্য নিঃশেষিত হইয়া যায়; সিকি ঘণ্টা কালও যদি খুব মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করা যায়—তাহাও অবজ্ঞার বিষয় নহে। হাঁ! অধ্যয়নে যতই কেহ অভ্যস্ত হোক্ না, প্রত্যেক সিকি ঘণ্টায় মনকে একটু "হাওয়া-খাওয়ান" দরকার!—যেমন মনে কর—জান্‌লা দিয়া দেখা, কাম্‌রার মধ্যে একটু পায়চারি করা, ছন্দের তালে দুই তিনটা অঙ্গভঙ্গী করা, যেমন মনে কর,—গোলা লোফালুফি করা। তুমি হাসিতেছ? আ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রণালী স্কুলের ক্লাস হইতে,সরকারী অধ্যয়নপদ্ধতি হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ঐ সকল স্থানে দুই ঘণ্টা ধরিয়া, ডেকসো হইতে চোখ্ উঠাইবার জো নাই। কিন্তু তোমরা জান কি না বলিতে পারি না,—সাময়িক নিয়মানুসারে, ঘোড়াদের জন্য নিম্নলিখিত চলন-ভঙ্গী আদিষ্ট হইয়াছে:—দশমিনিট করিয়া কদম-চাল, তারপর পাঁচ মিনিট করিয়া সহজ চালে চলা। এইরকম করিলে সহজেই লম্বা পাড়ি জমানো যায়। এই প্রণালী অধ্যয়ন-কার্য্যে যদি প্রয়োগ কর তাহা হইলে মনযোগের শক্তিব্যয় কম হইবে।

—কিন্তু তুমি বলিতেছ, যখন গোলা লোফালুফি করি, কিংবা জান্‌লা দিয়া বহির্দেশ দেখি, তখন ত আমার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয় এবং প্রত্যেক বারে আমার নূতন করিয়া প্রয়াস করিতে হয়।

—ভুল। কোন উদ্ভাবনার কাজে, রচনায় কাজে, যে সব কাজ মনের দম্‌কা বেগে,—অনুপ্রাণনার ঝোঁকে সম্পন্ন হয় সেই সব কাজ সম্বন্ধেই এ কথা খাটে!

অনুপ্রাণনায় এক একবার ঝোঁক আসে—তারপরেই আবার অবসাদ উপস্থিত হয়। কাজেই এইরূপ স্থলে ঝোঁকের সময় থামিলে চলিবে না—ঝোঁকের সময়কে অতিক্রম করিলে চলিবে না। কিন্তু শেখা জিনিসটা ত অনুপ্রাণনার কাজ নহে। ইহা কেবল ধৈর্য্যের কাজ, মনযোগের কাজ। শিক্ষকের উপদেশ কথা শুনিতে শুনিতে, যখন আস্তে আস্তে কাণ অসাড় হইয়া পড়ে, কোন পুস্তক অধ্যয়ন করিতে করিতে যখন চোখ্ অসাড় হইয়া পড়ে, তখন যে একটা বিষাদময় অন্যমনস্কতা আসিয়া পড়ে—সেই অন্যমনস্কতা বা পথভ্রষ্টতা অধ্যয়নের পরম শত্রু। এই পথভ্রষ্টতা একবার আরম্ভ হইলে কিরূপে থামান যায়? এইরূপ অজ্ঞাতসারে পথভ্রষ্ট হওয়া অপেক্ষায়, বরং দৃঢ়তা সহকারে সজ্ঞানে থামিয়া যাওয়া ভাল।

তোমার শিখিবার প্রয়াস-প্রযত্নকে সময়ের দ্বারা যখন বেশ নিয়মিত করিতে পারিবে,—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—তখন এই নিয়মনিষ্ঠা তোমার সমস্ত জীবনের উপর প্রতিফলিত হইবে। সময়কে কাজে লাগাইলে সময়, কি ইচ্ছাশক্তি কি শৃঙ্খলা-প্রবৃত্তি, সম্ভবতঃ উভয়েরই প্রকৃষ্ট সাধনা-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

একবার সময়ের নিয়মশাসনে অভ্যস্ত হইলে, আমার বিশ্বাস, অধ্যয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, মিনিটের মূল্য তুমি কখনই ভুলিতে পারিবে না, মিনিট্‌গুলা বৃথা নষ্ট হইলে অনুতাপ না করিয়া থাকিতে পারিবে না! যদি কখন ঐ মিনিট্‌গুলা বিশ্রামে বা আত্মবিনোদনে ব্যয় করিতে ইচ্ছা হয়, অন্তত এইটুকু জানিতে পারিবে উহা ব্যয় করিতে কত মূল্য লাগিয়াছে; তাহা হইলে তুমি উহার অপব্যয় এড়াইতে চেষ্টা করিবে, এবং তোমার বিশ্রাম ও আমোদ আরও স্বাদু হইবে। এক-কথায়—নির্ব্বোধ ও অলস ব্যক্তিরা যে সকল মুহূর্ত্তকে খালী-খালী মনে করে, ক্লান্তিজনক মনে করে, যে সকল মুহূর্ত্তে উহারা হাঁইতোলে এবং অধীর-ভাবে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে—সেই সময় তোমার মনে হইবে, অবসাদ-ক্লান্তি হইতে রক্ষা পাইবার উহাই ত একটা উপায়,এই অবসাদ-সঙ্কটে অধ্যয়নের আসনই ত প্রকৃত আশ্রয়স্থান। পুস্তকপাঠে সবসময়েই যে অবসাদ দূর হয় তাহা নহে। আবেগ-উত্তেজনাপূর্ণ পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম; তা ছাড়া আমরা বিনা-আয়াসে গ্রন্থপাঠ করিয়া থাকি; কিন্তু আসলে জীবনের মুহূর্ত্ত-বিশেষে এই আয়াস বা প্রয়াসই আত্মবিনোদনের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই মুহূর্ত্তগুলার মধ্যে, আমাদের এলোমেলো ভাবকে গুছাইয়া আনিবার পক্ষে এই "সাধের অধ্যয়ন"ই পরম সাধন।

উহা অবসাদকে, চিত্তদৌর্ব্বল্যকে প্রথমে শান্তিতে, পরে সুখে পরিণত করে। প্রিয় পাঠক, আমি যে তোমাকে এই কথাগুলা বলিতেছি, ইহা ফাঁকা কথা নয়, ইহা

নীতি-গ্রন্থের কতকগুলা উপদেশবাক্য নয়! চিকিৎসক যখন জ্বর থামাইবার জন্য ৩০ কিংবা ৬০ গ্রেন কুইনিনের ব্যবস্থা করেন—ইহা যেরূপ ফলদায়ী ও প্রামাণিক, আমার কথাগুলাও সেইরূপ কেজো ও নিশ্চয়াত্মক বলিয়া জানিবে।

জ্বর প্রতিকারের পক্ষে কুইনিন যেরূপ অব্যর্থ ঔষধ,—বিষাদময় মৌনতা নিবারণের পক্ষে, অবসাদ নিবারণের পক্ষে, চিত্তদৌর্ব্বল্য নিবারণের পক্ষে, অধ্যয়নও সেইরূপ অব্যর্থ ঔষধ।

অপরিবর্ত্তনীয় কালের নিয়মে যদি তোমার অধ্যয়নকে নিয়মিত কর, তাহা হইলে পুরস্কারের জন্য তোমাকে আর অপেক্ষা করিতে হইবে না; চিরজীবন, শিক্ষার দ্বারা তোমার সমস্ত সময় বিভূষিত ও আনন্দময় হইয়া উঠিবে।

**

উপরে যে সব কথা বিবৃত হইয়াছে, একটা দৃষ্টান্ত দিলে উহা আরও বিশদ হইবে, উহার সারসংগ্রহ সহজে হইবে।

মাঝামাঝি দৈহিকশক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই দৌড়িতে পারে—ভাল করিয়া দৌড়িতে পারে—কেবল যদি সে সুপ্রণালীক্রমে তাহার পায়ের ব্যবহার করে, তাহার ফুস্‌ফুসের ব্যবহার করে। ঐরূপ একজন মাঝামাঝি ধীশক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিখিতে পারে, ভাল করিয়া লিখিতে পারে,—কেবল যদি সে সুপ্রণালীক্রমে তাহার মস্তিষ্ক চালনা করে, কাণের ব্যবহার করে, চোখের ব্যবহার করে।

শুধু তাহাই নহে। যাহার বেশী দৈহিক শক্তি অথচ যদি তাহার নিয়মিত অভ্যাস না হইয়া থাকে,—সে তেমন দৌড়িতে পারিবে না যেমন দৌড়তে পারিবে সে—যাহার দৈহিক-শক্তি অপেক্ষাকৃত কম হইলেও যে যথানিয়মে দৌড়িতে অভ্যাস করিয়াছে। শিখিবার পক্ষেও এই কথা খাটে।

এই তত্ত্বটি প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের উদ্দেশ্য। হাঁ, শিখিতে পারাযায়।

দ্বিতীয়ভাগে ব্যবহারিক নিয়ম-অনুশাসনের খুঁটিনাটিগুলা প্রদর্শিত হইবে:—কেমন করিয়া শেখা যায়?

(প্রথম ভাগ সমাপ্ত)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নির্ব্বাসনে

(আন্তন্ শেকভ হইতে)

বুড়া সিমিয়ন,—লোকে তার নাম দিয়াছিল খলিফা, আর একজন তাতার-যুবক তার নাম কেহ জানিত না, নদীর ধারে জঙ্গলী কাঠ জ্বালিয়া বসিয়া আগুন পোহাইতেছিল; আর তিনজন মাঝি কুঁড়ের ভিতর শুইয়া ছিল। সিমিয়ন ষাট বছরের বুড়া, দাঁত নাই, কৃশকায়, কিন্তু খুব কাঁধ-চেটালো, আর দেখিতেও বেশ সুস্থ ও সবল, মদে চুরচুরে হইয়া ছিল। সে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িত, যদি না তার জেবের মধ্যে মদের শিশিটা মজুদ থাকিত। তার ভয়, পাছে সঙ্গীরা তার নিকট হইতে মদ চায়! তাতার-যুবা অসুস্থ ও বড় ক্লান্ত—ছেঁড়া কাঁথা জড়াইয়া সেখানে বসিয়াছিল। সিমবিরস্কে যখন সে বাস করিত,—তখনকার কালের সেই গৌরবের জীবনের স্মৃতিটাকে জড়াইয়া অভিমান করিত, আর অহঙ্কার করিত, কি অপূর্ব্ব সুন্দরী ও চতুর, স্ত্রীই তারা যাকে সে দেশে ফেলিয়া আসিয়াছে! তাতারের বয়স বছর পঁচিশ হইবে, কিন্তু সেই আগুনের আভায় তার সেই পাণ্ডুর মুখ রোগে ও বিষাদের ছায়ায় নিতান্ত বালকের মুখের মতই দেখাইতেছিল।

"হ্যাঁ, একে তুমি ঠিক স্বর্গ বলতে পার না—তা ঠিক—" খলিফা বলিল, "একবার চোখ মেলে তাকালেই সব বুঝতে পারবে এখন—জল, রুক্ষ নদীর পাড়, চারিধারেই কাদা,

আর কিছু না! পবিত্র সপ্তাহ কেটে গেল, তবু এখনও নদীতে বরফ ভাসছে! আজ সকালেও বরফ—বরফ।"

"কষ্ট! মহাকষ্ট!—" তাতার ভয়ে একবার চারিদিকে চাহিয়া গুমরাইয়া উঠিল।

দশ পা তফাতে নদী বহিয়া চলিয়াছে—অন্ধকার, তুষার-শীতল নদী যখন দ্রুতগতি সমুদ্রের দিকে চলিবার পথে খাড়া উঁচু তটভূমিকে জড়াইয়া-জড়াইয়া বহিতেছিল, তখন মনে হইতেছিল, সেও যেন গুমরাইয়া গর্জ্জাইয়া উঠিতেছে! তটের কাছে একখান বড় নৌকা—খেয়া-পারের মাঝিরা তাহাকে 'কারা-বাস' বলে। নদীর অপর পারে, দূরে দূরে, ছোট ছোট সাপের মত পরস্পর গায়ে-গায়ে জড়াইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া জ্বলন্ত অগ্নিশিখা উঠিতেছে, নামিতেছে। গত বৎসরের জঙ্গলের ঘাস জ্বলিতেছিল; আর সেই সর্পের মত লেলিহান অগ্নিশিখার পিছনে আবার সেই ঘনীভূত তিমিররাশি—নদীতে ভাসমান ছোট-ছোট বরফগুলা নৌকার গায়ে ধাকা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, ও নদী-বক্ষে তাহার শব্দ উঠিতেছে। চারিদিকে শুধু গভীর অন্ধকার আর জমাট হিম।

তাতার একবার আকাশের পানে মুখ তুলিয়া দেখিল। তার দেশের আকাশেও যত তারা, এখানেও ঠিক তত তারাই ফুটিয়াছে, এখানেও তেমনি মাথার উপরে অন্ধকার। কিন্তু একটা জিনিষের অভাব। দেশে সিমবিরস্ক শাসন-তন্ত্রে অমন খোলা আকাশও নাই, অমন তারার বাহারও নাই!

তাতার আবার বলিল,—"কষ্ট! মহাকষ্ট!"

"অভ্যাস হয়ে যাবে হে, এ তোমার অভ্যাস হয়ে যাবে" খলিফা দাঁতে চিবাইয়া বলিল, "তুমি এখন ছেলেমানুষ, বুদ্ধি হয়নি—এখনও তোমার ঠোঁট মায়ের দুধে ভিজে রয়েছে। কেবল তোমার মত বোকা ছোকরারাই মনে ভাবে যে, তোমাদের মত দুঃখী লোক আর কেউ নেই। কিন্তু দিন আসবে একদিন, যখন তুমিই বলবে—ভগবান সকলকেই এমনি জীবন যেন দেন! এই যেমন আমার, দেখ না। সপ্তাহের মধ্যেই জল নেমে যাবে, ছোট নৌকাখানা জলে ভাসিয়ে দেব। তুমি ত সাইবিরিয়ায় আনন্দ করতে যাবে, আর আমি এইখানে পার-ঘাটায় লোক পার করবার জন্যে থাকব। বিশ বছর ধরে আমি এই পারা-পার করছি, দিন-রাত্তির। রুই মিরগেল জলের তলে, আর আমি উপরে। ভগবানকে ধন্যবাদ! আমি আর কিছু চাইনে। ভগবান সকলকে এমনি জীবন দান করুন!"

তাতার খানকয়েক বুনো কাঠ আগুনের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া, কাছ ঘেঁসিয়া বসিল; বলিল—"আমার বাবার অসুখ। যখন তিনি মারা যাবেন, তখন আমার মা আর আমার স্ত্রী এখানে আসবে! তারা আমার কাছে শপথ করেছে!"

"মা আর বউয়ে তোমার দরকার?" খলিফা বলিল, "ও-সব মাথা থেকে তাড়াও, ও-সব যত বাজে ভাবনা ভায়া! ও সব শয়তানের কারসাজি! সে-ই ওই সব খেয়াল আর ভাবনা মানুষের মাথায় চাপিয়েছে। ও সব পাপ কথা কখনো শুনোনা। যদি সে মেয়ে-মানুষের কথা পাড়ে, তাকে পাল্টা জবাব দিয়ো, বলো,—"সে সব দরকার নেই! যদি সে স্বাধীনতার কথা বলে, অমনি জবাব দেবে তাকে, তোমার কিছুর দরকার নেই। না বাপ, না মা, না স্ত্রী, না স্বাধীনতা, না ঘর, না বাড়ী,—তোমার কিছুর দরকার নেই, সে সব পাট চুকে গেছে।"

খলিফা বোতল হইতে এক পাত্র পান করিয়া আবার বলিল, "আমি ভায়া, সাদাসিদে চাষার ছেলে নই, আমি পুরুতের ছেলে। যখন কুরস্কে বাস করতাম, তখন কাটা-পোষাক পরতাম, এখন আমি নিজেকে এমন অবস্থায় নিয়ে এসেছি যে উলঙ্গ হয়ে মাটীতে শুয়ে ঘুমুতে পারি, আর —ভগবান যেন সকলকে এমনি জীবন দান করেন! আমি কিছু চাইনে। কাকেও ভয় করিনে। আমি জানি, আমার চেয়ে পয়সাওয়ালা আর স্বাধীন লোক এ পৃথিবীতে আর একটীও নেই। রুশিয়া থেকে প্রথম যেদিন আমি এখানে আসি, আমি জোর করে বলেছি,—আমি কিছু চাইনে। শয়তান আমাকেও বউ, বাড়ী-ঘর, স্বাধীনতার কথা বলেছিল। আমি পাল্টা জবাব দিয়েছিলাম,—আমার কিছু চাইনে। আমি তাকে বেশ কাবু করে তুলেছিলাম—আর এখন, এই তুমি যেমন দেখছ, আমি বেশ সুখে আছি, আর কোন অভাব-অভিযোগ নেই। যদি কেউ শয়তানের সঙ্গে বাজী ধরে এক চুল শয়তানের দিকে টলে, কিম্বা একবার তার কথা শোনে, সে অমনি মরেছে!

তার আর কোন উপায় নেই উদ্ধারের,—তার তখন পাঁকের মধ্যে মাথা অবধি ডুবে যায়, তা থেকে বেরুতে সে কখনো পারে না।

"ভেবো না ভায়া যে শুধু কেবল আমাদের বোকা চাষারাই এমনি করে মারা যায়। বড় ঘরের ছেলে, লেখা পড়া-জানার দলও এমনি করে মারা পড়ে। বছর পনেরো আগে, রুশিয়া থেকে এক ভদ্র লোককে পাঠালে। সে তার ভাইয়েদের সঙ্গে ভাগ-জাগ করে সম্পত্তি নেবে না, একখানা উইল নিয়ে নানা অসৎ উপায়ে হাঙ্গামা-ফৈজত করতে লাগ্‌লো। তারা বললে, সে নাকি কোন রাজবংশের, বড় জমিদার ঘরের ছেলে,—হয়তো বা কোন রাজ-কর্ম্মচারী হবে, কে জানে, কে বলতে পারে! তারপর, সেও এখানে এল। এসেই প্রথমে সে একখানা বাড়ী কিন্‌লে আর মুখোর-টিনস্কে মেলা জমি কিনলে। বললে, "আমি নিজে খেটে-খুটে খেতে চাই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করব, এখন তো আর আমি ভদ্রলোক নই, এখন একজন দায়মালী।" আমি বলেছিলাম—"বেশ, ভগবান তাকে বল দিন, এর চেয়ে বেশী সে আর কিছু করতে পারছে না।"" সে ছিল অল্পবয়সী যুবা, বার-চটুকে, আর ভারি বকতে ভালবাসত; নিজেই ঘাস নিড়েন দিত, মাছ ধরে বেড়াত। আর দিনে অমন ত্রিশ-ক্রোশ ঘোড়ায় চড়ে দৌড়ুত। তার দুর্ভাগ্যের কারণই তাই। প্রথম বছর থেকেই সে গিরিনোর ডাকঘরে ঘোড়ায় চড়ে যেত। আমার সঙ্গে এই নৌকায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলত—উঃ, সিমিয়ন, কতদিনে তারা বাড়ী থেকে আমাকে টাকা পাঠাবে? আমি জবাব দিতুম্—তোমার তো কোন দরকার নেই, ভ্যাসিলি সারজেইচ্‌। টাকায় তোমার কি হবে?—ও সব পুরোনো ধরণ-ধারণ ছেড়ে দাও, মনে কর সে সব কখনো যেন ছিলও না। যেন সব স্বপ্ন দেখেছ, মনে কর না কেন! নতুন করে বাঁচো!" আমি বল্লুম, "ও শয়তানের কথায় কাণ দিয়ো না, ও তোমার ভাল করবে না, শুধু মন্দই করবে। এখন তুমি টাকা চাইছ, দুদিন পরে আবার আরো অন্য-কিছুর দরকার হবে। যদি সুখী হতে চাও, কোন জিনিষই চেয়ো না।" হ্যাঁ·· আমি বলতুম, "দেখ, ভাগ্য এর মধ্যেই আমাদের পড়্‌তা খারাপ করে দিয়েছে, তার কাছ থেকে দয়া ভিক্ষা করে কিছু ভাল হবে না। আর তার কাছে মাথা নীচু করেও ভাল হবে না—তাকে তাচ্ছিল্য করে হেসে উড়িয়ে দাও, তখন সে নিজেই হাসবে। এমনি করে আমি তাকে বোঝাতুম।

"তারপর, দু-বছর পরে সে খুব খোস-মেজাজে পার-ঘাটায় এল। দুটো হাত কচলাতে কচলাতে খুব হাসতে লাগল। বললে, "আমি গিরানোতে যাচ্ছি আমার স্ত্রীর কাছে। আমার উপর তার ভারি অনুরাগ। সে আসছে, সে বড় ভালো, অমন স্ত্রী হয় না!" আহ্লাদে সে একেবারে আটখানা।

তারপর সেদিন সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ফিরে এল। সে বেশ দেখতে, যুবতী স্ত্রী, মাথায় টুপী, কোলে একটী ছোট মেয়ে। আর আমার ভ্যাসিলী সারজেইচ্‌ তার আশে-পাশে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। তার মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে সুখে ভরে উঠছে। সুখ্যাতি করে ত তাকে একেবারে সে আকাশে তুলে দিলে। হ্যাঁ ভাই, সিমিয়ন—' সাইবিরিয়াতেও মানুষ বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করে। আমি ভাবলাম,—বরাবর তার এমন ভাব থাকবে না!

সেই সময় থেকে, প্রতি সপ্তাহে সে গিরীনোতে যেত, রুশিয়া থেকে তার জন্যে টাকা পাঠিয়েছে কিনা, তারই খোঁজ করতে। টাকা চাই, তখন তার আর শেষ নাই। সে বলত "আমার জন্যে শুধু সে এই এমন যৌবন আর মাধুর্য্য সব মাটী করছে, আর আমার এই দুঃখের ভার নিচ্ছে! এ জন্যে যাতে তার মন বেশ ফুর্ত্তিতে থাকে তা আমাকে করতে হবে। সব জিনিষে যাতে সে আনন্দ পায়, —এর জন্যে সে রাজ-কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় করতে লাগল, সকল রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগল। এই সব সঙ্গ রাখতে বেশ করে খাওয়া-দাওয়া দিতে হত, নিত্যই মদ চালাতে হত। একটা পিয়ানোও চাই, আর সোফার জন্যে একটা খুব পশমওলা কুকুর চাই—এক কথায়, যতদূর বাড়াবাড়ি আর বিলাসিতা, তার চূড়ান্ত হলো···তার স্ত্রী কিন্তু বেশীদিন তার সঙ্গে বাস করলে না। কি করে পারবে? কাদা, জল, হিম-বরফ, না শাক-সবজী, না ফল-মূল!

তার চারদিকে কেবল ভাল্লুক আর মাতালের দল, আর সে সেই পিটার্স বর্গের মেয়ে, আদরের দুলালী।...সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।...হ্যাঁ, আর যে স্বামী সেও আর এখন মানুষ নয়, এখন সে কয়েদী।...তারপর তিন বছর পরে, আমার বেশ মনে আছে, একদিন সন্ধ্যার সময় ওপার থেকে চীৎকার শোনা গেল। যখন আমি পাড়ি মেরে ওপারে গেলাম, দেখি না, মুড়ি-সুড়ি দিয়ে সেই স্ত্রীলোক,—সঙ্গে এক যুবা রাজকর্ম্মচারী। আমি তাদের পার করে দিলুম, তারা একখানা এক্কায় চড়ে চলে গেল; তারপর সকালের দিকে ভ্যাসিলি সার্জ্জেইচ একেবারে হোম্‌কো-ধোম্‌কো হয়ে ছুটে এল। সে জিজ্ঞেস করলে, "আমার স্ত্রী কি একজন চশমা-পরা লোকের সঙ্গে গিয়েছে, দেখেছ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, ওই মাঠে বাতাসের পেছনে দৌড়োও।" সে তো তাদের পেছনে দৌড়ুল। পাঁচদিন পর্য্যন্ত তাদের পেছনে ছুটোছুটি। যখন তাকে এপারে নিয়ে এলাম, তখন সে নৌকার মধ্যে আছড়ে পড়ে তক্তার উপর মাথা খুঁড়তে লাগল, আর কেঁদে কেঁদে গর্জ্জে উঠতে লাগল। আমি হাসলুম, তাকে মনে করিয়ে দিলুম,—"হুঁ, সাইবিরিয়াতেও লোকে বাস করে!" কিন্তু তাতে তার দশা আরো খারাপ হল।

এর পর সে তার স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। তার স্ত্রী তখন রুশিয়ায় ফিরে গেছে, সে কেবল সেই স্ত্রীকে দেখবার জন্যে ভেবে মরত, আর তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে সাধ্য-সাধনা করত। প্রত্যেক দিনই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াত। একদিন ডাকঘরে, তার পর দিন কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সহরে। রুশিয়ায় ফিরে যেতে পাবার জন্যে ক্ষমা আর অনুমতির আর দরখাস্ত আর আর্জ্জি সে পেশ করতে লাগল—সব আবার তারের খবরে। সে বলত যে দু'শ রুব্‌ল্ সে খরচ করবে। জমিটা সে বেচে ফেলবে। বাড়ীখানা একজন ইহুদীর কাছে বাঁধা দিলে। মাথার চুল সাদা হয়ে গেল, মাজা দুমড়ে গেল, যক্ষ্মা-রোগীর মত মুখ হলদে হয়ে গেল। কথা কইতে গেলেই চোখে জল ধরে রাখতে পারত না। এই দরখাস্ত পাঠিয়ে পাঠিয়ে সে আট-বছর কাটিয়ে দিলে। তারপর সে যেন জীবন ফিরে পেলে, এক নতুন সান্ত্বনা পেলে! সেই মেয়ে বড় হয়ে উঠল। সে তাকে ভারী ভাল বাসত। আর সত্যি কথা বলতে কি, সে দেখতেও মন্দ ছিল না,—বেশ সুন্দর কালো জোড়া ভ্রূ, খুব তেজী। প্রতি রবিবারে সে ঘোড়ায় চড়ে মেয়ে নিয়ে গিরানোর গির্জ্জেয় যেত। নৌকোয় দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে খুব হাসি-খুসি করত। আর সে মেয়ের মুখের পানে থেকে চোখ নামাত না। বলেছিল, "হ্যাঁ সিমিয়ন, এ সাইবিরিয়াতেও লোকে সুখে বাস করে। দেখ কি চমৎকার মেয়ে আমার হয়,—তুমি হাজার ক্রোশের মধ্যে ঠিক এমনটী আর দেখতে পাবে না।" সত্যিই মেয়েটি দেখতে বেশ! আমি মনে মনে বললাম, "হাঁ, দাঁড়াও, মেয়ে ডাগর হয়ে উঠেছে, শিরায় রক্ত নাচ্‌ছে, সে বাঁচতে চায়,—আর এখানে এ কি জীবন!" যে করেই হোক, বুঝলে ভায়া, সে দুঃখ করতে সুরু করলে। শুকিয়ে হাড় জির-জিরে হয়ে রোগে পড়ল, আর উঠতে পারে না। একেবারে ক্ষয়-কাশ! এই তোমার সাইবিরিয়ার সুখ! এমনি করে এখানে লোকে বাস করে।...ভ্যাসিলি সার্জ্জেইচ কেবল ডাক্তার ডেকে ডেকে বাড়ীতে আনতে লাগল। একবার যদি শোনে যে ওখানে একজন ডাক্তার আছেন, বা দু-তিন ক্রোশের মধ্যে কোন ঝাড়-ফুকওয়ালা আছে, অমনি সে ছুটল তার কাছে—যেতেই হবে। ভাবলে রক্ত জল হয়ে যায়! কি টাকাটাই না সে খরচ করলে! এ টাকাটায় দস্তুর-মত মদ খেতে পারত। মেয়েটা তো নিশ্চয়ই মরবে। কেউ কিছুতে বাঁচাতে পারবে না। সে একেবারে ধনে-প্রাণে মারা যাবে। সে সেই দুঃখে গলায় দড়িই দিক্ অথবা রুশিয়াতেই ছুটে পালাক—একই কথা। যদি সে দৌড়ে পালায়, তাকে আবার ধরে ফেলবে, আবার নতুন করে বিচার হবে, আবার দস্তুর-মত হায়রাণী সইতে হবে, আর তার পর শেষ যা, তা বুঝতেই পারছ ত!"

তাতার শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তার পক্ষে তারা খুব ভাল ছিল।"

"কি ভাল ছিল?"

"স্ত্রী আর মেয়ে।...যতই কেন সে সহ্য করুক, যত

শাস্তিই সে পাক না কেন, যেমনকরে হোক সে তো তাদের দেখতে পেয়েছিল।...তুমিই বলছ যে তুমি কিছু চাও না, কিন্তু কিছু না চাওয়াটা খুবই খারাপ। তার স্ত্রী তার কাছে তিন বছর বাসও করেছিল, ভগবান তাকে এ সুখটুকু দান করেছিলেন। একেবারে কিছু না পাওয়ার চেয়ে—তিন বছর, —সেও যে ঢের ভালো। তুমি এ বুঝবে না।"

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বহু কষ্টে ঠিক ঠিক রুশীয় কথা জোগাইয়া বলিতে বলিতে তাতার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল যেন ভগবান তাকে এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচান্, আর এইখানে যেন তাহাকে কবরে না যাইতে হয়! যদি তার স্ত্রী তার নিকটে আসে, একদিনের জন্য এমন কি এক ঘণ্টার জন্যও, তবে সে যে-কোন ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তি ভোগ করিতেও রাজী আছে, আর সেজন্য ভগবানকে শত ধন্যবাদ! কিছু না পাওয়ার চেয়ে একদিনের একটু-পাওয়াতেও ঢের সুখ! তারপর আবার সে কেমন করিয়া তার সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী চতুরা স্ত্রীকে ফেলিয়া আসিয়াছে, তার গল্প সুরু করিয়া দিল। দুই হাত কপালে দিয়া সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, সিমিয়নকে বিশ্বাস করাইতে লাগিল যে সে একেবারে নির্দ্দোষ, শুধু অবিচারে তার এই শাস্তি-ভোগ। তার দুই ভাই এক চাষার ঘোড়া চুরি করে, আর সেই বুড়া মানুষটাকে মারিয়া আধ-মরা করে। কিন্তু সমাজ তার প্রতি অতি অন্যায় ব্যবহার করিল। তাহারা তিন ভাইই সাইবিরিয়ার দায়মালী হইয়া আসিল, আর তার যে খুড়া, সে ধনী ব্যক্তি, দিব্য বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল।

সিমিয়ন বলিল, "ও তোমার ক্রমে অভ্যেস হয়ে যাবে।"

তাতার কিছু বলিল না, শুধু তার জল-ভরা আঁখি অন্য দিকে ফিরাইল। তার মুখে সন্দেহ ও ভয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে যেন ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না,সে সিমবিরস্কে না থাকিয়া বিদেশে এই অপরিচিতের মধ্যে এই হিমে কেন পড়িয়া আছে! থলিকা আগুনের ধারে গিয়া বসিল, কি একটা ভাবিয়া নিঃশব্দে হাসিল, ও গুণ গুণ স্বরে একটা সুর ধরিল।

"তার বাপের কাছে থেকে কিই বা তার স্বস্তি!" কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার আরম্ভ করিল :—

"সে তার মেয়েকে ভালবাসে, আর তাতে তার মস্ত সান্ত্বনা, সত্যি। কিন্তু তুমি তার চোখে হাত চাপা দিতে পারো না। সে হলো বুড়ো মানুষ, বেশ কড়া রকমের বুড়ো। আর যুবতী মেয়েদের সঙ্গে তুমি নিশ্চয় অমন বুড়োর কড়া রকমটা কখনো চাও না। তার চায় বেশ আদর যত্ন, হা-হা-হা, নয় হো-হো-হো-হো—সুগন্ধি জিনিষ, আর রঙ-ঢঙ! হ্যাঁ!......আঃ, এখন কাজের কথা! কাজ!" জড়-ভরতের মত উঠিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। "সব ফুরিয়ে গেছে—এখন তবে শোবার সময়। আচ্ছা ভায়া, আমি চল্লুম।"

তাতার আবার জ্বলন্ত আগুনে জঙ্গলের কাঠ ঠেলিয়া দিল, ও পাশে শুইয়া পড়িয়া তার নিজের গ্রাম ও স্ত্রীর কথা ভাবিতে লাগিল। যদি তার স্ত্রী এক সপ্তাহের জন্যও আসিত, অন্ততঃ একদিনের জন্য, তার পর ইচ্ছা হয় সে নয় আবার দেশে ফিরিয়া যাক্। একেবারে না আসার চেয়ে দু'চার দিন, অন্ততঃ একটা দিনও! কিন্তু যদি তার স্ত্রী সত্য রক্ষা করে,—আসে,—তবে কি করিয়া তাহাকে সে কি খাওয়াইবে? কোথাই বা তাকে রাখিবে?

সে চীৎকার করিয়া নিজেকেই প্রশ্ন করিল। "কিছু না পেয়ে তুমি বাঁচবে কি করে?"

দিন রাত্রি ধরিয়া যদি সে দাঁড় বয়, তবে দিনে দশটা পয়সা রোজগার হয়। যাত্রীরা কখনো কখনো চা খাইবার জন্য বা মদের জন্য টাকা দেয় সত্য, কিন্তু অন্যেরা তাহা হইতে বখরা কাড়িয়া লয়, তাতারকে কিছুই দেয় না, শুধু তার দিকে তাকাইয়া হাসে। দারিদ্র্যের অভাবের তাড়নায় সে ক্ষুধায় পীড়িত, শীতে কম্পিত, ভয়ে ত্রস্ত। তার সারা দেহ শীতে কামড়াইয়া ধরিতেছিল, আর ঠক্ ঠক্ করিয়া সে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। যদি সে ওই কুঁড়ের ভিতরে যায়, গায়ে ঢাকা দিবার জন্য কিছুই পাইবে না। এখানে বাহিরেও গায়ে চাপা দিবার কিছু নাই, তবু আগুনটাকে জ্বালাইয়া রাখিতে পারিবে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই জল নামিয়া যাইবে, তখন সিমিয়ন ছাড়া আর কোন খেয়ার মাঝির দরকার হইবে না; তাতারকে আবার তার রুটী ও কাজের জন্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিখারীর মত বেড়াইতে হইবে। তার স্ত্রীর সবে মাত্র এই সতেরো বছর বয়স; সে দেখিতে সুন্দরী, লাজ-নতা, আদরের মেয়ে। সে কেমন করিয়া ঘোমটা খুলিয়া গ্রামে গ্রামে ফিরিবে, দ্বারে-দ্বারে রুটী মাগিবে! ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া ওঠে,—উঃ কি ভয়ানক!

তার পর তাতার যখন চোখ মেলিয়া চাহিল, তখন ভোর হইয়া গেছে। নৌকা, উইলো গাছ আর জলের ঢেউ বেশ পরিষ্কার দেখা গেল। চোখ ফিরাইলেই তুমি দেখিতে পাইবে, নদীর ভিজা কাদামাখা গড়ানে পাড় আর তার উপরে সেই পাঁশুটে রঙের খড়ের কুঁড়ে, আর উপরে গ্রামের কুঁড়ে ঘরগুলা। গ্রামে তখন মোরগ ডাকিয়া উঠিয়াছে।

এই কাদা-মাখা পাড়, এই নৌকা, এই নদী, এই সব অপরিচিত দুষ্ট লোক, ক্ষুধার তাড়না, হিম, অসুস্থতা,—এ সব যেন সত্য নয়! তাতার ভাবিতেছিল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে! তার মনে হইল, সে ঘুমাইতেছে—তার নাক-ডাকার শব্দও—ঐ যে সে শুনিতে পাইতেছে! নিশ্চয়ই সে সিমবিরিস্কে তার বাড়ীতেই রহিয়াছে। শুধু তার স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকিলেই হয় এবং সেও যেন ডাকিলেই উত্তর দেয়! পাশের ঘরে তার মা শুইয়া; ...ওঃ! স্বপ্ন কি ভয়ানক জিনিব!...কোথা হইতে এ-সব স্বপ্ন আসে?...তাতার কাসিয়া উঠিল, এক চোখ খুলিয়া দেখিল, এটা কি নদী? ভল্গা? তখন বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

"ওহে!" অপর পার হইতে ডাক আসিল। "ওহে মাঝি—"

তাতার গা ঝাড়া দিয়া উঠিল এবং তাহার সঙ্গীদিগকে ডাকিতে গেল। মাঝিরা তাহাদের সেই ভেড়ার ছালের জামা টানিতে টানিতে ঘুমের জড়তায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা বিকৃত স্বরে কটু দিব্য করিতে করিতে নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘুম হইতে উঠিয়া নদীর সেই ছুঁচ-বেঁধার মত হাওয়া যখন গায়ে বিঁধিতে লাগিল, তখন তাহাদের কাছে ঠাণ্ডা যেন দুঃস্বপ্নের মত বোধ হইল। টলিতে টলিতে হোঁচট খাইয়া তাহারা নৌকায় গিয়া উঠিল। তাতার ও মাঝিরা দাঁড় ধরিল। সিমিয়ন হাল ধরিল। ওদিকে অপর পার হইতে অনবরত চীৎকার শোনা যাইতে লাগিল, দুইবার বন্দুকের আওয়াজও শোনা গেল। অপরিচিত লোক নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিল যে মাঝিরা পড়িয়া ঘুমাইতেছে, অথবা গাঁয়ের সরাইখানায় গিয়াছে।

"আরে, ঠিক সময়েই পারে যাব।" খলিফা এমনি ভাবে কথা কহিল যেন সে লোকের বেশ ধারণা হইয়া গেছে, যে এ পৃথিবীতে কোন কিছুতে বেশী তাড়া করিবার কোন প্রয়োজনই নাই! "ও একই কথা, চীৎকার-মিৎকার করে বিশেষ কিছু লাভ হবে না।"

সেই ভারী বিশ্রী নৌকাখানা নদীতীর হইতে উইলোর ঝোপের মধ্য দিয়া পথ করিয়া অগ্রসর হইল। শুধু উইলো গুলা সরিয়া পিছনে পড়িতে লাগিল বলিয়াই মনে হইতে লাগিল, যে নৌকাখানা নড়িতেছে। তালে তালে ধীরে ধীরে মাঝিরা দাঁড় ফেলিতে লাগিল। খলিফা তার পেটের কাছে হালটা এমন ভাবে ধরিল, যে শূন্যে সেটা একটা ধনুকের মত দেখাইতেছিল। একধার হইতে অন্যধারে হালটা এদিকে ওদিকে ঠেলিতে লাগিল। সেই অস্পষ্ট আলোয় যেন কোন্ পুরাকালের এক বৃহৎ লম্বা থাবাওয়ালা জানোয়ারের পিঠে চড়িয়া বসিয়া কতকগুলা লোক কোন্ সুদূর জন-হীন তুহিনের দেশে ভাসিয়া চলিয়াছে!—কখনো কখনো ঘন-ঘোর রাত্রির দুঃস্বপ্নে এমনি দেখা যায়!

উইলোর ঝোপ ছাড়িয়া নৌকা শীঘ্রই বহর জলে পৌঁছিল। অপর পারে তখন ক্যাঁচকোচ ও তালে তালে দাঁড় ফেলার ধ্বনি স্পষ্ট শুনা গেল এবং জলের উপর দিয়া অপর পার হইতে "শীগ্‌গির শীগ্‌গির "শব্দ শুনা গেল। আর মাত্র দশ মিনিট। নৌকাখানা সজোরে ঘাটে গিয়া লাগিল।

মুখ-চোখের উপর হইতে হাত দিয়া গুঁড়া বরফ মুছিয়া ফেলিয়া সিমিয়ন বলিয়া উঠিল,—"এ পড়ছেই,

পড়ছেই—ভগবান জানেন, কোত্থেকে এত বরফ আসে!"

নদীতীরে একজন দুর্ব্বল বুড়া দাঁড়াইয়াছিল—গায়ে একটা শেয়ালের চামড়ার জামা, মাথায় সাদা ভেড়ার চামড়ার টুপী। ঘোড়া দুটোর নিকট হইতে একটু দূরে সে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; মুখখানা আঁধার কালিতে ছাইয়া গিয়াছে। মনে হইল, সে যেন কি মনে করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর তার অবাধ্য স্মৃতির উপর থাকিয়া থাকিয়া রাগে ফুলিয়া উঠিতেছে। যখন সিমিয়ন তার কাছে অগ্রসর হইয়া হাসিয়া মাথার টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিল, সে তখন বলিল,—"আমি এখান তাড়াতাড়ি আনাস্তাভেস্কায় যাচ্ছি। আমার মেয়ের অবস্থা বড় খারাপ! শুনেছি, আনাস্তাভেস্কায় একজন নতুন ডাক্তার এসেছে।"

মাঝিরা গাড়ীখানা নৌকার উপর টানিয়া তুলিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। যাহাকে সিমিয়ন ভ্যাসিলি সার্জ্জেইচ্ নাম বলিয়াছিল,সমস্ত ক্ষণই সে মোটা মোটা আঙুলগুলা চাপিয়া ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তার চালক যখন জিজ্ঞাসা করিল, যে তার সম্মুখে সে তামাক খাইবে কি না, সে কোন উত্তর দিল না, যেন সে শুনিতেই পায় নাই। সিমিয়ন নৌকার হালের উপর পেটটা চাপিয়া দুষ্টামির চাহনি চাহিয়া বলিল, "হাঁ! সাইবিরিয়াতেও লোক বেঁচে থাকে। এই সাইবিরিয়াতেও।" খলিফার মুখখানায় যেন জয়োল্লাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। যেন সে একটা বিষয়ে ঠিক বিচার করিয়া ফেলিয়াছে; আর সে যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিল তাহা ফলিয়াছে বলিয়া মনে মনে খুসী হইয়া হাসিতে লাগিল। শিয়ালের চামড়ার জামা গায়ে লোকটীর মুখে গভীর বিষাদ ও নিরাশার ছবি দেখিয়া সিমিয়নের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিল।

নদীর পারে আসিয়া যখন তারা আবার ঘোড়া দুটোকে গাড়ীতে জুতিতেছিল, তখন সে বলিল, "এ সময় কোথাও যাওয়া—এই কাদায়—বড়ই মুস্কিলের কথা ভ্যাসিলি সার্জ্জেইচ। তুমি দু'এক হপ্তা অপেক্ষা করলেও পারতে, যখন সব শুকিয়ে যেত। আর কথাটা কি জান, তুমি একেবারে সেখানে না গেলেও পারতে।...যদি সেখানে গেলে কিছু সুবিধে হতো তা হলেও নয় একটা কথা ছিল, কিন্তু তুমি ত নিজে জান যে চিরকাল ধরে এমনি করে তুমি যেতে পার, ফল কিছুই হবে না!...যাক, তারপর?" ভ্যাসিলি সার্জ্জেইচ্ নিঃশব্দে মাঝিদের হাতে গোটা কয়েক টাকা দিলেনও গাড়ীতে উঠিয়া জোরে হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

"এর পরেও আবার ডাক্তার" শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সিমিয়ন বলিল, "হ্যাঁ, আসল ডাক্তার খুঁজে দেখ—হাওয়ার পিছনে দৌড়োও,শয়তানের লেজ ধরে টানো, তাকে নিপাত দাও। আর কি রকম চরিত্রের লোক এরা! ভগবান আমার মত মহাপাপীকে ক্ষমা করুন!"

তাতার সিমিয়নের নিকটে উঠিয়া গেল। অতি ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত তার মুখের পানে চাহিল; তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা রুশীয় ও তাতারী ভাষায় মিলাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "ও অতি ভাল লোক, আর তুমি অতি বদ! ও মহাপ্রাণ লোক, মস্ত লোক, তুমি একটা জানোয়ার।...ও সত্যই বেঁচে আছে, কিন্তু তুমি মরা... ভগবান মানুষকে গড়েছেন, তারা যাতে সুখ-দুঃখ ভোগ করে,—কিন্তু তুমি কিছু চাও না।...কিছু চাও না।...তুমি একখানা পাথর—শুধু মাটীর ঢেলা। পাথর কিছু চায় না, তুমিও কিছু চাও না।...তুমি একখানা পাথর, পাথর,...তোমার উপর ভগবানের এতটুকু মায়া নেই, ভালবাসা নেই। কিন্তু ওকে... ভগবান ভাল বাসেন।"

সকলে হাসিয়া উঠিল! শুধু তাতার ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; হাত দুখানা জোরে নাড়িল, তার সেই ছেঁড়া নেকড়া টানিয়া বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া, ফিরিয়া সেই আগুনের কাছে গেল। সিমিয়ন ও মাঝিরা কুঁড়ে ঘরে ফিরিল।

"ওঃ! ভারী ঠাণ্ডা—" একজন মাঝি ভাঙ্গা কর্কশ স্বরে এই কথা বলিয়া মেঝেতে যে খড় বিছানো ছিল, তাহার উপর আড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

"হ্যাঁ, এ গরম নয়" আর একজন বলিল—"নৌকোর গোলামের জীবন গরম নয়।"

সকলে শুইয়া পড়িল। বাতাসের মুখে দরজা খোলাই রহিল, আর বরফের গুঁড়াগুলা ঝটকায় ঘুরিতে ঘুরিতে কুঁড়ের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। কেহ উঠিয়া দরজা বন্ধ করিল না, সকলে শীতে জড় সড় অলস।

"আমি কিন্তু বেশ আছি"—সিমিয়ন বলিল, "ভগবান প্রত্যেককেই যেন এমনি জীবন দেন!"

"আরে তুই তো মাঝি—গোলাম হয়েই জন্মেছিস—শয়তানও তোকে নেবে না।"

আঙ্গিনা হইতে একটা বিকট শব্দ আসিল। যেন একটা কুকুর গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতেছে।

"ও আবার কি? কে ওখানে?"

"সেই তাতার বেটা কাঁদছে।"

"আরে...লোকটা কি রকম!"

"ও সব অভ্যাস হয়ে যাবে ক্রমে।" সিমিয়ন ঘুমাইয়া পড়িল।

অচিরে আর-সকলে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল।... দরজটা তেমনি খোলাই রহিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

স্বর্গারোহণে

[এই সেই আষাঢ়। এই আষাঢ়েরই প্রথম বর্ষণে গত বৎসর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্বর্গলোক যাত্রা করেন। মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে লোকান্তরের দ্বার বুঝি বা উদ্ঘাটিত হয়—নিশীথে স্বপ্নাবেশে! পরদিন প্রত্যূষে আনন্দ-বিস্ফারিত কবি অচেনা পথের বর্ণ-উজ্জ্বল বিচিত্র বৈভব বর্ণন করেন। তখন আমরা রোগশয্যা-পার্শ্বে নিরাময়-কামনায় একাগ্রচিত্ত। কবির সেই বর্ণনার আভাষ লইয়া এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ বিরচিত—দারুণ শোকের তরুণ স্পর্শ আজি এই মৃত্যু-বার্ষিকের অশ্রুসিক্ত উপহার তাহারই উদ্দেশে।—

লেখক]

প্রস্তাবনা

কল্পলোকে কুহক রচিল,—কাহার ইঙ্গিতে?

সবুজ পরী কহিল,—সে ত ভোগ চাহে নাই; পঙ্কিল কি ভোগ?

নীল পরী কহিল,—হাসির কুচি কুড়াইত সে, অশ্রুর বিন্দু বিলাইত; মৌন তার প্রাণের কম্পন, মৌন তার দান।

লাল পরী বাধা দিয়া বলিল,—কার প্রাণে কি যে ব্যথা স্পন্দন তারই ত্রিতন্ত্রীতে; নহিলে মূকের ভাষা দিবে কে?

তিনজনে সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা তার, ক্ষুধায় খাদ্য ধারিবে কেন? ফুলের ফসলে চাঁদের আলো ধরিয়াছে সে; সে যে কবি, ছন্দের রাজা। কর্ম্ম-বন্ধনের শেষে ঐ ভাবে, এস মিলাই তারে অনন্ত সৌন্দর্য্য-ধারে।

তন্দ্রায়

কালির রেখা টানিতে টানিতে ছুটিয়া এলে, কে তুমি? রুদ্রচণ্ড, কি রচিতে চাও?—ধূমের কুহেলিকা, এ কি!

পরিচয় কাহার লও? চিনিতে পার না, কি চাহ না? জীবনে জীবনে নিত্য সহচর,—আমি মহাকাল।

সন্ধ্যায়

চোখে আমার কে পরাইল মুক্তার কাজল? এ কি স্বপ্নপুরী!

মণির ঝালরে ঝলমল রক্তের কিংখাব অফুরন্ত। চেনা হাতের নিখুঁত বুনন, দেখি দেখি। চোখ ভরে, মন উঠে না।

অযুত শ্বেত অশ্বের সোনালি রথ,—কুহু ও কেকায় ভরপুর, এস।

সারথি কৈ? কৈ সে মহাকাল? যাদুকর, ছিঃ ছিঃ এ কি! সারথি তুমি! তুমি যে সবিতা, দেবেরও দেবতা, নমস্কার, নমস্কার।

ভাবে ভোর, কল্পনায় তন্ময়। কবি, বন্ধনের গ্রন্থি খসিয়া যাক্। মুক্ত হাওয়ায় মুক্ত প্রাণ। গিরা কে দিল?

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বেড়িয়া তোমায়—বেণুর তানে, বীণার সুরে। বরপুত্র, এস ক্রোড়ে।

নিশীথে

রথ চলে অনাবিল ঘর্ঘর রবে কোন্ সুদূরে? পারিজাতের সুগন্ধ বাহিয়া বায়ুস্তর সুরভিত, সুরের ঝাঁকে মেঘলোকে ঢিমা তালের মিহি আওয়াজ প্রতিধ্বনিত, লাল নীল সবুজ পরী শ্রান্ত আত্মার ক্লান্তি-হরণে ব্যজনব্যস্ত।

কবি নির্নিমেষ চাহিয়া—কাহার ধ্যানে কি আনন্দে বিভোর!

মধ্যপথে রথ থামে কেন, কবি? কি কামনা নিহিত এখনও হৃদয়ের অন্তঃস্তলে?

কামনা! কৈ? জানি না।

সত্যের ইন্দ্র তুমি, জান না তা বুঝ! মর্ত্তধামে আকাঙ্ক্ষা দলিত পিষ্ট লাঞ্ছিত করিয়াছ। ধন চাহ নাই, যশ পাছে পাছে জয়মাল্য লইয়া ফিরিয়াছে, ভ্রূক্ষেপ কর নাই। নারীর প্রেমে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়াছ—রূপের নেশা, দেহের তৃষা তোমার কাছে চির-অবগুণ্ঠিতা! চলুক রথ স্বর্লোকে।

চক্রনেমি এখনও অচল কেন? টলে রথ, চলে না কেন? সুরগণ গান শুনিতে উদ্‌গ্রীব। গাহ কবি, প্রাণ ভরিয়া গাহ গান সৌন্দর্য্য-পুলকের, সাম্য-সামের, বিশ্বের আদি রচনার, শাশ্বত পুরুষের।

সচল রথ এখনও বিকল! মর্ত্ত্যের ক্লেদপূর্ণ পথে আঁখি ফিরাইলে কেন, কবি? কি দেখিলে? সর্ব্বেন্দ্রিয়-জয়ী তুমি, কিসের আকর্ষণ, কিসের মোহ?

মোহ! মোহ!! কৈ, কোথায়?

আহার বিহারে বিলাস-ব্যসনে চির-উদাসীন, কুণ্ঠা-সংশয়-আসক্তি-বিহীন ঔদার্য্যের দীপশিখা তুমি, কি দেখিতে কি দেখিতেছ?

সাগরবেলায় তপ্ত বালুকারাশি ঠিকরিয়া উঠিতেছে—কাহার ত্রস্ত পদসঞ্চারে? কার অশ্রুজলে ঢেউয়ের পর ঢেউ ফেনিল আকারে আছাড়িয়া পড়িতেছে? সে যে আমারই জননী। চক্ষু আছে দৃষ্টি নাই, প্রাণ আছে স্পন্দন নাই, ব্যথা আছে বেদনার অনুভূতি নাই—পাষাণ, পাষাণ।

কি চাহ?

চাহি? কৈ, কিছু না।

বর লও।

দিবে যদি, দিতে পার যদি, দাও মুক্তি ঐ উঁহার।

গম্ভীর অধীন সৃষ্টি। মুক্তির নিয়ামক কর্ম্ম। কর্ম্মের অবসানে ঘটিবে মিলন মহাতীর্থে পুণ্যধামে।

মৃদু হাস্য নাচিল ওষ্ঠে। যোড়-করে কবি সমাধিস্থ হইলেন।

প্রভাতে

কর্ম্মের লেশ নাই আর। হউক লয় অনন্তে। পরিনির্ব্বাণ লাভ কর, কবি।

ঘর্ঘর রবে রথ ছুটিল—মেঘলোক ভেদ করিয়া। স্বর্গের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

শ্রীকালীচরণ মিত্র।

সত্যেন্দ্র-স্মরণে

এক বর্ষ হলো গত, গেছ তুমি আমাদেরে ছাড়ি,
অবসন্ন খিন্ন করে কোন'রূপে মুছি অশ্রুবারি
মর্ম্মাহত ফিরিলাম কর্ম্মভূমে। কাজে ও অকাজে
বৎসর কাটিয়া গেল ক্ষতি-ক্ষোভে লাঞ্ছনা ও লাজে।
নব দূর্ব্বাঙ্কুর সনে সঞ্জীবিয়া স্মৃতিটি তোমার—
অন্তর্গূঢ়-ব্যথা-ঘন ফিরে এল আবার আষাঢ়।
সুখীও চঞ্চল-চিত্ত উন্মনস্ক যে নব আষাঢ়ে,
বিরহে করুণ, কবি করিয়াছে যুগে যুগে যারে,
তুমি যারে করিয়াছ দুর্বিষহ কারুণ্য গম্ভীর,
সে আষাঢ় এলো ফিরে আঁধারিয়া অন্তর-বাহির!

তুমি চলে গেছ বন্ধু, তারপর বিদ্যুৎ কঙ্কণ
ললাটে হানিয়া বর্ষা গেল রেখে অশ্রুর প্লাবন।
শরৎ আসিল বঙ্গে বহি তব গীতি-উপাদান।
শেফালি, মরাল, কাশ, কুমুদ্বতী নদী-কলতান,
তুমি তারে বরিলে না ভরি চারু ছন্দের অঞ্জলি,
অভিমানে ছড়াইয়া স্নেহ-ভেট কেঁদে গেল চলি,
বাজিল বোধন-বাঁশী—ডুবে গেল তার আগমনী—
তব বিদায়ের সুর তখনো যে উঠে অনুরণি।
মৌন কাব্যকুঞ্জ হেরি' হেমন্তের কুণ্ঠা গেল বাড়ি'
ফিরিল গুণ্ঠিত মুখে শাঁইবনে আর্ত্তনাদ ছাড়ি'।

ঋতুরাজ ফিরে এসে হেরে হেথা ফিরে গেছে ভোল,
কে গাবে স্বাগত তার? কে বাঁধিবে ফুলের হিন্দোল?
পলাশে বিলাস নাই, রক্তাশোক গাঢ় শোকারুণ,
বাজিছে কোকিল কণ্ঠে ছন্দশ্ছিন্ন বেহাগ করুণ।
নাহি কোন' সমারোহ, নিরুৎসাহ প্রমোদের হাট—
উৎসবের পুরোহিত, করিলেনা তুমি নান্দীপাঠ।
বনে যারা ফুটেছিল অনাদরে শুকাল সকল,
এবার বসন্তে মনে ফলিল না ফুলের ফসল।
আসিল নিদাঘ উগ্র লয়ে "চম্পা! সূর্য্যের সৌরভ,"
কবি নাই, হায় হায় কে তাহার বুঝিবে গৌরব?

লভিল না অভিষেক-পান্থবারি মাল্য সচন্দন,
রুদ্রেরো গলিল হিয়া, রক্তনেত্রে করিল ক্রন্দন,
না মিলাতে বেণু বনে— উষ্ণশ্বাসে তার হাহাকার,
বৎসর ঘুরিয়া গেল, শোকঘন ফিরিল আষাঢ়।
এবার কাজ রী-গানে হ'লনা সে অতিথি নন্দিত,
কূটমল্লিকার মাল্য কণ্ঠে তার হ'লনা লম্বিত,
রচিলেনা সিংহাসন, "আনন্দের অখণ্ড মণ্ডল"
বিকচ কদম্বে, বৃথা মিলাইল যূথী-পরিমল।
কেতকীরে ধন্য করি অতিথিরে দিলেনা এবার,
"কণ্টকের কুণ্ঠা সনে সৌরভের গৌরব তাহার।"

নব-মেঘদূত তুমি রচিলে না। পর্জ্জন্য পুষ্কর—
আগে কভু কবিলোকে লভেনিক হেন অনাদর।
তুমি চলে গেছ বন্ধু,—কালচক্র ঘুরিছে তেমনি;
নির্ব্বিকার লোকযাত্রা চলিতেছে চলিত যেমনি।
তেমনি চলিছে আজো জনসংঘে উৎসব অবাধ—
কৌতুক-কৌশল, ক্রীড়া, কাড়াকাড়ি, বাদবিসম্বাদ।
যার গেছে তার গেছে,—গেছে-যা' তা' গেছে আমাদের,
তুমি যে কি বস্তু ছিলে দুঃখী দেশে আজি পাই টের।
কত হৃদ্য ছিলে তুমি হৃদি জুড়ে ছিলে কতখানি—
তোমারে হারায়ে আজি, মর্ম্মে মর্ম্মে প্রাণে প্রাণে জানি।

স্নিগ্ধ বনস্পতিসম ছিলে তুমি ছায়াচ্ছন্ন করি'
ফাঁকা ফাঁকা খাঁ খাঁ দিক হাহাকারে উঠে আজ ভরি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আকৈশোর প্রেমাধ্যা, আকৈশোর নেত্রসঞ্জীবন,
তৃষ্ণায়ত দৃষ্টি তোমা দিগ্বলয়ে করে অন্বেষণ।
সংসারের বিষবৃক্ষে দুটী ফল অমৃতের মত,
কল্পতরু, তোমা হতে দুইটিই হল অধিগত।
নাহি আর গোষ্ঠীসুখ, বন্ধুসভা ম্লান ম্রিয়মান,
স্তিমিত নক্ষত্রে ভরা সোমশূন্য ব্যোমের সমান।
দেশের মর্ম্মের বাণী বহুদিন হয়নি ছন্দিত,
ভণ্ডেরা হয়নি তব কণ্টাকত কশায় দণ্ডিত।

রসবিন্দু নাহি পাই মাসিকের শুষ্ক পত্র-ভারে,
গন্ধমধুহীন যেন শীর্ণ পুষ্প স্মরায় তোমারে।
অন্নে শুধু দেহ বাঁচে, প্রাণপুষ্টি চাহে যে এ মন—
তুমি গেছ, সেই হতে চলিতেছে তার অনশন।
তৃষ্ণাতুর শ্রুতিযুগ, পক্ষাঘাতে অবশ লেখনী,
জীবন ভরেছে গদ্যে, দিশাহারা ছন্দের তরণী।
বিজ্ঞজন বলে "মূঢ়, দুইদিন আগে আর পিছে,
যে গেছে, তাহার লাগি কেন আর শোক কর' মিছে।"
এ কথা কি বুঝিনাক? কিন্তু হায়, মোরা তো মানুষ,
কেমনে ভুলিব স্বার্থ—দুর্ব্বিষহ ক্ষতির অঙ্কুশ?

মোরা শুধু ভাবি তাই—কত কলি তব কল্পবনে
ফুটিতে পারিত হায়, ফুটিল না অকাল দহনে!
ছুটিতে পারিত হায় দিকে দিকে কত মনোরথ,
পদাঙ্ক-গৌরবে তব, ধন্য হতো কত নব পথ।
কত সৃষ্টি অনুৎকীর্ণ রয়ে গেল তব শিল্পাগারে,
অপূর্ব্ব কল্পনা কত রসমূর্ত্ত হলোনা স্বাকারে।
কত আদ্‌রা একে শেষে রক্ত দিয়ে পারনি ভরিতে,
উদ্বোধিত কত সত্যে ছন্দোময় পারনি করিতে।
করিতে পারিতে ভাষা-জননীরে রাজরাজেশ্বরী,
আনিতে পারিতে গর্ব্বে দিগ্বিজয়-মালিকা আহরি।

কত যে অপূর্ব্ব শ্রীতে কত রত্নে নব ছন্দহারে
মণ্ডিতে পারিতে তব চিরারাধ্যা দেশমাতৃকারে!
কত অকথিত বাণী, অঝঙ্কৃত কত সামগান,
অগ্রথিত কত মাল্য, সমারব্ধ কত অভিযান,
কত দ্বিতীয়ার চাঁদ, বিশালের কতই অঙ্কুর,
নিয়ে তুমি গেছ চলি, তাই মোরা এত শোকাতুর!
প্লবমান হিমশৈলে কিয়দংশ উর্ম্মিপরে জাগে
নয়নের অন্তরালে অধিকাংশ রহে নিম্নভাগে।

যা দিয়েছ, দশগুণ ছিল তার তব চিত্ত-তলে,
সাগ্রহ আকুতি কত দগ্ধ হলো চিতার অনলে।

ওগো তরুণের গুরু, মুক্তিতীর্থ-যাত্রীদের নেতা,
হের আজি মধ্যপথে বন্ধ তব অভিযান হেথা।
আজি তব মৃত্যুদিনে অশ্রুকণ্ঠ অনুজ তোমার,
উন্নয়নে উদগুলি জিজ্ঞাসা করিছে বারবার,
লোকান্তরে কবিস্বর্গে সমাদরে আছ বা কেমন?
লভেছ স্বগৌরবে দেবতা-দুর্ল্লভ রত্নাসন,
কত আশা মিটেনিক পূরেনিক কতই বাসনা,
সফল হল কি সেথা, পুরস্কৃত হলো কি সাধনা?
শাসন সংযত চিরশৃঙ্খলিত হতভাগ্য ভূমি,
তেয়াগি অক্ষুণ্ণ মুক্তি স্বস্তি আজি লভেছ ত তুমি!

অথবা সেথাও তুমি আনন্দের চিন্ময় মন্দিরে
ভুলিতে পারনি তব নির্য্যাতিত দেশ-জননীরে!
স্বর্গের সৌভাগ্য তব হয়ত বা লাগিছে বিস্বাদ,
কুশাঙ্কুর সম সদা বিঁধিতেছে দেশের প্রমাদ,
মাগিছ বিদায় বুঝি স্বর্গ হতে, পরত্রবিরাগি,
"অশ্রুজলে চিরশ্যাম ভূতলের স্বর্গখণ্ড লাগি!"

শ্রীকালিদাস রায়।

সঙ্কলন

আপো নারায়ণ

জল ফিল্টার কথা।

১ নং চিত্রে মরণের ফাঁদ। এই ফিল্টার বাঙ্গালার ঘরে-ঘরে। ইহাকে কলসী ফিল্টার কহে। এই কলসীর ভিতর দিয়া "ময়লা" জলকে দেখিতে "পরিষ্কার" করা যায় বটে,—কিন্তু সে জল আদৌ "নিরাপদ" নহে। একশ বার এ কথাটি মনে রাখিবে। কলসীর ফিল্টার জলকে ধুলা-কাদা-শূন্য করে—জীবাণু শূন্য করিবার ক্ষমতা ইহার আদৌ নাই! অথচ এই কলসী ফিল্টারের উপরে এদেশের কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল প্রকার লোকেরই অগাধ বিশ্বাস!

২ নং ইহা বিলাতী পাস্তুর চ্যাম্বার ল্যাণ্ড ফিল্টার। জলের কলের মুখে লাগাইয়া দিলে ইহার ভিতর দিয়া যে জল যায় তাহা নিরাপদ (অর্থাৎ) জীবাণু-শূন্য হয়।

(৩ নং) ইহা বিলাতী বার্কফেল্ড ফিল্টার। ইহার মাথার দিকের ঢাকনি খুলিয়া ইহার ভিতরে জল ঢালিয়া দিতে হয়। নীচের দিকের কলের চাবি খুলিলে যে জল পড়ে সে জল নিরাপদ (অর্থাৎ জীবাণু-শূন্য)। ফিল্টার ব্যবহার করিবে ত এই দুইটি ব্যবহার করিও—কলসীর ফিল্টারকে ঘরে ঠাঁই দিও না।

(২) পাতকুয়ার কথা।

মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িলেই জল উঠে। কিন্তু সে গর্ত্তের ধার যদি সিমেণ্ট দিয়া পাকা করিয়া গাঁথিয়া না দেওয়া হয় তবে কি হয়, (৪ নং) ছবিতে দেখ। একটি পাকা দেওয়াল-ওয়ালা পাতকুয়া—কিন্তু সিমেণ্ট দেওয়া নয়। ইহার কাছেই একগর্ত্তে চোনা প্রভৃতি ফেলা হয়; সেটিও পাকা কিন্তু সিমেণ্ট দেওয়া নয়। তাহার ফলে চোনা চৌবাচ্ছার গায়ের ফাটল দিয়া ময়লা মাটির ভিতর দিয়া পাতকুয়ার গাঁথনির ফাটল ভেদ করিয়া সেই পাতকুয়ার জলকে নষ্ট

করিতেছে। এই পাতকুয়ার জল পান করাও যা, অঞ্জলি ভরিয়া চোনা পান করাও তাই।

১নং চিত্র কলসীর জল ফিল্টার
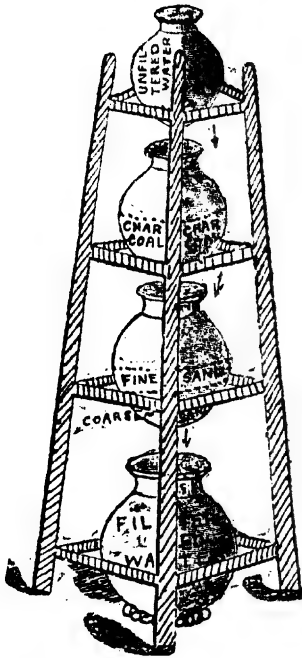
(৫ নং) এই ছবিতে দেখ একটি পাতকুয়া রহিয়াছে! এই পাতকুয়া হইতে যত জল উঠাইবে, ততই উহার তলার আশে পাশের জমি হইতে জলের টান ধরিবে;—অর্থাৎ, এই পাতকুয়ার তলায় ফুটকি ফুটকি দিয়া যে একটি উল্টা ত্রিকোণ আঁকা আছে—সেই সমস্ত জায়গায় জলকে সজোরে টানিয়া পাতকুয়ার ভিতরে আনিয়া ফেলিবে। এই যায়গাটুকু কম নয়—পাতকুয়ার গভীরতার সঙ্গে ইহার মাপ করিয়া দেখ—প্রায় ১০০ হাত ব্যাসের জমি। এই ত্রিকোণের মধ্যে ঘেরা আছে। যদি পাতকুয়া হইতে ধীরে-সুস্থে অল্প অল্প করিয়া জল উঠান যায়, তবে ঐ সব জায়গার জলটুকু ধীরে ধীরে ভাল করিয়া চোঁয়াইয়া, বেশী পরিষ্কার হইয়া পাতকুয়ার ভিতরে যাইবার অবসর পায়। কিন্তু সকলে মিলিয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, অতি মাত্রায় জল উঠাইলে, ঐ সমস্ত জায়গার জল হুড়মুড় করিয়া অর্থাৎ বেশীর ভাগ অপরিষ্কার অবস্থাতেই পাতকুয়ার মধ্যে যাইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। সে জল পান করিয়া পীড়া হইতে পারে।
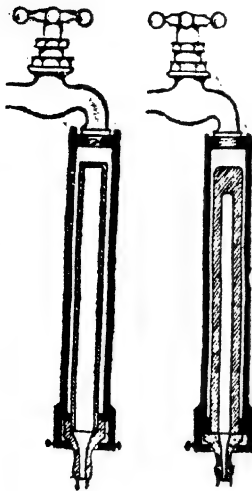
২ নং চিত্র পাস্তুর চ্যাম্বার ল্যাণ্ড ফিল্টার

৩নং চিত্র বার্কফেল্‌ড্‌ ফিল্টার

৬নং ছবিখানিতে দুইটি জিনিস দেখান হইয়াছে। (১) টি কাচা (পাড়যুক্ত) পাতকুয়া (২) পাকা অগভীর পাতকুয়া। (৩) পাকা গভীর পাতকুয়া (৪) নলকূপ বা টিউব-ওয়েল। এই ছবিটিতে আরো লক্ষ্য কর যে ছবির তলার দিকে একটি ঘন মাটির স্তর দেখা যাইতেছে। এই স্তরের গুণ এই যে উহার ওপরে জল পড়িলে সে জল ঐ অশোষক স্তরকে ভেদ করিয়া নীচে নামিতে পারে না। সব দেশে সব জমিতেই এই অশোষক স্তর থাকে। মাটিতে লোকে স্নান করে, প্রস্রাব করে, ময়লা জল ঢালে; সেই সব জল মাটী চোঁয়াইয়া, কাঁচা পাতকুয়ার ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। পাকা পাতকুয়ার গায়ে ফাটল ধরিলেও সেখান দিয়া পাকা পাতকুয়ার জলকে নষ্ট করে। তাহা ছাড়া পাতকুয়া পাকাই হউক আর কাঁচাই হউক—তাহার জল মাত্রেই ঐ সকল ময়লা জল হইতে উৎপন্ন। এইজন্য এই জাতীয় পাতকুয়া মাত্রেই

৪নং চিত্র পাতকুয়ার কাঁচা গাঁথুনি

বিপজ্জনক—এ জাতীয় পাতকুয়ার জল পান করা, আর ময়লা-ধোয়া জল পান করা একই কথা। বাঙ্গালাদেশের মাটি আঁচড়াইলেই জল উঠে—বর্ষাকালে একহাত খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়। আর আমরা এমনি কুঁড়ে অদূরদর্শী ও কৃপণ যে আর খুঁড়িতে চাই না—সেই ময়লা-গোলা জলই ব্যবহার করি, আর মনে মনে খুব খুসী থাকি—যতদিন না আমাশয় কলেরা বা টাইফয়েড্ জ্বরে দু-একটা লোক মারা পড়ে!

মাটীর কত নীচে যে এই অশোষক মাটির স্তর থাকে, তাহা বলা যায় না। এইজন্য, পাতকুয়া যতই গভীর করিয়া খোঁড়া হউক না,
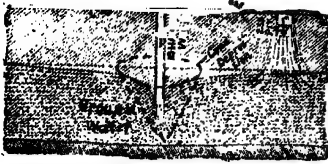
৫ নং চিত্র জলের টান

সে পাতকুয়াকে অগভীর পাতকুয়া বলে। কারণ, অশোষক স্তরের উপরের পাতকুয়াকে অগভীর পাতকুয়া বলে এবং অশোষক স্তর ভেদ
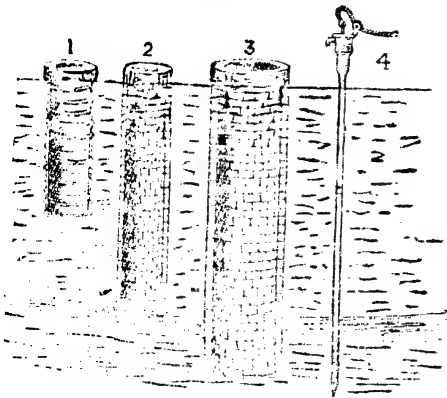
৬ নং চিত্র পাতকুয়া ও টিউব-ওয়েল

করিয়া তাহার তলা থেকে যে পাতকুয়ার জল সরবরাহ হয় তাহাকেই গভীর পাতকুয়া বলে। অশোষক স্তরের নীচের জল অতীব নির্ম্মল সেজন্য নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করা চলে। এই ছবিতে নলকূপ (৪) ও গভীর
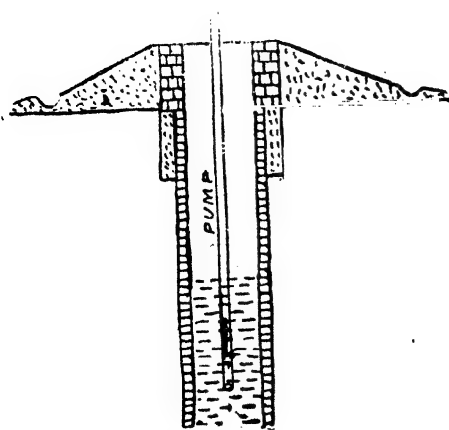
৭ নং চিত্র পাতকুয়া ও পাকা পাড়

পাতকুয়া (৩) এই দুটির জলই নিরাপদে পান করা যায়। অগভীর কাঁচা (১) ও পাকা (২) পাতকুয়ার জল বিষবৎ পরিত্যাজ্য।
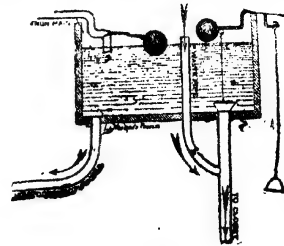
৮নং চিত্র সিষ্টার্ন

(৭ নং) পাতকুয়া কাটাইয়া তাহার কি রকম যত্ন করা উচিত এই ছবিতে তাহা দেখান হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহার চারিদিকে প্রাচীর দেওয়া—যেন কেহ ইহাতে কোনও ময়লা না ফেলে বা জলের মধ্যে না নামে। দ্বিতীয়তঃ ইহার প্রাচীর হইতে চারিদিকের দশহাত জমি পাকা করিয়া বিলাতি মাটি দিয়া ঢাল করিয়া গাঁথা—যাহাতে ঐখানে যে জল পড়িবে, সে জল পুনরায় চোঁয়াইয়া ঐ পাতকুয়ার ভিতরে আবার না যাইয়া পড়ে। গাঁথা যায়গাটীর ঢালুর শেষাংশে একটি পাকা নর্দ্দামা আছে—যদ্বারা সমস্ত জল দূরে গিয়া পড়ে। পাতকুয়া হইতে জল উঠাইবার জন্য পাম্প বা কপি-কল লাগান আছে।

সহরের বিপদ।
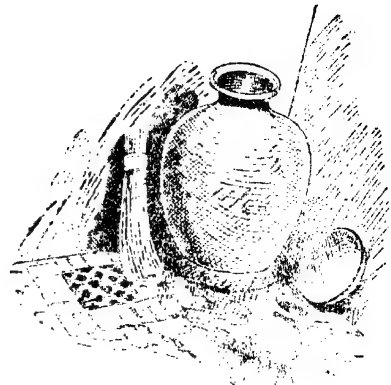
৯ নং চিত্র কলসীর জল

(৮) সহরে অনেক বাড়ীতে সিষ্টার্ণ নামক লৌহনির্ম্মিত চৌবাচ্ছা থাকে। কোনও কোনও বাড়ীতে একই সিষ্টার্ণ হইতে পায়খানার ও পানীয় জল সরবরাহ হয়—সে ব্যবস্থাটি মারাত্মক।

(নং ৯) অনেক স্কুলে বা কাহারও বাড়ীতে দেখা যায় যে ঝাঁঝরির কাছে জলের জালা রাখা হয়। জালার মুখের ঢাকনিটি ও জলের

ভাঁড়টি মেজেতে গড়াগড়ি যায়। ময়লার ঝাঁঝরি ও ঝাঁটার এত কাছে জলের জালা রাখাও যা আর ঝাঁঝরি হইতে ভাঁড় ডুবাইয়া ময়লা জল পান করিতে দেওয়াও তা!

(নং ১০) চৌবাচ্ছার ধারে মাজা ঘটি বাটি ও ন্যাতা ঝাঁঝরির কাছে রাখিয়া ঝি কায করিতেছে;—তুমি এক গ্লাস জল চাও, অমনি ঝাঁঝরির
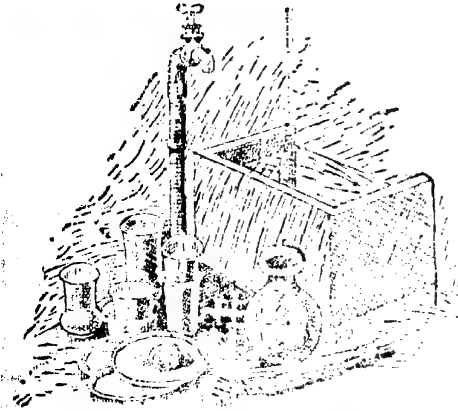
১০নং চিত্র চৌবাচ্ছা

পাশ থেকে গ্লাসটিকে তুলিয়া, ঐ সর্ব্বময়লাময়ী "ন্যাতা" খানি সেই গ্লাসে, বুলাইয়া তোমাকে কল হইতে জল আনিয়া দিবে! বল দেখি গ্লাস, ন্যাতা ও ঝি—কে বেশী ময়লা? আরো বল দেখি যে বা যাহারা সেই ভাবে চোখ বুজিয়া জল পান করে তাহাদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি কেমন!

(নং ১১) পুকুরের জলকে আমরা কত রকমে নোংরা করি তাহার দৃষ্টান্ত এই ছবিখানির মাথার ডানদিক হইতে বাম দিকে আছে, যথাক্রমে—

(ক) গোয়ালের ময়লা জলে আসিয়া পড়িতেছে।

(খ) পানার ময়লা জল " "

(গ) গাছপালার পাতা জলে পড়িয়া পচিতেছে।

(ঘ) গরুকে জলে স্নান করাইতেছে।

(ঙ) জলের ধারে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, স্নান করা, কুলকুচি করা হইতেছে।

(চ) জলের ধারে প্রস্রাব করিতেছে।

(ছ) জলে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে।

(জ) জলে হাঁস চরিতেছে।

(ঝ) জলে ধোপা কাপড় কাচিতেছে।

১১ নং চিত্র পুষ্করিণী

(ঞ) জলে নানা রকম উদ্ভিজ্জ জন্মিয়াছে।

এক কথায়—
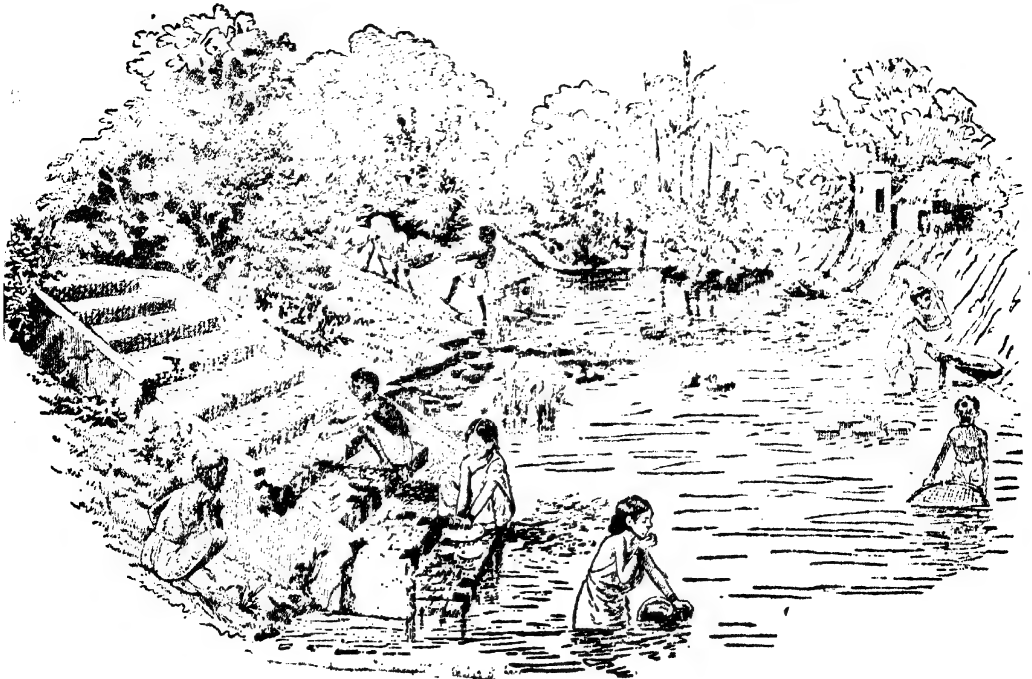
জলের নারায়ণত্ব কি চমৎকারই রক্ষিত হইতেছে!

স্বাস্থ্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০। শ্রীরমেশচন্দ্র রায়।

গান

হাটের ধুলা সয়না যে আর কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুর-সুরধুনীর ধারায় করাও আমায় স্নান।
জাগাক তারি মৃদঙ্গ রোল
রক্তে তুলুক তরঙ্গ দোল
অঙ্গ হতে ফেলুক ধুয়ে সকল অসম্মান
সব কোলাহল দিক্ ডুবায়ে তাহার কলতান।

সুন্দর হে, তোমার ফুলে গেঁথেছিলেম মালা,
সেই কথা আজ মনে করাও ভুলাও সকল জ্বালা।
তোমার গানের পদ্মবনে
আবার ডাকো নিমন্ত্রণে
তারি গোপন সুধাকণা আবার করাও পান,
তারি রেণুর তিলক লেখা আমায় কর দান॥

প্রেয়সী, চৈত্র, ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে
ডাইনে বাঁয়ে দুইহাতে:
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে
নিত্য নূতন সংঘাতে।
বাজে ফুলে বাজে কাঁটায়
আলোছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ঐ যে বাজে
দুঃখে সুখে শঙ্কাতে॥
তালে তালে সাঁঝ-সকালে
রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
শাদাকালোর দ্বন্দ্বে যে ঐ
ছন্দে নানান্ রং জাগে॥
এই তালে তোর গান বেঁধে নে,
কান্না-হাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন মরণ বাঁচন
নাচন-সভার ডঙ্কাতে॥

প্রেয়সী, চৈত্র, ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন ভারতে নগর-বিন্যাস

প্রাচীন ভারতে নগরবিন্যাস একটা বিশিষ্ট বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। বাস্তু শব্দ সংস্কৃত বস্ (বসা বা বাস করা) হইতে নিষ্পন্ন। যাহাতে দেব ও নরগণ বসেন বা বাস করেন, তাহাকে বাস্তু বলে। ধরা, হর্ম্ম্য, যান ও পর্য্যঙ্ক বাস্তুর নানা অঙ্গ। আবার হর্ম্ম্য বলিতে প্রাসাদ, মণ্ডপ, সভা, শালা, প্রপা ও রঙ্গ এই ছয় শ্রেণীবিভাগ বুঝায়। এই ধরা ও হর্ম্ম্যই নগরনির্ম্মাণশাস্ত্রের মুখ্য বিষয়। পরে বাস্তুবিদ্যা কেবল বাসগৃহনির্ম্মাণে পর্য্যবসিত হওয়াতে নগরনির্ম্মাণপদ্ধতি সাধারণতঃ শিল্পশাস্ত্রের বিষয়ীভূত হইয়া গিয়াছে।

নগরবিন্যাসপদ্ধতি এই প্রাচীন ভারতেও অতি প্রাচীন ব্রহ্মা হইতে ইহার উদ্ভব বলিয়া শিল্পশাস্ত্রে ও কিংবদন্তীতে প্রকাশ। বিশ্বকর্ম্মাই এই শাস্ত্র জগতে প্রচার করেন। বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ পুস্তকে দেখা যায়, ব্রহ্মা গর্গমুনিকে এই শাস্ত্র শিক্ষা দেন; গর্গমুনি পরাশরকে ইহা অর্পণ করেন; পরাশর বৃহদ্রথকে ইহা শোনান; বৃহদ্রথেরই শিষ্য বিশ্বকর্ম্মা তদীয় শিষ্য বসুদেবকে এবং সাধারণে ইহা জ্ঞাপন করেন। ইহার প্রচার ও ব্যবহার না থাকিলেও অদ্যাবধি দাক্ষিণাত্যের শিল্পিগণ ইহা পরিজ্ঞাত আছেন এবং পুরুষানুক্রমে এই শিল্পশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যাইতেছেন।

মনস্বী হ্যাভেল সাহেবের মতে বৈদিক যুগেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। বৈদিক যজ্ঞবেদীর উপর অঙ্কিত জ্যামিতিক চিত্র ও 'স্বস্তিক', 'সর্ব্বতোভদ্র' প্রভৃতি চিত্রের সহিত নগরের পরিকল্পনার (plan) নাম ও পরিলেখের (diagram) যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বিশেষতঃ প্রায় সকল স্থপতিই যজ্ঞের পুরোহিত বা যজ্ঞকর্ম্মে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আবার নগর বা গ্রাম প্রতিষ্ঠায় নানা যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইত। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, তিনি মনে করেন, বৈদিক যুগেও এই শাস্ত্র পরিজ্ঞাত ছিল। বেদে 'অশ্মময়ী' (প্রস্তর নির্ম্মিত), 'আয়সী' (লৌহময় 'শতভুজি') অর্থাৎ শতপ্রকার পরিবেষ্টিত, 'পৃথ্বী' (বৃহৎ) ও 'উর্ব্বী' (আয়ত) পুরীর ভুরি ভুরি উল্লেখ আছে। গ্রাম এবং মহাগ্রামের বর্ণনাও বেদে পাওয়া যায়। যাঁহারা লৌহময় দুর্গ, শতস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ কিংবা মহাগ্রাম রচনা করিতে পারিয়া ছিলেন, তাঁহারা নগরবিন্যাসের কিছু কিছু জানিতেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্র খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর রচনা, তাহাতে নগর বিন্যাসের যেরূপ পরিপাটী বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতেও এই শাস্ত্রের অতিপ্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

পথ, বীথী, রথ্যা, উপরথ্যা, পৌরজনের বাসস্থান (সর্ব্বজনগৃহবাস), রাজপ্রাসাদ, ধর্ম্মাধিকরণ হাটবাজার (আপণ) দেবালয়, প্রাচীর, পরিখা, তোরণ, প্রপা, আরাম, পুষ্করিণী, এমন কি বারবনিতার বাসস্থান ইত্যাদির পরিস্থাপনা ও পরিরচনা লইয়া নগরনির্ম্মাণ পদ্ধতি (১)

ভূপরীক্ষা (২) স্থান নির্ব্বাচন (ভূমিসংগ্রহ) (৩) দিক্‌নির্ণয়, (দিকপরি চ্ছেদ), (৪) নির্ব্বাচিত ভূমির পরিভাগ) পদবিন্যাস, (৫) বাস্তুদেবতার অর্চ্চনা (বলিকর্ম্মবিধান), (৬) গ্রাম বিন্যাস বা নগর বিন্যাস, (৭) হর্ম্ম্য গৃহ ও তাহার তলাদি নির্ণয় (ভূমি বিধান) (৮) নগরদ্বার নির্ম্মাণ (গোপুর বিধান), (৯) দেবালয় নির্ম্মাণ (মণ্ডপ বিধান) এবং (১০) রাজপ্রসাদ নির্ম্মাণ (রাজবেশ্ম বিধান,) নগর নির্ম্মাণ শাস্ত্রের এই দশ অঙ্গ। হরি-বংশে আছে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতী নির্ম্মাণের জন্য স্থপতিগণকে বলিতেছেন—ইহাতে এই এই চিহ্ন ও আয়তন করিতে হইবে। বেশ্মবাস্তু গ্রহণ কর, ত্রিকচত্বর কল্পনা কর। রাজমার্গাদির পরিমাণ কর, প্রাসাদাদির গতি (orientation) নির্ণয় কর।

নদী ও সমুদ্রতীর, হ্রদ ও সরোবরতীর অথবা শৈলশিখরই নগরস্থাপনের পক্ষে প্রশস্ত স্থান। নানা বৃক্ষলতাকীর্ণ, পশুপক্ষিগণাবৃত, সুবহূদকধান্য, তৃণকাষ্ঠসুখপূর্ণ, আসিন্ধুনৌগমাকুল পর্ব্বতের অনতিদূরে, সুরম্যসমভূদেশে রাজধানী" প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শুক্রাচার্য্যের উপদেশ। অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে জীবনধারণের উপযোগী সমস্ত দ্রব্য যেখানে পাওয়া যায়, নদীপথে, সমুদ্র-পথে যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্য করিবার সুবিধা যেখানে আছে, খনিজদ্রব্যেরও অভাব নাই, তেমন স্থানে নগর স্থাপন বিধেয়। আজকাল যেমন বৃক্ষাদির উচ্ছেদ এবং পুষ্করিণী ভরাট করিয়া অট্টালিকার উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা বাতিক হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহা ছিল না। বৃক্ষাদির যথাযথ সমাবেশ নগরাদিতে করিতে হইত। স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহার উপযোগিতা কেবল সম্প্রতি উপলব্ধি হইতেছে। ক্ষীরীবৃক্ষ, খদির, কদম্ব, নিম্ব, চম্পক, পুন্নাগ, আমলক, পটল, সপ্তপর্ণ, নিশুণ্ডী, পিণ্ডিত, সহকার প্রভৃতি বৃক্ষরাজির যথারীতি রোপণ করিতে হইত।

মানসার এবং ময়মত শিল্পশাস্ত্রের মতে ভূমির বর্ণ, গন্ধ, রস, আকার, দিক, শব্দ, স্পর্শ পরীক্ষা করিয়া তাহার নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ভোজের মতে স্থানটার মধ্যভাগ উন্নত (মধ্যস্থানসমুন্নত) হওয়া চাই। কিন্তু ময়মতে কচ্ছপোন্নত ভূমি বর্জ্জ্য বলিয়া লেখা আছে। উত্তর কিংবা পূর্ব্বদিকে ঢালু (ঐন্দ্রোত্তরপ্লাব) হইয়া গেলে সেই স্থান শুভ—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

ভূমি নির্ব্বাচন শেষ হইলে, দেববলি প্রদান, স্বস্তিবাগ্‌ঘোষণ, হা কর্ষণ, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি দ্বারা স্থপতিকে ভূমি পবিত্র করিতে হয়। তারপর নগরের মাণ নির্ণয় করিতে হইবে।

ইহার পর স্থপতির কাজ প্রাকার ও পরিখা রচনা। প্রাচীন নগর মাত্রেই পরিখা ও প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। কারণ তখন দেশময় শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না। বহু রাজা বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের পরস্পর যুদ্ধ বিবাদ অনবরত চলিত। কাজেই প্রত্যেক নগরকে দুর্গের মত সুরক্ষিত করিতে হইবে।

স্থানের প্রয়োজনানুসারে (ভূমিবশাৎ) পরিখার সংখ্যা এক হইতে আট পর্য্যন্ত ছিল। কৌটিল্যের মতে চারি হাত অন্তর অন্তর তিনটী পরিখাই যথেষ্ট। পরিখার পার্শ্বদেশ ইষ্টকনির্ম্মিত হওয়া চাই।

পরিখার বিস্তৃতি ও গভীরতার পরিমাণও শিল্পশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। পরিখার জল 'স্থির' বা 'অস্থির' দুই রকমেরই থাকিত। কিন্তু সাধারণতঃ পরিখায় অস্থির বা প্রবাহী জলেরই বন্দোবস্ত থাকিত। কৌটিল্যের মতে, যাহাতে সর্ব্বদা জলস্রোত প্রবাহিত থাকে, কিংবা নিকটস্থ অন্য কোন জলাশয় হইতে জলাগমে পরিখা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে, তাহার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। এই জন্য নদীস্রোত যাহাতে পরিখায় আসিয়া পড়ে, সেজন্য পরিখার সহিত নদীর সংযোগ করা উচিত।

যেস্থলে নদীর সহিত সংযোগ হইয়াছে, সেইস্থলে মুখা পরিখা-দ্বার নির্ম্মিত করিবে তাহাতে এমন যন্ত্র স্থাপন করিবে, যাহাতে প্রয়োজন হইলে সমগ্র পুরী পরিপ্লাবিত করা যাইতে পারে।

নগরের জল নির্গম প্রণালীর সহিত এই পরিখা সংযুক্ত থাকিত—যাহাতে সহরের জল আসিয়া তাহাতে পড়িতে পারে, এবং নদীস্রোতে মলাবর্জ্জনাদি ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে।

পরিখার বাহিরে ঘন জঙ্গল রোপণ করিয়া স্থানটী আরও দুর্গম করা হইত। নগরের রক্ষাবিধান ছাড়াও পরিখার অন্য উপযোগিতা ছিল। খাতের মাটী দিয়া নিম্নস্থান বা জলাভূমিগুলি ভরাট করিয়া নগরকে সমতল, অথবা 'ঐন্দ্রোত্তরপ্লব' অথবা 'মধ্যস্থানসমুন্নত' করা হইত। সেই মাটী দিয়া আবার সহরের চারিধারে চয় বা বপ্র (rampart, কাঁচা মাটার মোটা বাঁধ তোলা হইত। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে অনেকেই এই প্রাচীরাকার মৃৎস্তূপ দেখিয়া থাকিবেন। এই বপ্রের উপরেই ইষ্টক-প্রাকার (parapet, wall) নির্ম্মিত হইত। প্রাকারের সংখ্যাও এক কিংবা বহু ছিল। প্রাচীন পাটলীপুত্রে তিনটী কাষ্ঠময় প্রাচীর ছিল বলিয়া শোনা যায়। এই প্রাচীরের উপর আবার বহু সাল বা অট্টাল (turret বা tower) নির্ম্মিত হইত।

প্রত্যেক নগরের অনেক দ্বার বা তোরণ ছিল। তাহার উপর প্রাগুক্ত অট্টালিকার ন্যায় নানাকারুকার্য্যখচিত গৃহ নির্ম্মাণ করা হইত। তাহাকে গোপুর বলে। এই গোপুর শুধু নগরের দ্বারে নয়, দেবমন্দির অথবা রাজা বা ধনীর গৃহদ্বারেও নির্ম্মিত হইত। যাঁহারা বৃন্দাবন গিয়াছেন, তাঁহারা শেঠের রাধাবল্লভ মন্দিরে এই অপূর্ব্বসুন্দর গোপুর দেখিয়া থাকিবেন। শিল্পশাস্ত্রে ইহার বিশদ বর্ণনা ও নির্ম্মাণপ্রণালী লিখিত আছে। নগরের উত্তর দ্বারকে ব্রাহ্ম (ব্রহ্মাকে উৎসৃষ্ট) দ্বার পূর্ব্বদ্বারকে ঐন্দ্র (ইন্দ্র বা উদীয়মান সূর্য্যকে উৎসৃষ্ট) দ্বার, পশ্চিম দ্বারকে সৈনাপত্য এবং দক্ষিণ দ্বারকে যাম্য (যমাধিষ্ঠিত) দ্বার বলা হয়।

নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০। শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত।

কদভ্যাসের পরিণাম

পয়সা খরচ করিয়া ও সখের দাস হইয়া কেমন দুরবস্থা হয় তাহা দেখুন।—

১। ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ সুরূপা ও পূর্ণাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী যুবতী। (বাম দিকে)

২। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিনীদের সংসর্গ-দোষে ইনি দিবারাত্র পান ও জরদা-দোক্তা খাওয়া সুরু করিয়াছেন, সৌখীন অভ্যাস করিয়া সখের দাসী সাজিয়াছেন। (মধ্যস্থলে)

৩। দশ বৎসর এই কদভ্যাসের ফলে যুবতীটির কি অবস্থা হইয়াছে দেখুন। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে বৃদ্ধা সাজিয়া নিজ নিবু দ্ধিতার পরিচয় দিতেছেন। দাঁতগুলির দুই একটি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, কপাল ও ওষ্ঠপার্শ্ব সঙ্কুচিত রেখান্বিত হইয়াছে, মুখের সে অনাবিল সৌন্দর্য্য-সুষমাটুকু কোথায় মুখ লুকাইয়াছে—কে জানে! (ডান দিকে]
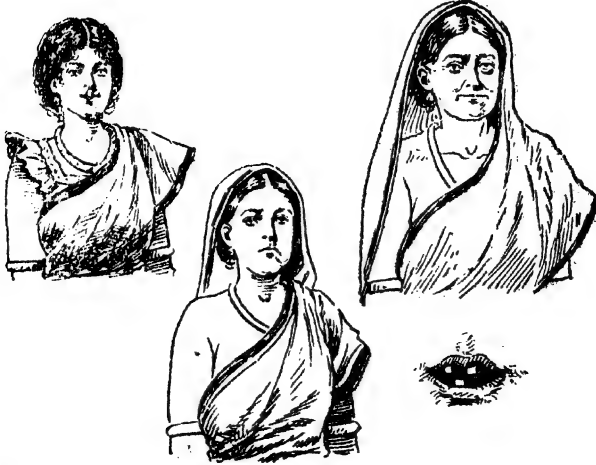
৪। তারপর একবার দাঁতগুলির দুরবস্থা দেখুন। ঠোঁটদুটির এক এক স্থানে সাদা, এক এক স্থানে কালো হইয়াছে, অধিকাংশ দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, যে ৩।৪টি অবশিষ্ট আছে, সেগুলি ক্ষয়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ফাঁক ফাঁক হইয়া গিয়াছে, দন্তগুলির সম্মুখ ও পশ্চাতের দিক "কলঙ্ক-রেখা" পড়িয়া, "দশন মুকুতা পাঁতির" সে উজ্জ্বল মহিমা চিরতরে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পান-দোক্তার জন্ত প্রতি মাসে ৫৲ হইতে ১৫৲ খরচ পড়ে। যাঁহাদের স্বামী সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাসে ৫০৲।৬০৲ বা বড় জোর ১০০৲।১৫০৲ টাকা রোজগার করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই পান দোক্তার খরচটা নিতান্ত বাজে খরচ বলিয়া কমাইয়া দিলে ভাল হয় না কি? এই ১০৲।১৫৲ টাকায় সংসারের অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের সঙ্কুলান করা যায়; যেমন শিশুর একপোয়ার জায়গায় একসের দুধের বন্দোবস্ত, কর্ত্তার পাতে একটু ঘি দিবার যোগাড়, আর এক প্রস্থ বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর প্রভৃতি, বা মাসে মাসে টাকা জমাইয়া একটা সেলাইয়ের কল কিনিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; ইত্যাদি—

আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন যে অতিরিক্ত তাম্বুল ভক্ষণকারীকে শ্রবণশক্তির অল্পতা, বর্ণের মলিনতা, শোষ, পিত্ত, বাত, কেশ-দন্ত-অগ্নি-ও দেহের বল হ্রাস, রক্ত প্রকোপ জন্ত বিবিধ রোগ আক্রমণ করিতে পারে (ভাব-প্রকাশ)। দুইবার আহারের পর এক একটি পান খাওয়া ছাড়া অন্য সময় কদাচ পান খাইবে না। তবে বমনের পর, যুদ্ধক্ষেত্রে ও পণ্ডিতপূর্ণ রাজসভায় তাম্বুল ভোজন আমাদের শাস্ত্রে বিধান দেওয়া আছে। ইহা ছাড়া পান খাওয়া অন্ত সময় কোনক্রমে বিধেয় নহে। মুখের দুর্গন্ধ-নাশক ও ঈষৎ রুচিকারক ব্যতীত পানের অন্ত কোন শরীর-পোষক গুণ নাই। পরন্তু ইহা কামশক্তি ও রক্তপিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ বীর্য্য, মুখ প্রসেক, (বারবার) থুথু ফেলিবার ইচ্ছা), অগ্নিনাশক গুরুপাক ক্লেদকর ও জিহ্বার জড়তা আনয়ন করে। পান খাইয়া ছিবড়া ফেলিয়া দেওয়া ভাল এবং রীতিমত মুখ-কুল্লী ও জিহ্বা পরিষ্কার করা উচিত।

দোক্তা ও জর্দ্দা, পান অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর; কারণ ইহা অল্প বিস্তর মাদকতা আনে, ক্ষুধা নষ্ট করে, হৃদি-দৌর্ব্বল্য আনয়ন করে, কোষ্ঠকাঠিন্য শিরঘূর্ণণ অজীর্ণ প্রভৃতির বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করে।

পয়সা খরচ করিয়া ও সখের দাস হইয়া কেমন দুরাবস্থা হয় তাহা দেখুন।—

জর্দ্দা ও সুর্ত্তীতে প্রায়ই বিলাতী সুগন্ধি মাখাইয়া দেওয়া হয়, ও উচ্চশ্রেণীর জর্দ্দার 'তবক' (সোনালী বা রূপালী পাত) দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হয় ; উপরিউক্ত দুইটি জিনিষই শরীরের পক্ষে নিতান্ত অপকারী।

অতএব স্বাস্থ্যনীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়া বিবেচনা করি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়,—মেয়ে পুরুষ সকলেরই—

অতিরিক্ত পান খাওয়া ও দোক্তা জর্দ্দা স্পর্শ করা আ উচিত নয়।

স্বাস্থ্য-সমাচার, বৈশাখ, ১৩৩০।

কলের কুলি

লোহার কারখানার আগুনের থাপ্‌রা থেকে টিফিনের ছুটী পেয়ে বেহারী যখন বাইরে এল, তখন বেলা বারোটা।

গ্রীষ্মের দুপুর—বাতাসে যেন আগুনের হল্‌কা! প্রকৃতির শ্যামল শ্রীতে একটা ঝল্‌সানো ভাব! চারিপাশের এই পীড়াদায়ক দৃশ্যের মাঝ দিয়ে বেহারী তাদের বস্তিতে ছুট্‌ল, এক ঘণ্টার মধ্যে খাওয়া শেষ করে কাজে ফির্‌তে হবে।

তার ঘরের সামনে এসে যখন সে দাঁড়াল, তখন রৌদ্রে তার মাথার ভিতর ঝাঁ ঝাঁ কচ্ছে, শরীরের মধ্যে একটা ক্লান্তি, অবসাদ, বেদনা ও বুভুক্ষার তীব্র কম্পন চলেছে। গায়ের কোটটা ছুড়ে ফেলে সে তার ভাঙা তক্তাপোষের উপর শুয়ে পড়ল।

ঘরের মাঝে জিনিস-পত্র অগোছালো ভাবে ছড়ানো। এক কোণে একটা টোল-খাওয়া পিতলের ঘটী; অন্য কোণে একটা ভাঙা থালা। মাটীর কলসীটে ঘরে গড়াচ্ছে। তক্তাপোষের তলায় একটা ছোট থলির মধ্যে চাল, একটা ভাঁড়ে খানিকটে নুন। কিছু দূরে এক জায়গায় একটা মাটীর উনানের পাশে কতকগুলো কয়লা জড়ো করা পড়ে আছে।

জিনিষপত্র গুছিয়ে খাবার তৈরি করার চেষ্টাও সে করলে না, নিশ্চেষ্ট জড়ের মত শুয়ে পড়ে রইল।

সে ভাবছিল তার জীবনের কথা,—কেন এই কারখানার জীবন আর তার ভাল লাগছে না! এই আবেষ্টনের মধ্যেই সে মানুষ হয়েছে। এই লোহার রেল, বিম, সশব্দ এঞ্জিন, মেসিন ক্রেন,—এরাই ত ছেলে-বেলা থেকে তার সাথী! তবে কেন সে তাদের সঙ্গে নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি! এদের মধ্যে থেকেও কেন তার অন্তরাত্মা লোহার হয়ে যায়নি? মাঝে মাঝে ত এই হৃদয়টা অশান্ত বিদ্রোহে সব ভেঙে-চুরে ছুটে পালাতে চায়। বারো বছর বয়সে তার বাপ-মা যখন মারা যা তখন ত তার মনের মধ্যে বিশেষ কোনো আঘাত সে প নি। তবে কেন ক'দিনের পালিতা লছমী—! তার জন্যে

রাগ করে সে তার চিন্তা ছেড়ে দেবার চেষ্টা করে কিন্তু মুহূর্ত্ত না ফির্‌তে আবার সেই চিন্তাই তার মন ছেয়ে ফেল্‌লে।

লছমীকে নিরাশ্রয় দেখে আজ চার বছর সে তা ঘরে এনে পালন করেছে! তার সময়ের কতখানি, ত উপার্জ্জনের কতখানি, তার বুকের স্নেহভাণ্ডারের কতখা সে উজাড় করেছে, শুধু এই কুড়ানো মেয়েটার জন্যে!

তার চোখের সামনে; সেই সব ঘটনার ছবির ফিল্ একে-একে ফুটে উঠতে লাগল বছর বারোর মেয়ে ক্ষুধা-কাতর মুখে কারখানা ফেরত শ্রমিকদের কাছে খাবা ভিক্ষা করেছে কত দিন। তাকে দেখে বেহারীর প্রাণে মধ্যে একটা স্নেহের বন্যা বয়ে গেল। এক অজ্ঞাত স্নেহে আবেগে সে লছমীকে বুকে তুলে নিলে।

যখন সে কারখানা থেকে ফিরে আসত তখন তা ঘরের দ্বারে লছমী দুই চোখে কি ব্যগ্র প্রতীক্ষা ভ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকৃত তার পথের পানে চেয়ে। কত, কত দূ থেকে এ দৃশ্য দেখে তার প্রাণ পুলকে স্পন্দিত হয়ে উঠত।

এই লছমীকে সে এত ভালবাসত যে আর-কে তাকে ভালবাসবে এটা সে সহ্য কর্ত্তে পারতো না! লছমীকে তার আর সব সহকর্ম্মীরা যদি কিছু উপহার দিত, ত তাতে সে খুসী হতে পারতো না।

লছমীর দু একজন বন্ধু জুটেছিল কিন্তু তাদেরও সে সুচক্ষে দেখত না। পাছে লছমীর মনে কষ্ট হয় এজন্য তাদের সে কিছু বলতে পারতো না। লছমীকে আশ্রয় করে তার এই কারখানা-জীবনের মরুর মাঝে যে স্নেহলতাটি মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল, তার ভয় হতো কোন্‌দিন এই লছমীর বন্ধুর দল একটা কাল-বৈশাখীর তীব্র ঝাপটে সে লতাটিকে ছিন্নভিন্ন করে তার হৃদয়টাকে বালু মরুর অনন্ত হাহাকারে পরিণত করে যাবে! অবশেষে একদিন এই ভাবের আতিশয্যে সে লছমীর বন্ধুজনকে দু'কথা শুনিয়ে দিলে।

তার দুদিন পরে কারখানা থেকে ফিরে এসে দেখলে লছমী তার ঘরে নেই। চোখ চেয়ে দেখ্‌লে ঘরের কোণে দড়ির আনলায় তার সাড়ীখানাও আর দুল্‌ছে না। প্রথমটা সে জুতাজামা-শুদ্ধ তার তক্তাপোষের উপর গুম্‌ হয়ে বসে রইল। অল্পক্ষণ পরে ব্যাপারটাকে বেশ সহজ ভাবে গ্রহণ করবার ভঙ্গীতে চাল-ডাল গুছিয়ে রান্না করতে বসল। কিন্তু বস্‌তে না বস্‌তে তার বিরক্ত এল। ভাতের হাঁড়ীটা উনানের উপর চড়িয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল। আবার একমিনিট পরেই বিছানা থেকে উঠে, হাঁড়াটাকে উনান থেকে দুম্‌ করে নামাতেই সেটা ফেসে গেল। তখন রাগ করে জিনিষ পত্র ছুড়ে ফেলে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।......

... ...

উত্তেজনার বশে উঠে দাঁড়াতেই তার সেই চিরপুরাতন, পরিচিত কলের কর্কশ ভোঁ বেজে উঠল।

তার যেন চমক ভেঙে গেল। মুহূর্ত্তে সে তার পরিত্যক্ত কোটটা তুলে গায়ে চড়িয়ে নিলে। তার পর একবার ঘরের চার পাশে চেয়ে, মাটীর কলসীতে জল আছে কি না দেখে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল, তার সেই চির-পুরাতন নির্ম্মম হৃদয়হীন বন্ধুর আহ্বানে! রৌদ্র, অনাহার ও উত্তেজনার ঝোঁকে ছুটে আসার ফলে সে কারখানার দরজার সাম্‌নে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

ম্যানেজার সাহেব বেয়ারাকে ডেকে তাকে হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে বল্‌লে।

কারখানার শ্রমিকের দল শুধু একবার উঁকি মেরে চলে গেল। কারখানার বজ্র-কঠোর কর্ম্ম শৃঙ্খলে বন্দী শ্রমিক তারা, সহকর্ম্মীর জন্য একবিন্দু অশ্রু ফেলার অবসর তখন তাদের ছিল না!

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

মিথ্যা আজ আর নয়

মিথ্যা আমি বল্‌ব না মা—
আজ্‌কে মিছে নয়।
এই যে আলো উঠ্‌ল ভেসে
বিশ্ব-ভুবন-ময়॥
এই আলোকে নয়ন আমার
তোমার নয়ন দেখলে আবার—
মন-ভুলানো সেই হাসি, যার
কিছুতে নাই ভয়।
মিথ্যা আমি বল্‌ব না মা—আজ্‌কে মিছে নয়॥

শিউলি ফুলের বক্ষ' পরে
আজ্‌কে সকাল হতে,
কোন-স্বপনের গন্ধ ভাসে
কোন-স্মরণের রথে!
কোন্‌ অতীতের মুগ্ধ কবি
আঁক্‌ছে বসে তোমার ছবি,
দেখ্‌তে আমি পাচ্ছি সবই
আর কি মিছে রয়!
মিথ্যা কি আজ কইতে পারি? আজকে মিছে নয়॥

আজকে মনে হচ্ছে, চেয়ে
দিগন্তরের পানে—
ওই যেখানে কালোর রেখা
মিশ্‌ছে সোনার প্রাণে,—
ওই যেখানে নদীর জলে
কইছে কথা কতই ছলে,
ওই যেখানে পদ্ম-দলে
অবাক্‌ চেয়ে রয়!
তোমার কথা কইছে ওরা—অন্য কারো নয়॥

মিথ্যা আমি কইব না মা—
আজ্‌কে মিছে নয়।
বুক ছাপিয়ে সত্য এল,
গাইব তারই জয়॥
ওই আকাশের সুনীল মেঘে
তোমার চরণ-প্রসাদ মেগে
যেই কথাটি উঠ্‌ছে জেগে
আমার পরাণ-ময়॥
সেই কথাটি বল্‌ব মাগো—মিথ্যা আজ আর নয়॥

আজকে আমার আস্‌ছে মনে
লক্ষ যুগের বাণী।
মনের হিসাব-খাতায় লেখা
লক্ষ লাভ, আর হানি॥
কার কাছে কি পাব ব'লে
লক্ষ যোজন গেলাম চ'লে
শেষ কালেতে নয়ন-জলে
বিশ্ব আঁধার-ময়॥
তোর কাছে মা সত্যি কব, মিথ্যা আজ আর নয়॥

আজকে মনে আস্‌ছে চেয়ে
তেপান্তরের মাঠে।
বিশ্ব-জোড়া সকল লোকের
সন্ধ্যা যেথায় কাটে॥
সেইখানে তোর পায়ের কাছে—
যুগে-যুগের আঁধার-মাঝে
আমার সকল কর্ম্ম কাজে
বাঁধন হল ক্ষয়॥
তোর কাছে মা সত্যি কব, নাই ত কোনই ভয়॥

কাল্‌কে রাতে আস্‌ল যারা
মেঘের মাথায় চড়ে'
বজ্র-মেলার মহোৎসবে
মরণ-মন্ত্র পড়ে'॥
দেখে তাদের কুটীল ভুরু,
হৃদয় আমার দুরু-দুরু
হঠাৎ কেন হ'ল সুরু,
অজ্ঞাত কোন্‌ ভয়॥
তখন আমি পাই নি যে মা তোমার পরিচয়॥

তাই তে বুঝি সকালে আজ
হঠাৎ তুমি এসে,
অন্তরে মোর অভয় দিলে
অঙ্গনে মোর হেসে॥
তাইকে বুঝি ধীরে ধীরে
অতীত কথা ভুললে ফিরে,
তাইত বুঝি নয়ন-নীরে
হঠাৎ পরিচয়॥
সত্যি ক'রে বল্‌ব মাগো—আজ্‌কে মিছে নয়॥

একটি কথা বল্‌ মা আমায়
অন্য কথা নয়—
এই যে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া
এই যে পরিচয়—
এর মাঝে মা আমার তরে
কভু কি তোর অশ্রু ঝরে?
মন কি কভু কেমন করে
হারিয়ে যাবার ভয়॥
সত্যি যদি কিছু থাকে এইটে যেন হয়॥

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

রাজপুতানার কথা ও উপকথা

(বিদুষী রাজকুমারী ও সাধু কবি বিহারীদাস)

শাহ আলম বাদশাহের সময় যদুবংশীয় মহারাজার এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। মহারাজের রাজ্য তত বৃহৎ নহে বলিয়া তিনি রাজকুমারীরর বিবাহ স্বরাজ্যের কোন বড় সর্দারের সহিত দিতে ইচ্ছুক; কিন্তু মহারাণীর ইচ্ছা যে রাজকুমারী কোন বড় রাজার ঘরে পড়েন। রাজকুমারী যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী, আবার তেমনি বিদুষী। মহারাণী রাজাকে কোনপ্রকারে স্বীয় মতে আনিতে না পারিয়া কি করা উচিত, গোপনে প্রধান মন্ত্রীর সহিত তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

তখন যাদবপতির প্রধান মন্ত্রী একজন চৌবে ব্রাহ্মণ। চৌবেরা যেমন আহারে তৎপর সেইরূপ বাক্‌পটুতায় অদ্বিতীয়। মহারাণী চৌবেকে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে বলিলেন, যাহাতে রাজকুমারীর বিবাহ কাছওয়ার মহারাজের সহিত হয়; এবং তাঁহাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিবার লোভও দেখাইলেন। চৌবে পুরস্কারের লোভে বিবাহের সম্বন্ধ করিবার জন্য নিজ অনুচরকে কাছওয়ার রাজ্যে পাঠাইলেন। অনেক দিন পড়িয়া থাকিয়া এবং অনেক কথা-মাজার পর বিবাহ স্থির হইল। এরূপ কিম্বদন্তী যে কাছওয়ার-মহারাজকে প্রবঞ্চনা করিয়া বিবাহে সম্মত করা হয়। তাঁহাকে এরূপ বলা হয়, যে যাদব রাজ্যের আয় প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা। মহারাজা বড় ঘর মনে করিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হন। তখনকার মহারাজদের কি চমৎকার অনুসন্ধিৎসা! বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। যাদব-মহারাজা যখন দেখিলেন যে মহারাণী নিজ বুদ্ধি খাটাইয়া এমন উচ্চ ঘরে বিবাহের জোগাড় করিয়াছেন, তখন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রাজকুমারীর বিবাহ মহোৎসাহে ও সমুল্লাসে দিতে প্রস্তুত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে বর আসিলেন। যখন যদুপতির রাজ্যের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে। যাদব-রাজ্যের আয় ৫।৭ লক্ষের অধিক নহে। তখন আর কি করিবেন, অগত্যা বিবাহ করিতে হইল। অন্দর-মহলে কন্যাদান। সেখানে দুই মহারাজা পাত্রী ও মহারাণী ব্যতীত ও এক পুরোহিত দুই চোখে কাপড় বাঁধা। নচেৎ বেপর্দ্দা হইবে! যাহা হউক কন্যা সম্প্রদান আরম্ভ হইল। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিয়া কন্যা দানের দক্ষিণা যাদবপতিকে কাছওয়ার-পতির হস্তে সমর্পণ করিতে বলিলেন। যাদবপতি নিজ জামাতাকে দক্ষিণা দিতে গেলে তিনি স্বহস্তে দক্ষিণা না লইয়া তাম্রকুণ্ডে ফেলিয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য স্বহস্তে দক্ষিণা না নিলে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে। রাজকুমারীকে একটা বাঁদীর মত রাখিলেও চলিবে। যাদবপতি দুই তিনবার জামতাকে স্বহস্তে দক্ষিণা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি গ্রহণ না করায় উদ্দেশ্য বুঝিয়া কটিস্থিত "কটার" নামক অস্ত্র বাহির করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "দেখ্ তুই জামাতা বলিতে বাঁচিয়া পারিবি না। যদি দক্ষিণা স্বহস্তে না লস্ তাহা হইলে এইক্ষণে তোর উদরমধ্যে "কটার" প্রবেশ করাইয়া দিয়া তোকে প্রাণে মারিব আর সেই সঙ্গে তোর নবোঢ়া স্ত্রী ও তোর শাশুড়ীকে মারিয়া নিজেও আত্মহত্যা করিব" শ্বশুরের ধমকে কাছওয়ার-রাজের চক্ষু ফুটিল। তিনি আর অধিক জেদ না করিয়া শিষ্ট বালকটির মত স্বহস্তে দান গ্রহণ করিলেন। সম্প্রদান-কার্য্য শেষ হইয়া গেল। রাজপুতদের এই প্রথা যে-রাত্রে বিবাহ সেই রাত্রিতেই নব বধূকে একবার শ্বশুরালয়ে আনিয়া পুনরায় পিত্রালয়ে পাঠান হয়। কিন্তু কাছওয়ার-রাজ শ্বশুরকে অপমান করিবার জন্য নবোঢ়াকে নিজ শিবিরে আনিলেন না। শিবিরে আসিয়াই হুকুম দিলেন যে কাছওয়ার রাজ্য হইতে দুই দিবসের মধ্যে সৈন্য-সামন্ত আসিয়া যেন হাজির হয়। শ্বশুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িতে হইবে।

যদুপতি এই সংবাদ পাইয়া কিছু বিচলিত-চিত্ত হইলেন। ভাবিলেন, বিবাহ না হইয়া ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ বুঝি হয়! পরদিন প্রাতে পঞ্চম-বর্ষীয় রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া তিনি জামাতার শিবিরে গিয়া উপস্থিত। সেখানে কাছওয়ার রাজা শ্বশুরের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া নিজ লোক ও প্রহরীদের বলিয়া দিলেন যে যদুপতিকে যেন সকলে বলিয়া দেয় মহারাজা তখনও ঘুমাইতেছেন, কাহার সাধ্য তাঁহাকে জাগায়! ওই বলিয়া যদুপতিকে যেন ফিরাইয়া দেওয়া হয়। সকলকে এই কথা শিখাইয়া মহারাজ চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। যদুপতি প্রথমে নিজ আগমন-বার্ত্তা জামাতার নিকট পাঠাইতে বলায় কেহ সম্মত হইল না। সকলেরই এক কথা—মহারাজ ঘুমাইতেছেন, কাহারও জাগাইবার হুকুম নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া তখন তিনি স্বয়ং নিজ বালকের হস্ত ধরিয়া সটান মহারাজের শিবিরে প্রবেশ করিতে যাইলেন। প্রহরীরা বাধা দিলে বলিলেন, তোমাদের মহারাজা আমার জামাতা। আমরা শ্বশুর-জামাইয়ে বোঝাপড়া করিব। এই বলিয়া তিনি শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখেন, মহারাজ আপাদমস্তক এক চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছেন। যদুপতি স্বহস্তে মুখের চাদর খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "আর কপট নিদ্রায় পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। বেলা হইয়াছে, এখন ওঠে।" জামাতা বাবাজীর আর চতুরতা খাটিল না। অগত্যা উঠিয়া শ্বশুরকে গদিতে বসাইলেন। শ্বশুর তখন নিজ পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে আনিয়া বলিলেন—"দেখ, আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। দুই দিন বেশী বাঁচিলেও কোন লাভ নাই, আর দুইদিন কম বাঁচিলেও কোন ক্ষতি নাই। এই তোমার শ্যালক, তুমি ইহার ভগিনীপতি। তোমার কোলে ইহাকে দিয়া চলিলাম। ইহার ভালমন্দ তোমার হস্তে। যাহা ভাল বুঝিবে করিবে"—এই বলিয়া যদুপতি রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন।

কাছওয়ার-রাজ এখন আর কি করেন, তখনই সৈন্য আনাইবার যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা রদ করিলেন। রাজকুমারীকে স্বীয় শিবিরে আনাইয়া লোক-লস্কর সমভি-ব্যবহারে অতি সমারোহের সহিত নূতন মহারাণীকে সঙ্গে লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই সকল দেখিয়া রাজকুমারীর মাতার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, রাজপুত কন্যার সপত্নীর অভাব নাই। তাহার উপর এখানে শ্বশুর-জামাইয়ে এক প্রকার বিবাদই হইয়া গেল। হয়তো তাঁহার কন্যাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। তজ্জন্য কন্যা-বিদায়ের পূর্ব্বে চৌবেজীকে ডাকাইয়া মহারাণী বলিলেন, "দেখ, বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত তুমিই করিয়াছ, এখন যাহাতে জামাতার কন্যার প্রতি সুদৃষ্টি হয় ও থাকে, তাহার ব্যবস্থা কর।" চৌবেজী এক মাদুলি আনিয়া এই বলিয়া রাজকুমারীকে পরাইয়া দিলেন যে ইহাতে বশীকরণ-মন্ত্র লেখা আছে। রাজা তোমার কন্যার দাস হইয়া থাকিবে। বাস্তবিক সেই মাদুলিতে এই কবিতাটি লেখা ছিল ;—

যন্ত্র মন্ত্র আওর টোট্‌কা ইন্ মত শিখো কোই,
পিয় কহে সো কিজিয়ো আপহি বশ মে হোই।

তাৎপর্য্য এই যে মন্ত্রাদি অর্থাৎ বশীকরণ ইত্যাদি ক্রিয়ায় স্বামী বশীভূত হয় না। যদি প্রিয়কে বশীভূত করিতে চাও তবে স্বামীর বশবর্ত্তিনী হইয়া থাক, অর্থাৎ সতত তাঁহার অধীন ও বাধ্য থাকিলে ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার মনো-রঞ্জনে তৎপর থাকিলে, তিনি আপনিই বশীভূত হইবেন।

খ

রাজকুমারী এমন কাছওয়ার রাজ্যে। মহারাজ তাঁহার প্রতি খুব অনুরক্ত। বশীকরণ মন্ত্রটি ও যন্ত্রটি বেশ কার্য্য দেখাইতেছে। অথবা তল্লিখিত উপদেশ দ্বারা রাজকুমারী মহারাজকে বশ করিয়াছেন। যাহা হউক দুই-চারি মাস এইরূপে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার পর কাছওয়ার-রাজ বাদশাহের নিকট দিল্লী যাত্রা করিলেন। দুই মাস, চারিমাস, ছয়মাস কাটিয়া গেল, কাছওয়ার-রাজ দিল্লীতেই অবস্থান করিতেছেন, রাজকুমারীর সপত্নীগণ প্রতি সপ্তাহে মহারাজের নিকট খলিতা * পাঠান। তাঁহারা দেখিলেন,

* খলিতা—রাজারাণীরা পরস্পর যে সকল পত্রাদি আদান প্রদান করেন রাজপুতানায় তাহাকে খলিতা বলে। কিংখাবের থলিতে পুরিয়া এই সকল পত্রাদি পাঠান হয় বলিয়া খলিতা এই নাম হইয়াছে।

তাঁহারা সকলেই মহারাজের নিকট 'খলিতা' পাঠান, কিন্তু ছয়মাস হইতে চলিল নূতন রাণী একখানিও পত্র পাঠান নাই। তাই তাঁহারা এক দিন তাঁহার মহলে আসিয়া তাঁহাকে টিটকারি দিয়া বলিলেন,—"তুই এমন কি গুণ করিয়া রাজাকে বশ করিয়াছিস্ যে ছয় মাস হইল মহারাজা দিল্লী গিয়াছেন, তুই একখানাও "খলিতা" পাঠাইলি না! তোর কি মহারাজকে দেখিতে একটু ইচ্ছাও হয় না?" চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে এইরূপ টিটকারি দেওয়ায় তিনি প্রথমে নতমুখে সমস্ত কথা শুনিলেন, তৎপরে একখানি কাগজে মস্তকের সিন্দুরে খোঁপার কাঁটার অগ্রভাগ দিয়া "সা" এই অক্ষরটি মাত্র লিখিয়া "খলিতায়" বন্ধ করিয়া মহারাজের নিকট দিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন। যথাসময়ে "খলিতা" গুলি মহারাজার হস্তে পৌঁছিলে, তিনি এক এক করিয়া সমস্তগুলি পাঠ করিয়া শেষে ছোট রাণীর খলিতাটি আগ্রহের সহিত খুলিয়া পাঠ করিতে গিয়া দেখেন, রক্তবর্ণে "সা" অক্ষর ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই লেখা নাই। রাজা ত অবাক! নৈরাশ্যের ছায়ায় তাঁহার মুখ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি জানেন, ছোট রাণী তাঁহার যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী আবার তেমনি বিদুষী। অবশ্যই এ 'সা'-এর কোন গুপ্ত অর্থ আছে। এ অর্থ কে বলিতে পারে? পাত্র-মিত্র লইয়া মহারাজ অর্থ বাহির করিবার জন্য মাথা ঘামাইতে বসিলেন, কোন মতেই অর্থ বাহির হইল না। তখন মোসাহেবদের মধ্যে একজন বলিল—"মহারাজ! যমুনার বেলাভূমিতে এক প্রসিদ্ধ কবি অথচ অত্যন্ত সাধু বিহারীদাস বালির উপর পড়িয়া দিবারাত্র গড়াগড়ি দিতেছেন। হয়ত তিনি ইহার অর্থ বলিতে পারেন।" কাছওয়ার-রাজ বিহারী দাসকে আনিতে বলিলেন।

বিহারী দাস এক অতি উচ্চ অঙ্গের কবি এবং সাধু পুরুষ। তাঁহার দেহ অতি স্থূল। অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই। লোভ ক্রোধ তথা মাৎসর্য্য কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। মহারাজের লোকজন গিয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিয়া আনিল। মহারাজ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বসাইয়া তাঁহার হস্তে পত্রখানি দিলেন। বিহারী দাস "সা" অক্ষরটি পড়িয়া হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! পত্রে কেবল "লালসা" লেখা আছে। রক্তবর্ণ সিন্দুরে লেখা বলিয়া 'লাল,' তাহাতে 'সা' মিলাইলেই 'লালসা' হইল। অর্থাৎ আপনি ছয়মাস হইল গৃহে যান নাই, তজ্জন্য আপনার পত্নী আপনাকে দেখিতে চাহেন। সেইজন্য সেই লালসা জ্ঞাপন করিয়াছেন।"

মহারাজ পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া বিহারী দাসকে বিদায় দিলেন এবং অতি শীঘ্র দিল্লী ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে আগমন করিলেন। ছোট রাণী যে কতদূর গুণবতী ও বিদুষী, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন।

মহারাজ দিল্লী হইতে আসিয়া সেই যে অন্দরে প্রবেশ করিয়াছেন, আর তিনি বাহিরে আসেন না। রাজকার্য্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল ভোগ-বিলাসে রত হইলেন। রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করায় ক্রমশঃ রাজ্যে অরাজকতা আসিয়া দেখা দিল। সমস্ত কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে আরম্ভ হইল। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। মহারাজ অন্দরে পড়িয়া আছেন; বাহিরে একবারো আসেন না, বড় বড় কর্ম্মচারী প্রমাদ গণিল। কি করিয়া এ বিপদ হইতে রাজ্য উদ্ধার হয়, তাঁহারা সেই চিন্তায় অস্থির! অবশেষে দুই-চারি জন পরামর্শ করিলেন যে সেই যে দিল্লীর সাধুটি, যে মহারাজকে রাণীর পত্র শুনাইয়া তাঁহাকে দেশে পাঠান, সেই সাধুকে ধরিয়া আনা যাউক। তিনি যদি এ রোগের ব্যবস্থা করিতে পারেন! নতুবা আর ত কোন উপায় দেখা যায় না। এই পরামর্শ স্থির হইলে, কতকগুলি লোক দিল্লীতে আসিয়া যমুনাতীরে সেই সাধুর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বিহারীদাস সেই বেলাভূমিতে স্থূল শরীর লইয়া গড়াগড়ি দিতেছেন; তাহারা তাঁহাকে ধরিল এবং বলিল,—"ঠাকুর রাজধানী চল। রাজা ক্ষেপিয়াছে। তুমি না গেলে শোধরাইবে না।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিহারীদাস ক্রোধ, লোভ, প্রভৃতিশূন্য, তাঁহাকে যেদিকে ফেরাও তিনি সেই দিকেই ফেরেন। সুতরাং তাঁহাকে পাল্‌কিতে করিয়া কাছওয়ার রাজ্যাভিমুখে লইয়া যাওয়া হইল। দশ দিবসের মধ্যে বিহারী দাস রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত। রাজকর্ম্ম-চারীরা তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইলে তিনি বলিলেন,

তোমরা আমায় রাজান্তঃপুরের দরজায় ফেলিয়া আইস। তাহারা তদ্রূপই করিল।

বিরাট বপুটি অন্তঃপুরের দরজায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে, ইতিমধ্যে এক বাঁদী অন্তঃপুর হইতে কোন কার্য্যবশতঃ বাহিরে আসিল। বিহারী দাস একখানি কাগজ সেই বাঁদীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখ, সুযোগ-ক্রমে এ কাগজখানি মহারাজকে দেখাইবে।" বাঁদী কাগজ লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

তৃতীয় প্রহরে মহারাজ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া শিরে উষ্ণীষ ধারণ করিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে সেই বাঁদী একখানি বৃহৎ দর্পণ ধরিয়া আছে। মহারাজ কাচে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন ও পাগড়ী বাঁধিতেছেন, এমন সময় বাঁদীর হাতে কাগজ দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "করমতি, এ কাগজখানা কিসের?" বাঁদী বলিল,"মহারাজ! ভয়ে বলিব, না, নির্ভয়ে বলিব?" রাজা বলিলেন "নির্ভয়ে বল।" করমতি বলিল, "মহারাজ! কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলাম, তখন একটি প্রকাণ্ড-দেহ পুরুষ এই কাগজখানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, মহারাজকে দেখাইবে। তাই এই কাগজ হাতে করিয়া বসিয়া আছি।" রাজা বাঁদীর হস্ত হইতে কাগজ খানি লইয়া দেখিলেন, তাহাতে কেবল "তি" এই অক্ষর লেখা আছে। তিনি তখন বাঁদীকে বলিলেন, "যাও, রাণী যাদবনন্দীকে ডাকিয়া আন।" যদুবংশীয়া রাণী আসিতে মহারাজ তাঁহাকে কাগজখানি দিয়া বলিলেন, "এ পত্রের অর্থ তুমি ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারিবে না।" রাণী বলিলেন, "ইহাতে ত কেবল বাঁদীর নাম 'করমতি' লেখা আছে অর্থাৎ 'তি' তে 'কর' (হস্ত) মিলাইয়া পাঠ করুন তাহা হইলে দেখিবেন "মতির হস্তে পাঠাইতেছি এই অর্থ পাইবেন।" রাজা তখন করমতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যে লোক তোমায় এ পত্র দিয়াছে, সে কিরূপ?" করমতি হাত যোড় করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি একটি স্থূলকায় লোক এই পত্র আমায় দিয়াছে।" মহারাজ বুঝিলেন যে কবি বিহারী দাসের এই কাণ্ড। বিহারী দাস দিল্লী হইতে এখানে কি করিয়া আসিল এবং কেনই বা আসিল! মহারাজ একটু বিস্মিত হইয়া বিনয়-সহকারে অন্দর হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, উত্তরে জানিতে পারিলেন যে বাস্তবিকই বিহারী দাস আসিয়াছেন।

মহারাজ আর অন্দরে থাকিতে পারিলেন না। বিহারী দাস কিরূপ মহাপুরুষ তাহা তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন। কিঞ্চিৎ পরে তিনি অন্দর হইতে বাহিরে আসিলেন। তখন বিহারী দাস নিম্নলিখিত কবিতাটি হাস্য করিতে করিতে মহারাজকে শুনাইলেন:—

নহি পরাগ, নহি মধুর রস, নহি বিকাশ ইহি কাল।
অলি কলিহীন সে বন্ধো আগে কৌন হবাল॥

যাদব-রাণী যে সময় বিবাহিতা হইয়া কাছওয়ার রাজ্যে আসেন, তখন তাঁহার বয়স অল্প। বালিকা বলিলেই হয়। দিল্লী হইতে রাজা কাছওয়ারে ফিরিয়া আসিলে পর, তাঁহার বয়স তখনও যে বেশী হইয়াছিল তাহা নহে। তাই কবি বিহারী দাস হাস্য করিয়া বলিতেছেন;—পুষ্পটি এখনও মুকুল অবস্থায়; তাহাতে মধুর রস নাই, এখনও পরাগ উৎপন্ন হয় নাই, এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই। এখন হইতেই যদি ভ্রমর এরূপ পুষ্পের প্রণয়-বন্ধনে পড়িল, তবে পরে কি হইবে, তাহা জানি না। বলা বাহুল্য এই উক্তিতেই কাজ হইল।

এই সাধুই প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি বিহারী দাস। ইনি হিন্দী ভাষায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "বিহারী কি শতসই" রচনা করিয়া মহারাজ জয় সিংহের নামে উৎসর্গ করিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। হিন্দী ভাষায় "বিহারী কি শতকই" একখানি উচ্চ অঙ্গের কাব্য। উপরিউক্ত কবিতাটীকে তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভেই স্থান দিয়াছিলেন।

৺ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। *

* রাও সাহেব ৺ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ কেরৌলী-রাজ্যে মন্ত্রী ছিলেন।

মেঘ্‌লা রাতের ভোর

কে আপনি!……না, এ-কামরা নয়, এটা রিজার্ভ করা হয়েচে, দেখ্‌চেন না?

—ক্ষমা করবেন মশাই, তাড়াতাড়িতে ভুল করে উঠে পড়েচি।

* * * *

আমায় একটা মিষ্টি দাও না গা! দেখ, এ তরকারীটায় ঝাল একটু বেশী হয়ে গেছে……এ কি, তোমার মুখখানা অমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল যে! মাথায় হাত দিয়ে রেখেছ কেন? কপালের পাশদুটো দপ্‌ দপ্‌ করচে বুঝি? পাখাটা খুলে দাও না! উঃ, আজ কি ভয়ানক গরম হাওয়া দিচ্ছে, দেখেছ! গাড়ীটা থাম্‌লো যে!

দেখতো এ—টা কোন্ ষ্টেশন……আসানসোল্ নাকি? —হ্যাঁ……পেট ভর্‌লো তো…না, না, আমার মোটেই ক্ষিদে পায়নি।……কিচ্ছু ভাব্‌তে হবে না তোমায়—কোন অসুখ বোধ কর্‌চি না, হঠাৎ মাথাটা একটু ধরেছিল, এই যা…হ্যাঁ, এখন বেশ সুস্থ বোধ করচি!

—বাঁচলুম! তোমার মুখের অবস্থা দেখে বড্ড ভয় পেয়েছিলুম কিন্তু। এই বই থেকে খানিকটা পড়্‌বো, শুন্‌বে?……না, থাক! তোমার আজ তেমন মন লাগ্‌চে না, অন্য সময়ে পড়লেই চলবে! শরীরটা বিশেষ খারাপ বোধ কর্‌ তো, একটু শোও—এই যে, আমি সরে বস্‌চি, তোমার মাথাটা রাখো এই কোলের ওপর। বাঃ, এরি মধ্যে সন্ধ্যা নেমে এল। বাইরে আর কিছু দেখ্‌বার যো নেই। দেখ অনু, ঐ অন্ধকার-জড়ানো মাঠ-গুলোর বুকের কাছে-কাছে জোনাকির মিট্‌-মিটে আলোর ঝুরি আর উপরের তারার-ভরা অমানিশার আকাশ—কি সুন্দর ভাবে মিলে গেছে!—তোমার চুলগুলো এত……অনু! তোমার চোখের পাতা ভিজে,—তুমি কাঁদ্‌চো? কি-কষ্ট হচ্চে তোমার,বল লক্ষীটি! কিছু না? না! তোমায় নিয়ে আর পারি না! উঠে বস্‌চো যে? কিছু বল্‌তে চাও আমাকে? অমন করে' চেয়ে রইলে কেন! বলনা, কি মুস্কিল!

—একটা কথা আছে, শুন্‌বে কি? ওগো, জানিনা মার্জ্জনা আমার অদৃষ্টে আছে কি না—তবুও তোমায় শোনাতে হবে। কথাটা ভুলেই যাব স্থির করেছিলুম, কিন্তু আজ কি কুক্ষণে দেখা দিয়ে সে আমার প্রায়-ভুলে যাওয়া বিষের জ্বালাকে নতুন করে জাগিয়ে দিলে! কিছুতেই আর নিজেকে গোপন করে রাখ্‌তে পার্‌চি না গো, পারচি না! বঞ্চনার এ বোঝা আমাকে নামাতেই হবে। ঐ যে, তখন দেখ্‌লে না! তুমি যখন বসে খাচ্ছিলে, একজন লোক হঠাৎ আমাদের এই কাম্‌রায় উঠে পড়েছিল। ওর নাম নিরঞ্জন। ঐ লোকটার কথাই তোমায় এখন বল্‌বো। তুমি হয়তো জাননা, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার প্রায় ছ বছর আগে, নিরঞ্জন প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আস্‌তো। বাবার বন্ধুর ছেলে—তার সম্বন্ধে আমাদের বাড়ীতে কোন বাধা-নিষেধই ছিল না। আমিও অসঙ্কোচে তার সঙ্গে আলাপ করতুম। সর্ব্বদাই আমাকে সুখী কর্‌বার চেষ্টা করতো সে। মনে মনে আমিও তাকে ভাল ছেলে বলেই শ্রদ্ধা করতুম। এমনি ভাবে কতদিন কেটে গেল। তারপর একদিন নির্জ্জনে পেয়ে সে আমাকে বল্লে—অণিমা! তুমি হয়তো কিছুই জাননা, আমি তোমায় কত—! তার সেই আবেগ-ভরা কথাগুলো শুন্‌তে শুন্‌তে আমার গাটা শিউরে উঠলো। উঃ, তখন সে কি করলে, জানো? সে আমার খুব কাছে সরে এল—একেবারে খুব কাছে…আস্তে আস্তে আমার হাত দুটো তার নিজের হাতে চেপে ধরে আমার মুখে—ওগো, আমার প্রতি একটু দয়া কর, আমাকে দূর করে দিয়ো না—

কি বল্‌ছিলুম, সে আমার এই মুখে একটা কলঙ্কের ছাপ এঁকে দিলে! ভয়ে লজ্জায়, কি-এক ভাবে আমি তার হাত থেকে হাতদুখানা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলুম।—এ কি, মুখ ঢাকচো কেন? ক্ষমা করতে পার্‌বেনা বুঝি! কিছুতেই না?

—বলে যাও অনু, থাম্‌চো কেন? যা কিছু বল্‌বার আছে তোমার! যত কঠিন, যত ভয়ানক—

—হাঁ, বল্‌বো বৈকি। শেষ পর্য্যন্ত সব কথাই বল্‌তে হবে তোমায়। না বলে যে উপায় নেই!

তারপর, নিরঞ্জন সেদিনের মতো বাড়ী ফিরে গেল। আমাদের দুজনের ভিতরে ঘনিষ্ঠতাও বেড়েই চল্ল। দু'তিন দিন পরে একদিন বিকেলে মার কাছে বসে গল্প করচি,

এমন সময় দাদা ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে গায়ের চাদরখানা চেয়ারের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—মা, নিরঞ্জনকে যেন কোনদিন আর এ-বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেওয়া না হয়। দাদার মুখ-চোখ লাল হয়ে গেছে! দেখে মা একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, বল্লেন—কি রে অনিল, ব্যাপার কি? তুই অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌চিস কেন?

দাদা নিজের চড়া সুরটা একটুও না নামিয়েই বল্লেন,—বিশেষ কিছু নয়! তবে এ-টা জেনে রেখো নিরঞ্জনের মতো একটা মাতাল কুলটাসক্ত ছেলের আসা-যাওয়া আমাদের বাড়ীতে চল্‌বে না। অণির সঙ্গে কথা বল্‌বার উপযুক্ত পাত্র সে একেবারেই নয়। জান মা, একটা মস্ত জালিয়াতির হাত থেকে আমরা বেঁচে গেছি! আমাদের রমেশ ওদের বাড়ীর পাশে থাকে, ওর বাড়ীর খবর সে জানে, আর তাছাড়া আমি নিজের চোখে সেদিন যা দেখলুম—! একনিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে ফেলে তিনি থাম্‌লেন। মা আর আমি দুজনে চেয়ে রইলুম হতবাক্‌ হয়ে দাদার মুখের পানে তাকিয়ে। মা বল্লেন—যাক্‌! ভালই হোল। আমি কিন্তু অপমানে, ঘৃণায়, বিরক্তিতে, অবসাদে অভিভূত হয়ে মনে মনে ভাবলুম, বাপের বন্ধু-কন্যার উপযুক্ত মর্য্যাদাই রেখেচে সে। কত-বড় ধূর্ত্তামি, কি ভীষণ প্রবঞ্চনাই বুকে করে সে ফিরেচে আমার পাছে-পাছে! সমস্ত ব্যাপারটা তখন অল্পে অল্পে আমার কাছে জীবন্ত নগ্ন কুশ্রী মূর্ত্তি ধরে ফুটে উঠ্‌লো। ভয়ে আমি চোখ বুজলুম। কিন্তু পরে ক্ষমা করেছিলুম তাকে। ক্ষমা করেছিলুম এই ভেবে যে, খুব সহজেই সে আমার মুক্তি দিয়েচে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল……

—যাক্‌ বাঁচলুম, আমি আমার নিশ্বাসকে যেন ফিরিয়ে পেলুম। ভুলে যাও অনু, পুরানো স্মৃতি সব ভুলে যাও। তুমি যে তাকে আন্তরিক ঘৃণা করতে পেরেচ, এই আজ আমার পরম পরিতৃপ্তি। জীবনে সব মানুষই অমন এক-একবার ভুল করে বসে, আর সেই ভুলের জন্য যদি কেউ উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করে' শুদ্ধ পবিত্র হতে চায়, ক্ষমা তাকে আমাদের করতেই হবে, আঃ, কি কর, পা ছাড়! অপরাধের মাত্রা আর বাড়িয়ো না আমার। আজ তুমি যেমন আ ভালবাসায় বিশ্বাস করে অকপটে প্রাণের আবেগে জীব গূঢ় কথাগুলো একটি একটি করে প্রকাশ করে দিলে, আ ঠিক সেই রকম একটা বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে আ জীবনের কলুষিত কাহিনী তোমায় কাছে নিবেদন ক দেব। তারপর মার্জ্জনা করা না করা, সে তোমার ইচ্ছ কারণ, আমার মনে হয়, বিচার করার ক্ষমতা শুধু আমাদেরই আছে, তা নয়, সে-অধিকার তোমাদেরও স আছে, এবং আমাদের দোষ-অপরাধগুলো তোমা সত্যিকার দোষ-অপরাধের মতোই। তা না হলে বন্ধু প্ররোচনায় আমি যেদিন গান শোনবার ছলে এক বাইজী কাছে গেলুম, তার হাতে-তুলে দেওয়া মদের গ্লাসে নিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা চুমুক দিতে পারলুম, সেটা কি তু পাপ বলে গ্রহণ করবে না? নিশ্চয়ই করবে। যদি ব না, তাহলে এই বুঝতে হবে, যা সত্য তাকে অকুণ্ঠ ভা প্রচার করার শক্তি তোমার মধ্যে নেই! তারপর, বাইজীর কাছ থেকে ফিরে এসে আমি কি করলুম জানো প্রথমে আমার অধঃপতনের কথা স্মরণ করে লজ্জায় ম গেলুম। প্রতিজ্ঞা করলুম, জীবনে একবার যা ভুল হ গেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করবো, আমার মধ্যে মানুষের স রকম উন্নতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। নিভৃতে এর জন্য ক প্রার্থনা করেচি, কত শক্তি ভিক্ষা চেয়েচি, আর তারি ফ আজ আমি অনেক-কিছু বিপদের কবল থেকে নির্ম্মুক্ত ক্ষমার কথা কি বলচো, অনু! যদি কোনদিন জান্‌তে পা আমার এ পাপের ক্ষমা আছে, তবে তোমার নিজের জ কিছুমাত্র ভেবো না।—

পেরেচ, সত্যই ক্ষমা করতে পেরেচ আমাকে! ত রাখো, এমনি করেই আমার বুকে তোমার মাথা ছুঁই রাখো, এমনি করেই আমার মুঠিতে তোমার হাত রেখে··

···এই যে আমরা একেবারে মধুপুরে এসে পড়েচি!

প্রসাদবাবু বলে কে যেন আমায় চেঁচিয়ে ডাক্‌লে, না অনু, একটু সরে বসো, তোমার মাথার কাপড়টা আ একটু·········।

শ্রীবিনয় চক্রবর্ত্তী।

সংস্কার ও যুক্তি*

নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব, প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্ব—এই সংস্কার ও যুক্তির দ্বন্দ্ব। নবীন চায় বিধবারা বিবাহ করুক, ভারত-সন্তান সমুদ্র-পারে যাক, বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ হউক, বাল্য-বিবাহ বন্ধ হউক, মেয়েরা কাউন্‌সিলে যাক, ছুঁৎ মার্গ অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্ত হোক। কিন্তু প্রবীণেরা এর কোনটাই গ্রহণ করবেন না। তাঁরা ক্রমাগত উত্তর হতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হতে উত্তরে মাথা নাড়ছেন আর বলছেন—এ হতে পারে না, এ হতে দেব না। এই যে নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব, প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্ব, এ সংস্কার ও যুক্তির দ্বন্দ্ব। কেমন করে এই দ্বন্দ্ব যুক্তি ও সংস্কারের দ্বন্দ্ব, আমরা এ দুটোর কোন্‌টার বেশী ভক্ত হয়ে পড়েছি ও কেন পড়েছি এবং কোন্‌টার বেশী ভক্ত হওয়া উচিত, তারই একটু আলোচনা করব। এ কথা কেউ আমার মুখের সাম্‌নে বলতে পারবেন না যে তিনি যুক্তি মানেন না—কেন না, তা হলে তিনি তার বিরুদ্ধে নিজে কোন যুক্তি উত্থাপন করতে পারবেন না; কারণ আদবেই তিনি যুক্তির ধার ধারেন না। অথচ এই যুক্তির মূলেই আমরা কি করে কুঠারাঘাত করে আস্‌চি তাও দেখ্‌তে পাব।

সকলেরই কতকগুলি সংস্কার আছে, যা তাদের মনের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছে। আপনি যদি আপনার গ্রামের রামচরণ মুদীকে বলেন, "ত্যাখো রামচরণ, তোমাদের ছেলেটা তোমাদের নিজেদের দোষেই মারা গেল—আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম চারিদিকে কলেরা হচ্ছে, জল ফুটিয়ে খাও, তা তোমরা শুনলে না; তোমরা চল্‌লে ওলাদেবীকে পূজো করতে, গ্রামময় সংকীর্ত্তন করতে—আর কতকগুলি হরির লুট দিতে। যা করলে কলেরা বন্ধ হয়, তা না করে করলে কতকগুলো বাজে কাজ, সুতরাং যা হবার তাই হয়েছে!" রামচরণ দু-একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে, দু-একটা দুঃখ-বাচক শব্দ উচ্চারণ করে বল্‌বে, "তা কি করব বাবু! ভগবান দিয়েছিলেন, তিনিই নিলেন! মানুষের কি হাত, বলুন? তার কাল ফুরিয়েছে, সে চলে গেছে।" আপনি তাকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারবেন না যে তাদের কর্ম্মফলেই ছেলেটার কাল ফুরোতে বাধ্য হয়েছে, আর ওলাউঠার-অধিষ্ঠাত্রী ওলা-দেবী নন্, সেটা হচ্ছে কলেরার জীবাণু। আপনি এই সোজা কথাটা তাকে বোঝাতে পারবেন না। পূর্ব্বাহ্ণে যে-সংস্কার তাকে পেয়ে বসেছে, সেটা ছাড়ানোর চেষ্টা আপনার পণ্ডশ্রম হবে। আপনি ধীরে ধীরে ভট্টাচার্য্য মশায়ের নিকট যান,—বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করুন, তিনি যদি আপনাকে ম্লেচ্ছাদি বিশেষণে আপ্যায়িত করে পত্র-পাঠ বিদায় নাও করেন, তবে অগাধ শাস্ত্র-বারিধি হতে কোটেশন-বচনে আপনাকে প্লাবিত করে দেবেন! আপনি হয়ত শাস্ত্র-বচনে বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে আপনার সাধারণ ও বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে বিধবার বিবাহ না দেওয়ার জন্য বালবিধবাদের জীবন-ব্যাপী কষ্ট, সমাজে লোক-সংখ্যার স্বল্পতা, সমাজে দুর্নীতির আধিক্য প্রভৃতি যুক্তির অবতারণার উদ্যোগ করলেন, কিন্তু দু'মিনিটের মধ্যেই আপনার সুযুক্তির জাল গুড়িয়ে নিতে হবে। পণ্ডিত মহাশয় শীঘ্রই সটীকি মস্তকান্দোলনের সহিত আপনাকে সমঝিয়ে দেবেন যে ও-সব যুক্তি যুক্তিই নয়, শাস্ত্রীয় বচনই আসল যুক্তি! সুতরাং আপনাকে বাধ্য হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের পন্থানুসারে শাস্ত্রের বচন উত্থাপন করতে হবে। যদি পণ্ডিত মহাশয় মধ্যপথে নস্যগ্রহণ শিরসঞ্চালন ও হস্তপদাদি বিক্ষেপণ ও তৎসহ তর্জ্জন ও গর্জ্জন আরম্ভ না করেন, (যার পৌণে ষোল আনারই সম্ভাবনা) তবে হয়ত আপনি সমস্ত শাস্ত্রীয় যুক্তি শাস্ত্রের দ্বারাই একে একে মন্থন করতে সমর্থ হলেন ও মনে করলেন যে পণ্ডিত-প্রবরকে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছেন! কিন্তু হায়,

---

* এখানে সংস্কার অর্থে—'কুসংস্কার' শব্দে যে অর্থ ব্যবহৃত হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। 'শিক্ষাসংস্কার', 'সমাজ-সংস্কার' প্রভৃতির দ্বারা যাহা বুঝায়, তাহা নহে।

পরক্ষণেই হয়ত আপনি পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে যাবার সময় শুনতে পাবেন, পণ্ডিত মহাশয় উদাত্ত স্বরে কোন নিরীহ প্রতিবাসীর নিকট ঘোষণা করছেন, "হরচন্দ্রের ব্যাটা দুদিন কালেজে পড়ে কীই না হয়ে এসেছে, একেবারে খৃষ্টান, নেহাৎ খৃষ্টান! আমার সঙ্গে আসে কি না, বিধবা বিয়ের তর্ক করতে! বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছি। বাছাধন কালেজি 'বিদ্যেয়' আর কুল পান্ না। আগেই না হরচন্দ্রকে বলেছিলাম, ছেলেকে কালেজে দিও না, কি কেলেঙ্কারি" ইত্যাদি।

আবার আর একদিকে দেখুন, আপনাকে যদি ইউরোপীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের নিকট অর্থাৎ পাদরী মহাশয়দিগের নিকট বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রচার করতে হত, তবে, আপনাকে ঠিক এইরূপ সঙ্কটেই পড়তে হত। বিধবা বিবাহের নিষেধ আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের নিকট এত প্রিয়, পাশ্চাত্য সমাজের আচার্য্যগণ সেই নিষেধের কথা শুনে, আমাদের অসভ্যতায় ও কুসংস্কারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মনে করে উৎফুল্ল বা দুঃখিত হয়ে থাকেন। আর ওলাউঠার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ওলাদেবীকে ডিক্ হারি কি বলে সম্বোধন করত, বলতে পারি না, তবে তাঁকে যে ভক্তি-গদগদচিত্তে পূজা করত না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই যে দেশ-ভেদে ও সমাজভেদে একই জিনিষ সম্বন্ধে দুই প্রকার ধারণা ও সংস্কার, এর কারণ কি? তাদের যেটা অনায়াস-লব্ধ সংস্কার সেটাই আমরা এত যুক্তিতর্ক খরচ করেও মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারিনে কেন? আর পারলেও এত বেগ পেতে হয় কেন? এর কারণ খুঁজতে গেলে এই সংস্কারের জন্ম-বৃত্তান্তের একটু খোঁজ নিতে হবে।

আপনি আজ বয়ঃস্থ মানুষ, এখন আপনার বহু বিষয়ে বহুবিধ মতামত আছে; বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ সম্বন্ধে আপনার মতামত আছে, ভূত-প্রেতাদি সম্বন্ধে মতামত আছে, প্রতিমা পূজা সম্বন্ধেও আপনার মতামতের অভাব নাই, ইস্লামধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধেও আপনি মতামত পোষণ করেন, এ ছাড়া আরো হাজারো মতামত আপনার মনোরাজ্য ব্যাপিয়া গিয়াছে কিন্তু এগুলি আপনার অন্তর-রাজ্যে বসতি সুরু করলে কবে থেকে? এগুলি কি আপনার মগজে উড়ে এ জুড়ে বসেছে? না, এগুলি কালক্রমে ধীরে ধী সেখানে সঞ্চিত হয়েছে? মনে করুন, আপনার বয়স অ তিরিশ বছর। আজ হতে দশ বৎসর পূর্ব্বে আপনার জ্ঞ আজ-অপেক্ষা কম ছিল; অপেক্ষাকৃত কম বস্তু বা চিন্ত সহিত আপনি পরিচিত ছিলেন। আজ সে সব বি আপনার চিন্তারাজ্যে বিরাজ করছে আর যাদের সম্ব আপনার বিচিত্র মতামত গড়ে উঠেচে, তার অনেকগুি সঙ্গে আপনার বিশ বৎসর বয়সের সময় আপনার পরিচ ছিল না। তার পর আরও দশ বৎসর আগেকার কথা ল করুন, তখন আপনার বয়স দশ বৎসর, আপনি ক্ষুদ্র বাল আপনার চিন্তার বিষয় তখন ফুটবল ম্যাচ, কি হ টিম, সুপক্ক আমটি, সুগোল মারবেলটি, সাদা বিড়ালটি তখন আপনার বাল্য বিবাহ বা বহুবিবাহ সম্বন্ধে কে সংস্কারের সৃষ্টি হয় নি, কারণ তখন পর্য্যন্ত বিব ব্যাপারটা আদবে কি, তাই আপনি বুঝে উঠতে পা নি। এ সমস্ত বিষয়ে আপনার সংস্কার বা ধারণা পরব কালে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তখন আপনার ভূত-প্রেতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, দেব-প্রতিমাকে ভক্তি প্রণাম করতে শিখেছেন ও মুসলমানদের প্রতি এক বিজাতীয় ধারণা মনে পোষণ করতে আরম্ভ করেছে তখন যদি আপনাকে কেহ জিজ্ঞাসা করত "হ্যাঁ রে, তুই ভূতের ভয়ে রাত্রে ঘর থেকে বেরোস্ নে, কে তোকে ব যে ভূত আছে? আর ঐ জাম-গাছটায় যে একটা ভূ আছে এ সংবাদই বা জোগাড় কল্লি কোত্থেকে আপনি হয়ত উত্তর দিতেন, "বাঃ, ঐ গাছটায় নিশ্চয়ই ভূ আছে—রায়েদের বৌ ঐ গাছে ফাঁসী টেনে মরেছিল, ঐ গাছে ভূত হয়ে আছে।" কিন্তু মানুষ গলায় ফাঁস টে মরলে কেন ভূত হয়, তার উত্তর তখন আপনি দি পারতেন না (অবশ্য এখন আপনি এ সব বিষয়ে জ গম্ভীর স্বরে—পণ্ডিত লোকের উপযুক্ত ধৈর্য্য-বিশিষ্ট বক্তৃ দিতে পারেন) কিন্তু তখন আপনি তা পারতেন না। জোর হয়ত আপনি বলতেন, সাধু মানুষ মরলে স্বর্গে য পাপী নরকে যায় আর অপমৃত্যু হলে তাকে ভূত হতে হ

কিন্তু মানুষ মরলে সে স্বর্গে বা নরকে যায় বা ভূত হয়ে থাকে, এর কোন প্রমাণ আপনি তখন দিতে পারতেন না; কারণ এ সব বিষয়ে আপনি তখন কোন আলোচনাই করেন নি—অথবা করার শক্তিই আপনার হয় নি। এগুলি তখন ছিল আপনার শোনা কথা। আর যদি—আপনার মধ্যে একটু অনুসন্ধিৎসা থাকৃত তবে ঐ শোনা কথার সঙ্গে একটু শোনা যুক্তি অথবা মনগড়া যুক্তি—যেমন সৎলোক স্বর্গে যায় কেন? উত্তর—সৎলোক বহু কষ্ট সহ্য করেন, সৎকর্ম্ম করেন এবং অনেক সময় সারাজীবন দুঃখে-কষ্টে কাটিয়ে থাকেন, সুতরাং মৃত্যুর পর তাঁরা পুরস্কার স্বরূপ সুখ পান অতএব তাঁদের স্বর্গ-বাস হয়ে থাকে, এই প্রকার। বাল্যকালে যে সব বিষয় আপনার সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার বেশীর ভাগই আপনার শোনা কথা; যুক্তি-বিচার দিয়ে আপনি সেগুলি গ্রহণ করেন নি; সেগুলি আপনি মাতৃভাষা শেখার মত এমনই গ্রহণ করেছেন। আপনি হিন্দুর ছেলে, আপনার বয়স এখন দশ বৎসর, সুতরাং আপনি দুর্গা কালী শিবের মূর্ত্তি দেখলেই মাথা নীচু করে প্রণাম করেন; পৈতাধারী ব্রাহ্মণ দেখে নমস্কার বলে মনে করেন; আর একদিকে একজন খৃষ্টান বা মুসলমান বালক (অবশ্য যারা হিন্দুর সংস্পর্শে এসে বা পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু থাকার দরুণ দরগায় শির্ণিও দেয়, মা কালীর কাছে মানতও করে, তাদের কথা বলছিনে) দুর্গা কালী বা শিবঠাকুরকে ভক্তি প্রণাম করা দূরে থাকুক, মন্দিরের প্রতি একটু সম্মান দেখায় না, তারা অবজ্ঞার পাত্র, ইহার কারণ কি? কারণ খুবই স্পষ্ট,—আপনারা দুইজনে দুই বিভিন্ন সমাজ ও সংসর্গের মধ্যে থাকিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছেন। আপনারা আপনাদের চারিদিকে যাহা দেখিয়াছেন, তাহার সবই বিভিন্ন। আপনি যখন দণ্ডকারণ্যবাসী রাজার বিবরণ শুনিয়াছেন, তখন সে কারবালা মরুভূমে অবস্থিত হোসেনের কথা শ্রবণ করিয়াছে, আপনি যখন শঙ্খ-ঘণ্টা পূজোপকরণ-বেষ্টিত পূজকের মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়াছেন, তখন সে ভক্তের নেমাজ দেখিয়াছে, যখন আপনি উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের সহিত শ্মশানে বিচরণ করিয়াছেন, তখন সে ছদ্মবেশধারী হারুণ আল্ রসিদের সঙ্গে বাগ্‌দাদ্ নগরে বাহির হইয়াছে! আপনার চিন্তা-রাজ্যে যখন গয়া-কাশী উপস্থিত, তাহার মনোরাজ্যে তখন মক্কা মদিনা বিরাজমান। আমার পক্ষে আপনার পিতা যখন স্নান সারিয়া শিখা বন্ধন করেন, তাহার পিতা তখন গোসল করিয়া শ্মশ্রু কর্ষণ করেন, আপনার পিতা যখন পিঁড়িতে বসিয়া 'অন্ন ব্যঞ্জন' উদরস্থ করেন, তাহার পিতা তখন মাদুরে উপবেশন করিয়া 'খানা' খান্, আর আপনার পিতা যখন সাত্ত্বিক খাদ্য—সুসিদ্ধ অপক্ক কদলী (ভাষায় কাঁচা কলা) চর্ব্বণ করেন, তাহার পিতা তখন কোন বিশেষ পক্ষীর সুপক্ক মাংস ভোজন করেন! মোট কথা, আপনার পিতা যখন পুত্রের উপবীত দেন তাহার পিতা তখন তনয়কে কল্‌মা পড়াইয়া থাকেন এবং হিন্দুর পুত্র যখন ভূতের ভয়ে রামনাম করে—তস্য পুত্র তখন জিনের ভয়ে আল্লা স্মরণ করে। সর্ব্বশেষে আপনার পিতাঠাকুর চিতার উপর অধিরোহণ করেন—তাহার 'বাপজান' তখন গোত্তেরণী অবরোহণ করে। সুতরাং আপনাতে ও আপনার মুসলমান বন্ধুতে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ জন্মিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি! বরং প্রভেদ না হইলেই বিস্ময়ের ব্যাপার হইত। যে কারণে বাঙ্গালীর ছেলে বাংলা শিখে,—ইংরাজি বা হিব্রু শিখে না,—ইংরেজের ছেলে ইংরাজি শেখে ও চীনার ছেলে 'চুচাং' শিখিয়া থাকে, ঠিক সেই কারণেই ইংরাজের ছেলে খৃষ্টান হয় ও খৃষ্টীয় আচার-প্রণালী গ্রহণ করে, চীনারা বৌদ্ধ আচার-প্রণালী গ্রহণ করে, ও বাঙ্গালী হিন্দু বা মুসলমানও আপন বিশিষ্ট আচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। সুতরাং এখানে এইটুকু নিরাপদে বলা যাইতে পারে—হিন্দুর ছেলে যে হিন্দু হইয়াছে—মুসমানের ছেলে যে মুসলমান হইয়াছে এবং খৃষ্টানের ছেলে যে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে,—ইহাতে তাহাদের নিজেদের কোন বুদ্ধিবৃত্তি বা বিচার ও যুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাহারা বাল্যকাল যে-সমাজে লালিত-পালিত হইয়াছে, সে সমাজের ও ধর্ম্মের আচরণ দেখিয়াছেন ও ধর্ম্ম-বিষয় শুনিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ঐ ঐ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে—এখানে নিজেদের

কৃতিত্বের কোন পরিচয় নাই। একটু কড়াভাষায় বলিতে গেলে বলা যায়—তাঁহারা গড্ডলিকা-প্রবাহেই চলিয়াছেন, স্বাধীন চিন্তার কোন তোয়াক্কা রাখেন নাই। সকলে যে পথে চলিয়াছে তাঁহারাও সেই পথেই চলিয়াছেন। এই সমস্ত হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানগণই যখন অনেক সময় অন্যান্য ধর্ম্মের আলোচনা মাত্র না করিয়া আপন আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য বক্তা সাজিয়া বক্তৃতা করিতে থাকেন, তখন হাসিব কি কাঁদিব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহাদের বুঝা উচিত তাঁহারা দৈবক্রমে হিন্দু খৃষ্টান মুসলমান বা বৌদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দুধর্ম্ম ইস্‌লামধর্ম্ম খৃষ্টানধর্ম্ম বা বৌদ্ধধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ নহে। শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের জন্য নিরপেক্ষ বিচার চাই। এইরূপে গৃহীত ধারণাগুলি যে পরে এমন শক্ত করিয়া আমাদিগকে পাইয়া বসে, এমন কি অনেক সময় আমরা প্রাণ গেলেও সেগুলি ছাড়িতে চাহি না, তার কারণ আছে। আপনার জিনিষের প্রতি সকলেরই স্বাভাবিক টান আছে; আর সেটা জিনিষের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না। আমার মা বলিয়াই আমার নিকট তিনি প্রিয়, তাঁর দোষ গুণের হিসাব আমি চাহি না, তিনি আমার মা। আমার দেশ বলিয়াই আমার দেশ 'সকল দেশের সেরা', দেশের লোক উন্নত না অনুন্নত, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত তার খোঁজ আমি করি না,সে যে আমার দেশ! ভারতের পর্ব্বত বলিয়াই হিমালয় ভারতবাসীর প্রিয়। ভারতের বৃক্ষ বলিয়াই বট ভারতবাসীর নিকট মহিমাময়, ইংরেজের 'ওক্' নহে। বহুদিনের পরিচিত লোকদের সহিত যেমন আমাদের আদানে-প্রদানে কথায়-বার্ত্তায় একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন গড়িয়া উঠে, তেমনই সংস্কারের মধ্য দিয়া চিন্তা করিতে করিতে সেগুলি আমাদের মনের এক অংশ দখল করিয়া লয়। সেগুলি ছাড়িবার কথা আমরা ভাবিতেও পারি না।

এই যে স্বাভাবিক সংস্কার, ভক্তি বা শ্রদ্ধা, এর প্রয়োজন আছে; কিন্তু তাই বলিয়া এগুলির বাড়াবাড়ি সহ্য করিতে পারি না। পুরাতনকে পুরাতন বলিয়াই মনে করিব,—সংস্কারকে সংস্কার বলিয়াই মনে করিব, আর কিছু মনে করিব না। তাহাকে সত্যের আসনে বসাইতে পারিব না। পুরাতনকে বলি,সংস্কারকে বলি তোমরা আছ তাতে আপত্তি নাই; কিন্তু যখন তোমরা আমার উন্নতির সাম্‌নে আসিয়া পড়িবে আমার দেশের উন্নতির পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইবে তোমাদের নির্ম্মমভাবে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিব, তোমাদের চূর্ণবিচূর্ণ করিব। এই যে পুরাতন সংস্কার এর টানেই আমরা অনেক সময় শ্রেয়কে আহ্বান করিতে পারিনা, আমরা দুনিয়ার উন্নতির মার্গে পিছাইয়া থাকি। এই জন্যই আমরা বিধবা বিবাহের কথা শুনিয়া কানে হাত দিই, বহুবিবাহ নিষেধের কথা সহ্য করিতে পারি না। হতভাগিনীদের চোখে অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেলেও 'দারুভূতো মুরারি'র মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষায় বাধা দিয়া সমাজের এক অংশকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া রাখি। এই যে সব অনর্থ—আমাদের উপর যুক্তির বদলে সংস্কারের আধিপত্যই ইহার কারণ। সাধারণ মানুষের নানা বৃত্তি বিশেষ বিকশিত না হওয়ায় যুক্তির পরিবর্ত্তে সংস্কারের প্রভাবই তার উপর বেশী। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে জগতের প্রাচীন ধর্ম্ম-কয়েকটি-অবলম্বনকারী লোক-সংখ্যাই পৃথিবীতে অধিক। পরবর্ত্তী কালে প্রচারিত ধর্ম্মসমূহ-অবলম্বী লোক-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টানের আধিক্যই পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়। একজন হিন্দু হইতে পুরুষানুক্রমে বহু হিন্দুর সৃষ্টি হইয়াছে—হিন্দুর ছেলে সংস্কারবশতঃ হিন্দু হইয়াছে—মুসলমান বা খৃষ্টান হয় নাই। এইরূপে ক্রমে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বাড়িয়া বর্ত্তমান সংখ্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যদি এই সমস্ত ধর্ম্ম খুব সঙ্কীর্ণ না হইয়া পরেও এই সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে অন্তর্মুখী স্বাধীন চিন্তার আবির্ভাব না হয়, তবে এই সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিবে। এই পারিপার্শ্বিক সংস্কারের জন্যই ছোট সমাজ পার্শ্ববর্ত্তী বড় সমাজের সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া উহার সহিত মিশিয়া যায়। আর এই জন্যই চাষার ছেলে চাষা, দর্জ্জির ছেলে দর্জ্জি ও মুচির ছেলে মুচি হইয়া থাকে। তারা তাদের বাপ-দাদাকে যে পথে যাইতে দেখে, নিজেরাও সেই পথে চলিতে থাকে। কিন্তু সকল কালেই একদল লোক দেখা যায়—যারা বাঁধা পথে চলে না, তারা নিজেরা যে পথটা ভাল মনে করে সেই পথে রওনা

হয়। ইহারা সাধারণ শ্রেণী অপেক্ষা তিক্ষ্ণধী, বুদ্ধিমান ও যুক্তি-প্রিয়। এঁরা গড্ডালিকা-প্রবাহে নীত হন না। এঁরাই যুগে যুগে নানাদেশের নানাসমাজ সংস্কার করিয়াছেন; নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও গ্রহণ করিয়াছেন। এঁরাই কবীর-পন্থী, নানকপন্থী ও প্রোটেষ্ট্যান্ট হইয়াছেন। আর ইঁহারাই বাংলা দেশে ব্রাহ্ম সমাজের সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহারা প্রথম এই পথের পথিক হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্বাধীন পথের যাত্রী। তাঁরা সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা দূরে থাকুক ঘৃণা ও বিদ্বেষই পাইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে সাধারণতঃ নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক নামে অভিহিত করা হয়। ইঁহাদের উপর সর্ব্বদা কটুক্তি বর্ষিত হইতে থাকে। তাঁহারা কদুক্তিগুলি কেমন করিয়া গ্রহণ করেন, তাহার আলোচনায় কাজ নাই, তবে তাঁরা এর কতদূর উপযুক্ত তাহার কথায় তার আলোচনা করিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা নাই। তাহারা কোন বিশেষ ধর্ম্ম মানেন না, তাঁহারা নাস্তিক;—বেশ! কিন্তু তাঁহারা নাস্তিক কেন? তাহারা কিছু নাস্তিক হইয়া জন্মান নাই, কালক্রমে এই মতে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা কোন সুখের প্রলোভনে ঐরূপ হন নাই; যেমন নাকি আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর কেহ কেহ, উচ্চপদ পাইবার আশায় বা সুবিধামত বিবাহ করিবার আশায় খৃষ্টান হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। অপর পক্ষে নিরীশ্বরবাদী হওয়ায় নানা আপদ আছে; তাহার মধ্যে প্রধান—আত্মপরিজনের মৃত্যুতে ভগবানকে ডাকিয়া শান্তি পাইবার উপায় নাই, পাপের বিভীষিকা হইতে উদ্ধারের পথ নাই, বিপদে ভর করিবার বড় কেহই নাই। নিরীশ্বরবাদী হইয়া তাহাকে বিপদে ত্রাণকর্ত্তা, দুঃখে শান্তি, সর্ব্বকালের বন্ধু হারাইতে হয়—অন্ততঃ বাহির হইতে ত এইরূপই মনে হইয়া থাকে। সাধারণের টিটকারী লাঞ্ছনা ত ফাও! কোন না কোন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে লালিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াও (সেখানে তাহার ঈশ্বর-বিশ্বাসী হওয়ার পোণে ষোল আনা সম্ভাবনা) ও এত অসুবিধা সত্ত্বেও যখন তাঁহারা নিরীশ্বরবাদী হইয়াছেন তখন তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তার একটু প্রশংসা করিতে হয় বৈ কি। তাঁহাদের যুক্তি-প্রণালীতে ভুল থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু যে কেহ তাঁদের মত মোটেই আলোচনা না করিয়া তাঁহাদের নাম শুনিবামাত্র ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপের হাসি ফুটাইয়া তুলিবেন বা নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন—এটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিনা। যখন বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া ভট চায্ মশায় পাদ্রীসাহেব ও মৌলবীসাহেব—অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা সত্ত্বেও অকুণ্ঠিত চিত্তে সেগুলিকে নরকস্থ করিতে থাকেন ও আপনার ধর্ম্মকে স্বর্গে ঠেলেন, তখন যদি কাহারও মনে সেই পুরাতন কথা 'nothing like butter' (চামড়ার মত কোন জিনিসই নয়) মনে পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। স্বাধীন চিন্তা ও তৎপ্রসূত কর্ম্মের যে আদর নাই, সে ত জানা কথা। তা না হইলে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্ম প্রচার করায় বিশপ ল্যাটিমার ও রিড্‌লিকেই বা খুঁটিতে বাঁধিয়া পোড়াইবে কেন? পৃথিবী ভ্রমণশীল—এই সত্য প্রচারের জন্য গ্যালিলিওকেই বা শ্রীঘর বাস করিতে হইবে কেন? আর হিন্দু সমাজে বিলাত-ফেরতদের পাত্তা পাইতে এত বেগ পাইতে হইবে কেন? বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অশীতিপর বৃদ্ধের বিবাহই বা চলিবে কেন? আর কুষ্ঠরোগীর বিবাহই বা সম্ভব হইবে কেন?

মানুষ সকল কাজেরই এক একটা কারণ খোঁজে। মানুষ জানতে চায় মানুষ জন্মে কেন? মানুষ মরেই বা কেন? মানুষ কেউ ধনী কেউ নির্ধন হয় কেন? কেউ সুখী কেউ দুঃখী হয় কেন? মানুষ প্রথমে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং আপনাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুসারে কতকগুলি মীমাংসাও করিয়া লইয়াছিল। তাদের বংশধরেরা মোটামুটি সেই মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া লন্; এইরূপেই সমাজগত সংস্কার সমূহ এক পুরুষ হইতে অন্যপুরুষে সংক্রামিত হইয়া থাকে। কিন্তু কতকগুলি বেয়াড়া বংশধর—গোপালের মত সুবোধ ছেলে না হইয়া পূর্ব্বপুরুষের মীমাংসার উপরেও প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, কেন? এটা হবে কেন, ওটার কারণ কি? এদের প্রমাণ কোথায়? ধর্ম্মে, সমাজ, রাষ্ট্রে, দর্শন-বিজ্ঞানে এই মহাপুরুষেরাই জগতকে চালিত করিয়াছেন। তাঁরা নূতন নূতন পথে

জগৎকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন। পূর্ব্বে ধারণা ছিল বসুন্ধরা নিশ্চল; গ্যালিলিও প্রমাণ করিলেন পৃথিবী চঞ্চল ঘূর্ণ্যমান। নিউটন প্রশ্ন করিলেন, আপেল পড়ে কেন? আচার্য্য বসু বলিলেন,বৃক্ষজগৎ প্রাণহীন নির্জ্জীব নহে প্রাণবন্ত চেতন। আপনি ইঁহাদের নূতন পথে চলাকে কি নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন? তা হলে যে আপনাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা সাধিত অনেক সুবিধাই ছাড়িতে হয়! এঁদের নূতন পথে চলার যদি আপনি সমর্থন করেন, তবে ধর্ম্ম বিষয়ে নূতন পথের পথিকদিগকে আপনি সমর্থন করিবেন না কেন? যদি আপনি বিজ্ঞানের নূতন ব্যাখ্যাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে ধর্ম্ম বিষয়ে নূতন ব্যাখ্যাকে আদরে গ্রহণ করিবেন না কেন? যদি বলা যায়—ধর্ম্মপন্থী ঋষিগণ ভগবানের নিকট হইতে revealation বা প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন,সুতরাং তাঁহারা অভ্রান্ত। তবে অপরপক্ষে বলা যাইতে পারে যে বিজ্ঞান-সাধকেরাও ত সত্যের অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারাও ত সেই সত্যরূপী ভগবানকেই অন্যরূপে আরাধনাতে জীবন পাত করিয়াছিলেন। তবে তাঁহারাই বা কোন্ স্থানে ভ্রান্ত হইলেন কেন! আর ঋষিদের নিকটেই সমস্ত সত্য revealed (উদ্ভাসিত) হইল কেন? সত্যই যদি ব্রহ্ম হয়, তবে বিজ্ঞান-সাধকদিগের অপরাধ কি? এ বিষয়ে বলিলে অনেক কথা বলিতে হয়, তবে মোটামুটি একটা প্রশ্ন করা যায় যে—যদি ধর্ম্মাচার্য্যগণ প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং যাঁহাকে জানিলে নিখিল বিষয়ের জ্ঞান হয় তাঁহাকেই জানিয়াছিলেন, তবে তাঁহারা কেন শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়েই প্রত্যাদিষ্ট হইলেন, বিজ্ঞানের এতগুলি শাখার মধ্যে কোনো বিষয়েই নানা দেশের বহু সংখ্যক ধর্ম্মাচর্য্যদের মধ্যে কেহই revealation বা প্রত্যাদেশ পাইলেন না? তাঁহারা রোগ-পীড়িত মানবের জন্য কোন সর্ব্বরোগ-হর মহৌষধ বা উহার প্রস্তুত-প্রণালীও ত জানিতে পারিতেন। এমন কোন দ্রব্যও তো পাইতে পারিতেন, যাহা খাইয়া মানব নানাবিধ দুঃখ ও অবসাদ হইতে নিস্তার পায়! তাঁহারা যদি সমগ্র সত্যেরই মালিক হইলেন, তবে শুধু আধ্যাত্মিক তত্ত্বই সার করিলেন কেন? বৈজ্ঞানিক যেমন শুধু বিজ্ঞান বিষয়ে সত্যই পাইলেন, তাঁহারাও তেমনি শুধুই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পাইলেন, এ কেমন কথা? নিখিল সত্য জানার লক্ষণ কি? এই সব ধর্ম্মাচার্য্যগণের কথা আমরা শাস্ত্রে পাই, কিন্তু শাস্ত্রে আমরা অত্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি কি? শাস্ত্র পুরাপুরি মানিতে হইলে আপনাকে মনুমহারাজের অনুজ্ঞা-অনুসারে—ব্রাহ্মণের সহিত এক আসনে উপবিষ্ট শূদ্রের কটিতে তপ্ত লৌহ বিদ্ধ করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে অথবা কটি ছেদন করিতে হইবে, গৌরী (অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা) দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে হইবে এবং আরও বহুকর্ম্ম করিতে হইবে যাহাতে আপনি সম্ভবতঃ স্বীকৃত হইবেন না। এখানে হয়ত কেহ বলিবেন—"দেখ বাপু, আজ যা তুমি যুক্তির দ্বারা বিচার করিয়া বা বিজ্ঞানের কষ্টি-পাথরে কষিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ফেলিয়া দিতেছ, কাল্কেই আবার বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সেইটাই প্রামাণিক ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পার। যখন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের কোন স্থিরতা নাই, তখন তোমার অত বাড়াবাড়ি সুশোভন নহে।" তথাস্তু! আপনি কি তবে বলিতে চান—যেহেতু ভবিষ্যতে অমুক সংস্কার বা লোকাচার নির্ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, সেই হেতু সেই সংস্কারে বিশ্বাস করিতে হইবে? আজ যদি কেহ আপনার নিকট বলে, "মহাশয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি এক কোটি মাইল দূরে দূরে সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের ত্রিকোণাকৃতি অনুচরদিগের এক একটী ঘাঁটি আছে, সেখান হইতে তাহারা প্রতি নবমী তিথিতে ভগবানের রাজ্যে পাহারাদারি করিয়া থাকে অথবা নিদ্রিতাবস্থায় মানুষের আত্মা তলপেটে জড় হইয়া থাকে এবং আপনাকে ভরসা দেয় যে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে এইগুলি প্রমাণিত হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে, তবে উহা আপনি বিশ্বাস করিবেন কি? ভবিষ্যতে নির্ভুল প্রমাণ হইলেও হইতে পারে এমন সংস্কার মানিয়া আমাদের লাভ কি? আজ যদি বিজ্ঞান প্রমাণ করে, ভূতপ্রেত নাই, তবে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে উহাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে বলিয়া বর্ত্তমান প্রমাণকে বিতাড়িত করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? ভবিষ্যতে সেটা যে প্রমাণিত হইবে, তাহারই বা

নিশ্চয়তা কি? সম্ভাবনার উপরে নির্ভর করিয়া আমরা সত্যকেও ত অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিতেও পারি। আর এই সত্যকে বিদায় করিয়া আমরা মহা-অসুবিধায় পড়িতে পারি, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আজ যদি বিজ্ঞান ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব নাই প্রমাণ করে, তবে ভবিষ্যতের দোহাই দিয়া সত্যকে উপেক্ষা করিয়া এত লোকের একটি মহা ভয়ের কারণ বর্ত্তমান রাখা যুক্তিসঙ্গত, না লাভকর, না সুবিধাজনক? ভবিষ্যতে আমাদের মৃত্যুর পর কত কি আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হইবে, তাহাতে আমাদের কি আসিয়া যায়! ভবিষ্যতে হয়ত রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে এমন কোন মহৌষধ প্রস্তুত হইবে যাহা ভক্ষণে মানবের পঞ্চশত বৎসর পরমায়ু হইবে বা এমন কোন উপায় উদ্ভাবিত হইবে যদ্দারা মঙ্গল গ্রহে গমন করা যাইবে, কিন্তু তাহাতে আমাদের কি লাভ? আমরা বর্ত্তমানে যে সংস্কার পোষণ করিব ও যে যে দেশাচার ও লোকাচার গ্রহণ করিব, তাহা সু হউক বা কু হউক তাহার ফল আমরা ভোগ করিব; ভবিষ্যৎ বা অতীত তাহার সুখাংশ বা দুঃখাংশ গ্রহণ করিতে আসিবে না। আমরা যাহা করিব তাহার ফলভোগী আমরা। আপনি যদি মনে করেন, পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মরিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়; আর আপনি যদি সেই ধারণা-অনুযায়ী লাফাইয়া পড়িয়া মরেন, তবে তার জন্য দায়ী আপনি, আপনার বুদ্ধি, আপনার বিচার। আর কেহই নহে, ভবিষ্যৎ নহে, অতীতও নহে।

এখন কথা হইতেছে, কাহারা স্বাধীন চিন্তা করিবেন! নির্ভুল রূপে চিন্তা করার ক্ষমতাও সকলের সমান নহে, সকলেই যদি স্বাধীনচিন্তা আরম্ভ করিয়া দেন আর সেই চিন্তানুযায়ী চলিতে থাকেন তবে সমাজ টিকিবে কি না! অরাজক রাজ্যের মত সকলেই স্ব-স্ব প্রধান হইয়া উঠিবে কি না? যদি ওঠে তবে সমাজে চিরস্থায়ী বিপ্লব চলিতে থাকা অসম্ভব নয়, সুতরাং যা আছে তাকে মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এ কথার অসারত্ব প্রমাণ হইবে। বিপ্লব হইতে পারে, কিন্তু সেটা চিরস্থায়ী হইবে না। রাষ্ট্র-জগতে যেমন দেখা যায় বিপ্লব বেশী দিন স্থায়ী হয় না; বিপ্লবের অনতিবিলম্বেই কোন শক্তিশালী ব্যক্তি রাজদণ্ড গ্রহণ করেন অথবা কোন নির্দিষ্ট শাসনপ্রণালী রাষ্ট্রে প্রবর্ত্তিত হয়; সমাজেও তেমনি বেশীদিন বিপ্লব স্থায়ী হয় না। শক্তিশালী মনের নেতৃত্বে সমাজ অনেক পরিবর্ত্তন ও নূতন গ্রহণ করিয়া নবরূপে দেখা দেয়। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়েও যেমন দেখা যায়, দেশের সব লোক বিপ্লবে যোগদান করে না, একদল লোক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধেই থাকিয়া যায়, সমাজ-বিপ্লবেও তেমনি। সমাজ-বিপ্লবেও উন্নতি-কামীরা যখন দেশকে সঙ্গে লইয়া সম্মুখে ছুটিতে থাকে, তখন একদল লোক দেশকে পুরাতন গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। সমাজ প্রথমে খুব আন্দোলিত হইলেও শেষে এই দোটানায় পড়িয়া একটা মাঝা-মাঝি পথ ধরে। এজন্য স্বাধীন চিন্তায় বাধা দিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ইহার নজীর-স্বরূপ মাইকেলের সময়কার কথা বলা যাইতে পারে। তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার বন্যায় শিক্ষিত যুবকসমাজ ভাসিয়া যাইতে ছিল। মদ্যপান খুব চলিতেছিল। সভ্যতার তখন লক্ষণ হইয়াছিল গোমাংস পবিত্র ভক্ষ্য, হ্যাটকোট একমাত্র পোষাক এবং ইংরাজী একমাত্র পঠিতব্য ও কথিতব্য ভাষা। এই প্রকার হইয়াছিল তখনকার অবস্থা; কিন্তু এ ভাব স্থায়ী হইয়াছিল কি? তা হয় নাই! এর উগ্রতাটুকু উবিয়া যা বাকি ছিল বা আছে, তা দেশের উপকারই করিয়াছে। তাই স্বাধীন চিন্তাকে ভয় করার কোন কারণ নাই। বিপ্লবকে ভয় করিলে চলিবে না। বিপ্লব আমাদের চাই। আর এটাই যে প্রাণের লক্ষণ তা নিজেদের দিকে চাহিলেই টের পাওয়া যাইবে। ভারত এত যুগ পরাধীন কেন? কারণ তার মধ্যে প্রাণ নাই। সুতরাং তার মধ্যে স্বাধীন চিন্তার সংঘাত নাই, সমাজে বিপ্লব নাই, রাষ্ট্রে বিপ্লব নাই, কোনদিকে কোন উত্থান নাই। চারিদিকে শুধু শান্তি, শান্তি আর শান্তি। এ অসহ্য শান্তি, এ নিস্তব্ধতা মৃতের লক্ষণ। জাপান উন্নত কেন? কারণ জাপানের দেহে চির-চঞ্চল বেগবান প্রাণ রহিয়াছে। তারা পুরাতন ভেঙ্গে নূতন গড়ে আপনাদের বিজয়-পদক্ষেপ ফেলে মার্চ্চ করে চলেছে। পুরাতন ভাঙতে তাদের হাত কাঁপে নাই, প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয় নাই; নির্ম্মম হাতেই তারা পুরাতনকে উপড়ে ফেলেছে; আবার তেমনি জয়গর্ব্বে আর

এক হাতে নূতন গড়ে চলেছে। এই ত স্বাধীন মানুষের স্বাধীন মনের ধারা! পুরাতন আমার আদরের ততক্ষণ, যতক্ষণ সে আমার সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারবে, আমার বিজয়-যাত্রার পথের সাম্‌নে এসে দাঁড়াবে সে। যখন সে আমার পথের সাম্‌নে পথরোধ করবে তখন আমি তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবো; যেরূপেই আমার সম্মুখে আসুক, তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতেই হবে। আমার পরিচালক হচ্ছে যুক্তি আর তার কষ্টি পাথর হচ্ছে বিজ্ঞান; এ বিজয় যাত্রার পথে স্বয়ং ভগবানও রেহাই পাবেন না। তুমি সমাজ-সংস্কার, তুমি যদি এসে বল—তুমি বিধবা তুমি বিবাহ কর; আমি জিজ্ঞাসা করব—কেন করব? তোমার যুক্তি কি? যুক্তি দাও করছি। তুমি হিন্দু—তুমি বলছ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ কর, আমি বলব—রাজি আছি, শুধু যুক্তি দাও। তুমি প্রতিমা-পূজক তুমি বলছ—প্রতিমা পূজা কর; আমি বলব আপত্তি নাই, তোমার যুক্তি দাও। তুমি মুসলমান ইস্‌লাম ধর্ম্ম নিতে বলছ, তুমি খৃষ্টান খৃষ্টধর্ম্ম নিতে বলছ;—মন্দ কি? কিন্তু নেব কেন? তোমার যুক্তি কি? আর কোণে বসে আছ তুমি কে? তুমি নিরীশ্বর-বাদী? বেশ, এস আমাকে বুঝিয়ে দাও, তোমার মত সত্য, আমি তোমার মত নিতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করব না। তোমাদের যার যা আছে নিয়ে এস, কিন্তু সঙ্গে যুক্তি আনা চাই, আমাকে বুঝিয়ে দাও, আমি এক মুহূর্ত্তে তোমাদের হয়ে যাব। এই আমার কথা, আর এই হচ্ছে স্বাধীন মনের কথা। আমার কোন কিছুতেই আপত্তি নাই—আমি যে সত্যের উপাসক। তোমার মত যদি সত্য হয়, আমি তাহা মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করব, তাতে আমার যত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয় হোক, আমি কাতর হব না, কিছুতেই দমে যাব না। আমি জানি—যুক্তি আমার দিকে, সত্য আমার সহায়। আমি সুবিধাবাদী নই; আমি Ignorance is bliss বলে চোখে কাণে তুলো গুঁজে থাকতে পারব না। আর এস দেশের নবীনের দল, যদি প্রাণে সাহস থাকে, হৃদয়ে বল থাকে, এস! পুরাতনের সাধা পথ যদি ঠিক না হয়ত নিজ হাতে গড়ে নিয়ে নূতন পথে আমরা চলব, প্রাণ কাঁপবে না, হৃদয় টলবে না। আমরা অসীম সাহসে দুর্জ্জয় বেগে সম্মুখে অগ্রসর হব, এ মার্চ্চের সাম্‌নে সব বাধা চুরমার হয়ে যাবে। পদতলে আমাদের "থর থর করে কাঁপবে ভূধর, শিলা রাশি রাশি পড়িবে খসে।" আর অধীর আনন্দে সমস্ত প্রাণ গাহিয়া উঠিবে—

"ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্ কারা আঘাতে আঘাত কর্—
ওরে কি গান গেয়েছে পাখী, এসেছে রবির কর!"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

বায়োস্কোপের অভিনয়

বায়োস্কোপের এই নির্ব্বাক অভিনয়-লীলা আমাদের মনে আজ যে অনেকখানি বিভ্রম, অনেকখানি উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শুধু আমোদের দিক দিয়াই নয়, শিক্ষার দিক দিয়া এবং ব্যবসার দিক দিয়াও বায়োস্কোপ আজ সারা পৃথিবীতে খুব সেরা আসন গ্রহণ করিয়াছে। তবে এ ব্যবসায়ে যে-সে লোক আসিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ পাটের মহাজন ইহার রস বা মর্ম্ম বুঝিবার তোয়াক্কা রাখে না। ছবি দেখিয়াই সে খুসী; তবু কলেজের বিজ্ঞ অধ্যাপক হইতে পেটো-মহাজন অবধি সকলেই বায়োস্কোপের ছবির ভক্ত।

এই যে বায়োস্কোপের প্রতি সাধারণের এত অনুরাগ, এত টান, ইহার কারণ কি? ঐ যে সাদা পর্দ্দা টাঙ্গানো রহিয়াছে, রঙ্গগৃহের আলো নিভাইয়া দেওয়া মাত্র এক-বাড়ী লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া ওঠে, ঐ পর্দ্দায় এখনি বিদ্যুতের গতিতে নানা লোকের কি বিচিত্র মেলা বসিবে, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি ও অশ্রু মালার পর মালা গাঁথিয়া যাইবে,—নির্ব্বাক ভঙ্গী দিয়া এখনি পৃথিবীর এক-কোণের জীবন-

ম্যাডানের তোলা—মহাভারত

উচ্ছ্বাস কি অপূর্ব্ব ছন্দেই না চঞ্চল সজীব হইয়া উঠিবে, কি মোহ আছে উহাতে !

এই বিশ্বব্যাপী অনুরাগের কারণ, উপন্যাস বা নাটক পড়িয়া সকলে তার সঠিক মর্ম্ম বোঝে না; শিক্ষায় মন দস্তুর-মত তৈরী না হইলে মানুষের চিত্ত-বৃত্তির বিচিত্র বিকাশ,—উপন্যাস বা নাটকের পটে যেমন করিয়াই ফলানো হউক, সকলের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু ছবির পটে পর্দ্দার গায়ে অভিনয়ের যে বিচিত্র ভঙ্গী ফুটিতেছে, তাহা সকলকে বিমুগ্ধ করিতেছে। পৃথিবীতে এই চলাফেরার ফাঁকে ফাঁকে মানুষের মন নানাভাবে ওত-প্রোত হয়, নানাদেশের কত বিচিত্র বার্ত্তাই প্রাণটাকে উদারতায় ভরাইয়া তোলে, মনের আঁধার কাটিয়া দেয়! এই যে কখনো সুখ, কখনো দুঃখ, কখনো রাগ, কখনো অভিমান, কখনো হর্ষ, কখনো শোক—ইহার পরশ প্রাণে লাগে নাই, এমন মানুষ জগতে বিরল। তাই ঐ ছবিটুকুতে তাহারই ফটো দেখিয়া দর্শকের মনের সুপ্ত তার একটা না একটা ভাবে ঝঙ্কৃত হয়! সে তার নিজের মনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখে ঐ ছবির পটে, তাই চলচ্চিত্রের এত আদর। তার কত সুপ্ত আশা, লুপ্ত স্বপ্ন ছবির তরঙ্গে প্রাণে দুলিয়া ওঠে! সে বোঝে পৃথিবীর সকল নরনারীর মনটা এক—তা সে যে ভাষায় কথা কহুক, আর যে পোষাকই গায়ে পরুক, আর তার গায়ের রঙ কটাই হউক, বা কালোই হউক! তাই চট করিয়া ছবির অভিনয়-লীলা চকিতে দর্শকের চিত্তে ভাবের সাড়া পায়, সহানুভূতি জাগাইয়া তোলে!

সেই জন্যই বায়োস্কোপের অভিনয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীর খুব ওস্তাদ ও কৃতী হওয়া প্রয়োজন। থিয়েটারের কাটা-সৈন্যের স্থান বায়োস্কোপে নাই! বায়োস্কোপের

অভিনেতার নানা রসে রসিক হওয়া চাই। তাঁর পড়াশুনার প্রয়োজন, ভাব-চিন্তায় সাধনার প্রয়োজন, অর্থাৎ তাঁর চৌখস্ রকমের আর্টিষ্ট হওয়া চাই। ভাব-ভঙ্গীর অক্ষমতা থিয়েটারের অক্ষম অভিনেতা গলার জোরে চাপা দেয়— এখানে গলাবাজির ঠাঁই নাই। এখানে চটপট কাজ সারা দরকার! কাজেই খুব smart আর্টিষ্ট না হইলে বায়োস্কোপ-অভিনয়ে সফলতা লাভ সম্ভব হয় না। বায়োস্কোপের অভিনয়-সম্বন্ধে মোটামুটি দুই-একটা কথা আজ পাড়িতে চাই; কিন্তু তার আগে একটা ক্রটি সারিয়া লওয়া দরকার।

আর বারে একটা কথা বলা ভুল হইয়াছিল। 'বেদৌরা' 'নর্ত্তকী তারা' ছবি জ্যোতিশবাবু তোলেন নাই। ম্যাডান

ম্যাডানের তোলা—মহাভারত

কোম্পানির ছবির মধ্যে জ্যোতিশবাবু তুলিয়াছেন,—হরিশ্চন্দ্র, বিল্বমঙ্গল, মহাভারত, ভাগীরথ-গঙ্গা, পরীক্ষিৎ, রাজা ভোজ, দক্ষ, আর Topical Budget-এর বিভিন্ন অংশ। তারপর ইণ্ডো-ব্রিটিশ কোম্পানি নামে যে বাঙ্গালী ফিলম্ কোম্পানি মধ্যে মাথা তুলিয়াছিল, সে কোম্পানিতেও যোগ দিয়া তিনি তোলেন,—বিলাত-ফেরত, যশোদানন্দন ও সাধু কি শয়তান!

ম্যাডানের 'মোহিনী' চিত্রে নাট্যাধ্যক্ষতা (direction) করেন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁহার শিক্ষায় রাণীর ভূমিকায় মিস্ পেসেন্স কুপার চমৎকার অভিনয় করেন। মিস্ আলবার্টিনা মোহিনীর ভূমিকা লইয়া ছিলেন। তাঁর অভিনয় ভালো, তবে চেহারা খাপ খায় নাই। মোহিনী বলিতেই সেরা-রূপসী তন্বঙ্গী নবযৌবনার ছবি আমাদের মনে উদয় হয়—কিন্তু 'মোহিনী' ছবিতে মোহিনীর বয়স বেশী হইয়া ছিল, এই যা খুঁৎ। তবে সে খুঁৎ অভিনয়ের মাধুর্য্যে ঢাকা পড়িয়াছিল। রাজা রুক্মাঙ্গদ সাজিয়াছিলেন শিশিরকুমার।

রুক্মাঙ্গদ সত্যপরায়ণ রাজা, বিষ্ণুপরায়ণ, মমতায় প্রাণটি

ভরা ; রাণীর সহিত প্রণয়ের সীমা নাই। রাজার একটি পুত্র—রাজা তাহাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন। মৃগয়ায় গিয়া বনমধ্যে রাজা মোহিনীকে দেখেন। মোহিনী বিষ্ণু-মায়া—রাজার ভক্তি-পরীক্ষার জন্য তিনি তরুণী রূপসীর মূর্ত্তি ধরিয়া বনমধ্যে আবির্ভূতা হন্। রাজা মোহিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁর চরণপ্রান্তে দাঁড়াইলেন, হৃদয়প্রার্থী হইয়া। মোহিনী রাজার অনুরাগ দেখিয়া রাজাকে গ্রহণ করিলেন ; তবে সর্ত্ত হইল,—তাঁর কথায় রাজাকে চলা-ফেরা করিতে হইবে। রাজা বলিলেন, তথাস্তু! তার পর মোহিনীকে লইয়া রাজা রাজধানীতে ফিরিলেন। কুমার ছুটিয়া আসিল ; রাজা তাহাকে কোলে লইলেন। মোহিনী বলিলেন,—না, না, নামাইয়া দাও। রাজা এই নিষেধে রূপমুগ্ধতার প্রথম বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিলেন। বুক ছিঁড়িয়া গেল, তবু তিনি সত্য রক্ষা করিলেন,কুমারকে কোল হইতে নামাইয়া দিলেন। তারপরে রাণীর পানে ফিরিয়াও চান না—মোহিনীকে লইয়াই মত্ত। রাণী দূর হইতে দেখেন আর উপেক্ষার ছুরি তাঁর বুকটাকে ছিঁড়িয়া খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলে। তারপর একদিন—সেদিন একাদশী—রাজা একাদশী ব্রত পালন করেন, কিন্তু মোহিনীকে লইয়া সব ভুলিয়া আছেন! কি করিয়া তাঁর ব্রত পালন হয়—রাণীর চিন্তা হইল। রাণীর আদেশে রাজ্যে ঢ্যাঁড়া পড়িল কাল একাদশী। রাজা সে ঢেঁড়া শুনিলেন। ধর্ম্ম-রত রাজার মন টলিল ; তিনি মোহিনীর ভুজপাশ হইতে ছুট চাহিলেন, ব্রত পালনের জন্য। মোহিনী সম্মত হইল, বেশ, কিন্তু কুমারের শির শাণিত তরবারিতে স্কন্ধচ্যুত করিতে হইবে! এ সেকালের কথা। ব্রতপালন ধর্ম্ম, তার দাম কুমারের শিরের চেয়ে ঢের বেশী বলিয়া রাজা বুঝিলেন। তিনি তাহাতেই সম্মত! কুমারকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া আনা হইল—রাণী আসিলেন।

মোহিনী ও রুক্মাঙ্গদ

পাত্রমিত্র আসিল। সকলে নিষেধ করিতে লাগিল। মোহিনীর পায়ে পড়িয়া রাণী ও পাত্রমিত্র কুমারের প্রাণ ভিক্ষা চাহিল—মোহিনী তাতে টলিল না। তারপর রুক্মাঙ্গদ শাণিত খড়্গ লইয়া কুমারের স্কন্ধে হানিলেন—তখন সেকালে যাহা নিত্য হইত, তাহাই হইল—অর্থাৎ ভক্তির জয়! কুমারের কিছু হইল না। খড়্গের আঘাত পুষ্পমাল্য হইয়া কুমারের কণ্ঠ ভূষিত করিল। ইহার মধ্যে ভাবের দ্বন্দ্ব, ভাবের দোলা খুব আছে, আর সে ভাব খুলিয়াছে শিশিরকুমার, মিস্ পেসেন্স কুপার ও মিস্ আলবার্টিনার অভিনয়ে চমৎকার। এ ছবিগুলি অতিশয় সুন্দর। ছবি তুলিয়াছেন তরুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সান্যাল। জ্যোতিশবাবুর কাছে ইঁহার ছবি তোলায় হাতে খড়ি হয়। ননীবাবু এখন তাজমহল কোম্পানির

ফটোগ্রাফার। তাঁর ওস্তাদির পরিচয় সকলে পাইয়াছেন, তাজমহল কোম্পানির 'আঁধারে আলো' ও 'মানভঞ্জন' ছবিতে। তাঁর বিশদ পরিচয় দিব, তাজমহল কোম্পানির ছবির আলোচনা-প্রসঙ্গে।

'পতিভক্তি' ছবির সম্বন্ধে সেবারে বলিয়াছিলাম, এখানি চলনসই হইয়াছে। কেন এ কথা বলিয়াছি, একটু খুলিয়া বলি। 'পতিভক্তি'তে আর্টের চেয়ে 'thrill' অংশই খুলিয়াছে বেশী। সেদিক দিয়া ছবি খুব সফলতা লাভ করিয়াছে। Chasing ও sensational situation-এর অভাব নাই; তাছাড়া অনেক শিক্ষা আছে—তবে legal techniqueএ এমনি অসঙ্গতি হইয়াছে যে তার জন্য অনেকখানি রসহানি ঘটিয়াছে। খুনী মামলায় পুলিশ প্রথমে খুব কড়া তদন্ত করে—তারপর ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তদন্ত (preliminary enquiry) চলে; ম্যাজিষ্ট্রেট যদি দেখেন, প্রচুর প্রমাণ আছে, তখন সে মামলা সেশন কোর্টে যায়। ইহাতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। পতিভক্তিতে খুনের দায় স্ত্রী নিজের ঘাড়ে লইবার জন্য হাইকোর্টের বিচার-অবধি প্রতীক্ষা করিলেন কেন? তার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পুলিশের কাছে বা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তিনি নিজেকে আসামী বলিয়া চালাইয়া দিতে পারিতেন; তাহাতে সকল দিক রক্ষাও পাইত। তাহা না করিয়া নাটকীয় climax ফুটাইবার জন্য শেষ-পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা দোষের হইয়াছে; ছবির রসভঙ্গও হইয়াছে।

উপেক্ষিতা রাণী—মোহিনী

এ দোষটুনা ঘটিলে 'পতিভক্তি'কে একখানি উৎকৃষ্ট ছবি বলিতে পারিতাম।

মহাভারত, ধ্রুব প্রভৃতি ছবিতে setting ভালো; তবে একালের ঘরবাড়ী সেকালের ঘর-বাড়ীর স্থান দখল করায় দর্শকের মনে একটা বিষম ঘা দেয়।

যাহা হউক, এই যে-সব পৌরাণিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিচিত্র চিত্রনাট্যে এদেশী কাব্য-কথা ছবিতে
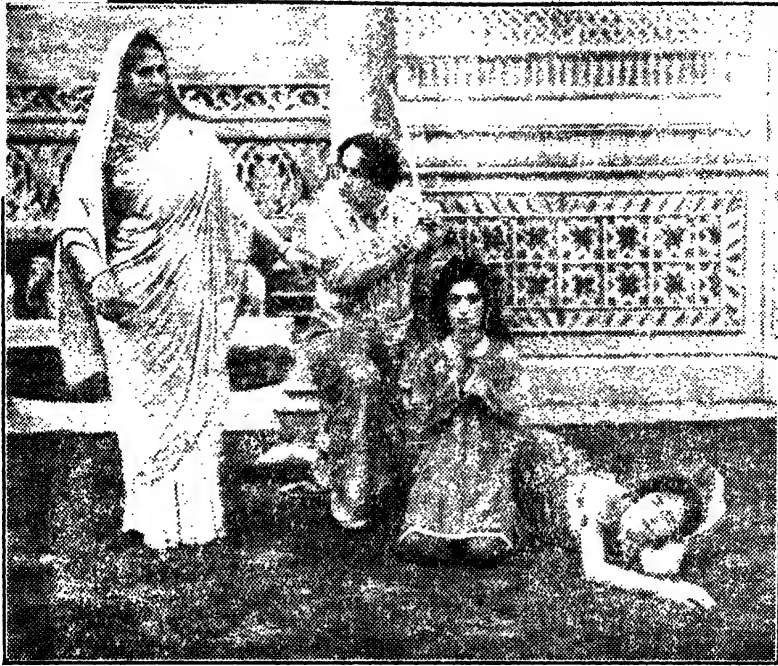
রুক্মাঙ্গদ, মোহিনী, কুমার ও মূর্চ্ছিতা রাণী

দেখাইবার চেষ্টা ম্যাডান কোম্পানি সুরু করিয়াছেন, সেজন্য আমরা প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ দিই ম্যাডান কোম্পানির পরিচালক শ্রীযুক্ত রোস্তমজী সাহেবকে। ইনি জে, এফ, ম্যাডান সাহেবের জামাতা। ম্যাডান সাহেবের তৃতীয় পুত্র জাহাঙ্গীর সাহেব এ বিষয়ে তাঁর যোগ্য সহকারী। এই দুই জনের প্রাণপাত পরিশ্রমে ম্যাডান কোম্পানি এদেশী চিত্র-নাট্যের অবতারণায় সক্ষম হইয়াছেন এবং কোম্পানি এ বিষয়ে অনেকাংশেই সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাঁরা যদি এ ক্ষেত্রে না নামিতেন, তাহা হইলে এদেশে এ প্রচেষ্টাও কেহ করিত কি না সন্দেহ। ম্যাডান কোম্পানিই এবিষয়ে প্রথম যোগ্য পথপ্রদর্শক।

তবে তাঁহাদের অসুবিধা কোথায়, তাহাও আমরা বুঝি। তাঁরা পার্শী। বাঙালী আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ; তার উপর পুরাণ ও শাস্ত্রাদি সম্বন্ধেও পরের কাছ হইতে তাঁদের জ্ঞান আহরণ করিতে হয়। যাঁরা সে জ্ঞানের বার্ত্তা তাঁহাদের কাছে লইয়া যান, তাঁরা যদি ফাঁকিতে কাজ সারেন, তবে রোস্তমজী সাহেব ও জাহাঙ্গীর সাহেব সে ফাঁকি কি করিয়া ধরিবেন! এই জন্যই কয়েকখানি চিত্রে কতকগুলা গলদ রহিয়া গিয়াছে। তাঁরা যদি এ বিষয়ে ভালো আর্টিষ্ট ও ডিরেক্টরের সহায়তা পাইতেন, তবে এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি, ম্যাডান কোম্পানির তোলা নাট্যচিত্র ভারতে অপূর্ব্ব গৌরব ও গর্ব্বের সামগ্রী হইয়া উঠিত!

কাজেই এ সব খুতের জন্য কোম্পানিকে দায়ী করা যায় না। এ খুত উক্ত কারণেই ঘটিয়াছে। এই সব খুত সারিতে suggestions লইবার জন্ত রোস্তমজী সাহেব ও জাহাঙ্গীর সাহেব সর্ব্বদাই তৎপর আছেন, উন্মুখ আছেন। কোম্পানী যখন এত অর্থ এদিকে ব্যয় করিতেছেন, তখন তাঁহাদের উচিত, এমন আর্টিষ্ট বিশেষ যত্নে খুঁজিয়া বাহির করা, যাঁরা ফাঁকিতে কাজ

সারিবার লোক নন্; যাঁরা ঠকাইয়া পয়সা খাইতে ঘৃণা বোধ করেন! এমন বাঙালী আর্টিষ্ট দেশে আছেন, যাঁরা পয়সার চেয়ে আর্টকে শ্রদ্ধা করেন ঢের বেশী, আর্টের দাম পয়সার চেয়ে ঢের বেশী বলিয়া বোঝেন।

তারপর একটা কথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, বায়োস্কোপে বিলাতী ছবি দেখিতে আমাদের বাঙালী দর্শকের যে-ভিড় হয়, দেশী ছবি দেখিতে তার সিকির সিকিও হয় না কেন? তাছাড়া এক-একটা বিলাতী ছবি অমন এক বার পর্দ্দায় দেখানো সুরু হইলে বহুদিন ধরিয়াই সে দর্শক-সংগ্রহে সমর্থ হয়, অথচ দেশী ছবিতে তেমন হয় না।—ইহারই বা কারণ কি?

অনেকগুলি কারণই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিছুকাল পূর্ব্বে কেহ কেহ বলিতেন, এটা গরম দেশ আর য়ুরোপ-আমেরিকা ঠাণ্ডা দেশ। ছবির নেগেটিভ সেখানে যতটা পাকা তৈয়ারী হয়, পশিটিভ যেমন বেশীদিন অটুট থাকে, কেমিক্যালে যতটা গুণ সেদেশে থাকে—গরম দেশ বলিয়া এখানে সেগুলায় খুঁত থাকিয়া যায়। এ কথা একটুও খাঁটী নয়—বিশেষজ্ঞরা বলেন। সেই যে একটা কথা আছে, আনাড়ি কারিকর তার যন্ত্র-পাতির দোষ দেয় (A bad workman quarrels with has tools)—এ কথাটা তাহারি প্রতিধ্বনি! গরম আবহাওয়ার জন্য এখানে Chendrals এ কোন দোষ ঘটে না,—নেগেটিভ বা পশিটিভকে অটুট্ নিখুঁৎ রাখিতেও সেজন্য এতটুকু বেগ পাইতে হয় না। সে দোষ যাঁরা দেন, তাঁরা হয় ফিল্‌ম্-ফটোগ্রাফির কিছুই জানেন না, নয় তো তাঁরা আনাড়ি ফটোগ্রাফার। তাছাড়া ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণই আমরা কয়েকখানি এদেশে-তোলা ছবিতে পাইয়াছি। ম্যাডান কোম্পানির তোলা মাতৃস্নেহ, বেদৌরা, নুরজাহান প্রভৃতি ছবি, তাজমহলের তোলা মানভঞ্জন ও ফটো-প্লে সিণ্ডিকেটের তোলা Soul of a Slave ছবিতে অন্ততঃ ফটোগ্রাফির দিক দিয়া এমন কোন ত্রুটি ঘটে নাই। যাক্—এখন যে কথা বলিতেছিলাম।

পতিভক্তি—দইওয়ালী বেশে পত্নী লীলাবতী

এদেশে বোম্বাইয়ের-তোলা বহু চিত্র বায়োস্কোপে

পতিভক্তির—একটি দৃশ্য

দেখানো হইয়াছে। সে ছবি বাঙালী দর্শক গ্রহণ করেন নাই তার কারণ, সে অভিনয় অত্যন্ত প্রাণহীন, নাটকের উপাখ্যানও গুছাইয়া লেখা নয়—তবে সে সব ছবির Setting চমৎকার। আর নারীর ভূমিকা পুরুষ দিয়া অভিনয় করাইলে চিরদিনই সে অভিনয় বিশ্রী হইবে ও অভিনয়-নামেরই যোগ্য হইবে না। কারণ তাতে আড়ষ্ট ভাব কোনদিন কাটানো তো যাইবেই না—তার উপর ন্যাকামির প্রলেপ পড়িবে! তা সে থিয়েটারেই পুরুষে নারী সাজুক, আর বায়োস্কোপেই সাজুক! এই সব কারণে বোম্বাইয়ের ছবি বাঙালী দর্শকের চোখে পীড়া দিয়াছে।

বাঙলা দেশে তোলা ছবিও যে তেমন ভালো লাগে নাই, তার কারণ—এ-সব ছবিতে যে-সব বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করিয়াছে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রী; আর ডিরেক্টরও খুব পাকা লোক নন্ বলিয়া। ম্যাডান কোম্পানির ছবির কথাই বলিতেছি। কারণ যা-তা অভিনেতা দিয়া ছবি তোলার চেষ্টা এইখানেই বেশী। যেমন-তেমন লোক দিয়া অভিনয় করাইয়া ছবি খাড়া করা যায় না। যা-তা নাটক গীতিনাট্য বাঙলা রঙ্গমঞ্চে কখনো কখনো ধুম-ধাম বাধাইয়া দিয়াছে, সত্য—কিন্তু তা'ও যা ঘটিয়াছে, সে বিলাতী বায়োস্কোপের ছবি দেখায় অভ্যস্ত দর্শকের সৃষ্টির পূর্ব্ব যুগে। এখন বিলাতী চিত্রে বাঙালী দর্শক এমন চমৎকার অভিনয় দেখিতেছে যে তাহারা মেকি ও খাঁটী অভিনয়ের প্রভেদ ধরিয়া ফেলিয়াছে। তার ফল দেখিতেছি বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চে। দুই-চারিজন অভিনেতা খুব ওস্তাদ বলিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে এমন নাম কিনিয়া ফেলিয়াছিল যে তাদের ভুল দেখাইতে গিয়া গিয়া আমরা একাধিকবার বিড়ম্বিত হইয়াছি—এখন তাঁরা হঠাৎ দর্শকের এত অপ্রিয় হইলেন কেন? তার কারণ, দর্শক তাঁদের অক্ষমতা বুঝিয়া ফেলিয়াছে। ধাপ্পা বা মেকির জলুশ ক'দিন থাকে? কিন্তু সে কথাও থাক্—।

বাঙ্‌লা ছবির অনেকগুলিতেই নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান খুব সুসমঞ্জস হইতেছে না। বিলাতী ছবিতে যা দেখিতেছি, দেশী ছবিতে যদি তারই নকল করিবার চেষ্টা দেখি—তাহা হইলে তা প্রাণে লাগিবে কেন? ধরুন,—চ্যাপলিন এখন

অনেক কাণ্ড দেখান্, যা বিলাতী সমাজ, বিলাতী আব-হাওয়ায় সে-দেশের সঙ্গে থাপ খায়—তার নকলে যদি অমনি ডিগবাজী খাওয়া প্রভৃতি দেখাইতে এদেশী অভিনেতার দল মুখে রক্ত তোলেন, তাহা হইলে তিনি হাস্যকর উদ্ভটতারই সৃষ্টি করিবেন মাত্র, কোনদিন কাহারো সহানুভূতি জাগাইতে পারিবেন না। এই প্রচেষ্টার এই সাধনার পথে চলিয়া এক উদীয়মান তরুণ অভিনেতা তাঁর ভবিষ্যৎ একদম মাটী করিয়া ফেলিয়াছেন। সে ছবি বা অভিনেতার বদলাইয়া যায় এবং ফলে যে ছবির সৃষ্টি হয় তা দেখিয়া তাঁদের অন্তরঙ্গ আত্মীয়-বন্ধুও বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করেন, এ কার ছবি? বায়োস্কোপে অভিনয় করিতে গিয়া অনেক অভিনেতাকে আমরা দেখিয়াছি, ঐ ক্যামেরার পানেই ক্রমাগত চাহিতেছেন—অর্থাৎ ছবি কেমন উঠিতেছে! কাহারো এ ভাবনাও আছে, আমার সব expression গুলা উঠিতেছে ত! তার ফলে expression বস্তুটকে তাঁরা এমন বিকট করিয়া ফুটাইতে যান যে মৃদু হাসির উচ্ছ্বাস
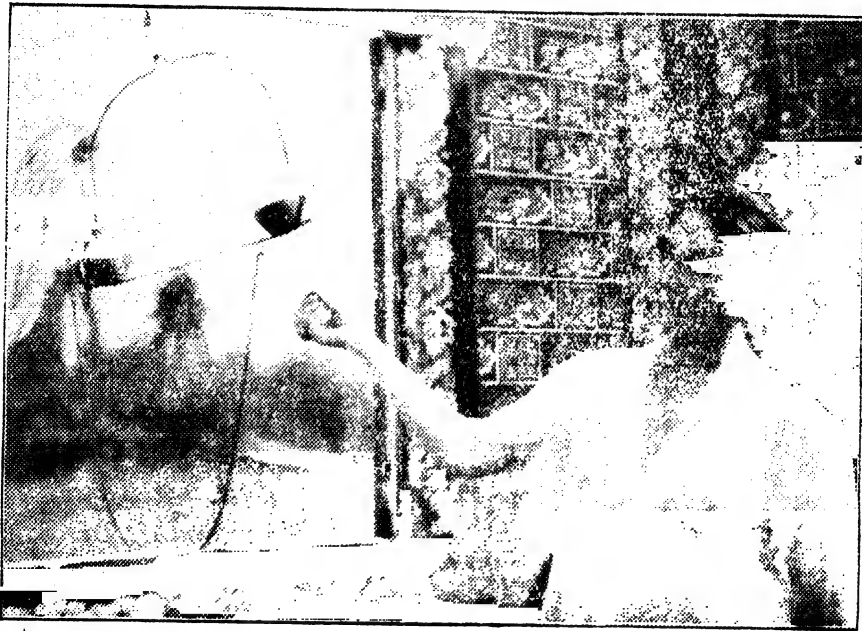
পতিভক্তি গণিকা কামকলা

নাম প্রকাশ করিতে চাহিনা—প্রসঙ্গক্রমে শুধু কথাটা পাড়িলাম।

বায়োস্কোপের অভিনয়ে বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রী যে দোষ করেন, তার একটা কারণ, তাঁরা এ জিনিষটাকে ভালো করিয়া Study না করিয়াই আসরে নামিয়া পড়িতেছেন। বায়োস্কোপের অভিনয়ে কতকগুলা বিষয়ে ভারী হুঁসিয়ার হইতে হয়। এক তো সাদাসিধা ফটোগ্রাফ তুলিতে গেলে আমাদের মধ্যে অনেকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া এমনি আড়ষ্ট হইয়া বসেন যে তাঁদের হাবভাব বিলকুল প্রকাণ্ড হাস্যের ফুৎকারে দন্তমাণিক্যে জাগিয়া ওঠে আর ঘৃণা বা ক্রোধের এতটুকু ইঙ্গিত রাক্ষসে মূর্ত্তি ধারণ করে! বায়োস্কোপের ক্যামেরার সামনে অভিনয়ের সময় চলাফেরার স্বাভাবিক ভঙ্গীকে এক ডিগ্রী নামাইতে হইবে বৈ উঠাইলে চলিবে না। সাদাসিধা চলা ক্যামেরার লেন্সে দ্রুত চলায় রূপান্তরিত হইয়া ফোটে। চলার স্বাভাবিক মাত্রাকে আরো মৃদু আরো একডিগ্রী মন্থর করিলে তবে তাহা স্বাভাবিক ভঙ্গীতে ফুটিবে।

তারপর বাঙলা ছবিতে আর একটা যে দোষ ঘটিতেছে

ধ্রুব

অতিরিক্ত রঙমাখার চাপে। সাহেব-মেম মুখে রঙ মাখিয়া অভিনয় করে—তাদের বর্ণ উজ্জ্বল-গৌর, তাই তারা রঙ মাখে; java powder-এর সঙ্গে light pink বা yellow দেয়, তাদের স্বাভাবিক রঙে তাহা মিশ খায় আমরা যদি তাদের দেখিয়া রঙ মাখিয়া মুখটা জ্যাবড়া করিয়া ফেলি, তাহা হইলে সে বহুরূপী সাজা হইবে।—তার উপর মুখের ভাবভঙ্গী সে রঙের তলায় পড়িয়া ফুটিতেই পাইবে না। এই দোষ ঘটিয়াছে "আঁধারে আলো" ছবিতে। শিশিরকুমারের মত সুদক্ষ অভিনেতার মুখখানিও রঙের ভারে এমন নিপীড়িত হইয়াছে যে মুখে-চোখে ভাবের লীলা ফোট-ফোট হইয়াও স্পষ্ট ফুটিতে পারে নাই। আমাদের মনে হয়, আমরা কালা বাঙালী, রঙ না মাখিয়া যদি অভিনয় করি, তবে তাহাতে ছবি খুলিবে ভালো। এমনি, ফটো তোলাইবার সময় তো কেহ মুখে রঙ মাখি না—তার দরুণ ছবি কি বেমানান্ হয়? এই যে 'মানভঞ্জন' ফিল্মের সূচনায় দেখি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে। তিনি এতটুকু রঙ মাখেন নাই বা সাজসজ্জা করেন নাই—কি স্বাভাবিক ভঙ্গীর সরল ছবিই না ফুটিয়াছে তাঁর! বাঙালী রঙ মাখিলেই বহুরূপী সাজিয়াছে বলিয়া তাকে মনে হইবে। চোখে মুখে wrinkles প্রভৃতির জন্য জন্য তুলির আঁচড়, রঙের পরশ একটু-আধটু লাগাইতেই হইবে—তার জন্য সে-সব techniqes শেখা দরকার। রঙ মাখাতেও বিলাতীর নকল চলিবে না। এই রঙের ঘটায় আমাদের বহু বাঙলা ছবির অভিনয়ে রসহানি

বিয়ের বাজার—কনে দেখা

ঘটিয়াছে। এই দোষ ততটা ঘটে নাই 'মানভঞ্জনে'—রমানাথের চেহারায়। প্রতিভাশালী কৃতবিদ্য কলাবিদ্ অভিনেতা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র বি, এল এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি খুব হুঁসিয়ার ভাবে মুখে রঙের তুলি বুলাইয়াছিলেন—মুখে-চোখে ভাবের খেলা কোথাও আটক পড়ে নাই।

এই সব ক্রটিগুলা সারিতে হইবে। তার পর বাঙ্লা ছবি তোলার সাজ-সরঞ্জাম এখনো বিলাতীর মত যে খুব পোক্ত নুরজাহানের ছবি ঠিকঠাক তুলিতে হইলে আগ্রা, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ঐ সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের লইয়া গিয়া ফটো তোলাইলে সে ছবি সব খুৎ সারিয়া লাখো গুণে ভাল হইত। কিন্তু তার জন্য কত পয়সার দরকার! কাজেই ফাঁকি দিয়া কাজ সারিতে হয়। আগ্রা দিল্লীর দৃশ্যসংস্থান এখানে যেন তেন প্রকারেণ সারিয়া লইতে হয়। ফলে দর্শকের চিত্তও ঘা খায়। এ ক্রটি তখন সারিবে—যখন এ দেশের দর্শক জাতি-গৌরবের নীচে পয়সার দাম

নূরজাহানের একটি দৃশ্য

হয় নাই, তার কারণ পয়সার অস্বচ্ছলতা। এ ব্যবসায়ে অনেক টাকার মূলধন দরকার। এ দেশে বায়োস্কোপের এই অতি শৈশব অবস্থায় বেশী টাকা লইয়া আসরে নামিতে অনেকের দ্বিধা হইতেছে। বিলাতীর সাজ-সরঞ্জাম উৎকৃষ্ট। তাছাড়া তাদের অর্থ এত বেশী যে setting প্রভৃতি ঠিক-ঠাক করিবার জন্য তারা অমন এক একটা প্রকাণ্ড নগরেরই সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে ছবির জন্য। আমরা তা পারি না। ফেলিবে। তাঁদের আনুকূল্য ও সহানুভূতিতে এ ক্রটি ঘুচিতে পারে। প্রতাপ সিংহ, রাজসিংহ প্রভৃতির জীবন-লীলা ছবিতে দেখাইতে হইলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের লইয়া ফটোগ্রাফার ও ডিরেক্টরকে রাজপুতানার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতে হইবে; সেখানে গ্রীষ্ম বর্ষা নানা ঋতু কাটাইতে হইবে; সেখানে ঘটনা-অনুযায়ী দৃশ্য তুলিতে হইবে, অভিনয় করিতে হইবে, তবেই সে ছবির

সৃষ্টি হইবে, দর্শককে বাধ্য করিয়া সে ছবি তার ন্যায্য মূল্য আদায় করিবেই, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বায়োস্কোপ কোম্পানিদেরও বলি, দর্শকের পূর্ণ সহানুভূতি চাহিলে তাঁদেরও কতকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া এধারে আসিতে হইবে। No risk no gain —সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিখুঁৎ ছবি যে 'মার' খাইবে না, এ কথা তাঁহারাও জানেন।

ম্যাডানের তোলা—মহাভারত

এখন বায়োস্কোপে যাঁরা অভিনয় করিতে চান, তাঁদের কয়েকটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে বলি—

১। ক্যামেরার দিকে মোটেই চাহিবেন না।

২। নিজেকে কেমন দেখাইতেছে, অভিনয়ে চেহারা বা ভাবভঙ্গী কেমন খুলিবে, সে কথা মোটে ভাবিবেন না—সেদিকগুলার ভার দিন, ডিরেক্টর ও ফটোগ্রাফারের উপর।

৩। pose দিবার কতকগুলা photographic আইন-কানুন আছে—যেমন front face দিলে মুখ flat হইয়া যায়; ক্যামেরার দিকে three-quarters face দিতে হইবে, দেওয়া চাই, এই দিকেই লক্ষ্য স্থির করা দরকার। front face দিয়া কোন অভিনেতা কোনদিন ভালো ছবি ফুটাইতে পারিবেন না।

৪। ভাবকে অতিমাত্রায় দেখাইতে চাহিবেন না।

৫। প্রত্যেক গতিভঙ্গী স্বাভাবিক মাত্রার চেয়েও এক ডিগ্রী কম রাখা দরকার, অর্থাৎ গতিভঙ্গীর প্রকাশ মৃদু চালে (slow) হইবে; একটুও বেশীর দিকে যেন ঝোঁক না পড়ে।

৬। মুখে রঙ ন্যাবড়াইবেন না। বাঙালী কালা আদমী; রঙ মাখিয়া সে ফর্সা হইবে না। ক্যামেরার লেন্সে রঙের আঁচড় যেমন ধরা পড়ে, এমন আর কোথাও না,—রঙ্‌-মাখা সুন্দর মুখ সূক্ষ্মদৃষ্টি তরুণীর চোখকেও ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু ক্যামেরার লেন্সকে পারে না।

পতিভক্তি—রেশ-দেখার দৃশ্য

৭। এদেশী অভিনেতার মুখেরও অবয়বের স্বাভাবিক রঙ ছবিতে যেমন খুলিবে, কৃত্রিম রঙ তেমন নয়—এই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখিবেন। তবে wrinkles প্রভৃতির জন্য তুলির আঁচড় টানিতে হয়—সেজন্য techniques এর জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। যেখানে-সেখানে তুলি টানিলেই wrinkles খুলিবে না।

৮। নিজের অভিনয় সারা হইলে একই দৃশ্যে যখন অপরে অভিনয় করিতেছেন, তখন নিজেকে ঐ দৃশ্যেরই ভাবে তন্ময় রাখিতে হইবে। সে সময় ভাবের পরিবর্তন না ঘটে, বা অপর দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়—দেখিবেন।

বারান্তরে আরো অনেক কথা বলিব।

শিবসুন্দর।

চয়ন

কোকেন-কথা

এই যে কোকেনে বহু লোকের শরীর নষ্ট হইতেছে এবং যে কোকেন লইয়া কোর্টে নিত্য কত লোকের জেল-জরিমানা চলিয়াছে, পুলিশ কড়া পাহারায় কোকেনের ব্যবহার বন্ধ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে, সেই কোকেনের জন্ম-ইতিহাসে এতটুকু রহস্য বা জটিলতা নাই। অত্যন্ত নিরীহ আব-হাওয়ার মধ্যেই কোকেনের জন্ম।

দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম গাছ আছে, তার নাম এরিথ্রক্সিলন কোকা। কোকা নামেই এ গাছ খ্যাত। কতকটা ঝোপের মতই এ গাছ জন্মায় এবং ৬ ফুট ৮ ফুটের বেশী মাথায় বাড়ে না। গাছে ছোট ছোট ফুল হয়, তার রঙ ফিকে হলদে, একটু সাদার আমেজও আছে। এ গাছে ফলও ধরে, কতকটা বোঁচের আকার। এই গাছের পাতা হইতেই কোকেনের জন্ম। দেড়বৎসরের

গাছ হইতে ৪০ বৎসরের গাছ অবধি—তার পাতায় কোকেন পাওয়া যায়। এই কোকা গাছের পাতায় নানা উপাদানের মধ্যে শতকরা পাঁচভাগ কোকেন পাওয়া যায়। একসঙ্গে বিস্তর পাতা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে কম-জোরালো সলফিউরিক এসিড মিশাইয়া দেওয়া হয়, পরে তাহাতে বহু পরিমাণ কার্ব্বনেট অফ্ সোডা মিশাইলে যে গুঁড়া তলায় থিতাইয়া পড়ে, তাহাই কোকেন।

এই পদার্থটাকে ছাঁকিয়া বিশুদ্ধ করা হয়। তখন সেই বিশুদ্ধ গুঁড়া মানুষের অঙ্গে বেদনার স্থানে ছড়াইয়া ডাক্তারে ছুরি চালান্, ছুরির আঘাত তাহার ফলে কিছুমাত্র বোঝা যায় না—সে জায়গাটা অসাড় হইয়া যায়। চোখের অসুখেও কোকেনের ব্যবহার প্রচলিত আছে।

কোকেনের স্বাদ বিশ্রী।—কোকেন খাইলে নেশা হয় আফিঙের মতই নেশার ভাব। তবু কেন লোকে ইহা সখের জন্যে খায়, এ ভারী তাজ্জবের কথা!

কোকেন মুখে দিলে প্রথমটা শরীরে একটু ফূর্ত্তি আসে—তারপর শরীর নিঝুম হইয়া যায়। ক্রমাগত কোকেন খাওয়ার ফলে মানুষের বুদ্ধি-শক্তি লোপ পায়, শরীরের সমস্ত পেশীই নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হয় এবং অবসাদে শরীর-মন এমনি আচ্ছন্ন হয় যে মানুষ মানুষ নামের অযোগ্য হইয়া অপদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের শরীরে কোকেন বিষের মতই কুফল সঞ্চারিত করে। অথচ এই কোকেনের নেশায় মানুষ অগ্রসর হয় কি বলিয়া, এ এক রহস্য। এ নেশার আর একটি বিষম মজা এই যে একবার এ নেশা সুরু করিলে মানুষ যতই বুদ্ধিবৃত্তি হারাইতে থাকিবে, ততই তার আগ্রহ বাড়িবে কোকেন সেবন করিতে! সমাজে কেহ যাহাতে কোকেন সেবন করিতে না পারে, আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত সমাজের সেজন্য সতর্ক পাহারা দেওয়া দরকার।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

সর্দ্দি লাগা

সাধারণতঃ আমরা যাহাকে 'সর্দ্দি লাগা' বলি, সেটা জ্বরেরই সব-নীচু ধাপ—এবং সেটার ছোঁয়াচ্ খুব প্রবল। প্রথম কাহারো সর্দ্দি লাগিলে তাহার হুঁসিয়ার থাকা উচিত অর্থাৎ আর কাহারো কাছে যাহাতে হাঁচি না হয়; তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তিরও ছোঁয়াচ লাগিয়া সর্দ্দি হইতে পারে। প্রথম সর্দ্দি সুরু হইলে নাকে ঔষধ দেওয়া দরকার। অনেকের ধারণা, ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দ্দি হয়। এই ঠাণ্ডা লাগার মধ্যে একটু মজা আছে। যাঁরা বিশুদ্ধ নির্ম্মল বায়ুতে অহরহ বাস করেন, তাঁদের যত ঠাণ্ডাই লাগুক্, চট্ করিয়া সর্দ্দি হইবে না। যাঁরা সম্প্রতি হিমালয়-অভিযানে গিয়াছিলেন, বা যাঁরা মেরু-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহারা অত ঠাণ্ডাতেও সর্দ্দি লাগার কথা তোলেন নাই। সহরের দূষিত বাষ্পের সংস্পর্শ হইতে হঠাৎ বাহিরের মুক্ত নির্ম্মল বায়ুতে আসিলে এবং সে বায়ু যদি শীতল হয় তাহা হইলেই সর্দ্দি লাগার আশঙ্কা থাকে। নভেম্বর (১৯১৪ সালে) সালিসবারি প্লেনে মুক্ত-প্রান্তরে একদল সৈন্য আস্তানা গাড়িয়াছিল—শীতে রৌদ্রে তারা অসুবিধা ভোগ করিয়াছিল প্রচুর—সে অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রকাণ্ড তাঁবু ফেলিয়া তার মধ্যে সৈন্যদলকে যেমনি প্রবেশ করানো হইল, অমনি শতকরা পঞ্চাশ জন সৈন্যের সর্দ্দি লাগিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, ঠাণ্ডা লাগাটাই সর্দ্দি হওয়ার কারণ নয়। দুষ্ট হাওয়া হইতে মুক্ত বায়ুতে একেবারে আসার ফলে সর্দ্দি হয়। দুষ্ট হাওয়া, বদ্ধ বাষ্প, এগুলা হইতে যত দূরে থাকা যায়, সর্দ্দি-লাগার হাত হইতেও ঠিক সেই পরিমাণে আমরা রক্ষা পাইতে পারি।

আমাদের শরীর-যন্ত্রটা এমনি কৌশলে তৈয়ারী যে ঠাণ্ডা ও গরম এ দুইটা সে চট্ করিয়া সহিয়া অভ্যস্ত করিয়া লইতে পারে। গ্রীষ্মকালে আমরা কতকগুলা জামাজোড়া ত্যাগ করিয়া অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে বাস করি; ঘরের জানালা খুলিয়া রাখি, খোলা ঘরে একগাদা লোকের বদ্ধ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেও থাকিতে হয় না, এই কারণে গ্রীষ্মকালে সর্দ্দি হয় কম। শীতকালে শরীরের উপরে কতকগুলা কাপড়চোপড় চাপাইয়া অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করি, জানালা বন্ধ করিয়া মজলিস বসাই, তার ফলে দূষিত বাষ্পে ভিতরটা অত্যন্ত ভরিয়া থাকে এবং সে সময় একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে নাকের ঝিল্লী সে ঠাণ্ডার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তেজিত হইয়া ওঠে এবং ফলে সর্দ্দি হয়। শীত-

কালে বদ্ধ ঘর হইতে যদি চট করিয়া বাহিরে না আসিয়া একটু সতর্ক ভাবে মুক্ত হাওয়ায় বাহির হই, তাহা হইলে সর্দ্দি হয় না। আমাদের চাকর-বাকরেরা অত মোটা জামা-জোড়া গায়ে দেয় না, খোলা জায়গায় তারা কাজ করে—তাদের সর্দ্দিও হামেশা হয় না, আর বাবুলোক যাঁরা গলায় কম্ফর্টর ও গায়ে ওভার-কোট চাপাইয়া নাকে রুমাল দিয়া থাকেন তাঁদের ঘন ঘন সর্দ্দি হয়—তার একমাত্র কারণ, ঐ অতিরিক্ত কাপড়-চোপড়ে ঢাকা থাকিলে নাসিকার ঝিল্লীগুলাও নিস্তেজ হয় এবং একটু ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে আসিলে তার পক্ষে জয়লাভ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে।

এ সর্দ্দির হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে আমাদের যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা অবলম্বন করা উচিত অর্থাৎ জানালা-দরজা বন্ধ না করিয়া যতটা পারি বাস করি; কেননা খোলা-হাওয়ার মধ্যে বেশীর ভাগ যাতে থাকিতে পারি সেই দিকে সচেষ্ট হওয়া উচিত। আদিম যুগে মানুষ যখন জামা-জোড়ার ভারে ক্লান্ত হইতে জানিত না, তখন সর্দ্দি-কাশীর এত দৌরাত্ম্য ছিল না। জানলা বন্ধ করিয়া গলাবন্ধ জড়াইয়া জুজু সাজিয়া বাস করিলে সর্দ্দির আক্রমণের আশঙ্কা ঢের বেশী থাকে; খোলা শরীরে সে আশঙ্কা খুব কম। এ কথাটি মনে রাখিলে যখন-তখন সর্দ্দিতে আক্রান্ত হইয়া উৎপীড়িত হইতেও হয় না।

রোদাঁর শেষজীবন

বিখ্যাত শিল্পী রোদাঁর শেষ-জীবন অতি কষ্টে কাটিয়াছিল। সম্প্রতি তাঁর সেক্রেটারী মাদামোসেল টিয়েল রোদাঁর শেষজীবনের কাহিনী গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে প্রতিভার বরপুত্র এই অপূর্ব্ব-কুশলী শিল্পীর প্রতি দেশের ও জাতির দারুণ অবহেলার কাহিনী পড়িয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। আমেরিকান আর্ট নিউজ্ পত্রিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

১৯১৬-১৭ সালে প্যারির নিকটে মোদিন পর্ব্বত-শিখরে জীর্ণ একটা বাড়ীতে রোদাঁ বাস করিতেছিলেন। প্রচুর হিমশীতল হাওয়ায়, খাদ্যের অভাবে,—তাঁহাকে যেন চিবাইয়া খাইতেছিল। দেশের কর্ত্তাদের কাছে লিখিয়া লিখিয়াও একঝোড়া কয়লা তাঁর দ্বারে কেহ পাঠায় নাই। রোদাঁর চিকিৎসকেরাও এ বিষয়ে লেখালেখি করিয়া এদিকে কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। রোদাঁ-শিল্পাগারের কর্ত্তৃপক্ষ এ অবস্থায় এই শিল্পীকে শিল্পাগারের একটি কক্ষে স্থান দিয়া অনুগৃহীত করাও কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবেন নাই। অথচ এ বাড়ী একদিন রোদাঁরই বাস-ভবন ছিল!

এই শিল্পীর অন্তিমশয্যা যেমন বেদনাতুর তেমনি নিঃসঙ্গ ছিল। নির্জ্জন কক্ষে রোগে ভুগিয়া, শীতে কাঁপিয়া, ঠাণ্ডা জলে হাওয়ায় হাড় তাঁহার গুঁড়াইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। অথচ এই রোদাঁকে লইয়া যে দেশ গর্ব্ব করিয়া বেড়ায়, সে দেশের একটি প্রাণীও তাঁহাকে দেখিতে আসে নাই, কোন রকমে তাঁর বেদনায় সাহায্য করা,—সে দূরের কথা!

এত বড় শিল্পীর প্রতি সুসভ্য জাতির এই অকথ্য অবহেলা ও অমানুষিক অত্যাচার লজ্জার কথা। কোন অসভ্য জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠাও বুঝি এমনভাবে কোনদিন কলঙ্কের মসীতে লিপ্ত হয় নাই।

কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি

এ বৎসর গরমে লোকের প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে। রৌদ্রের দীপ্ত তেজ বাড়িয়াই চলিয়াছে, বৃষ্টির চিহ্ন নাই! সকলেই ভাবিতেছে, এমন কোন উপায় নাই, বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্ক এমন ব্যবস্থা করিতে পারে না, যাহার দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি ঝরানো যায়!

গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকায় এবিষয়ে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সেখানে এরোপ্লেনে চড়িয়া আকাশে উঠিয়া মেঘ ছড়াইয়া বৃষ্টি ঝরানো হইয়াছে। এ বিষয়ে নিউ ইয়র্কের ইর্ভানং পোষ্টে কর্ণেলের প্রোফেসর বান্‌ক্রফ্ট লিখিয়াছেন,—

মেঘে বারি সঞ্চিত থাকে—বারির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা। মেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করিলে তাহা স্প্রের কাজ করে। এই স্প্রে করিবার সময় তড়িৎ-ভরা বালি ছুড়িয়া মেঘে মারিলে বড় বড় জলের ফোঁটা পড়ে। দেখা গিয়াছে, পিচকারীতে একমণ বালি ভরিয়া মেঘে ছুড়িলে দুই মাইল ধরিয়া স্থান দশ মিনিটে মেঘলা হইয়া বৃষ্টি পড়ে।

লণ্ডনের আকাশ ধোঁয়া বা কুয়াশায় ভরা। লণ্ডনের বিস্তৃতি ১১৭ মাইল। একখানি এরোপ্লেনে ষোলটন বালি ভরিয়া সেটিকে ঘণ্টায় ৭৫ মাইল বেগে যদি আকাশে ছুটাইয়া দেওয়া যায় এবং সে এরোপ্লেন হইতে যদি সেকেণ্ডে ১৭৷৷০সের করিয়া বালি পিচকারী করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে লণ্ডনে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।

যে-সব সহরে আকাশ ধূমাচ্ছন্ন থাকে বা কুয়াশায় ভরা থাকে—সে-সব জায়গায় এমনি পিচকারী ভরিয়া বালি ছড়ানোয় বৃষ্টিপাতে প্রচুর সহায়তা করে। এমনি ভাবে বালি ছড়াইয়া কুয়াশা কাটাইয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া জাহাজ চালানো এখন এক রকম নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে য়ুরোপে বা আমেরিকায় বৃষ্টির জন্য এ পরীক্ষা তেমন চালানো হয় নাই—তারা এই প্রক্রিয়ায় কোনমতে কুয়াশা কাটাইয়া আকাশ পরিষ্কার করিতেছে।

তবে এভাবে বৃষ্টি নামানো সম্ভব হয় সেই সব দেশেই—যে-সব দেশ সমুদ্র বা বড় নদীর ধারে অবস্থিত। বালি না লইয়া বৃষ্টি ঝরানোর দিকে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পড়িতেছে; কারণ তাঁরা বলেন, বালির পিচকারীতে অসুবিধা বিস্তর। বাতাস একটু ভিজা করিয়া লইয়া খানিকটা বৃষ্টি নামানো সম্ভব হয়—কিন্তু তাহাতে ব্যয় পড়ে এত বেশী যে তার চেয়ে অনাবৃষ্টির কষ্ট সহিয়া মরাও বরং ভালো। বাতাসকে ভিজা করিতে গেলে নানা যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের দরকার হয়। তার ব্যয়-ভার বহন করা সকল দেশের সম্ভব নয়, এইটাই দাঁড়াইতেছে মস্ত সমস্যা!

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

—

ছোট গল্পের সেরা-লেখক

ছোট গল্পের সব-চেয়ে বড় লেখক কে? কিপলিং, না, মোপাসাঁ, না, শেকভ, না ব্যালজাক? সম্প্রতি আমেরিকা বলিতেছে—ক্যাথেরিন ম্যান্সফিল্ড নামে এক মহিলা লেখিকা ছোট গল্প লেখায় সব চেয়ে ওস্তাদী দেখাইয়াছেন। তাঁর দুখানি বই ১৯২২ সালে প্রকাশিত Bliss ও The Garden Party সম্প্রতি নাকি পাশ্চাত্য জগতে ছোট গল্পের রাজ্যে যুগান্তর আনিয়াছে! In a German Pension ১৯১১ সালে প্রকাশিত হইবামাত্র সমস্ত বই নিমেষে নিঃশেষ হইয়া যায়। তার পর বহুকাল এই লেখিকা চুপচাপ ছিলেন। গত তিন বৎসরে নানা পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য ছোট গল্প ও Blissএবং The Garden Party বাহির হয় এবং সেগুলি পাশ্চাত্য নরনারী অতি আগ্রহে পড়িতেছে। মানব-চরিত্রে তাঁর জ্ঞান, মনস্তত্ত্বের আলোচনায় তাঁর অভিনবত্ব পাশ্চাত্য জগৎকে একেবারে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁর মৃত্যু হইয়াছে ১৯২৩ সালের ৯ই জানুয়ারি; ৩৩ বৎসর মাত্র বয়সে। সর্ব্বসমেত ৩০টি ছোট গল্প তিনি লিখিয়াছেন—কিন্তু এই কয়েকটি গল্পে জগৎকে যে বাণী তিনি শুনাইয়া গিয়াছেন—তাহা চিরদিন জগৎকে অপূর্ব্বভাবে ঝঙ্কৃত রাখিবে।

ক্যাথেরিন ম্যান্সফিল্ডের জন্ম হয় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে নিউজিলণ্ডের অন্তর্গত ওয়েলিংটন প্রদেশে। ইংরাজ লেখক মিড্‌লটন্ ম্যারির সহিত তাঁর বিবাহ হয় ২৩ বৎসর বয়সে। ১৯১৯ সালে তিনি The Nation and 'Athenœum' পত্রিকায় বহু সমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন। সমালোচনায় তাঁর ওস্তাদীর সুখ্যাতি তখনি অচিরে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁর শেষ গল্প বাহির হয় The Nation and Athenœum পত্রিকায় ১৯২২ সালে ৮ই মার্চ্চ, তারিখে। গল্পটি ২৫০০ মাত্র কথায় সম্পূর্ণ—কিন্তু এই অল্পপরিসরে তিনি যা বলিয়াছেন, যে ছবি ফুটাইয়াছেন, অনেক বড় বড় লেখক লাখ কথাতেও তাহা পারেন নাই—ইহাই হইল এক বিখ্যাত সমালোচকের মত। গল্পটীর নাম The Fly। এই গল্পে ওলড ফিলড উডিফিলড্ নায়ক। নায়কের বর্ণনায় কিছুই এমন

নাই - তবু পাঠক তার চেহারার যা আদরা পান তা গোটা ছবি, পরিপূর্ণ মূর্ত্তি।

কালি-ভরা দোয়াতের মাঝে একটা পোকা পড়ে; জীবনের জন্য তার যে সংগ্রাম বস্ তাহা লক্ষ্য করিয়া কলমের ডগায় করিয়া তাহাকে উপরে তোলেন এবং ব্লটিং কাগজে স্থান দেন—সেই কাগজে এই ছোট্ট পোকা উঠিয়া তার পাখায় কালি ঝাড়িয়া নিজেকে আবার সতেজ সজীব করিয়া তোলে, খুব বীরের ভঙ্গীতে। 'বসে'র মাথায় তখন এক 'আইডিয়া' আসিল। এই পোকার জীবন-সংগ্রাম দেখিয়া তাঁর মন আশায় ভরিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, এই তো চাই। মরা—সে তো কাপুরুষের কাজ! পোকাটি এতক্ষণে কালি ঝাড়িয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে—বস্ আবার তার গায়ে কলমে করিয়া এক টোসা কালি ঝাড়িয়া দিলেন; কালির সে টোসা ঝাড়িয়া বাঁচিবার জন্য পোকার আবার সংগ্রাম চলিল। তারপর আবার এক টোসা কালি, আবার এক টোসা—পোকা আর পারে না—নেতাইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িল; তখন নূতন টাট্‌কা ব্লটিং কাগজ আনিয়া পোকাটিকে সেখানে রাখা হইল; পোকা আবার নড়া-চড়া সুরু করিল। এমনি করিয়া পোকার ভাবভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের নানা সমস্যার চিন্তা বসের মনে জাগিয়া চলিল—এইখানেই গল্পের শেষ।

রুশিয়ার ওস্তাদ লেখক শেকভের রচনা-ভঙ্গীর সহিত ক্যাথেরিন ম্যান্সফিল্‌ডের রচনার সাদৃশ্য আছে। তাঁর লেখায় উপদেশ নাই,—তত্ত্বকথা নাই, দর্শনের ব্যাখ্যা নাই। আর্টের খেলায় ভরপুর তাঁর রচনা—গল্পের শেষে এমন একটি স্মৃতি রাখিয়া যায় যে তা মন হইতে চট্ করিয়া বিলুপ্ত হইবার নয়! মনে গভীরভাবে তাহা মুদ্রিত হয়, গানের রেশের মত মনের তারে বাজিতে থাকে! পাঠকের মনে সে রেশ চিন্তার বহু তরঙ্গ তোলে।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

ঘর ও বাহির

লোকসেবা

বিগত ১৯১৭ সালের শারদীয়া পূজার মহাষ্টমীর দিন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের অনুমতিক্রমে স্থানীয় কয়েকটী যুবকের চেষ্টায় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সরিষা গ্রামে রামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হয়। ধর্ম্ম, বিদ্যা ও অন্নদানের দ্বারা নর-নারায়ণের সেবা করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আশ্রমে একটী নৈশবিদ্যালয়, একটি লাইব্রেরী ও একটি বস্ত্র-বয়নালয় স্থাপিত হইয়াছে। আশ্রমের সেবকগণ সর্ব্ব প্রকারে সকলের সেবা করিতেছেন। কিন্তু বিস্তৃতভাবে কার্য্য করিবার পক্ষে স্থান গৃহ ও অর্থের প্রয়োজন। জনৈক বোম্বাইবাসী সহৃদয় ভদ্রলোক বয়ন-বিদ্যালয়ের জন্য ৯৮৪৷৹ আনা, দরিদ্র ভাণ্ডারে দুইশত টাকা ও ২০ খানি কম্বল দিয়া আশ্রমকে সহায়তা করিয়াছেন। কলিকাতার বিখ্যাত এটর্ণি শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বিদ্যালয়ের প্রথমাবস্থায় দুইশত টাকা দান করিয়াছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

এই নানা ব্যাধি-প্রপীড়িত দেশে চিকিৎসক-অভাবে প্রতি বৎসর কত শত দরিদ্র ব্যক্তিকে যে বিনা-চিকিৎসায় প্রাণ হারাইতে হইতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। দেশের যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি দাতব্য-চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়া দেশের দীন দরিদ্র ব্যক্তিদের কল্যাণ করেন, তাঁহারা সমগ্র দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। আমাদের কাঁথি মহকুমার মুগবেড়্যা নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর নন্দ, অজয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বেরা এবং মারিশদা নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়গণ আপনাপন পল্লীগ্রামে এক একটী দাতব্য-চিকিৎসালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক দরিদ্র পল্লীবাসীদের যে প্রভূত উপকার করিতেছেন। ঘাটাল মহকুমার বীরসিংহ গ্রামে স্বদেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর পান মহাশয় দরিদ্র পল্লীবাসীদের উপকারের জন্য গত ১৯২১ সালে তাঁহার স্বর্গগতা জননীর স্মৃতি-রক্ষার্থ "তারা দাতব্য চিকিৎসালয়" নামে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। গত বৎসর এই চিকিৎসালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৬০৯ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

এই চিকিৎসালয়ে ২২২০ জন নূতন রোগীর মধ্যে ১৪৮৬ জন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তি। ঘাটাল মহকুমা ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি বলিয়া চির প্রসিদ্ধ। ঘাটালের রোগার্ত্ত ব্যক্তিদের কল্যাণার্থ সিদ্ধেশ্বর বাবুর এই পুণ্যানুষ্ঠান বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

—নীহার

এক দিকে ম্যালেরিয়া অন্যদিকে কালাজ্বর, মাঝখানে দারিদ্র্য, এই তিন শত্রুতে মিলিয়া বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতেছে। যদি সময় থাকিতে বাঙ্গালী আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত না হয়, তবে মেক্সিকো, তাসমানিয়া, পলিনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির আদিমজাতিদের মত তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত! সুখের বিষয়, অ্যাণ্টী-ম্যালেরিয়া সোসাইটী ও বঙ্গীয় যুবক সমিতির নেতৃত্বে অ্যাণ্টী কালাজ্বর সোসাইটী ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর-নিবারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী জাতি যদি আত্মরক্ষার জন্য প্রবুদ্ধ হইয়া ইঁহাদিগকে সহায়তা না করেন, তবে ইঁহারা কি করিতে পারেন? মহামারী সমস্যার সঙ্গে বাঙ্গালার দারিদ্র্য সমস্যাও অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। অতএব জাতিকে বাঁচাইতে হইলে দারিদ্র্য সমস্যারও সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করিতে হইবে। বাঙ্গালার জাগ্রত যুবকশক্তি বাঙ্গলার তরুণ সাধকগণ, একমাত্র তোমরাই ইচ্ছা করিলে তপস্যার বলে এ জীবন্মৃত জাতিকে আবার বাঁচাইয়া তুলিতে পার।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

রাজনীতি

গ্রামে যত কিছু চাষের জমি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকই অধিকাংশ স্থলে জোত-জমা শূন্য দরিদ্র কৃষকদিগকে জমি বর্গা দেয় এবং বর্গার অর্দ্ধেক ফসল দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই বর্গাদার বা ভাগ-চাষীরা যে ফসল প্রাপ্ত হয় তাহা তাহাদের মজুরী বিশেষ। এই প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে জমির অর্দ্ধেক ফসল হইতেও বঞ্চিত হইবেন। ফসলের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে সামান্য কিছু খাজনা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এ অবস্থায় যে সমস্ত মধ্যবিত্ত লোকের সুবিধা ও সঙ্গতি আছে তাঁহারা চাকর খাটাইয়া জমি চাষ করিবেন। কাজেই অনেক জোত-জমা-শূন্য গরীব কৃষক বর্গাজমি হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্নাভাবে মারা পড়িবে। আর যাহারা বিদেশে চাকুরী করেন তাঁহারা বর্গাদারদের নিকট হইতে জমি ছাড়াইয়া লইয়া জমি পতিত রাখিবেন কিংবা কোন শ্বেতাঙ্গ কি মাড়োয়ারীর নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন। ইহার ফলে মধ্যবিত্ত লোকের যেমন ক্ষতি হইবে, দরিদ্র নিরন্ন কৃষকেরও তদ্রূপ ক্ষতি হইবে। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর নষ্ট হওয়ায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্ম্মে কর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটিবে; নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ব্রহ্মোত্তর কিংবা দেবোত্তর পতিত হইয়া পড়িয়া থাকিবে। এই আইন পাশ হইলে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িবে।

—রায়তবন্ধু

ডিমোক্র্যাসির ম্যাজিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও আজ রামাশ্যামার সমান—পণ্ডিত মতিলাল আজ ছাতুয়া বেহারার তুল্য মূল্য। আমাদের এই রাজনীতির ভোটান রাজ্যে ভোটের উপরই মানুষের মূল্য নির্দ্ধারণ হচ্ছে। কার ধর্ম্ম কি হবে—কার মা মরবে কি বাঁচবে—বিবাহ কা'কে করবে - সমস্তই ভোটে ফেলে ঠিক হবে। এমন সুন্দর পথ আর নাই। যে সকল পেচক আলোর ভয়ে বেরুতে সাহস করতো না—দিনমণি অস্ত যাওয়ায় আজ তারা বেরিয়ে কি কোলাহলই না আরম্ভ করেছে! মহাত্মার কথা মুখে নিয়ে কত ভণ্ড প্রতারক দেশের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে। স্বার্থের মতলব ভিতরে নিয়ে বাইরে এসে সাধু সেজে দাঁড়িয়েছে। চুরি যাদের ব্যবসা, অসত্য যাদের আশ্রয়, কাপুরুষতা যাদের ধর্ম্ম—তারাই এখন মহাত্মার ভেক নিয়ে দেশের মাথায় চ'ড়ে বসেছে। সে দলে ভাল লোক যাঁরা আছেন, তাঁরা হয় কিছুই জানেন না—না-হয় জেনে-শুনেও এই সব লোককে প্রশ্রয় দেন। "যে জন গোরাঙ্গ ভজে, সে আমার প্রাণ রে"—মহাত্মার নাম নিলেই তাঁরা তাদের সাধু মনে করেন, নিজে প্রতারিত হ'ন এবং দেশকে প্রতারিত করেন। এই প্রতারক দলের বিতাড়নই আজ দেশের হিতাকাঙ্খীদের প্রধান কাজ।

—যুগান্তর

যাঁহারা শুধু সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতিনিধি-স্বরূপ নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহাদের পক্ষেও শুধু সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ বজায় রাখিয়া কার্য্য করিলে চলিবে না। দেশের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমূহ, যাহাতে সকলেরই মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে তাহাতে তাঁহাদের কি মত তাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হইবে। নির্ব্বাচক জন-সাধারণকে এ বিষয়েও বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে অতি গুরুতর বহু বিষয় দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। আগামী ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকাল মধ্যেই ঐ সমুদয় প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের রাজ্যশাসন বিষয়ক ব্যাপারে সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া ব্যয়-সঙ্কোচ-প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে। ইঞ্চকেপ কমিটী ও মুখার্জ্জি কমিটী যেভাবে

ব্যয়-সঙ্কোচের নির্দ্দেশ করিয়াছেন অতি বিবেচনার সহিত তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধেও অতি তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইবে। বাঙ্গালার প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের যে সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহারও একটা সুমীমাংসা আগামী সভাতেই করিতে হইবে। যাহাতে ভূম্যধিকারী এবং প্রজাবর্গের মধ্যে কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে না পারে, অথচ নিরীহ মূক প্রজাগণের স্বার্থ সর্ব্বপ্রকারে রক্ষিত হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এরূপক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর লোকই বা একই প্রকার স্বার্থ যুক্ত ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাচন করা কি পরিমাণে যুক্তিযুক্ত হইবে তাহাও বিশেষ বিবেচ্য। দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণেরই কেবল নির্ব্বাচনপ্রার্থী হওয়া কর্ত্তব্য। সার্টিফিকেটের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ব্যবস্থা-সভার যথেষ্ট কার্য্যকরী ক্ষমতা বর্ত্তমান রহিয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। ব্যবস্থাপক সভার উপর ন্যস্ত ক্ষমতার যাহাতে বিশেষ সদ্ব্যবহার হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই নির্ব্বাচনকারীগণকে কার্য্য করিতে হইবে।

—ময়মনসিংহ সমাচার

—

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ড্জিয়ান" ভারতের শত্রু নহে। উদ্দেশ্য সাধু হইতে পারে; কিন্তু ঔপনিবেশিক মন্ত্রিসভাকে এত অধিক ক্ষমতা প্রদান করিবার যুক্তির আমরা অনুমোদন করিতে অসমর্থ। এক শত বৃটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে কেনিয়ার স্থান ও পদগত আপত্তি; তাহা ব্যতীত বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষে ঔপনিবেশিক মন্ত্রি-সভার বিচার নিরপেক্ষ ও আমাদিগের স্বার্থানুকূল হইবে, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস হয় না। স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রাপ্ত উপনিবেশে ভারতের প্রতি বিদ্বেষ বদ্ধমূল এবং প্রবল। সত্য বটে অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড ও ক্যানেডা উপনিবেশবাসী সন্তানকে ইউরোপীয়ান প্রবাসীর সমানাধিকার প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই ন্যায়সঙ্গত নীতি কার্য্যে পূর্ণ মাত্রায় প্রবর্ত্তিত হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রিসভা এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। কেবল তাহাই নহে, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতসন্তানের অবস্থা কঠিনতর হইয়াছে। বিতাড়ন নীতি এক্ষণে তথায় প্রবল। দক্ষিণ আফ্রিকা কেনিয়ার সাম্প্রদায়িক বরাদ বিষয়ে আর নিরপেক্ষ নাই। কেনিয়াকে দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাজ্যভুক্ত করিতেও প্রস্তুত।

—হিতবাদী

—

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান বৈদেশিক শাসন-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব একটা অভাবনীয় বিস্ময়কর বস্তু। তেত্রিশ কোটী বিপুল জনবাহিনীর উপর, কয়েক লক্ষ লোক নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব চালাইতেছে,—আর তাহারা সেই সব স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচার মাথা পাতিয়া লইতেছে, ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় জার্ম্মাণীর রাষ্ট্র-নায়ক কূটনীতিজ্ঞ প্রিন্স বিস্‌মার্কের সঙ্গে একবার দেখা করিতে গিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই প্রিন্স বিস্মার্ক হঠাৎ চমকিয়া উঠেন। রমেশচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। প্রিন্স বলিয়াছিলেন, "ইংলণ্ডের সামান্য ৩।৪ কোটী লোক ভারতের তেত্রিশ কোটি লোককে অনায়াসে ভেড়ার পালের মত চালাইতেছে। ইহাতে আমি মনে করিয়াছিলাম, ভারতবাসীরা নিশ্চয়ই বামনের জাতি হইবে, সাধারণ মানুষের মত নয়। তাই আপনাকে সাধারণ মানুষের মতই লম্বাচৌড়া দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিয়াছিলাম।"

এই বিস্ময়কর ব্যাপারের কারণ এই যে, তেত্রিশ কোটী ভারতবাসী নিজেরাই বৈদেশিক শাসন-যন্ত্রকে মাথায় করিয়া বহন করিতেছে,—তাহার কলকব্জায় নিজেরাই প্রচুর পরিমাণে তৈল যোগাইয়া চালাইতেছে। কি আইন-আদালতে, কি স্কুল-কলেজে, কি কাউন্সিল-মজলিশে সর্ব্বত্রই 'তৈল যোগাইবার' কার্য্যে আমরা পরম উৎসাহ প্রকাশ করিতেছি। আর ইহারই নাম সোজা ভাষায় 'সহযোগ'। ভারতবাসীর সহযোগের বনিয়াদের উপরেই বিপুল বৈদেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অস্বাভাবিক সহযোগ-প্রবৃত্তি আমাদের মনে থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিজেদের রচিত শৃঙ্খলে নিজেরাই বন্দী হইয়া রহিব।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

—

আমাদের দেশে নেতৃত্বের আসনে বসিয়া অনেকে মনে করেন, তাঁহাদেরই খেয়ালমত, তাঁহাদেরই নির্দ্দেশ-মত, তাঁহাদেরই বিশেষ মাপকাঠির পরিমাণে জাতির স্বাধীনতার গতি সুনির্দ্দিষ্ট হইবে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে পতিত জাতির উদ্ধার-কর্ত্তা জনগণ-অধিনায়কের নির্দ্দেশ অনুসারেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছে। নেতৃত্বের মদ-গর্ব্বে মোহান্ধ হইয়া জাতির এই বহু মতের অপ্রতিহত গতির বিঘ্ন জন্মাইতে যে কোন নেতা চেষ্টা করিবেন, তিনিই ভাগীরথী তরঙ্গ মুখে মদোদ্ধত ঐরাবতের ন্যায় বিধ্বস্ত হইয়া কোথায় ভাসিয়া যাইবেন। কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে, তৎপর নাগপুর কংগ্রেসে, আহম্মদাবাদ কংগ্রেসে ও গয়া কংগ্রেসে সমগ্র দেশের সহস্র সহস্র প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, দেশের মঙ্গলকামী হইয়া যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আজ কি না ৯৬ জন লোকের খোস-মেজাজের তাড়নায় তাহা অবজ্ঞা করিতে হইবে! যাঁহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর দেশের লোক কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে না। তাঁহাদের মত যে দেশের মত নয়, তাঁহাদের মত যে কংগ্রেসের মত নয়,

তাহা তাঁহারাও জানেন। তাই তাঁহারা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কাউন্সিল বর্জ্জনের বিষয় মীমাংসা করিবার প্রস্তাবে শঙ্কিত ও অসম্মত। যাঁহারা জনমতের সম্মুখীন হইতে সাহস পান না, তাঁহাদের নেতৃত্বের অবসান হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

—আনন্দ বাজার পত্রিকা।

—

ভারতে রেলওয়ে ব্যয়—আগামী পাঁচ বৎসর যাহাতে ভারতে রেল বিস্তারের জন্য ১৫০ কোটী টাকা ব্যয় হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। টাকা পয়সা অভাবের দিনে এই প্রভূত টাকা কেবল রেল-বিস্তারের জন্য ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হইতেছে তাহা জানিবার জন্য অনেকের মনে কৌতূহল জন্মিতে পারে। এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে অন্য কতকগুলি বিষয় জানা দরকার। বিলাতে এখন কল-কারখানার কাজ অনেক পরিমাণে কমিয়া যাওয়ায় বেকার-সমস্যা সেখানে গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বহু লোক বিনা কাজে বসিয়া আছে এবং তাহাদের জীবিকা সংগ্রহের উপায় হইতেছে না। এত টাকার রেলওয়ে সাজ-সরঞ্জাম ভারতে আবশ্যক হইলে উহা প্রস্তুত করিতে বিলাতের কল-কারখানায় যে কার্য্য-বাহুল্য উপস্থিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যার একটু সমাধান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। রেলওয়ের সাজ-সরঞ্জাম জর্ম্মাণি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অনেক কম মূল্যে পাওয়া গেলেও আমাদিগকে অনেক বেশী মূল্য দিয়া উহা বিলাতেই কিনিতে হয়, পাঠকবর্গ বোধ হয় তাহা অবগত আছেন।

—চারুমিহির

—

সেকালে শুধু দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতা দেখিয়াই ব্যথিত হইয়াছিলাম। আজ সেই পরাধীনতার গোড়া খুঁজিতে খুঁজিতে মনে হইতেছে যে, ওটা আমাদের ভিতরের পরাধীনতার একটা বাহিরের রূপ মাত্র। ঘরে যাহারা পঙ্গু, বাহিরে তাহারা কর্ম্মী হয় না, ঘরে যাহারা পরমুখাপেক্ষী, গতানুগতিকের দাস—বাহিরে আসিলেই তাহারা স্বাবলম্বী হইয়া উঠে না; যাহাদের ব্যক্তিগত জীবন অষ্ট বন্ধনে বাঁধা, তাহাদের সমষ্টিগত জীবন স্বাধীন হয় না; আমার মনে হয় আমরা স্বাধীনতা চাই না বলিয়াই স্বাধীনতা পাই না। 'স্বাধীনতা আমরা চাই না'—এটা হয় ত তোমাদের কানে কটু ঠেকিবে; কিন্তু বলিতে পার পরাধীনতার যন্ত্রণাটা যদি আমাদের সত্যই অসহ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে পদে পদে এত অত্যাচার, অবিচার আমরা চুপ করিয়া মানিয়া লই কেন? সে দিন দেখিলাম, নোয়াখালির একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী দেশাচারের ভয়ে তাঁহার একজন বিলাত-ফেরত আত্মীয়কে সামাজিক ব্যাপারে বয়কট করিয়াছেন। খোলাখুলিভাবে তাঁহার আত্মীয়ের সহিত মিশিলে নাকি নোয়াখালিতে কংগ্রেসের কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে। দেখিতে পাই, জমিদার বা জোতদারদের মধ্যে অনেকেই রাজনৈতিক স্বরাজকামী, যেহেতু রাজনৈতিক পরাধীনতা অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা উঠিলেই তাহারা চীৎকার করিয়া দেশ মাথায় করে কেন বলিতে পার? যাঁহারা দেশের গরীবদের দুঃখে কাতর হইয়া খদ্দর প্রচার করিতেছেন, জমিদার ও জোতদারের অন্যায় স্বার্থ সঙ্কুচিত করিয়া কৃষকদের অবস্থা উন্নত করিবার কথা উঠিলেই তাঁহারা আর্ত্তনাদ করেন কেন, বলিতে পার?

—যুগান্তর

—

গবর্ণমেণ্টই প্রজাসত্ব আইন পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেছেন এরূপ মনে করিয়া গভর্ণমেণ্টের উপর অনেকে অযথা দোষারোপ করিতেছেন। বস্তুতঃ এই সংশোধন আইন যে সরকার কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হয় নাই এবং ইহা যে সরকারী আইন নহে, ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গীয় শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য বর্দ্ধমানের মহা-রাজাধিরাজ বাহাদুর সে কথা স্পষ্ট বাক্যেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেশের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত রায়ত-সভা-সমূহে প্রজাসত্ব আইনের পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করা হইয়াছে, এবং বঙ্গীয় কৃষকবৃন্দের দুর্দ্দশা দেখিয়াও অনেকে এই পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন। ইহারই ফলে প্রচলিত আইনের কিরূপ সংশোধন প্রয়োজন তাহা স্থির করিয়া খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কমিটীর মেম্বারগণ যাহা করিয়াছেন, সেজন্য গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব কল্পনা করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। তারপর, পাণ্ডুলিপি সাধারণ্যে প্রচার করার সময়ই সরকারপক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে দেশবাসীর সমালোচনা আহ্বান করা হইয়াছে, এবং গভর্ণমেণ্ট পরিষ্কারভাবে জানাইয়াছেন যে এ বিষয়ে দেশবাসীর মতামত বিবেচনা করিয়াই কর্ত্তব্য স্থির করা হইবে। এ অবস্থায় যাহারা এই সংশোধন প্রস্তাবের অন্তরালে গভর্ণমেণ্টের দুরভিসন্ধি কল্পনা করিতেছেন, আমরা তাহাদের বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিতেছি না।

—ঢাকা প্রকাশ

জন-গণ-মন

যে সকল হিন্দু সন্তান ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে তাহারা যদি পুনরায় হিন্দু সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উৎসুক হয়, তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। শুদ্ধি প্রায়শ্চিত্তেরই নামান্তর। এমন কি যে হিন্দু-বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই, সেও ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শত শত গ্রীক, শক, হূন, চীন অতি প্রাচীনকালে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বকালেও বহু হিন্দু রাজা মুসলমান কন্যাকে বিবাহ

করিতেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সকল মুসলমান-তনয়া অথবা তদ্গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু হইয়া গিয়াছেন। মধ্য প্রদেশের রাজগড়ের রাজবংশও এইরূপ মুসলমান দুহিতার গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অথচ রাজপুতানায় সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের সহিত রাজগড়ের রাজবংশের পরিণয় অবাধে সম্পন্ন হয়। গুজরাট প্রদেশের জামনগরের হিন্দু নরপতি জামসাহেবের শরীরে মুসলমান শোণিত প্রাহিত হইতেছে ইহা ঐতিহাসিক সত্য। মালকানা রাজপুতগণ অন্যূন দুই শত বৎসর পূর্ব্বে অনিচ্ছায় মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা অনেক বিষয়েই হিন্দুর আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া আসিতেছে এমন কি উহাদের মধ্যে অনেকে মস্তকে শিখাধারণ করে। সেই সকল হিন্দু সমাজচ্যুত রাজপুত এখন শুদ্ধি বা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে ইহাতে মুসলমানগণের বিরক্তির কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। — — —হিতবাদী।

হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে এক ফার্ম্মান বাহির করিয়া রাজ্যের ভিতর হইতে বেগার প্রথাটা উঠাইয়া দিয়াছেন। বেগার এদেশে অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত জুলুমের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। মজুর খাটিয়া যাহাদের পেটের ভাতের পয়সা উপার্জ্জন করিতে হয় তাহাদের অবস্থা এদেশে যে কিরূপ শোচনীয় তাহা এই শ্রেণীর লোকদের উপরে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বোঝা যায়। সুতরাং খাটিয়া পয়সা না পাওয়ার অর্থ ইহাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে সপরিবারে উপবাস করিয়া থাকার সামিল হইয়াই দাঁড়ায়। অথচ এ প্রথা ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই চলিতেছে—এবং নির্ব্বিবাদেই চলিতেছে। প্রজারা খাজনা দিয়া জমি ভোগ করে। সুতরাং ন্যায়ের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই বেগার জোর করিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু অধিকার না থাকিলেও বেগার খাটানো হইয়াই থাকে—এবং অনেক ক্ষেত্রে সেজন্য উৎপীড়নও চলে। এই ফার্ম্মানের দ্বারা নিজামের প্রজাদের প্রতি দরদের একটা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সংস্কারের ভিতর দিয়া তিনি যে প্রজাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে চান তাহারও পরিচয় ইহাতে সুস্পষ্ট। আমরা আশা করি,নিজামের এই আদর্শ ভারতবর্ষের অন্যত্রও অনতিবিলম্বেই পরিগৃহীত হইবে। ইহা কেবলমাত্র যে ন্যায় এবং দয়াধর্ম্মের বিরোধী তাহা নহে, ইহা যুগধর্ম্মেরও পরিপন্থী।

——— —স্বরাজ।

শিক্ষা

সামন্ত রাজ্যগুলির ভিতরে বরোদা যে অনেক বিষয়েই উন্নতির পথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। শিক্ষা ব্যাপারেও সে সামন্ত রাজ্যগুলির ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হউক অনেকের অপেক্ষাই উন্নত। আমরা তাহার গত বৎসরের শিক্ষা বিভাগের হিসাব-নিকাশের কতকগুলি অঙ্ক খতাইয়া দিতেছি। এই সামন্ত রাজ্যটির মোট জনসংখ্যা ২১,২৬,৫২২ এবং ইহার স্কুলের সংখ্যা ২৮১৫টি। (ইহার প্রতি ৭৫০ জন বালকের পিছনে একটি করিয়া স্কুল আছে; বালকের অনুপাতে স্কুলের সংখ্যা অবশ্য বেশী নহে। কিন্তু এক বৎসরের ভিতর এই রাজ্যটি শিক্ষা-ব্যবস্থায় যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে, সেই উন্নতির ধারা যদি বজায় রাখিয়া চলিতে পারে, তবে এজন্য তাহার চিন্তিত হইবারও বিশেষ কারণ নাই।) ১৯২০-২১ সালে স্কুলে তাহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৯৩, ৮১৬ জন; কিন্তু ১৯২১-২২ সালে এই সংখ্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ২০,৩,৮৬৫ জনে। ১৯২০-২১ সালের শিক্ষাবিভাগে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ছিল ১, ২৬, ৮৯৫ টাকা কিন্তু ১৯২১-২২ সালে সেই ব্যয়ের অঙ্ক দাঁড়াইয়াছে ২৬, ২৩, ৬৫৯ টাকায়। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের যে বেশ নজর আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বরোদায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যের ভিতর অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রায় দুই লক্ষ লোক আছে। তাহাদের জন্য আলোচ্য বৎসরে অন্ততঃ ২১১টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহাদের পাঁচটি কেবলমাত্র বালিকাদের জন্য। সাধারণতঃ বরোদার শতকরা ১০ জন লিখিতে ও পড়িতে জানে। ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যে লিখিতে ও পড়িতে জানা লোকের সংখ্যা অবশ্য ঢের বেশী; কিন্তু তথাপি মনে হয় যেরূপভাবে এ রাজ্যটি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহাতে এদিকবার এই দৈন্য সে সম্ভবতঃ শীঘ্রই পোষাইয়া লইতে পারিবে।

— — —স্বরাজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন যে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তদ্বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। কেহ কেহ পরিবর্ত্তনের কোন চেষ্টা হইতে শুনিলেই উচ্চ শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপ হইল আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়েন। যে শিক্ষা চলিতেছে তাহা কতদূর উচ্চ শিক্ষা তাঁহারা বিচার করিয়া দেখিতে চাহেন না! তথা-কথিত উচ্চশিক্ষিত বি-এ, এম-এ ডিগ্রিধারীর সংখ্যা কিছু কমিলে দেশের তেমন অনিষ্ট হইবে মনে করিবার কারণ দেখিনা। ভগ্ন-স্বাস্থ্য পরের গলগ্রহ সুলভ বি-এ, এম্-এতে দেশ প্লাবিত হইলেই আমাদের উন্নতি হইবে মনে করি না। আমরা চাই তেমন শিক্ষা যাহাতে দেশবাসীকে শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যে বলীয়ান মানসিক বৃত্তি সমূহের বিকাশে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নত স্বাধীন জীবিকার্জ্জনে সমর্থ ও চরিত্রবলে তেজস্বী করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইসচেন্সেলার বিচক্ষণ পণ্ডিত ও দেশ-হিতৈষী। আমরা আশা করি তাঁহার তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তিত ও উন্নতির পথে পরিচালিত হইবে।

—ময়মনসিংহ সমাচার

রূপ-সায়রের ঢেউ

দিচ্ছি চুমুক রাত্রি-দিবা জীবন-পিয়ালায়,
মনের ক্ষুধা রইল মনে, মিলনাকো হায় !
বিশ্ব-বাঁশী নিত্য শোনায় লক্ষ রাগিণী,
ছন্দে তাহার নৃত্য করে চিত্ত-নাগিনী !

ডাগর দুটি নয়ন তার জ্বালিয়ে রাখো ভাই,
যতই কালো আস্‌চে নেমে, ততই আলো চাই !
বন্ধুরা সব নিন্দা করে, মন্দ কথা কয়,
কারণ আমি তাদের ভুলে তোমার গাহি জয় !

গণ্ডী কেটে কান্না-ঘরে বন্দী রেখে মন,
বলেন ওঁরা জড়ের মতন থাকতে সারা-ক্ষণ !
অর্দ্ধজীবন অন্ধ হয়ে কাট্‌ল আমার দিন,
যৌবন মোর বল্‌ল বোকা সোনায় ভেবে টিন !

আচম্বিতে সাম্‌নে এলে অন্ধকারের চাঁদ !
উঠ্‌ল দুলে প্রাণের তলায় ঘুমিয়ে-থাকা সাধ !
এক পলকে পষ্ট হোলো মিথ্যা যত ভ্রম,
পড়্‌ল ধরা জীবন-তালে কোথায় আছে সম্ !

প্রেম নাকি ভাই কথার কথা, অসার কামিনী,
নরক যাবে তার সাথে যে জাগ্‌বে যামিনী !
চক্ষু দুটি রুদ্ধ ক'রে শুদ্ধ মনেতে,
ভস্ম মেখে লম্বা চল শীঘ্র বনেতে !

বেঁচেও এ যে নরক-ভোগা ! কথার মুখে ছাই !
তার চেয়ে সই ম'রেই আমি নরক যেতে চাই !
জ্যান্তে যদি স্বর্গ লুটি থাক্‌লে তোমার সাথ,
ভয় কি পরে মড়ার ওপর কর্‌লে খড়্গাঘাত !

তোমার আমার এই যে মিলন, নয় তা অপরের,
মধ্যে এসে অন্যে কেন টান্‌বে কথার জের ?
আমরা তো কেউ সাধছিনাকো সাধুর সাধে বাদ,
সেই-বা কেন হেথায় জুটে ঘটায় পরমাদ ?

দিনের বেলায় আজ্‌কে আষাঢ় ঢাল্‌লে চোখের জল,
রাত্রে এখন চন্দ্রাবলী ঝর্‌চে অজচ্ছল !
আলোক-ছায়ার মায়ার খেলায় আয় গো সজনী,
প্রেমের দোলায় দোদুল দুলি দিবস-রজনী !

শুন্‌ব আমি কেকার সুরে মেঘ্‌লা-বেলার গীত,
তোমার বুকের তালে-তালে !—এম্‌নি আমার রীত্ !
একটা-দুটো বেভুল কোকিল ধর্‌বে প্রলাপ-তান,
কিন্নরীরা রামধনুকে ছুড়বে সুরের বাণ !

রূপনারাণের বাঁকের মুখে বাউল জোছনা,
তরীর ওপর আয়রে আমার কমল-লোচনা !
চল্‌ব ভেসে তারেই রেখে সমাজ-কলরব,
পূর্ণিমাতে আজ যে সখি, চন্দ্রেরি উৎসব !

তারার নূপুর বাজ্‌চে শোনো—বাজ্‌চে শোনো গো !
নদীর প্রাণে সেই রাগিণীর ছন্দ গোণো গো !
ভাস্‌চে তরী—ভাস্‌চে যেন স্বপন-মরালী,
চাঁদের আলো ! আজ অকূলেই মনকে ভরালি !

ফুলের ফসল ফল্‌চে কোথায় গভীর বিজনে,
বেতারে তার আস্‌চে খবর সমীর-বীজনে !
গন্ধ দিয়েই গাঁথ্‌বে মালা সে কোন্ কুহকী,
সেই মালাতেই রূপটি তোমার উঠ্‌বে পুলকি !

নিয়ম-বাঁধা সংসারেতে নেইকো আমার টান,
একঘেয়ে সে জীবন-স্রোতে যায় যে ডুবে প্রাণ !
ঘরের কোণে জাগ্‌চে যত নরক-ভীতু চোখ,
বাইরে আছে কবির ভুবন, প্রেমের কল্পলোক ।

হাতের লক্ষ্মী তুমি আমার, মাড়িয়ে যাবনা,
স্বর্গে গেলেও তোমার মতন দোসরা পাবনা ।
নৃত্য করেন উর্ব্বশী আর রম্ভা-মেনকাও,
দিব্যি তোমার ! চাইনা তাঁদের, পষ্ট জেনো তাও !

দুই তনুতে একটি হয়ে থাক্‌তে পারে যে,
রেমো-শ্রেমোর ফাল্‌তো কথার কি ধার ধারে সে ?
পাতলা দুটি ঠোঁটের ঠোঙায় রূপের সুরা পাই,
মাতাল হয়ে মজায় আছি, আর বেশী কি চাই ?

আত্মহারা মত্ত যে-লোক মর্ত্ত্য-ভোলা গো,
তার কানেতে নীতির মানা মিথ্যে তোলা গো !
তার সুরেতে যে-বোল ফোটে, বধূর-গীতি সে,
নীতি তো তার প্রেমের নীতি—মধুর নীতি সে !

প্রেমের চেয়ে মস্ত সাধন কি আর আছে রে,
বেদ-বেদান্ত হার মেনে যায় প্রেমের কাছে রে !
প্রেমের ভেতর সপ্ত ভুবন নিত্য জাগিয়া,
তাই হয়েছি প্রেমের তাপস তোমার লাগিয়া !

কথার 'পরে কথাই গাঁথা রইল তবে আজ,
চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে—আয় ফেলে সব সাজ !
তুলতুলে ঐ নরম বুকে চুপ ক'রে থাক্ মুখ,
এই দুনিয়া যার-খুসি হোক্—নেইকো আমার দুখ !

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দত্ত-গিন্নী

৫

বৈকাল বেলায় ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দত্তজা দেখিলেন, দত্ত-গিন্নী মহাসমারোহে পিঠে তৈয়ার করিতে বসিয়াছেন। দেখিয়া দত্তজা প্রসন্ন হইতে পারিলেন না।

তিনি কানাই নাপিতকে স্মরণ করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বলিলেন, "আজ আবার এতগুলো পিঠে হচ্ছে কিসের জন্যে ?"

কৃপাময়ী ধোঁয়া হইতে আপনার চোখ আড়াল করিয়া সম্পূর্ণ অগ্রাহ্যের সুরে বলিল, "গোপাল খেতে চেয়েছিল তাই ক'খানা পিঠে করছি।"

দপ্ করিয়া দত্তজার বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "দেখ গিন্নী, বড় বাড়াবাড়ি করছো ! মনে ভাবছো আমি কিছু টের পাই না, বটে ? আমি এ-সব হতে দেব না। গোপাল ত আর এ বাড়ীতে আসতে পাবে না, আর সেই সঙ্গে তোমাকেও বাড়ী থেকে বেরুতে দিচ্ছি না।"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে কৃপাময়ী একবার দত্তজার মুখের দিকে চাহিয়া, আবার পিঠে ভাজিতে লাগিল, তার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল।

দত্তজা ভাবিলেন, তাঁহার ঔষধ ধরিয়াছে—তাই আর একটু মাত্রা বাড়াইয়া বলিলেন, "ওঠো, বলছি। ফেলে রাখ ও পিঠে। নৈলে সব আগুনে দেব।"

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া কৃপাময়ী একবার দত্তজার দিকে চাহিয়া বলিল, "ফরফরিয়ো না, বলছি। বেরোও বাড়ী থেকে।"

"কি ! যত বড় মুখ, তত বড় কথা ! আমাকে বেরোও ! কার বাড়ী যে আমি বেরুব ! বেরুতে তোকেই হবে। ওঠো শিগ্‌গির পিঠে ফেলে, নৈলে—" বলিয়া দত্তজা পিঠের একটা বাসনে হাত দিতেই কৃপাময়ী লাফাইয়া উঠিয়া একখানা চেলা কাঠ লইয়া তাঁহার পিঠে দমাদম কয়েক ঘা বসাইয়া দিল।

দত্তজা হাউ-হাউ করিয়া গড়াইয়া পড়িলেন।

শব্দ শুনিয়াই হউক বা অমনি হউক গোপাল তখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃপাময়ীকে নিবৃত্ত করিয়া দত্ত-মহাশয়কে সযত্নে সে উঠাইল ও তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। দত্তগিন্নীকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "এ তোমার কোন্ দেশী কারবার বউ ঠাকরুণ ? স্বামীর গায়ে হাত তোলা ! আর যে সে হাত তোলা নয়, একেবারে খুনের দাখিল ! আমি না এসে পড়লে তো মেরে ফেলেছিলে আর কি, ছি !" এ সহানুভূতিতে দত্তজার অন্তর গলিয়া গেল।

এই তিরস্কারে কৃপাময়ী শুধু একবার কাতর নয়নে গোপালের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া গেল। সে নীরবে পিঠে ভাজিতে ভাজিতে চোখের জল মুছিতে লাগিল।

দত্তজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেখতো ভাই, দেখতো, ও আমাকে বলে কি না বেরিয়ে যাও! তার পর এই মার। বলতো, এ সব কি ভদ্র লোকের মেয়ের কাজ?"

গোপাল বলিল, "বাস্তবিকই তো! এ কি কথা! ভদ্রলোককে ভাল মানুষ পেয়ে তুমি যা-নয় তাই বলবে আর এমনি হাল করবে, এ কোন্ দেশী কথা?"

আর পিঠে ভাজা চলিল না। এ তিরস্কারে কৃপাময়ী মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন গোপাল আসিয়া তাহার কাছে বসিয়া বলিল, "এতে কান্নার কি হলো? আরে মলো যা। শোনো না!" বলিয়া কৃপাময়ীকে এক রকম বুকের ভিতর টানিয়া সে মাথায় মুখে পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

দত্তজা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ইহাই হইল তাঁহার শাসন-প্রচেষ্টার শেষ ফল! গোপাল তাঁহার চক্ষের সামনে অম্লান বদনে তাহার স্ত্রীকে এমনি ভাবে সান্ত্বনা দিতেছে! কিন্তু এখন তো গোপালকে কোন কথা বলিবার মুখ তাঁহার নাই। সে তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে। "দুর হোক গে ছাই, যা হয় হোক। লোকের মুখ আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।" বলিয়া দত্ত মহাশয় হাত পা ছাড়িয়া দিলেন; দত্ত-গিন্নীকে সুস্থির করিয়া গোপাল আবার দত্ত মহাশয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

চেলা কাঠের ঘা খাইয়া দত্ত মহাশয়ের পিঠে একটা প্রকাণ্ড ক্ষত হইল। তাহার টাটানি সারিতে অনেক দিন লাগিল—দত্তজা সে কয়দিন বিছানা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

সমস্ত কথাই অবশ্য গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু দত্ত মহাশয় কবিরাজের কাছে বলিয়াছিলেন যে তিনি হঠাৎ পা পিছলাইয়া একটা চেলা কাঠের গাদার উপর পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছেন। গ্রামের লোকেও তাঁহার সঙ্গে সেই ভাণটা রক্ষা করিয়া কথা কহিত আর মুখ ফিরাইয়া হাসিত।

তবে সমস্ত কথাটা লোকে জানিত না; দত্তগিন্নী মারিয়াছিল সে কথা সবাই জানিত। কেন মারিয়াছিল, সে সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। গোপাল ভাণ্ডারী যে ইহার সঙ্গে কোন মতে জড়িত আছে, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ ছিল না।

৬

পিঠের ঘা তখনও শুকায় নাই, কিন্তু দত্ত মহাশয় হাঁটিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারেন, তবে একটু নত হইয়া। সকাল বেলায় রান্নাঘর সারিয়া হাত ধুইয়া দত্তগিন্নী দত্ত মহাশয়কে বলিলেন, "আমাকে আজ পাঁচশো টাকা দিতে হবে। সামনের রবিবার আমার সাবিত্রী ব্রতের প্রতিষ্ঠা।"

দত্ত মহাশয় আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "টাকা আমি কোথায় পাব? তোমার সিন্দুকেই তো টাকা আছে, আমি কোথায় পাব?"

"না, আমার টাকা নেই। তুমি পোষ্টাপিস থেকে তুলে দাও।"

এ কথায় না বলিবার সাহস দত্ত মহাশয়ের অবশ্য ছিল না। কানাই নাপিত মিথ্যা বলে নাই, শাসন করিতে হইলে রোজ মারিতে হয় না। এক দিনের প্রহারে দশদিন ভয় জন্মায়। সেই চেলা-কাঠ-পর্ব্বের পর দত্তমহাশয়ের ভিতর যা' কিছু বিদ্রোহ ছিল, তাহা একদম উবিয়া গিয়াছিল।

একবার দত্তমহাশয় বলিলেন, "আমি খোঁড়া হ'য়ে রয়েছি, কেমন করে' যাবো পোষ্টাপিসে?"

অমনি একটা চাবুকের মত জবাব আসিল, "তোমায় যেতে হবে না, গোপালকে বলে রেখেছি, সেই টাকা তুলে দেবে।"

গোপাল! গোপাল! গোপাল! দত্ত মহাশয়ের অন্তর কৃপাময়ীর মুখে এই নাম শুনিয়া জ্বলিয়া খাক্ হইয়া গেল। আর বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি ফর্ম্ সহি করিয়া দিলেন।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক সেদিন ও তার পরের তিন দিন বন্ধ গোপালের নিকট এ সংবাদ জানিয়া আসিয়া কৃপাময়ী আবার স্বামীকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল, "কোনোখান থেকে টাকাটা আজ জোগাড় না করে' দিলেই নয়।"

দত্তমহাশয় আবার ওজর তুলিলেন, "আমি এখন কেমন করে' কোথায় যাই, বল দেখি।"

অমনি কৃপাময়ী বলিলেন, "তোমার যেতে হবে না,

গোপালের কাছে টাকা আছে, সেই দেবে,—তুমি কেবল একখানা হ্যাণ্ডনোট সই করে দেবে।" বলিয়া একখানা গোপালের হাতে লেখা খসড়া হ্যাণ্ডনোট দত্তমহাশয়ের সামনে ধরিল।

দত্ত মহাশয় হ্যাণ্ডনোটখানা সই করিবার জন্য কালি-কলম লইয়া বলিলেন, "টাকা কই ?"

"সে আমি গোপালের ঠেঁয়ে নিয়ে আসবো গিয়ে,—তুমি কাগজখানা সই করে দাও।"

দত্ত মহাশয় গোপালের বরাবর হ্যাণ্ডনোট সহি করিয়া দিলেন। কিন্তু এই হ্যাণ্ডনোটে তিনি যে টাকা কর্জ্জ করিলেন সে তাঁহার নিজেরই টাকা, তাঁর স্ত্রীর সিন্দুকে মজুত ছিল। হ্যাণ্ডনোটখানি স্ত্রী আদায় করিলেন গোপালের বেনামীতে।

ধুম করিয়া সাবিত্রী-ব্রতের প্রতিষ্ঠা হইল। দত্তমহাশয় ও দত্ত-গৃহিণী দুইজনেই কৃপণ ছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে গৃহিণী অনেক টাকা খরচ করিয়া বসিলেন। তাই বলিয়া ঠিক পাঁচশো টাকাই খরচ করেন নাই, আন্দাজ সাড়ে তিন শো টাকা খরচ করিয়া বাকী টাকা চুরি করিলেন।

সতেরো জন ব্রাহ্মণ, সতেরো জন ব্রাহ্মণ-কুমারী এবং সতেরো জন সধবা ব্রাহ্মণী সংগ্রহ করিতে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ-বাড়ী উজাড় হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা নিজেরাই আয়োজন করিয়া আহারাদি করিয়া দক্ষিণা ও ডালি লইয়া বিদায় হইলেন। নানা দ্রব্য-সম্ভারে ডালি সাজাইয়া কৃপাময়ী স্বামীর পূজা করিলেন। দত্তমহাশয় কৃতার্থ হইয়া সে পূজা গ্রহণ করিলেন এবং কৃপাময়ী যখন গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল তখন তাঁহার অন্তর আনন্দে ও গর্ব্বে অভিভূত হইয়া উঠিল।

উৎসব সারাদিন ভরিয়া চলিল। গোপাল ভাণ্ডারী কোমরে গামছা বাঁধিয়া মহা হাঁটাহাঁটি লাগাইয়া দিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ং হুঁকা হাতে সমস্ত তদ্বির করিতে লাগিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরোহিত্যের কার্য্য যত্ন ও সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন করিলেন। সকলেই দত্তগিন্নীকে আশীর্ব্বাদ ও ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ব্রাহ্মণের দল বাহিরে আসিলে নটবর দাস বলিল, "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।" আর দত্তবাড়ীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "সাবিত্রীভ্যো নমঃ।"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কৃপাময়ীর সাবিত্রী-ব্রতের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড পরিহাস লুকানো আছে সেটা এতক্ষণে প্রকাশ হইল। কিন্তু সে কারণে কোন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-কন্যা বা ব্রাহ্মণী নিমন্ত্রণ-গ্রহণে অসম্মত হন নাই।

কেবল একজন ছাড়া। তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল না; কেন না তিনি বিধবা, কিন্তু তাঁর দুটি ছোট মেয়ে ছিল, তাহাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে যাইতে দেন নাই। এই "অদ্ভুত" জীবটি শ্রীমতী শ্যামা ঠাকুরাণী। ইনি দূর-সম্পর্কে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভগ্নী, নিতান্ত দরিদ্র এবং সম্পূর্ণ-রূপে ভট্টাচার্য্যের আশ্রিতা।

৭

শ্যামা দেবীর বয়স পঞ্চাশের উপর। বর্ণ গৌর, নাক-মুখ-চোখ সবই তীক্ষ্ণ ও তীব্র। তাঁহার কথার আঁচ ভয়ানক। ভট্টাচার্য্যের সংসারে তিনি একা চারটি লোকের খাটুনী খাটিয়া তবে একবেলা দু মুঠো অন্ন পান, এবং সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খোঁটা ও গালি-গালাজ খাইয়া থাকেন। এই সকলের প্রধান কারণ, তাঁহার শুচিবাই। তিনি মাছের কাঁটা ও ভাত খুঁটিয়া আর স্নান করিয়া ও কাপড় কাচিয়া দিনের অর্দ্ধেক ভাগ কাটাইয়া দিতেন। এও সহ্য হইত কিন্তু তার চেয়ে অসহ্য হইয়াছিল তাঁহার সতীত্বের শুচিতা। তিনি সরল বিশ্বাসে সতীত্বকে অবশ্য-পালনীয় নারীধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং নারীর পক্ষে সতীত্ব-হানিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাতক বলিয়া জানিতেন। যাহাকে অসতী বলিয়া জানিতেন বা সন্দেহ করিতেন, তাহাকে তিনি স্পর্শ করিলে স্নান করিতেন, তাহাদের স্পৃষ্ট কোন জিনিষ কখনো খাইতেন না। তাঁহার এই শুচিবাই ক্রমে গ্রামের প্রায় ষোল আনা স্ত্রীলোকের উপর গিয়া পড়িল। তাহাতে সব ক্ষেপিয়া উঠিল! সবাই অসতী, আর উনি বড় সতী, এই দেমাক কেহ সহ্য করিতে পারিত না।

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর তিনি ছিলেন দু'চক্ষের বিষ। গৃহিণী নিজে অসতী ছিলেন না; তবে পাড়ার অসতীদের কলঙ্কে

কাহিনী লইয়া মেয়ে-মহলে আলোচনা করিতে বড় ভাল-বাসিতেন। একদিন শ্যামা দেবী এমনি একটা আলোচনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,"বড় বউ, এ-সব পাপের কথা বল্লেও মন ময়লা হয়, তার চেয়ে মহাভারত রামায়ণ পড় না কেন!" সেই হইতে ভট্টাচার্য্য-গিন্নী শ্যামার উপর হাড়ে চটা।

যখন শ্যামা তাঁহার মেয়ে-দুটীকে কৃপাময়ীর ব্রত-প্রতিষ্ঠার নিমন্ত্রণে যাইতে বারণ করিলেন তখন এই কথা লইয়া অন্দরে খুব একচোট কলহ হইয়া গেল! ভট্টাচার্য্য গৃহিনী গলা ছাড়িয়া বলিলেন, "ওরে আমার সতী সাবিত্রীরে—গ্রামের সবশুদ্ধ অসতী আর উনি সতী! এত যদি সতী হয়েছিলে, তবে এ দশা হল কেন?"

এ কথার কোন উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারিলেও শ্যামা তর্কে পশ্চাৎপদ হইলেন না; কোঁদল রীতিমত বাধিয়া উঠিল। শ্যামা বলিলেন, অসতীর অন্ন যে খায় তারই সে পাপ স্পর্শে, তা' ছাড়া তার মতিগতি খারাপ হইয়া যায়! ইহাতে ভট্টাচার্য্য-গিন্নী আরও তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ঝগড়া বাড়িয়া চলিল।

এমন সময় ভট্টাচার্য্য দত্তবাড়ী হইতে ফিরিলেন। গিন্নী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পাড়িয়া ধরিলেন, বলিলেন, "ওগো তোমার পাজি-পুঁথি তুলে রাখো, আমাদের এই তর্কালঙ্কার মশায় পাঁতি দিয়ে তোমাদের সবাইকে একঘরে করে' দিয়েছেন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন বড় তার্কিক; কিন্তু এ কোন্দলের ক্ষেত্রে তিনি সব কথা শুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। শ্যামা বলিলেন, "লজ্জা হয় না বউ, গুষ্টিশুদ্ধ একটা মেয়ের অন্ন খেয়ে এলি, যার নাম করলে নরকে যেতে হয় আবার বড় গলায় তর্ক করতে যাস্! যা' করিস্ চুপচাপ কর, আর ঢাকঢোল বাজিয়ে কোঁদল করতে আসিস নে! ঘেন্না হয় না?"

"বটে রে মাগী, আমরা নরকে যাব আর তোর জন্যে বৈকুণ্ঠে বাড়ী হচ্ছে! নচ্ছার মাগী, সাতকাল কুল ভাসিয়ে সোয়ামীর কুল বাপের কুল খেয়ে এখানে মরতে এসেছেন, আবার পাদ্রীগিরী করছেন, দেখ। আমাদের দেখে যদি এত ঘেন্না পায়, তবে আমার ভাতগুলো গিলিস কোন্ লজ্জায়?"

এ প্রকার ঝগড়ায় ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর জয় অবশ্যম্ভাবী। শ্যামা দেবীকেই বাধ্য হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইল! কিন্তু তিনি একটা অসম সাহসের কাজ করিয়া বসিলেন। মেয়ে দুটীর হাত ধরিয়া অনাথা বিধবা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন, সে দিনকার মত চক্রবর্ত্তী-বাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

শ্যামা ঠাকুরাণী যে কথাটা তুলিলেন, সেটা এই কারণে খুব রাষ্ট্র হইয়া গেল আর গ্রামের প্রত্যেক স্থানে এই কথা লইয়া খুব তোলাপাড়া চলিতে লাগিল। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা যে এত বড় পাপিষ্ঠাকে এমনি করিয়া সমাদর করিলেন, ইহাতে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, যুবকেরা ঘোরতর তর্ক করিতে লাগিল, বৃদ্ধেরা আস্ফালন করিতে লাগিল।

এমনি একটা মজলিসে একদিন শ্যামা ঠাকুরাণীরই কথা আলোচনা হইতেছিল। সকলে একবাক্যে শ্যামার পক্ষ লইয়া দত্তগৃহিণীর চরিত্রের নানা দোষ কীর্ত্তন করিতেছিল। এমন সময় দত্ত মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সবই শুনিলেন। রাগে তাঁহার ব্রহ্মতালু ফাটিবার উপক্রম হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সবাই চুপ মারিয়া গিয়াছিল; তিনিই খোঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে বাপু, সবাই বড় যে চুপ মেরে গেলে! কি কথা হচ্ছিল?"

সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। নিধিরাম বলিয়া একটা নিতান্ত ঠোঁটকাটা ছোকরা বলিয়া বসিল,

"দত্তগৃহিণীর কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

"হাঁ, সে আমি শুনেছি। শুনেছি বলেই জিজ্ঞাসা করছি। তা বাপু, তোমাদের সে কথা আলোচনা করবার কি অধিকার আছে, শুনি?" বলিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি সংলগ্ন ও অসংলগ্নভাবে তাহাদিগকে গালাগালি করিতে লাগিলেন। একবার তিনি পত্নীর চরিত্র-দোষ অস্বীকার করিলেন, আর একবার বলিলেন, সে দোষ থাক বা না থাক অন্য লোকের তাতে মাথাব্যথা কেন! আবার বলিলেন, গোপাল ভাণ্ডারীর মত মহাপুরুষ জগতে আছে কি না, সন্দেহ! তা' ছাড়া সমস্ত দলকে অপোগণ্ড, ডেঁপো, ডানপিটে, বদমায়েস

বলিয়া গালিগালাজ করিলেন। আবার বলিলেন, কৃপাময়ী যদি অসতীই হয়, তবে সতীই বা কে—একে একে সমস্ত গ্রামবাসিনী ভদ্রমহিলাদের চরিত্রে নিঃসঙ্কোচে তিনি কালিমা লেপন করিয়া গেলেন।

ছোকরারাও ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহারা তাঁহার সঙ্গে সমানে গালিগালাজ চালাইতে লাগিল; আর শাসাইল। দত্তজাকে সমাজে বন্ধ দেওয়া হইতে ঘরে আগুন দেওয়া পর্য্যন্ত নানারকম ভয়ই আকারে-ইঙ্গিতে বা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখানো হইল। তাহার জন্য যে শ্যামা ঠাকুরাণী বেচারীকে ঘর ছাড়া হইতে হইয়াছে, এ অপরাধ তার গ্রামবাসী ভুলিতে পারিবে না, ইত্যাদি নানা কথা হইল।

দত্ত মহাশয় যখন প্রচণ্ড বেগে তর্ক চালাইতেছেন, তখন গোপাল ভাণ্ডারী আসিয়া তাঁহাকে এক রকম বগল-দাবা করিয়া লইয়া গেল।

উপস্থিত ব্যাপারটা ইহাতে থামিয়া গেল বটে, কিন্তু ইহার পর এমন ব্যাপার একটু ঘন ঘন ঘটিতে লাগিল। এতদিন পর্য্যন্ত লোকে দত্ত মহাশয়ের আড়ালে কৃপাময়ীকে লইয়া কানা-ঘুষা করিয়াছে, হাস্য-পরিহাস করিয়াছে, কিন্তু এ সব আলোচনার মধ্যে সর্ব্বত্রই দত্ত মহাশয়ের প্রতি কতকটা কৃপা ও সহানুভূতির ভাব ছিল। দত্ত মহাশয় নিরীহ প্রকৃতির লোক, কাহারও কোনও অনিষ্ট করিবার মত মনের বলই তাঁর ছিল না। কাজেই লোকে তাঁহার প্রতি একটু সদয় ব্যবহারই করিত, এবং তাঁহার দিকে চাহিয়াই কৃপাময়ীর কথা লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিত না। কিন্তু তিনি যখন আগ বাড়াইয়া কৃপাময়ী ও গোপাল ভাণ্ডারীর পক্ষে ওকালতি আরম্ভ করিলেন এবং অপরকে এতটা বাড়াবাড়ি করিয়া গালাগালি আরম্ভ করিলেন, তখন লোকেরও রোখ বাড়িয়া গেল। এখন তাহারা দত্তজাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কৃপাময়ীর কথা লইয়া রহস্য করিতে লাগিল। কৃপাময়ী, গোপাল ও দত্তজাকে লইয়া গান বাঁধিয়া তার বাড়ীর আশেপাশে গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং পথে-ঘাটে দত্তজাকে জ্বালাতন করিতে লাগিল।

কৃপাময়ী ও গোপাল কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। তাহারা কেহই এ সব কোন কথা কানেই তুলিত না। তাহারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে ঠিক পূর্ব্বেরই মত দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিল। কৃপাময়ী ঠিক পূর্ব্বের মত নির্জ্জন ঘরেও আধ হাত ঘোমটা টানিয়া সম্পূর্ণ নীরবে কাজ করিয়া যাইত, পাড়ায় বেড়াইত, প্রতিবেশীর বাড়ীতে বড় কোন অনুষ্ঠান হইলে কাজ করিত। আর গোপাল সান্ন্যাল মহাশয়কে কুপরামর্শ দিত, লোকের মধ্যে মামলা বাধাইত, আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিত। ইহাদের জীবনের ভিতর এই সব গ্রাম্য গোলযোগ একটুও উপদ্রবের সৃষ্টি করিতে পারিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে তাহাদের মতিগতির একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল। গোপাল ভাণ্ডারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভয়ানক অনুগত হইয়া পড়িল। সান্ন্যাল মহাশয়দের আশ্রয়ে থাকিয়া সে ভট্টাচার্য্যকে এতদিন কতকটা অগ্রাহ্যই করিয়া আসিয়াছে। কোনও রকমে প্রকাশ্যভাবে সে কোন রকম অশ্রদ্ধা বড় একটা প্রকাশ করে নাই বটে, কিন্তু বড় একটা গ্রাহ্যও করিত না। কিন্তু এখন সে ভট্টাচার্য্য বাড়ী দুবেলা আনাগোনা করিতে লাগিল। পথে কোথাও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখিতে পাইলে সে অনেকটা ঘুরিয়া গিয়াও তাঁর পায়ের ধূলা না লইয়া ছাড়িত না। আর প্রায়ই সে গোপনে যাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পরকে ঠকাইবার নানা রকম ফিকির-ফন্দী বাতলাইয়া দিত। ভট্টাচার্য্য ধূর্ত্ত লোক। এ হঠাৎ-ভক্তির যে কোনও মূল আছে, তাহা তিনি না বুঝিতেন এমন নয়। কিন্তু গোপালের দুষ্ট বুদ্ধি অসামান্য। তাহার মন্ত্রণায় তিনি নিজেকে এতটা লাভবান মনে করিলেন যে তিনি গোপালকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্যাম নেহারী —
(প্রাচীন চিত্র হইতে)

৪৭শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৩০ { চতুর্থ সংখ্যা

সুরসরিৎ

চিদাকাশে হংস-বাহিনী
অনাদি বাণী গাহিল !
সুরসরিৎ প্রবাহিল !

রূপ ও রসে ঘ্রাণ পরশে
রাগরঙ্গে উছলিল !
সুরসরিৎ সলিল !

শব্দ অনাহত শ্রবণ-অতীত
মহাকাল কুহরিল !
সুরসরিৎ বাহিরিল !

নামরূপময় বিশ্বচিত্র
শাশ্বতী-চিত ভরিল !
সুরসরিৎ নিঃসরিল !

জগৎ-কারণ প্রথম স্পন্দন
নাদগম্ভীর উঠিল !
সুরসরিৎ ছুটিল !

সৃষ্টিচ্ছন্দে বাক অর্থে
অনিরুদ্ধা ফুটিল !
সুরসরিৎ লুটিল !

হিমালয়। শ্রীসরলা দেবী।

বাব্‌লা

উপন্যাস

চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে একটি তরুণী বসিয়াছিল, কোলে তার সাত মাসের ছেলে।

চারিধার ঝাপ্‌সা করিয়া আষাঢ়ের ধারা নামিয়াছিল। বেলা তখন প্রায় দেড়টা; দুইটার ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ। কতকগুলি যাত্রী টিনের শেডের তলায় অত্যন্ত চিন্তাকুল-ভাবে বসিয়া কলরব করিতেছিল। যাত্রার উৎসাহ এই অবিরাম ধারার স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল! সকলে কেমন নির্জীবের মত হইয়া পড়িয়াছিল। পাণ-সিগারেটওয়ালা ছোকরাটা অবধি দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া ছিল, বেচা-কেনার কথা তার মনেও ছিল না।

তরুণীর মনে বাহিরের এই বর্ষার বারি-প্রবাহ চিন্তার সহস্র ধারা খুলিয়া দিয়াছিল। মেঘ-ভরা আঁধার আকাশের মতই তার মনের মধ্যটা আঁধারে ছাইয়া গিয়াছিল। সকালের স্নিগ্ধ রৌদ্র-কিরণে এই যাত্রার ব্যাপারটি সমস্ত প্রাণে এমন আলো ফুটাইয়া তুলিয়াছিল,—হাসির উচ্ছ্বাসে, অসহ্য পুলকের সম্ভাবনায় মন এমনি ভরপূর হইয়া গিয়াছিল যে, চিরকালের পরিচিত এই পল্লী-বাসভূমি ত্যাগ করিয়া কোলাহল-ভরা কলিকাতা-সহরের দিকে পা বাড়াইতে তার প্রাণ এতটুকু কাতর হয় নাই। আসন্ন বিচ্ছেদের একটা অতি-মৃদু বেদনাও তার প্রাণের কোনখানে পরশ বুলাইতে পারে নাই।

কি প্রচণ্ড উৎসাহেই না সে এখানকার কাজকর্ম্ম সারিয়া চিরকালের মত এখানকার বাস উঠাইবার বন্দোব করিয়াছে—অধীর আবেগে হাত এতটুকু কাঁপিয়া ওঠে নাই, প্রাণ এতটুকু কাতর হয় না!

তারপর খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তরুণী যখন গরুর গাড়ীতে আসিয়া উঠিল, তখনো চারিধার রৌদ্রের কিরণে ঝলমল করিতেছে। খড়ে ছাওয়া ঐ জীর্ণ গৃহখানি, পাশে তার পাণা-ভরা পুকুর—ঘরের সামনে বাতাবি লেবুর গাছ, ঘেঁটুর বন, চির-পরিচিত এই সব সাথী—ইহাদের ছাড়িয়া যাইবার সময় একটা ক্ষীণ দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিবার উপক্রম করিলে প্রাণের ভিতরকার নব-আশা-আনন্দ-পুলকের ঝাপ্‌টায় সেটাকে সে উড়াইয়া দিয়াছিল। নাপিত-বৌ, গয়ার মা, সই, কালী ঠাকুরঝি—সবাই আসিয়া গাড়ীর কাছে সজল চোখে দাঁড়াইয়া ছিল, সকলকে মুখের কথায় আর হাসিতে আপ্যায়িত করিয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী চলিল, পাড়াগাঁর মেটে পথ ধরিয়া। কত বাঁশবন, খানা-ডোবা, ঝোপ-ঝাপ—কোনটা ডাহিনে ফেলিয়া, কোনটা বাঁয়ে রাখিয়া, যষ্ঠী-তলার ধার দিয়া শিবমন্দিরের সামনে দিয়া, কত মোড় ঘুরিয়া, ধূ-ধূ মাঠের মধ্য দিয়া, আলে হেলিয়া গাড়ী চলিয়াছে ত চলিয়াছেই! চোখের সামনে পল্লী-প্রকৃতি তার বিচিত্র মায়ার দৃশ্য দেখাইয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার কত চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এ-সব কিছুই তার চোখে পড়ে নাই! দুই চোখ একান্ত আগ্রহে এই কত যোজন দূরত্বের ব্যবধান ভেদ করিয়া একান্ত অজানা সহরের পথে পথে আকুল হইয়া ঘুরিয়া তেমনি অজানা এক গৃহের দ্বারে কার দুটি উদ্যত বাহুর বাঁধন মাগিয়া ফিরিতেছিল! কেমন সে গৃহখানি! কেমন করিয়া কি সাজেই তাকে আজ আহ্বান করিয়া লইবে! সেখানে কত সাধে নূতন ঘর সে বাঁধিবে গিয়া—দীর্ঘ বিরহের অশ্রু মুছিয়া চির-মিলনের হাসির সাগরে ঝাঁপ দিবে সেখানে, ইহা ভাবিয়া প্রাণটা মুহূর্ত্তে চমকিত পুলকিত হইয়া শিহরিয়া-শিহরিয়া উঠিতেছিল! কল্পনার এই রঙীন স্বপ্নের মধ্য দিয়া গাড়ী আসিয়া কখন এক সময় ষ্টেশনের সামনে দাঁড়াইয়াছে, সেদিকে তার খেয়াল ছিল না। ঐ টিনের ছাদ-দেওয়া ঘরখানি! ঐ নীল রঙের জামা পরা, মাথায় নীল পাগড়ি দেওয়া লোকগুলা মিলন-পথের অগ্র-দূতের মত আসিয়া গাড়ী হইতে মোটমাট তুলিয়া তাহাকে ষ্টেশনের এই ঘরটিতে

আনিয়া বসাইয়া দিল। সমস্তটা যেন স্বপ্ন! সঙ্গে ছিল বিপিন। পাড়া-সম্পর্কে তরুণী তাহাকে ঠাকুরপো বলিয়া ডাকে। বছর সতেরো তার বয়স। সে কলিকাতায় চলিয়াছে, কলেজে নূতন পড়া পড়িতে। এথানে গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ হইয়াছে—সেও চলিয়াছে কলিকাতায় প্রাণে কত সাধ, কত উৎসাহ জাগাইয়া। না জানি, সেও আজ ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন-ছবি মনে মনে গড়িয়া তুলিতেছে! তরুণী ওয়েটিং রুমে বসিলে বিপিন গেল টিকিট কিনিতে।

তরুণী গাড়ী হইতে নামিতেই দেখে, রৌদ্র কোথায় মিলাইয়া গেছে। আকাশে মেঘ জমিতেছে; চারিধার কালো হইয়া আসিয়াছে। সামনে রেলের লাইন সরীসৃপের তেলা গায়ের মতই ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কোন্ সীমাহীন অসীমের দেশে গিয়া সে মিশিয়াছে! তারের উপর তার, তারের জাল বোনা!... ঐ একটা থামের মত, কি ওটা? বুঝি, এই অকূল প্রান্তরের মধ্যে সে ঐ হাতখানি তুলিয়া যাত্রা-পথের দিকে সঙ্কেত করিতেছে!

হঠাৎ ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। কাছে ঘটিতে দুধ ছিল—পুঁটলির মধ্য হইতে ঝিনুক বাহির করিয়া তরুণী ছেলেকে দুধ খাওয়াইয়া দিল। ছেলের দুধ খাওয়া শেষ হইয়াছে, অমনি আকাশ ফাটিয়া ঝম্-ঝম্ শব্দে বৃষ্টি নামিয়া পড়িল,—দিক্-দিগন্ত যেন ভাসাইয়া দিবে, এম্নি ঘন বৃষ্টি!

তরুণীর মনে হইল, তার যত সাধ আশা হাসি আনন্দের বুক চাপিয়া কালো মেঘের রাশ জড়ো হইয়াছে—আর সে-সব কল্পনার ছবি ভাসাইয়া দিতেই যেন ঐ বৃষ্টি নামিয়াছে! আকাশের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণের আলোও বুঝি নিভিয়া আসে! প্রাণ কেমন হাঁফাইয়া উঠিতেছিল! সে তখন এ ভাবটাকে দূর করিয়া দিবার জন্য আপনার ক্ষুদ্র জীবনের কথাগুলা ভাবিতে বসিল।

সে তখন সাত বছরের মেয়ে—বাপ মারা গেল। তারপর বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে মাও সেই অজানা পথে যাত্রা করিল। পাড়ার ছিল গয়ার মা—তিন কুলে তার কেহ ছিল না! সে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া তাহাকে আশ্রয় দিল। তারপর এমনি এক রকমে দিন কাটিয়া যাইতেছিল—বয়স যখন বারো বছর, তখন বিবাহ হইল। স্বামীর বাপ ছিল না, মা ছিল না। এক বৃদ্ধা পিশি—তাহার কাছেই স্বামী মানুষ হইয়াছে। পিশিই দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া তাকে বৌ করিয়া ঘরে লইয়া গেল।

স্বামীর ঘরেই কি স্বচ্ছলতা ছিল! বেচারা এখানে ওখানে কাজের চেষ্টায় নানা স্থানে ঘুরিয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। তারপর কলিকাতায় গিয়া পড়িল—একেবারে অজানা অচেনা ঠাঁই। কতদিন অমন তার অনাহারে ঘুরিয়া কাটিয়াছে, কতদিন পথে পড়িয়া সে রাত কাটাইয়াছে! শেষে একটা ছাপাখানায় কাজ শিখিতে ঢোকে। সেখানে দুইবেলা আহার মিলিল, আর শুইবার ঠাঁইটুকু!

শুধু তাহাকে সুখী করিবার জন্যই স্বামীর এ কাজে কি উৎসাহ! দুই মাস পরে মাহিনা হইল পাঁচ টাকা; তারপর আরো ছয় মাস কাটিলে সাত টাকা—তারপর বছর ঘুরিলে আরো দশ,—এমনি করিয়া কম্পোজিটারী কাজ করিয়া আজ স্বামী চল্লিশ টাকা মাহিনা পাইতেছে। ছুটী পাইলে বছরে দুই তিনবার মাত্র দেশে আসিতে পায়। আসিতে খরচ পড়ে, তাছাড়া প্রেসের ছুটীর সময় একট্রা কাজ করিলে কিছু রোজগার করা যায়। কাজেই বেশী আসা চলে না। যখন প্রাণটা খুব হাঁফাইয়া ওঠে, হৃদয়ের আহ্বান আকুল হইয়া বাজে, তখনই আসিয়া সে স্ত্রীকে দেখিয়া যায়। স্ত্রীকে বলিয়া কহিয়া লেখাপড়াও একটু শিখাইয়াছে। স্বামীকে চিঠি লিখিয়া মনের কথা জানাইবে, স্বামীর চিঠি পড়িয়া তার মনের কথাও জানিবে,—এই আশায় সেও ধ্যানীর মত একাগ্র চিত্তে লেখাপড়া শিখিয়াছে।

চিঠি লিখিয়া চিঠি পাইয়া—স্বামীকে সে দিবারাত্র পাশে পাশে পাইয়াছে। স্বামীর স্বর তার কাণে বাজিয়াছে সারাক্ষণ। স্বামীর সোহাগ-আদরে বিজন এই জীবনটাকে সে সরস রাখিয়াছে। ভাগ্যে লেখাপড়া শিখিয়াছিল, না হইলে কি লইয়া বাঁচিত সে—এই দূরে, একা, পল্লীর নিরালা বিজন ঘরের কোণে!

স্বামী যখন আসিত, তখনই দুইজনে বসিয়া ভবিষ্যতের

কত সুখের ছবিই না আঁকিতে বসিত ; আরো কিছু মাহিনা বাড়িলে স্ত্রীকে সে লইয়া যাইবে, কলিকাতায় দুইজনে এক — থাকিবে! তখন আর ছাড়াছাড়ি থাকিয়া এ বিচ্ছেদের বেদনা বহিতে হইবে না! কলিকাতায় অমন একটা বাড়ীর মধ্যে একখানা ঘর লইলেই চলিয়া যাইবে। এখানে কে দেখে? কাজকর্ম্মের মাঝে ডুবিয়া থাকিলেও স্বামীর মনটি এখানে পড়িয়া আছে সারাক্ষণ—শৈল কি করিতেছে? কেমন আছে? যদি কোনদিন রাত্রে হঠাৎ বড় রকমের একটা অসুখ করে? কে দেখিবে? কি হইবে? এমনি উদ্বেগ স্বামীর চিঠিতে কেবলি প্রকাশ পায়! সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর বুক-ফাটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ রেশটুকু যেন তার প্রাণে করুণ সুরে বাজিয়া ওঠে!

তারপর তাদের জীবন-পথে আসিয়া দেখা দিল এই শিশু! বৃদ্ধা পিশি দুই চোখে জল আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না! আহা, মা-বাপ-হারা পূর্ণ—তার ছেলে হইয়াছে! এ বস্তু চোখে দেখিবে, পিশি যে ভুলিয়াও এমন কল্পনা করিতে পারে নাই! বাপ আসিয়া ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইল; আদর করিয়া ডাকিল, বাবা আমার, বাবলা আমার, বাবলা! শুনিয়া পিশি বলিল—তাই ডাক্ রে—জন্মদুঃখী ছেলে, বাবা বলে জীবনে তো কাউকে ডাকতে পেলিনে কোনদিন! ঐ ছোট্ট গুঁড়োটুকুকেই বাবা বলে ডেকে প্রাণের সাধ মেটা!

তার পর পূর্ণর এক কথা,—কলকাতায় চল। শৈল বলিল,—পিশিমাকে কে দেখবে?

পূর্ণ বলিল,—পিশিমাও যাবে।

শুনিয়া পিশি বলিল,—তা'ও কি হয়? তোমরা যাও বাবা। আমি এখানে থাকি।...এই ঘর থেকেই সবাইকে বিদেয় করেছি—নিজে এখান থেকেই তাদের পথ নেব রে, তাই এই ঠাঁইটুকু জুড়ে পড়ে আছি! পিশি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

পূর্ণ বলিল,—তাহলে যাওয়া হয় না!

শৈল বলিল,—সত্যিই তো,—পিশিমাকে ছেড়ে কি করে যাই? বুড়ো মানুষ, ওঁকে কে দেখ্‌বে!

পূর্ণ বলিল,—তাই তো!

দুই জনের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই!

তারপর পিশিমাও একদিন সেই অজানা পথে যাত্রা করিল।

তখন পূর্ণ আসিয়া বলিল,—যাক,সব শেষ! আর এখানে কেন! কি ভরসায় ফেলে রাখি? এবার আমার সঙ্গে চল।

ছোট্ট বাবলা তখন পাঁচ মাসেরটি। পাড়ার সকলে বলিল,—তা হয় না পূর্ণ। গাঁয়ের ছেলে, গাঁয়েই ছেলের ভাতটি দাও। ভগবানের আশীর্ব্বাদে মানুষের মত হয়েছ, দু'পয়সা রোজগার করছ!...আর বৌমা? আমরা আছি, আমরা দেখব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

নিরাশ চিত্তে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া পূর্ণ কলিকাতায় চলিয়া গেল, একলা! নিরাশায় শৈল আবার ঘরের কোণে আঁচলে চোখের জল মুছিল। এবারেও উপায় নাই!

তারপর ছেলের ভাত হইয়া গেল। ভাতের পর পূর্ণ বলিল,—এবার গোছগাছ কর—চল আমার সঙ্গে। শৈল পা বাড়াইয়া ছিল; বলিল,—বেশ!

বাধা পড়িল। পাড়ার ঘোষাল-গিন্নী আসিয়া বলিলেন,—বৌমাকে আর কটা দিন রেখে যা বাবা! ঝাঁপার বিয়ে। ঝাঁপা বৌমার সঙ্গে সই পাতিয়েছে—ঝাঁপার বড় সাধ, তার বিয়েয় সইটি থাকে।

পূর্ণ গোছগাছ করিতেছিল কলিকাতায় যাইবার জন্য; বলিল,—বেশ!

এবারো বেচারা একা ফিরিল—শৈলর যাওয়া হইল না। হায়রে, এবারেও উপায় নাই!

যাইবার দিন পূর্ণ বলিল,—এবারও তোমার যাওয়া হল না! কেবলি বাধা পড়ছে! পূর্ণর কথা বাধিয়া গেল। শৈলর চোখে জল আসিল—কোনমতে উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া মৃদু কণ্ঠে সে কহিল,—আর পনেরোটা দিন বৈ ত নয়—তখন এসে নিয়ে যেয়ো।

পূর্ণ বলিল,—আর কি এখন ছুটী পাব, বাড়ী আসতে? একটু ভাবিয়া আবার সে বলিল,—ওদের বিপিন এবারে কলকাতায় পড়তে যাচ্ছে। ওর কলেজ খুলবে আর দিন পনেরো বাদে—ওকে বলে যাই, ওর সঙ্গে তোমরা যেয়ো।

ঘাড় নাড়িয়া শৈল বলিল,—তাই যাব।

স্ত্রীর অধরে চুম্বন করিয়া পূর্ণ বলিল,—এবার যেন আর নড়চড় হয় না—দেখো! লক্ষ্মীটি!

স্ত্রীর মনটা হু-হু করিয়া উঠিল। সে আর চোখের জল ঠেকাইতে পারিল না। তার কি অপরাধ গো! সে যে চায়, এখনি তোমার সঙ্গে যাইতে…কিন্তু পাড়ার ওঁরা… কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব গো যে, তোমার পাশটিতে গিয়া চিরদিনের আশ্রয় লইতে আমার প্রাণ কতখানি কাতর!

পূর্ণ চলিয়া গেল। শৈল দেশে পড়িয়া রহিল। সইয়ের বিবাহ কবে হইবে? এ কয়টা দিন কায়-মনে সে কেবলি ঠাকুরকে ডাকিয়াছে, হে ঠাকুর, আর বাধা দিয়ো না গো, আর বাধা সহিতে পারি না!

তারপর সইয়ের বিবাহ হইয়া গেল। এবার যাওয়া হইবে। বিপিন কবে যাইবে? আজ নয়, কাল—এমনি করিয়া আরো দুই-তিনটা দিন গেল। সে বৌ-মানুষ, মুখে কিছু বলিতেও পারে না—! বিপিনের মর্জ্জি! প্রাণ তার অধীরতায় ফাটিয়া গেলেও সে-যাতনা নীরবে সে সহিতে লাগিল। উপায় নাই রে, উপায় নাই! অবোলা নারী সে, নারী রে, তায় বৌ-মানুষ! বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ তার ফুটিবার নয়!

শেষে আজ…আঃ…সে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিল। আজ বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে! আর কি! কয় ঘণ্টা মাত্র,—ট্রেণ আসিলেই হয়!

২

বৃষ্টির বেগ একটু কমিয়াছে,—টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। বিপিন আসিয়া বলিল,—গাড়ী আসছে বৌদি। খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে, বুঝি?

শৈল বলিল,—হ্যাঁ, আমি ওকে নিচ্ছি। বৃষ্টিতে ভারী আতান্তর হতে হবে।

গাড়ী আসিল। একখানি থার্ড ক্লাশ মেয়েদের গাড়ীতে শৈলকে ও বাব্‌লাকে উঠাইয়া দিয়া বিপিন গিয়া পাশের থার্ড ক্লাশ গাড়ীতে বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পথের দুইধারে ধূ-ধূ মাঠ বৃষ্টির জলে জলময় হইয়া উঠিয়াছে। শৈলর মনে আনন্দের রাগিণী বাজিয়া উঠিল। আর কি! এই গাড়ীখানা গিয়া একবার কলিকাতায় থামিলে হয়—তার সব দুঃখ, মনের সব আঁধার ঘুচিয়া যাইবে, দুইটি চোখের সপ্রেম দৃষ্টির পরশে! এই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়াছে সে কত দিন! একটার পর আর-একটা বাধা আসিয়া এ-দিনটিকে কেবলি পিছাইয়া দিয়াছে—শেষে আর তার আশা করিতেও সাহস হয় নাই! আজ, মনের সাধ মিটিয়াছে!

এই বৃষ্টি! এই বৃষ্টিই যদি সকাল হইতে এমনি অঝোরে নামিয়া পড়িত, তাহা হইলে কি আর বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হওয়া যাইত! পাড়ার পাঁচজনে মানা করিত,—ছোট ছেলে সঙ্গে, এই বৃষ্টিতে কি বাহির হয়! বিপিন চলিয়া যাইত—তাকে যে যাইতেই হইবে! আর সে…?

শৈল শিহরিয়া উঠিল। ভাগ্যে, তখন বৃষ্টি নামে নাই! উচ্ছ্বসিত আনন্দে সে বাব্‌লাকে বুকে জড়াইয়া তার মুখে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল—বাব্‌লা, বাব্‌লা, আমাদের বাব্‌লা। কেন এত ঘুমোচ্ছ ধন! কোথায় যাচ্ছ, কার কাছে, বুঝছ না তুমি! ওঠো, জাগো, কথা কও, আমার সঙ্গে কথা কও…

বাব্‌লা ঘুম ভাঙ্গিয়া বিষম বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শৈল তাকে দোলা দিয়া ভুলাইতে লাগিল। চারিধারে বেশ ঠাণ্ডা—বাব্‌লা আরামে আবার ঘুমে ঢুলিয়া পড়িল। শৈল তাকে কোলে করিয়া বসিয়া জান্‌লা দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। এই বৃষ্টি-জলে ধোওয়া মুক্ত প্রান্তর, তার প্রাণে কেমন এক মুক্তির আভাষ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ঐ একটা-একটা ষ্টেশনে গাড়ী গিয়া থামিতেছে। ষ্টেশনের পিছনে একতলা ছোট ছোট বাড়ীগুলি—আর তাদের পিছনে কোথাও মুক্ত প্রান্তর, কোথাও জঙ্গল, কোথাও বা ছোট ডোবা। ঘরের জানলায় কোনো তরুণী চোখে কি এক দৃষ্টি লইয়া সকৌতুহলে গাড়ীর পানে চাহিয়া আছে, ষ্টেশনের লোকগুলার নির্ব্বাক নির্ব্বিকার ভাব, যাত্রীদলের ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি,—এ সমস্তই তার প্রাণে এক নিবিড় শুভ সূচনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল! তার মনে হইতেছিল, কতক্ষণে এ গাড়ী গিয়া যে কলিকাতায় থামিবে! স্বামী

নামাইয়া লইবে—মিলনের সুনিবিড় বাঁধনে দুজনে সর্ব্বক্ষণ বাধা থাকিবে! সুখের কি অফুরাণ রাগিণীই না প্রাণে বাজিবে, অহর্নিশি, সারাক্ষণ!.. কিন্তু গাড়ীটা বড় আস্তে যাইতেছে—রেলগাড়ীও এমন আস্তে যায়!···

রাণাঘাটে আসিয়া যখন গাড়ী থামিল, তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে,—রৌদ্র ফুটিয়াছে। তার কামরায় আরো দু-তিন জন রমণী আসিয়া উঠিল। তার মধ্যে একজন তার মতই বয়সে তরুণী, দুইজন বিধবা প্রৌঢ়া। একটি বাবু তাদের গাড়ীতে বসাইয়া চলিয়া গেল। গাড়ী আবার ছাড়িয়া দিল।

নবাগতা তরুণীটি তার পাশে আসিয়া বসিল। প্রৌঢ়া দুইজন পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি সামলাইয়া লইয়া নিজেদের কথায় বিভোর হইল।

নবাগতা আসিয়া শৈলকে জিজ্ঞাসা করিল—কতদূর যাবে তুমি ভাই?

শৈল বলিল,—কলকাতা।

নবাগতা বলিল,—আমরা নৈহাটী যাব। সেখান থেকে আর একটা রেলে চড়ে যাব ওপারে,—মগরায়।

তারপর দুইজনে পরিচয় হইল। নবাগতার নাম, গৌরী। এতদিন সে বাপের বাড়াতেই ছিল—স্বামীর চাকরি হইয়াছে মগরায়। তাই স্বামী আসিয়া তাহাকে মগরায় লইয়া চলিয়াছে। প্রৌঢ়া দুটি তার মা আর পিশি। স্বামীর ঘরে কেহ তো নাই! মা ও পিশিও একলা তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, কাজেই সঙ্গে চলিয়াছে, তার সব গুছাইয়া দিবার জন্য। যিনি তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন, তিনিই গৌরীর স্বামী।

শৈলর পরিচয় লইয়া গৌরী তার পানে একটু বেদনা-মাখা দৃষ্টিতে চাহিল; কহিল,—তোমার স্বামী তোমার সঙ্গে নেই?—স্বামীর সঙ্গে রেলে যেতে ভারী ভালো লাগে, ভাই। আমি আর একবার গেছলুম। কেমন পাঁচবার পাঁচটা ষ্টেশনে এসে দেখা দেন,—পাণ চাই? জল খাবে। খাবার নাও—এমনি নানা অছিলায় গাড়ীর কাছে আসেন—একটু একটু দেখা হয়, একটা-দুটো কথাও হয়, ভারী ভালো লাগে! তাছাড়া...

বলিয়া গৌরী জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল; ও একটু পরেই খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া মুখখান চকিতে সরাইয়া আনিল।

শৈল নির্ব্বাক পুতুলের মত তার পানে চাহিয়া তার ভাবভঙ্গী দেখিতে লাগিল। কোথা হইতে এক ঝলক বসন্তের হাওয়া যেন তার তপ্ত প্রাণের উপর আসিয়া পড়িয়াছে! প্রাণটাকে জুড়াইয়া দিয়াছে!

গৌরী হাসিতে হাসিতে বলিল,—কি দুষ্টু! বলিয়া আবার মুখ বাড়াইল, ও পরক্ষণে আবার হাসিয়া মুখ সরাইয়া লইল।

শৈল বলিল,—কি হয়েছে?

গৌরী বলিল,—স্বাখো না ভাই, ওখান থেকে কেবলি মুখ বাড়িয়ে দেখা হচ্ছে। যেমনি আমি মুখ বাড়াচ্ছি,—অমনি হাসা হচ্ছে, আর মুখভঙ্গী করা হচ্ছে। কেউ যদি দেখে ফেলে, ভাই? স্বাখো দিকিনি, লজ্জা করে না?

শৈল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল,—লুব্ধ চিত্তে গৌরীর ভাব-ভঙ্গী দেখিতে লাগিল। তার নিজের প্রাণের মধ্যে কি এক অজানা বেদনার ভার গুমরিয়া উঠিল। প্রাণটা হা-হা করিয়া উঠিল। হায়রে, বঞ্চিতা দুর্ভাগিনী নারী!

গৌরী বলিল,—ও কি কম দুষ্টু! ফি শনিবারে আমাদের বাড়ী আসবে! আর যাবার সময় নড়তে চায় না! আমি তো ভাই পালিয়ে যাচ্ছি না! মা-টা বলে, নতুন চাকরি—তাতে ঢিলে দিলে চলে কি! তা ভাই, শনিবার দুটো বাজলে অমনি ষ্টেশনে ছুটবে! আপিসের লোক কত ঠাট্টা করে, তা শোনে না! যত বলি, একটা শনিবার নয় এসো না, তাহলে কেউ আর ঠাট্টা করবে না। তা বলে, করুক ঠাট্টা! আমি তা বলে শনিবারে সেখানে থাকবো না, থাকতে পারব না।

গৌরী নিজের মনে বকিয়া চলিল। তাদের প্রেমলীলার শত-সহস্র চিত্র প্রাণের কোন্‌ গোপন কোণ হইতে সে বাহির করিয়া শৈলর সামনে মেলিয়া দিতে লাগিল। আর শৈলর মরুর মত শুষ্ক বুকে শত শত বিচিত্র ফুল ফুটিয়া উঠিল!

গাড়ী আসিয়া মদনপুরে থামিল। গৌরীর স্বামী

আসিয়া কামরার সামনে দেখা দিল। গৌরী ধড়মড়িয়া উঠিয়া প্রৌঢ়াদের কাছে সরিয়া গেল, ও এক-গলা ঘোমটা টানিয়া তাহারি ফাঁক দিয়া দুই ডাগর চোখের দৃষ্টি স্বামীর উপর নিক্ষেপ করিল। সে কি হাসি-ভরা, ছল-ভরা দৃষ্টি—শৈল চকিতে তাহা দেখিয়া লইল।

গৌরীর স্বামী জিজ্ঞাসা করিল,—তোমাদের কিছু চাই? এবং উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া একরাশ সাজা পাণ বেঞ্চের উপর ঢালিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে গৌরী পাণগুলা লইয়া বলিল,—দেখেছ ভাই দুষ্টুমি!—এত পাণ রয়েছে, তবু কিনা পাণ নিয়ে আসা! আবার বলা হচ্ছে, তোমাদের কি চাই? মা পিসিমা বিধবা মানুষ, রেলে কিছু খায় কি?...তোমাদের কি চাই? এ শুধু একটু ছল করে আমায় দেখতে আসা! আর কিছু না!...আমার এমনি লজ্জা করে! কত বলি, তা কিছুতে শুনবে না! এই তো যাচ্ছি সেখানে, তা দেখচি, আমায় আর আস্ত রাখবে না। পদে পদে এমন লজ্জায় ফেলবে যে আমার মাথা কাটা যাবে, মার সামনে পিশিমার সামনে!

শৈল বলিল,—তোমার ভালো লাগে না?

মৃদু হাসিয়া লজ্জাজড়িত স্বরে গৌরী বলিল,—তা ভাই লাগে, তবু লজ্জা করে যে বড্ড!

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে গৌরীকে লজ্জা এমনি পাইয়া বসিল যে সে আর মাথা তুলিতে পারিল না।

শৈল রুদ্ধ নিশ্বাসে তার পানে চাহিয়া রহিল—প্রেম-স্বর্গ-লোক-বাসিনী এই বালিকার সৌভাগ্যের কাহিনী তার প্রাণের নিরানন্দ বিরহের ভাবটাকে মুহূর্ত্তে উস্কাইয়া জাগাইয়া তুলিল। নৈরাশ্যের একটা তীব্র বুক-ভাঙা নিশ্বাস বুকের এক প্রান্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, পাছে তাহারই একটা হল্‌কা গিয়া গৌরীর সৌভাগ্যে আঘাত করে, এই চিন্তায় নিশ্বাসটাকে সবলে সে চাপিয়া রাখিল।

গৌরীর পানে এমনি উদাস মুগ্ধ দৃষ্টিতে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর গৌরী মুখ তুলিল; হাসিয়া বলিল,—কি দেখচ ভাই, আমার মুখের পানে চেয়ে?

শৈল তার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া কহিল,—ভারী সুন্দর মুখখানি ভাই, তাই দেখছি।

গৌরী সে কথায় একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—যাও, ওর মত তুমিও দুষ্টুমি সুরু করলে, বুঝি!

শৈল বলিল,—তোমার স্বামীও ঐ কথা বলে বুঝি?

গৌরী বলিল,—বলেই তো। দিন রাত মুখে খালি ঐ কথা।

শৈল বলিল,—তা সুন্দর মুখকে সুন্দর বলবে না?

গৌরী বলিল,—ছাই মুখ, ছাই—

বাব্‌লা হঠাৎ ইতিমধ্যে উঠিয়া পড়িল; উঠিয়া কান্না জুড়িয়া দিল।

গৌরী বলিল,—খোকাকে একটু দাও না আমায়। বলিয়া কোলে লইয়া আদরে আদরে চুমায় চুমায় বাব্‌লাকে একেবারে বিব্রত করিয়া তুলিল।

—একটু ধর তো ভাই, ওর দুধটা আমি করে নি। বলিয়া শৈল একটা ধামার মধ্য হইতে কতকগুলা কুচানো কাগজ বাহির করিয়া একটা কাঁশার বাটিতে দুধ ঢালিয়া কাগজ জ্বালিয়া দুধটুকু গরম করিয়া দিল। পরে দুধ গরম হইলে বাব্‌লাকে খাওয়াইতে যাইবে, এমন সময় গৌরী বায়না লইল, সে দুধ খাওয়াইয়া দিবে।

শৈল বলিল,—না ভাই, তোমার কাপড় খারাপ হয়ে যাবে দুধ পড়ে।

—ইস্, তাই তো! বলিয়া গৌরী ছাড়িল না। বাটীতে ঝিনুক বাজাইয়া, ছড়া গাহিয়া, ভুলাইয়া বাব্‌লাকে সে দুধ খাওয়াইয়া দিল। ওধারে প্রৌঢ়া দুইজন তখন গল্প করিতে করিতে কখন বেঞ্চে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

শৈল বলিল,—এই যে খোকা না হতেই খোকার মার কাজ সব শিখে ফেলেছ! এমনি একটী খোকা তোমার হোক ভাই শীগ্‌গির—

—যাওঃ, বলিয়া গৌরী লজ্জায় ঘাড় নামাইল।

নৈহাটীতে ট্রেণ থামিলে গৌরী চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে শৈলর গলা জড়াইয়া বলিল,—চিঠি লিখো ভাই। নাম তো বলেছি, ঐ নামে, আর গৌরীবালা দেবী, মগরা। তাহলেই পাব। চিঠি দিতে ভুলো না যেন। তোমার চিঠি পেলেই আমি জবাব দেব।

শৈল গৌরীর মুখে চুমা খাইয়া বলিল,—চিঠি দেব বৈ কি। তুমিও চিঠি লিখো। তোমার স্বামী লজ্জা দেয় কত, কি কি দুষ্টুমি করে—সব কথা আমায় খুলে লিখো। আমি তোমার দিদি, মনে রেখো ভাই! কেমন, দিদিকে ভুলবে না?

—না, না ভুলবো না, নিশ্চয় মনে রাখবো। বলিয়া গৌরী বাব্‌লাকে আদর করিয়া চুমা খাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া গেল।

গাড়ী আবার খালি হইয়া গেল।...গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শৈল ভাবিল, তার নিরানন্দ জীবনে এইমাত্র যে হাসির ঝাপ্‌টা, যে ফুলের গন্ধ জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে-সব যেন গৌরীর সঙ্গে সঙ্গেই উবিয়া মুছিয়া গেল! মনটা হায়-হায় করিতে লাগিল। সে ভাবিল, এই চকিতের দেখায় এ কি আনন্দই গৌরী দিয়া গেল!...বেশ মেয়েটি! যেন একটি ফুল! যেন হাসির একটা উচ্ছ্বাস! আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তি! আহা, ভগবান, ওর সুখের ঘরখানি এমনি হাসিতে চিরদিন ভরপুর রাখো! নৈরাশ্য যেন ওর সে ঘরখানির ধারও না কোনদিন মাড়াইতে পারে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিদেশী কবিতা

দুরাশা

আত্মীয় অভিন্ন-হৃদি—নহে অপমানে।
সুসঙ্গী বন্ধুরা তব—নহেক দুর্দ্দিনে॥
মানুষের কাছে বৃথা তার আশা ভাই।
'মানুষ' জীবের যাহা স্বভাবতঃ নাই॥

(হালি)

ভালবাসা

ভালবাসা—বৈদ্য সে কি অসুস্থ মনের?
কিবা সে আপনি শত দুখের আলয়?
জানিনা তা—এই মাত্র পাইয়াছি টের—
নিষ্কর্ম্মার খেলা ইহা কৌতুক-নিলয়।

(হালি)

বন্ধুতা

খেয়ালে আপন-হারা হয়েছে সেজন,
আপনার মত বন্ধু চাহে যেই জন।
ছোট-খাট কথা লয়ে কলহ করিয়া—
বন্ধুত্বের হর্ষ হতে আছে যে সরিয়া!

(হালি)

যৌবন ও মদিরা

হে যুবক! সুরাপান কভু করিয়োনা,
বিভুদত্ত বিবেকেরে প্রাণে মারিয়োনা,
সেই ত মত্ততা এক—যৌবন সময়!
আরো কি মত্ততা চাই?—আশ্চর্য্য, নিশ্চয়!

(হালি)

যুবক ভিক্ষুক

করিতে দেখিয়া ভিক্ষা—বলিষ্ঠ যুবকে,
আমি তারে বিধি-মতে দিলাম ত' বকে।
অবশেষে কহিল সে, "দোষভাগী তারা—
দিয়ে দিয়ে শিখায়েছে যারা ভিক্ষা করা।"

(হালি)

আত্মোপদেশ

মারো মত্ত হাতী মনে, মারা যদি যায়।
কামিনী-কাঞ্চন ছাড়—ছাড়া যদি যায়।
হরি-ভক্তে মিতা কর—পাওয়া যদি যায়।
ভজনে গলাও দেহ—গলে যদি তায়।

(বাজীদ)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাঙ্‌লা বায়োস্কোপ

ম্যাডান কোম্পানির তোলা বায়োস্কোপের ছবিকে ঠিক বাঙলা ফিল্‌ম্‌ বলা যায় না। তার অভিনেতা-অভিনেত্রী, ফটোগ্রাফার, এমন কি, অনেক স্থলে ডিরেক্টরও বাঙালী বটে,—তবু কি ছবি তোলা হইবে, তার নির্দ্দেশ সেখানে করেন পার্শী কর্ত্তৃপক্ষ। ইহাতে একটা অসুবিধা ঘটে, সাহিত্যের দিক দিয়া, রসের দিক দিয়া।

বায়োস্কোপে বাঙ্‌লা ছবি তুলিবার সময় ব্যবসা-হিসাবে নজর রাখিতে হইবে, বাঙালী দর্শক কি চায়, তাকে তৃপ্তি দেওয়া যায় কি ছবিতে। তাই বলিয়া আর্টকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করিলে চলিবে না। ধরুন, কোন কোম্পানি যদি হনুমান-চরিত ফিল্‌ম বাহির করে, কিম্বা লক্ষ্মণের শক্তিশেল, কি দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গ এবং তাহা বাঙলা দেশে দেখাইতে চান, তবে বাঙালী দর্শককে তাহার দ্বারা তৃপ্তি দেওয়ার আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইবে। অথচ সে ছবি যদি বেহারে দেখানো হয়, তো সে ছবি বোধ হয় সেখানকার ব্যাঙ্ক লুটিয়া আনিতে পারে। কাল্‌চারে বাঙালী ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের চেয়ে ঢের আগাইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে য়ুরোপ বা আমেরিকা তাহার চেয়ে বড়, এ কথাও সকলে চট্‌ করিয়া মানিতে চাহিবে না। এবং না মানায় যে মিথ্যা স্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইবে, তাও নয়!

অর্থাৎ চড়কে বা রথতলায় যে সোনার বানর কিনিতে পাওয়া যায়,—সেই যে সুতা ধরিয়া টানিলে সড়াৎ করিয়া পাকাঠির ডগায় গিয়া ওঠে, আর সুতায় ঢোল্‌ দিলে নামিয়া পড়ে—সে পুতুল দেখিয়া পল্লী-বালকের তাক্‌ লাগিতে পারে; কিন্তু সহুরে ছেলে—যারা বিলাতী কল-কব্জা-লাগানো হরেক রকম পুতুলে বিচিত্র কেরামতি দেখিয়াছে, তাহারা এ আদিম ও নিতান্ত সরল ছাঁচের পুতুল দেখিয়া তাচ্ছল্যের হাসি হাসে। তেমনি বায়োস্কোপে হনুমানের লম্ফ-ঝম্প দেখা বা তার দ্বারা গন্ধমাদন বহিয়া আনার দৃশ্য দেখিয়া বাঙালী দর্শক কোন রস পায় না! অথচ তাহা দেখিয়া বেহারীর তাক্‌ লাগিয়া যায়।

বায়োস্কোপের পার্শী কর্ত্তৃপক্ষ বাঙালীর মনের নাড়ীর কোনো সন্ধান জানেন না; ভালো বিলাতী ফিল্‌মের নকলে তাঁরা বাঙলা সামাজিক নাট্য ছবিতে তোলেন। হয়তো সে নাটক বাঙালার মনের খোরাক ঠিক জোগায় না, তাই পার্শী কর্ত্তৃপক্ষও এমনি দুই-একখানা নাটক খুলিয়া তার প্রতি দর্শকের তেমন আকর্ষণের বেগ নাই দেখিয়া মন-মরা হইয়া পড়েন এবং তাঁদের উৎসাহ কমিয়া আসে। তা ছাড়া এমনও হয়, বাঙলা সামাজিক নাটকে বা পৌরাণিক নাটকে সাজ-সজ্জায় পার্শী রুচি ঢুকাইতে গিয়া ছবিতে এমন দোষ আনিয়া ফেলেন যে বাঙালী দর্শক তা দেখিয়া বিরক্ত হয়! বাঙলা ছবির প্রধান লক্ষ্যই হইতেছে, বাঙালী দর্শককে তৃপ্ত করা। তারপর নয় বিলাতে পাঠাইয়া পয়সা উপার্জ্জন কর।

আঁধারে আলো—সত্যেন্দ্র ও রাধারাণী

এই সব অসুবিধা বুঝিয়া শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী-প্রমুখ বাঙলার কৃতবিদ্য শিল্পীরা গত বৎসর তাজমহল ফিল্‌ম্ কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেন। যে কয়জন শিল্পী এখানে কর্ত্তৃত্বের ভার লন্, তার মধ্যে শিশিরকুমার ও শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র মিত্রের রসজ্ঞতার পরিচয় বাঙলার অভিনয়-কলার যাঁরা কোন খপর রাখেন, তাঁরা সকলেই জানেন।

কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করিয়াই ইঁহারা অতি-দ্রুত ছবি তুলিতে লাগিয়া গেলেন—তখনো সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় হয় নাই! কিন্তু তরুণ প্রাণ, সে কি ধৈর্য্য মানে! এই কোম্পানির ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সান্যাল। ম্যাডান কোম্পানির চিত্র-শালায় তাঁর হাতে খড়ি হয়। এবং তাঁর তোলা ছবি 'মোহিনী' ও 'বরের বাজার' দেখিয়া লোকে তার আর যা-কিছু খুঁতের উল্লেখ করুক, ফটোগ্রাফির সুখ্যাতি সকলেই করিয়াছিলেন।

আঁধারে আলো--সত্যেন্দ্রর চিন্তা,—সেই মুখখানি!

তাজমহল কোম্পানি ষ্টুডিও তৈয়ার করাইলেন, দমদমা ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে বাগানে। এবং ষ্টুডিও খুলিবামাত্রই তড়ি-ঘড়ি ছবি তোলা সুরু হইয়া গেল। প্রথমেই বহি নির্ব্বাচিত হইল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "আঁধারে আলো।"

বহিখানি যে এ-দেশের পক্ষে খুব সুনির্ব্বাচিত হইয়াছিল, এ কথা সকলে স্বীকার করেন না। পতিতার প্রতি সহানুভূতি বা সমবেদনা সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ বাঙালী দর্শক পতিতাকে চোখের উপর দেখিয়া সহানুভূতির পাত্রী বলিয়া ভাবিতে চায় না! বইয়ের পাতায় পতিতার দুঃখের কাহিনী পড়িয়া যাদের চক্ষু সজল হইয়া আসে, তারাই আবার ষ্টেজে বা বায়োস্কোপের ছবির পর্দ্দায় তার বিশ্রী মূর্ত্তি ও ভীষণ পরিণাম দেখিতেই এমনি অভ্যস্ত যে চট্ করিয়া প্রাণের মধ্যে তার প্রতি সহানুভূতি জাগাইতে পারে না! অবশ্য তাই বলিয়াই যে এ সাধু প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকিব, বা পতিতার প্রতি যাহাতে সহানুভূতি জাগে, এমন ব্যাপারে হাত দিব না, এমন পণ কাহাকেও করিতে বলি না—বরং এমন পণ যদি কেহ করে, তাহা হইলে সাহিত্য-রসজ্ঞ বা আর্টিষ্ট তাহাকে তো কখনোই বলিতে পারিব না, বরং তাকে বলিব অর্ব্বাচীন!

কিন্তু, কথা তা লইয়া নয়। এ যে ব্যবসার কথা। সাধারণ দর্শককে ক্রমে ক্রমে শিখাইয়া তৈয়ার করিতে হইবে। অন্ধ সংস্কারে বদ্ধ তার মনের কপাট ধীরে ধীরে খুলিয়া দিতে হইবে। প্রাণ তার যাতে মুক্ত থাকে, বাহিরের আলো ও বাতাস গ্রহণ করিতে পারে, যাহা সুন্দর যাহা সৎ, যাহা প্রাণের উপর দাবী রাখে, এমন সমস্ত জিনিষ বুকে লইতে পারে, তাহা করিতে হইবে। তাই বাঙালীর ঘরে নিত্য যাহা ঘটে,—দরিদ্রের ঘর-কন্না, কেরাণীর দুঃখ, অন্নের ধান্দায় ঘোরা—এমনি কোনো সমস্যা লইয়া যদি সুনিপুণ শিল্পীর দ্বারা কোন নাটক বায়োস্কোপে অভিনয় করিয়া দেখানো হয়, তবে তাহা সমস্ত বাঙালীর প্রাণে সুগভীর সাড়া তুলিবে। সৌখীন বাঙালীর বিলাস-লীলা বা রোমান্সের ছবি বায়োস্কোপে কয়েকজন মাত্র বিচক্ষণ ও রসজ্ঞ সুধী দর্শকের চিত্ত বিনোদন করিবে, যদি তাহাতে আর্টের খেলা থাকে। কিন্তু a thing of beauty is

আঁধারে আলো—স্নানের ঘাটে বিজলী

আমরা এ কথাও তেমন মানিনা যে-জিনিষটাকে দেখাইতে হইবে, সেটা সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ হওয়া চাই। নহিলে পতিত সাজাইতে বসিয়া তার গায়ে যদি নামাবলী জড়াইয়া দিতো সে একটা উদ্ভট হাস্যকর ব্যাপার হইবে! সাধারণ দর্শক 'আঁধারে আলো' ছবি ঐ জন্যই তেমন করিয়া লইতে পারে নাই—নহিলে ঐ একখানি ছবিতেই কোম্পানি অনেক টাকা তুলিতে পারিতেন।

"আঁধারে আলোয়" সব-চেয়ে ভালো অভিনয় হইয়াছিল বিজলীর। এই ভূমিকা যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁর কৃতিত্ব দেখিয়া আমরা সত্যই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। বাঙালী মেয়ের পক্ষে এমন জীবন্ত অভিনয় করা, বিশেষ

a joy for ever—এ কথা সাধারণ দর্শক সম্বন্ধে মোটেই খাটে না। তাছাড়া ঐ বিলাসী সমাজের ধাঁচ-ধোচ বিলাতী সমাজের সহিত এতটা মিল খায় যে ঐ সমাজের ছবিকে বিলাতীর নকল বলিয়াই দর্শক অনেক সময় ভাবে এবং ছবিও কাজেই মার খায়!

যাহা হোক, হয়তো হাতে তৈরী বই ছিল, "আঁধারে আলো," তাই ইহা লইয়াই কোম্পানি আসরে নামিলেন। "আঁধারে আলোয়" action এর অভাব, ভাবুকতা বেশী—তবু scenario লেখায় বহু দৃশ্য সেই actionএর খাতিরে সংযোজিত হইয়াছে। তবে তার মধ্যে সব-চেয়ে খুলিয়াছে মদের মজলিস! তার উপর একটা পতিতার পিছনে ধাওয়া করা—ছবিতে এ ব্যাপার রাখিয়া ঢাকিয়া দেখানো চলে না। গল্পে অল্প suggestion-এ মৃদু ইঙ্গিতে অনেকখানিরই আভাষ জাগাইয়া তোলা যায়। এই ছবিখানিতেও যদি তাহা করা হইত, তবে বোধ হয় পারিপাট্য বাড়িত! ছবিতে ঐ মজলিস যে ভাবে দেখানো হইয়াছে, গা তাহাতে শিরশির করিয়া ওঠে—এ কথা অনেকেই বলিয়াছিলেন।

আঁধারে আলো—বিজলীর বুকে বিজলীর পরশ

ছবির পর্দ্দায়—যে দিকে তার শিক্ষা হাতেখড়ির সামিল—কম শক্তির পরিচয় নয়! সত্যেন্দ্র বকিয়া চলিয়া যাওয়ার পর বিজলীর ভাব-ভঙ্গী, প্রণয়ী-অঘোরকে তাড়াইয়া দেওয়া, তারপর ভাবনার মাঝে নিজেকে ডুবাইয়া ধরা—দুই চোখে জলের ধারা নামিয়াছে—সে অভিনয় অপূর্ব্ব! বাঙলার কোন ফিল্ম অভিনেত্রী এমন অভিনয় এ-পর্য্যন্ত দেখাইতে পারেন নাই।

সত্যেন্দ্রর ভূমিকায় আমরা তেমন তৃপ্ত হইতে পারি নাই।

আঁধারে আলো—বিজলীর চিত্র

বিজলীর পর অভিনয় খুলিয়াছে তার মাতাল প্রণয়ী অঘোরকালীর। অনেক টাকা মাসহারা দিয়া বিজলীকে সে রাখিয়াছে। সত্যেন্দ্রর প্রেমে বিজলী যখন টলিল, তখন প্রণয়ীর পয়সা, বা তার রোষ-কষায়িত দৃষ্টি বা ভয় দেখানোকে সে গ্রাহ্যও করিল না। যে দৃশ্যে অঘোর মুগ্ধ তন্ময় দৃষ্টিতে অথচ একধারে বসিয়া বিজলীর নাচ দেখিতেছে—খুবই ছোটখাট দৃশ্য—কিন্তু এই একটি দৃশ্যেই এই প্রণয়ীর ভূমিকায় নরেশচন্দ্র অভিনয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।
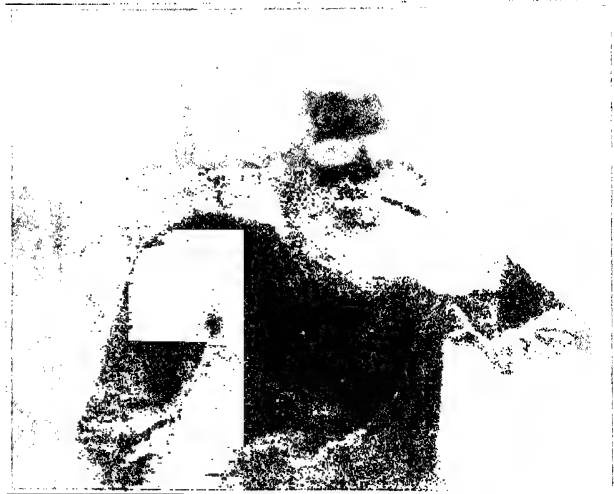
তাছাড়া setting সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। বিজলীর ঘরখানি বেশ সজ্জিত; কিন্তু যে-বাড়ীর ঘর অমন সজ্জিত তার সামনের

তার একটা কারণ, রঙের গাঢ় প্রলেপে সুদক্ষ শিল্পী শিশিরকুমারের মুখ এমনি আচ্ছন্ন হইয়া ছিল যে ভ্রূর সঙ্কুচন-প্রসারণ; বিরক্তি, হর্ষ প্রভৃতি ভাব ফুটিতে গিয়া সে রঙের নীচে চাপা পড়িয়াছিল। তবে দুই-চারিটি দৃশ্য প্রাণে এমন রেখাপাত করিয়াছে যে তা ভুলিবার নয়!—যে দৃশ্যে সত্যেন্দ্র স্ত্রীকে পাশে বসাইয়া বহি পড়িয়া শুনাইতেছে—যে দৃশ্যে সে মার চিঠি পাইয়াছে দেশে যাইবার জন্য,—যে দৃশ্যে বিজলীর গৃহে গিয়া বিজলীর স্ব-রূপ দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছে, তারপর যে দৃশ্যে বিজলীকে বাড়ীতে গাহিতে আনিয়া অপমানের সম্ভ শোধ লইয়াছে ভাবিয়া সুখী হইয়াছে—এমনি আরো ছোটখাট দৃশ্যগুলি।

আঁধারে আলো—মুগ্ধ অঘোর

সদর ওরূপ জীর্ণ-শ্রী দেখানো—ইহাতে মস্ত-বড় ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

যাহা হৌক, এত দ্রুত এবং সমস্ত সরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও 'আঁধারে আলো' ছবি-হিসাবে যাহা হইয়াছে, তাহা আশা-প্রদ তবে নিখুঁৎ নয়—এবং সাজসজ্জায় দৃশ্যে বেশ বৈচিত্র্য আনিয়াছিল এবং ভবিষ্যতে যে এ কোম্পানির কাছে আরো ভালো ছবি পাইব, এমনও আশা হইয়াছিল।

সে আশা অনেকটা পূর্ণ হইল, যখন কোম্পানি মানভঞ্জন ছবি দেখাইলেন। 'মানভঞ্জনে' নাট্যাধ্যক্ষতা করেন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র।

উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়া' বেড়ায়—'যেন মনের ভিতর-কার কোন এক অশ্রুত অব্যক্ত সঙ্গীতের তালে তালে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নৃত্য করিতে চাহিতেছে।' তার 'বসনে ভূষণে গমনে; তার বাহুর বিক্ষেপে,তার গ্রীবার ভঙ্গীতে, তার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুর-নিক্কণে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্র ভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উজ্জ্বলভাবে উচ্ছলিত হইয়া ওঠে' নেশা—'মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া যায়, নব-যৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য্য তার সর্ব্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে। ছাদে প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া দেখিয়া সে ঐ বৃহৎ জগৎখানাকে

মানভঞ্জন—গিরিবালার চিন্তা

'মানভঞ্জন' রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ ছোট গল্প 'মানভঞ্জনের' নাট্য-চিত্র-সংস্করণ নয়। রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জনে' নায়িকা গিরিবালা সুন্দরী তরুণী—রূপের হিল্লোল তুলিয়া সে বেড়ায়, নিজেকে শত সাজে সাজাইয়া আয়নার সামনে ধরে, আর আপনার 'সর্ব্বাঙ্গের উচ্ছলিত মদির রসে তার নেশা' লাগিয়া যায়। কখনো 'একখানি কোমল রঙীন বস্ত্রে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া সে ছাতের

কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে চায়।" বেচারী এই জগজ্জয়ী রূপ লইয়া স্বামী গোপীনাথ শীলকে বশ করিতে পারে নাই। স্বামী তার পানে ফিরিয়াও চায় না। সে বিভোর হইয়া আছে থিয়েটারের নটী লইয়া। গিরির দাসী সুধো সুরসিকা—তার কাছে গিরিবালা নায়িকা সাজে, ও তাকে নায়ক সাজাইয়া প্রেমের খেলা খেলে। দাসীকে লইয়া সে একদিন থিয়েটারে 'মানভঞ্জন' দেখিতে গেল। সেখানে তার তরুণ

দেহের রক্তলহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সে সকল সংসার ভুলিয়া গেল, মনে করিল—'এমন এক জায়গায় আসিয়াছে, যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্বাধীনতায় কোন বাধামাত্র নাই।' তারপর প্রতি সপ্তাহে থিয়েটার দেখিয়া দেখিয়া তার এমন নেশা লাগিল যে উপেক্ষিতা রূপোন্মাদিনী তরুণী ভাবিল, বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্য্যরাজ্ঞীর পক্ষে এ এক মায়া-সিংহাসন। রাধার বিরহ-ভাবে সে তন্ময় হইয়া গেল। থিয়েটার তাকে ডাকিতে লাগিল। তখন সে একদিন পলাইয়া গিয়া থিয়েটারে ঢুকিল। মোটামুটি ইহাই হইল রবীন্দ্রনাথের গল্পের theme.

তাজমহলের মানভঞ্জন-চিত্রে নায়ক গোপীনাথ গল্পের সঙ্গে ঠিক আছে।

মানভঞ্জন—সরকার মহাশয়ের বিরক্তি

মানভঞ্জন—গোপীনাথ ও থিয়েটারের ম্যানেজার

মানভঞ্জন—গোপীনাথ ও মধুমক্ষিকা

থিয়েটারের নটীর প্রেমে দুই গোপীনাথই মশগুল; তবে চিত্র-নাট্যের গিরিবালা শান্ত বধূ; স্বামীর প্রেম হারাইয়া সে ভাবিল না জানি, ষ্টেজের নায়িকায় কি মাদকতা আছে! অভিনয়ের ভঙ্গীতেই স্বামীকে বুঝি সেও বশ করিতে পারিবে! ইহা ভাবিয়া সে ঘর ছাড়িয়া থিয়েটারে গিয়া ঢুকিল। সেখানে গোপীনাথ তাহাকে চিনিয়া গোলমাল করে, আহত হয় ও বাড়ী আসিয়া শয্যা গ্রহণ করে। গিরিবালা ফিরিয়া আসিয়া তার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হয়—অনুতপ্ত স্বামী ক্ষমা চায়।

চিত্রনাট্যের গিরিবালার ষ্টেজে নামা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে সেটা বিচার-সাপেক্ষ, তবে তার বিচার এখানে করিব না। চিত্রনাট্যের অভিনয় কেমন হইয়াছে, ছবি কেমন খুলিয়াছে, সেই সম্বন্ধেই দুই-চারিটা কথা মাত্র বলিব।

'মানভঞ্জনে' সব চেয়ে ভালো অভিনয় হইয়াছে—প্রেমিকানন্দর। সে থিয়েটারের অভিনেত্রী লবঙ্গলতার প্রণয়ী। সে-ই গোপীনাথের কাছে লবঙ্গকে জুটাইয়া দেয়, অর্থ-প্রত্যাশায়। তারপর একদিন দুইজনকে এক সঙ্গে দেখিয়া গোপীনাথ নটীকে পরিত্যাগ করে।

গোপীনাথের অভিনয়ও খুব চমৎকার, প্রায় নিখুঁত। তরুণ গোপীনাথের বায়োস্কোপ দেখিতে যাওয়া,—নবোঢ়া বধূর সঙ্গে প্রেম-লীলা; তারপর ইয়ারের দলে মিশিয়া অধঃপাতের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া—এ সব খুব চমৎকার হইয়াছে। তারপর থিয়েটারে বিহ্বলতা, ম্যানেজারের সঙ্গে কলহ, প্রেমিকানান্দর প্রতি ঘৃণার অসহ্য আঘাত গিরিবালাকে ষ্টেজে দেখিয়া তার চাঞ্চল্য, শেষে ইয়ারদের খেদাইয়া দেওয়া ও আহত অবস্থায় গিরিকে দেখিয়া তার চমক ও অনুতাপ—এ সব নিখুঁত! গোপীনাথের ভূমিকায় নরেশচন্দ্রর অভিনয় প্রথম শ্রেণীর।

ষ্টেজে 'মানভঞ্জন' গীতি-নাট্যের অভিনয়—এটুকু ষ্টেজের সত্য অভিনয় হইতে ছবি তোলা—এটুকু খুব বাহাদুরীর কাজ। ষ্টেজে আলো জ্বালিয়া ছবি তুলিতে হইয়াছে। এই আলোর তেজ রক্ষা করা সহজ ব্যাপার নয়। আর ষ্টেজের অভিনয়টুকুও আলো-আঁধারের মধ্য দিয়া ভারী সুন্দর খুলিয়াছে—খুব আর্টিষ্টিক হইয়াছে। ইহাতে ফটোগ্রাফারের কৃতিত্বের বেশ পরিচয় পাই।
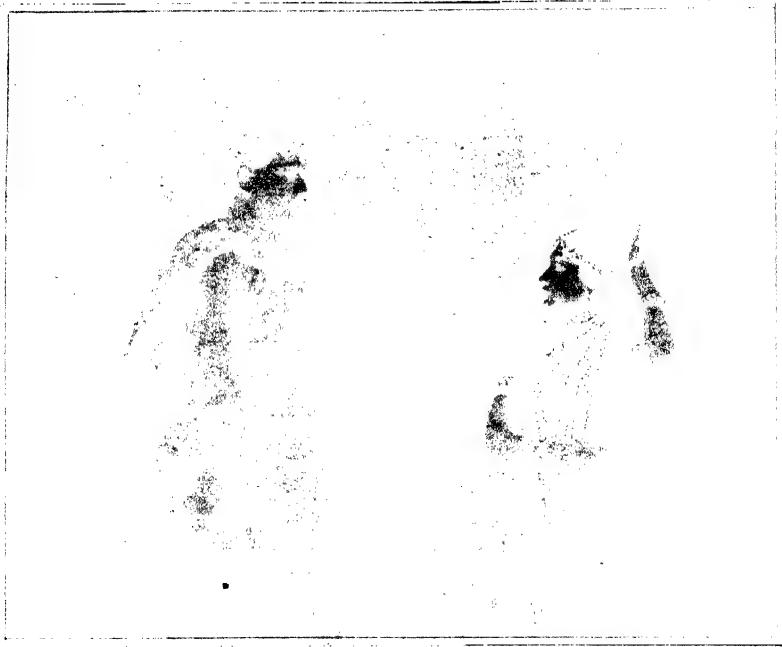
মানভঞ্জন—থিয়েটারে গিরিবালা

তারপর 'মানভঞ্জনে'র settIng, আঁধারে আলোর চেয়ে তাহা নিখুঁৎ হইয়াছে। ফটোগ্রাফারও খুব কলা-কৌশল দেখাইয়াছেন, মাঝে 'সোনার তরীর' অবতারণা করিয়া। অর্থাৎ ষ্টেজের উপর এ পর্য্যন্ত বায়োস্কোপে যে কয়টি বাঙলা ছবি দেখিয়াছি, 'মানভঞ্জন' সব-চেয়ে সেরা হইয়াছে।

যাঁরা এ চিত্র-নাট্যে রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' দেখিবেন আশা করিয়াছেন, তাঁরা একটু অন্যায় করিয়াছেন। কেন না, তাজমহল কোম্পানি বলিয়া দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের মান-ভঞ্জন অবলম্বনে ছবি। রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' ছবিতে তোলা হইয়াছে, এ কথা তাঁরা বলেন নাই।

গিরিবালার ভূমিকা যোগ্যতর হস্তে দেওয়া উচিত ছিল। গিরিবালা মানায় নাই—তার মুখে-চোখে হাব-ভাবের খেলার ও প্রাণ-বস্তুটিরই অভাব রহিয়া গিয়াছে। A flat face—সর্ব্বত্র একই ভঙ্গী! এ অভিনেত্রীটির পির্দ্দায় অভিনয় ফোটে নাই, ফুটিবে কি না, সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। নটী লবঙ্গলতাও জবু-থবু,—তারো যেন প্রাণ নাই! নেহাৎ নির্জীব! ইয়ারদল ভালো, তবে মাতলামির অতখানি ঘটার কোন প্রয়োজন ছিল না। ওটা অল্প-একটু suggestion এর উপর দিয়া গেলে বোধ হয় ভালো হইত। মাতলামোর বাড়া-বাড়িতে দর্শকের গা শির্‌শির্ করিয়া ওঠে। বুড়া সরকার মশায় কপির ক্ষেত্রেই যা খুলিয়াছিলেন—তা ছাড়া তাঁর অভিনয়ও আমাদের চোখে কৃত্রিম নির্জীব ঠেকিয়াছে।

যাহা হোক, বাংলা বায়োস্কোপ সবে এই দু দিনের শিশু—তার দোষ-ত্রুটির জন্য এখন চোখ রাঙানো বা হুঙ্কার ধমক দেওয়া একটু নিষ্ঠুর হইবে—এ কথা আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি। ভালো কথায় তার সে ত্রুটি শুধরাইতে হইবে। নচেৎ ধমকানিতে বেচারী ভড়কাইয়া দমিয়া যাইতে পারে। এ মাসের চয়নে কনক মুখোপাধ্যায়ের Photo-play হইতে অনুদিত বায়োস্কোপের নাটক লেখা সন্দর্ভটি সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি।

তবে আরো একটা কথা আমাদের মনে হয়—নাট্যে

মানভঞ্জন—রোগশয্যায় গোপীনাথ ও গিরিবালা

গল্প-নির্ব্বাচনে বাঙলা বায়োস্কোপ একটু সতর্ক হউন। ভালো theme লউন্। বাঙলার দারিদ্র্যের ছবি তুলুন। ধনীর বিলাস-লীলার অভিনয় সাধারণের চিত্তে সহজে রেখাপাত করিবে বলিয়া মনে হয় না। বাঙলার সুখ-দুঃখ, সাধারণ বাঙালীর হর্ষ-বেদনা চট্ করিয়া দর্শককেও অভিভূত করিবে। তারপর বড় বড় সমস্যা তাদের সামনে ধরিলে দর্শক তখন আগ্রহে তাহা দেখিতে আসিবে এবং তাহাতে নিজের চিন্তা মিশাইতে শিখিবে।

তাজমহল কোম্পানিকে আমাদের অনুরোধ, অবান্তর কতকগুলা দৃশ্য যোজনা করিয়া নাটকের আসল বস্তুটিকে যেন কোথাও চাপা না দিয়া ফেলেন। হাতে কাঁচি লইয়া নির্দ্দয়ভাবে ছবির গায়ে চালান, খুব কাট্-ছাঁট করুন—ছবি আকারে ছোট হয় হোক তবে সেটি solid হওয়া চাই—dramatic action-এ আগাগোড়া সেটিকে লীলায়িত করা চাই। Actionএর মানে, হাত-পা নাড়া বা ছুটাছুটি করা নয়; প্রকৃত নাটকীয় action যাকে বলে তাই চাই। আর বাক্-হীন অভিনয় চোখ-মুখের ভঙ্গীতে জোরালো ভাবে প্রকাশ করুন্।

এই কোম্পানিতে কলাকুশল কৃতবিদ্য শিল্পী আছেন—setting ও সাজ-সজ্জায় তাঁরা নিখুঁত না হইলে সেটা লজ্জার বিষয় হইবে। ঐ যে ব্লাউস ও বারাণসী সাড়ী পরিয়া গিরিবালা রাত্রে বিছানায় শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে—এমন উদ্ভট দৃশ্য যেন তাঁদের তোলা ছবিতে না দেখিতে হয়! বাঙালীর মেয়ে গায়ে ব্লাউজ আঁটিয়া বারাণসী পরিয়া ঘুমাইতে যান্ না—তা সে যত বড় ধনীর ঘরণীই তিনি হৌন্!

শিবসুন্দর।

বিশ্ব-পিয়ালার ধারা

মাতাল, মাতাল !
ওরে ঢাল্,
সজনীর-অধর-মাখানো,
শীতকালে-কোকিল-ডাকানো
জীবনের ধারা !
প্রাণপণে পান ক'রে আমি হই সারা,
ভেসে যাক্—তৃষাতে তাতল মোর বুকের চাতাল—
আমি রে মাতাল !
একি তাপ, একি জ্বালা !
মায়া-ফুলে ঢাকা ওগো কণ্টকের মালা
কণ্ঠেতে পরিয়া,
ইহলোকে কত নর আছে হাহা জীবন্তে মরিয়া !
ছলনা-ডাকিনী
মোহিনীর রূপ ধরি গায় সদা মোহিনী-রাগিণী !
মুরলী-গুঞ্জনে-ভোলা
মৃগ-মত, ছন্দে দোলে অন্তরেতে আনন্দ-হিন্দোলা ;
অন্ধ হয়ে ছুটে আসে,—অন্ধকারে বদ্ধ হয় শৃঙ্খলের ফাঁদে,—
কোথা যায় আকাশ-বাতাস—
অসীমের অবাধ উল্লাস !
কারাগারে হাহাকারে প্রাণ খালি কাঁদে, কাঁদে, কাঁদে !
(মানবের ভয়ার্ত্ত ক্রন্দন,
স্রষ্টা সেও করে না শ্রবণ !)
নিজে কাঁদে, নিজে শোনে ;—পিঞ্জরের দ্বার,
চূর্ণ করে পঞ্জর তাহার !
যন্ত্রণার ষড়যন্ত্রে পুনর্ব্বার
শৃঙ্খলের ঝঞ্ঝনার ধ্বনিঝঞ্ঝা কি প্রচণ্ড করে তিরস্কার !

* * *

বিশ্বে তুমি আছ কি ঈশ্বর ?
থাকো যদি, নহ গো নিঃস্ব'র !
ধনী-জনে শিষ্য কর, তব বরে পায় তারা সুখ,
তাই তারা তব নামে সতত উৎসুক,
তাই তারা তোমাকেই মানে
ধ্যানে, জ্ঞানে, প্রাণে।
ফোটে ফুল,
বসন্তের অন্তঃপুরে গন্ধভারে করে ঢুল্ ঢুল্,—
দরিদ্রের হৃদয়-শোণিত,
গোলাপের সারা দেহ করেছে লোহিত !
কাঙালের অশ্রুনীর,
প্রমত্ত নীরধি-গর্ভে বিক্ষোভেতে হয়েছে অস্থির !
বজ্র ছাড়ে উন্মত্ত ফুৎকার,
বুভুক্ষু ভিক্ষুর প্রাণে যত দুঃখ রহি রহি করিছে উদ্গার !
হিমালয়,
দীনের হৃদয় ও যে হয়ে জড় শিলাময়
নিবেদিছে অনন্তের প্রতি,
বিক্ষুব্ধ চিত্তের যত নিস্তব্ধ মিনতি !

* * *

রে হৃদয় !
কেন কাঁপো—কেন কর ভয় ?
দাহ থেকে চাহ যদি ত্রাণ,
সুরা-পাত্রে কর মুক্তি-স্নান !
এ-জগৎ ভুলে যাও,
নিরালাতে ব'সে ব'সে পিয়ালার রাঙা গান গাও আর গাও !
এ পিয়ালা গড়া কিসে নেই তার ঠিক—
মৃত্তি দিয়ে, কাব্য দিয়ে, সঙ্গীত কি রক্তাধরে—কিম্বা এ স্ফটিক !
ভ'রে মোর চিত্ত-হ্রদ,
শব্দে-গন্ধে-স্পর্শে ওহো ! টলমল্ করে খালি মদ আর মদ !
দ্রাক্ষারসে নাই শুধু সুরা—
ওস্তাদের সুপটু আঙ্গুলে সুরে সুরে ঢালে সুরা ওই তানপুরা !

সুরা-ভরা পূর্ণিমার রূপ,
সুরা-ভরা প্রেয়সীর চুম্বন-প্রয়াসী কেঁপে-ওঠা মধু কণ্ঠকূপ।
মর্ম্মবধূ হয়েছে অধীরা,
রবীন্দ্রের কাব্য-পেহে পান ক'রে সুখে-দুখে কবিত্ব-মদিরা।
চারিভিতে—
বিহঙ্গের গীতে,
বনের সবুজে, ছোট তৃণফুলে, গিরি-দরী, নিঝরে, সরিতে—
আছে সুরা সুরসিকে মাতাল করিতে।
গেলে উপবনে,
মনে মনে
গন্ধময়ী সুরা ঝ'রে অগোচরে মত্ত ক'রে দেয় বিশ্বজনে।
পত্রবীণে কি মর্ম্মর ওঠে শোনো বেজে—
শব্দময়ী সীধু সে যে!
স্পর্শময় মন্ত্র-ধারা সদ্য করি পান,
দেখি যবে, একখানি তনুলতা বুকে মোর নীরবে শয়ান।
পিয়ালা ভর্ দে মুঝে! হয়ে থাকি আমি মাতোয়ালা!
মোর পেশা—
নেশা ভাই! নেশা, খালি নেশা!
ভুলে গেছি বিল্‌কুল্ ধরণীতে আছে কত শোক,তাপ, জ্বালা!
মরণ সে ডাক্ দেয় কাণে কাণে ঘন ঘন ঘন—
ভয় তবু পাইনা কখনো!
বোতলের মদে নয়—রূপ-মদে আমি নব ওমর খৈয়াম,
মরণে জীবন দেখি আমি তাই, ভালো লাগে তাই ধরাধাম!

* * *

জাগো রে মরণ-ভীত!
দুঃস্বপ্নের কোলে শুয়ে কে তোরা নিদ্রিত?
এস গো গরিব!
জ্বালো ফের প্রাণের প্রদীপ।
সন্ধ্যা হোলো! মিছে ডাকো "কোথা তুমি ভগবান!"—
কোথা ভগবান?
মরণের মহাসাগরের তীরে
ফিরে—ফিরে—ফিরে
প্রতিধ্বনি চমকিয়া জাগে ঘন-ঘোরে—উথলায় শূন্যতার বান!
আভিজাত্য-জাঁকে স্তব্ধ জগতের চির-অধীশ্বর—
শোনেনা সে কাঙালের স্বর!

আমিও গরিব বটে,
তবু মোর হৃদি-তটে
নিশিদিন সুলীলায়ে বহে কেন আনন্দের ঢেউ,
সে খবর রাখো কি গো কেউ?
অহরহ করি মাত্‌লামি—
তাই সুখী আমি।
ঈশ্বরের নহি মোসাহেব। দেয় নাই ইষ্টমন্ত্র সাধনের গুরু,
নরকের ভয়ে হৃদি করেনাকো তবু দুরু-দুরু!
দামাল ছেলের মত,হেসে-খেলে নেচে-গেয়ে যায় মোর কাল—
আমি যে মাতাল!
জাগরণে, স্বপনে, শয়নে,
মত্ততা যে মাখা দু-নয়নে!
আসে যদি অমা?
রূপের চাঁদিনী মেখে বুকে মোর আছে প্রিয়তমা।
হাতে আছে প্রাণের সরক—
চুমুকে চুমুকে তাই, করি সুখে আনন্দ পরখ।
এ সরক গড়া কিসে নেই তার ঠিক,
মৃত্তি দিয়ে, কাব্য দিয়ে,সঙ্গীত কি রক্তাধরে,—কিম্বা এ স্ফটিক!

* * *

শিরে তুলি
অলক্ষ্মীর পদধূলি,
অসম কাঁদুনী-ছন্দে ক্রমাগত কেটে যায় জীবনের তাল!
ওরে—ওরে কে হবি মাতাল?
আয়, আয়! শুষ্ক হয় জীবনের নদ,
ঢাল্ ঢাল্, ওরে ঢাল্ এইবেলা ঢাল্ তাতে পিরিতির মদ!—
দুঃখ-শোকে চুবাইয়া কর্ ত্বরা বধ!
শোন—শোন্ ডাকে ইহকাল!
ধরণীর প্রাণরস-দুইহাতে লুটে,
আয়—আয় ছুটে
বিশ্বের যৌবন-কুঞ্জে, ছেড়ে তোর তমিস্র পাতাল—
যে হবি মাতাল!
হেথা আছে প্রিয়া,
ঢুলুঢুলু দুটি চোখে সুরতের লাল নেশা নিয়া।
হেথা আছে সুর,
কত-ফুলরেণু-মাখা দখিনার মাদকতা দিয়ে পরিপূর।

হেথা আছে আলো,
তপনের সোমরস গলা ভ'রে যত পারো ঢালো আর ঢালো!
পাত্রে যদি থাকে রে আসব,
ধরা-স্বর্গে আমি যে বাসব!
মাতাল! মাতাল! আমি-তুমি সবাই মাতাল—
পিয়ালা ভর্ দে মুখে—হো হো, মোরা মদের মরাল—
দুঃখ-শোকে ভাবিনা করাল!—
দে রে—দে রে—একেবারে মাতাল ক'রে দে—
রূপ দিয়ে, সুর দিয়ে পিয়ালা ভ'রে দে—
—পিয়ালা ভ'রে দে!
এ পিয়ালা গড়া কিসে নেই তার ঠিক,
মূর্ত্তি দিয়ে, কাব্য দিয়ে, সঙ্গীত কি রক্তাধরে—কিম্বা এ স্ফটিক!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সভাপতির অভিভাষণ

[এবারকার নৈহাটীর চতুর্দ্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে প্রধান সভাপতি হইয়াছিলেন বর্দ্ধমানাধিপতি। সাহিত্য-শাখায় সভাপতি হইয়াছিলেন, নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু; দর্শন-শাখায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন; বিজ্ঞান-শাখায় শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়; এবং ইতিহাস-শাখায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা]

সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ—

বাঙ্‌লা সাহিত্য

বঙ্গ সাহিত্যে এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন সাহিত্য—মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বাংলার ভাণ্ডারে এখন যে সকল পুস্তক মজুত আছে, তাহার ভুলভ্রান্তি দোষত্রুটি বাদ দিলেও শুদ্ধ সমালোচকের সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া অবশিষ্ট ও পরিষ্কৃত যাহা থাকে তাহাকেও আমরা একটা সাহিত্য বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি। ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে বিদ্বজ্জনেরা যে তাঁহাদের মাতৃ-ভাষাকে কি উদ্দীপন শক্তিতে, কি পদলালিত্যে, কি অর্থবোধে, কি শ্রুতি-মাধুর্য্যে, কি ভাব-সম্ভারে, কি অলঙ্কারের সুষমায় অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছেন, একথা বলিলে অপর প্রদেশ-বাসিগণের ক্ষুণ্ণ হইবার কোনও কারণ নাই। **আমার বিশ্বাস, এই বঙ্গভাষাই অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতে শিষ্ট ভাষা হইবে; ইতিমধ্যেই অনেক বাংলা পুস্তক হিন্দী মারাঠা, গুজরাটী, তেলেগু, তামিল, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালায় সাহিত্য আছে, সাহিত্যিকও আছেন, নাই কেবল সাহিত্যিকে-সাহিত্যিকে সাহিত্য; পরস্পরের মধ্যে সেই সাহিত্যের অভাব এতদিন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে যে, সাহিত্য শব্দের মিলনার্থ আমাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে; সেইজন্যই আজ এই সাহিত্য-সম্মিলনে সুধীজনকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইয়াছে।**

যাঁহার কুঞ্জদ্বারের পরিক্রম সীমা মধ্যে আজ এই সারস্বত-উৎসব সম্পাদিত হইতেছে, সেই বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বঙ্গের সাহিত্য-সমাজে সমাজপতিপদে সার্ব্বলৌকিক মতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; এই পদে আরোহণ করা বঙ্কিম বাবুর পক্ষে অসাধারণ গৌরবের বিষয়। কারণ তিনি যখন প্রথম গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন প্রাচীন পণ্ডিত-মণ্ডলীর অনেকের নিকট তিনি নিজেও পাংক্তেয় বলিয়া গৃহীত হন নাই।

মধুসূদনও পরলোক-গমনের পূর্ব্বে দু-একটা চড়ুই ভাতি বা প্রীতিভোজে নিমন্ত্রিত হইতেন মাত্র, বিবাহের বৌভাতে বা আদ্যশ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের পংক্তিভোজনে পাতা পাতিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। বৈদেশিক সমাজ হইতে প্রাপ্ত কৌলীন্যের পুষ্পমালা কণ্ঠে দোলাইয়াও রবিবাবু সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এখনও সাহিত্য-সমাজপতি নহেন। এই জনতন্ত্রযুগে

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্ মহাতাব্ বাহাদুর

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
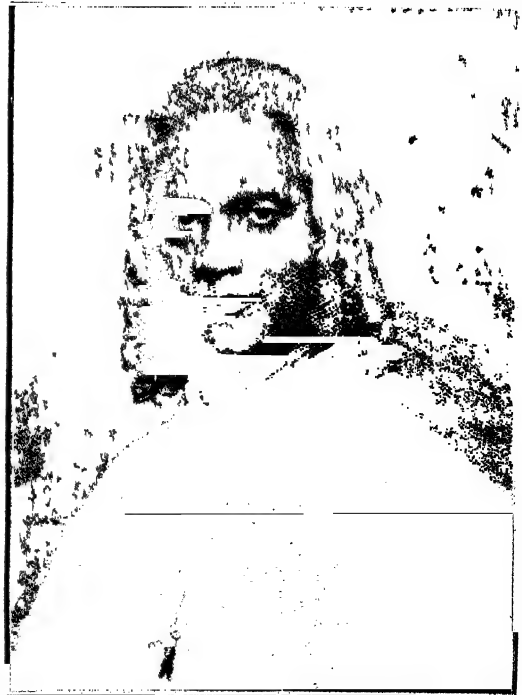
স্বরাজের এই আখড়াই-বাজনার দিন এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান—কেহ বা সাহিত্য-সুলতান, কেহ বা কাব্য-কৈসর, কেহবা বিজ্ঞান-বাহাদুর, কেহ বা কবি-বিরূপাক্ষ, কেহ বা নাট্য-নেপোলিয়ান।

ইংরাজদের আর কিছু থাক্ না থাক্ বহুদিনের অভ্যাস-যোগে একটা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার প্রণালী, গঠন করিবার শক্তিটা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থকার সমিতি আছে; পাঠক সমিতিও আছে, অভিনেতৃ-সমিতি আছে, অভিনয়-দর্শক-সমিতিও আছে; তাঁহাদের "আমি" শব্দটা বৃহদক্ষরে লিখিবার প্রথা থাকিলেও কোনও কার্য্য বিশেষের উদ্দেশে দশটা "আমির" তেরিজ করিয়া টোটালে একটা বড় "আমি" গড়িতে পারেন; একখানি রথ টানিবার সময় সকলে একটা কাছিতে হাত লাগাইয়া আপন আপন শক্তি-অনুসারে একদিকেই টান দিতে পারেন। আমাদের কিন্তু ঐখানেই গোল! পরাধীন জাতি আমরা শক্তি-পরিচালনের ক্ষেত্র অতি-ক্ষুদ্র অতি-সঙ্কীর্ণ,—সুতরাং বাগেযোগে যদি একখানি রথ টানিবার সুযোগ পাই ত' অমনি সেই রথের গায়ে ইচ্ছামত কাছি বাঁধিয়া যে যাহার কেরামতি দেখাইতে উদ্যোগী হই। রাম যদি দক্ষিণ দিকে টানিতে যায়, শ্যাম অমনি মারেন হ্যাঁচ্কা পূর্ব্বদিকে, নেপাল টানেন পশ্চিম দিকে ও গোপাল টানেন উত্তর দিকে—তাতে রথ উল্‌টাইয়াই পড়ুক আর নারায়ণ মাটীতে গড়াগড়িই যান, সে দিকে দৃক্‌পাত নাই! কে কেমন হেঁইয়ো-টান মারিয়াছি, শ্যামকে কেমন জব্দ করিয়াছি, গোপাল কেমন হারিয়া গিয়াছে, এই বাহাদুরী লইয়া তালপাতার ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে বাড়ী ফিরি।**

এ অবস্থার পরিবর্ত্তন আমাদিগকে করিতেই হইবে; আত্মাভিমান-রূপ পাপ-পুরুষই মিলন-পথে দস্যুরূপে দাঁড়াইয়া বঙ্গের সাহিত্য-পরিবারকে পরস্পরের নিকট অগ্রসর হইতে দিতেছে না; এই পরিবার মধ্যে যাঁহারা বয়ো-

জ্যেষ্ঠ এবং কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবীণ, তাঁহারাই অগ্রে স্নেহের হাস্যে অধর উৎফুল্ল করিয়া ও আদরের আলিঙ্গনের জন্য বাহু বিস্তার করিয়া কনিষ্ঠদিগকে ক্রোড়ের নিকট টানিয়া আনুন, কাশ্মিরী শাল বিছাইয়া তাহাদিগকে বসাইয়া নিজে কুশাসন গ্রহণ করুন। কোন শাস্ত্রেই অহঙ্কারীকে জ্ঞানী বলে না।**

বৃটিশ যুগে প্রথম সাহিত্য-কর্ত্তাদের কথা আসিলেই প্রথমে মনে পড়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বর গুপ্ত ও রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর নাম। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের "পাখী সব করে রব" "ঘুম-পাড়ানী মাসী পিসীর" মত বাঙ্‌লার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে আজও পর্য্যন্ত উচ্চারিত হয়, কিন্তু তাঁহার রস-তরঙ্গিনী ও বাসবদত্তা কেন যে বর্ত্তমান কালে পাঠকদিগের কাছে ততটা আদর পায় না, তাহা বুঝিতে পারি না। আদিরস ইদানীং মদনকে বিদায় দিয়া প্রণয় নাম পরিগ্রহ করিয়াছে, পেটে পাড়ার পাট উঠাইয়া দিয়া সীমন্তে পাতা কাটিতেছে, মালতী-মালা ভাসাইয়া দিয়া ক্যামেলিয়ায় কবরী আলোকিত করিতেছে, চুয়া-চন্দন-কেশরের পরিবর্তে রুজ্‌ ভেজেলিন হেলিয়োট্রোপে অঙ্গরাগ করিতেছে, নলিনী-পত্র-শয়নে হা-হুতাশ না করিয়া সোফায় হেলান দিয়া আলুলায়িত কেশে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে বলিয়াই—বাসবদত্তাদি কাব্য এখনকার রুচির আদালতে সদ্য সাব্যস্ত করিতে পারিতেছে না। ভাবের সহজ সৌন্দর্য্য ও পদাবলীর মাধুর্য্যে ঈশ্বর গুপ্ত একদিন সাহিত্য-গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; রঙ্গলাল দীনবন্ধু বঙ্কিম প্রভৃতি সাহিত্য-মহারথীগণ প্রায় সকলেই প্রথম যৌবনে গুপ্ত কবির প্রতিভার দীপ্ত আলোকের নিকট বসিয়া দাঁড়ি টানিয়া আসিয়াছেন। গুপ্ত কবির সঙ্গে সঙ্গেই খাঁটী বাঙ্গলা কবিতা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। তাঁহার শব্দ-চাতুর্য্যে শর্করা-সংযোগে আনারসের ন্যায় রস-ভরা মধুর ফলকে মধুরতর করিয়াছিল; কাব্যকলার গব্যঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া তিনি তপস্বী মৎস্যকেও বিলাসী পূজ্য-ভোজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। গুপ্ত কবির পর বঙ্গদেশে অনেক কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেক কবিতা সকল দেশে সকল সময়ে সকল জাতির মধ্যে বরণীয় হইবার উপযুক্ত কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের রচনা পাঠের লালসা যে বর্ত্তমান শিক্ষিত জনগণের অন্তর হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে—এ কথা মনে হয় না।**

বর্ত্তমান গদ্য-সাহিত্য

বর্ত্তমান জাতীয় গদ্যের প্রাসাদ-গঠনে কণিক চালাইয়া গিয়াছেন রাজা রামমোহন রায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি। আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস লিখিতেছি না, মোটামুটি আলোচনা করিতে যে দুই-চারিটী নাম মনে আসিতেছে বলিয়া যাইতেছি, তাও পর্য্যায়ক্রমে বলিতেছি না; সুতরাং অজ্ঞতা বা অনবধানতা-বশতঃ অনেক নাম বাদ পড়িয়া যাইতেছে ও যাইবে; তাহার জন্য উকিল-পোষণে অক্ষম এই দীনের নামে অনুগ্রহ করিয়া কেহ মানহানির মকদ্দমা রুজু করিবেন না!

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ও বিশেষ বিভাগীয় গ্রন্থগুলি বাদ দিলে বাঙ্‌লা সাহিত্য বলিতে এখন যাহা বুঝায় তাহা কবিতা ও কথা-সাহিত্য। কথা-সাহিত্য-প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচরণ মিত্রকে।

কথা-সাহিত্য

আলালের ঘরের দুলাল নামটি আটপৌরে বাঙ্‌লা। ইহার ভাষা আটপৌরে বাংলা, ইহার গল্প পাত্র-পাত্রী সব বাঙালীর নিজস্ব।**

দীনবন্ধু, রামদাস সেন, অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি তন্ত্রধার, পূজক, বেশকারী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া পুরোহিতরূপে বঙ্কিম বাবুই প্রথমে যেন মন্ত্রবলে তাঁহাদের মুখ ভাষাদেবীর দিকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, দেখ, উনিই তোমাদের মা!

শুভক্ষণে ১২৮০ সালে বঙ্গদর্শন প্রচারিত হইল! সকলে দেখিল, মায়ের মুখ কি সুন্দর, কি পবিত্র, কি মাধুর্য্য-মণ্ডিত তেজোজ্জ্বল। তখন জ্ঞানকাননের কুসুমরাশি আহরণ করিয়া সকলে মায়ের কাছে অঞ্জলি অঞ্জলি পুষ্প ঢালিয়া দিতে

লাগিল; চিন্তা ও কল্পনার ভাণ্ডার হইতে হিরণ্যহীরা মণিমুক্তা বাহির করিয়া মাতৃদেবীর অঙ্গে ভূষণ পরাইতে লাগিল। স্থানে স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল—কলিকাতায় জ্ঞানাঙ্কুর ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের আর্য্যদর্শন প্রকাশিত হইল। ঢাকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বান্ধব প্রতিষ্ঠিত করিলেন; প্রাচীন ঋষিগণের চিন্তা, সংস্কৃত দার্শনিক সংহিতাকার ও কবিগণের চিন্তা, ইংলণ্ডের চিন্তা, ফ্রান্সের চিন্তা, জার্ম্মাণীর চিন্তা, ইটালীর চিন্তা এই সকল পত্রিকার পৃষ্ঠায় মঙ্গলময় কোমল বাঙ্‌লায় কথা কহিতে লাগিল। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বেও বাঙ্‌লায় সাময়িক পত্রিকা ছিল বটে, তন্মধ্যে স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরিচালিত রহস্য-সন্দর্ভের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সে সকল পত্রিকা মিশনরী-কার্য্য দ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙালীকে বাঙলায় Baptise করিল বঙ্গদর্শন। বঙ্কিম বাবু যদি বাঙ্‌লায় একখানি পুস্তকও না লিখিয়া কেবল মাত্র বঙ্গদর্শনের প্রবর্ত্তনা করিতেন, তাহা হইলে তিনিও ধন্য হইতেন এবং বঙ্গদেশও ধন্য হইত!**

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

আর্য্যগণ নারীকেই যে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন, তাহার সার্থকতার প্রমাণ করিবার জন্যই বুঝি সিত শতদল-শুভ্র কল্পনার মতিমালা হৃদয়ে দোলাইয়া বঙ্গের অমৃত কাননে এত অঙ্গনা বীণা বাদন করিতেছেন! আমার যৌবনকালে যখন এদেশে বিদুষী নারীর সংখ্যা একমাত্র অঙ্গুলির পর্ব্বে গণনা করা যাইতে পারিত কি না সন্দেহ, তখন পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "দীপ-নির্ব্বাণ" পড়িয়া চমকিত হইয়া মনে করিয়াছিলাম, আমাদের দেশে মহিলা কি এত শিক্ষিতা হইতে পারেন! তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা এই কথা জানিয়া তবে বিশ্বাস হইয়াছিল, তাঁহার রচিত গীত-কবিতাদি তাঁহাতেই সম্ভব! মধুসূদন দত্তের বংশে কবিতা জীবিতা রাখিয়াছেন শ্রীমতী মানকুমারী। তাঁহার শ্বশুর-গৃহের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকায় দত্ত-কুল-বধূ কল্যাণীয়া শ্রীমতী গিরীন্দ্রকুমারীর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় আমি বহুকাল পূর্ব্বে পাইয়াছি। তাঁহার রচনায় একটা সরল সহজ সৌন্দর্য্য আছে। মাননীয়া শ্রীমতী কামিনী রায়ের প্রতিভাপূর্ণ সৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতার সাহায্যে আমি মানস-নয়নে মাত্র দেখিয়াছি! তাঁহার লেখা আমার বেশ মিষ্ট লাগে। জ্যোতির্ম্ময়ী ও রাণী মৃণালিনীর রচনাতেও সৌন্দর্য্য আছে। একে সাবিত্রীর অশ্রুজল, অন্যে গোপ-বধূ-নয়ন-বিগলিত বারিবিন্দু। ঘোষ-জায়া শৈলবালার রচনাও বড় মিষ্ট। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা ও হিরণ্ময়ী সাহিত্য-ক্ষেত্রে চিরপ্রশংসিতা। আমার বড় আক্ষেপ, সহজ কবি তরুদত্ত তাঁহার বালিকা প্রাণের উচ্ছ্বাস নিজের মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই! শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা কুমুদিনীও সারস্বত-সরসী আলো করিয়া আছেন। শান্তা ও সীতা দেবীর রচনা পড়িবার জন্য অনেকেই আমার ন্যায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন।

আরো অনেক বঙ্গ-মহিলার রচনার গৌরবে বাঙালীর বাঙালী বলিয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। আর গুটি দুই-তিন নাম করিব। অনুরূপা ও সুরূপা (ইন্দিরা) আমার অতি স্নেহের পাত্রী।**

আর একটি বালিকার কথা মাত্র উল্লেখ করিব—তিনি নিরুপমা দেবী। রূপ দেখি নাই কিন্তু গুণে যে তিনি সার্থক নাম্নী তাহাতে সন্দেহ কি! অন্যান্য কথা-সাহিত্য-লেখকদিগের মধ্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম আমাকে সর্ব্বাগ্রে সসম্মানে উচ্চারণ করিতে হয়। তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার স্বর্ণলতা একেবারে খাঁটী সোনা। পল্লীজীবনের কি করুণ কাহিনীর গার্হস্থ্য চিত্রই তারক বাবু লিখিয়া গিয়াছেন! তারকবাবুর নিকট হইতেই মূলধন ঋণ করিয়াই আমি রঙ্গ-মঞ্চ হইতে 'সরলা'র সৌন্দর্য্য একদিন বঙ্গবাসীকে দেখাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের পর কল্যাণীয় শ্রীমান্ হারাণচন্দ্র তাঁহার পল্লীবাসে একটু বিশ্রাম করিয়া লইতেছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প এই প্রাচীন প্রাণকে পুলকিত করিয়াছে। রবি বাবুর গল্পগুচ্ছের ন্যায় প্রভাত বাবুর গল্পগুলিও আমি বার বার পড়িয়াছি; এখনও অবসরে পাঠ করিতে ইচ্ছা করে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আদর আজ ঘরে ঘরে, এ আদর-লাভে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলেখক স্নেহাস্পদ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্পগুলি অবসর সময় বিনোদনের উৎকৃষ্ট উপাদান।

নাম করিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এ যুগে নাম-মাহাত্ম্য বলিয়া বোধ হয় নাম করিতে করিতে নামতা বাড়িয়া গেল। আর একটি নাম বাকী রাখিয়াছি—তেত্রিশ কোটী দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া অবশেষে বলিতে হয় ওঁ তৎসৎ! এইবার ওঁ তৎসৎ উচ্চারণ মাত্র করিব! পূর্ব্বাচার্য্যগণ নবোদিত তরুণ অরুণের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিয়া "নমো জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহা-দ্যুতিং" বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন, মধ্যাহ্ন ভাস্করের দিকে চাহিবার শক্তি কাহার যে অসহনীয় তেজোদীপ্ত প্রভার ধ্যান বা স্তব করিবে! কবি-কুলোজ্জ্বল রবি এক্ষণে বঙ্গ গগনের শীর্ষদেশে বিরাজ করিয়া লোককে আলোকিত পুলকিত উদ্দীপিত ও সঞ্জীবিত করিতেছেন। বড় বড় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দূরবীক্ষণ-সাহায্যে যে জ্যোতিষ্কের প্রতি লক্ষ্য করিতে অক্ষম, যাঁহার কাব্য-সলিলে প্রতিফলিত রূপের প্রতি চাহিলেও সাধারণ লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়, আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি কেবল কিরণানুভবে তাঁহার স্তব-স্তুতি করিতে পারে মাত্র। জগতে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ সূর্য্যাভ্যন্তরস্থ রেখা-বিন্দু আদি দর্শনের লালসায় সর্ব্বগ্রাসের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন কিন্তু আমি আম্রের অমৃত তুল্য রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত, চূতফলের উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে আমার প্রয়োজন নাই, সেইজন্য করুণাময় জগদীশ্বরের চরণে বার বার প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করি যে আমাদের এই রবি যেন কখনও কোন পাপগ্রহ দ্বারা পাদমাত্র গ্রস্ত না হয়েন, তাঁহার পূর্ণ প্রকাশে যেন জগৎ চির-পুলকিত চির-আলোকিত ও চির-জীবিত থাকে!

একবার একজন ইংরাজ ভ্রমণকারীর গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে তিনি লণ্ডনে কোন সময়ে তাঁহার পার্শী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, বন্ধু, উচ্চশিক্ষিত হইয়াও কিরূপে সূর্য্যরূপ একটা জড়গ্রহের উপাসনা কর? তাহাতে পার্শী মহাশয় উত্তর দিয়াছিলেন যে আপনি ত' কখনও সূর্য্য দেখেন নাই, তাই কেন সূর্য্য উপাসনা করি, বুঝিতে পারেন নাই। তাহার কিছুকাল পরে ঐ ইংরাজ ভ্রমণচ্ছলে ভারতবর্ষে আসিয়া জবাকুসুম-সঙ্কাশ সূর্য্য দেখিয়া বলিয়াছেন, "হাঁ, এই সূর্য্যের সম্মুখে ভক্তিভরে স্বতই মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।" আত্মোপাসক অনেক ইংরাজের বিশ্বাস, বক্সার বাঙালীদের এক-দুই গণনা শিক্ষা পর্য্যন্ত তাঁহারাই দিয়াছেন। আমাদের রবিকে দেখিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছেন, এ সূর্য্যের আলোকে যে দেশ প্রদীপ্ত, সে দেশ বারাণসীর ন্যায় ভৌগোলিক অস্তিত্বের বহির্ভূত তীর্থক্ষেত্র!

ক্রমশঃ

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সাহিত্য-সম্মিলন

এবারে ৮ই আষাঢ় তারিখে নৈহাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন হইয়াছিল। সম্মিলনের উদ্যোক্তা ছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়।

এই সম্মিলনের কথা বলিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা

বঙ্কিমচন্দ্র (বাঁশরীর সৌজন্যে)

বলা প্রয়োজন—সেটি এবারে ঐ নৈহাটীতে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে।

সাহিত্য সম্মিলনের এই চতুর্দ্দশ অধিবেশন লইয়া নৈহাটীতে একটা দলাদলি বাধে। একদল বলেন, নৈহাটী বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিতে ভরা। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে সম্মিলনের বৈঠক বসুক। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের জন্ম যে গৃহে, যে মন্দি[র] বঙ্গ ভারতী নানা পূজা-উপচারে তুষ্ট হইয়া বাঙালীর হৃদ[য়] শতদল আসন পাতিয়া আজ দীপ্ত হাস্যে বাঙালীকে গ্র[হণ] করিয়াছেন, বাঙালীকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, সে গৃ[হে] সে মন্দিরে সম্মিলন বসিলে সম্মিলনের এ অধিবেশন সার্থ[ক] হইবে! আর একদল বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহ একেবা[রে] জীর্ণ ভগ্ন; সেখানে এত লোকের সমাগমে বিপদের আশ[ঙ্কা] আছে, সেজন্য ঠিক ঐ মন্দিরেই অধিবেশন করা চলে না অতএব সম্মিলনের বৈঠক অন্যত্র বসুক। কোন দলের কথা[ই] উড়াইয়া দিবার নয়। এক পক্ষে প্রাণের গভীর ভক্তি
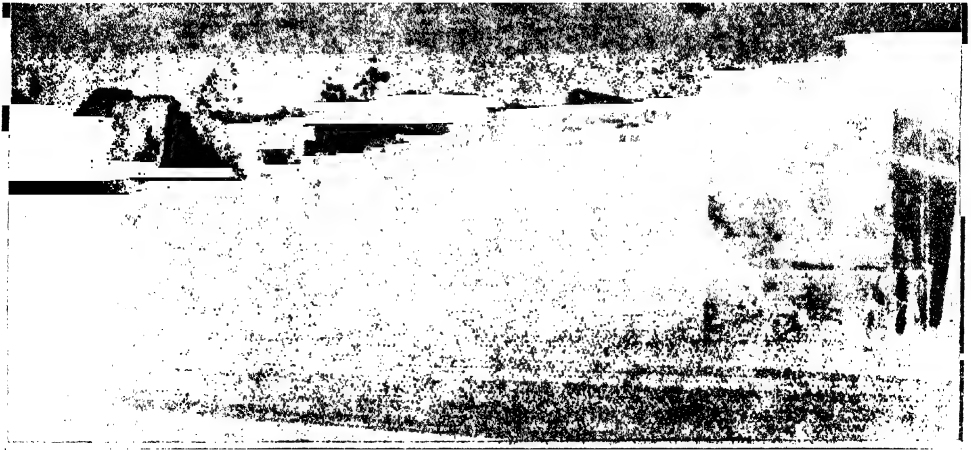
বঙ্কিমচন্দ্রের বাস-ভবন (বাঁশরীর সৌজন্যে)

অনুরাগ—তর্কের স্রোতে তাহা ভাসিতে জানে না, সে যে প্রাণের বস্তু,—প্রাণ থাকিতে তার বিচ্ছেদ নাই! অপর পক্ষে জীবন-মরণের কথা, কাজের কথা!

এই দলাদলি লইয়া খপরের কাগজে নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপ চলিয়াছে। একদল আর-একদলকে বালকের মত গালি দিয়াছে—ব্যাপার দেখিয়া আমরা লজ্জায় মরিয়া গিয়াছি।

দুইদলেই যদি স্বতন্ত্র অধিবেশন বসান্ তাহাতে ক্ষতি কি? দুইদলের উদ্দেশ্য একই,—সাহিত্যালোচনা। এ আলোচনা যত বেশী হয়, ততই মঙ্গল। দুইটা কেন,সাহিত্যের জন্য এমন বৈঠক পাঁচটা বসুক,—তাহাতে লাভ বৈ লোকসান নাই! কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ব্বলতা যে, ঐ যে ও দল আমাদের মানিল না, বটে, উহাদের কাজ পণ্ড করিয়া দাও, করিয়া গালি দাও, উহাদের সকলকে হেয় করিয়া ছাড়িয়া দাও! উহাদের দলে ভিড়িয়ো না,—খবরদার!

এই যে প্রবৃত্তি, এ প্রবৃত্তি কালচারের অভাবটাকেই বড় জোরালো ভাবেই প্রকাশ করিয়া দেয়। এই নীচ ও বর্ব্বর প্রবৃত্তির সমর্থন কোনকালে করিতে পারি না, করিও নাই —Light, more light—দেশের অন্ধ কুসংস্কার, কুশিক্ষা-এ সব অন্ধকারে যত পারো আলোক পাত কর—আলোর চেতনা দিয়া সকলকে জাগাইয়া তোলো—ইহাই হইল আমাদের কথা! না, ওরা আমাদের দলে নয়, অতএব যত ভালো কথাই উহারা বলুক না, সে সব কথাকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দাও—এ কথা শিক্ষিত বা বয়স্ক ব্যক্তির মুখে সাজে না! এই দলাদলির মুখে যে হীনতা প্রকাশ পাইয়াছে, তার আর সীমা নাই!

যাই হোক,—১লা আষাঢ়ের দলও প্রাণপণে গালি দিয়া ছিলেন, ৮ই আষাঢ়ের সভায় যাইয়ো না—যারা যাইবে, তারা বড়লোকের মোসাহেব—এমনি গালি দিয়া তাঁরা তাঁদের অত-বড় স্মৃতিপূজারই শুধু অপমান করেন নাই, সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রেরও অপমান করিয়াছেন! আশা করি, দুইদলই তাঁদের এ অমার্জ্জনীয় ছেলেমানুষির জন্য অনুতপ্ত হইয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যের গুরু—যাঁরা সাহিত্য আলোচনা করেন, তাঁদের সকলেরই তিনি ভক্তির পাত্র। তাঁর স্মৃতি যার সহিত জড়িত, এমন ব্যাপারে এইরূপ শেয়াল-কুকুরের মত কামড়াকামড়ি ব্যাপারকে অত্যন্ত গর্হিত আচরণ বলিয়া আমরা মনে করি। ইহা লইয়া দুই একটা অর্ব্বাচীন দায়িত্ব-জ্ঞানহীন দৈনিক সংবাদপত্র ইতরের মত গালি দিয়াছিল এবং পাত-চাটা প্রভৃতি যে সব বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছিল তার জবাব কলমের মুখে চলে না—তাই সে জবাব দেওয়ায় নিরস্ত রহিলাম।

১লা আষাঢ় নৈহাটীর স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসী বঙ্কিমচন্দ্রের জীর্ণ গৃহেই সম্মিলন বসাইয়াছিলেন, এবং নানা সাহিত্যিক সেখানে উপস্থিত থাকিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির তর্পণ করিয়া আসিয়াছেন।

৮ই আষাঢ় শাস্ত্রী মহাশয়ের আহ্বানে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভূমির অদূরে রেল-লাইনের পশ্চিমে প্রকাণ্ড মণ্ডপে চতুর্দ্দশ সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষেই আতিথ্যে ও অভ্যর্থনায় কোন ত্রুটি বা সম্মিলনীর ধরা-বাঁধা কাজেও অর্থাৎ সঙ্গীত ও প্রবন্ধ-পাঠ পাঠ তো হইয়া আসিতেছে চিরকাল—এবং তা হইবেও কেন না সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্যের আলোচনা চাই-ই তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যাঁ সাহিত্যের সম্বন্ধে কোন নূতন কথা শুনাইতে পারিবেন ন তাঁকে দিয়া প্রবন্ধ পড়াইয়া অনর্থক সকলকে হায়রাণি ফেলা কেন! তাঁদের সাহসকে অবশ্য সাধুবাদ করি, কি শ্রোতৃবর্গের শুনিবার মত একটা কিছু দেওয়া চাই তো!

প্রতি বৎসর গাদাপ্রমাণ প্রবন্ধ একটা মোটা কেতা সংগ্রহ করিয়া অর্থ ব্যয় করিয়া ছাপাইয়া ফল কি হইতেছে
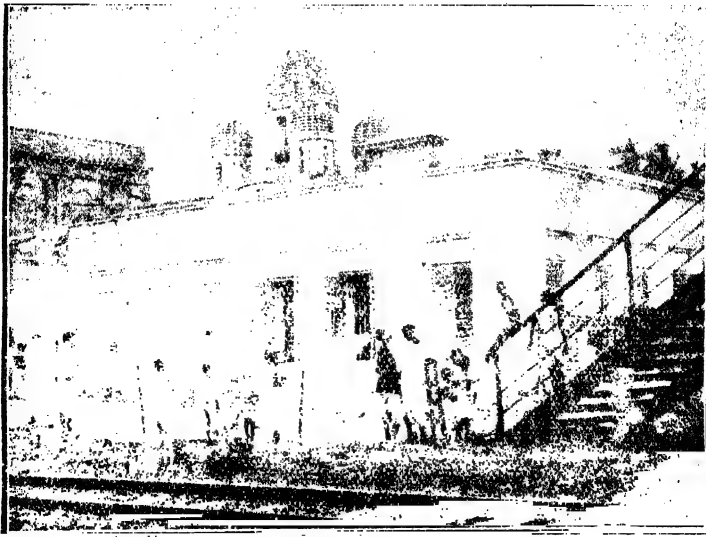
বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা; এই ঘর তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পীঠস্থান
(বাঁশরীর সৌজন্যে)

ব্যাপারে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। ৮ই আষাঢ় এই সভায় বর্ত্তমান সাহিত্য-গুরু কবিবর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; এবং বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে তিনি যে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইবেন। প্রবন্ধ-পাঠের ঘটা না থাকিলেও আমরা ঐটুকুতেই কৃতার্থ হইয়া গৃহে ফিরিতাম।

* * * * *

এখন একটা কথা বলিতে চাই। এই যে প্রতি বৎসর সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে, ইহাতে নিয়ম করিয়া প্রবন্ধ

আমরা চাই, সাহিত্য সম্মিলনীতে সাহিত্যের নব নব বা শুনাইতে যাঁরা পারেন, তাঁহাদের শুধু বক্তার আস দেওয়া হোক, সাহিত্যের গতির তাঁরা আলোচনা করুন— বদ্ লেখকদের বদ্ লেখা শায়েস্তা করা হোক,—দুঃ সাহিত্যিকের দুর্দ্দশা-মোচনের উপায় নির্দ্ধারিত হোক,— যাঁরা সাহিত্যের কোন বিশেষ বিভাগে রিসার্চ্চ করিতেছেন সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও সুযোগ যাহাতে তাঁহাদের করায় হয় তাহা করুন,—দর্শনে, বিজ্ঞানে, নূতন বা নূতন তথ্য সারা জগতে প্রচারের জন্য উদ্যোগ হোক—

নহিলে মামুলি প্রথায় দুইটা কবিতা আর সাতটা প্রবন্ধ পড়াইয়া আসর জমানোয় কোন ফল নাই। তবে ইহাতে একটি লাভ এই দেখিতেছি যে, নানা সাহিত্যিক এক জায়গায় জড়ো হইতে পারিতেছেন—কিন্তু ঐটুকুই যা হইতেছে। তাঁদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান কৈ? তার সময়ও নাই। ছেলেবেলায় সেনেটে জড়ো হইতাম দেশ-বিদেশের ছেলে সকলে পরীক্ষা দিতে—পরস্পরে পরস্পরের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকিতাম। দুই চারিটা কথা পড়িবার উদ্যোগ হইতেছে, অমনি ঘণ্টা বাজিত, আর অমনি সকলে ত্রস্তে হলে ছুটিতাম—এইবার Question paper লইয়া পড়া। এই সাম্মিলনীও ঠিক তেমনি চলিয়াছে—ঐ ঘণ্টা পড়িল! শান্ত গোপাল সাজিয়া বসিবে চল, কোন্ রথী এখনি প্রবন্ধের প্রকাণ্ড বস্তা লইয়া মঞ্চে চড়িবেন! এই যে এবার দুই-দুইটা সভা হইল—সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের লইয়া বহু প্রবন্ধও পড়া হইল—কিন্তু কাহারো প্রবন্ধে তেমন নূতন বাণী পাইলাম না—সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান বা ইতিহাসের পথে চলিবার একটা মৃদু ইঙ্গিত অবধি না!

তাই বলিয়া কি প্রবন্ধের দরকার নাই? প্রবন্ধেরও দরকার আছে। অন্ততঃ পক্ষে একটা নিয়ম বজায় রাখিতেও! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকের দলে প্রাণ খুলিয়া মেশা চাই, আর চাই কাজ। এই কাজের জন্য চাই তরুণের দলকে প্রাণ,—যাদের কল্পনায় ভরপুর—সৃষ্টির জন্য যারা উন্মুখ, শক্তি যাদের অসীম! বুড়াদের লইয়া আর তাঁদের কতকগুলি মামুলি গৎ লইয়া চলিলে সাহিত্য সম্মিলনের গতি মন্থর হইয়া পড়িবে। চাই সেখানে তরুণ প্রাণের চপল হিল্লোল। এই তরুণের দল, এই সজীব প্রাণবন্তের দলের হাতে যদি সম্মিলনের ভার অর্পণ করা যায়, তবে এই নির্জীব সভায় প্রাণের সাড়া জাগিবে। এই সবুজ ও কাঁচা দলের শক্তি অসাধারণ—সম্মিলনী পরখ করিয়া দেখিতে পারেন।

সখের যাত্রা

(চিত্র)

তিনকড়ি বলিল, "হরিদা, যাত্রা শুনতে যাবে?" হরিদা অর্থাৎ হরিচরণ মণ্ডল, তাহার মেটে দরজায় বসিয়া এক-তাড়া পাট লইয়া ঢেরায় পাক দিতেছিল; হঠাৎ যাত্রার কথা শুনিয়া তাহার ঘূর্ণায়মান ঢেরাখানি দক্ষিণ করতলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কোথায় যাত্রা?"

তিনকড়ি। তেমোহানিতে বারোয়ারি-তলায়।

হরি। কার দল? কখন জুড়বে?

তিন। দল যার হয় হোক গে, যাত্রা হলেই হলো।

হরি। বেশ যা হোক্, যাত্রা হলেই হলো! তার ভাল-মন্দ নেই?

তিন। তা আছে বই কি! সেটা ভাই, আমি শুনিনি। যাই হোক্, গেলেই জানতে পারব।

হরি বলিল, "আমার ভাই গরুর দড়ি নেই,—আমাকে আজ দড়ি পাকাতেই হবে—নইলে আজ গরু বাঁধতে পারবো না।" দড়ি-পাকানোই যাত্রা শোনার অন্তরাল ভাবিয়া তিনকড়ি এক-দৌড়ে নিজের বাড়ী হইতে একটা ঢেরা আনিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "সর দাদা, আমি-শুদ্ধ পাট কাটি—দুজনে লাগলে কতক্ষণ!" বলিয়া দড়ি কাটিতে লাগিল।

তিনকড়ির বয়স বিশ বৎসর। তাহার মা আছেন, বাপ নাই, বড় ভাই, ভাজ ও ভাইপো আছে; তিনকড়ির স্ত্রী পূর্ণগর্ভা। তিনকড়ি ও হরিচরণ দুইজনে পাট কাটিয়া দড়ি পাকাইয়া ফেলিল। তিনকড়ি সোৎসাহে কহিল, "তোমার হয়ে গেল। এইবার যতীন দাদাকে দেখি গে—"

হরি। যাস এখন বোস্। এত রোদে আর যায় না।

তিনকড়ি। না ভাই, রোদ বললে চলবে না—সবাই-কার তো সাত্-আসাত্ আছে।

হরি। হাঁ, তা আছে বই কি! তাদেরও ত বেগার খাটতে হবে।

তিনকড়ি দ্রুতপদে গিয়া যতীনের বাড়ী উপস্থিত হইল। যতীন তখন কল্কের ফুঁ দিতে দিতে বাহির হইতেছিল। তিনকড়ি যতীনকে দেখিয়া কহিল, "যতীন-দা, যাত্রা শুনতে চল।"

যতীন। কোথায়?

তিন। তেমোয়ানিতে।

যতীন। ও বাবা! সে যে অনেক দূর! তোমার তো বাইও কম নয়। কখন যাত্রা হবে?

তিন। আজ রাত্রে।

যতীন। কার দল?

তিন। তা জানিনা দাদা, যাত্রা হবে তাই জানি।

যতীন। কার দল, কি পালা, তা না জেনে এই দু-তিন ক্রোশ পথ রাতে হেঁটে মরব?

তিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে গিয়ে লোক সব মরেই যায় কি না!

যতীন। এখন যা, হুঁকোটা নিয়ে আয়, তামাক খা।

তিন। তুমি যদি যাত্রা শুনতে যাও, তবে তোমার বাড়ী তামাক খাব, নইলে খাব না।

যতীন তামাক খাইতে খাইতে বলিল, "যাব কি ভাই—আমার কাপড় নেই,—ধোপার বাড়ী থেকে এখনও কাপড় আসেনি। বাড়ীতে যা আছে, সব ময়লা হয়েছে।"

তিন। বোধ হয়, আমাদের কাপড় সেদ্ধ কচ্ছে, দাও দিকি তোমার কি কি ময়লা কাপড় আছে।

তিনকড়ি যতীনের বাড়ী হইতে একখানা কাপড়, এক খানা সরু চাদর ও একটা সার্ট লইয়া বাড়ীতে ফিরিল। তিনকড়ির মা উঠানে জাঁতা পাতিয়া কলাই ভাঙ্গিতে ছিলেন; তিনকড়ি বাড়ী প্রবেশ করিবামাত্র মা বলিলেন, "হ্যাঁরে, সমস্ত দিন কোথা ছিলি?"

তিন। একটু দরকারে গেছলাম।

তিন-মা। দরকার ত তোমার রাত দিনই!

তিন। মা, বড় বউ কোথা?

তিন-মা। ওই ঘরে।

তিনকড়ি যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তিনকড়ির স্ত্রী শুইয়া আছে—আর বড় বউ বসিয়া তাম্বুল রচনা করিতে করিতে ছোট বউয়ের সহিত গল্প করিতেছিল। তিনকড়ি কাপড় হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল; তিনকড়িকে দেখিয়া তিনকড়ির পত্নী মাথায় একটু ঘোমটা টানিয়া দিল। তিনকড়ি একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ বড় বউ, তুমি আজ কাপড় সেদ্ধ করছিলে না?"

বড় বউ। কাপড় আবার কখন সেদ্ধ করছিলাম! স্বপন দেখছ নাকি?

তিন। তখন যে কতকগুলো কাপড় নিয়ে—

বড় বউ বাধা দিয়া বলিল, "করছিলাম কাপড় সেদ্ধ! আমি বলে—"

তিন। যদিও না করেছ,—আমার কাপড় কখানা একটু পরিষ্কার করে দিতে হবে।

বড় বউ বিরক্ত হইয়া কহিল, "পার্ব্বো না, পার্ব্বো না। যত দেশের হুকুম নিয়ে এসে জড় কর্ব্বে আমার কাছে! তুমি সমস্ত দিন যে বেড়াতে গেলে, তা ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমার কত কাজ হতো, তাও হলো না—আবার ছেলেটাও কাকা, কাকা করে কাঁদতে লাগল, আমাকে কোন কাজ করতে দিলে না। এখন কার বেগার নিয়ে এল, কাপড় ফর্সা করে দাও! আমি পার্ব্বো না।"

তিনকড়ি ক্ষণেক স্থির হইয়া থাকিয়া বলিল, "বাবা, একেবারে ন'শো কথা শুনিয়ে দিলে! আমি না হয় একটু দায়েই পড়েছি, তা বলে অত কথা!"

বড় বউ। না, বলবে না! ও কার কাপড়? ও তো তোমার নয়।

তিনকড়ি মৃদুস্বরে বলিল, "না, আমারি।" বলিয়া চুপে চুপে চলিয়া গেল।

বেলা তখন অপরাহ্ন। তিনকড়ি দোকান হইতে সাবান কিনিয়া আনিয়া যতীনের কাপড়-জামায় সাবান দিয়া কাচিয়া শুকাইতে দিল।

বেণীমাধব দাঁড়াইয়া তখন ভাবিতেছিল, তাইত, বেলাও গেল, কি করি! গরুর খড় কুচানো নাই—কাটবো, না, কাদায় জল দেবো! কাদাটাও শুকুচ্ছে—কাল একপাট

দেওয়াল দিতেই হবে। ঠিক সেই সময় আমাদের তিনকড়ি গিয়া হাজির।

বেণী। কে রে? তিনকড়ি যে! আজ আর সমস্ত দিন দেখি নি কেন বাবা?

তিন। আজ যাত্রা শুনতে যেতে হবে, তাই সারাদিন ব্যস্ত আছি, সঙ্গী যোগাড় করতে হবে। খুড়ো, তুমি যাবে?

বেণী। না বাবা! আমার কত কাজ রয়েচে, আমার কি যাত্রা শুনতে গেলে চলে?

তিন। খুব চলবে, নাও—কাজ তো ভারি।

বেণী। ভারি বটে! নেহাৎ হাল্কা নয়। গরুর খড় নেই, কাদাটা শুকুচ্চে, তাতে জল দিতে হবে, কাল এক পাট্ দেওয়াল না দিলেই নয়।

—তা হবে, হবে, আরও একখানা বঁটি এনে দাও দেখি। ঐ ক'টা খড়—কাট্‌তে কতক্ষণ যায়?

"তবে দাঁড়া" বলিয়া বেণী আর একখানা বঁটী আনিল ও নিজের বঁটিখানা বাহির করিল এবং বেণী ও তিনকড়ি দুইজনে ঘণ্টা-খানেকের ভিতর পণ-খানেক খড় কুচাইয়া ফেলিল।

তিনকড়ি বলিল, "যাত্রা শুনতে যাবে তো, দেখ!"

বেণী। যাব কি রে! কাল ভোরে কাদা করতে হবে যে।

তিন। আজই কাদা করে ফেল না, কাল যাত্রা শুনে এসে দেয়াল দেবে।

"তুই দিবি? তবে আয়, দুজনে হাতাহাতি কাদাটা তৈরি করে ফেলি।" বলিয়া দুইজনে জল তুলিতে ও কাদা কোপাইতে লাগিল।

যখন সন্ধ্যা হইয়াছে, তখন তিনকড়ি হাত-মুখ ধুইয়া নিজের বাড়ীর দিকে চলিল, পথে দেখিল, ননীগোপাল এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে যাইতেছে, অমনি তিনকড়ি তাহাকে পাকড়াও করিল।

"ননী, তোমাকে ভাই যাত্রা শুনতে যেতে হবে। অনেকগুলো লোক জুটেচে, তুমি হলেই হয়।"

ননী। আরে দূর ভাই, আমার গরু হারিয়েচে, মরছি খুঁজে।

তিন। আমি শুদ্ধ তোমার গরু খুঁজে দিচ্চি—তা হলে তো যাবে?

ননী। তা বরং যেতে পারি।

তখন মনের স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিতে দুইজনে গরু খুঁজি চলিল।

এদিকে তিনকড়ির বড় ভাই বাড়ী আসিয়া মা জিজ্ঞাসা করিল, "মা? তেনা কোথা?" বলিলেন, "হাটের ন্যাড়া হুজুক খোঁজে! কোথায় যাত্রা হ তাই নাকি সে শুনেচে, আর কি তার নিস্তার আ লোক জড় কর্ত্তে বেরিয়েচে।"

এদিকে ননীগোপাল গরু খুঁজিয়া লইয়া বা যাইতেছে আর তিনকড়ি তাহার খোসামোদ করি করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে ও বলিতেছে, "চল ভা সবাই মিলে আমোদ করে যাত্রা শুনে আসা যাক্। ক'দিনের জন্যেই বা আসা!"

ননী। তা তো বুঝলাম, ভাই, আমার যে কাপড় না নইলে আর যাব না কেন?

তিনকড়ি আশ্বাস দিয়া কহিল, "এই না কথা! আম কাপড় আছে, দেবো এখন।"

অগত্যা ননী তিনকড়ির বাক্যে স্বীকৃত হইয়া গ লইয়া বাড়ী গেল। তিনকড়ি আর একবার সঙ্গী দিগকে ভাত খাইবার জন্য তাগাদা দিয়া বাড়ী ফিরিল।

তিনকড়ির দাদা পাঁচকড়ি তখন একটা লণ্ঠন লই গোশালায় দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহার কৃষাণ গরুকে খাইতে দিবার ব্যবস্থা করিতেছে, ও যে গরুটা দুষ্টা করিতেছে তাহার পৃষ্ঠে বাম হস্তে এক একটা কিল মারি তেছে, এমন সময় তিনকড়ি বাড়ী প্রবেশ করিয়া ডাকিল "দাদা!"

পাঁচকড়ি বলিল, "কেন? সমস্ত দিন কোথা ছিলি ে তেনা?"

তিনকড়ি অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "এই ননী গরু হারিয়েচে, তাই বল্লে, 'খুঁজে দে না ভাই' তাই দিচ্ছিলাম।

পাঁচু। তোর গরু-বাছুর কোথায় গেল? এল কিনা তার খোঁজ রেখেছিস্?

তিনকড়ি নিরুত্তর রহিল।

পাঁচকড়ি আপন মনে হাসিল। পরে গোশালার কাজ মিটাইয়া বাহিরে আসিয়া দেখে, তিনকড়ি সরিয়া পড়িয়াছে।

বাড়ীর ভিতর রন্ধন-শালে পাঁচকড়ির স্ত্রী ভাত বাড়িতেছে আর তিনকড়ি বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "বউদিদি তোমাদের একখানা কাপড় থাকে তো দাও না।"

বড় বউ। আমাদের কাপড় নিয়ে কি করবে ঠাকুরপো? সব যে পাছা পেড়ে, তুমি কি করে পরবে?

তিন। তা হোক্, তুমি দাওনা, এখনকার ঐ যে সার্ট আর পাঞ্জাবীর ফ্যাসান হয়েছে, তা এক রকম মন্দ হয় নি! যেমন কিছু কাপড় বেশী লাগে, তেমনি ছেঁড়া পাছা পাড় কাপড় পরে জামা গায়ে দিলে সাড়ে চার হাত ঝুল থাকে বলে সব ঢাকা পড়ে যায়, কেউ জানতে পারে না।

বড় বউ। কেন, তোমার বাসি-করা কাপড় আছে ত!

তিন। আছে ত, সে একজনকে দিতে হবে।

বড় বউ হাসিয়া বলিল, "বেশ, বেশ, এখন থাক, ভাত বেড়েচি।"

তিনকড়ি রন্ধন-শালা হইতে বড় ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া দেখিল, মা বসিয়া হরিনাম জপ করিতেছে আর পাঁচকড়ির পুত্র রাম তার পিতামহীর কোলে মাথা দিয়া শুইয়া বিজ-বিজ করিয়া কি বকিতেছে।

তিনকড়ি আস্তে আস্তে যাইয়া রামকে বলিল, "এই ভুঁড়ো ওঠ্" বলিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে উঠাইয়া দিয়া আপনি মাতার ক্রোড়ে শুইয়া পড়িল। রাম সদর্পে "তুমি ভুঁড়ো, তুমি ভুঁড়ো" বলিতে বলিতে কাকার উপর পড়িয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিল।

পাঁচকড়ি বাড়ী আসিয়া বলিল, "কি রে সব করছিস্ কি?"

মা বলিলেন, "বাপরে বাপ, দুজনে কি হুড়ই কচ্চে।" পাঁচকড়ি বলিল, "আয়রে, ভাত বেড়েচে।"

তখন তিনকড়ি রামকে ক্রোড়ে করিয়া রামের হাতটা পাটা কামড়াইতে কামড়াইতে যাইয়া রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিয়া যথাস্থানে আহারে বসিল। রামকে সঙ্গে করিয়া না খাইলে তিনকড়ি আহারে সুখ পাইত না।

ভোজন করিতে বসিয়া তিনকড়ি বলিল, "দাদা, আমাকে দুটো টাকা দিতে হবে।"

পাঁচু। টাকা কি হবে?

তিন। যাত্রা শুনতে যাবো।

পাঁচু। তা টাকা নিয়ে কি করবি? সে ত অমনি হলেই হবে।

তিন। তা হবে না। আমার সঙ্গে যারা যাবে, তাদের জল খাওয়াতে হবে আর রামের জন্যে রসগোল্লা কিনে আনবো।

পাঁচু। আমার হাতে সব সময় টাকা-কড়ি থাকে না, তোকে যখন ধান চাল বিক্রী কর্ত্তে দিই তখন তোর খরচের মত কিছু রেখে দিতে পারিস না?

তিন। সে আমার দরকার নেই, আমি যেখানে যা পাবো তোমায় এনে দেবো, আমার যখন দরকার হবে তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেবো।

পাঁচু। সে বড় অসুবিধে হয়। সব সময় হাতে থাকে না, খরচ করে ফেলি।

তিন। তা হোক, সেই আমার সুবিধে।

আহারান্তে পাঁচকড়ি উঠিয়া গেলে, বড় বউ ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ ঠাকুর পো, তুমি যে যাত্রা শুনতে যাবে, এদিকে ছোট বউয়ের তো ব্যথা ধরেচে।"

তিনকড়ির স্ত্রী পূর্ণগর্ভা; তাহার প্রসব-বেদনা উপস্থিত জানিতে পারিয়াও তিনকড়ি যাত্রা শুনিতে যাইতে চাহে কি না, তাহা দেখিবার জন্য বড় বউ মিথ্যা করিয়া বলিল, "ছোট বউয়ের ব্যথা ধরেচে।"

তিনকড়ি তাহা শুনিয়া শিহরিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! ও খবর আমাকে দেওয়া কেন? আমি আগে বেরিয়ে যাই, পরে তোমরা যা হয় করো। আর আমি থেকেই বা কি কর্ব্বো?"

বড় বউ একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে কি ঠাকুরপো, বাড়ীতে একটা লোক যাতনায় ছটফট কর্ব্বে, আর তুমি

আমোদ করে যাত্রা শুনতে যাচ্ছ? যা হোক্ মনিষ্যি বটে!"

তিনকড়ি একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কি কর্ব্বো বউদি, আমি যে সবাইকে কথা দিয়ে ফেলেচি। এখন না গেলে তারা মনে কর্ব্বে কি? এবারকার মত এ দায়টা উদ্ধার হয়ে আসি, পরে—"

বড় বউ বাধা দিয়া কহিল, "যাও, যাও, আর বকতে হবে না। বাড়ীর এ দায় অপেক্ষা তোমার যাত্রা শোনার দায় যে আগে, তা কি আমি জানি!"

তিনকড়ি রন্ধনশালা হইতে উঠিয়া গেলে গৃহিণী শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউমা, ছোট বউমার ব্যথা ধরেচে?"

বড় বউ। না, না, ঠাকুরপোকে মিছে করে বলছিলাম।

গৃহিণী। তাই ভাল, নইলে রাত্রে মুস্কিল হতো।

তিনকড়ি তাড়াতাড়ি আচমন শেষ করিয়া নিজ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে বলিল, "কি গো, তোমার গতিক কি? একটা দিন আর চুপ করে থাকতে পারলে না?"

ছোট বউ সবিস্ময়ে কহিল, "কি হয়েছে? কিসের গতিক?"

—"বড়বউ বল্লে, তোমার ব্যথা ধরেচে।"

ছোটবউ। কৈ, না। দিদি তোমায় মিছে করে বলেচে।

তিন। যাক্, বাঁচা গেল। লক্ষ্মীটি, আজ কিছু গোলযোগ করোনা, কাল তোমায় বড় বড় রসগোল্লা এনে খাওয়াব।

ছোটবউ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, রসগোল্লার আশায় আমি ধৈর্য্য ধরে থাকি, তুমি যাত্রাটা মোট কথা ফস্কাতে দিও না।"

তিনকড়ি পাণ লইয়া নিজে একখানা পাছা পেড়ে কাপড় পরিয়া ও অন্যান্য লোকের জামা কাপড় লইয়া মাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে প্রণাম করিয়া বাটী হইতে প্রস্থান করিল।

রাত্রি আন্দাজ নয়টা—এমন সময় তিনকড়ি সঙ্গীদের সহিত যাইয়া মিলিত হইল। বেণী বলিল, "আর কেউ যাবে?"

তিন। আমরা এই ক'জন, আর কাকেও বলা হয় নি।

যতীন। কই, আমার কাপড় কই?

তিন। এই যে সকলকার কাপড় এনেচি। শীগ্‌গির করে পরে নাও।

সকলকার পোষাক পরা হইলে বেণী কাকা, যতীন দাদা, তিনকড়ি হরি দাদা ও ননীগোপালকে লইয়া যাত্রা শুনিতে যাত্রা করিল।

এতক্ষণ যাহাদের কথা বলিতেছিলাম, তাহারা সকলেই কৃষিজীবি। পথে সকলে বাহির হইয়া নানাবিধ গল্প করিতে করিতে চলিল। কেহ নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিন্দা করিয়া পাঁচুর সুখ্যাতি করিল, কেহ বা আপনার ও নিজ স্ত্রীর গুণপনা কীর্ত্তন করিল। এইরূপ নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে জ্যোৎস্না রাত্রে প্রায় তিন ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়া তেমোয়ানির নিকট আসিয়া সকলে উপস্থিত হইল।

তিনকড়ি যাত্রার আখড়াই শুনিয়া আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিল, বলিল, "ওই যে আখড়াই দিচ্চে। ব্যস, ফিরতেও আর হবে না। বাঃ, বাঃ, বেশ বাজাচ্ছে।"

যখন সকলে যাত্রা-স্থানে উপস্থিত হইল, তখন জানিতে পারিল, এই গ্রামেরই সখের দল।

যতীন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "আরে, সখের দল আবার দল! পেশাদারী দল নইলে কি গাইতে পারে?"

তিন। কেন, এদের জনা পালা হবে।

যতীন। জনা পালা তো হবে! ভাল গাইতে পারা চাইত, না, ভাল পালা হলেই হলো?

হরি বলিল, "ভাই, এরা ঢাক্ বাজিয়ে জানান্ দিলে না?"

দলস্থ একজন লোক হরির কথা শুনিতে পাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বটে ত—ঢাক বাজাতে ভুল হয়ে গেছে। ও খ্যেঁদে, নব্‌নে মুচিকে বল্, ঢাক্‌টা গাঁয়ে একবার ফিরিয়ে আনুক।"

বলিবামাত্র আসর হইতে একজন লোক উঠিয়া কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে দ্রুত প্রস্থান করিল।

পরক্ষণে এক ঢাক্ ও এক কাঁশি গ্রামের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া সদর্পে ও সশব্দে ঘুরিয়া আসিল। ঘণ্টা খানেক

পরে দুই-চারিজন করিয়া দর্শক আসিয়া দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে যাত্রাস্থল জনপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন আখড়াই বন্ধ হইল; যাত্রা আরম্ভ হইবে। একটি ছোকরা একতাড়া প্রোগ্রাম লইয়া শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল; অমনি দর্শকমণ্ডলী 'হুড়মুড়' করিয়া মহা-গোলযোগ করিয়া উঠিয়া পড়িল। সকলেরই মুখে এক কথা—"আমাকে এক খানা, আমাকে!" সঙ্গে সঙ্গে এদিকে দাওনা হে, "এ দিকে" ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ হাত হইতেই কাড়িয়া লইতে লাগিল। যে লোকটা প্রোগ্রাম বিলি করিতেছিল, সে আর হাতে হাতে দিয়া কুলাইয়া উঠিতে না পারিয়া এবং বর্ত্তমান বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কাগজের গোছাটা ধপাস করিয়া ফেলিয়া দিয়া সরিয়া পড়িল।

পাঠক, আপনি কখনও পল্লীগ্রামের সখের দলের অভিনয় দেখিয়াছেন কি [illegible] করিয়া [illegible] দেখিয়া থাকেন, তবে একবার দয়া করিয়া এই জন[illegible]-অশ্বত্থতলে আবির্ভূত হউন।

মহা সমারোহের সহিত প্রোগ্রাম ত বিলি হইয়া গেল—কিন্তু ঐ দেখুন, কিসের পালা হইবে, তাই লইয়া সাজ-ঘরের ভিতর কুরু-পাণ্ডবের সমর বাধিয়া গিয়াছে। একজন বলিল, "অনা পালা হোক।" অপর জন কহিল, "আমার ভাই ও পালাটা মনে নাই।"

আর একজন বলিল, "আমি বলি, অভিমন্যু বধ হোক্।" অপর আর-একজন কহিল, "প্রোগ্রামে সবাইকার নাম দেওয়া হয়েচে আমি গরীব কি না, তাই আমারি দেওয়া হয় নি! বেশ, তোমরাই যাত্রা কর, আমি পার্ব্বো না।"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "তুই ত নেপথ্যের; আকাশ-বাণীর পাঠ বলিস, তোর আর কি নাম দেব রে?"

"বেশ ত গো, তোমরাই গান কর।"

যে ব্যক্তি প্রোগ্রাম বিলি করিতেছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাঃ! আমি যে পরশুরামের মাতৃহত্যার কাগজ বিলিয়ে এলাম।"

অমনি মার-মুখী হইয়া সকলে কহিল, "সে কি! কোথায় কি তার ঠিক নেই, এর মধ্যে তুই কাগজ দিয়ে এলি?"

১ম। তা দিক্‌না—যাত্রা ত আরম্ভ হয়ে গেল। লোকে কি বাড়ী যাবার সময় প্রোগ্রাম নেবে?

২য়। আরম্ভ হলো কি রকম! এখনও কি পালা হবে, ঠিক হলো না। আমরা রইলাম সাজ-ঘরে—

১ম। তোমরা যদি এখন না বেরোও, তা বলে যাত্রা আরম্ভ হবে না? ওই দেখ, কেষ্টা বেটা নেচে ফিরে এল।

অপর আর-একজন ব্যক্তি কেষ্টা বেটাকে দেখিয়া কহিল, "এই, তোদিকের্ কে সাজ দিলে? তোরা নাচতে গেলি কার হুকুমে?"

নাচিয়েরা থতমত খাইয়া বলিল, "আমাদের দোষ কি! মুকুয্যেই তো আমাদিকে নাচালে।"

৩য়। যাও হে, তোমরা কে সেজে যাবে, যাও। নেচেছে, তার অন্যায় কি হয়েচে? যে পালাই হোক—নাচতে তো হবেই! বেশ করেচিস্, নেচেছিস। এখন নাচিয়ের পোষাক খুলে ছোকরা সেজে যা, আসরে বোস্ গে যা।

কতকগুলা রাখাল-বালক সারাদিন মাঠে গরু চরাইয়া রাত্রে যাত্রা করিতে আসিয়াছে। তাহাদের হাতে হাতে একটা একটা রঙ্গিন রুমাল ও একটা একটা জামা দিয়া এবং অধিকন্তু তাহাদের পিঠে চন্দননগরের ওজনের এক একটি ধাক্কা দিয়া সাজ-ঘর হইতে রাস্তায় নামাইয়া দিল।

বালকের দল সাজ পরিতে পরিতে আসরে যাইয়া 'গুড় গুড়' করিয়া সারি সারি প্রবেশ করিল এবং আসরের মাঝে এক একটি প্রণাম করিয়া বাজিয়ের নিকট সরিয়া সরিয়া আসর অন্ধকার করিয়া বসিয়া পড়িল। দর্শকেরা মনে করিল, তাহলে এবার যাত্রাটা আরম্ভ হইল! সকলে বেশ জাঁকাইয়া বসিল।

যেখানে যাত্রা হইতেছে, সে স্থলে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটা পুষ্করিণী আছে। পানায় জলটা প্রায় সবই ঢাকা। কেবল ঘাটের নিকট বাঁশ দিয়া খানিকটা জায়গা জল ব্যবহারের জন্য কিছু পানা ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে। সেই পুষ্করিণী-তীরে একটা অশ্বত্থ ও গোটাকতক জাম গাছ আছে। সেই বৃক্ষ-তলে খান চার-পাঁচ দোকান বসিয়াছে, দুইখানা পান-বিড়ির দোকান, আর বাকী বাদাম তেলে

ভাজা সুজীর পান্তুয়া গুড়ের জিলাপী ও পাঁপরের দোকান সাজাইয়া রাখিয়াছে। দর্শকেরা সেই দোকানের খাবার ও পানাওয়ালা পুষ্করিণীর জল উদরস্থ করিতেছে! কয়েক জন বৃদ্ধ ছাড়া প্রায় সকল লোকেরই সারা রাত্রি মুখ চলিতেছে।

আর প্রোগ্রাম লইয়া লোকে কি করিল? কেহ-বা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া গান খুঁজিতে লাগিল; অনেকে ছেলের হাতে দিয়া ভুলাইয়া রাখিল। কেহ-বা কহিল, "বেশ কাগজ, বেশ স্যাকা, ঘরের দেওয়ালে মেরে দেবো।" যাহার পুত্র কাল পাঠশালা গিয়াছে সে একখানা প্রোগ্রাম লইয়া ছেলের হাতে দিয়া বলিল, "পড় দেখি, কি নেকেচে?" আবার [illegible] কহিল, "থাক্, কাল তামুক মুড়ে মাঠে নিয়ে কেহ গাহ.. যাবো।" [illegible]

আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত দর্শকবৃন্দ কি করিতেছে, দেখা যাক্। বেণী, হরি, যতীন ইহারা সকলে বসিয়া আছে, তিনকড়ি শুইবার চেষ্টা দেখিতেছে।

ননী কহিল, "শুবি কেন রে?"

তিন। এখন একটু শুই ভাই। যখন আমাদের ছোট বো'য়ের মত বামুনটা আসবে, তখন আমাকে উঠিয়ে দিস!

বলিয়া সকলকে ঠেলিয়া অতি কষ্টে একটু স্থান করিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল।

জনা পালাই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এদিকে সাজ-ঘরের ভিতর গোলযোগ হইতেছে। কেহ অগ্নিদেব সাজিতে চাহেনা, সকলেই অর্জ্জুন বা প্রবীর সাজিব বলে। তাহার কারণ, ঐ দুই জনের সাজ ভাল। দুইটা ছেলে স্বাহা ও মদনমঞ্জরী সাজিল, কিন্তু জনা সাজিতে কেহ চাহে না। যে ব্যক্তি জনার পাঠ লইয়াছিল, সে এখন আর এক-রাত্রের জন্ম সাধের গোঁফ মুড়াইতে অনিচ্ছুক। দলের লোক যখন তাহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল, তখন তাহার লাঙ্গুল স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে লাগিল!

বিপিন বাবুর সখের দল। তিনি স্বয়ং আসিয়া কত বলিলেন, অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু জনার মালিক মহাশয় কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। তখন বিপিনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যদি জনা না সাজো, তবে এবার থেকে কদম পুকুরের জমীর ছেঁচ বন্ধ করব। দেখি, কি করে তুমি ফসল কাট!"

তখন ভাবী বিপদের আশঙ্কায় জনা গোঁফ কামাইতে বসিল। এমন সময় যাত্রার দলের ছোকরা একজন আসিয়া খবর দিল, "শ্রোতারা সব উঠে পড়েচে।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "এ্যাঁ, উঠবে কি! যে আজ যাত্রা না শুনবে, কাল তার বাড়ী থেকে গরু কেড়ে আনা হবে!"

অগত্যা সেই গ্রামের জমীদার বিপিনবাবুর শাসন-বাক্যে সকলে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিল। যে দিকে স্ত্রীলোকেরা বসিয়াছিল, সে দিকটার বর্ত্তমান অবস্থা—গণ্ডা গণ্ডা পাকা দেশী কুমড়ার ন্যায় স্ত্রীলোকেরা পড়িয়া [illegible] একটি প্রাণীও বসিয়া নাই! আছে, [illegible] যাত্রার আখড়া [illegible]

প্রথমটা খুব জাঁক [illegible] ক্রমে যাত্রা আরম্ভ হইল; শ্রোতারাও শুনিতে লাগিল। কিন্তু পরে সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল, কেবল গোলযোগ রহিল সাজ-ঘরে।

তিনকড়ি ত প্রথমেই যাত্রা-স্থলে উপস্থিত হইয়া দুই টাকার পান বিড়ি ও খাবার কিনিয়া সঙ্গীদের খাওয়াইল; পরে নিদ্রা যাইতে লাগিল। যাত্রার গোলযোগ তাহার কর্ণে কিছুই প্রবেশ করে নাই।

যাত্রার পালা অর্দ্ধেক হইবার পর দলপতি সুরাপানে হরষিত হইয়া টলিতে টলিতে আসরে আসিয়া বলিলেন, "বেশ গাওয়া হচ্চে। বাঃ, দাও, এইবার সং দাও।" তখন বাবুর হুকুম পাইবা মাত্র আবার সাজ-ঘরে মহা-কোলাহল উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, "বাঁদর সাজ, বাবু বাঁদরের সং ভাল বাসেন।" কেহ বলিল, "না, না, বোষ্টমের সং দে।" কেবল সাজ-ঘরে গোলযোগই হয়, সং আর বাহির হয় না! বাবু তখন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আরে, এত দেরী করে কেন রে?"

বাজিয়েরা গত বাজাইয়া বাজাইয়া যত ঘামিয়া ওঠে, তত তাল কাটিয়া ফেলে! বাজিয়েরা শেষ নাচার হইয়া পড়িল। বাবু বলিলেন, "না হয়—আমিই একটা সং দি" বলিয়া ডাকিলেন, "পঞ্চা!"

পঞ্চানন বাবুর পাচক। বয়স ৪০।৪৫ হইবে. সংসারে আওতা না থাকায় উৰ্দ্ধে প্রায় হাত চারেক বাড়িয়া উঠিয়াছে. খুব কৃশ, মুখমণ্ডলে বড় বড় গুম্ফ। ব্রাহ্মণ বড় আমোদ-প্রিয়। অদ্য সে বাবুর প্রসাদ পাইয়া স্বর্গের সিঁড়ির অর্দ্ধেক আন্দাজ উঠিয়া পড়িল। বাবুর আহ্বানে পঞ্চানন "আজ্ঞা, যাই" বলিয়া একটা আমড়া ডাল হাতে করিয়া টলিতে টলিতে আসরে আসিয়া বলিল, "কি হুকুম বাবু?"

বাবু। দেখ্ পঞ্চা, আজ আসর তোকেই রাখতে হবে! নইলে এতগুলো লোকের কাছে মান থাকে না!

বাবুর হুকুম পাইবা মাত্র প্রভু-ভক্ত পঞ্চানন আপনার কোঁচার কাপড় ফর ফর্ করিয়া খুলিয়া, মাথার উপর ঘোমটা টানিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল; আসরটা বেষ্টন করিয়া ঘোর উদ্যমে নাচিতে লাগিল। যে কয়জন দর্শক জাগিয়াছিল,তাহারা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের হাসির শব্দে নিদ্রিত শ্রোতৃবর্গ জাগিয়া উঠিল এবং সকলে হাসিতে লাগিল। পঞ্চাননের আর নাচ থামে না, লোকেরও হাসি থামে না! বাবু তখন নিজেই "এন্‌কোর, এন্‌কোর" করিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন।

এদিকে আমাদের পুর্ব্ব-পরিচিত তিনকড়ি হাসির শব্দে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া চোখ্ রগড়াইতে রগড়াইতে কহিল, "কি রে, সং এল না কি?"

বাবু তখন হুকুম দিলেন, "দাও, ভাঙ্গিয়ে দাও।" বাজিয়ে "ডুগ--ডুগ" করিয়া ডুগী চাপড়াইয়া দিল; যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

পাঠক বলিবেন, এ আবার কি যাত্রা, কিছুই সম্পূর্ণ হইল না!

পল্লীগ্রামের সখের দল প্রায়ই অসম্পূর্ণ হয়। একটা পালাও সম্পূর্ণ হইতে আমি দেখি নাই।

তিনকড়ি এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল, "এঁ্যা, হয়ে গেল?"

যতীন বলিল, "তুই এসে অবধি আগাগোড়া ঘুমুলি রে—কিছুই দেখলি না?"

তিন। কি কি এসেছিল? কি পালা হলো?

যতীন। নাচ্-টাচ্ গুলো বেশ হয়েছিল, নেচেছিল মন্দ নয়। তুই কারও কাদা করে দিলি, কারও খড় কেটে দিলি, কারও গরু খুঁজে দিলি, নিজের জামা-কাপড় দিয়ে সবাইকে আনলি, দু'টাকা খরচ করলি, আর এই তিন ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসে সমস্ত রাত ঘুমুলি! দূর্, হাঁদা দূর্, দূর!

তিনকড়ি একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, "আমার ভাই এত যাত্রা-শোনার সখ্ নেই!"

শ্রীশরৎকুমারী দেবী

চয়ন

ফল রক্ষার উপায়

সকল দেশের লোকেই বলে, ফল খাইলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর যাঁরা দুপুর-বেলায় টিফিনে, বা অপরাহ্নে জলখাবারের সময় ফল খান, তাঁরা সকলেই এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করেন। তবে এই ফল খাওয়ায় রুচিভেদ আছে। কেহ আম ভালবাসেন, কেহ আনারস,কেহ কমলা লেবু,বা পাকা পেঁপে কেহ আর কিছু। বৎসরের সব সময়েই তো আর সব ফল পাওয়া যায় না। কোনটা গ্রীষ্মে ফলে, কোনটা বর্ষায়, কোনটা শীতের সময়, কোনটা বা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে।

ফলে এমন কতকগুলি উপাদান পাওয়া যায়, মনুষ্য শরীরের পক্ষে যেগুলি খুব উপকারী।

আজ আটবৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিতেছেন,কি করিয়া ফলকে বারো-মাস তাজা ও আহারের উপযোগী রাখা যায়। ইহার ফলে preserved fruits

বিদেশ হইতে প্রচুর আমদানি হয়,—এদেশেও ফলকে preserve করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং সে চেষ্টা সফলতা লাভ করিয়াছে। এদেশের আম, আতা, আনারস, পেয়ারা প্রভৃতি বোতলে বা টিনে বন্ধ হইয়া তাজা অবস্থায় বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, এবং তার স্বাদও পুরা মাত্রায় আমেরিকা-য়ুরোপের অধিবাসীরা আনন্দে উপভোগ করিতেছে।

সম্প্রতি আমেরিকায় একটা প্রণালীর পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, de-hydration পদ্ধতির দ্বারা ফলের বর্ণ গন্ধ ও স্বাদ বহুকাল তাজা রাখা যায়—এবং তার গুণেরও কোন ব্যতিক্রম হয় না।

De-hydration-এর পদ্ধতি সহজ, তবে তাহাতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। একরকম যন্ত্রের দ্বারা তাপের সাহায্যে ফলে এমনভাবে বায়ুতরঙ্গ দেওয়া হয়, যার ফলে ফলের মধ্য হইতে সমস্ত জলীয় ভাগটা শুষিয়া লওয়া যায়। ফলের কোনখানে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই—ইহার দ্বারা তার পর সেই ফল অমন একবৎসর দেড়বৎসর পরেও খাইলে তার স্বাদে, বর্ণে বা গন্ধে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষ্য হইবে না। শুধু খাইবার পূর্ব্বে ঘণ্টাখানেক ফলগুলি জলে ভিজাইয়া রাখা দরকার। এমনিভাবে শাকসব্জীও তাজা রাখা যায়।

ফল হইতে এভাবে জল শুষিয়া লইলে তাদের ওজন খুব কম হয়। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সেটা কম লাভ নয়—কারণ রপ্তানিতে মাশুল পড়ে কম। অথচ ফলে যে এ্যাসিড, ভাইটামিন ও লবণ পাওয়া যায়, তার কোন কমতি হয় না।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

মার্কিন নাট্যকার

আমেরিকায় ভালো কাব্য বা ভালো নাটকের অভাব, এমনি অপবাদ চিরদিন চলিয়া আসিতেছিল। কল-কারখানার চাপে আর পয়সার ভারে মার্কিনের মন এমন আঁটা যে, কল্পনা সেখানে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

সম্প্রতি আমেরিকায় এক নাট্যকারের প্রতিভা এমন দীপ্ত রাগে ফুটিয়াছে যে, পৃথিবীশুদ্ধ সকলেই তাঁর গোঁড়া হইয়া পড়িতেছে। এই নাট্যকারের নাম ইউজিন ও'নীল। য়ুরোপের সর্ব্বত্র নানা ভাষায় তাঁর নাটকের অনুবাদ বাহির হইতেছে।

"The Straw," "Difl'rent", "The Emperor qones"—ইংলণ্ডে এমন খ্যাতি লাভ করিয়াছে যে মার্কিন-বিদ্বেষী ইংরাজ নাটকের সুখ্যাতি করিবার সময় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিতেছে,…"ও'নীল তো আইরিশম্যান।"

মস্কো সহরের আর্ট থিয়েটারে ও'নীলের "The Hairy Ape" অভিনীত হইয়া সকলের কাছে বিস্তর তারিফ আদায় করিয়াছে। ফ্রান্স, জার্ম্মানি, বেলজিয়ম, আয়র্লণ্ড—সর্ব্বত্র তাঁর নাটক পঠিত, অভিনীত ও অনূদিত হইতেছে। তাঁর অন্যান্য নাটকগুলির নাম—Anna Bhristic, Beyond the Horizon, The White-hdead Boy, The First Man.

এ নাটকগুলির উপাখ্যানে, চরিত্র-ব্যঞ্জনায় অপূর্ব্বতা আছে।

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

বায়োস্কোপের নাটক লেখা

ভারতীতে বায়োস্কোপ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হইতেছে, তাই Photo-play পত্রিকা হইতে বায়োস্কোপের scenario লেখা সম্বন্ধে আলোচনাটুকুর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

বায়োস্কোপের এখন এই শৈশব অবস্থা। এখনই ইহার গল্পনাট্য যে সম্পূর্ণ নিখুঁত হইবে, এমন আশা করা ঠিক নয়। আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় মধ্য যুগে। বহু শতাব্দীর চর্চ্চার ফলে কথা নাট্যের বর্ত্তমান অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। ছোট গল্প তো কত শতাব্দী পূর্ব্বে লোকের মুখে-মুখেই চলাফেরা করিত; তারপর লেখার অক্ষরে সে যখন আসরে দেখা দিল, সেও বহু যুগের কথা! এখন কত কাল পরে তার এই বিচিত্র মনোহর রূপ দেখিয়া বিশ্ববাসী মুগ্ধ হইতেছে চমৎকৃত হইতেছে।

সাহিত্য-হিসাবে চলচ্চিত্রের বয়স দশ-বারো বৎসর মাত্র। এই বালক যতই দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হোক, তবু সে বালক মাত্র—তার কাছ হইতে প্রৌঢ় নাটক বা উপন্যাসের পরিপূর্ণ মাধুর্য্য আশা করা অন্যায়। তবে এ বালকের ভাগ্য এক-হিসাবে খুবই ভালো যে সে জন্মিবামাত্র সমস্ত জগতের সকল লোকের—তারা ত ভাষাতেই কথা কহুক আর সে যেই হোক, আর পণ্ডিতই হোক—সকলের দৃষ্টি ও আদর-লাভে সমর্থ হইয়াছে!

বায়োস্কোপের প্রথম যুগে অভিনেতা-অভিনেত্রী একমাত্র হাত পা চালোনার প্রখর বেগেরই সাধনা করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নামিয়াছিল। তখনকার দিনে ডিরেক্টরের একমাত্র আদেশ ছিল, নড়ো, নড়ো—স্থির থাকিয়ো না, এক মুহূর্ত্ত স্থির নয়। কেবল নড়ো, আর হাত-পা ছোড়ো! তারপর যখন বায়োস্কোপে ছুটন্ত রেল-গাড়ী, ছুটন্ত মোটর, চলন্ত জাহাজ, ওড়া পাখী ও ঘোড়দৌড়ের ছবি উঠিল, তখন সকলে ভাবিল, বায়োস্কোপ আজ কেল্লা ফতে করিল! এর বেশী প্রত্যাশা বায়োস্কোপের কাছে তখনকার দিনে কেহ করিতও না!

তারপর বায়োস্কোপের রঙ্গক্ষেত্র আরো বিস্তীর্ণ হইয়া দেখা দিল। ছোট-খাট গল্প তার পটে উঠিতে লাগিল। তারপর বড় বড় নাটক, বড় বড় উপন্যাস যখন পর্দ্দায় প্রতিফলিত হইতে লাগিল, তখন লোকের আগ্রহ ও আশার আর অন্ত রহিল না। ষ্টেজ ঐ একটা সাদা কাপড়ে আসিয়া নামিয়া পড়িল! তবু ষ্টেজ একটা বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন রহিয়া গেল। বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন,—বায়োস্কোপ ষ্টেজকে সব দিক দিয়া গ্রাস করিতে চাহিলেও একটা বিষয়ে ষ্টেজ এখনো প্রতিদ্বন্দ্বীহীন—ভাষার সুর ভাষার খেলা, যেটা অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখ হইতে বাহির হইয়া দর্শকের চিত্তে নানা রসের সৃষ্টি করে, বায়োস্কোপ সেখানে ঘেঁষ দিতে চাহে না।

এই খুঁত সারিতে বায়োস্কোপ sub-titleএর সৃষ্টি হইল। এই sub titleএ ভাষার অলঙ্কার আসিয়া দেখা দিল, কাব্য ঝরিয়া পড়িল,—রঙ-তামাসার ফোয়ারা ছুটিল। বার্ণার্ড শ'র উক্তি ক্রমেই উবিয়া যাইবার জো হইয়াছে।

রেলে-রেলে সংঘর্ষ, বা জানোয়ারের মুখ হইতে পালানো বা ঘরে আগুন লাগানোই এখন বায়োস্কোপের সেরা কেরামতি বলিয়া বিবেচিত হয় না। দর্শক ছবিতে এখন মনের খেলা ভাবের দোলা দেখিতে চায় এবং তার সে আশা মিটিতেছেও। এই বায়োস্কোপের কাছ হইতে দর্শকের প্রত্যাশা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে বায়োস্কোপ তার এখন ভারী আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বায়োস্কোপের গল্পে মোটামুটি দুইটি ভাগ আছে। প্রথম, আসল প্লটটি; দ্বিতীয় বহিখানির প্রতিপাদ্য সত্য, মূল তত্ত্ব। গল্পটী মোটামুটি ভালো লাগে—কিন্তু ঐ প্রতিপাদ্য বিষয়টিই (theme) চিত্র-নাটাকে প্রাণের মধ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

যিনি বায়োস্কোপের ছবির জন্য নাটক লিখিতে চান, তাঁহাকে দুই-চারিটা কথা বলিতে চাই—আসল গল্প-বস্তু অর্থাৎ উপাখ্যান কতকগুলা ঘটনার সমষ্টিমাত্র। গল্প একটা জায়গা হইতে সুরু হইয়া climaxএ উঠিয়া তারপর কাজ করিয়া বিলীন অর্থাৎ শেষ হইল। কিন্তু কোন সত্য প্রতিপাদিত করিতে চাহিলে একটা idea লইয়া সুরু করিতে হইবে এবং সেই ideaকে ফলাইবার জন্য যেমন-যেমন ঘটনার প্রয়োজন, তেমনি ঘটনা জুটাইয়া ফলাইয়া যাইতে হইবে। যেমন ইবসেনের Doll's House. ইবসেন বলিতে চাহিয়াছেন, নারী পুরুষের হাতে খেলনা মাত্র হইয়া উঠিয়াছে,—এই সত্যটিই তাঁর নাটকের আসল বস্তু; আর এইটিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁর প্লট অগ্রসর হইয়াছে।

এই বায়োস্কোপের জন্য নাটক লেখা আয়ত্ত করিতে হইলে নিজের বায়োস্কোপ দেখা খুব প্রয়োজন। ভালো-মন্দ সব ছবি দেখিয়া যান্। মন্দ হইতে ভালো বাছিয়া লইতে পারিলে শিক্ষা কতক অগ্রসর হইল। এবং যেটা ভালো, সেটা কেন ভালো লাগিতেছে এটুকু বুঝিলে খারাপ দিকটা মনের কোণেও ঘেঁষ দিতে পারিবে

না। অর্থাৎ ছবি দেখিয়া ভাবিতে হইবে, লেখক যে সত্য প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, সেটাকে ঠিক বলিতে পারিলেন কি? অবান্তর কিছু গুঁজিয়া দিয়া ছিলেন কি? বাজে কতকগুলা দৃশ্য গুঁজিয়া মনটাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ছিলেন কি? climax কোথাও পাওয়া গেল কি?

এমনি ভাবে ছবির পর ছবি দেখিলে title লেখার সম্বন্ধেও বেশ জ্ঞান জন্মিবে,—sub-titleকে বেশ হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলা যায় কিসে, সে জ্ঞানও লাভ হইবে।

তারপর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, নাট্যকার হয়তো ছবি তোলার সময় উপস্থিত না থাকিতে পারেন। তিনি তাঁর নাট্য-গল্পে প্রত্যেকটি চরিত্রের আসা-যাওয়া, বসা-দাঁড়ানো, সাজসজ্জা অর্থাৎ details-এর প্রত্যেক খুঁটিনাটি, তাদের ভাব-ভঙ্গী সমস্ত তাঁর লেখায় ছকিয়া দিবেন। প্রথমে লিখিবেন নাট্য-গল্প তারপর দৃশ্য যোজনা করিবেন।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

সঙ্কলন

'ময়দানে'র সলিল-সমাধি

গত ২১শে মে তারিখে কলিকাতা হইতে রওনা হইলাম। নিরাপদে Colombo পৌঁছিলাম এবং সেখান হইতে রওনা হইয়াও যখন monsoonকে ফাঁকি দিয়া আরব সাগর ও Socotres দ্বীপ পার হইয়া লোহিত সাগরে পড়িলাম তখন যে আমাদের কতখানি আনন্দ হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। Red Seaর গরম বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিল। এই গরমের মধ্য দিয়া চলিয়া কয়েকঘণ্টা "লুই" এর উৎপাত সহ্য করিয়া মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত Port Soudan এ উপস্থিত হইলাম। অসহ্য গরমে প্রাণ আই-ঢাই করিতেছিল। এখানকার এই গরম হইতে অব্যাহতি পাইয়া কবে Port Said পার হইয়া ঠাণ্ডা পাইব সেই আশায় সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম। বোধহয় সেইজন্যই প্রভুভক্ত "ময়দান" আমাদের কষ্ট নিবারণ করিতেই লোহিত সাগরে একবার ডুব দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু হতভাগিনীর আর সে শক্তি থাকিল না, সমুদ্রের অতলগর্ভে ছয়শত ফিট শীতল জলে নিজেই চিরবিশ্রাম লাভ করিল। কেমন করিয়া কি হইল তাহাই সংক্ষেপে বলিব।

৮ই জুন তারিখে রাত্রি প্রায় ১টার সময় Port Soudan হইতে রওনা হইয়াছিলাম। পরদিন সন্ধ্যার পরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া অন্যান্য সকলেই নিজ নিজ কাজকর্ম্ম সারিয়া রোজকার মত নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিত হইয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি আকাশ মেঘমুক্ত নির্ম্মল, বাতাসের গতিও ধীর, সবুজ জল অন্ধকারের বসন পরিয়া বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। এতই অন্ধকার যে দূরের কিছুই দেখা যায় না—শুধু জাহাজের গতির সহিত জল বিভক্ত হইয়া সরিয়া যাইবার সময় ঢেউগুলি আগুনের সারির মত জ্বলিয়া উঠিয়া পুনরায় মিশিয়া যাইতেছিল। রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিয়া স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কথা মনে পড়াতে যখন এক পেয়ালা কোকো পান করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতেছি এমন সময় জাহাজের Bridge (যে স্থান হইতে গতি পরিবর্ত্তন, থামান বা চালান হয়) হইতে টেলিগ্রাফের শব্দ হঠাৎ ইঞ্জিন ঘরে বাজিয়া উঠিল। চক্ষের পলকে ইঞ্জিন থামিয়া মুহূর্ত্ত-পরেই আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। এবার পূর্ণমাত্রায় পিছন দিকে চলিবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। এই আকস্মিক ঘটনায় ব্যস্ত হইয়া বাহিরে গিয়া সামনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বক্ষঃস্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। দেখিলাম অতি অল্পমাত্র ব্যবধানেই একটী পাহাড় আমাদের সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জাহাজ পূর্ণবেগে আসিতেছিল, সেই গতি রোধ করিয়া পিছনে হটিবার পূর্ব্বেই পাহাড়ের সঙ্গে তাহার ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গেল। চক্ষের নিমেষে এই সমস্ত ঘটিল। এই কোলাকুলীর আবেগ-স্পন্দন এতই প্রবল হইয়াছিল যে তাহা নিদ্রামগ্ন সকলকেই একসঙ্গে জাগাইয়া তুলিল। কাহাকেও কাহাকেও বা ধাক্কা দিয়া উঁচু Bunk হইতে নীচে মেঝের উপর ফেলিয়া দিতেও ত্রুটি করে নাই। মুহূর্ত্তমধ্যে সকলে বাহির হইয়া প্রকৃত ব্যাপার অনুভব করিয়া নিজ নিজ Life-Belt লাগাইয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া গেল। ঐ দিনই ১০ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমাদের বরাবরের প্রথানুযায়ী Boat Drill (অর্থাৎ বিপদের সময় Life Belt ও Boat লইয়া কিরূপে জীবন বাঁচাইতে হয়) শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। ঐ কাল্পনিক Boat Drill যে সত্যে পরিণত হইবে তাহা ভাবি নাই! আমাদের তখনকার মনের অবস্থা জানানো অসম্ভব।

যাহা হউক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেই প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলাম। সকলেই Life Belt পরিয়া অদ্ভুত বেশে সজ্জিত হইয়া নিজের নিজের Dutyতে দাঁড়াইয়া রহিল। কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে এই স্থলে আমাদের অনেক শিখিবার আছে। এইরূপ জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াও শেষ হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত নিজ নিজ কর্ত্তব্য ছাড়িয়া প্রাণ উপর নির্ভর করিয়া কেহই সান্ত্বনা পাইল না, ভাঙ্গা স্থানটি দিয়া জল বেশ বেগেই প্রবেশ করিতেছিল।

আশা-নিরাশায় রাত্রি কাটিলে ভোরে দেখা গেল যে জাহাজখানি একটী দ্বীপের সহিত (St. John's Reef) লাগিয়া আছে। Salvage না আসা পর্য্যন্ত জাহাজখানিকে যাহাতে রাখিতে পারা যায়,
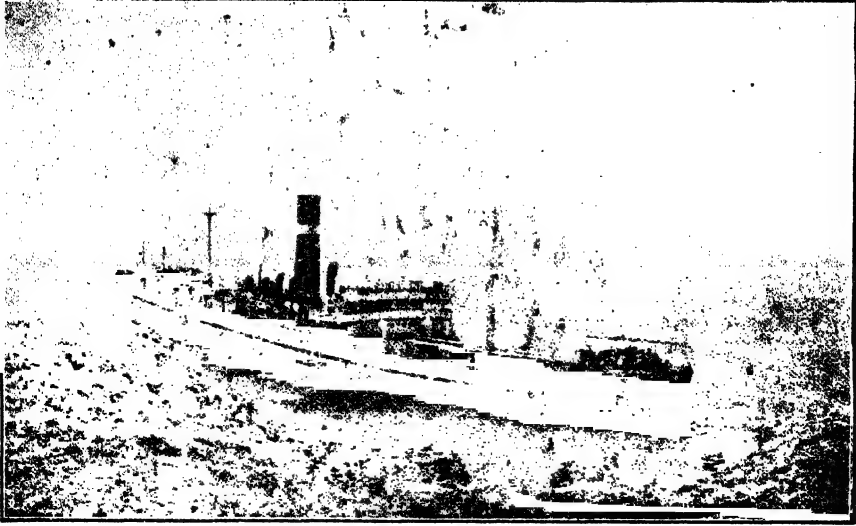
পাহাড়ের ধাক্কা লাগিয়া 'ময়দান' জাহাজ ধীরে ধীরে জলমগ্ন হইতেছে, সাম্নের দিকটা তাহার যেমন জলের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, পিছনের দিকটা তেমনি উঁচুতে উঠিতেছে।

বাঁচাইবার জন্য কেহই লাফালাফি করিল না। আমাদের ভারতীয় খালাসীগণও এ স্থলে ভারতের গৌরব রক্ষা করিয়াছিল ও শেষ পর্য্যন্ত নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়াছিল।

সময় থাকিতে থাকিতে তখনই জীবন বাঁচাইবার আশায় বিনাতারে চতুর্দ্দিকে S. O. S (Save our Souls আমাদের জীবন বাঁচাও) সংবাদ করুণ স্বরে পাঠাইয়া দিয়া ততোধিক করুণ চিত্তে প্রায় সকলকেই নিজের নিজের নৌকায় করিয়া কিনারায় পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল।

জলে ডোবার হাত হইতে যদিও তখনকার মত রক্ষা পাইলাম কিন্তু জলজন্তুর হাতে বোধ হয় প্রাণ যাইবে, তখন এই ভাবনাই বেশী হইল। এইরূপ বিপদের সময়েও জাহাজখানির একখানি শেষ ছবি তুলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—তাই সমস্ত জিনিষ ফেলিয়া Cameraটী মাত্র সঙ্গে লইয়া কিনারায় গিয়াছিলাম।

জাহাজখানি সামনের দিকে ক্রমাগত ডুবিতে লাগিল। (ছবিতে দেখিতে পাইবেন যে সামনের দিক ডুবিতেছে ও পিছনদিক ক্রমেই উঁচু হইয়া উঠিতেছে।) আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই উহার চরম দশা প্রাপ্তির আশঙ্কা করিতেছিলাম। ঐ লতা-পাতা-জলহীন মরু পাহাড়ের উপর রৌদ্রতাপে পুড়িয়া আমরা পিপাসায় ও শ্রান্তিতে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। জলে স্থলে এক রকম ব্যবস্থা—দুয়েতেই উভয় সঙ্কট। কিন্তু উপায় নাই সুতরাং এইরূপ ভাবেই কয়েকঘণ্টা কাটাইলাম।

জাহাজখানি মন্থর গতিতে ডুবিতে লাগিল। এই সুযোগে আমরা কয়েকজন অন্যান্য সকলের জন্য কিছু খাদ্য ও পানীয় আনিতে নৌকায় করিয়া পুনরায় জাহাজে গেলাম ও নিজের কিছু অত্যাবশ্যক জিনিষ-পত্র বাঁচাইতে Cabinএ প্রবেশ করিলাম। ক্ষিপ্রগতিতে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির একটী পুটলী করিয়া পুনরায় নৌকায় উঠিলাম। যে Cabinএর মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে এতদিন কাটাইয়াছি, তখন সেই Cabinএ বেশীক্ষণ থাকাও বিপদজনক—কারণ সমস্তই তখন অনিশ্চিত—যে কোন মুহূর্ত্তেই সমস্ত জাহাজখানি হঠাৎ ডুবিতে পারে এবং উহার পূর্ব্বে যদি ডুবিবার স্থান হইতে একটু দূরে সরিয়া না যাইতে পারা যায়, তবে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গেই

ডুবিতে হইবে—সময় থাকিতেই আমরা "ময়দানের" নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া কিনারায় গিয়া তাহার জলযাত্রা দেখিতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ সম্মুখ ভাগ জলে ডুবিয়া গিয়া যখন উপরের ডেকের উপর জল পৌঁছিল, তখন খুব জোরে একটা শব্দ হইলও সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার জল উর্দ্ধে উথলাইয়া উঠিল—এইরূপে আরও দুই একটা শব্দ করিয়া কাঠ লোহা-লক্কড় ইত্যাদি আকাশে নিক্ষিপ্ত করিয়া জল ছিট্‌কাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে "ময়দান" লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষপত্র লইয়া সেইখানেই ছয় শত ফিট গভীর জলে চির-বিশ্রাম লাভ করিল—বিদায়-কালীন তাহার এই করুণ দৃশ্য বড়ই মর্ম্মান্তিক। Edinburghএর পশুশালার জন্য আমরা অনেক প্রকার পশুপক্ষী ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, ইত্যাদি ও বাজির ঘোড়া লইয়া যাইতেছিলাম। কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের কোলাহল ও আর্ত্তনাদ একসঙ্গে উত্থিত হইয়া যেন "ময়দানেরই" আর্ত্তনাদ বলিয়া মনে হইয়াছিল। পরক্ষণেই সমস্ত নীরব—কেবলমাত্র কতকগুলি কাঠও খাঁচা ভাসিয়া উঠিল। আমরা সকলকেই নীরবে টুপি উত্তোলন করিয়া "ময়দানের" নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বিনা-তারে আমাদের জীবন বাঁচাইবার সংবাদ প্রেরণ করিবার পরে সৌভাগ্যক্রমে কয়েকখানি জাহাজ এদিক ওদিকে নিকটে থাকাতে প্রথমে একখানি ইতালীয় ও পরে একখানি জাপানী জাহাজ কয়েকঘণ্টার মধ্যেই দ্রুতগতিতে আসিয়াছিল; কিন্তু উহারা আমাদিগের বিপরীত-গামী ছিল ও বিলাতগামী Bibby কোম্পানির Warwickshine জাহাজও আমাদের সাহায্যার্থে আসিতেছিল বলিয়া আমরা পূর্ব্ব দুইখানিকে ধন্যবাদ করিয়া বিদায় দিয়া শেষের খানিতে চড়িয়া সুয়েজ অভিমুখে রওনা হইলাম। "ময়দান" লোহিত সাগরের St. John's Reefএর নিকটেই ৬০০ শত ফিট গভীর সমুদ্র-তলে চির-নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিল।

বাঁশরী, আষাঢ়, ১৩৩০। শ্রীফণিভূষণ মজুমদার।

গান

তোমার

শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে
চলে এসেছি,
কেউ কি তা জানে?
তোমার আছে গানে গানে গাওয়া,
আমার কেবল চোখে চোখে চাওয়া,
মনে মনে মনের কথাখানি
বলে এসেছি,
কেউ কি তা জানে?
ওদের নেশা তখন ধরে নাই,
রঙীন রসে প্যালা ভরে নাই।
তখনো ত কতই আনাগোনা,
নতুন লোকের নতুন চেনাশোনা,
ফিরে ফিরে ফিরে-আসার আশা
দলে এসেছি,
কেউ কি তা জানে?

শান্তি-নিকেতন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান

নাই বা এলে সময় যদি নাই,
ক্ষণেক এসে বোলো না গো যাই যাই যাই।
আমার প্রাণে আছি জানি
সীমাবিহীন গভীর বাণী,
তোমায় চিরদিনের কথাখানি বল্‌তে যেন পাই।
যখন দখিন হাওয়া কানন ঘিরে
এক কথা কয় ফিরে ফিরে।
পূর্ণিমা চাঁদ কারে চেয়ে
একতানে দেয় আকাশ ছেয়ে
যেন সময়হারা সেই সময়ে
একটি সে গান গাই॥

শান্তি-নিকেতন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দত্ত-গিন্নী

৮

কৃপাময়ীর চিরদিনই ধর্ম্মে মতি ছিল। গ্রামে যে কয়টি গৃহদেবতা ছিলেন, প্রত্যেকের মন্দিরে সে গিয়া নিত্য গড় করিয়া আসিত, আর ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে ঠাকুর-সেবার কাজ সে নিজে উপযাচক হইয়া রোজ করিত, আর এমন সৌষ্ঠবের সঙ্গে করিত যে ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী তাহাতে কৃপা-ময়ীর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। পুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে সে নিত্য গিয়া সকলকে প্রণাম করিত, আর এটা-ওটা-সেটা পাঠাইত। ইহার উপর এখন তার যেন ধর্ম্মকর্ম্মে রোখ্ চাপিয়া গেল। সে অনেকগুলি ব্রত-নিয়ম করিতে লাগিল, আর গ্রামের লোকদিগকে, বিশেষ ব্রাহ্মণদিগকে, খাওয়াইয়া পেট ভরা করিয়া দিল।

এ বুদ্ধি তাহাকে দিয়াছিল গোপাল। সে বুঝাইয়াছিল যে এমনি করিলে ভট্টাচার্য্য ও চক্রবর্ত্তী কৃপাময়ীর হাতে থাকিবে। সুতরাং গ্রামের লোক যতই কেন গান বাঁধুক না, তাহাকে জাতিচ্যুত করিতে কেহ পারিবে না। এ বুদ্ধি সুবুদ্ধি; কিন্তু ইহার তলায় গোপালের আর একটা কুবুদ্ধিও ছিল। যে কোন ধর্ম্ম-কার্য্য বা উৎসব কৃপাময়ী করুক না কেন, সে দত্ত মহাশয়কে তাহা পরিচালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। স্বামীর হাতে টাকা দিলে চুরির সুবিধা হইবে না; তা ছাড়া স্বামীও যে সে টাকার মধ্যে হাত বসাইতে পারে, এ সন্দেহ তার ছিল। তাই সে সব কেনা-কাটা প্রভৃতি টাকার কারবার করিত তাহার পরম-বিশ্বাসী গোপালকে দিয়া। গোপাল ইচ্ছামত তাহার যে অংশ হউক গাফ্ করিলেও তাহা ধরিবার ক্ষমতা কৃপাময়ীর ছিল না। কাজেই কৃপাময়ী যতই ধর্ম্মকর্ম্ম করিত, ততই গোপালের সিন্দুক ভর্ত্তি হইয়া উঠিত।

এত করিয়াও যে তাহারা গ্রামের ঘোঁট নিবারণ করিতে পারিল না, সে কেবল দত্ত মহাশয়ের স্ত্রীর চরিত্র-প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে। তিনি যতই লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিলেন, ততই গ্রামের লোকের রোখ চড়িয়া গেল। শেষে দত্ত মহাশয়কে জাতিচ্যুত করিবার প্রস্তাব-সম্বন্ধে রীতিমত আন্দোলন-আলোচনা চলিতে লাগিল।

ইহার আর একটা কারণ ছিল। শ্যামা ঠাকুরাণীর উপর লোকে কোন দিনই সন্তুষ্ট ছিল না। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র যে পরিমাণে নিষ্কলঙ্ক ঠিক সেই পরিমাণে উগ্র ছিল। নিজে নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ বলিয়া তাঁর বেশ অহঙ্কার ছিল এবং সেই অহঙ্কারে তিনি গ্রামের সকল লোককেই বিশেষ স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদাই খোঁচা দিতেন।

গ্রামের মেয়েদের সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা যত রকম কলঙ্ক ছিল, তাহা লইয়া কারবার করিত বিশেষ ভাবে দুইজন। রাইমণি নাপিতদের বিধবা মেয়ে। সে ইহা লইয়া বাড়ী ঘুরিয়া মেয়ে-মহলে রস ছড়াইত ও আসর জমাইত। তার নিজের চরিত্র বয়স-কালে খুবই খারাপ ছিল, আর এখন সে ছিল গ্রামের যুবতীদের অভিসারের প্রধান সহায়। কাজেই সে অনেক খবর রাখিত, আর অকুণ্ঠিত চিত্তে খবর তৈয়ার করিয়া সতী নারীর নামেও কলঙ্ক রটাইত। তার এই সব রসের কথা শুনিবার জন্য মেয়ে-মহলে আগ্রহের অন্ত ছিল না। ঝী-বউ হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধা পর্য্যন্ত নূতন খবর শুনিবার জন্য তাহাকে ডাকিয়া গল্প করিত, আর সে কথা শুনিয়া আমোদ করিত।

আর একজন ছিলেন শ্যামা ঠাকুরাণী। তাঁহার আলোচনা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের—তার ভিতর আদি-রসের অংশও ছিল না। তিনি সকল সত্য ও কল্পিত কাহিনী অকপটে বিশ্বাস করিতেন এবং সেই জন্য গ্রামের তিন-পোয়া স্ত্রীলোককে অসতী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের উপর নিজের অন্তরের সমস্ত উগ্রতা ঢালিয়া দিতেন। যাহাকে তিনি অসতী বলিয়া মনে করিতেন, মুখের কথায় ও আচরণে তার প্রতি অপরিমেয় ঘৃণা জ্ঞাপন করিতে তিনি কোন দিন দ্বিধা করিতেন না—এমন কি তাঁর আশ্রয়দাত্রী ও পালয়িত্রী ভট্টাচার্য্য-গিন্নীকেও তিনি ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। তাই তাঁর স্বল্প অবসরের অধিকাংশই ঘরে বাহিরে ঝগড়া ও

কোন্দল করিয়াই কাটিত। আর কোন্দলে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল অদ্বিতীয়।

এই জন্য শ্যামা দেবী কাহারও প্রিয়পাত্রী ছিলেন না। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে গ্রামের লোক হঠাৎ শ্যামা দেবীর প্রতি ভয়ানক সহানুভূতি বোধ করিতে লাগিল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শ্যামাদেবীর আক্রোশ যে ষোল আনা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী পর্য্যন্ত জানিতেন, যদিও তিনি ইহা লইয়া এতটা হৈ-চৈ করার পক্ষপাতিনী ছিলেন না। কিন্তু কেবল সত্যের খাতিরেই যে গ্রামের লোক এত বড় একটা অপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষপাতী হইয়াছিল, তাহা নহে। দত্ত মহাশয়ের ওকালতির চোটে লোকে যতই ক্ষেপিয়া উঠিল, ততই শ্যামার প্রতি তাহাদের সহানুভূতি বাড়িয়া গেল।

তা ছাড়া শ্যামার দুর্গতির মাত্রাটা এত অধিক হইল যে তাহাতে লোকে তার দুঃখে না কাঁদিয়া পারিল না।

শ্যামা যখন চলিয়া গেল তখন ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী পদে পদে তাহার অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। শ্যামা একা এত কাজ করিত যে সে না থাকায় সংসার প্রায় অচল হইয়া দাঁড়াইল। তাই তিনি নিজে খাটো না হইয়া শ্যামাকে ফিরাইয়া আনিবার নানা রকম চেষ্টা করিলেন। ছোট ছেলেপিলেদের মধ্যে যাহারা শ্যামার অত্যন্ত ন্যাওটা ছিল, তাহাদের একে একে তিনি চক্রবর্ত্তী-বাড়ী পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বে বহুবার শ্যামা এমনি ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের অনুরোধে সহজেই ফিরিয়াছিলেন এবার কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। তার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়-প্রমুখ অপরাপর সকলকে দিয়া চেষ্টা করিয়াও যখন তিনি অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন স্বয়ং ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দৌত্যে নিযুক্ত করিলেন। ভট্টাচার্য্যও বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিলেন।

ইহার পর চক্রবর্ত্তী-গিন্নীর সঙ্গে শ্যামার ভয়ানক ঝগড়া হইল। তাহার ফলে শ্যামা গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র আর এক কুটুম্বের বাড়ী গেলেন। সেখানেও তিনি অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। এমনি এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিতে ঘুরিতে দুঃখে-কষ্টে তিনি অনেক ভুগিলেন, শেষে তাঁহার মেয়ে দুইটি পর-পর ওলাউঠায় একরকম বিনা-চিকিৎসায় মারা গেল। তখন শ্যামা দেবী ভট্টাচার্য্যের কাছে অনেক মিনতি করিয়া কিছু টাকা ভিক্ষা করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। কাশীর পথে তাঁহার মৃত্যু হইল।

কলহপরায়ণা হইলেও শ্যামা যে সাধ্বী ও সেবা-নিপুণা ছিলেন, সেটা তাঁহার মৃত্যুতে গ্রামবাসীদের মনের ভিতর গাঁথিয়া গেল। তাঁহার এই শোচনীয় পরিণামে সকলেই অল্পবিস্তর ক্ষুব্ধ হইল। এ ব্যাপারের দায়িত্ব সকলে অকুণ্ঠিত চিত্তে দত্তগিন্নীর ঘাড়ে চাপাইল। ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ও গ্রামবাসী-সকলের নির্ম্মমতার দায়িত্ব সমস্ত বিস্মৃত হইয়া দত্তগিন্নীর চরিত্র-দোষরূপ মূল কারণটাকেই সকলে চাপিয়া ধরিল। যাহারা দত্ত-পরিবারের উপর ক্ষেপিয়া ছিল, তারা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। একদল যুবক এতদূর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল যে দত্তজার বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া পাপিষ্ঠাকে দগ্ধ করিবার সাধু সঙ্কল্পও তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিল। কথাটা তাহারা গোপন রাখিবার কোন চেষ্টা করে নাই, কাজেই গোপাল ভাণ্ডারী তাহা সহজেই জানিতে পারিল। সে অবিলম্বে প্রেসিডেণ্টের কাছে এত্তেলা দিল, দত্তবাড়ীতে সরকারী খরচায় চৌকীদার মোতায়েন হইল এবং কালক্রমে মহকুমার আদালতে বিচার হইয়া এক দল ছোকরা জামিন-মুচলেকায় আবদ্ধ হইয়া রহিল।

ইহাতে প্রধূমিত অগ্নি রীতিমত জ্বলিয়া উঠিল।

ইহার পরই চৌধুরী-বাড়ীতে কন্যার বিবাহে তিন-চার শত লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইল। সাবেক রীতি-অনুসারে দত্তগিন্নী ছেলেদের ভার গ্রহণ করিলেন এবং যথাসময়ে পরিপাটীরূপে রন্ধনাদি সম্পন্ন হইল। চৌধুরী বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান ভরিয়া লোকে পাত পাড়িয়া বসিয়া গেল।

বাড়ীর বউ-ঝিকে সঙ্গে লইয়া দত্তগৃহিণী পরিবেষণ করিতে অগ্রসর হইলেন। পাঁচ-সাতটি ভদ্রলোকের পাতে নির্ব্বিবাদে ভাত দিয়া যাইবার পর দত্তগিন্নী ভবেশ রায়ের পাতে ভাত দিতেই সে "হাঁ, হাঁ" করিয়া দাঁড়াইল। চৌধুরী মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভবেশ রায় খুব বড় গলায় বলিল, "চৌধুরী মশায় আমাদের জাত মারতে চান্ নাকি? মেয়ের বিয়েতে পাঁচ গাঁয়ের স্বজাতি নিমন্ত্রণ করে এনে শেষে একটা বেশ্যা দিয়ে পরিবেষণ করাচ্ছেন!"

ইহার পর একটা ভীষণ হট্টগোল বাধিয়া গেল। সকলেই পাত ছাড়িয়া উঠিয়া তর্কাতর্কিতে যোগ দিল। ব্যাপারটার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত খাওয়া হইতে পারে না!

নটবর দাস কেবল চাপিয়া বসিয়া রহিল, সে বলিল, "অন্ন ব্রহ্ম, পরান্ন পরব্রহ্ম, ছেড়ো না বাবা, ছেড়ো না।" কিন্তু সে কথা কেহ কানে তুলিল না।

চৌধুরী মহাশয়ের মাথা ঘুরিয়া গেল। তর্কের মুখে এ কথা প্রকাশ হইতে বিলম্ব ঘটিল না যে দত্তগিন্নী কেবল পরিবেষণ করিতে আসেন নাই, রান্নাটাও তাঁর স্বহস্ত-কৃত। কাজেই ভবেশ রায়ের কথাটা যদি টিঁকিয়া যায়, তবে তাঁর এত আয়োজন একেবারে মাটি হয়, তাই তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বপাকে নিজের ভোজন-ব্যাপার সমাধা করিয়া পাশের দাওয়ায় বসিয়া দেখা শোনা করিতেছিলেন; তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া ভবেশকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তার দল ভারী, সেও সহজে হটিবার পাত্র নয়।

চৌধুরী মহাশয়ের বৈবাহিক ও সমস্ত বরযাত্রীর সম্মুখে সমস্ত দেশ-শুদ্ধ লোকের সামনে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। সকল পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া ভবেশ রায়ের দল দত্তগিন্নীর চরিত্রের স্বচ্ছন্দ সমালোচনা করিতে লাগিল।

দত্ত-মহাশয় ক্ষিপ্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী আঙ্গিনা হইতে একখণ্ড বাঁশ সংগ্রহ করিয়া ভবেশকে মারিতে ধাওয়া করিলেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

আলোচনার প্রথম অধ্যায়ে বউ-ঝিদের লইয়া দত্তগিন্নী কিছুক্ষণ ভাতের থালা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ঘোমটা অভ্যাসমত টানা ছিল, কিন্তু তাহার আড়ালে তাহার মুখের মাংসপেশী বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। তাহার এবং এই সব ভদ্র যুবতী ও কিশোরীদের সম্মুখেই এমন অনেক রকম কথার আলোচনা হইতে লাগিল, যাহা ভদ্রলোকের ও ততোধিক ভদ্র-মহিলার অশ্রাব্য। ইহারা দাঁড়াইয়া শুনিলেন; বউগুলির মুখ লাল হইয়া উঠিল। দত্তগিন্নীর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। কেবল একবার যখন ভবেশ রায় বড়গলায় বলিল যে পাঁচি চাঁড়ালনীকে গোপাল ভাণ্ডারী নিজে দত্তগিন্নীর বাড়ী ডাকিয়া আনিয়াছিল কেন? তখন দত্তগিন্নীর ওষ্ঠে একটু হাসির আভাস দেখা দিল। চির-বন্ধ্যার নামে এ অভিযোগে তিনি একটু হাসি বোধ করিলেন। তারপর ভট্টাচার্য্য মহাশয় মেয়েদের সরিতে বলিলেন। সকলে বৈঠকখানায় উঠিয়া গেল! সেখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৈঠক চলিল!

দেখা গেল, দত্তমহাশয় ও দত্তগৃহিণীকে লইয়া বেশ দুইটা দল হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে চৌধুরী মহাশয় দত্তদের দলে; আর ছোট-খাট যাহারা তাহাদের মধ্যে অনেকে তাহাদের বিরুদ্ধে। গোপাল ভাণ্ডারীর কূটনীতি বিফলে যায় নাই।

পাঁচ-ছয় ঘণ্টা তর্ক-বিতর্কের পর যখন কিছুই স্থির হইল না, তখন চৌধুরী মহাশয়ের নূতন বৈবাহিকের পরামর্শে স্থির হইল যে আপাততঃ দত্তগৃহিণীকে রান্নার ও পরিবেষণের কার্য্য হইতে অপসৃত করা হলে সকলে অন্নগ্রহণ করিলেন। পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় বৈঠক করিয়া দত্তগিন্নীর চরিত্র সমালোচনা ও সেবিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা যাইবে। এই সর্ত্তে আপোষ হইলে পর সকলে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত গিয়া কাঁড়ি কাঁড়ি অন্ন উদরসাৎ করিল। কেবল দুইজন লোক খাইতে অস্বীকার করিল, তাহাদিগকে কেহ গ্রাহ্যও করিল না।

পাণ লইবার সময় নটবর দাস ভবেশকে বলিল, "ভায়া, পেটে হাত দিয়ে ভাল করে দেখ, জাতটা বেঁচে আছে তো!"

ভবেশের মেজাজের তপ্ত তেলে কে যেন একটা বেগুন ফেলিয়া দিল! সে তিড়িং-বিড়িং করিয়া উঠিল; নরহরি তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "ক্ষেপো না ভাই! বেশ্যার অন্ন জিনিষটা বড় নাপাক, এতে করে উদরাময় হয়ে জাতটা মারা যেতে পারে, তাই বলছি!"

৯

দত্তদের একঘরে করিবার প্রস্তাব ফাঁসিয়া গেল। একঘরে করিবার প্রধান উপায় যে-তিনটি,—দেখা গেল তাহার দ্বারা শরৎ দত্তকে ঠেকানো কঠিন। ধোপা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চাকরাণভোগী প্রজা; সে বরং গ্রামের লোককে ভোগাইতে পারে, গ্রামের লোকের তার উপর কোনই হাত

নাই। নাপিত কানাই কেবল যে শরৎ দত্তর সুহৃদ তা নয়, সে সান্ন্যালদের প্রজা ও ভৃত্য, আর সান্ন্যাল মহাশয় গোপালের হাতে। পুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তো শরৎ-দত্তর একান্ত পক্ষপাতী!

আর যা' উপায় আছে, তাহাতেও শরৎ দত্তকে স্পর্শ করা কঠিন দাঁড়াইল। শরৎ দত্তর মেয়ে নাই,—কাজেই সমাজের শাসন চালাইবার একটা প্রকাণ্ড সুযোগও নাই। মড়া না পুড়াইয়া শাসন তো আর তাহারা জীবিত থাকিতে করিবার উপায় নাই!

বাকী রহিল শরৎ দত্তকে লইয়া খাওয়া-দাওয়া না করা। সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে আটকাইলেও দত্তর তাহাতে বেশী ব্যস্ত হইবার কথা নয়, কেন না তাহারা স্বামী-স্ত্রী কেহই বড় মিশুক নয়, আর দশজনের সঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রে মেলা-মেশা করিতে না পারিলে যে তাহারা মুষ্‌ড়িয়া মরিয়া যাইবে, এমন সম্ভাবনাও ছিল না। কাজেই আটকাইবার কোন উপায় রহিল না। কেন না গ্রামের যাঁরা মাথা-মাথা লোক, তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে দত্তদের পক্ষে দাঁড়াইলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, চৌধুরী মহাশয় ইঁহারা সকলেই বয়সেও প্রবীণ, অর্থ-প্রতিপত্তিতেও গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই তাঁহাদের আশ্রিত বা কৃপাধীন।

কাজেই ভবেশ রায় তার যৌবনসুলভ কর্ম্মতৎপরতার সহিত যতই কেন ছুটাছুটি করুক না, সে দত্তদের কিছুই করিতে পারিল না। উত্তেজনাটা যখন খুব বেশী প্রবল, ঠিক সেই সময় একদিন ভবেশের চেষ্টায় একটা বৈঠকে ঠিক হইয়া গেল যে দত্ত মহাশয়ের হুঁকা বন্ধ। ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মাতব্বর সেখানে কেহ ছিলেন না। ভবেশ ইহা লইয়া খুব হৈ-চৈ করিতে লাগিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও চৌধুরী মহাশয়কে হাতে পায়ে ধরিল, অপর লোককে ধমকাইল, শাসাইল। কিন্তু কিছুই হইল না। ভবেশ চটিয়া ক্রমে গ্রাম-শুদ্ধ সকলকেই 'একঘরে' করিয়া বসিল। তার দলে আর কেহ রহিল না, সেও কাহারও বাড়ী খাওয়া-দাওয়া করিত না।

কয়েকদিন উত্তেজনার পর গ্রামবাসীরা দিব্য শান্ত সুস্থির হইয়া বসিল। দত্ত মহাশয় নিশ্চিন্ত মনে সকলের বৈঠকে যাইয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতে লাগিলেন। দত্ত-গিন্নী মাথায় ঘোমটা টানিয়া সারা গ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইয়া মেয়ে-মজলিসে আদর-সম্ভাষণ পাইতে লাগিল। তাঁহারা চক্ষের অন্তরাল হইলেই সকলে কাণা-ঘুষা করিত, হাসাহাসি করিত। আর-দশজন অসতী মেয়ের মত দত্ত-গিন্নীও অন্তরঙ্গ বন্ধু-মহলে কেবল একটা আমোদজনক আলোচনার বিষয় হইয়া রহিল। বুড়ারা মুচকি হাসিয়া দত্তগিন্নীর সম্বন্ধে নূতন টাটকা খবর লইয়া মৃদুস্বরে আলোচনা করিতেন। ছোকরারা নিভৃতে সেই বিষয় লইয়াই কৌতুক করিত। গিন্নীরা রাইমণি ও পাঁচিকে ডাকিয়া দত্ত-গিন্নার সব গূঢ়তম খবর সংগ্রহ করিতেন, যুবতীর দল মজলিশ করিয়া নানা আদিরস-ঘটিত আলোচনার মধ্যে দত্ত-গিন্নীর অপার কীর্ত্তিকলাপের সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া পরিতৃপ্তি পাইত।

যতদিন বাহিরের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিতে হইয়াছিল, ততদিন দত্তজা একরকম আনন্দে ছিলেন। স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করা নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিয়া তিনি আগ্রহের সহিত স্ত্রী ও গোপালের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন এবং ওকালতির ঝোঁকে প্রায় নিজেও বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছিলেন যে কৃপাময়ীর বাস্তবিক কোন দোষ নাই, আর থাকিলেও তেমন দোষ গ্রামের প্রত্যেক নারীর আছে। এমন কি তিনি প্রায় বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছিলেন যে সতীত্ব হিসাবে কৃপাময়ী সীতা সাবিত্রীর দলে না হইলেও, গ্রামের ঠাকরুণদের কয়েক ধাপ উপরেই। যাঁহারা সবচেয়ে বেশী সতীত্বের স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই দত্তজা বেশী নিশ্চয়তার সহিত স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহারা ঠিক তার উল্টা। এই কথা ধ্যান করিয়া করিয়া তিনি শ্যামা ঠাকুরাণীর যৌবন-কাল সম্বন্ধে কতকগুলি আশ্চর্য্য কাহিনী কল্পনা করিয়া সেগুলি শেষে বিশ্বাসের সহিত প্রচার করিয়াদিলেন। দুই-একজন তাহাতে তাঁহাকে থু থু করিয়াছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ লোক শ্যামার সম্বন্ধেও এমন কথা শুনিয়া চট্ করিয়া বিশ্বাস করিল এবং একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

যখন সকলেই এমনি অসতী, তখন কৃপাময়ী এমন কিই বা করিয়াছে, যাহাতে তাহাকে বিশেষ ঘৃণা করা যায়—মনে মনে

এই রকম সাব্যস্ত করিয়া দত্তজা অনেকটা আনন্দে ছিলেন। বিশেষ এই উপায়ে গোপালের বুদ্ধি ও শক্তির সহায়তা পাওয়াটাকে তিনি বিশেষ লাভজনক বলিয়া মনে করিলেন।

কিন্তু গোলযোগ ও তাহার সঙ্গে ওকালতির প্রয়োজন যখন ফুরাইয়া গেল,তখন দত্ত মহাশয়ের ভিতর সুপ্ত মনুষ্যত্ব আবার এক-আধবার সামান্য একটু নড়াচড়া করিতে লাগিল। আর দত্ত-গিন্নী বাড়াবাড়িটাও বড় বেশী আরম্ভ করিল। স্বামীর কাছে আগে যাও কিছু ঢাকাঢাকি ছিল তাহা সে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিল। গোপাল যখন-তখন আসিতে লাগিল, আর সে আসিলেই দত্ত-গিন্নী সকল কাজ ফেলিয়া সোজা তাহার কাছে গিয়া হাজির হ'ত। দত্তজা হয়তো ঘরে বসিয়া কোন কাজ-কর্ম্ম করিতেছেন, কৃপাময়ী আসিয়া তাঁর কাগজপত্রগুলি উঠাইতে উঠাইতে অনায়াসে হুকুম করিত, "তুমি এখন একটু বাইরে যাও।"

প্রথম যেদিন এমনটা হইল সেদিন দত্ত মহাশয়ের ভয়ানক মনে লাগিল; কিন্তু ক্রমে ইহাও অভ্যস্ত হইয়া আসিল। তখন আর বলার দরকার হইত না, গোপালকে দেখিলেই দত্তজা বাড়ী ছাড়িয়া যাইতেন। তারপর একদিন তাহারা ঘরে আসিলে দত্ত মহাশয়ের কাগজ-পত্র গুছাইতে একটু বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে গোপাল তাহার অস্তিত্ব একদম ভুলিয়া গিয়া কৃপাময়ীকে একটা বিশ্রী পরিহাস করিয়া বসিল। কৃপাময়ীও হাসিয়া তার পাল্টা জবাব দিল।

দত্ত মহাশয় মুখ লাল করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ আছে; তাহার তলায় বসিয়া দত্তজা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিলেন। আজ যাহা ঘটিয়াছে তাহা তাঁহারও একেবারে অসহ্য ঠেকিয়াছে। এমন করিয়া ঘরে থাকার চেয়ে বিবাগী হইয়া যাওয়া ভাল। লোক-সমাজে একটা কেলেঙ্কারী হইবে এই জন্যই তাঁর যা ভয়, আর সেই ভয়েই তাঁকে সব সহিয়া যাইতে হইতেছে। কেলেঙ্কারী যে আঠারো আনা পরিমাণে হইয়া গিয়াছে, সেটা তিনি হিসাব করিলেন না। কেমন করিয়া লোকের কাছে কেলেঙ্কারী না করিয়া এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন, দুর্ব্বলচিত্ত ক্ষীণবল শরৎ দত্ত কেবল তাহাই ভাবিয়া অধীর হইলেন।

খেয়া পার হইয়া কানাই নাপিত সেই সময় সান্যালবাড়ী হইতে ফিরিল।

দত্ত মহাশয়কে এমনি অবস্থায় দেখিয়া চতুর কানাই অনায়াসে বুঝিল যে আজ একটা ভয়ানক কিছু হইয়াছে। সে দত্ত মহাশয়ের কাছে আসিয়া বসিল আর ধীরে ধীরে তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া গেল। দত্ত মহাশয় অবশ্য সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন না। তিনি স্ত্রীর চরিত্রের উপর কোন দোষ নিক্ষেপ করিলেন না। তাঁর একমাত্র অভিযোগ এই যে স্ত্রী তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে। গোপনে গোপনে সে যে কি সব কারবার করিতেছে, তাহা দত্ত মহাশয় জানেন না, কিন্তু গোপাল ভাণ্ডারীর পরামর্শে সে তাঁহার টাকাগুলির সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়। আর সে যে গোপনে ভাণ্ডারীকে তার চেয়ে বেশী বিশ্বাস করে, ইহাই দত্ত মহাশয়ের রাগের কারণ।

ইহা ছাড়াও কানাই তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিয়া এমন সব কথা জানিয়া লইল যাহাতে সে আসল ব্যাপারের বেশ একটু আঁচ পাইল।

কানাই তাঁহাকে পরামর্শ দিল, স্ত্রীকে এতটা আস্কারা দিবেন না; তাকে এখনো শাসন করিতে পারেন তো।

দত্তজা বলিলেন, "ভাল কথা বল্লে বাপু! সেই আমাকে চিরদিন শাসন করে এলো আর আজ আমি তাকে শাসন করবো! একবার তোর কথা শুনে চেলা কাঠের বাড়ী পেয়েছি, আবার কি প্রাণে মারা যেতে বলিস্!"

কথাটা বলিয়াই দত্তজার আপশোষ হইল। তাঁহার বিশ্বাস যে দত্ত-গৃহিণীর হাতে সেদিনকার লাঞ্ছনার কথাটা এতদিন গোপনেই আছে। সেই গোপন কথাটা ঝোঁকের মাথায় প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া তিনি অনুতপ্ত হইলেন!

কানাই বলিল,"কিন্তু শাসন করা তো সোজা দত্তমশায়। তার খোরাক তো আপনার হাতে।"

"আরে আমার জান যে তার হাতে! আমি যদি তার খোরাক বন্ধ করতে যাই, একদিন যদি টাকা তার হাতে না দিই তবে সে যে আমাকে সোজা খুন করে বসবে!"

কানাই বলিল, "তাই যদি ভয়, তবে তার সঙ্গে থাকেন

কেন? আপনি কেন তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিন না! দেখি, সে কোথায় যায়!"

"হয়েছে! সে আমায় দিনে দুবার বাড়ী থেকে বের করছে আর আমি তাকে বের করবো! ভায়া, বল্লেই হয় হয় না, আমার স্ত্রীর মত মেয়ে মানুষের সঙ্গে কারবার করতে হোত, তবে বুঝতে পারতে ব্যাপারটা কি!"

কানাই বলিল, "আচ্ছা বসুন, একটা বুদ্ধি করেছি। আপনি তো স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছেন! আমি বলি, আর ঘরে ফিরবেন না। অন্য বাড়ী যান, চাই কি অন্য গাঁয়ে যান, ঘুরে ঘুরে বেড়ান, টাকা-কড়ি আদায় করুন, ওঁকে কিছু দেবেন না। তবেই জব্দ হয়ে কেঁদে পথ পাবেন না ঠাকরুণ!"

কথাটা দত্ত মহাশয়ের মনে লাগিল। তখন অনেকক্ষণ আলোচনা করিয়া দুজনে মিলিয়া বুদ্ধি আঁটা হইল। দত্ত মহাশয় পরের দিন প্রত্যুষে উঠিয়া রামগঞ্জে তাঁহার পিস্তুত ভগ্নীর বাড়ী চলিয়া যাইবেন এবং আর কৃপময়ীর ধার দিয়াও ভিড়িবেন না, ইহাই শেষে স্থির হইল।

আলোচনা করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তাঁহারা এই আলোচনায় এত তন্ময় ছিলেন যে গোপাল যে ইতিমধ্যে তাঁহাদের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কাহারও নজরে পড়ে নাই। গোপাল নীরবে দাঁড়াইয়া যখন ষড়যন্ত্রটা সমস্ত বুঝিতে পারিল, তখন নীরবে সরিয়া গেল।

দত্ত মহাশয় সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপচাপ বাড়ী ফিরিলেন। গৃহিণী তখন বাড়ী নাই দেখিয়া তিনি বেশ স্বস্তি বোধ করিলেন। নীরবে গিয়া সিন্দুক খুলিয়া তাঁহার কাগজ-পত্র ও টাকাকড়ি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। একটা মোটা পুলিন্দা এক পাশে রাখা ছিল, তাহা পাইলেন না। সেইটা সব-চেয়ে বেশী দরকারী। তাহার মধ্যে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির নামজারীর কাগজ ও অন্যান্য দলিল ছিল। তিনি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া খুঁজিতে লাগিলেন; শেষে কৃপাময়ীর সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত গুটাইয়া রাখিলেন।

অভ্যাসমত আধহাত ঘোমটা টানিয়া দত্ত-গিন্নী আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "খেতে এসো।"

দত্ত মহাশয় গম্ভীরভাবে খাইতে গেলেন। খাইয়া দাইয়া ফিরিয়া আর একচোট সন্ধান চলিল, কাগজ পাওয়া গেল না।

অনেক রাত্রে গৃহিণী ঘরে আসিলেন। তাঁহার হাতে সেই হারানো পুলিন্দাটা। দত্ত-গিন্নী ধীরভাবে পুলিন্দাটা এবং আর একখানা কাগজ সিন্দুকের উপর রাখিয়া প্রদীপটা উস্কাইয়া দিলেন এবং পিলসুজটি ধরিয়া তুলিয়া দত্ত মহাশয়ের পাশে বিছানার উপর রাখিলেন।

তার পর ধীরে ধীরে গিয়া দোয়াত-কলম এবং সিন্দুকের উপর রাখা সেই কাগজখানা আনিলেন। দোয়াত কলম দত্ত মহাশয়ের হাতের কাছে রাখিয়া কাগজ-খানা দত্ত মহাশয়ের সামনে ধরিলেন এবং ধীরভাবে বলিলেন, "এইখানে সই কর।"

এতক্ষণ দত্ত মহাশয় অবাক্ হইয়া স্ত্রীর কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছিলেন। এখন একেবারে বজ্রাহতের মত চাহিয়া দেখিলেন,কাগজখানা একখানা ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা দলিল। তাড়াতাড়ি তাহার উপর চক্ষু বুলাইয়া তিনি দেখিলেন যে ইহা একখানি দান-পত্র! ইহাতে লেখা আছে যে তিনি সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী কৃপাময়ী দত্তকে দান করিতেছেন। দলিলের সঙ্গে রীতিমত সমস্ত সম্পত্তির তপশীল দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাপারটা এই :—

গোপাল ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়া আসিয়াই দত্তগিন্নীকে পরামর্শ দিল যে আজ রাত্রের মধ্যে যদি সে একখানা দান-পত্র না করিয়া লইতে পারে, তবে হয়তো দত্তজা শিকল কাটিয়া পলাইবে! সে বলিল, তাহার কাছে ষ্ট্যাম্প কাগজ আছে, সে অবিলম্বে দলিল লিখিয়া দিবে। দলিলে সম্পত্তির তপশীল লাগিবে বলিয়া সে দত্ত-গৃহিণীর নিকটে চাহিয়া দলিলের পুলিন্দা লইয়া গিয়া এতক্ষণ ধরিয়া দলিল লিখিয়াছে। দত্ত মহাশয় যতক্ষণ নিজের চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন, ততক্ষণ গৃহিণী গোপালের বাড়ীতে বসিয়া দলিল লিখাইতেছিল। দলিল সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ, এমন কি লেখক ছাড়া তিনজন সাক্ষীর দস্তখতও তাহাতে দেওয়া রহিয়াছে, এখন দত্তজা সই করিলেই হয়!

দত্ত মহাশয় নিরুপায়ভাবে বলিলেন, "এ কি ?"

"দেখতে পাচ্ছো না, একখানা দান-পত্র ? এখানা তোমায় সই করতে হবে।"

গৃহিণীর মূর্ত্তি দেখিয়া দত্তর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তবু নিমজ্জমান ব্যক্তির মত সমস্ত সাহস সংগ্রহ করিয়া কম্পিত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এ কেন ?"

"ন্যাকা, জানেন না ! তুমি আমায় ভাতে মেরে শাসন করতে চাও ! এমন চিন্তা যাতে তোমার মনে আর কখনও না আসে, সেইজন্যে এই ব্যবস্থা।"

"তোমায় ভাতে মারবো ? সে কি কথা, কৃপা ?" বলিয়া দত্তজা একটু হাসিলেন।

কিন্তু কৃপাময়ীর তাহাতে কৃপা হইল না। সে বলিল, "হাঁ গো হাঁ, কানাই নাপিতের সঙ্গে তোমার যে পরামর্শ হয়েছে, সব আমি জানি। আর ন্যাকামির দরকার নেই, সই করবে না কি, কর।"

মস্ত বড় হাঁ করিয়া দত্তজা স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি সত্য সত্যই পরিপূর্ণরূপে অবাক হইয়া গেলেন। অবাক্ হইলেন কৃপাময়ীর প্রস্তাবের অপূর্ব্বতা দেখিয়া, অবাক্ হইলেন তাহার লোভের পরিমাণ ও সাহস দেখিয়া, আর সব চেয়ে বেশী অবাক্ হইলেন এই নারীর সর্ব্বজ্ঞতায় ! যখন কানাইয়ের সঙ্গে দত্ত মহাশয় আলাপ করিতেছিলেন, তখন সেখানে অন্য কেহ ছিল না—এ কথা তিনি হলফ্ করিতে প্রস্তুত ছিলেন ! তবে কৃপাময়ী জানিল কি করিয়া ? ভয়ে তাঁর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। ইহার কোন ভৌতিক শক্তি নাই তো।

ভাবিতে দত্ত মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। এক দিন তিনি নিভৃতে দাঁড়াইয়া দুইজন প্রতিবেশীর মধ্যে তাঁহারই সম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়াছিলেন। একজন বলিতেছিল, "দত্তজা যে কিছু না জানে, তা নয়। সে স্বচক্ষে সব দেখছে, তবু সে যে স্ত্রীর কাছে এমন ভেড়া বনে রয়েছে কেন, তা বুঝতে পারি না।"

ইহার উত্তরে অপর ব্যক্তি বলিয়াছিল যে এ সব মন্ত্রে-তন্ত্রে হয়। এমন একটা মন্ত্র-পড়া সিন্দুর পাওয়া যায়, যাহা মাথায় পরিলে স্ত্রী যাহাই করুক না কেন, স্বামী তার কাছে সম্পূর্ণ পদানত হইয়া থাকিবে। তা' ছাড়া ডাকিনী-মন্ত্রে দীক্ষা থাকিলেও এ রকম করা যায় ইত্যাদি।

সেই কথা দত্তজার মনে উঠিল। তাঁর স্ত্রী কি সত্য সত্যই ডাকিনী মন্ত্রে সিদ্ধা নাকি ? যদি হয়, তবে কি ভয়ঙ্কর ! দত্তজা কাঁপিতে লাগিলেন।

কৃপাময়ী বলিলেন, "হাঁ করে তাকিয়ে দেখছো কি ? যত বড়ই হাঁ কর, আমাকে আস্ত গিল্‌তে পারবে না। সই করবে না কি, কর, নইলে—সেদিন গোপাল এসেছিল বলে বেঁচে গেছ, আজ আর জ্যান্ত থাকবে না।"

ইহার চেয়েও জবর ভয়ে দত্ত মহাশয় কম্পমান ছিলেন। মুখে কোন কথা বলিবার সাহস তাঁর কোন অবস্থাতেই হইত না, এখন মনেও স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন কথা ভাবিতে সাহস হইল না—এ নারী যে তাঁর মনের কথা সব দেখিতে পাইতেছে, সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ বিমূঢ় থাকিয়া দত্ত মহাশয় কম্পিত হস্তে কলম লইয়া বলিলেন, "কোথা সই করবো, বল ?"

কৃপাময়ী সকল স্থান দেখাইয়া দিল; পাতায় পাতায় সহি করিয়া দত্ত মহাশয় গলদঘর্ম্ম অবস্থায় কলমটা ছুড়িয়া ফেলিলেন।

তার পর কৃপাময়ীর মুখের দিকে মূঢ়ের মত কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শেষে হঠাৎ তার পায় ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "সব তো দিলাম তোমায়, আমার তো আর কোন জোর রইল না, এখন দয়া করে আমায় প্রাণে মেরো না।"

কৃপাময়ী দলিলখানা ভাঁজ করিতেছিল। সিন্দুক খুলিয়া দলিল ও পুলিন্দা তাহার ভিতর বন্ধ করিল। ততক্ষণ দত্তজা তাহার পায়ের কাছেই পড়িয়া রহিলেন। সিন্দুক বন্ধ করিয়া কৃপাময়ী তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইল। একটু হাসিয়া বলিল, "না, এখন তোমার বিষদাঁত ভাঙ্গা হলো, এখন আর তোমার কোন ভয় নেই। খাও দাও হাসো খেলো, যা' ইচ্ছা কর,কেবল আমার সঙ্গে লাগতে এসো না। কাল দলিলখানা রেজেষ্ট্রী করে দিয়ে এসে তার পর তুমিও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, আমিও নিশ্চিন্ত।"

দত্তজার চক্ষু আবার গোলাকার হইয়া উঠিল। তাই

তো, এখনো আপদ চোকে নাই—রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে।

পরের দিন দত্তজা ও গোপাল রেজেষ্ট্রী অফিসে গেলেন; কৃপাময়ী ডুলি করিয়া সঙ্গে গেল; কাজটা সম্পূর্ণ শেষ না করিয়া সে স্বস্তি লাভ করিতেছিল না।

দত্ত মহাশয় আর গ্রামে ফিরিলেন না। কানাইয়ের উপদেশ-মত তিনি রামগঞ্জেই গেলেন, কিন্তু সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া তবে গেলেন। যখন গেলেন, তখন আর কৃপাময়ীর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার কোন প্রয়োজনই রহিল না

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

গৃহ

বিবাহের মর্য্যাদা যেমন একপক্ষের দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে না, গৃহের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে। "নারীই গৃহের শ্রী, সৌন্দর্য্য,—তাঁহার দ্বারাই গৃহের কল্যাণ সাধিত হয়" ইত্যাদি কথাও তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্যান্য আপাত-মধুর কথার মতই "বিষকুম্ভম্ পয়োমুখম্"; এবং সত্যাভাস মাত্র। নারীও গৃহের অংশ বলিয়া তাঁহার উপর গৃহের শ্রী, সৌন্দ্য ও কল্যাণ নির্ভর করে বটে, কিন্তু পরিপূর্ণ শ্রী, সৌন্দর্য ও কল্যাণ গৃহের প্রত্যেকের উপরই নির্ভর করে।—এবং যে তাহার যত প্রধান পাত্র তাহার উপরই তার তত বেশী নির্ভর। সুতরাং বর্ত্তমান ব্যবস্থার মুখে যতই বলা হউক, কর্ত্তাই যখন সর্ব্বপ্রধান তখন তাঁহার উপরই গৃহের অদৃষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নির্ভর করিয়া থাকে! এমন কি ইহা পরিবর্ত্তিত হইলেও পুরুষই স্বভাবতঃ প্রবল বলিয়া বরাবরই ইহা তাঁহার উপরই বেশী নির্ভর করা সম্ভব। সুতরাং গৃহের শ্রী, সৌন্দর্য্য, মর্য্যাদা-রক্ষার জ্ঞান তাঁহাদেরই বেশী থাকা আবশ্যক। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের দ্বারাও গৃহের সুখ, শান্তি, শৃঙ্খলা,গৌরব এক কথায় গৃহের গৃহত্ব খুবই নষ্ট হইতে পারে—এবং সর্ব্বদা হইয়াও থাকে। কাজেই তাহাদেরও ছেলেবেলা হইতে গৃহরক্ষা শিক্ষণীয় এবং সে শিক্ষা ছেলে মেয়ে উভয়েরই সমান আবশ্যক। বরং এতদিনের অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় ছেলেরাই এবিষয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকিয়া যাওয়ায় এবং ঠিক পূর্ব্বের কারণবশতঃ তাহারাই স্বভাবতঃ প্রবল বলিয়া তাহাদেরই এ বিষয়ে আরও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া ও শেখা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। গৃহের প্রত্যেকেরই ইহা মনে রাখা উচিত, যে গৃহও একটী রাষ্ট্র, এবং ইহার অধিবাসীর সংখ্যার অল্পত্বের জন্য প্রত্যেকেই ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ, এবং ইহার শ্রী, সম্পদে যোগ-বিয়োগের অপরিসীম ক্ষমতা প্রত্যেকের হাতেই আছে; সেইজন্য রাষ্ট্রে যেখানে কোটি-হিসাবে গুরুত্বের গণনা হয়, গৃহে তেমনি একজনের অন্যায়, অবহেলা, শৈথিল্যেই সে ক্ষতি হইয়া থাকে।

তাহার পর বয়োজ্যেষ্ঠের মনোযোগ যেমন অত্যাচার ও বন্ধনে পরিণত হইতে পারে, কনিষ্ঠদেরও মনে রাখা উচিত যে বয়স্করাও এই রাষ্ট্রের অধিবাসী,—এবং তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা ও অধিকারের তাঁহারাও দাবী করিতে পারেন। আর তাঁহারা যেখানে ঐ রাষ্ট্রের কতকগুলি বিশেষ ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী, তখন তাঁহাদের কর্ত্তব্য-পরিচালনায় সকল সময় বাধা দেওয়া বা হস্তক্ষেপ করা চলিতে পারে না। কারণ কোন আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান-সম্পন্ন, স্বাধীন লোকই সে ভাবে কাজ করিতে পারে না। তাঁহাদের উপর কাজের ভার থাকার অর্থই, তাঁহারা সাধারণ বিষয়ে রাষ্ট্রনিয়মানুসারে আপনাপন বিচার-বুদ্ধি-অনুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহ করিবেন। তবে তাঁহারা যদি রাষ্ট্রনিয়ম লঙ্ঘন করেন, কিম্বা যে-সব বিষয়ে সকল অধিবাসীর পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের না জানাইয়া করেন, তবেই কোন কথা উঠিতে পারে! তাহাও তাঁহাদের পদমর্য্যাদা বুঝিয়া সম্মানের সহিতই করা উচিত।

"স্নেহের অত্যাচার" কথাটীরও অনেক অপব্যবহার

সর্ব্বদাই হয়। উহা যখন সত্যই "স্নেহের"থাকে, তখনই মাত্র "অত্যাচার" চলিতে পারে। অর্থাৎ যখন তুমি শারীরিক ও মানসিক বেদনা বা দুর্ব্বলতায় কাতর আছ বা কোন কারণে বা কোন বিষয়ে আনন্দ লাভ করিয়াছ, তখন প্রিয়জনকে ঐ সুখ-দুঃখের ভাগ দিতে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক এবং সেটুকু মনোযোগ আমরা তাঁহাদের কাছে দাবী করিতে পারি। কিম্বা আপনার যেখানে ক্ষমতা এবং প্রিয়জনের নৈপুণ্য থাকে, সুতরাং তিনি অল্পব্যয়ে ও সুন্দরভাবে সে কাজ করিতে পারেন, তখনও তাঁহাকে আমরা তাহা আমাদের জন্য করিতে অনুরোধ করিতে পারি। কিন্তু প্রিয়জনের স্নেহ আছে বলিয়াই তাঁহার উপর সত্য "অত্যাচার" চলিতে পারে না। বরং আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ব্যবহারই তাঁহার প্রাপ্য।

তাহার পর ইহাও মনে রাখা উচিত পুরুষের যেমন স্ত্রী-সন্তানই গৃহ হইলেও স্ত্রীই বিশেষভাবে গৃহ ;—নারীরও তেমনি স্বামী ও সন্তান গৃহ হইলেও স্বামীই বিশেষভাবে গৃহ। এবং স্বামী যেমন কাজকর্ম্ম, বিরক্তির পর বা বিপদে আপদে স্ত্রীর নিকট জুড়াইতে চাহেন, স্ত্রীরও ঠিক সেই আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন স্বামীর কাছে আছে। মার সম্বন্ধেও সন্তানদের ইহা মনে রাখা উচিত। "ঘরটী আলো মায়ের হাসিমুখ"তাহাদের যেমন আবশ্যক, মায়ের"সেই হাসিমুখ"টী যাহাতে থাকে, তাহার জন্ত যত্ন-চেষ্টাও তাহাদের করিতে হইবে। আর তাহাদের "হাসিমুখ"ও মায়ের কম আবশ্যক নয়।

"গৃহই নারীর রাজ্য" এ সম্বন্ধেও বলিতে হয় তিনি সম্রাজ্ঞীর পদ পাইলেই তবে তাহা তাঁহার "রাজ্য" নতুবা উহা তাঁহার জেলখানা হইয়া উঠিতে পারে এবং হইয়াও থাকে। আর পুরুষের পক্ষে গৃহ অপ্রীতিকর হইয়া উঠিলেই অন্য নানা স্থানে সময় কাটানর সুবিধা থাকায় ও গৃহের বন্ধন তাহাকে তত বেশী জড়াইয়া থাকে না বলিয়া তাঁহায় তাহা যত কষ্টকর না হয়, নারীর উহার নাগপাশের বন্ধন তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ হইয়া উঠে। ইহা একহিসাবে জেলখানা অপেক্ষাও যন্ত্রণাদায়ক। কারণ জেলখানার শাস্তি আপনার কৃতকর্ম্মের ফল। তার পর তাহার মধ্যে হৃদয়ের কোন বালাই নাই, তাহা চুক্তিমত কাজ মাত্র; না করিলে তৎক্ষণাৎ দণ্ড দ্বারা শোধ করিয়া লওয়া হয়। সুতরাং হিসাবে কোন গোল নাই। কিন্তু যেখানে হৃদয়ের উপর চাপ দিয়া তাহার সমস্ত সার পদার্থ নিংড়াইয়া বাহির হইয়া গেলেও ঘানিগাছে বাঁধা থাকিয়া চোখে ঠুলি দিয়া তাহা হইতেই পিষিয়া পিষিয়া রস বাহির করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, সেখানে ব্যাপারটা একসঙ্গেই শোকাবহ ও ভয়াবহ হইয়া পড়ে। এদিকে তখন রস কম বাহির হইলে বা তাহার মধ্যে মিষ্টত্ব কম পাওয়া গেলে সকলের আক্রোশের আর সীমা পরিসীমা থাকে না। এবং তখন আবার তাহা পরিত্যাগ করিয়া উহাই সকল রকম অন্যায় পাপ করিবার বিশেষ উপযুক্ত কারণও হইয়া উঠিতে পারে।

আরও একটী মজার কথা এই, যদিও "গৃহই নারীর রাজ্য" এবং তাঁহার আজীবন "তনু-মন-প্রাণ সমর্পণের" এক মাত্র ক্ষেত্র কিন্তু গৃহ তাঁহার জন্য নয়। তাহা যাহাতে কেবল পুরুষেরই সর্ব্বাংশে সুখ-সুবিধার উপযোগী হইতে পারে, এখানে সকল রকমে সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে গৃহ ত পুরুষের পক্ষেই বেশী আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। কিন্তু তাঁহার "বাহিরে"ও আমোদ, আহ্লাদ, আরাম পাইবার সুযোগ-সুবিধাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু নারীর "বাহির" ত বন্ধই, তাহার উপর ঘরেও যদি উহার স্থান না থাকে, তাহা হইলে তিনি ও-সকল পাইবেন কোথায়? না,—তাঁহার ওগুলিরই আবশ্যক নাই?

Arnold Bennet তাঁহার মেয়েদের সম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে "স্বামীরা সকলেই অল্পবিস্তর পশু" কিন্তু তাঁহাদের বশ করিয়া মন যোগাইয়া চলাই স্ত্রীর কাজ। ইহাতে বলিতে হয় মানুষকে পশুত্ব হইতে উদ্ধার করাই ত সভ্যতার উদ্দেশ্য। সুতরাং কাহাকেও "পশু" রাখিয়া তাহার পিছনে শক্তি ব্যয় বাজে খরচ মাত্র। তাহা অপেক্ষা কেহই যাহাতে "পশু" না থাকে, সেইদিকে মানব শক্তির গতি হইলেই তাহা সার্থক হইতে পারে। তিনি আরও বলিয়াছেন, "দায়িত্বই পুরুষকে পশুতে পরিণত করে।" কিন্তু ইহা যাহাকে করে, সে কি "দায়িত্ব" গ্রহণের উপযুক্ত?

আর দায়িত্ব কি মেয়েদেরও নাই? তাঁহারা তাহার অধিকও গ্রহণ করিতেও চাহিতেছেন। সুতরাং তাঁহারাই বা সকল সময়ে দেবতা থাকিবেন কি করিয়া? তাঁহার কথা-মত কাহারও কাজ একটু কম বা বেশী হইলেও এক জনকে দেবতা হইতে বলা ও অপরকে "পশু" হইতে দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ দেবতা হইতে না বলিলেও একজনকে "পশু" রাখিলে দেবতা-ভিন্ন কাহারও তাহাকে লইয়া চালানো সম্ভব নয়! আর পশুবশ করিবার চেষ্টার মধ্যে মানুষের সদ্‌বৃত্তি-পরিচালনার ক্ষেত্র অল্পই আছে। বিশেষতঃ নর-নারীর সম্বন্ধ পশু ও দেবতা বা পশু ও পশু-বশকারীর সম্বন্ধ নয়। তাহা মানুষের সম্বন্ধ। সুতরাং তাহাতে দুইপক্ষেই মনুষ্যত্বের সমান দাবী থাকা উচিত। বাস্তবিক এ সবই ত প্রকৃতপক্ষে নরনারীর মামুলী সম্বন্ধের কথা মাত্র। আশ্চর্য্য, এই সব মতগুলিই আবার নব্য আকারে চালাইবার চেষ্টা হয়। গৃহকে গৃহ রাখিবার ক্ষমতা-অর্জ্জনের জন্যও নারীর বাহিরে আসা আবশ্যক। তাহার ভিতরে গিয়া বদ্ধ হইলে নিজের ভারেই ত তাহা নামিয়া পড়িবে, তখন তাহা উঠাইবার ক্ষমতা হইবে কোথা হইতে? ওদিকে ওটী বহন করিবার বাসুকী যদি একা নারীই হন, তাহা হইলে আর সকলে তাহার ভিতর ঢুকিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার বিশেষ আরাম লাগিবার কথা নয়। আর বাসুকীর মস্তকের মত তার সহ্য-শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ নারী-মস্তকে যখন পাওয়া যায় নাই, তখন তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেও পারে এবং তাহার ফলে গৃহ কাদায় গড়াগড়ি যাইতে পারে। তারপর যাহার মাথা ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহারও একটা দিক আছে। একদিন সেও তাহা অম্লান বদনে ভাঙ্গিতে দিতে না চাহিতে পারে—বিশেষতঃ সে যদি দেখিতে পায়, তাহাকে ভার সহিতে দেখিলে নৃত্যের নিবৃত্তি হয় না, বরং তাহার সীমা পরীক্ষা করা অথবা অভঙ্গুর জিনিষের মত নির্দ্দয়ে ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তিই প্রবলতর হয়। কিম্বা মাথা ঠিক থাকিলেও তাণ্ডবের বলে মাথার উপর থাকা সত্ত্বেও গৃহখানি ভাঙ্গিয়া চুরমার হওয়াও সম্ভব!

বাস্তবিক গৃহ নারীর একা মাথায় করিয়া রাখার জিনিষ নয়। উহার ভার প্রকৃতপক্ষে বাড়ীর সকলেরই মাথায় আছে। কিন্তু উহা যে সকলেরই মাথায় করিয়া রাখিবারই জিনিষ, সে সম্বন্ধে কোন চৈতন্য এতদিন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া না জাগাতেই উহা অধিকাংশ স্থলেই কাৎ হইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে।

যুগধর্ম্মানুযায়ী গৃহধর্ম্মের শিক্ষা এখন বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। গৃহ আমাদের সকল রকম অসংযম চরিতার্থ করিবার ক্ষেত্র নয়। বাহিরে যদি সৌজন্য, সদ্ব্যবহারের আবশ্যকতা থাকে, গৃহে তাহা হইলে তাহার সহিত স্নেহ, প্রেম, শ্রদ্ধাও থাকা চাই। গৃহে আমরা বাহিরের সকল খোলস ছাড়িয়া "স্বরূপে অবস্থান" করিয়া থাকি এইখানে দৈনন্দিন জীবন-দর্পণে আমাদের যে রূপ প্রতিফলিত হইয়া উঠে, তাহাই ত আমাদের "স্বরূপ।" বাহিরের আড়ম্বরে অনেক সময় ভার বেশী করিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু গৃহের মানদণ্ডেই আমাদের প্রকৃত ওজন টের পাওয়া যায়। আর বাহিরের সঙ্গতির অতিরিক্ত মূল্যবান পরিচ্ছদে যেমন প্রকৃত অবস্থা ঢাকা থাকিতে পারে, কিন্তু আটপৌরে কাপড়েই আমাদের সত্য অবস্থা প্রকাশ পায়, বাহিরের ভদ্রতার মধ্যেও তেমনি আপনার প্রকৃত স্বভাবটী গোপন রাখা সহজ, কিন্তু গৃহের মধ্যকার ব্যবহারেই তাহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাও মনে রাখা উচিত, বাহিরের কাটাছাঁটা আরামের পরিপন্থী পরিচ্ছদ গৃহের উপযোগী না হইলেও নগ্নতাকেও আমরা গৃহে স্থান দিই না এবং আটপৌরে বেশের সহজ শোভনতা ও পরিচ্ছন্নতার উপর গৃহের সৌন্দর্য্য ও দেহের স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

গৃহকে "দুর্গ"কে করিয়া রাখাও অবশ্য ঠিক নয়। এবং তাহাতে গৌরব করিবারও কিছু নাই। এখন গণতন্ত্রের যুগ। আভিজাত্য-প্রাধান্যের সময়ের মত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুর্গ খাড়া করিয়া তাহার ভিতরের লোকদের বিশ্বজগৎ হইতে আটকাইয়া রাখা ও বিশ্বের প্রভাব তাহার ভিতরে ঢুকিতে না দেওয়া আর চলিতে পারে না। পালের গোদার ভাবও এখন হাস্যকর! গৃহের শ্রী, সম্পদ, মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে বটে, কিন্তু গৃহই যে আমাদের জন্য,—আমরা গৃহের জন্য নই,—ইহাও মনে রাখিতে হইবে। আর গৃহের প্রত্যেক অধিবাসীর মর্য্যাদা রক্ষিত হইলে

গৃহের মর্য্যাদাও আপনিই রক্ষিত হয়। গৃহ যেমন আমাদের সকল রকম অসংযম চরিতার্থ করিবার ক্ষেত্র নয় এবং তাহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আছে, বাহিরের জগতের ও আমাদের নিজের প্রতি কর্ত্তব্যেরও তেমনি তাহাতে স্থান থাকা চাই। অতিরিক্ত মাত্রায় গৃহের প্রতি মনোযোগেও গৃহত্ব বেশী রক্ষিত হয় না। তাহাতে যে তাহা করে সে গৃহকে এত বেশী গুরুতর করিয়া তোলে যে অপর সকলেরই তাহাতে স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মে। সর্ব্বদা অতিরিক্ত ঝাড়পোঁচ, ঘসামাজার জন্য শশব্যস্ত থাকিতে হইলে সে ঘর আরামের সহিত ব্যবহার করা যায় না। যে গৃহিণীর ঘরের মেঝে হইতে সিঁদুর পাড়িলে উঠানো যায়, তাহাতে বাস করা বাড়ীর লোকদের সব সময় বড় সুখকর হয় না। যাঁহার ঘরের চেয়ারখানি, বা টেবিলের জিনিষটী এতটুকু বাঁকা হইয়া থাকিবার যো নাই, তাঁহার সম্বন্ধেও উহা খাটে। তারপর রান্নাবান্না লইয়া সাধারণতঃ আমাদের সংসারে যে হাঙ্গামা লাগিয়া থাকে, তাহা দেখিলে "করতল-ভিক্ষা তরুতল-বাস" করিতেই প্রবৃত্তি হয়। ইহার উপর শুচিবায়ুগ্রস্ত হইলে ত সোনায় সোহাগা!

এদিকে ইহাতে বাড়ীর অপর সকলেও গৃহের সম্বন্ধে আপনাদের যে কোন কর্ত্তব্য আছে, তাহা মনেও না না করিয়া গৃহিণীর যত্ন, পরিশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া কেবলি দোষ, ত্রুটির অনুসন্ধান ও দাবী করিতে থাকেন। গৃহও যে একটী রাষ্ট্র এবং তাহা কলে চলে না, অথচ রাষ্ট্রের মত প্রয়োজনোপযোগী কর্ম্মীর ব্যবস্থা হইবার উপায় ইহাতে নাই,—আয়-অনুসারে কোন গতিকে তাহা চালাইতে হয়,—তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। তারপর রাষ্ট্রের মত ইহার কর্ম্মীদের উপর পরিচালকের কোন ক্ষমতা নাই এবং সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, দায়িত্বশূন্য, নির্ভরের অযোগ্য পরিশ্রম মাত্র ইহার অবলম্বন। অনেক স্থলে এবং অনেক সময়ে তাহাও জোটে না। একা গৃহিণীকেই সব্যসাচী হইতে হয়। তাহার উপর তাঁহারও শরীর, মনের স্বাস্থ্য সকল সময় সমান না থাকিতে পারে এবং নানারকম আকস্মিক ও সাময়িক বাধা-বিপদও ঘটিয়া থাকে। আর তাঁহারও ত শারীরিক, মানসিক শক্তি, প্রবৃত্তি প্রয়োজন অনুসারে অন্য সকল রকম কাজ ও আমোদ-আহ্লাদেরও প্রয়োজন আছে, সুতরাং তাঁহাকেই একা তাহার মধ্যে বদ্ধ করাও চলিতে পারে না। গৃহ সকলের মনোযোগের জিনিষ না হইলে এ সকল কোন বিষয়েই কাহারও সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সহানুভূতি জন্মিতে পারে না।

গৃহিণীদেরও মনে রাখা উচিত কেবল ঘরের খাটুনী লইয়া পড়িয়া থাকিলে পতিপুত্রকন্যাদের কাছে সম্মান, প্রতিপত্তি কিছুই রক্ষা পায় না। তাহারা তাহাতে প্রকৃতপক্ষে সুখীও হন্ না। তাহাতে কেবল তাঁহাদের স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং মনের দিকে ক্রমেই তাঁহাদের সহিত দূরত্ব আসিয়া পড়ে। অনেক গৃহিণী পতিপুত্রের জন্য প্রাণপাত করিয়া খাটিয়াও তাঁহাদের কাছ হইতে নির্ম্মম ঔদাসীন্য ভিন্ন কিছুই না পাইয়া একান্ত ক্ষুব্ধ থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, ভুক্তভোগী না হইলে কাহারও তস্য সহানুভূতি আসিতে পারে না। তিনি যে কত দুঃখে, কি ভাবে কি করেন, তাহা তাঁহারা কেমন করিয়া জানিবেন? অধিকন্তু তাঁহাকে এতটুকু অসন্তুষ্ট বা ম্লান দেখিলেই সকলের তাহা বিষম অপরাধ বলিয়াই মনে হয়। সমস্ত শরীর-মন পাত করিলেও মানুষের সহানুভূতি ওভাবে আকর্ষণ করা যায় না;—মরিলে তাহা আমাদের দেশের কবিদের পদ্যের ফোয়ারা ছুটাইবার উপকরণ যোগাইতে পারে। তাহা অপেক্ষা নিজের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইলে তাঁহারা নিজেরাও সুখী হইতে পারেন; শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফলে রোগব্যাধি, অসামর্থ্য, অকাল-বার্দ্ধক্য ইত্যাদিও ঘটিতে পারে। তাহাতে কাহারো সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। শেষে তাহার মধ্যেও সহানুভূতির অভাব ও অবজ্ঞা প্রবেশ করিয়া জঘন্যতার চরম হইতে পারে। মেয়ের আপনাদের ভালবাসার মাপে অন্যের নিকট তাহাই প্রত্যাশা করিতে যান। কিন্তু তাঁহাদের মত ভালবাসা তাঁহাদের দিবার কোন শিক্ষাও অন্য পক্ষে নাই আত্মরক্ষা সকলকে আপনিই করিয়া চলিতে হয়,—তাহার মধ্যে আবার রাষ্ট্রসমাজ-গৃহব্যবস্থা কিছুই তাঁহাদের দিকে চাহিয়া গঠিত নয় বলিয়া জীবনসংগ্রাম

তাঁহাদেরই কঠোরতর। ইহার এতই জটিল কৌশল যে যেভাবে তাঁহাদের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ ও কর্ত্তব্যের গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই অনুসারে চলিতে গেলেই তাঁহাদের অধিকতর প্রতারিত হইতে হয়। আর ভালবাসার ভেলা অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের এই ভবনদী পার হইবার ব্যবস্থা বটে,—কিন্তু সেই ভালবাসা তাঁহার ভাগ্যেই কম লাভ করিবার সম্ভাবনাও ঐ সকল ব্যবস্থার মধ্যেই আছে। কারণ তিনি যেমন ভাল বাসিয়া যাইবেন ও যাহাতে তাহা ভিন্ন তাঁহার কোন গতিও না থাকে, তাহার ব্যবস্থা পাকা আছে, অপরদিকে তাঁহাদের ভালবাসা অন্যপক্ষে হাসি-ঠাট্টার জিনিষ এবং তাহা আটকাইবারও তেমন কোন নিশ্চিত অবলম্বন (security) নাই।

এই সকল বুঝিয়া তাঁহাদের আপনাদের শারীরিক, মানসিক সকল দিকে আপনাদেরই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে শিক্ষা করা উচিত। আগে একরকম অশিক্ষিত বল দ্বারা তাঁহারা আপনাদের প্রতিপত্তি অনেকটা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার ভিত্তি দূষিত থাকায় তাহাতে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হইতে দেখিয়া এখনকার লোকে আর তাহা সহ্য করেন না। এখনকার শিক্ষিতারাও অবশ্য তাহার সাহায্য হইতে লজ্জা এবং ঘৃণা বোধও করেন। সুতরাং কালোপযোগী আত্মরক্ষা তাঁহাদের শিখিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসমাজব্যবস্থা ও সর্ব্বোপরি মানুষের মনের পরিবর্ত্তন না হয়, ততদিন তাহা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন থাকিবে।

ধনের সঞ্চয়ের মত শরীর-মনের সঞ্চয়ও আমাদের সময় থাকিতে করিতে হয়। বিশেষতঃ মনের সঞ্চয় না থাকিলে বয়সের সহিত শারীরিক শক্তির অনিবার্য্য হ্রাসে সম্বল কিছুই থাকে না। বয়সের সহিত শরীরকে বিশ্রাম দিয়া মনকে খাটাইবার দিকেই ক্রমে চেষ্টা হওয়া উচিত। অনেক শিক্ষিতাদেরও এ বিষয়ে শোচনীয় ঔদাসীন্য দেখা যায়। বিবাহের পর তাঁহারা সংসার ও সন্তানে এত বেশী ডুবিয়া যান, যে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কোন চিন্তাই আর মনে প্রবেশ করে না। কিন্তু ঐ সকলের দাবী শিথিল হইয়া আসিলে একদিন তাঁহাদের চৈতন্য হইতে পারে যে বিবাহের পর আর কোন শিক্ষাই তাঁহাদের হয় নাই,—বরং আগে যাহা হইয়াছিল তাহাতেও মরিচা ধরিয়া কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে; বর্ত্তমান জগতের সঙ্গেও তাঁহাদের কোন যোগ নাই;—তাহা তাঁহাদের বহুকাল পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিতাদের যদি এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে জীবনের বর্ষার দিনে অপরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সংসারের কাজ যখন বেশী থাকে না, তখনও তাহার পিছনেই ঘোরা ও তাহা লইয়াই হাঙ্গামা করা ছাড়া আর তাঁহাদের কিছুই করিবার থাকে না। আগে এই সময়ে অনেকে পুত্রবধূ নাতি-নাতিনী ইত্যাদি পরিবৃত হইয়া তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া একরকম সুখ-সম্মানেই থাকিতেন বটে, কিন্তু সে অবস্থার ক্রমেই পরিবর্ত্তন হইতেছে। তাহা হওয়া বিশেষ প্রয়োজনও হইয়াছে। তাঁহাদের শিক্ষা ও অবস্থার জন্য বিশেষ দোষ দেওয়া না গেলেও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার তাঁহারা অল্প স্থলেই করিতে পারিয়াছেন। নবযুগের নবীনদের আর তাঁহাদের হাতে পড়িতে দেওয়া হইবে না। চাপে থাকা ও চাপে রাখা দুইই ছাড়িয়া আপনার শক্তি, প্রকৃতি, প্রয়োজনানুসারে চলিবার স্বাধীনতাই সকলের থাকা আবশ্যক।

আপনার অবলম্বন আপনারই ঠিক রাখিতে হইবে। তাহার উপর প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা সম্মান যদি পাওয়া যায়, সৌভাগ্য। মেয়েদের মানুষ হইতে দিবার ইহাও একটী যুক্তি বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমানে যখন পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়িভাবে সম্মান, প্রতিপত্তি লাভের সম্ভাবনা তাঁহাদের নাই, তখন আপনাদেরও মানুষ না হইতে দিলে তাঁহারা করিবেন কি? জীবন-সায়াহ্নেই বা তাঁহাদের দশা কি হইবে? যাঁহারা মেয়েদের জ্ঞানকর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণের নামমাত্রে মাতৃত্ব ও গৃহকর্ম্মের নাম জপ করিতে থাকেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, অনুকূল শিক্ষা, সুবিধা লাভ করিলে ঐ সকল করিয়াও তাঁহারা পরে জীবনের পরিপক্ক অভিজ্ঞতা লইয়া জগতের সকল জ্ঞানকর্ম্মযজ্ঞেই যোগদান করিতে পারেন, এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন মন্ত্রই খাটে না।

গৃহে হাঙ্গামার সৃষ্টি ও বধূপীড়ন ব্যতীত ব্রতপূজা, গুরুপুরোহিতপোষণ, তীর্থদর্শনও আগে ঐ সময়ে তাহাদের দখল ছিল (ইহাতেও অবশ্য অর্থব্যয় ও হাঙ্গামা কম নাই)—এখন তাহারও অনুকূল অবস্থা নাই;—আদর্শেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং হওয়া বিশেষ আবশ্যকও হইয়াছে। সুতরাং যুগধর্ম্মানুযায়ী ব্রত, পূজা, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি করিবার উপযুক্ত শিক্ষা, সামর্থ্য লাভ করিবার সুযোগ তাঁহাদের দিতে হইবে। সেদিন কাগজে দেখা গেল, কোন মহিলা পতিপূজার সহিত মূর্ত্তিপূজার তুলনা করিয়া তাহার গৌরব ও গূঢ়ার্থ দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যাঁহাদের সমঝাইতে ঐ তুলনাটীর অবতারণা, তাঁহাদের কাছে উহা কোনই কাজে আসিবে না! কারণ সকল রকম অন্ধপূজাই তাঁহারা ত্যাগ করিতে চাহেন।

বঙ্গনারী।

রিক্তা

২১

পরদিন সবিতার যাওয়ার দিন। রাত্রে শুক্ল পক্ষের আকাশে পুরু মেঘের আবরণ পড়িয়া পাণ্ডুর চাঁদের আলোকে ঘোলাটে করিয়া দিল!

দীর্ঘ বিরহাকুল চাপা কান্নার মত বাতাসের হা-হা শব্দ বন্ধ ঘরের ভিতর হইতেও শুনা যাইতেছিল। দক্ষিণের বারান্দায় সাজানো টবের পুষ্পিত গাছগুলির ডাল-পালা পবন-বেগে সার্শির উপর আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল।

সেদিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই গাঢ় স্তব্ধতা দেশ জুড়িয়া ব্যাপিয়া ছিল। মানুষের কল-কোলাহল একেবারেই চুপ। প্রত্যেকেই ঘরের কোণ আশ্রয় করিয়া ঝড়-জলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিল। অনেকক্ষণ বন্ধ ঘরের ভিতর থাকিয়া সবিতা হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল, উঠিয়া জান্‌লা খুলিবামাত্র এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসশুদ্ধ জলের ছাট আসিয়া তার মাথার সামনের চুলগুলিকে ভিজাইয়া দিল। সে দু পা পিছাইয়া, পরে আবার জানালা বন্ধ করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তার মনে পড়িল, এ ঘরে আর ঠাণ্ডা লাগিবে কার? পুলক তো নাই,—তবে জান্‌লা বন্ধ করিবার কি এত দরকার? থাক না খোলা! ঘরে একটু জল আসিবে, তাতে আর এমন কি ক্ষতি!

জান্‌লাটা খোলাই রহিল। সে ঘরের মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল, ভাবিতে লাগিল, এইখানে এতকাল বাস করিয়া সে আবার যখন মায়ের কাছে ফিরিবে, তখন তাঁর উচ্ছ্বসিত অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিয়াও নিজের এই দুর্ভাগ্যকে কেমন করিয়া সে ঢাকিতে পারিবে? যদি তা না পারে, তবে মাকে কি আঘাতই না দিবে! তার মায়ের তেজস্বী স্বভাব সে জানিত। আঘাত খাইয়া তিনি আরো কঠিন হইয়াই উঠিবেন হয় তো!

কমলা রংয়ের একখানা র‍্যাপারে মাথাশুদ্ধ ঢাকিয়া অরুণ আসিয়া বলিল,—ও কি! এমন সময়ে শুয়ে যে! অসুখ করেছে নাকি?

সবিতা উঠিয়া বসিল, বলিল,—না, অসুখ করবে কেন?

—না করলেই ভাল,—এর ওপর আবার এই ঠাণ্ডায় জান্‌লা খোলা,—দেখো, নিউমোনিয়ায় ধরবে!

—নিউমোনিয়া আমার কিছুই করতে পারবে না।

—তোমার কিছু করতে না পারুক,—আচ্ছা, থাক্ সে কথা। তোমার কাছে কি একটু ইউকালিপ্‌টাস্ পেতে পারি? আছে ঘরে?

—আছে। কেন, সর্দ্দি হয়েছে নাকি?

—সেই রকম মনে হচ্চে,—একখানা রুমালে একটু ইউকালিপ্‌টাস্ দিয়ে দাও তো আমাকে, আমি পালাই। তোমার এই ঠাণ্ডায় থেকে আমাকে শুদ্ধ বরফ হয়ে যেতে হবে নইলে,—উঃ! কি করে তুমি আছ!

সবিতা উঠিয়া আগে জানলা বন্ধ করিল। তারপর

আলমারি খুলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—রুমাল! তোমার রুমাল আছে সঙ্গে?

অরুণ পকেটে হাত দিয়া বলিল—নেই তো! তোমার যদি রুমাল থাকে, আপতেতঃ তাই একখানা ধার দাও।

অরুণ হাসিতেছিল, সবিতা যেন সেদিকে চোখ দেয় নাই, এইভাবে বলিল,—আমার রুমাল? হ্যাঁ, আছে,—দাঁড়াও, দিচ্চি। তারপর বলিল,—জান্‌লাটা বন্ধ করলে যে বড়?

সবিতা রুমালে ইউকালিপটাস্ দিতে দিতে বলিল,—তোমার ঠাণ্ডা লাগ্‌ছিল, তাই। এই নাও রুমাল।

রুমালটা নাকের কাছে ধরিয়া অরুণ বলিল,—তোমার কি কালই যাওয়া তাহলে ঠিক্, কেমন?

—হ্যাঁ।

—সন্ধ্যা বেলা তো?

—হ্যাঁ।··· কেন, এত খবরে তোমার কি দরকার?

—কিছুই না। আমার কি দরকার, আবার! এমনি বলছি।

—ওই এম্‌নির কি তোমার কোনো একটা মানে নেই?

—না। মানে আবার কি থাকবে? অত ব্যাকরণ অভিধান সঙ্গে করে আমি কথা বলি নে!

রুমালটা নাকের কাছে রাখিয়া আঘ্রাণ নিতে নিতে অরুণ চলিয়া গেল; সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতেই গেল। এই ঝড়-বাদলের রাতে তার এই দুর্ব্বলতা টুকু কেহ দেখিতে পাইল না তো! নিজের মনের উপর নিজের চোখ-রাঙানিই সে সবিতার কাছেও খানিকটা উগারিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু লজ্জাটা বেশী করিয়া বুঝিল ফিরিবার সময়।

সবিতা আবার সেই মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। অকারণ ব্যথায় তার দুই চক্ষের জলধারা হাতের ফাঁক দিয়া ঝরিতে লাগিল। বুকের ভিতর যে বাঁধন সে বাঁধিয়াছিল, সেও তো রক্তবহ শিরা দিয়াই! চঞ্চল রক্তস্রোতে বুঝি তাই সকল বাঁধনই এলোমেলো হইয়া খুলিয়া গিয়াছিল! যেখানে এতটুকু মনের যোগ নাই, অযোগ্যা, উপেক্ষিতা যে, সেইখানে এই রকম দয়া দেখানোকে কি বলা যায়? শুধুই দয়া? যার দুঃখে সহানুভূতি নাই, তার উপর আবার দয়াই বা কি! তবে ক্ষণিকের খেলা? তা হইতে পারে। সবিতার চোখ মুখ আগুন হইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! সে যে সব হারাইতে বসিয়াও মনের বলটুকু ভরসা করিয়াছিল। ওই সর্ব্বহারী দুর্গ্রহ! তুমি তাও কি হরণ করিয়া লইতে চাও? সে তো খেল্‌না নয়!

খোলা চুলগুলি হাতে জড়াইয়া বাঁধিয়া মাথায় কাপড় দিয়া সবিতা আলোর কাছে গিয়া বসিল। চোখ মুছিয়া দুর্ব্বলতার লজ্জা তখন সে মুছিয়া ফেলিয়াছে। বাড়ীর সকলকার খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া বাড়ী নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল তারই তন্দ্রাহীন চক্ষে ঘুম নাই।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া এই কথাটা মনে হইতেই সে আলোর দম খুব কমাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। শীঘ্র শীঘ্র ঘুম আসিবে বলিয়া ঘর অন্ধকার করিলেও ঘুমের বদলে হু-হু করিয়া ভাবনার স্রোত আসিয়া তাকে পীড়িত করিয়া তুলিল!

পরদিন কাজে-কর্ম্মে বেলা দুই প্রহর অবধি কাটিল। অরুণের দেখা নাই। সে কোন্ এক ফাঁকে আসিয়া খাইয়া গিয়াছে, সে কথা সবিতা চাকরদের মুখে শুনিল। কোথায় গিয়াছে, তা তারা জানে না।

আশা যে একা কি করিয়া থাকিবে, তাই ভাবিয়া সবিতার পাশে পাশে ঘুরিতেছিল, আর ওই এক কথাই সে বার বার বলিতেছিল,—আমি একা কি করে থাকবো দিদি?

সবিতা সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—যেমন করে আমি থাকি, তেমনি করে তুমিও থাক্‌বে,—কদিনই বা!

শুভেন্দু বলিল,—মনে থাকে যেন কথাটা! কাশী গিয়ে আবার সব ভুলে যেয়োনা যেন বৌদি!

—যদিই যাই, তোমরা খোঁচা দিয়ে দিয়ে মনে করিয়ে দিয়ো, তা পারবে তো?

—তাও তো বটে! বলিয়া শুভেন্দু কুণ্ঠিতভাবে মুখ নামাইল।

সবিতা নিজেই আবার হাসিয়া বলিল,—না, না, আমায় ও সব খোঁচা দেওয়ার দরকার হবে না। আমি আপনিই

আস্‌বো,—যাই হোক্‌, এখন দেখছি যে আমিও একজন দরকারী মানুষ হয়ে পড়েছি।

—ও,—তা এতকাল পরে বুঝি বুঝ্‌লেন? যখন পুলক আমাদের কাছে ছিল, তখন তা বোঝেন নি? আচ্ছা বৌদি,—প্রভাত বাবুর কি কৃতজ্ঞতা! একখানা চিঠির জবাব দিয়ে পুলকের খবর জানাতেও তিনি পারেন না! এই-সব নবাবী দেখেই তো দাদা রাগ করে! না দিলেই হত পুলককে ছেড়ে!

—না দিয়ে আর কি হত? তাঁদের ছেলে সে, তাঁদেরই তো জোর!

—জোর! বেশ হতো,—নালিশ করে নিতেন আর কি!

—তাহলে লোকে আমাদেরই পাগল বলতো! নাই দিলেন চিঠি-পত্র, পুলক ভাল থাকলেই হল! তবে চিঠি পেলে আমাকে জানিয়ো, আমিও ভাবনায় থাক্‌বো তো!

—আচ্ছা ধরো, চিঠিপত্র না এসে যদি একেবারে পুলকই এসে পড়ে, তবে কি করা যাবে, তাই বল তো?

সবিতা হাসিল।—অত আকাশকুসুম নাই বা করলে! আমি পুলককে চাইনে, খবর পেলেই ঢের!

—আর যদিই পুলক আসে তো তাকে যে নিয়ে আস্‌বে তারি সঙ্গে তাকে ফিরিয়ে দিয়ো, বলো, এখানে তার মা বা দিদিমা কেউ নেই, কে তাকে দেখবে শুনবে?

—তা পারলে তো ঠিকই হয়! তাদের কথার উত্তর দেওয়ার সুবিধে হয়—

সবিতা বলিল,—তোমার কল্পনা যদি কখনো সত্য হয় তো তাই করো,—এই কথা ঠিক হয়ে রইল।

—আচ্ছা, আমি না থেকে বাড়ীতে যদি তোমরাই থাকো, তাহলে কি করো বল তো বৌদি! সত্যি কথা বলো কিন্তু!

সবিতা একটু ভাবিল, তারপর বলিল,—কি জানি, কি করি,—আগে থেকে কিছু বলা যায় না। কিন্তু পুলকের কি দোষ?

শুভেন্দু হাসিয়া উঠিল, বলিল,—ব্যস্‌! পুলকের কোনো দোষ নেই বললেই তো সব গোলমাল মিটে যায়!

—গোলমাল থাকার চেয়ে কি মিটে যাওয়াই ভাল নয়? তা যে রকম গোলমাল হোক না কেন! আমার ও-সব ভাল লাগে না,—চিরকাল আমি গোলমালকে ভয় করি।

—থাক্‌,—আমার আকাশকুসুম তাহলে শুকিয়েই গেল তো! তাহলে কি কাজ-কর্ম্ম আছে, তা আজকের মত সেরে নাও, সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে তো!

সন্ধ্যা আগাইয়া আসিতেছে শুনিয়াই সবিতা তার দাদা মশায়কে কিছু জল খাওয়াইবার ব্যবস্থায় গেল। কেন না, তিনি সন্ধ্যার সময়ে সন্ধ্যা-বন্দনাদিতে বসিবেন, তারপরই ট্রেনের সময়! তখন আর অন্য কাজের অবসর থাকিবে না,—তিনি আবার ট্রেনে বসিয়া জলস্পর্শও করিবেন না।

কিন্তু তার দাদামশায় জানাইলেন যে, তাঁর দেশের লোকেরাই তাঁকে খাওয়াইয়া দিয়াছে, তিনি আর কিছু খাইবেন না, কেবল সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া লইবেন মাত্র।

সবিতা আসন পাতিয়া জায়গা করিয়া দিল, তিনি সন্ধ্যা করিতে বসিলেন।

সবিতা এই অবসরে একবার স্বামীর কাছে একটু বিদায় লইয়া আসিবার জন্য তাঁর সন্ধান করিল। নীচে, বাহিরে কোথাও তাঁর সাড়া পাওয়া গেল না। একবার সে ভাবিল, তবে কি তিনি এখনো ফেরেন নাই?

উপরে প্রকাণ্ড ছাদের ওপারের তেতলার নূতন ঘরটীতে অরুণই ইদানীং শুইত। ঘরখানি একে নূতন তৈরী তার উপর তার অধিকারী অরুণ যথাসাধ্য যত্নে সে ঘরখানি সাজাইয়াছিল। বাগানের ফুলগাছগুলির মধ্যে যেটিকে অরুণের ভাল লাগিত, সম্ভব হইলে সে সেইটীকেই টবে করিয়া তেতলায় তুলিয়া লইয়া যাইত। একটা-আধটা করিয়া ক্রমে অনেকগুলি টব জড়ো হইয়া তার ঘরখানি তোলা বাগানে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সকল গাছেই কিছু ফুল ফোটে নাই, কোনো কোনো গাছের শুষ্ক কঙ্কালও টবের বুকে খাড়া হইয়া আছে।

সবিতা ধীরপদে গিয়া ছাতের উপর দাঁড়াইয়া দেখিল, নীল-পীত সার্শি ভেদ করিয়া অপরাহ্ণের অন্তিম আলো অরুণের খাটের বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রথমটা সে সেখানে অরুণকে দেখিতে পাইল না; তারপর দেখিল, হাঁ, খাটেরই উপর শুইয়া অরুণ একখানা মোটা বই পড়িতেছে। দূর হইতে এইটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

যখন সবিতা স্বামীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, তখন বেশ সহজ মনেই আসিয়াছিল। কোন জটিল সংশয়ের লেশমাত্রও তার মনে উদয় হয় নাই, অকারণ দীনতা বা ম্লানতা তার মনকে নরম করে নাই।

কিন্তু দূর হইতে ঘরখানাকে দেখিয়াই তার মনের এই একটু ভদ্রতা ও কোমলতাই যেন অসহ্য কাঙ্গালপনা বলিয়া তার মনে হইল। সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিল।

ফিরিতে ফিরিতেও তার মনে হইতেছিল, বুঝি স্বামীর কৌতুকফুল্ল দৃষ্টির বাণ তার পিঠ ভেদিয়া বুকে আসিয়া বিঁধিতেছে! কোনো রকমে চোখ-কাণ বুজিয়া তেতলা ছাড়িয়া একতলার দালানে আসিয়া সে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল!

যাত্রার সময় সবিতার দাদামশায় একবার অরুণের খোঁজ করিলেন। জগৎবাবু বলিলেন,—গুপী, অরুণকে ডেকে নিয়ে আয়—

গুপী ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—তিনি বেড়াতে গিয়েছেন, বাড়ীর কোনখানেই নেই।

—তেতলায় দেখেছিস্? নেই?

—দেখেছি, নেই। এইমাত্র তিনি বেরিয়ে গেছেন।

সবিতার দাদামশায় একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু তবু তিনি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেছিলেন সবিতাকে দেখিয়া। সবিতা যে পরম সুখী হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আর তাঁর তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। আর আর পাঁচজন পাড়া-প্রতিবাসীর মুখে যেরকম অপ্রিয় রটনা তাঁরা শুনিয়াছিলেন, সে সব একেবারেই মিথ্যা গুজব মনে হইল।

বাড়ীশুদ্ধ সকলকার ছলছল দৃষ্টির মাঝে বিদায় লইয়া সবিতা যখন ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন লোকারণ্য ষ্টেশনে আলো জ্বালা হইয়াছে। স্বল্প দিবালোকে আর কাজ চলে না।

ষ্টেশনের দিকের জান্‌লা বন্ধ করিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া সে দেখিল, খানিকটা শুষ্ক খড়ের স্তূপ, তার পাশে একটা কুকুর কোন্ মরা জন্তুর হাড় আনিয়া চিবাইবার চেষ্টা করিতেছে! একটু দূরে, জীর্ণ একটা খড়ের ঘরের মাথায় কয়েকটী দেশী কুমড়া শুকাইয়া আছে। আর এই ঘরের পূর্ব্বদিকেই প্রকাণ্ড স্বর্ণ গোলকের মত পূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছে।

জান্‌লার উপর হাত দিয়া সে এই সব দেখিতেছিল, সহসা হাতের উপর অন্য হাতের স্পর্শে চমকিয়া চোখ ফিরাইয়া সে দেখিল, অরুণ! আশ্চর্য্যভাবে বলিল,—তুমি!

—হ্যাঁ, অবাক্ হয়ে গেলে নাকি? এই দিকে বেড়াতে বেড়াতে এসেছিলুম, তাই ভাবলুম, একটু দেখাও করে যাই,—বাড়ীতে তো আজ আর দেখা হয়নি!

সবিতার মুখে আসিল যে বলে, তোমার এই দয়ায় কৃতার্থ হইলাম, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া বলিল,—দাদামশায় তোমার খোঁজ করেছিলেন। তুমি বাড়ী ছিলে না!

অরুণ একটু হাসিয়া নরম গলায় বলিল,—আচ্ছা, তুমিই বলতো,—ওই বাড়ীতে কি থাকা যায়? মা অবধি আর এখন নেই যে, দুটো কথা বলব! শুধু চুপচাপ্—

তখনো সেই জানলার উপর সবিতার হাতের উপর অরুণের সবল হাতখানা চাপিয়া ছিল। সবিতা অন্য কথা না বলিয়া আগে হাতখানা টানিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অরুণের নিশ্চেষ্ট হাত সরাইতে পারিল না!

অরুণও তা বুঝিল, কিন্তু সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপও নাই এমনি ভাবে বলিল,—ভাল কথা, আমার যে সেই একটা কথা আছে বলবার, বে না?

—এখানে? এখন? আচ্ছা, বল। শুন্‌ছি,—কিন্তু,—

সবিতা জোর দিয়া হাত সরাইতে গেল। তার ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া অরুণ একটু হাসিল।

এ কি অস্বাভাবিক মাতালের মত হাসি! সবিতার আরক্ত মুখ ও কপাল ঘামিয়া উঠিল।

ষ্টেশনের সুমুখ দুয়ার দিয়া সবিতার দাদামশায় গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে অরুণকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিলেন,—এই

যে! বড় সুখী হলুম ভাই, বড় সুখী হলুম, আমি ভাবছিলুম যে, আসবার সময় বুঝি আর দেখাটা দিলেই না!

ঝাঁ করিয়া সবিতার হাতের উপর হইতে নিজের হাত টানিয়া লইয়া অরুণ কোনো রকমে তাঁকে একটা প্রণাম করিয়া সুমুখের দুয়ার দিয়াই নামিয়া পড়িল। সেদিকে আবার স্বয়ং কর্ত্তা দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু তিনি কিছুই বলিলেন না।

অরুণ এক দিকে সরিয়া পড়িল। সবিতাও আর তার লজ্জাভিভূত চোখ তুলিয়া কোনো দিকেই চাহিতে পারিল না।

২২

পুণ্যতীর্থ কাশীধামের একটী গলির মধ্যে ছোট দোতলা একখানি বাড়ীতে সবিতার দাদামশায় থাকিতেন। এ বাড়ীর যিনি মালিক, তিনি বহুকাল বিদেশ-বাসী, তাই বাড়ীখানি ভাড়া দেওয়া থাকে। বাড়ীখানির আশেপাশে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা থাকায় যদিও বাড়ীটী নিতান্ত গলির মধ্যে তবু তত বেশী অন্ধকার বা স্যাঁতা নয়!

খোলা জমিটুকু এককালে সুদৃশ্য উদ্যান ছিল বোধ হয়, বর্ত্তমানে ঘাস-বন হইয়া আছে। তবু কচিৎ কখনো কখনো শুষ্কপ্রায় ঝাড়েও দু-একটা জুঁই, মল্লিকা বা গন্ধরাজ, করবী ফুটিয়া গাছ আলো করিয়া থাকে! উঠানের ঠিক মাঝখানে একটা অতি-প্রাচীন আধখানা-ভাঙ্গা বেলগাছ হেলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সবিতা তার মাকে বই পড়িয়া শুনাইতেছিল। তিনি একখানি আসনে বসিয়া দেওয়ালে হেলিয়া একাগ্র মনে তাই শুনিতেছিলেন; এক-আধবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাঠিকার মনের কথাও পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

কিন্তু সতর্ক পাঠিকা ঠিক সেইক্ষণেই পড়া বন্ধ করিয়া বলিল,—তুমি শুনছো না, বুঝি মা?

—শুনছি বইকি। তুই পড়্—

—ছাই শুনছো,—আমার মুখপানে চেয়ে আছ কেন তবে?

মা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, —আচ্ছা, আর চাইব না, তুই পড়্ এবার!

সবিতা আবার পড়িয়া চলিল, কিন্তু আবার মাঝখানে বাধা দিয়া মা বলিলেন,—তোর শ্বশুরের সেই চিঠিখানার জবাব দিয়েছিস্ রে? দিস্নি বুঝি?

—দিয়েছি তো! এই তো সেদিন জবাব দিলুম,—কেন?

—না, এমনি বলছিলুম! তুই পড়্,—

—এমন করে কি পড়া হয় কখনো? দু-ছত্র পড়া না হতেই আবার তুমি কথা পেড়ে বস্‌বে তো! পড়া শেষ হবে কি করে? কি বলবার আছে, মনে করে তাই বল এখন—

মায়ের মনের একটা খট্‌কা তখনো ভাঙ্গে নাই। তিন মাস সবিতা কাশীতে আসিয়াছে, কিন্তু কই অরুণের চিঠি তো একখানিও আসিল না! কেন, স্ত্রীর খবর লইবার ইচ্ছা তার কেন হইল না? সবিতাও তো কই কোনো কথাতে ভুলক্রমেও স্বামীর এতটুকু নাম করে না!.. কেন? সে কথা তুলিতে গেলেই সে আর পাঁচ কথা দিয়া চাপা দিয়া ফেলে, জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করে কেন?

সবিতা বই মুড়িয়া ফেলিল। বলিল,—মা, বেলা তো গেল! দাদামশায় ফিরলেন না তো! রাত্রে কি খাবেন, কিছু বলে গিয়েছেন কি?

মা হাসিয়া বলিলেন,—তার জন্যে তোমার এত ভাবনা কেন? আমি তো আছি,—তুমি আমাদের দুদণ্ডের অতিথি বই তো নও!

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আমার অভ্যাস হয়ে গেছে মা,—মনে হয় দায়-দোষ সব আমারই হবে নইলে—

—এখানে আর সে ভয় কর কেন?

বাস্তবিকই সবিতার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রত্যেক ব্যবস্থা তার করায়ত্ত ছিল। সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সুবন্দোবস্ত করিতেই তার দিন কাটিত। তাই এখানে দায়িত্বহীন দিনগুলি যেন দীর্ঘ হইতেও দীর্ঘতর হইয়া উঠিয়াছে!

বই তুলিয়া রাখিবার জন্য সবিতা উপরে গেল। বইখানি রাখিয়া, ছোট-খাট দু-একটা কাজ সারিয়া আসিয়া

দেখিল, মা তাঁর তসরের চাদরখানি গায়ে জড়াইলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল,—মা কোথাও যাবে নাকি?

মা বলিলেন,—হ্যাঁ,—কাছেই একজনদের বাড়ী যাব, তাঁদের বৌ এসেছে, তার নাকি ভারী ব্যারাম। যাই, একটু দেখে আসি। আমাদের ওঁরা অনেক উপকার করেছেন। বাবা আর আমি দু' জনেই যখন রোগে পড়ি, তখন তো ওঁরাই আমাদের যত্ন করে বাঁচিয়ে ছিলেন।

—আমাকেও নিয়ে চল না মা, আমিও একটু দেখে আসি।

—বাবাকে না বলে তোকে নিয়ে যাবো? যদি রাগ করেন?

—না, তা কেন? তুমি একটু দাঁড়াও, আমি তাঁকে বলে আসি! তিনি তো ফিরেচেন, দেখলুম।

সবিতার দাদামশায় উপরকার ঘরে বসিয়াছিলেন। সমুখে একখানা প্রকাণ্ড আকারের ভারি বই; একখানা পুরানো অভিধানের পাতা খোলা,—তিনি নিবিষ্ট মনে বই গুলির মাঝেই ডুবিয়াছিলেন দেখিয়া সবিতা তাঁকে ত্যক্ত করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল।

হঠাৎ তাঁর পেন্‌সিলের দরকার পড়ায় তিনি মুখ তুলিতে সবিতার উপর তাঁর চোখ পড়িল। বলিলেন,—ওই যে বাক্সটার ওপরে আমার পেন্‌সিল আছে, দাও তো দিদি!

সবিতা পেন্‌সিলটা তাঁর হাতে দিয়া বলিল,—আমারো একটা কথা আছে দাদামশায়,—মায়ের সঙ্গে আমি একটু বেড়াতে যেতে চাই, যাবো?

—বেড়াতে যাবে? কোথায়?

—তাতো জানিনে। মা বলিলেন, যাঁরা আপনাদের ব্যারামের সময়ে যত্ন করেছিলেন, তাঁদেরই বাড়ীতে।

—ওঃ! ভোলানাথ বাবুর বাড়ী! আচ্ছা, যাও।

সবিতা আসিয়া বলিল,—চল মা, দাদামশায় হুকুম দিয়েছেন।

—তুইও যাবি?

—দাদামশায় তো বললেন, তবে কেন যাবো না?

—তা বলে এই বেশে যাবি? যা, কাপড়টা ছেড়ে আয় তবে। শীগ্‌গির যা, আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

—আমার কাপড় ছাড়তে হবে! বলিয়া সবিতা কাপড় ছাড়িতে ঘরে ঢুকিল। একখানা ধোওয়া ফর্শা কাপড় পরিয়া সে মায়ের সঙ্গে চলিল।

মা একটু হাসিলেন, বলিলেন,—কাপড়-চোপড়ের পছন্দ দেখ্‌ছি একটুও বদ্‌লায়নি!

সবিতা বুঝিল যে, তার প্রসাধনটা মায়ের তেমন মনে লাগে নাই। সে বলিল,—আর বদ্‌লে কাজ নেই, তুমি চল এখন, দেখে আসি তাদের সেই বৌটীকে।

বাড়ীর ঠিক সুমুখের গলিটা পার হইয়াই সেই বাড়ী। বাহিরের বারান্দায় একটী আট দশ মাসের খোকা রবারের পুতুল হাতে করিয়া ঝীয়ের কাছে খেলা করিতেছিল।

খোকাটীকে কোলে করিয়া সবিতা বাড়ীতে ঢুকিল। খোকা কাঁদিল না, অবাক হইয়া সবিতার মুখ-পানে দেখিতেছিল।

বাড়ীতে ঢুকিয়া সে দেখিল, বড় একটী ঘরের ভিতর শুইয়া তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদের মত একটী সুন্দরী, এ পাশ ও পাশ করিতেছে। কাছে দাঁড়াইয়া একজন বয়স্কা সধবা মহিলা তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন।

সবিতাদের দেখিয়া তিনি তাদের আদর করিয়া ডাকিয়া বসাইলেন। শয্যাগতা সুন্দরী স্থির হইয়া চাহিয়া রহিলেন, অচেনা বলিয়া তাদের সামনে আর তার কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

সবিতা সেই রুগ্নার কাছে বসিয়া মেয়েটীর সঙ্গে দুই চারিটী কথায় আলাপ করিয়া জানিল যে এটী তার শ্বশুর-বাড়ী,—আর ওই বয়স্কা মহিলাটী তার শাশুড়ী। দারজিলিঙে থাকিতেই তার জ্বর হইয়া শরীর খারাপ হওয়াতে আবার এখানে আসিয়াছে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য। সবিতা বলিল,—তোমরাও দারজিলিঙে ছিলে? আমরাও তো ছিলুম এতদিন! সেখানে থাকতে তো এই সুন্দর মুখখানি দেখি নি কোনো দিন!

বউটী লজ্জিত হইয়া বলিল,—হ্যাঁ, ভারি তো সুন্দর মুখখানা!

সবিতা তার হাত দুখানি টিপিয়া দিয়া বলিল,—না, সত্যিই সুন্দর! তবে আমার দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে সুস্থ

অবস্থায় দেখলুম না। কতদিনে তুমি সুস্থ হয়ে বেড়াতে পারবে বলতে পারো?

—কতদিনে? আমার মনে হয়, কটকে গেলেই আমি সেরে যাবো। বাপের বাড়ী না হলে কখনো অসুখ সারে বুঝি?

—কটকে বুঝি বাপের বাড়ী! কটকে তো দেখ্‌ছি সুন্দরী আছে অনেক!

—গিয়েছিলেন কখনো কটকে?

—না, যাই নি। কটকে আমার মামাশ্বশুর থাকেন, মামাতো দেওর কনকের কাছে কটকের কথা কিছু কিছু শুনেছি।

—কনক? কালিপদ বাবুর ছেলে নাকি? আমার দাদার শ্বশুর হন তিনি—

—হ্যাঁ,—তিনিই আমার মামাশ্বশুর হন।

বউটীর মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিল। শয্যাগতা, কঙ্কাল-সার রুগ্না, তবু সে মুখে অপরিমিত লাবণ্যরাশি। দেখিলে চোখ ফেরে না। রক্ত প্রায় শূন্য হইয়া শরীর পাথরের মত সাদা হইয়া গিয়াছে, তবু এখনো এত সৌন্দর্য্য আছে, এমন মধু-মাখা হাসি আছে যে, সবিতা মুগ্ধ চোখে দেখিতেছিল। বৌটী বলিল,—তা হলে একটা কুটুম্ব-সম্পর্ক বের হল,—এ বিদেশে যেটুকু লাভ! আমি তো রুগী আছিই,—তাতে আবার বৌ মানুষ,—কিন্তু আলাপ হলো যখন, তখন আমি না যেতে পারলেও মাঝে মাঝে আসতে হবে!

—তা যে ক'দিন আছি, আসবো,—আমিও তো একা মানুষ বললেই হয়। আচ্ছা,—তোমাকে কি বলে ডাক্‌বো বল তো?

—আমি তোমার চেয়ে ছোট হব, না, বড় হব—তাই বল আগে!

সবিতা হাসিল, বলিল,—তা তোমার নামটী যদি আমার মিষ্টি লাগে, তাহলে বড় হলেও আমি তোমার নাম ধরে ডাকবো।

—তা হলে জ্যোতি বলে ডেকো। আমার নাম জ্যোতির্ম্ময়ী।

সবিতা নিমেষমাত্র একটু চমকিল,—পরক্ষণেই বলিল, —চমৎকার নামটী! এমন সুন্দর নাম থাকতে আবার অন্য কিছু বলে ডাকতে ইচ্ছে করে কারুর?

—আর আমি? আমি তোমাকে কি বলে ডাকবো ভাই?—আমার বৌদিদির তুমি পিস্‌তুতো ভাজ হও,—তা হলে—তা হলে—

সম্বন্ধটার জের চালাইয়া জ্যোতি একটা মীমাংসা করিতে গেল, কিন্তু অপারক হইয়া দুইজনেই হাসিয়া ফেলিল। সবিতা হাসিতে হাসিতে বলিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, খুব হয়েছে! তাহলে—তাহলে না করে তুমিও আমাকে সোজাসুজি নাম ধরেই ডেকো।

সজোরে ঘাড়া মাথা নাড়িয়া জ্যোতি বলিল—না,—সে আমার সুবিধে হয় না. আমি তো ভাল উঠ্‌তে পারিনে, নইলে দেখিয়ে দিতুম যে আমি তোমার চেয়ে কত বেঁটে কত ছোট্ট আছি! বয়সে বড় হতে যাব কেন?

—তবু তো খোকার মা!

—ও,—তা সত্যি। কিন্তু কই, খোকা কোথায় গেল ভাই? তোমারই কোলে ছিল যে! আমার ব্যারামের জন্যে ওটাও কত কষ্ট পাচ্ছে,—দিন-রাত খালি কাঁদে! একেই তো ওর কাঁদুনে স্বভাব, তাতে আমি পড়ে আছি।

সবিতা বলিল,—তোমার শাশুড়ী তাকে দুধ খাওয়াতে নিয়ে গেলেন।

—ওমা! তবেই হয়েছে! তাঁকে জ্বালিয়ে মারবে! ঝীই ওকে ভাল করে ভুলিয়ে দুধ খাওয়াতে পারে,—মায়ের কতকালের অনভ্যাস, উনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, তবু সাধ করে দুধ খাওয়াবেনই!

সবিতা বলিল,—তা যিনিই তাকে খাওয়ান না কেন, তোমার ছেলের পেট ভরলেই তো হল,—তুমি শুয়ে শুয়েই ব্যস্ত হও কেন?

—না, আর ব্যস্ত হব না। ওই ব্যস্ত হওয়াটা ও আমার কেমন স্বভাবের দোষ,—সেজন্যে আমি কত বকুনি খাই, নিজে ব্যস্ত হয়ে আর সকলকে ব্যস্ত করে তুলি বলে!

সবিতা হাসিয়া বলিল,—তুমি নিজেই যে একটী ছোট্ট খুকী!

—সত্যি ভাই, আমি চিরকালই যেন ছোটই রইলুম,—আমার ছেলেটা অবধি আমায় একটু ভয় করে না,—বেশ লম্বা মোটা-সোটা চেহারা হলেই ছেলের ভয় করে,—নয়?

সবিতা বলিল,—সে অভিজ্ঞতা আমারও খুব নেই, আমার চেহারাও এমন নয় যে ছেলেরা ভয় পাবে, তবে আর কিছু মোটা হতে পারলে পেতো বোধ হয়!

—ইস্,—তা বৈ কি! এমন সুন্দর পাৎলা লতাটীর মত নরম চেহারা দেখলে ছেলেরা ভয় পায় বৈ কি! আমার ছেলেটা তো কারু কোলে যায়না,—কেউ যদি একটু আদর করলে, তা হলেই চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করবে, কিন্তু ভাই তোমার মুখপানে চেয়ে সেও কাঁদ্‌লো না,—দিব্যি চুপ করে ছিল।

জ্যোতির শাশুড়ী এক-বাটী 'ফুড' হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতেই জ্যোতি মাথা নাড়িয়া বলিল,—এখন ও খেলে আমার ঠিক বমি হয়ে যাবে মা। ও আমি খেতে পারবো না—

তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—দুঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টা হতে চললো যে মা,—না খেলে আরও দুর্ব্বল হয়ে পড় যে! কেমন করে সেরে উঠবে?

সবিতা বলিল—কেন, খেতে এত আপত্তি হচ্ছে কেন?

জ্যোতি বলিল,—খেয়ে দেখ একটু! আগে খেয়ে দেখো কেমন লাগে, তারপর আমাকে খেতে বলো! দুধ দাও না, আমি এখনি খেয়ে ফেলতে পারি, ওই ফুড্‌টা আমার ছাই লাগে!

জ্যোতির শাশুড়ী বলিলেন,—দুধ খেয়ে যে হজম করতে পারো না, তা নইলে তো দুধই খেতে!

সবিতা 'ফুডে'র বাটিটা জ্যোতির শাশুড়ীর হাত হইতে নিজের হাতে লইল, বলিল,—আপাততঃ এইটে আমার হাতে খেয়ে নিয়ে আমাকে খুসি করে দাও, তবে আবার কালই এসে সারাদিন গল্প করে কাটিয়ে যাবো।

—ঠিক্? ঠিক্ কথা বল্‌ছো?

—ঠিক বই কি,—তুমি এখন প্রসন্ন মনে এটুকু খেয়ে নাও।

—খেতে যে ভারী বিশ্রী লাগে!

—আবার?

—আচ্ছা, দাও দেখি,—তোমার হাত বলে যদি একটু ভাল লাগে!

সবিতা গল্প করিতে করিতে সমস্তটুকুই জ্যোতিকে খাওয়াইয়া দিল, তার পরে মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল,—আজ এখন চল্লুম!

সবিতার হাতখানি নিজের কপালে চাপিয়া ধরিয়া জ্যোতি বলিল,—কাল আবার আস্‌বে তো! ওই অত খানি ছাই-ভস্ম যে-লোভে গিল্‌লুম, তাতে যেন নিরাশ করো না, পাপ হবে।

সবিতা হাসিতে হাসিতে বলিল,—না, পাপ সঞ্চয় করতে কি আর কেউ কাশী আসে? কালও আবার পুণ্যি সঞ্চয় করে যাবো।

—মনে থাকে যেন!

—খুব থাক্‌বে—

জ্যোতির শাশুড়ী তখন বারান্দায়,দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন, —দিব্যি মেয়েটী, দিদি তোমার! আমার বৌমাটীকে যেন মন্তরে বশ করে নিয়েছে!

সবিতা তাঁর পায়ে মাথা নামাইয়া প্রণাম করিয়া মায়ের সঙ্গে বাড়ী ফিরিল। তখন আশ-পাশের বাড়ীগুলির সব ঘরেই আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মন্দিরে মন্দিরে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

(ক্রমশ)

শ্রীনীহারবালা দেবী।

পরশমণি

হে পরশমণি!
অনাদি কালের ও কি রহস্যের খনি
বিস্তারিছে আপনাকে তব কল্পনায়,
বুঝে ওঠা দায়;—
তোমার অস্তিত্ব ঘেরি কল্পনার ছায়া-মরীচিকা,
আঁকে তব ভালে রাজটীকা।
কিম্বা কি হে ত্রিদিবের নন্দন-কাননে
ফুটে রহ এক বৃন্তে পারিজাত-সনে;
যেথা এই মর জগতের
কোনো দ্বার মুক্ত নহে বাধাহীন চিরপ্রবেশের।
শুধু তীব্র সাধনের ফলে,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লভি দুর্নিবার তপস্যার বলে,
ক্ষণতরে যায় স্পর্শ করা।

ছিলে, আছো, থাকিবে কি, মিছে ভেবে মরা!
শুধু জানি, তুমি কৃচ্ছ্র সাধনের ধন;
কণ্টকের লৌহ-বর্ম্ম ঢাকা কুসুমেরি আস্তরণ।
লোহা সোনা হয়ে যায় তোমার ক্ষণিক পরশনে;
দারিদ্র্যের তীব্র নিষ্পেষণে,
কুবেরের রত্নময় ভাণ্ডারের লইয়া পশরা
দরিদ্রকে দিতে চাও ধরা।—
ওরি কল্পনায়
ক্ষণিকেরও তরে ভুলি' দারিদ্র্যের তীব্র যাতনায়,
প্রসারিত করে ছুটে পশ্চাতে তোমার।

চিরন্তন প্রেম এ ধরার
কেবলি নিজেকে চায় মিলাইতে অপরের সাথে;
চিরন্তন মিলনের বরমাল্য হাতে,
প্রেমের পরশমণি খুঁজে পেতে লয়;
নরনারী সোনা হয়ে মিলনের মাঝে ফুটে রয়!

শুনিল যে অসীমের সর্ব্বনাশা বাঁশরীর ডাক,
ছিন্ন করি বন্ধনের শত গ্রন্থিপাক,
পথে পথে ছুটিয়া বেড়ায়,
অনন্তের বুকে বুকে আছাড়িয়া কেবলি খেলায়;
অম্বর-দেবতাপদে মুহুর্মুহু লুটাইয়া পড়ে।
পরশ করিলে তারে অবহেলা-ভরে,
যেন তার রূপ ধরি' পলে,—
স্বর্ণবর্ণে বিকশিয়া ওঠে হৃদয়ের শতদলে।

দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে
যেথা অশ্রু ঝরে ক্ষণে ক্ষণে,—
যেথায় রাজত্ব করে দীনতা নির্ম্মম,—
সেইখানে লভিছে জনম।
প্রেমে ধর্ম্মে দীন যারা
সারাটি জীবন তোমা খুঁজে খুঁজে হইল যে সারা!
সন্দেহ-দোলায় তবু দোলে নাই মন—
'আছো, তুমি আছো, আছো, মানবের চিরন্তন ধন।'
পলে পলে সৃষ্টি হতে প্রলয় অবধি,
খুঁজিছে মানব নিরবধি।
কে বলিবে পায়নি সন্ধান?—
সোনা করি দাওনি কে একটিও লৌহ-পরাণ?—
হৃদয়ের স্বর্ণপদ্ম আলো করি ওঠনি হে জ্বলি—
কি সাহসে বলি?
জানি ইহা জানি ভালো মতে,
অনাদি সৃষ্টির কাল হতে,
খোঁজে আর চাহে তোমা যুগে যুগে এ মুগ্ধ ধরণী,
হে পরশমণি!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।

সমালোচনা

জাপান।—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, ২৪নং কলেজ ষ্ট্রীট (দোতালা) মার্কেট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ন'সিকা। এ বইখানি প্রথম বাহির হয় ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসে; তখন ভারতীতে ইহার সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে বইখানিতে লেখার পরিমাণ ও ছবির সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, এবং রচনাও আমূল সংশোধিত হইয়াছে। লেখক সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত, আর তিনি জাপানে ছিলেন বহুকাল। এ বইখানি তাঁর প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতার উপর লিখিত। আমাদের দেশে ভ্রমণ-কাহিনী বা দেশের কথার বই বড় বেশী নাই। যে-কয়খানি আছে, তাহার মধ্যেও আবার সুলিখিত

নববর্ষের গায়িকা

বইয়ের সংখ্যা অতি-অল্প, আঙুলে গণিয়া তার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায়। উৎকৃষ্ট যে দুই-চারিখানি আছে, এখানি তাহার অন্যতম। গ্রন্থখানির প্রধান গুণ,—ইহার প্রতি ছত্রে প্রাণ আছে, রচনা এমন সরল আর চমৎকার যে উপন্যাসের মতই বইখানি আগাগোড়া সরস। তাছাড়া ইহার কোথাও এতটুকু ফাঁকি বা ন্যাকামি নাই,—জাপানের

নারাযুগের সম্ভ্রান্ত মহিলা

নানা তথ্যে নানা কথায় বইখানি ঠাসা। আর সেগুলি দেখিবার চোখও লেখকের আশ্চর্য্য রকমের। তিনি জাপানের সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, আর্ট—এক কথায় সমগ্র জাপানকে গোটাভাবে দেখিয়াছেন কবির চোখ দিয়া, দরদীর প্রাণ লইয়া, চিন্তাশীলের চিন্তা দিয়া, গোঁড়ামির ঠুলি ফেলিয়া; আর সেই দেখা জিনিষকে এমন নিপুণভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন যে জাপানের অতি-বিজনতম কোণটুকু, তার আশা-নৈরাশ্যের মর্ম্মকথাটুকু, তার অতি প্রাচীন ইতিহাস, তার বর্ত্তমান কর্ম্মপ্রচেষ্টাটাই সমস্ত, প্রকাণ্ড মানচিত্রের মত আমাদের চোখের সামনে দীপ্তবর্ণে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ভবিষ্যৎচিত্র

অতিথির অভ্যর্থনা

চুল বাঁধবার চিরুণী, কাঁটা, ফুল ইত্যাদি গহনা

"তোর"
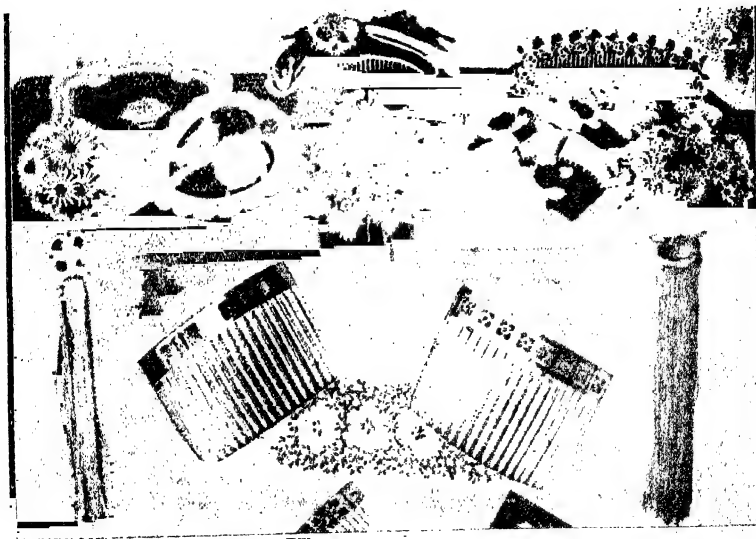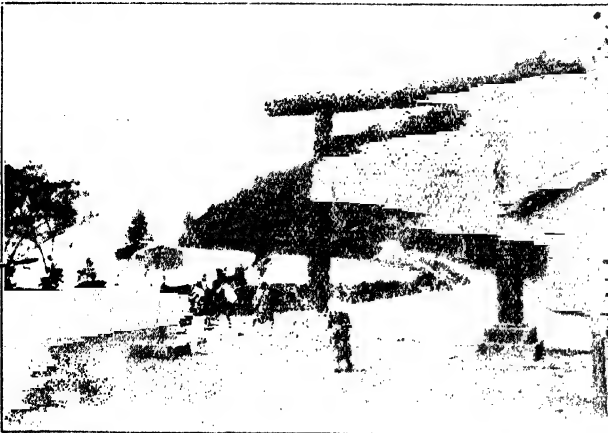
টুকুও আমরা অতি সহজে অনুমান করিয়া লইতে পারি। জাপান সম্বন্ধে অনেক বিদেশী উৎকৃষ্ট বহি লেখা হইয়াছে—সে-সব বইয়ের বিশ্বজোড়া খ্যাতি হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে অনেক বহিই আমরা পড়িয়াছি—এবং সেগুলির সহিত তুলনা করিয়া এ কথা আমরা বলিতে পারি, যে এই "জাপান" বইখানি, সেই সব উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ন্যায়ই প্রামাণ্য-স্বরূপ হইয়াছে। শুধু তা নয়, এ বইখানি সাহিত্যের অলঙ্কার। লেখা এমন সরস যে যে-কোন একটা পৃষ্ঠা খুলিয়া কেহ যদি পড়িতে বসেন, সেই পৃষ্ঠাতেই তাঁর মন এমন আঁটিয়া যাইবে যে বইখানি আগা-গোড়া না পড়িয়া তিনি ছাড়িতে পারিবেন না। আনন্দ ও কৌতূহলের এ যেন এক বিচিত্র ডালি! সব-চেয়ে উপভোগ্য বইখানির ভাষা। ভঙ্গী ও লেখার কায়দা এমন যে লেখক একনিমেষে পাঠকের পরমাত্মীয় হইয়া ওঠেন! বই পড়িতে পড়িতে মনে হয়, লেখক যেন সামনে বসিয়া গল্প বলিতেছেন,—সঙ্গে সঙ্গে জাপানের খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয় ছবি আঁকিয়া চোখের সামনে ধরিয়া দিতেছেন। বইখানির ছবি কাগজ বাঁধাই ছাপা চমৎকার : আর এই অসংখ্য ছবিতে যেন জাপানে আর্ট-গ্যালারি সাজানো হইয়াছে!

রাজকন্যা।—রঙ্গনাট্য। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী বি, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীবলরাম গোস্বামী, ১নং শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলিকাতা। হার্ডিং প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। কবিবর টেনিসনের 'প্রিন্সেস' কাব্য অবলম্বনে এই রঙ্গনাট্যখানি রচিত হইয়াছে। রচনা বিশেষত্ব-হীন।

শিবাচ্চর্ন-তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ লিখিত। কাশীধাম ব্রাহ্মণসভা হইতে প্রকাশিত ও মহামণ্ডল মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা।

নুর নবী। মোহাম্মদ এয়াকব আলী চৌধুরী প্রণীত। শক মোহসেন এণ্ড কোং, ৯৩ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। দিমডেল লিথো এণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ। মূল্য দেড় টাকা। হজরত মোহাম্মদের জীবন-কাহিনী ও তৎকালীন সমাজ ও ধর্ম্মনীতির কথা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। লেখকের

ভাষাবেশ সহজ ও সরল ; রচনাও হৃদয়-গ্রাহী। সাম্প্রদায়িক খুঁটিনাটির কোন আলোচনা নাই ; সেজন্য রচনাটি অ-মুসলমান পাঠকের কাছেও বেশ সরস লাগিবে। গ্রন্থে অনেকগুলি ছবি আছে।

ভাস্করনন্দ চরিতামৃত ও স্বরাজ্য-সিদ্ধি।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কটন প্রেসে মুদ্রিত। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য দেড় টাকা। মহাত্মা ভাস্করানন্দের নাম হিন্দু-সমাজে চিরস্মরণীয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, ভাস্করানন্দ প্রভৃতির মত সাধক জন্ম গ্রহণ করিয়া শুধু ভারতকে নয়, পৃথিবীকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ইঁহারা প্রাচীন ভারতের সাধনার আদর্শ পুরুষ। ইঁহাদের মানব-প্রেম, ভগবৎ-সাধনা ও নিষ্ঠা জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মত। অধ্যাত্মপ্রবণতায় ভাস্করানন্দের তুল্য আর একজন মহাত্মা একালে দুর্লভ। তাঁহার জীবন-কাহিনী ও তাঁহার সাধন-কথা প্রচার করিয়া লেখক সমাজ ও সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন। এই অপরূপ জীবন-কথা বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এগ্রন্থ প্রত্যেকের পড়া উচিত। নিরহঙ্কার সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-বর্জ্জিত চিত্ত ও সর্ব্বজীবে সমপ্রীতির এমন অপরূপ কাহিনী পাঠে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে, মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিবে, আদর্শের সন্ধানে পরের দ্বারে মাথা কুটিয়া মরিতে হইবে না। বহিখানির ছাপা কাগজ খুব ভাল। গ্রন্থে ভাস্করানন্দ স্বামীর ও অন্যান্য নানা দেশের নানা মনীষীর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

উড়ো চিঠি। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র বর্ম্মণ, আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এই গ্রন্থে লেখক পত্রচ্ছলে সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের উক্তি বেশ প্রাণবন্ত ও স্বচ্ছন্দ, প্রকাশ-ভঙ্গীতে সহজ ও সরল—এবং তাঁর যুক্তি বেশ জোরালো ও নিপুণ।—আগাগোড়া চিন্তাশীলতার ছাপ-মারা। রচনাভঙ্গীতে যেমন বলনম্রী প্রকৃতির পরিচয় পাই—আলোচনটুকুও তেমনি সুদৃঢ় বেগ লইয়া একেবারে প্রাণে আসিয়া আঘাত করে। নবীন চিন্তাধারার স্পর্শে লেখা উজ্জ্বল ; সুস্থ সবল আবহাওয়ায় ভরপুর। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই এ গ্রন্থখানি পড়িতে বলি—চিন্তার খোরাক তাঁহারা পাইবেন প্রচুর।

সুহাস। শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। আইডিয়াল প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি ছোট গল্পের বহি। সুহাস, ভিক্ষা, সেবা-অপরাধ, সৃষ্টিছাড়া, চোখের ভুল দীক্ষাগুরু ও সেকালের মেয়ে—এই কয়টি গল্প এ বহিতে সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলির উপাখ্যানে বৈচিত্র্য নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে জোর করিয়া কয়েক জায়গায় ফ্যানানোর ও বিজ্ঞের ভঙ্গীতে প্রকাশের চেষ্টা করার ফলে রসভঙ্গ হইয়াছে। কয়েকটি গল্পের ঘটনা-সংস্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের রচনার ছায়াও আসিয়া পড়িয়াছে। এ দোষগুলি কাটাইতে পারিলে লেখকের গল্প খুলিতে পারে ; রচনার স্থানে স্থানে রচনা-শক্তির দুই-চারিটা বিকচমান রশ্মি যে রেখাপাত করিয়াছে, তাহা আশাপ্রদ।

পুণ্য চিত্র।—শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, মডেল লাইব্রেরী, ২৫ নং বেচারাম দেউড়ী ঢাকা জগৎ আর্ট প্রেসে শ্রীসতীশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থে কয়টি কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে,—ঈশা খাঁ, অশোকের নবজীবন, চন্দ্রদ্বীপ, শাহান শা, মীরা বাই, সনাতন গোস্বামী, ও অদৃষ্ট। নিবন্ধগুলি গল্পচ্ছলে লিখিত—কয়েকটি কিংবদন্তী ও ঐতিহাসিক কাহিনীই ইহার ভিত্তি। রচনা ভালো—কাহিনীগুলি সরস।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

স্বাস্থ্য। মাসিকপত্র। সম্পাদক, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, বি। প্রথম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। ১১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। আমাদের দেশে সকলের এখন সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি দেওয়া দরকার—আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি। কারণ জ্বরে ভুগিয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়া না পারে কেহ লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতে, না পারে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে লড়াই করিতে, এমন কি চাকরি বা ওকালতি করিয়া পয়সা উপার্জ্জনেও বাধা পড়ে প্রতি পদে। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে গোড়ার কথাগুলিই আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন জানিনা—অথচ তাহা জানাইবার দিকে কোন বিশেষজ্ঞের চেষ্টাও দেখা যায় না। কিছুকাল পূর্ব্বে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু 'স্বাস্থ্য-সমাচার' বাহির করিয়াছিলেন—সেটি ভালোই চলিতেছে। তবে একখানি মাসিকে কয়টা কথাই বা থাকিতে পারে। সম্প্রতি ব্রজেন্দ্রবাবু অসাধারণ অধ্যবসায়ে 'স্বাস্থ্য' বাহির করিতেছেন। যে কয়-সংখ্যা পড়িয়াছি, পড়িয়া কিছু শিখিয়াছি,—এবং যাহা শিখিয়াছি তাহা আরও পাঁচজনে শিখুক—এমনি কামনা করিতেছি। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রবন্ধ আছে,—বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-রক্ষা, বঙ্গে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব, বিসূচিকা, আপো-নারায়ণ, স্ত্রীরোগ, যক্ষ্মা-চিকিৎসা প্রভৃতি। আপোনারায়ণ প্রবন্ধটি এই সংখ্যা ভারতীতে সঙ্কলিত হইল। সেইটি পড়িয়াই সকলে বুঝিবেন, 'স্বাস্থ্য' কি রকম বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। অনুরূপ চিত্রে বিষয়গুলি খুলিয়াছে খুব সুস্পষ্টভাবেই। যে বাঙালী বাঁচিতে চান তাঁহাদের সকলকেই নাটক নভেল ছাড়িয়াও নিয়মিতভাবে এ পত্রিকাখানি পড়িতে বলি। আগে সকলে শরীর রাখুন, তারপর নাটক-নভেল পড়িবার ঢের সুযোগ মিলিবে।

সমালোচক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় শ্রমিক বিবর্ত্তন

আজ মানুষকে যেমন সভ্যভব্য, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, কলা-কৌশলে উন্নত ও উৎকৃষ্ট দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে প্রথম যখন সে আসে, তার অবস্থা তখন ঠিক এমনি-ধারা ছিল না—সেটা তার ক্রমোন্নতির ধারা অনুসরণ করলেই সহজে বোঝা যাবে। মানুষ পৃথিবীতে প্রথম প্রবেশ করে দেখতে পেলে, তার অভাব-অভিযোগ পূরণের জন্য সবই আছে, কিন্তু সে যেন নিস্পন্দ, অসার, অচেতন অবস্থায়—কাজের উপযুক্ত না করে নিলে কোন কাজে আসে না। এই সরল সত্য আবিষ্কার করেই সে বুঝতে পারলে, তাকে বেঁচে থাকতে হলে পরিশ্রম করতে হবে। তাই সেই আদিম অবস্থায় পরিশ্রমের আর কোন পথ আবিষ্কার করতে না পেরে সে সদ্যোজাত পৃথিবীর অফুরন্ত ফলভাণ্ডার লুটতে লাগল আর বনের পশু-পাখী মেরে খেতে লাগল। এতেও দেখলে, তার আহারের সম্যক সংস্থান হচ্ছে না, তখন পশুপাল পুষতে লাগল, তার দুগ্ধ ও মাংস আহারের অভাব পূরণ করতে লাগল; চর্ম্ম ও লোম শীত ও আতপ-তাপ-ত্রাণের উপায় হল। ক্রমে মানুষের মাথায় একটা ধারণা গজিয়ে উঠল; সে ভাবলে,এত-বড় পৃথিবী অমনি পড়ে রয়েছে, চাষ আবাদ করলে ত বেশ উদরান্নের সংস্থান হয়। এই ভাবে কৃষির প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও অর্দ্ধসভ্য হল। এমনি ভাবে কত যুগ কেটে গেল-- মানুষের শ্রম-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হল না—তার আশা-আকাঙ্ক্ষাও মিটল না,ক্রমেই তা বেড়ে চলতে লাগল। তখন সে আবার এক নতুন ফন্দী আঁটল। শিল্পযুগ প্রতিষ্ঠিত হল। হাতে অনেক বিলাস ও ব্যবহারের জিনিস তৈরি হতে লাগল। ক্রমে নগরের প্রতিষ্ঠা হল, মানুষ সভ্য বলে নিজের পরিচয় দিতে লাগল। সুখে-স্বচ্ছন্দে বহুকাল ভ্রাতৃভাবে সকলে বসবাস করতে লাগল। এমনি করে আরও কয়েক যুগ কেটে গেল। অবশেষে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে য়ুরোপে শ্রমিক বিবর্ত্তন (Industrial Revolution) এসে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে সারা জগৎ এই বিরাট বিলাতী বিবর্ত্তন-বাদে বিলোড়িত হয়ে উঠল। সমগ্র-জগৎ এক অভিনব আলো দেখতে পেলে—নতুন পথের সন্ধান মিললো। বিজ্ঞান-বর্ত্তিকা হস্তে এ পথের পথপ্রদর্শক হলেন স্যর রিচার্ড আর্করাইট্, হারগ্রিভস্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ। হাতের পরিশ্রমের জায়গায় নদীর ও ঝরণার জল-প্রবাহে বা বাষ্পীয় বলে কাজ চলতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যে আরও উন্নতি হল—বৈদ্যুতিক প্রবাহে কল-কারখানা চলতে লাগল—মানুষের পরিশ্রম লাঘব হল, সে আরাম পেলে। এতদিনে the law of least sacrifice অর্থাৎ অল্প চেষ্টা ও পরিশ্রমে বেশী সুখ ও তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব হল।

মানুষ সুখ ত পেলে,কিন্তু শান্তি পেলে কি? এই অপূর্ব্ব আবিষ্কারের ফল হল এই যে বিদ্যুৎ বা বাষ্পচালিত যন্ত্রাদির মূল্য অত্যধিক হওয়ায় সাধারণে তা কিনে কাজ করতে পারলে না! দেশের ধনী-সম্প্রদায় যন্ত্র কিনলেন—কারখানা-চিমনির পত্তন হল—কুটীর-শিল্প উঠে গেল। দেশের টাকা বাড়তে লাগল—দেখতে দেখতে লাফে লাফে ধাপে ধাপে য়ুরোপ ধনী হয়ে উঠতে লাগল! চারদিক থেকে টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও রব উঠতে লাগল। Material prosperityর চরম শিখরে য়ুরোপ আরোহণ করলে।

এই শ্রমিক বিবর্ত্তন-বাদ অর্থাৎ Industrial Revolution-এর ফলে ও material prosperityর বলে য়ুরোপ কতটা লাভালাভ করলে দেখা যাক। তারপর এটা ভারতে প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে কি না,সে আলোচনা করা যাবে।

য়ুরোপের capitalist অর্থাৎ ধনী-সম্প্রদায় অনেক টাকা মূলধন ফেলে বড় বড় কল-কারখানার পত্তন করলেন—নতুন নতুন যন্ত্রপাতি কিনে এনে বসালেন। শ্রমশ্রেণী-বিভাগ অর্থাৎ classification of labour হল— দেশের দক্ষ কারিকরেরা যারা এ পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্মা বসেছিল, তারা কাজ পেলে—কাঁচা মাল পাইকেরী দরে কেনায় বাজারে সস্তা দরে তৈরি মাল বিক্রী হতে লাগল—তৈরি মাল পাইকেরী দরে বিক্রী হতে লাগল; কাজেই খুচরা বিক্রীর ঝঞ্ঝাট কেটে গেল, অনেক গরীব লোক চাকরি পেলে,

দেশের অর্থ হু-হু করে বাড়তে লাগল! শ্রমিক বিবর্ত্তনের মোটামুটি লাভের দিক হল এইটে; কিন্তু লোক্‌সানের দিকটা এর চেয়ে অনেক বেশী ঝুঁকে পড়েছে। ব্যাপার দেখে দেশের চিন্তাশীল লোকেরা চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। দেশ হঠাৎ ধনী হয়ে পড়ায় একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল, আর তার প্রতিক্রিয়ার ধাক্কা সমাজের গায়ে এসে লাগল। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে Ruskin লিখলেন, Unto this Last ;'Munera Pulveris' কারলাইল'Past and Present" ডিকেন্স্ Hard Times.

রস্‌কিন ভেবে দেখলেন, টাকা বাড়ছে বটে কিন্তু মন ত বাড়ছে না! তাই বললেন, "There is no wealth but life,—life, including all its powers of love, of joy and of admiration. That country is the richest which nourishes the greatest number of noble and happy human beings..."*

এই যে সব বড় বড় কল-কারখানা স্থাপিত হল, এগুলো চালাতে হলে যথেষ্ট মজুরের দরকার। তাই দেশ-বিদেশ থেকে মজুরের দল এসে জুটতে লাগল—ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ী সকলে এসে পড়ল—চাকরীও মিলল। এদের আসবার যথেষ্ট কারণ ছিল। দেশে বসে থাকলে চাষবাস করতে হত —যেবার ভাল ফসল হত সেবার একরকমে দিন কেটে যেত, কিন্তু যেবার দেবতা প্রসন্ন হতেন না, সেবারে এদের সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হত। তাই তারা ভেবে দেখলে, এই রকম অনিশ্চিত আশায় বসে থেকে বছর বছর মহাজনের সুদ গোণার চেয়ে কলে গিয়ে চাকরী নেওয়া ভাল; তাতে ভয় নেই,ভাবনা নেই! স্বাধীন জীবন—যে দিন ইচ্ছা হলো কাজ করলাম, যে দিন হল না, করলাম না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে দলে দলে স্ত্রীপুরুষে এসে বস্তি ভর্ত্তি করে দিলে! কল বেশ চলতে লাগল—মালিকের লাভও যথেষ্ট হতে লাগল; কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থা ত ফিরল না! উপরন্তু তাদের দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ ক্ষতি হল। দেশে থাকত যখন, তখন মা, বাপ, ভাই, বোন, স্ত্রী-পুত্র সব কাছে থাকত; এখানে ত তারা নেই, আছে কেবল কতকগুলো অপরিচিত স্ত্রীলোক। এই অপরিচিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অনেক দিন এক জায়গায় কাজ করার ফলে যা হবার তাই হল - sexual affinity অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের সহজাত আকর্ষণের লক্ষণ দেখা গেল। দেশের মা বাপ, ছেলে মেয়ে, ভাই বোন এদের সব মুখচ্ছবি অল্পে অল্পে তাদের মন থেকে মুছে যেতে লাগল—অধঃপতনের দিকে একটু একটু করে এগোতে লাগল। এখানে মায়ের মতন মাথার উপর অবিরত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে কেউ নেই, কাজেই তারা পাপে প্রলুব্ধ হল। সারাদিনের হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরে এসে দেখলে, তাকে আদর করে পাশে বসিয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলতে, বা ভালবাসতে কেউ নেই! কাজেই তারা চরিত্র হারালে—পিতার মত উপদেশ দিতে ভগিনীর মত সেবা করতে কেউ নেই, কাজেই ডুবল! তারা অগাধ পাপে মজ্জল,অতলে তলিয়ে গেল! অবিরাম ব্যভিচার-স্রোতে গা ভাসানোর ফলে হৃদয়ের কোমলবৃত্তিগুলো শুকিয়ে গেল, বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট হল,হিতাহিত-বোধ দূরে পালাল। এই পাপের আশ্রয় নিয়ে কি তারা সুখ-শান্তি পেলে? তাও পেলে না!

মিলে-মিশে নতুন সংসার পেতে তারা থাকতে পারলে না। খুন-জখম প্রায় হতে লাগল—এ সকল খুন-জখমের মূলে রইল sexual friction বা দ্বৈজাতিক বিবাদ। এদের সঙ্গে যে সমস্ত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে বাস করত, বড়দের কাছে এই আদর্শ দেখে তারাও বড় হয়ে এই ভাবে জঘন্য জীবন যাপন করতে শিক্ষা পেল। এ পাপ শুধু এদের মধ্যেই আবদ্ধ রইল না; এদের মধ্য দিয়ে ভদ্র সমাজেও প্রবেশ করল। কেমন করে করল, সেটা আর নাই-বা উল্লেখ করলাম। সংক্রামক রোগের মত দেখতে দেখতে এ পাপ সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। এতে সমাজ বড় কম আঘাত পেলে না। সমাজ পঙ্গু হয়ে যেতে আরম্ভ করলে—শরীর অসার ও নিস্পন্দ হয়ে আসতে লাগল। কেন না, এরা ত সমাজের একটা অংশ—একটা অংশ কেন বলি, আধখানা অঙ্গ বলা যেতে পারে; কাজেই এদের বাদ দিয়ে আর একটা আলাদা সমাজ ধরা যায় না। এদের আধখানা অঙ্গ বললাম, তার কারণ, দেশে ধনী আর

* Unto this Last. By John Ruskin

ক'জন?—অর্দ্ধেকের বেশী লোক হ'ল দরিদ্র। আর যারা কলে কুলিগিরি করতে যায়, তারা এই দরিদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। প্রমাণ-স্বরূপ ইংলণ্ডের কথা ধরুন। এখানে ধনীর সংখ্যা ৯২ লক্ষ; মধ্যবিত্ত সাড়ে ৩৭॥০ লক্ষ আর দরিদ্র হল তিন কোটী আশি লক্ষ।* আমেরিকা প্রদেশে প্রত্যেক এক-শত পরিবারের মধ্যে কেবল মাত্র একটি পরিবারের ধন-সম্পত্তি অবশিষ্ট ৯৯জন পরিবারের ধন-সম্পত্তি অপেক্ষা অধিক। ৯৯টি পরিবার একটি মাত্র পরিবারের বিলাস এবং সৌখীনতার উপকরণের জন্য কল-কারখানায় পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জ্জন করে।" ‡ কাজেই একের সর্ব্বনাশ হওয়া যা, সমস্ত সমাজের সর্ব্বনাশ হওয়াও তাই।

এদের পাপে পঙ্কিল জীবন যাপন করবার অনেক কারণ আছে। এদের মধ্যে সুশিক্ষা নেই কিন্তু কুশিক্ষা যথেষ্ট—প্রলোভনও চতুর্দ্দিকে। এ অবস্থায় ঠিক থাকা খুব শক্ত ব্যাপার। সমস্ত কারখানাতে দেখা যায়, স্ত্রী পুরুষে এক সঙ্গে কাজ করে। তাও যদি এদের সংখ্যা সমান হয়, তা হলে সেটা তত অমঙ্গলের কারণ হয় না। তারা হয়ত বিবাহ করে' পবিত্র বন্ধনে বাঁধা থেকে দিন কাটাতে পারত; কিন্তু তা সম্ভব নয়। সর্ব্বত্রই এদের সংখ্যায় অসামান্য অসামঞ্জস্য দেখা যায়। পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। যত অনিষ্টের মূল এইখানে। ইংলণ্ডের কথা জানি নে, জাপানের হিসাব অনেক দিন আগে একটা কাগজে বেরিয়েছিল:—Thirty-five years ago Japan had 200 factories employing 15000 people; now there are 25,000 factories employing two million people of whom eight hundred and fifty thousands are women. বিশ লক্ষ মজুরের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা সাড়ে আট লক্ষ। ভারতবর্ষেও ঠিক এই ব্যাপার। ১৯১২ সালে ১১৪৭টী খনি ইণ্ডিয়ান মাইন একৃট্ অনুসারে রেজেষ্টারী-ভুক্ত হয়েছিল। এই সব খনিতে এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার মজুর প্রত্যহ খাটত। তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১০১, ৯৭১ আর স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫৬,৫০৭।

সুতরাং সহজে অনুমান করা যেতে পারে যে সমস্ত দেশে সমস্ত কারখানায় পুরুষের অপেক্ষা মেয়েদের সংখ্যা অল্প; কাজেই ঐ রকম জায়গায় অধঃপতনের দ্বার রোধ করা অসম্ভব। তার পরে এক ঘরে বাপ মা, ছেলে মেয়ে, জামাই ও পুত্রবধূ বাস করার ফলে morality ও decency বলে জিনিসটা লোপ পাচ্ছে। প্রত্যেক কারখানার চারদিকে প্রচুর মদ তাড়ি, গাঁজা, গুলি ও তার সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ থাকায় এদের অধঃপতনের পথটাও বেশ সহজ এবং সুগম হয়ে উঠেছে। এই সব প্রলোভনের জিনিস চারদিকে ছড়ানো থাকায় শিক্ষাহীন, নীতি-বিবর্জ্জিত হতভাগারা সারাদিনের পরিশ্রমের পর এই রকম একটু সুখের আশায় যে পাপে গা ঢেলে দেবে, তা আর আশ্চর্য্য কি! এই পাপের ফলে যে-সমস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করছে, তারা নানা রোগে দুষ্ট, দুর্ব্বল ও ক্ষীণ শরীর নিয়ে সমাজের সমস্যা জটিল করে তুলছে মাত্র। Health citizen বলে কথাটী ক্রমশ উঠে যাচ্ছে—ভবিষ্যতে সবল ও সুস্থ জাতি-গঠনে বাধা পড়চে। সমাজ ও দেশের সমূহ সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হয়েছে।

নীতির দিক দিয়ে শ্রমিকদের যে ক্ষতি হয়েছে, এ গেল সেই ক্ষতির কথা। এ ছাড়াও তারা অনেক রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছোট ছোট অন্ধকার, আবর্জ্জনাপূর্ণ, দুর্গন্ধ স্যাঁৎসেতে ঘরে অনেক জনে মিলে বাস করার ফলে তারা স্বাস্থ্য হারাচ্ছে। এক একটা বস্তি কলেরা বসন্ত রোগের আদর্শ আবাস-স্থল। এগুলো ঠিক নগরের উপকণ্ঠে থাকায় নগরের মধ্যে নানা রোগের বীজ ছড়িয়ে পড়ছে—তাকে থামানো যাচ্ছে না। এ সব কলকারখানায় কাজ করে করে কুলিরাও কলের সামিল হয়ে গিয়েছে! তারা জীবনের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক গতি, সহজাত স্ফূর্ত্তি হারিয়েছে—যে স্বাধীন ভাবের ধারাটি তাদের হৃদয়ের মাঝে খেলা করত, তা শুষ্কপ্রায়! যে রকম সরল সবল অচল অটল জীবন তারা যাপন করত, তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে! হাতে কাঁচা

---

* The distribution of British money (in 1914) by L. G. C, Money.

‡ দরিদ্রের ক্রন্দন—শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ৮ পৃষ্ঠা।

টাকা পেয়ে সব বাবু হয়ে পড়েছে! নতুন নতুন অভাব সৃষ্টি করেছে—নিজের দুঃখকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তুলেছে।

যত টাকা সব এক হাতে গিয়ে জমছে। দেশের জনসাধারণের অবস্থা ঠিক এক রকম রয়েছে; কেবল মাঝ থেকে কতকগুলো লোক বড় মানুষ হয়ে উঠছে। বড় লোকেরাই কেবল বড় লোক হচ্ছে—গরীব যারা তারা গরীবই থেকে যাচ্ছে। সাধারণের দুঃখ ঘুচ্ছে না, পীড়িতের আর্ত্তনাদ থামছে না, দরিদ্রের অশ্রুধারা শুকোচ্ছে না। য়ুরোপের অবস্থা ছবিতে আঁকলে অনেকটা এই রকম হয়—একটা প্রচুর আহার-পুষ্ট দৈত্যের পাশে একটা রুগ্ন ভগ্ন ক্লিষ্ট বামন দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করছে। অগাধ ধনৈশ্বর্য্যের পাশে অনমুমেয় দারিদ্র্য! ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ হয়েছে য়ুরোপে! য়ুরোপের মতন ধনী যেমন আমাদের দেশে নেই তেমনি য়ুরোপের মত দরিদ্রও আমাদের দেশে নেই। ওখানে অনেক দরিদ্র আছে বলেই অনেকে ধনী হতে পেরেছে! এই সব দেখে শুনে হেনরী জর্জ দুঃখ করে বলেছেন, "The tramp comes with locomotives and alms-houses; and prisons are as surely the marks of "material prosperity" as are costly dwellings, rich ware hou es and magnificent churches. The association of poverty with progress is the greatest enigma of our times. It is the central foot from which spring industrial, social and political difficulties that perplex the world, and with which statesman-ship and philanthropy grapple in vain."* য়ুরোপের অবস্থার কথা আমাদের ভাষায় বলা যেতে পারে,—

আজি সভ্যতায়—
অন্তহীন আড়ম্বরে উচ্চ আস্ফালনে
দরিদ্র-রুধির-পুষ্ট বিলাস লালনে
অগণ্য চক্রের গর্জ্জন প্রখর মর্ম্মর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্ব্বর
রুদ্ররক্ত অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্দ্ধায়
নিঃসঙ্কোচে শান্ত চিত্তে কে ধরিবি হায়,
নীরব গৌরব সেই সৌম্য দান বেশ
সুবিরল নাহি যাহে চিন্তা চেষ্টা লেশ!
কে রাখিবি ভরি নিজ অনন্ত আগার
আত্মার সম্পদরাশি মঙ্গল উদার?

Enterp.iserরা মজুরদের শিক্ষা দিতেন না; ভয়,পাছে তারা শিক্ষা পেয়ে নিজেদের পাওনা-গণ্ডা পাবার জন্যে দাবী করে বসে; কিন্তু তাঁরা শিক্ষা দিন আর না দিন কালের গতি-অনুসারে তাদের চোখ ফুটেছে; তাই তারা চীৎকার করছে:—অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু!

তারা সমস্বরে বলছে—ওহে ধনী মহাজন, আমরা সারাদিন হাতে পায়ে গায়ে কালি মেখে, কলের চাকার সঙ্গে নিজেদের হাড়গুলো পর্য্যন্ত গুঁড়িয়ে কাজ করব, আর তুমি যে গোঁফে আতর লাগিয়ে শিষ দিয়ে বেড়াবে, তা হবে না; আমরা চিম্‌নির ধোঁয়ায় শরীরের প্রতি রক্ত-বিন্দু দান করব আর তুমি বিকেলে মোটর জুড়ি হাঁকিয়ে, থিয়েটার-বায়স্কোপ সিনেমা দেখে, জলবিহার আকাশ-বিহার করে বেড়াবে, গগনস্পর্শী গৃহে অগণিত দাসদাসী-বেষ্টিত হয়ে ভাল ভাল ভোজ্য খাবে; গার্ডেনপার্টি টিপার্টি দিয়ে বল নেচে বেড়াবে, সেটা অসহ্য! দৈনিক মজুরি ছাড়া আরও কিছু আমাদের দিতে হবে! তুমি আমাদের মতন অসংখ্য প্রাণীকে মেরে বড় মানুষ হয়েছ, তখন তোমার লভ্যাংশ থেকে আমাদের একেবারে বঞ্চিত করলে চলবে কেন? আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে, তোমাতে-আমাতে সম্বন্ধ শুধু কাজ করা আর মজুরি পাওয়া হলেই চলবে না। আমাদের কুকুর-বেড়ালের মতন দেখলে চলবে না—মানুষের মর্য্যাদা দও! উভয়ের মঙ্গল হবে! যদি আমাদের কথা না শোন, তোমার ঐ বিরাট কারখানা—যার বলে তুমি এত গর্ব্বিত—ধ্বংস করে ঐ টেম্‌সের জলে ফেলে দেব! সাবধান! সদয় ব্যবহার কর, মৈত্রী স্থাপন কর; নইলে তোমার আভিজাত্য-গর্ব্ব ধূলায় লুটোবে।

* Progress and Poverty by George Henry

ফল হচ্ছে এই যে, যেখানে মালিকেরা এ মিলিত ক্রন্দনে কর্ণপাত করছেন, সেখানে কোন অশান্তি দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু যেখানে এদের চীৎকারের প্রতিকার করা হচ্ছে না, সেখানে ধর্ম্মঘট, কাজ বন্ধ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, রক্তারক্তি চলছে। সারা য়ুরোপে ও আমেরিকায় এই রকম একটা বিরাট অসন্তোষ ও অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। এই সে দিন বিলাতের সমস্ত খনির মজুরেরা একযোগে বললে, তাদের শ্রমের হার বাড়িয়ে না দিলে কয়লা তোলা বন্ধ করবে—খনিগুলো জলে ডুবিয়ে দেবে। তাদের কথা প্রথমে না শোনায় অনেকগুলো খনি তারা নষ্ট করলে—বহু টাকার ক্ষতি হল। শেষে মিটমাট করতে হল। কিন্তু যদি মিটমাট না হত, তা হলে ভেবে দেখুন, ইংলণ্ডের কি সর্ব্বনাশই না হত! ইনডস্ট্রিয়ালিস্‌মের দরুণ দেশে যে পাপ প্রবেশ করেছে, লেবর এসোসিয়েসন হাজার চেষ্টা করলেও সে পাপ দূর করতে পারবে না। গভর্ণমেণ্ট বা ক্যাপিটালিষ্টরা এদের শত অভাব ও অভিযোগের প্রতিকার করলেও এদের মধ্যে যে একটা ধূমায়মান অসন্তোষ ও অতৃপ্তি আছে, সেটাও কিছুতেই নিবারিত হবে না। দেশের টাকা বাড়াতে হলে ইনডস্ট্রিয়ালিস্‌ম্ চাইতে হলে এই দুঃখ-কষ্ট, অতৃপ্তি, অসন্তোষ ও অশান্তিগুলোকেও ডেকে বরণ করে নিতে হবে। ইনডস্ট্রিয়ালিস্‌ম্ ও শান্তি এ দুটো এক জায়গায় থাকতে পারে না; এরা পরস্পর-বিরোধী।

এইত গেল শ্রমজীবীদের সব দিক দিয়ে ক্ষতির কথা! এদের যারা শ্রমে নিয়োজিত করে, তাদের কি কিছু ক্ষতি হয় নি? তাদেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। তাদের আত্মার অবনতি ছাড়া উন্নতি হয় নি। মেসিনের দরুণ তারা দেখতে দেখতে খুব বড় লোক হয়ে উঠেছে বটে—কিন্তু এই বড় মানুষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মভয় জিনিষটা তারা হারিয়েছে। এটা material prosperityর আনুষঙ্গিক ফল। দেশ ধনী হলেই বিলাসী ও সুখপ্রিয় হয়ে ওঠে—বিলাসী হলেই নৈতিক অধঃপতন আসবে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য! প্রাচীন গ্রীস ও রোমান্ সাম্রাজ্য এর জলন্ত উদাহরণ! হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠার কুফল সম্বন্ধে Sir Humphry Davy বলেছেন, "Even in priva[te] life too much prosperity either injures t[he] moral man, and occasions conduct which en[ds] in suffering; or it is accompanied by t[he] working of envy, calumny and malevolence [of] others."

য়ুরোপ ইনডস্ট্রিয়ালিসমের দরুণ বড় মানুষ হয়ে[ছে], বড় মানুষ হওয়ার ফলে বিলাসী হয়েছে, বিলাসী হওয়[ার] ফলে ধর্ম্মভাব হারিয়েছে, ধর্ম্মভাব হারাণোর ফলে নীতি[ভ্রষ্ট] হয়েছে, নীতিভ্রষ্ট হওয়ার ফলে সমাজবন্ধন হারিয়েছে, সমাজ-বন্ধন হারাণোর জন্য তারা আর বিবাহ-বন্ধনে আ[বদ্ধ] হতে চায় না, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনিচ্ছ[া] নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে—সমাজে নানা বিক্ষে[াভ] দেখা দিয়েছে। এ সম্বন্ধে গীডনী যা বলেছেন, তা প্রণিধা[নের] যোগ্য—

"When the duty of maintaining a fami[ly] tradition is no longer acknowledged, wh[en] religion has ceased to be an element [of] domestic life, when children have becom[e] unwelcome, and marriage is viewed as a co[n]venience or a pleasure, legal obstacle to i[ts] dissolution will no longer be tolerated by [a] community of irritable, sentimental a[nd] egoistic men and women who have found li[fe] disappointing"

এই কারণেই বোধ হয় য়ুরোপে বছর বছর গাদাগা[দা] বিবাহ-ভঙ্গ ও চুক্তিভঙ্গের নালিশ আদালতে উপস্থিত হচ্ছে—স্বামী-স্ত্রীতে সুখে বসবাস করতে পারছে না। অধ্যা[পক] শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাই বলেছেন:—

The divorces have been rapidly multipl[y]ing in Europe and America. To add to t[he] family unstability, the women of the west [are] becoming more and more economical[ly] independent. Not supported by her ow[n]

family and unable to find a husband or deserted by him she has to earn her own living. Thrown into the hard struggle and competition of wealth she gradually loses the idealism that is natural to her. She asks for votes in order to shield herself from the individualistic economic system regulated in the interest of man, but the feverish excitement, the constant fever and fret of modern industrialism gradually renders her unfit for motherhood—the essential and incontestable right of every normal woman. *

এই হল ইনডস্ট্রিয়ালিস্‌মের ভীষণ পরিণাম! আধুনিক কল-কারখানার দিকে তাকিয়ে একজন লেখক বলেছেন, কারখানায় প্রত্যেক দেওয়ালটা অগণিত গৃহহীন নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকের দীর্ঘশ্বাসে ও ক্ষুধার্ত্ত বালকের করুণ ক্রন্দন-ধ্বনিতে গাঁথা। এই Industrialism এর দরুণ য়ুরোপীয় স্থিতধীগণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। এর উপর বিতৃষ্ণা আনবার জন্যে নানা জনে নানা রকম কথা বলছেন। মিঃ জোসেফ চেম্বারলেন মহোদয় বলেছেন—

"Never before in our history was the misery of the poor more intense, or the condition of their daily life more hopeless and degraded. The vast wealth which modern progress has created has run into pockets; individuals and classes have grown rich beyond the reach of avarice but the great majority of toilers and spinners have derived no proportionate advantage from the prosperity which they helped to create."

একজন য়ুরোপীয় সভ্যতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলেছেন :—

Your people are no doubt better equipped than ours with some of the less important goods of life; they eat more and drink more, but there their occupations are more unhealthy, both for body and mind; they are crowded into factories, divorced from Nature and from ownership of the soil.

আর এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ যেন বলেছেন :—

I see it not such a fascinating kaleidscope as a great and complicated machine that is grinding, grinding, grinding the bodies and the souls of the people who made it and can not control it. And as I spoke, I gazed down upon the moving masses of the people the scurring motors, the long lines of tramways, the palatial hotels here, the sordid ware-houses there......I too felt that I was in the grip of some horrible machine that was whirling round and round in a vicious circle, grinding youth and beauty, hope and happiness.

আমেরিকা দেখতে দেখতে একটা বিরাট কারখানায় পরিণত হয়ে গেল—সেখানে ভগবানের জায়গায় কুবেরের পূজা হচ্ছে দেখে চিন্তাশীল লেখক E. Benjamin Andrews লিখেছেন, "Wealth-gaining is an attractive all-engrossing phenomenon over-shadowing all else massive, ubiquitous, obstreperous, never out of right or out of mind. By its size it occludes the sun; the noise of it deafens reason's ear. We do not refer only to those professedly engaged in making riches; the frenzy spreads to all. If only perchance ask how much one must have to live on comfortably, the chorus

* Glddny's "Principles of Sociology" chapter on the demogenic evolution quoted by Dr. Mukerjee.

answer at once, "The utmost you can get." It was said by him of old times, "Life is more than meat;" the modern criterion would seem to be that life is identical with meat and body with raiment."

Prof. Royce বলেছেন, "Industrialism, again involves another curse, the division of labour, as destructive of spiritual, as it is creative of temporal wealth, and not confined any longer to mills and shops, but felt as well on change, at the Bar, in newspaper-making, and even in teaching."

মহাপ্রাণ মিঃ এফ্ এনড্রুজ ফিটালে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় কুলিদের অবস্থা পরিদর্শন করতে গিয়ে ইনডস্ট্রিয়ালিসমের দরুণ ইংলণ্ডের কতটা অপকার হয়েছে, বলেছেন :— The physical status of the families of the manufacturing classes in England was reduced to the lowest point by the rapid industrial changes. The moral conditions were even worse. Children of tender age were reduced to physical wrecks. Young girls were ruined before they reached the age of thirteen or fourteen. Family life became impossible. The barracks in which the labourers lived reeked in immorality.

একজন বিখ্যাত জার্ম্মাণ বার্ত্তাশাস্ত্রবিৎ কলকারখানা জনিত আর্থিক সম্পদে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে বলেছেন, এ যুগ চলতে পারে না—এ আত্মবাদের বদলে শীগ্‌গির অধ্যাত্মবাদ এসে উপস্থিত হবে! তাঁর নিজের কথাগুলো তুলে দিচ্ছি। "আমরা এতদিন জানি নাই, আমাদিগের অর্থলাভের সার্থকতা কোথায়? আমরা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহাতে আমরা সুখ পাই নাই। আমরা এখন অন্য প্রকার কিছু চাই। আমরা বুঝিয়াছি, আমাদিগের দেশে একটা নূতন যুগ আসিতেছে, এ যুগের আদর্শগুলি আমাদিগের বংশধরগণকে একটা নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে। নূতন যুগের ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতা আমাদিগের বৈষয়িক জীবনের পঙ্কিল স্রোতকে নির্ম্মল করিয়া দিবে, মানুষ তখন প্রকৃত শান্তি এবং আনন্দ অনুভব করিবে"। কবি মাথ্যু আরনল্ড্ কলকারখানা জনিত বর্ত্তমান সভ্যতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন, তা তাঁর "The Future"; "The Scholar Gipsy" প্রভৃতি কবিতাগুলি পড়লেই বোঝা যায়। বড় দুঃখেই কবি লিখে গেছেন :—

> This tract which the river of Time
> Now flows through with us, is the plain.
> Gone is the calm of its earlier shore.
> Bordered by cities, and hoarse,
> With thousand cries is its stream.
> And we on its breast, our minds.
> Are confused as the cries which we hear.
> Changing and short as the sights which we see.

গোল্ডস্মিথ Industrialismকে বড় ভাল চোখে দেখতেন না। সামান্য দুটি ছত্রে নিজের মনের ভাব তিনি ব্যক্ত করে গেছেন :-

> Where wealth and freedom reign, contentment fails.
> And honour sinks where commerce long prevails."

এই সমস্ত বড় বড় লেখকদের লেখা থেকে বেশ প্রমাণ হচ্ছে যে তাঁদের চিন্তার ধারা বদলেছে। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে অর্থটাই একমাত্র কাম্য নয়—ধর্ম্মটারও একটু দরকার আছে। যে পাপ য়ুরোপে প্রবেশ করেছে, কারলাইলের মর্ম্মভেদী পরিহাস রসকিনের আদর্শানুরাগ, উইলিয়ম মরিসের সারল্য, টইনবির সমবেদনা ও কার্ল মার্কসের ঐকান্তিক চেষ্টাতেও তা দূর হচ্ছে না। এঁরা সকলে একে বাধা দেবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন কিন্তু পেরে উঠছেন না, যে ভূত তাঁদের ঘাড়ে চেপে বসেছে

তার হাতেই তাঁদের মৃত্যু জেনেও তাকেই আবার নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করছেন। য়ুরোপ আমেরিকা কপালে করাঘাত করে বলছে :—

নিবেছে আশার দীপ ভেঙ্গেছে কপাল !
এখন যে চারিদিকে ঘিরেছে জঞ্জাল।
ভেঙ্গেছে ধূলায় ঘর, সুখ-আশে নিরন্তর—
কত যে যাতনা সহি কত যে লাঞ্ছন !
কিন্তু সে সুখেরে খুঁজে পাইনে এখন !

হয়ত এখন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিলাপ করছেন ; কবে—

"আমার সকল কাঁটা ধন্য হয়ে ফুটবে গো ফুল ফুটবে,
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।"

য়ুরোপের ত এই অবস্থা! কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা করে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে এই যে শ্রমিক বিবর্ত্তন অর্থাৎ Industrial Revolution-এর ভারতে প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে কি না! আস্‌চে বারে তার আলোচনা করব।

শ্রীসন্তোষকুমার দে।

ভারতবর্ষ

মায়ের মত নিলে আমায় কোলে।
হে ভারতী, হে সুন্দরী,
কি রূপ তোমার মরি মরি
মাথায় তোমার লক্ষ মাণিক দোলে!
অঙ্গ তোমার সোনার বরণ
ঘিরে যে রয় সবুজ বসন
চরণতলে নীল সাগরের খেলা—
গাছে ভরা ঘন বনে
মাঠে ঘাটে গিরি-কোণে
কত পাখী কত পশুর মেলা!
কোথাও দেখি কেবল শুধু
ধূসর বালু করে ধূ-ধূ,
কোথাও ধুলা রাঙা রেখাই আঁকে ;
আঁচল তব চপল হাওয়ায়
স্বপন বোনে আলো-ছায়ায়
চমক কোথাও লাগায় পথের বাঁকে!
দিনের আলোয় নয়ন মম
চেয়ে থাকে মুগ্ধসম
কিছুতে সে তৃপ্তি যে না মানে,—
দৃপ্ত তোমার বাহুর ডোরে
বাঁধ আমায় নিবিড় করে'
গোপন কথা কতই যে কও কাণে!

তার পরে ফের দিনের শেষে
সন্ধ্যা ধীরে নাম্‌লে এসে,
ঘোমটা টানি ঘন-কুয়াশাতে,
দাঁড়াও যখন উদাসিনী
মনে হয় যে নাহি চিনি
অচিন্‌ যেন হও গো নিমেষ-পাতে!
আমার সনে লীলা তব
চলে সে যে নিত্য নব,
রাত্রে তোমার রয়না রূপের সীমা!
ঘন নীলে শূন্য গগন
নীরবতায় হয় নিমগন
জাগায় সে কোন্‌ অনন্ত মহিমা!
মায়ের স্নেহে শান্তিবিলান
যেমন আমার কাট্‌ত গো দিন
আপন দেশে সহজ সুখের দোলে—
তেম্‌নি সুখে রাত্রি হলে
ঘুমোই তোমার তারার তলে।
মায়ের মত নিলে আমায় কোলে॥

মিস্‌ গ্লোমিথ্‌ ফ্লাউম্‌।*
শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মূল জর্ম্মান্‌ হইতে অনূদিত

* মিস্‌ গ্লোমিথ্‌ ফ্লাউম্‌ বোলপুর শান্তি-নিকেতনে অধ্যাপনা করিতেছেন।

পাশাপাশি

মৃণালের কথা

নারী-জীবনের যা চরম পরিণতি, অর্থাৎ বিয়ে, তা আমার হয়ে গেছে অনেক দিন,—তবু শান্তি পাই না কেন? তৃপ্তি পাই না কেন? হায়, যা আমাদের সবাই ভাবে, সত্যিই যদি আমরা তেম্‌নি প্রাণহীন হতেম! তবে বোধ হয় সেটা আমাদের পক্ষে ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ হতো। প্রাণের স্পন্দন থেকেও তার ওপর এমন দলন, কখনো কখনো আমাদের এই সর্ব্বংসহাদেরও অসহ্য হয়ে ওঠে; তাই বল্‌ছিলাম সত্যিই যদি আমাদের সে সাড়া না থাক্‌ত!

গরীব বেচারী বাবা ১৫ বছরের মেয়ে নিয়ে যে বিপদে পড়েছিলেন! যদি শ্বশুর মশায় দয়া করে বিনা পণে আমাকে পুত্রবধূ না করতেন, তবে কি বাবার সাধ্য হতো, এমন ধনীর ঘরে মেয়ে দিয়ে শান্তির নিশ্বাস ফেল্‌তে? যাক্‌, বাবা সে নিশ্চিন্তে দু'বেলা দুটো ভাত মুখে দিতে পাচ্ছেন, এত বড় মেয়ে হলো বলে লোক-গঞ্জনার কথা তুলে মা চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে সংসার-যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই নিতে চেয়ে বাবাকে অর্দ্ধেক খাওয়া শেস না হতেই উঠে যেতে বাধ্য কচ্ছে‌ন না, এই কথা ভেবেই এখন আমি শান্তি পেতে চেষ্টা করি।

প্রথম প্রথম স্বামীর কাছে খুব আদর পেতাম, কিন্তু ক্রমেই সে আদরের, সে আবেগের পরিবর্ত্তন হতে হতে শেষে এখন একটা কথা বল্‌বারও কোন কোন দিন কেন অবসর পান না, সে কথা আগে না বুঝলেও এখন বুঝেচি। যখন বুঝিনি, তখন একদিন সকালে যখন উনি টয়লেট্‌ টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন, সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালাম—উনি একবার ফিরে তাকানো আবশ্যক বোধ কল্লেন না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চোখের জল যখন পড়-পড় হয়ে উঠ্‌ল, তখন হঠাৎ বলে ফেল্লাম, "তুমি এখন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর কেন? আমি তোমার কি করেছি?" শেষের কথা কটা কান্নায় জড়িয়ে গেল। উনি ফিরে তাকিয়ে বিরক্তি-মাখা সুরে বল্লেন, "কেন, কি মন্দ ব্যবহারই বা আমি তোমার সঙ্গে করি? তোমায় কোন দিন জোরে কথা বলেচি, বল্‌তে পারো? তবে? ছিলে ত কোন্‌ অজ-পাড়াগাঁয়ে ভূতের দেশে, বাসন মাজ্‌তে আর ঘর নিকুতেই হাতের তলা ক্ষয়ে যেত! এখন দিব্যি আরামে কলের জলে নাচ্ছ, স্প্রিংয়ের খাটে শুচ্ছ, বিদ্যুৎ-সুন্দরীর নিরলস সেবা পাচ্ছ, আর চাও কি? এততেও যদি তোমার মন না ওঠে, তবে তো আর পারা যায় না!" ঠিক্‌ কথা! এত সুখ দিয়েও যদি লোকে আমার মন না পায়, তবে সেটা আমারই মনের অপরাধ, লোকের নয়! সেইদিন থেকে আমি ওঁকে আর কিছু বলি না। শাশুড়ী অনুযোগ করেন, বাক্সভরা গয়না রয়েছে, পরি না কেন? কিন্তু এ-সবে যে আমার তৃপ্তি আসে না, সুখ পাই না, এ কথা কেউ বুঝ্‌তে চায়না, আর বুঝ্‌লেও সেটা ফুলবাড়ীর জমীদার-বধূর অন্যায় অতৃপ্তি! দেখে সবাই অবাক্‌ হয়। যে বাড়ীর বাড়ীর যে প্রথা! এতকাল আমার শাশুড়ী দিদি-শাশুড়ী, তাঁদের শাশুড়ীরা যেটা নির্ব্বিবাদে সহ্য করে এসেছেন, —আমি দুদিন এসেই সেটা অসহ্য ভেবে একেবারে নিজস্ব করে স্বামীকে আঁচলে বাঁধ্‌তে চাই, এত বড় দুর্নিবার আশা, আর সে আকাশ-কুসুম সফল না হওয়ায় দুঃখ পাওয়াটা সকলেই বিরক্তির চোখে দেখেন। কিন্তু সত্যকে চেপে, মিছে কতকগুলো গয়না-কাপড় পরে লোক দেখিয়ে সুখে আছি জানানোর চাইতে, এ স্বরূপ দেখিয়ে লোকের অপ্রীতিভাজন হওয়াও আমার ঢের বেশী সহ্য হয়। দিনের পর দিন কাটে, নভেল পড়ে, লেশ বুনে আর ছাদে ঘুরে। আর কি কর্‌বো? কোন কাজ তো ধনী-বধূর করবার নয়।

আমাদের বাড়ীর পাশের বাড়ী একটী মেয়েকে দেখে আমি বেশ আনন্দ পাই। অনেক সময় জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে আমি ঐ মেয়েটীকে দেখি। বয়সে বোধ হয় আমার চেয়ে কিছু বড়ই হবে। কি সুন্দর ওর জীবন-যাত্রার প্রণালী! আমার ভারী ভালো লাগে। কখনো দেখি, আপন-মনে

গান গাচ্ছে, কখনও দেখি বাগানে খেলা কচ্ছে, কখনও বা বই হাতে পড়া মুখস্থ কচ্ছে। কেমন নিশ্চিন্ত আরামে ওর দিনগুলো কাটে! ওর স্বামীর সঙ্গে নিশ্চয় খুব ভালবাসা হবে! কেন হবে না? ওরা নিজে দেখে শুনে মনের মিল হলে বিয়ে করবে। আমাদের মত জোর করে ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া নয়, যে. স্বামীর পছন্দ হল তোমায় আদর-যত্ন করলো, পছন্দ হলো না,—বাস্! যেমনই কেন সে ব্যবহার করুক্ না, তাতে অখুসী হওয়া স্ত্রীরই অপরাধ।

আজ খুব ভোরে, তখনও বিছানা ছেড়ে উঠিনি, একটা বিরাট অতৃপ্তি আর নৈরাশ্য এসে মনটাকে এমন চেপে ধরেছিল যে জেগে থাক্‌লেও উঠ্‌তে একটুও ইচ্ছে কচ্ছিল না। পাশে চেয়ে দেখলাম, কাল যেমন পাড়া হয়েছিল,বালিশটা তেমনই মস্তক-সংস্পর্শ-শূন্য রয়েছে! নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলাম।

ঝির্-ঝিরে প্রভাতী বাতাসের সঙ্গে ও বাড়ী থেকে গানের সুর ভেসে এসে আমায় বিছানা থেকে উঠিয়ে দিল, "প্রথম ফুলের পরি প্রসাদখানি, তাই ভোরে উঠেছি!" জানলার গরাদে ধরে দাড়িয়ে দেখলাম্, ওদের জানলার পাশের অর্গেনটাকে নানা ফুলে সাজিয়ে নিয়ে মেয়েটী বাজিয়ে গাইছে। কি সুন্দর লাগ্‌ল, কি বল্‌বো! কি, কি, ঐ লাইনটা কি? "সকাল-বেলার ছেলে খেলার ছলে সকল শিকল টুটেছি!" চমৎকার! বাঁধা শেকল কি খোলা যায়? ত কি কখনও ছেঁড়ে? বোধ হয়, ছেঁড়ে! যদি তাতে মর্চে ধরে! কতকগুলো ফুল হাতে গেরুয়া রঙের শাড়ীখানি দুলিয়ে মেয়েটি গান বন্ধ করে দিলে। সুরের রেশ তখনো রাগিণীতে ভেসে বেড়াচ্ছিল। এখন ও কি করবে? বোধ হয় পড়বে! আহা, যদি জীবন হতে হয় তবে অমনই। আমার যদি অমন জীবন হতো!

উৎপলার কথা

ইস্, কি গরমই পড়েছে! কিছুতেই মন বসচে না,—না গানে, না খেলায় আর না পড়ায়। ফ্যান্ খুলে দিলুম, আরে বাপ রে! সে বাতাস আরো অসহ্য। এখনি হয়ত শেফালি আস্‌বে। কদিনই ত আস্‌বো-আস্‌বো বলছে। কি দরকার ওর আমার কাছে? বোধ হয়, পড়াশোনার সম্বন্ধেই কোন খবর। যে মেয়ে, যদি পড়ায় একটুও মনোযোগ থাকে! কেবলই সৌখীন সাজগোজ্ করে আজ এ পার্টিতে কাল ও পার্টিতে ছুট্‌চে। বল্‌তে গেলে সারা গরমের ছুটীটাই প্রায় ঐ করে কাটাচ্ছে। তা পড়া-শোনার কথা মনে থাক্‌বে কি!

ও বাড়ীর বৌটী জানলার ধারে বসে বসে কি একটা লেশ বুনছে। বৌটীর চেহারাখানি ভারী মিষ্টি আর করুণ! তাই ও যখন ও-বাড়ীতে বছর দুয়েক আগে বিয়ে হয়ে এল, তখন আমি ওর সঙ্গে আলাপ করবো মনে করেছিলাম।

কিন্তু এতদিন পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও আমাদের এই দুই পরিবারের মধ্যে আলাপ হয়ে ওঠেনি তার কারণ, মায়ের একটু বেশী সভ্যতাভিমান, আর ভয়ানক বেশী ও-বাড়ীর গিন্নীর শুচিবাই আর আভিজাত্যাভিমান। তাই বাইরে বাইরে পুরুষ-মানুষদের ভেতর মৌখিক আলাপ থাক্‌লেও তার চর্চ্চা রাস্তায় দাঁড়িয়েই চলে, সেটাকে বাড়ী অবধি আন্‌বার আগ্রহ কোন পক্ষেরই নাই। তাই ঐ বৌটী আস্‌বার পর যখন আমি মাকে জানালাম যে যেচে গিয়েই না হয় আলাপ করে আস্‌বো। তখন মা বল্লেন, "না না,খবরদার,তা কর্‌তে যেয়ো না। গিন্নি যে রকম আচারে শুনি, তাতে উনি তোমার ছায়াটীত পছন্দ কর্‌বেনই না, তা'ছাড়া তুমি চলে আসবার পর গোবর-জল ছিটিয়ে বাড়ীটাকে শুদ্ধ করবেন"—তাই শুনে যেতে আর সাহস হয়নি। জানলা দিয়ে যে কথা বল্‌বো তারও উপায় নেই। মা বলেন, অত চেঁচিয়ে কথা বলা অসভ্যতা! তার উপর তুমি বল্‌লেও ওকথা বল্‌বে কি করে? ও যে হিন্দু ঘরের বৌ। কল্‌কাতার মত গায়ে ঘেঁসা ঘেঁসা বাড়ী ত, আমাদের এই বালিগঞ্জের বাগান-বাড়ী ছুটো নয়। আমি যখন যা করি, ও কেমন যেন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে, যখন গান করি, জানলার গরাদেয় কপাল চেপে শোনে। আমিও এমন মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে যতগুলো আমার মনের মত গান আছে, একে একে তাই

গাওয়া সুরু করি। বাবা পিয়ানোর চাইতে অর্গেনে গান শুনতে বেশী ভালবাসেন, তাই আমি এইটেই বেশী জানাই। মা কিন্তু পিয়ানোটাই পছন্দ করেন।

পাঁচটা বেজে গেছে। ছটার সময় দাদার বন্ধু মিঃ রায়ের আস্‌বার কথা আছে। ইনি মস্ত বড় লোক্, ঝরিয়ার ওদিকে নাকি কি কোলিয়ারী আছে। এইবার উঠে কাপড়-চোপড় ছাড়া যাক্, গরমও একটু যেন কমে এল!

"মিস্ পলি, ঘরে আস্‌তে পারি?" "এস" বলে উঠ্‌তেই, শেফালি এসে সোফায় কাৎ হয়ে বসলো, বললে, "অনুগ্রহ করে যদি ফ্যানের সুইচ্‌টা টেনে দাও। উঃ, কি গরমই পড়েচে!" সুইচটা খুলে দিয়ে এসে সোফার একপাশে বসে পড়লুম। সোফি বললে, "কি করে ফ্যান বন্ধ করে ঘরের ভেতর ছিলে?"

"ও গরম বাতাসের চাইতে এই গরমই ভাল লাগ্‌ছিল—সে জন্যে খুলিনি।"

"ওঃ, তবে ত আমি এসে তোমার অসুবিধেয় ফেল্লুম!" ওর পিঠে ছোট একটা চড় দিয়ে বল্লুম, "থাক্, হয়েচে। আর বেশী ভদ্রতায় কাজ নেই। তার চেয়ে চল একটু বাগানে বেড়িয়ে আসা যাক্, রোদটাও পড়ে এসেচে।" বলে উঠে আম্‌রা দুজনে বাগানে গেলুম।

বাগানে একটু ঘুর্‌তে ঘুর্‌তেই মিঃ রায়ের প্রকাণ্ড কার আমাদের গাড়ী-বারান্দায় ঢুক্‌ল।

সোফি বললে, "কে এলেন?"

"মিঃ রায়, নাম শোনোনি? দাদার বন্ধু।"

"নাম শুনেচি বইকি, তবে দাদার বন্ধু বল্‌লে যে? এখন বোধ হয় তোমার বন্ধু বল্‌লেই সত্যি কথা হয়—কেমন নয়?" বলে সোফি একটু বেঁকা হাসি হাস্‌ল।

"চল, ইণ্ট্রোডিউস্ করে দিইগে" বলে সোফির হাত ধরে ড্রইং-রুমের দিকে চল্‌লুম! আমরা ঘরে ঢুক্‌তেই মিঃ রায় এসে আমার হ্যাণ্ড সেক্ করলেন ও সোফির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন। আমি পরিচয় করিয়ে দিলুম।

বয় চা দিয়ে গেল; দুধ চিনি মিশিয়ে আমি সকলকে পরিবেষণ কল্লুম। মা আমার দিকে বার বার অগ্নি-দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন, তার কারণ আছে। আমি যা পরে সর্ব্বদা থাকি, এখনও সেই সব কাপড়ই আমার পরা ছিল। মিঃ রায়ের আস্‌বার কথা থাক্‌লেই মা আমাকে বেশ-ভূষার দিকে একটু নজর দেবার জন্যে তাড়া দেন, আজও দিয়েছিলেন। কিন্তু—দুপুরের অসহ্য গরমের পর যখন ঠাণ্ডা পড়ি-পড়ি কচ্ছিল, তখনই শেফালি এল। তখন আর ও-সব করবার সময় পেলুম কৈ? সোফির সাম্‌নে কাপড় চোপড় বদ্‌লাই, আর ও যা মেয়ে তাই নিয়ে একটা মস্ত কিছু সৃষ্টি করে ফেলুক! কলেজ-সুদ্ধ মেয়েকে শেষে আমার পিছনে লাগিয়ে দিক্ আর কি!

একে সোফি সুন্দরী, তাতে চমৎকার সেজে এসেছিল; তার ওপর বাগানে গিয়ে এদিকে সেদিকে দু'চারটে ফুল লাগিয়ে আরো বাহার খুলে দিয়েছিল। মিঃ রায়ের মুগ্ধ দৃষ্টি বার বার ওর ওপর পড়্‌ছিল, সোফিও খুব অবাধে তাঁর সঙ্গে গল্প চালিয়েছিল। আটটা বাজ্‌ল। সোফি "রাত হ'য়ে গেল এখন উঠি"—বলে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সোফি যাওয়ার পর একটু এ কথা সে কথার পর মা মিঃ রায়কে বল্লেন, "শেফালিকে তোমার কেমন বোধ হল?"

"চমৎকার, আর কথা-বার্ত্তায় বেশ বোঝা যায়, কলেজের পড়া ছাড়া আরো অনেক পড়া-শোনা করেন।" আমি মনে মনে হাস্‌লুম। সোফির যে কত বিদ্যানুরাগ, তা তো আর আমার অজানা নেই। মায়ের মুখ কিন্তু মিঃ রায়ের মন্তব্য শুনে অন্ধকার হয়ে উঠ্‌ল। সোফি কতকগুলো বড় বড় কবির কবিতা, কথা মুখস্থ করে রেখেছে, কায়দা করে কথাবার্ত্তার মধ্যে সেগুলো চালিয়ে দেয়—ফলে সহজেই মনে হয়, ওর অনেক বিষয় জানা। মজ্‌লিস্ আর ভালো জম্‌লো না। মিঃ রায় যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়্‌ছিলেন; তারপর আমাদের "শুভরাত্রি" জানিয়ে বিদায় নিলেন।

মা উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"কোন্‌কালে যে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি হবে পলি, তা ত আমি ভেবেই পাইনে! কি দরকার ছিল তোমার আজ শেফালিকে আসতে বল্‌বার? আর কাপড় ছেড়ে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে না তোমায় দশবার বলেছি! ঐ ত শেফালি, কেমন সেজে এসেছিল,

কি এমন বিশেষ ব্যাপারে আস্‌ছে, তাও নয়, ওদের বুদ্ধি, ওদের কথা ক'বার কায়দাই আলাদা!" আমি কোন উত্তর দিলুম না, আমি যে আজই বিশেষ করে সোফিকে আস্‌তে বলিনি, তাও বল্লুম না, কোন কথা বল্‌তে ইচ্ছে করছিল না। ভারী শ্রান্ত বোধ করছিলেম্। রাত্রে কিছু খাবনা বলে এসে শুয়ে পড়্‌লুম।

মা বোধ হয় ভাবলেন, বকুনি খেয়ে রাগ করেছি! মোটেই তা নয়। এম্‌নি আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছিল না। আঃ, কি বিরক্তিকর জীবনই হয়েচে!

মৃণালের কথা

আজ ক'দিন ওঁর দেখা নেই! মা বল্‌ছেন, সেটা আমারই অপরাধ! সেদিন ত আমার শাশুড়ী পিস্‌শাশুড়ীকে লক্ষ্য করে আমায় শুনিয়ে বল্লেন, "যোগেশ ঘোষ দশ হাজার টাকা নগদ নিয়ে কত সাধাসাধি করলে, কর্ত্তার মত হলো না, মেয়ের রং একটু ময়লা বলে! এই যে বেছে বেছে ডোমের চুপ্‌ড়ী ধুয়ে বৌ আন্‌লেন শুধু রূপ দেখে, তা এখন কি কাজে লাগ্‌চে, বল? যে কে সেই! নরুর ত আমার যে বাইরে টান, সে বাইরে টানই থেকে গেল! আর বৌকেও বলিহারী যাই, কোথায় একটু সেজেগুজে তার কাছে দাঁড়াবে বা বস্‌বে, তা নয়—তার সাম্‌নেও ঐ উস্কোখুস্কো বিশ্রী মূর্ত্তি,—পুরুষ মানুষ সে, ঘর-বাসী হবে কি দেখে?" সেদিন থেকে ওঁদের সাম্‌নে বড় একটা যাই না। দুঃখের উপকরণ সাম্‌নে থাকলে দুঃখটা বেশী করে উথলে ওঠে, চোখে না পড়্‌লে তবু একটু চাপা থাকে!

জান্‌লার ধারে বসে আছি, কত কথা মনে পড়্‌ছে, কোনটারই শেষ পাচ্ছি না। যশোদা ঝি এসে বললে, "মা তোমায় নাইয়ে দিতে বল্লেন গো বউদিদি, ঘুরে বসো—তেল মাখিয়ে দি।" ঘুরে বসলাম, যশোদা তেল ঠাস্‌তে ক্রমে তেল চুঁইয়ে কপাল বেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। কিছু বল্‌বো না, মনে করেছিলাম—সাজাও, তোমাদের মনের মতন করেই সাজাও, আমি শুধু তোমাদের বৌ, আমি কারু মেয়ে নই, আমার নিজের কোন ইচ্ছে নেই, আমি শুধু তোমাদের বৌ! গায়ে সর-ময়দা ডলে ডলে ময়লা তুলে দেওয়া আর দেহের ওপর যত্ন করার উপদেশ সারা হলে কল-ঘরে নাইতে নিয়ে গেল। সেখানে এক ঘণ্টা কাটাবার পর মাথা মুছে ঘরে ঢুক্‌তেই ননদ এসে বললে, "ও কি, ওই ভিজে চুল নিয়ে ঘরে ঢুক্‌ছ কেন? এস, নেড়ে শুকিয়ে দি, নইলে যে চুলের রাশ,—ও তো বিকেলে চুল বাঁধ্‌বার সময়ও ভিজে থাক্‌বে।" আজ ওঁর ওপরে আমাকে সাজাবার ভার পড়েছে, তাই চুল শুক্‌নো কর্‌বার তাড়া। রোজ নিজে বাঁধি, ইচ্ছে হলে বাঁধি, না হলে নয়, যদি ভিজে থাকে—প্রায়ই তা থাকে, তা'হলে অম্‌নিই রেখে দিই। ভাত এলে চুল শুকোনোর ব্যাপার থেকে ছুটী পেলুম। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে মেঝেয় একটু শুলুম। তিনটে বাজ্‌তে না বাজ্‌তে ননদ এসে টেনে তুলে, চিরুণী, তেল, জল আর চুলের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু করে দিলে।

আজ এ বিষয়ে তার যে একটু অভিজ্ঞতা আছে, তা আমার ও'পর দিয়েই ত প্রকাশ পাবে! ঘণ্টা দেড়েক্ পরে যখন চুল বাঁধা শেষ হলো, তখন চোখ খুল্‌তে চুলের পাতা চোখের পাতায় ঠেকে প্রায় এই রকম অবস্থা। প্রকাণ্ড পঞ্চাশ-গুছির বিনুনির খোঁপা ওপরেও মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, নীচেও ঘাড়ে ঠেকেছে। তারপর আবো ঘণ্টাখানেক কল-ঘরে সাবান ছোব্‌ড়ায় মেজে নিয়ে এসে সাজাতে বস্‌লো। গোলাপী রঙের সাড়ী, সবুজ রঙের বডি পরিয়ে রাজ্যের গয়না গায়ে দিয়ে, গালে চক্রাকৃতি করে রুজ্ লাগিয়ে, পাউডার দিয়ে, কপালে কাঁচ-পোকার টীপ পবে, আলতা পরিয়ে দিয়ে হাত ধরে আমাকে শাশুড়ীর কাছে দেখাতে নিয়ে চল্ল। "বৌকে কেমন দেখাচ্ছে, পিসিমা?" শাশুড়ী খুসীর হাসি হেসে বল্‌লেন, "তা দেখো ঠাকুরঝি, প্রমীলা আমাদের সাজাতে শিখেচে বেশ। দেখাচ্ছে ভালো! এই তো চাই! তা নয়, না আছে তেল, না আছে জল, যেন সং হয়ে বেড়ায়।" ননদের কাজ শেষ হয়েছিল, সে আমায় ছেড়ে দিয়ে নিজের চুল বাঁধ্‌তে গেল।

আমি আমার নিরালা ঘরে জান্‌লার পাশে এসে

বস্‌লাম। সেই মেয়েটী হাতে একখানা ফটো নিয়ে বাগানে এসে দাঁড়াল; সে বারবার সেখানা দেখ্‌ছিল আর তার পিছনে কি লেখা আছে, তাই পড়্‌ছিল, আমার দিকে চোখ্‌ পড়্‌তে চট্‌ করে গাছের আড়ালে চলে গেল। আমিও সেখান থেকে সরে গেলাম। ওদের ঐ সুশোভন পরিচ্ছন্ন সাজের কাছে আমার এই আড়ম্বরে-ভরা সাজ দেখাতেও লজ্জা করে! ও হয়ত ভাব্‌চে, বৌটার কি কুশ্রী রুচি! আচ্ছা, ঐ ফটোখানা কার?—যা ও অত আগ্রহ করে দেখেছ? বোধ হয় যার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, ওর সেই ভাবী স্বামীর। ফটোর পিছনে না জানি কি মিষ্টি প্রাণ-ভরা কথাই লেখা আছে যা হাজার বার পড়েও ওর সাধ মিট্‌ছে না! পায়ের শব্দে ফিরে চেয়ে দেখি, স্বামী। চুলগুলো উস্কো-খুস্কো চোখদুটো লাল, মুখখানাও ভারী শুক্‌নো দেখাচ্ছে। খাটের ওপর দু-তিনটে বালিস উপরোউপরি সাজিয়ে তার ওপর আড় হয়ে শুয়ে পড়ে বল্লেন, "তিন দিন আসিনি বলে রাগ করেচো না কি? সত্যি বল্‌চি, বড় দরকার ছিল। বিশ্বাস করলে না বুঝি?" আমি শুধু বল্লাম, "না,—রাগ কর্‌বো কি জন্যে?" তারপর একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, "যাক্‌, দেখ, এই—এই শরাদন্দু তার বৌয়ের জন্যে গয়না গড়াবে, তাই তোমার গয়নাগুলো সব একবার দেখতে চেয়েছে।" আমি বল্লাম, "সব গয়না তো আমার কাছে নেই, মায়ের কাছ থেকে চেয়ে এনে দিচ্ছি।"

"না,না, তাতে দরকার নেই,তোমার গায়ে যা আছে,তাই দাও। আমার বল্‌তে ভুল হয়েচে, সবগুলো চায়নি" বলে উনি ব্যস্তভাবে উঠে বসলেন। আমি শাঁখা, আর সোনা বাঁধানো নোয়া গাছা ছাড়া সব গয়না খুলে দিলুম। গয়নার দরকার যে কি, তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। উনি গয়নাগুলো পকেটে পুরে নিয়ে একটু হাসি-মুখে বল্লেন —"তবে চল্লুম, এখুনি তার দরকার কি না! মিছে দেরী কল্লে মনে কিছু ভাবতেও পারে। মা হয়ত এখন সন্ধ্যে কর্‌তে বসচেন,তাঁকে বলো, আমি এসেছিলুম। হ্যাঁ, আর দেখো, আজ রাত্রে বোধ হয় আমি আর আস্‌তে পার্‌বো না। প্রফুল্লরা বড় ধরেচে তাদের থিয়েটার দেখাতে হবে।"

বাগানের দিকের দরজা দিয়ে উনি বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে ননদ প্রমীলা এসে বললে, "বৌ, দাদার গলা যেন শুনলুম, এসেছিল না কি? ও মা, ও কি তোমার হাত গলা সব খালি কেন?"

"তোমার দাদা সব নিয়ে গেছেন।"

"সে কি কথা! আর তুমি দিলেই বা কেন?"

"চাইলেন যে।"

"চাইলো বলেই দিয়ে দিলে? বলি রীত-চরিত্তির যে তার না জানো তা তো নয়!"

আমি কথা বল্লেম না। প্রমীলাও খবরটী প্রচার কর্ত্তে তখনি বেরিয়ে গেল।

তারপর শাশুড়ী থেকে আরম্ভ করে, ঝী বাম্‌নী আশ্রিত অনুগত, আত্মীয়, সবাই একে একে এসে কেউ বা তিরস্কার কল্লেন, কেউ বা উপদেশ দিলেন, আবার কেউ কেউ সমবেদনাও জানিয়ে গেলেন। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তবু সে অন্ধকার বোধ হয় আমার মনের অন্ধকারের মত অত কালো নয়! সাড়ী জামা সব খুলে, একখানা সাদা কাপড় পরে শুয়ে পড়লাম। যশোদা এসে আলো জ্বালিয়ে বললে, "এমন অন্ধকারে একলাটি শুয়ে রয়েছ কেন বৌদি?"

"আলো নিবিয়ে দাও, আমাকে রাত্রে আর খেতে টেতে ডেকো না, আমার বড় মাথা ধরেচে আর উঠ্‌তে পারবো না।"

"অন্ধকারে থাকবে! আলো জ্বালুক না!"

"না, না তুমি আলো নিবিয়ে দিয়ে চলে যাও, আলোর কিছু দরকার নেই।"

যশোদা একটু হেসে আলো নিবিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেই অন্ধকারের ভেতর শুয়ে শুয়ে কেবলই ওই ও-বাড়ীর মেয়েটীর সুখের কথাই মনে পড়্‌ছিল। কি তৃপ্তিতে আজ ওর মনটী পরিপূর্ণ! ঐ যে, সেই মেয়েটীই গাইছে,—

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসাল নন্দনে!"

আঃ, ধীরে ধীরে সব দুঃখ, সব গ্লানি ঘুমের স্বপ্নতুলির জোছনা পরশে জুড়িয়ে এল।

উৎপলার কথা

পরশু মিঃ রায়ের সঙ্গে শেফালির বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখলুম, না যাওয়াই ভাল ছিল! আমায় দেখে যেন সবার ঠোঁটেই একটু বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। সোফির বিশেষ বন্ধু মীরা স্পষ্টই বললে, কি মিস্ পলি যে! আমরা মনে করেছিলুম, হাতের মোয়া কেড়ে খাওয়া আর তুমি নিজে চোখে দেখ্‌তে আসবে না! বন্ধু-মহলে রসিকা বলে মীরার খ্যাতি ছিল, ওর কথা শুনে সবাই খুব হেসে উঠ্‌ল, যেন কি একটা মস্ত রসিকতাই করেছে! আমার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল বললুম, "ভারী অন্যায় তোমাদের ওসব মনে করা।" আর কোন কথা বল্‌তে প্রবৃত্তি হলোনা, আর মুখে কিছু যোগালও না। তখনি চলে আস্‌তে ইচ্ছে হলো, কিন্তু তাহলে হাসির মাত্রা আরো বেড়ে যাবে বলে সে ইচ্ছে মনেই চেপে রাখলুম। মিঃ রায়কে আমি প্রীতির চোখে দেখলেও ঠিক্ প্রেমের চোখে তখনও পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পারিনি। আমি যাকে প্রীতির গণ্ডী ছাড়িয়ে একটু অন্য চোখে দেখেছিলুম, সে এখন বিলেতে। প্রথম প্রথম দি-মেলেই চার পাঁচ পৃষ্ঠা ভরা চিঠি পেতুম, কিন্তু ক্রমেই পৃষ্ঠা কম্‌তে লাগ্‌ল, তারপর দু-এক মেল বাদ যেতেও আরম্ভ হলো। আজ বছর খানেক ত কোন খবরই নেই। মা তার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, আমিও একরকম ছেড়ে দিয়েছিলুম; কিন্তু একেবারে ছাড়্‌তে পারিনি, সে আশা ছাড়্‌তে আমার অন্তরে ব্যথা বাজে।

"চিঠি হ্যায়।" বাইরে বেরিয়ে চিঠিগুলো নিয়ে দেখলুম, একটা প্যাকেট কেবল আমার। সেইটে নিয়ে বাকীগুলো ট্রের ওপর রেখে দিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলুম। কতদিন—কতদিন পরে সেই চির-পরিচিত হাতের লেখায় নিজের নাম দেখ্‌লুম! সে যে কত যুগ দেখিনি!

সে কি পাঠিয়েচে—আমায়? এতদিন পরে! প্যাকেটটা খুল্‌তে আশার আনন্দে আমার বুক দুর দুর করছিল। একখানা ফটো! একটী তরুণী মেম বসে রয়েছেন আর সেই চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে···ও কে ও? উঃ······

ফটোর পিছনে দু'লাইন লেখা, "আমাদের এই তরুণ দম্পতীর মধ্যে যেন চিরকাল প্রেমের, প্রীতির সম্বন্ধ অটুট থাকে, আমাদের হয়ে তুমি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাটুকু করো,—বন্ধুর প্রতি এই বন্ধুর অনুরোধ।"

বন্ধুর প্রতি বন্ধুর অনুরোধ? না, না, কেউ নও, তুমি আমার কেউ নও! প্রেমের, প্রীতির সম্বন্ধ অটুট থাকে, এই প্রার্থনা করবো? দেখি, যদি পরে তা পারি! কই এখন তো পারছি না।

বড় গরম বোধ হচ্ছে। আমার মনের ভেতরেও যেন আগুন জলছে! একটু বাগানে যাই। সেই বৌটী খুব সেজে-গুজে জান্‌লার কাছে বসে রয়েছে; সেখান থেকে সরে একটা ঝোপের আড়ালে গেলুম। কি সুখী ঐ বৌটী! কি চিন্তালেশহীন আনন্দময় জীবন ওর! কারো কাছে জীবন-নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়ে, ঠেলে-ফেলা সেই অপমানের গুরুভার বয়ে বেড়ায় না। অম্লান, শুভ্র মনখানি নিয়ে ও একজনের নিজস্ব হয়েছে।

যৌবন যখন সাড়া দিয়ে উঠেচে, তখনই ও দেখ্‌তে পেয়েচে, হৃদয়ের দেবতা পূজা গ্রহণের জন্য প্রেম-ভরে হাত দুটি মেলে রয়েছে! কি তৃপ্তি, আঃ কি শান্তি!

হাজার বার দেখেও যেন আমার দেখবার সাধ মিটচে না। সন্ধ্যে হয়ে এল। বাবা এলেন। বাক্সের নীচে কাপড়ের তলায় ফটোখানা রেখে দিয়ে, চোখে-মুখে জল দিয়ে, কাপড় বদ্‌লে ড্রইং-রুমে গেলুম। আমার দেরী দেখে মা চা ঢেলে বাবাকে দিয়েছিলেন, নিজেও নিয়েছিলেন। আমি একটু লজ্জিত মুখে চা ঢেলে নিয়ে খেতে লাগলুম।

বাবা বল্লেন, "তোর মুখখানা অমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন মা?"

"কৈ, কিছু তো হয়নি বাবা। মাথাটা একটু কেমন ধরেছিল, তা এখন সেরে গেছে।"

মা বললেন, "তা হবে না? দিন রাত্তির কেবল ঘরের ভেতর থাকবে! কি বইয়ের পোকাই হয়েচ!" · · ·

কোন কথা না বলে অর্গেনের পাশে গিয়ে বসলাম। বাবা ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "থাক্, থাক্ আজ্‌কে! শরীরটা তোর ভাল নেই মা—"

"না বাবা, ও কিছু নয়। আর বল্‌লুম ত এখন ভাল

আছি" বাজাতে সুরু করে দিলাম। সারাদিনের শ্রান্তির পর আমার গান শুন্‌তে যে বাবা কত ভালবাসেন! তাঁকে সেই সামান্য সুখটুকু থেকেও বঞ্চিত করবো?

খানিকটা এ সুর ও সুর বাজিয়ে সেই গানটী ধরলুম—"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব—"

সত্যি, আর যেন এ জীবনের বোঝা বইতে পারছি না, বড় ভার লাগ্‌ছে! ভগবান, যদি দয়া করে মুক্তি দাও।

শ্রীচিত্রলেখা চৌধুরাণী।

আলোচনা

শাস্ত্রের দোহাই

কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া আমাদের দেশে পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। আবার বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া হিতোপদেশ পর্য্যন্ত সমস্তই শাস্ত্র! তাহার ফল হইল এই যে কোন বিষয় লইয়া শাস্ত্রীয়-তর্ক আরম্ভ হইলে হাজার হাজার বৎসরেও তার শেষ হয় না। ব্যবসায়ীদের হাতে শাস্ত্র পড়িয়া উহার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে, কার্য্যক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকরূপে শাস্ত্রের সাহায্য পাওয়া যায় না। উদাহরণ-স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি!

"একাদশীতে অসমর্থ বিধবা জলগ্রহণ করিতে পারিবে কি না" এই লইয়া কত তর্কবিতর্ক হইয়া গেল: কিন্তু মীমাংসা হইল না—হওয়া অসম্ভব। কোন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে সত্য সত্যই কি কেহ জল না পাইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন? আশ্চর্য্য! মনুষ্যত্ব লজ্জা প্রভৃতি লজ্জা পাইয়া আমাদের দেশ হইতে পলায়ন করিতেছে! আর একজন পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছিলেন যে রবিবাবু নিরেট মূর্খ, কারণ তিনি লিখিয়াছেন, "সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে"—। অহঙ্কার immaterial আর চোখের জল material—সুতরাং চোখের জলে অহঙ্কার ডুবিতে পারে না! ব্যস্!

এ-সব বলার উদ্দেশ্য এই যে আমরা বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার সমর্থক কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করি নাই। তাহার কারণ, পণ্ডিত মহাশয়দের হাতে পড়িলে তাঁহাদের সংস্কার-বিরোধী বেদবাক্যও 'অনুবাদ' 'হেতুবাদ' 'অপবাদ' প্রভৃতি 'বাদের' খানা-ডোবায় পড়িয়া পচিতে থাকিত। স্ত্রীলোকের চিরকৌমার্য্য, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রভৃতির সমর্থক স্মৃতি-বাক্যের অভাব নাই। তারপর শাস্ত্রবাক্যের অর্থ লইয়া বেগতিক দেখিলে আধ্যাত্মিক অর্থের পালা আসে।

প্রাচীন ভারতের সাক্ষ্য

আমাদের আলোচনার ভিত্তি থাকিবে ভারতের ইতিহাস, বর্ত্তমান সমাজের বাস্তব অবস্থা ও যুক্তি। অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণের পক্ষপাতী হইলেও চলিবে না। তবে যদি কোন জিনিষ আমাদের প্রয়োজনীয় ও উপযোগী হয়, তবে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিব। আমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, ভারতের বৈশিষ্ট্যের সহিত উহা খাপ খাইবে কি না। কিন্তু আমাদের ধারণা, যে সমাজে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বিদেশীর দ্বারস্থ মোটেই হইতে হইবে না। আমাদের নিজেদের প্রাচীন সমাজের দিকে তাকাইলেই তাহা বেশ বোঝা যায়।

আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা যে খাঁটী ভারতীয়, তাহার দুই একটী প্রমাণ দিতেছি, কিন্তু স্মৃতি বাক্য দিয়া নয়—ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া—। এখানে 'অনুবাদ' 'হেতুবাদ' প্রভৃতি আনিয়া তর্কের জের টানা চলে না: উহা প্রত্যক্ষ সত্যের মত উজ্জ্বল। তাই বাক্-বিতণ্ডার পথ ছাড়িয়া এই সহজ পথ ধরিয়াছি।

মেয়েদের বিবাহের বয়স, স্বামী-নির্ব্বাচনের অধিকার প্রভৃতির একটী মাত্র প্রমাণ দিতেছি, সেটী—সাবিত্রীর বিবাহ। 'সাবিত্রী-সমানা ভব' বলিয়া যে আশীর্ব্বাদ প্রচলিত, যে সাবিত্রীর ব্রত হিন্দুর ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়, এ সেই সাবিত্রীর বিবাহ।

সাবিত্রীর পিতা যখন দেখিলেন যে তাঁহার বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অথচ বিবাহ হইল না তখন তিনি সাবিত্রীকে তাঁহার নিজ পতি মনোনয়ন করিতে বলিলেন। অবার তাঁহার নির্ব্বাচিত স্বামী অল্পায়ু বলিয়া যখন পুনর্নির্ব্বাচন করিতে বলিলেন, তখন সাবিত্রী উত্তর দিলেন, "অল্পায়ু হউন বা দীর্ঘায়ু হউন, জীবিত বা মৃত, সত্যবানই আমার স্বামী।" রামচন্দ্র! কি বেহায়া নির্লজ্জ ওই সাবিত্রী মেয়েটা! বাপের মুখের উপর কেমন করিয়া এ কথা বলিয়া গেল! ভাগ্যে আমাদের কর্ত্তারা তখন উপস্থিত ছিলেন না, থাকিলে কোন্ না প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইত!

কিন্তু সময় মত উপস্থিত না থাকিতে পারিলেও একটা ব্যবস্থা করা চাই ত। নতুবা যে সমাজ রসাতলে যায়। তাই সমাজের কোন রক্ষাকর্ত্তা লিখিলেন যে সাবিত্রী মোটর গাড়ী করিয়া ইডেন গার্ডেনে বর খুঁজিতে যান নাই। সত্যই ত। তিনি যে 'বৃদ্ধ' মন্ত্রীর সহিত

তপোবনে গিয়াছিলেন! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তখন ভারতে ইডেন গার্ডেন, বা মোটর গাড়ী ছিল না। তা হইলে কি ভয়ঙ্কর কাজই হইত!

সাবিত্রীর বিবাহে আরও কয়েকটী বিষয় দেখিবার আছে। প্রথমতঃ তিনি রাজকন্যার মত স্বয়ম্বর-সভায় স্বামী বরণ করেন নাই—পিত্রালয় হইতে অন্যত্র গিয়া স্বামী নির্ব্বাচন করেন। দ্বিতীয়তঃ বিবাহ গান্ধর্ব্ব বিধানে হয় নাই; পতি-নির্ব্বাচনের পর পিতার নিকট জানাইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ বিবাহের নির্দ্দিষ্ট বয়স উত্তীর্ণ হইয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তিনি বীর্য্যশুল্কাও ছিলেন না। তাঁহার পিতাকে সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল কি না, তাহা লেখা নাই! কাহারো নিকট কোন টিপ্পনি থাকিলে প্রকাশ করিবেন। তারপর রুক্মিণী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, প্রভৃতি কাহাকেও বন্ধমুখ ছালার ভিতর পুরিয়া গৌরীদান করা হয় নাই। এই ত গেল অতীতের অভিজ্ঞতা।

এখন বর্ত্তমানের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। জগতের দিকে চাহিয়া চলিতে হইবে। আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দেশ নয়—আর একা কোন দেশ থাকিতে পারিবে না। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবন-ধারার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তা না হইলে কালের কঠোর আঘাতে ধ্বংস অথবা অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। জগতের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে স্বেচ্ছায় মঙ্গলের দিকে পরিবর্ত্তন না করিলে কাল অমঙ্গলের দিকে ঠেলিয়া দিবে।

পরিবর্ত্তন জগতের নিয়ম। এ-কথা যদি কেহ বলেন যে জগতের নিয়ম সনাতন, আমাদের সনাতন সমাজ-প্রথার পরিবর্ত্তন চলে না, তাহা হইলে বলিব যে বক্তা হয় অন্ধ, না হয় মিথ্যাবাদী। যদি হিন্দু সমাজের কোথাও পরিবর্ত্তন ঘটে না, তবে বিভিন্ন যুগের জন্য বিভিন্ন শাস্ত্ররচনার উদ্দেশ্য কি? এই সেদিনও ত রঘুনাথ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া গেলেন। তবে আমাদের সমাজ-প্রথা অপরিবর্ত্তনীয় বলার অর্থ কি? একটা গল্প মনে প্রড়িল। এক ব্যবসায়ী গোয়ালার বাছুরের নিকট গৃহস্থ ঘরের এক বাছুর গিয়া বলিল, "চল ভাই, একটু দৌড়াদৌড়ি করি।" গোয়ালার বাছুর অস্থিচর্ম্মসার—সে উত্তর করিল, "না ভাই—চল, ওখানে রোদে শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ি।" আমাদেরও হইয়াছে ঐ দশা। সমাজ-শরীরে যখন প্রাণ ছিল, তখন পরিবর্ত্তন হইয়াছে পদে পদে, আর এখন পুরানো মড়াকে লইয়া আমরা লেজ নাড়িতেই ভাল বাসি!

নব যুগের নব্যতন্ত্রী নর-নারীকে একটা কথা বলিবার আছে। শুধু তর্ক করা কি শুধু চিন্তা করাতে বিশেষ কিছু হইবে না—'যাহা সত্য বলিয়া মনে করিব তাহা কার্য্যে পরিণত করিব—'এইরূপ দৃঢ়তা চাই। নতুবা সমস্তই মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইবে। আমরা বেশ বুঝি যে কথাটা বলা যত সহজ, কাজে করা তাহার চেয়ে হাজার গুণে কঠিন—আর কঠিন বলিয়াই তাহার গৌরবও বেশী। আমরা যেন এ ভুল করিয়া না বসি যে সমাজের লোক সত্য সত্যই সব জাগিয়াছে। দেশে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে মাত্র, সুযোগ উপস্থিত। এই নব-জাগরণের যুগে যদি আমরা কাজে না লাগিতে পারি, তবে আর কিছু হইবে না।

অন্ধভাবে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের আদেশ মানিয়া যাওয়াতে কাপুরুষতার পরিচয় দেওয়া হয়। প্রত্যেক কাজে নিয়মানুবর্ত্তিতার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু যে নিয়ম বিবেককে আঘাত করে, তাহা মানিয়া চলার মানে ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হওয়া। হাজার উদাহরণের মধ্যে একটীর উল্লেখ করিতেছি,—ঐ যে বিবাহের রাত্রে বর মহাশয় বীরত্ব প্রদর্শন-পূর্ব্বক পলায়ন করিলে কন্যার জাতিনাশ হইবে—যদি না সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হয়—এই প্রথা কোন্ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত? আমাদের মনুষ্যত্বের পরিমাণ কি এ'টা দ্বারা করা যায় না? এই হীন বর্ব্বরোচিত মনুষ্যত্বের অপমান-কারক প্রথার ক্রীতদাসের মত অনুবর্ত্তন কতখানি জাতীয় কলঙ্ক প্রমাণিত করে!

আমাদের যাহা দোষ, তাহার সংশোধন করিতেই হইবে। প্রাচীনের প্রতি মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা খুব স্বাভাবিক জিনিষ, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই মৃতের কঙ্কালকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যাঁহারা কাজে নামিবেন, তাঁহাদিগকে অত্যাচার উৎপীড়নের জন্য প্রস্তুত হইয়াই কাজে নামিতে হইবে।

আর একটী কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। জীবন-সন্ধ্যায় প্রাচীনেরা যদি নূতনের স্রোতে ঝাঁপ দিতে না চান্, তবে তাহা কিছু অস্বাভাবিক হইবে না। চিরদিন প্রাচীনের ধ্যান করিয়া আজ নূতনকে সাদরে বরণ করিয়া লওয়া ত দূরের কথা, নূতনের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি দেওয়াও সকলের পক্ষে সহজ নহে। একজন প্রাচীন পণ্ডিত বলেন, "আমার নূতন শিক্ষিত নবযুবককে সাপের মত ভয় করে, পাছে কামড় দেয়!" শুনিয়াছি, দীর্ঘকাল কারাবাসের পর কারাকক্ষ ত্যাগ করিতেও নাকি কয়েদীর মন কেমন করে। বৃদ্ধদের লইয়া টানা-হেচড়া করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা যদি নূতনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে তোলেন, তাহা হইলে ত কথাই নাই! তাহা না হইলেও আমরা তাঁহাদের নিকট অন্ততঃ এইটুকুও কি আশা করিতে পারি না যে তাঁহারা আমাদিগকে বাধা দিবেন না?

যাঁহারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে পুরাতন ভাল, পরিবর্ত্তন খারাপ, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হয় না, কারণ তাঁহারা অকপট। কিন্তু যাঁহারা মনে এক, মুখে আর—এবং কার্য্যে তৃতীয় ব্যবস্থা করেন,' তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসম্ভব।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আমি দেখিলাম, নারীর সতীত্ব ও মনুষ্যত্ব-বিষয়ক বাদানুবাদ "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" আরব্ধ হইয়া "ভারতীর" পৃষ্ঠায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শ্রীমতী উষাপ্রভা সেন ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে আমাকে যেভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় আমার আর পলাইবার পথ নাই! মতামতের সংঘর্ষ দ্বারা উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং আমি বলিতেছি—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এখন হইতে বঙ্গনারীগণের মধ্যে যাঁহার খুসি সতীত্বের বাধা পায় ঠেলিয়া মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হউন!

শ্রীমতী শুভা-বিমলা—অভয়া—কিরণময়ী প্রভৃতি নব-নারীগণ তাঁহাদের পথপ্রদর্শক হউন।

ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করুন, পৃথিবী শস্যশালিনী হউক, দেশ হইতে আধি ব্যাধি দরিদ্রতা দূরে পলায়ন করুক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

শিখিবার কলা-কৌশল

"অ্যাকাডেমি ফ্রাঁসেজ"এর সদস্য Marcel prevost-এর ফরাসী হইতে

দ্বিতীয় ভাগ

কেমন করিয়া শেখা যায়?

১

যেহেতু শেখাটা হ'চ্ছে মোটামুটি—ইচ্ছা, শৃঙ্খলা ও সময়ের ব্যাপার, অতএব পূর্ব্ব হইতেই বুঝা যাইতেছে, কোন বিশেষ বিষয় কি করিয়া শিখিতে হয় তাহা শিখাইতে হইলে,—ইচ্ছাশক্তি, শৃঙ্খলা, ও সময় কার্য্যতঃ কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় তাহারই শিক্ষা দিতে হয়। শিখিতে শেখানো ইহাকেই বলে।

কোন শিক্ষানবীশ সৈনিকের হাতে একটা বন্দুক দিয়া, বারুদের টোটা দিয়া, একটা নিশানা দেখাইয়া দিয়া—"এইবার ছোড়ো" বলিলেই যথেষ্ট হইবে না। বন্দুকটা কি করিয়া বাগাইয়া ধরিতে হয় তাহা উহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। জ্ঞানের শিক্ষানবীশকেও শুধু এ কথা বলিলে চলিবে না:—

"তোমার ইচ্ছাশক্তির উপর দৃঢ়ভাবে হুকুম চালাও; শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হও, সময়ের সদ্ব্যবহার কর।" উহাকে ইহাও দেখাইতে হইবে,—যাহারা ভাল রকম শিখিয়াছে, অনেক শিখিয়াছে, তাহাদের বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা হইতে, ইচ্ছা, শৃঙ্খলা ও সময়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে কি কি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি সংস্থাপিত হইয়াছে।

যাহারা ভাল শিখিয়াছে ও অনেক শিখিয়াছে তাহাদিগকে চেনা সহজ: আর কিছু নয়, তাহারা অনেক বিষয় জানে ও ভাল করিয়া জানে। তাহাদের শিখিবার প্রকরণগুলা সংখ্যায় বেশী নহে। কতকগুলি লোক আছে—সংখ্যায় খুবই অল্প—যাহারা, যাহা জানে তাহা নিজে আবিষ্কার করিয়াছে। কতকগুলি লোক আছে যাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছে শিক্ষকের সাহায্যে। কতকগুলি লোক আছে যাহারা শিখিয়াছে পুস্তকের সাহায্যে। আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে,—অধিকাংশ লোক যাহারা সত্যই ভাল করিয়া কিছু জানে তাহারা অংশতঃ শিক্ষকের সাহায্যে এবং অংশতঃ পুস্তকের সাহায্যে শিখিয়াছে। অনেকেই, শিক্ষক ও পুস্তক হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার সহিত নিজের একটা ব্যক্তিগত উদ্ভাবনও যোগ করিয়া দিয়াছে। যাহা পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সকল জিনিসই উহারা নিজে আবার অর্জ্জন করে-ইহাই উহাদের উদ্ভাবনার সীমা। কিন্তু শিক্ষক ও পুস্তক হইতে উহারা যে লাভ আদায় করে, তাহাদের এই উদ্ভাবনী চেষ্টা ঐ লাভটাকে আরও বাড়াইয়া তোলে।

শিক্ষক, পুস্তক, উদ্ভাবনা—বেশ নজর করিয়া দেখ—

এইগুলিই, ইচ্ছা শৃঙ্খলা ও সময়ের সদ্‌ব্যবহারের একমাত্র ব্যবহারিক উপায়। ইহার অধিক আর কিছুই নাই।

—উদ্‌ভাবনাও?

—হাঁ, উদ্‌ভাবনাও। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই; প্যাশকাল সম্বন্ধে, নিউটন সম্বন্ধে কিংবা পাস্তর সম্বন্ধে এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। তথাপি, স্বয়ং প্রতিভাও "দীর্ঘ ধৈর্য্য" এই নামে নির্দ্দেশিত ও বিশেষিত হইয়াছে।

উত্তর: "ক্রমাগত ঐ বিষয়ের চিন্তা!"... এই কথাটা খুব বড় বড় জ্যোতিষিক আবিষ্কারের গুপ্ত রহস্যটা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

ইচ্ছাশক্তির একটানা সুতীব্র চালনা ও সময়ের অক্লান্ত ব্যবহার ব্যতীত এমন-কি স্বয়ং প্রতিভাও বিকাশ পায় না। ইচ্ছাশক্তির এই একটানা চালনা কতকটা অতিমানবিক, এবং সময়ের এই অক্লান্ত ব্যবহারও মাঝামাঝি বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির ধৈর্য্যকে অতিক্রম করে। তারপর যাহাদের প্রতিভা নাই, তাহাদের পক্ষে, ঠিক এই উদ্ভাবনের প্রয়াসটাই, ইচ্ছাশক্তির সাহায্যকারী; ইচ্ছাশক্তি এই ক্ষেত্রে কৌতূহলের প্রভাবে বশীভূত হইয়া আত্মসমর্পণ করে। এই উদ্‌ভাবনের প্রয়াসটা ধৈর্য্যের সাহায্যকারী। অধ্যয়নের সহিত একটা ব্যক্তিগত চেষ্টা মিলিত হওয়ার সময় বেশ কাটে।

অতএব বুদ্ধি পূর্ব্বক শেখা ও ব্যবহারিক ধরণে শেখা—ইহার স্থান শিক্ষানবীশির এই মূল-প্রকরণটির মধ্যে সংরক্ষিত:—সে প্রকরণটি কি? না, আবিষ্করণ!

কোন বিজ্ঞান বা কলাক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপেই শিক্ষার্থীকে সামান্য রকমের কিছু কিছু আবিষ্কার করিতে হইবে। সক্রেটিসের শিক্ষা দিবার পদ্ধতি কি ছিল? তিনি শিষ্যের মনে সমস্ত জানিবার জন্য একটা ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু আবিষ্কার বৃদ্ধি উদ্দীপিত করিতেন। Emile সম্বন্ধে Rousseau যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন (অন্তত নীতি শিক্ষা দিবার জন্য) তাহাও কতকটা এইরূপ। আমাদের চিন্তাধারা অন্যের মনে উদ্দীপিত করিবার ক্ষমতা যদি আমাদের না থাকে, আমরা যদি সক্রেটিস কিংবা রুসো না হই, তাহা হইলে এই শিক্ষাপদ্ধতিকে যেন আমরা অতিমাত্রায় লইয়া না যাই; কিন্তু এই সক্রেটিসের পদ্ধতি কতকটা অনুসরণ করা অপরিহার্য্য। তাহার দৃষ্টান্ত—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কোন গ্রন্থের প্রথম পংক্তিতেই যে সব সংজ্ঞা চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা আমার চুচক্ষের বিষ! কোন বিজ্ঞানের প্রবেশ দ্বারে, কতকগুলা নীরস কর্কশ মতবাদ ও নিয়মের স্তূপ গাদা করিয়া রাখা—ইহাও আমার অসহ্য। মন্দিরের দ্বার আমার সম্মুখে উদঘাটন করা হোক্, কিন্তু একটা ধাক্কা দিয়া যেন তাহার ভিতর আমাকে ঢুকাইয়া না দেওয়া হয়। প্রথম পদক্ষেপের সময় আমাকে যেন নিজের চেষ্টায় হাঁটিতে দেওয়া হয়; আমাকে ছাড়িয়া দিয়া শুধু যেন পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়; বিপথে গেলে, আবশ্যক হইলে যেন শুধরাইয়া দেওয়া হয়

প্রিয় পাঠক, শেখা জিনিসটা কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার সময় আমি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলাম এবং শিক্ষার অন্তর্গত মূল উপাদানগুলি আমি যেরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। কোন সংজ্ঞা কিংবা কোন শ্রেণীবিভাগ আমাদের সম্মুখে একটা আকস্মিক অসম্বদ্ধ শৈলস্তূপের মত কখনই খাড়া হইয়া উঠে নাই। আমরা শুধু উহার প্রতিবন্ধকগুলা চিহ্নিত করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি, উহার আকার গঠন বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি, উহার প্রবেশ-পথ দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি, আমরা একটা যাত্রা-পথ বাছিয়া লইয়াছি। আমরা আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়াছি—শুধু পায়ে হাঁটিয়া, অক্ষমদিগের মত বাহকের কাঁধের উপর চাপিয়া নহে। এখন দেখ,—যাহা কিছু শেখা যায় তাহারই সম্বন্ধে এই প্রণালী প্রযুজ্য।

কোন মাঝারি-বুদ্ধিবিশিষ্ট ছাত্রের শক্তির উপযোগী করিয়া, শিক্ষার পারিভাষিক বুলি যাহাকে "অভিনিবেশ" বলে,—এই আবিষ্কারের কাজেও সেই "অভিনিবেশ" থাকা চাই। পাটিগণিতের একটা সমস্যা—এমন কি একটা তেরিজ (অন্ততঃ প্রথম প্রথম নিজের চেষ্টায় যে তেরিজ কষা হয়) ইহাই ত একটা সামান্য রকমের আবিষ্কার; যে ছাত্র তাহার প্রথম তেরিজের অঙ্ক কসিতে সফল হইয়াছে

সে নিজের শক্তিমত্তা যেরূপ অনুভব করে, নির্ভুল করিয়া তেরিজের উপপত্তি আবৃত্তি করিতে পারিলেও সেরূপ আত্মশক্তি অনুভব করিতে পারে না। উহা ছাত্রকে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দেয়; উহাতে সে সত্য সত্যই এতটা আবিষ্কার-শক্তি ব্যয় করে যে, রচনা লেখার কলা-কৌশল সম্বন্ধে গণ্ডা গণ্ডা লেকচার শুনিলেও তাহা হয় না। তুলি ধরিয়া চিত্র আঁকা, কোন সঙ্গীত-যন্ত্র বাজানো—আনাড়িভাবে হইলেও—যাহারা চিত্র কিংবা সঙ্গীতের ব্যাকরণ শিখিবার উচ্চাভিলাষ একটুও পোষণ করে না, ফলতঃ শুধু ওস্তাদদিগের চিত্র ও সঙ্গীতের রসাস্বাদ করিতে চাহে—তাহাদের পক্ষে উহাই আবিষ্কার...একটা তর্জ্জমা, একটা রচনা :—

আরও অন্য সামান্য রকমের আবিষ্কার আছে। কোন ভাষা শিখিবার সময় যদি তর্জ্জমা ও রচনার চেষ্টা না করা হয় তাহা হইলে "পালাস্"-হোটেলের মুটের চেয়ে বেশী কখনই শিখিতে পারিবে না...যন্ত্র চালনা শিখিবার সময় এই শিক্ষাতত্ত্বটা আরও চোখে পড়ে; কোন স্বয়ংচল গাড়ী কি করিয়া চালাইতে হয় সে সম্বন্ধে যতই মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হোক্ না, লেক্চার দেওয়া হোক্ না—উহা নিজের হাতে চালাইবার স্থান কখনই ঠিকমত অধিকার করিতে পারে না। চালক চক্রটা ধরিয়া একবার ঘুরাইলেই একটা-কিছু আবিষ্কার হয়।

*

* *

যাই হোক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে—প্রচুর ঔপপত্তিক উপদেশ দিবার পরেও শিক্ষানবীশ মোটর চালককে যদি একলা ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সে সহসা বিপদগ্রস্ত হইতে পারে। ঠিক্ ইহারই ন্যায়, "যে চালাইতে জানে" এইরূপ কোন উপদেষ্টার দ্বারা যথাপথে চালিত না হইলে কোন শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক বা কলাসম্বন্ধীয় আবিষ্কার কার্য্য তেমন ফলবান হয় না। মাঝামাঝি বুদ্ধিবিশিষ্ট সদিচ্ছাপ্রণোদিত পাঠক! এই কথাটা বেশ মনে রাখিবে, সম্পূর্ণ একাকী তুমি যদি কলা বা বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে এই আবিষ্কারের প্রকরণ অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে শিক্ষানবীশ মোটর-চালকের ন্যায় হঠাৎ খানায় গড়াইয়া পড়িবে।...সরলমতি দুঃসাহসী মোটর শিক্ষার্থীর যাত্রা-পথ যেরূপ দৈব দুর্ঘটনা জনিত নানা প্রকার ভাঙ্গা-চোরা জিনিসে সমাকীর্ণ হয়, জ্ঞানের রাস্তাটাও সেইরূপ হইয়া থাকে। চিত্রকর—যাহার বিশ্বাস সে একটা চিত্র আবিষ্কার করিয়াছে, কবি যে ছন্দ-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে গতি নিয়মিত না করিয়াই ভাবোচ্ছ্বাসের "কল-কপাট" খুলিয়া দিয়াছে; প্রাদেশিক গণিতবেত্তা—যাহার দৃঢ় বিশ্বাস সে বৃত্তের চতুষ্কোণ আবিষ্কার করিয়াছে; স্বয়ংসিদ্ধ পদার্থবিদ্যাবিৎ, রসায়নবিদ্যাবিৎ, জ্যোতির্ব্বিৎ——বিশেষতঃ দার্শনিক ও বার্ত্তাশাস্ত্রবিৎ যাহারা প্রতিদিন পাইপের ধূমপান করিতে করিতে, খুব কঠিন-কঠিন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রশ্নের সমাধান করিয়া থাকেন :—এইরূপ কত পথভ্রষ্ট ভ্রান্ত উদ্ভাবকে ও অবিষ্কারক দেখিতে পাওয়া যায়! উহাদের প্রবন্ধে-প্রবন্ধে অ্যাকাডেমিগুলা গিশ্‌গিশ্ করিতেছে। নবোদ্ভাবনার আফিস উহাদের দ্বারা আক্রান্ত। উহাদের প্রতি বেশী অনুকম্পা প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই। উহারা প্রায়ই কতকগুলা দেমাকী আহাম্মক অলসের দল; আলস্য ও স্বয়ংসিদ্ধভাব এই দুইটা পরস্পরের সহিত বেশ খাপ খায়। উহাদের বিশ্বাস, উহারা এক একজন প্রতিভাবান পুরুষ; সমস্ত শিক্ষানবীশি কাজে যে স্বেচ্ছামূলক প্রয়াস অপরিহার্য্য সেই প্রয়াস প্রয়োগ করিতে উহারা অসমর্থ। তাই গোড়াতেই সবই অতি সহজ মনে করিয়া উহারা বিস্মিত হয় :—হাঁ, তারপক্ষেই সহজ যে কিছুই শেখে না! কত সহজে একটা জিনিস আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া তাহারা নিজের প্রতিভার বাহাদুরী দেয়। তাহারা সবাইকে তাড়াতাড়ি জানায় যে, ইহার যাত্রাপথ খুবই পরিষ্কার ও সহজ। রীতিমত কলা-বিদ্যার সাধনা না করিয়াই প্রায় সব কলাবেত্তারা, নিম্নশ্রেণীর সব পণ্ডিতেরাই খ্যাতি লাভের জন্য লালায়িত।

*

* *

অতএব, ভাল করিয়া শিখিতে হইলে, উদ্ভাবনার প্রকরণটা অপরিহার্য্য :—

উহা ইচ্ছাকে তীব্র ও প্রখর করিয়া তুলে; ধৈর্য্যকে ক্লান্ত হইতে না দিয়া উহা সময়ের সদ্ব্যবহার করে। কিন্তু (প্রতিভার স্থল ছাড়া) উহা একেবারে অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া অনুসরণ করা সাংঘাতিক। আমরা দেখিতে পাইব যে, শিখিবার অন্য দুই উপায়ের পক্ষেও এই কথা সমান খাটে :—অর্থাৎ শিক্ষক ও পুস্তক সম্বন্ধে। এবং আমরা ইহারই মধ্যে এই কথার আভাস পাইতেছি যে,—ভাল করিয়া শিখিতে হইলে, শিক্ষক, পুস্তক ও উদ্ভাবনা—যুগপৎ এই তিনেরই ব্যবহার দরকার। ফলতঃ শিখিবার সময়, ইচ্ছা, শৃঙ্খলা ও সময়ের সদ্ব্যবহারের পক্ষে, শিক্ষক ও পুস্তক উদ্ভাবনারই মতো দুইটা কেজো উপায়। উদ্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি। এক্ষণে শিক্ষক ও পুস্তক সম্বন্ধে আমরা ইহা সপ্রমাণ করিব। শিক্ষক কি?—না, একখানা কথা-কহিয়ে পুস্তক। পুস্তক কি?—না একজন শিক্ষক;—যদিও নীরব—তিনি তাঁহার চিন্তাধারা অন্যের মনে সংক্রামিত করেন। বস্তুতঃ শিক্ষার্থী যখন উহাদের সান্নিধ্যে আসে, তখন—একেবারে নিরেট্ আল্‌সে না হইলে—তাহার ইচ্ছাবৃত্তিতে একটু লঘু-রকমের উত্তেজনা উপস্থিত হয়:—নূতনের কৌতূহল তাহাকে আকর্ষণ করে। শিক্ষকের ভিতরে কিংবা পুস্তকের ভিতরে জ্ঞানকে সে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে; অন্ততঃ প্রথম-শিক্ষায় একটা চঞ্চল বাসনা তাহার মনে জাগিয়া উঠে। ইচ্ছা শক্তির উপর যে আর একটি প্রভাব বিদ্যমান তাহা কি শিক্ষক, কি পুস্তক উভয়েরই মধ্যে সমান; নবশিক্ষার্থীর উপর উভয়েরই প্রভাব সুনিশ্চিত। জ্ঞানের আধাররূপে বিদ্যমান—একজন মানুষ কিংবা একখানা পুস্তক। আর কিছু করিতে হইবে না, এখন সেই পুস্তককে স্বাঙ্গীকৃত করিতে হইবে, সেই মানুষের সমতুল্য হইতে হইবে। এক কথায়, নব-শিক্ষার্থীর নিকট, শিক্ষক ও পুস্তক তাহার প্রয়াসের চিরস্থায়ী সহায় হইয়া দাঁড়ায়। একজন 'গাইড্' বা নেতার কাজ করে, আর একজন পর্য্যটকের যাত্রাপথে মানচিত্রের কাজ করে।

পক্ষান্তরে শিক্ষক ও পুস্তক, নব-শিক্ষার্থীর নিকট প্রথমে শৃঙ্খলার একটা আভাস দেয়, তাহার পর শৃঙ্খলাকে সুনিশ্চিত করিয়া দাঁড় করায়। অধিকাংশ মানুষ, যেমন কোন বিষয়ে প্রয়াস করিতে ভয় পায় সেইরূপ সুশৃঙ্খলরূপে কাজ করিতেও ভয় পায়। এমন-কি, গুছাইয়া রাখা যাহাদের কাজ (যথা গৃহ-ভৃত্য) তাহারাও তাহাদের নিজের কাজ যেরূপ বিশৃঙ্খলভাবে করে, তাহা অতীব শোচনীয়। শিক্ষক ও পুস্তকের মধ্যে এই শৃঙ্খলার ভাব বিশেষরূপে আছে এবং উহারা নব-শিক্ষার্থীকেও, কষ্ট না দিয়া বেমালুম এই শৃঙ্খলার ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, এইরূপ আমরা অনুমান করিয়া থাকি। শিক্ষকের শিক্ষাদান ও পুস্তকের শিক্ষাদান—এই দুই রকম শিক্ষা-প্রণালী আমরা ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারিব, নব-শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষকের শৃঙ্খলার প্রতি ও পুস্তকের শৃঙ্খলার প্রতি যে অন্ধ-বিশ্বাস আছে তাহা কমাইয়া আনা দরকার। এ কথাটাও কম সত্য নহে যে,—পুস্তক নির্ব্বাচনের সময়, শিক্ষক নির্ব্বাচনের সময়, তাহাদের অনুসৃত পদ্ধতির উপর আমাদের একটা বিশ্বাস থাকে; আমরা আপাততঃ আমাদের শৃঙ্খলাকে (যদি আমাদের কোন একটা শৃঙ্খলার ধারণা থাকে) উহাদের শৃঙ্খলার নিকট বলিদান দিই। এবং আমাদের যদি কোন শৃঙ্খলার ধারণা না থাকে, তাহা হইলে আমাদের জায়গায়, উহাদিগকেই শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে বলিয়া থাকি।

এক কথায়, সময়ের সদ্ব্যবহারের কেজো উপায়স্বরূপ, অধ্যয়নের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত বেশী জ্ঞান অর্জ্জন করা যাইতে পারে সেই ঊর্দ্ধ পরিমাণ জ্ঞান অর্জ্জনের সহায় শিক্ষক ও পুস্তক ন্যূনাধিক জ্ঞাতসারে শিক্ষার্থীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন! একটা বড় বই, অনেক বালাম-বিশিষ্ট কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ দেখিলে নব-শিক্ষার্থীর মনে ভীতির সঞ্চার হয়। একটা হাল্‌কা রকমের বই নব-শিক্ষার্থী ইচ্ছাসুখে গ্রহণ করে। কখন কখন সে বাহ্য আকারে প্রতারিত হয়। কোন-এক গ্রন্থের উপর তাঁহার বিশ্বাস জন্মে—যদি কেবল সেই গ্রন্থের উপর লেখা থাকে:—"দশ পাঠে ইংরাজি-শিক্ষা।" এমন-কি—শিক্ষকের সহিত বন্দোবস্ত করিবার সময় প্রথমেই তাঁহাকে প্রায়ই এইরূপ প্রশ্ন করা হয়—যথা:—

—কয় ঘণ্টা ? কয় মাস ?…

যেমন অজ্ঞাতসারে শৃঙ্খলা-বিভাগের ভার শিক্ষক ও পুস্তকের হস্তে ন্যস্ত করা হয়, সেইরূপ সময়-বিভাগের ভারটাও উহাদের হাতে দেওয়া হইয়া থাকে। এবং শিক্ষার্থী কার্য্যতঃ, শৃঙ্খলা ও সময়ের সম্বন্ধে শিক্ষক ও পুস্তককেই দায়ী করে! দিন ও বৎসর বৃথা নষ্ট হইলে শিক্ষার্থী পরে উহাদের উপরেই দোষারোপ করে। অবশেষে যখন একটা চূড়ান্ত গোলযোগ বাধে তখন উহারা অভিসম্পাতের পাত্র হয়।

এ কথা ভুলিলে চলিবে না,—শিক্ষক ও পুস্তকের দ্বারা আমাদের জড়তা কিছুতেই অপসারিত হইতে পারে না। অধ্যয়নের সময় আমাদের শৃঙ্খলার অভাব আমাদের সময়ের অপব্যয় শিক্ষক ও পুস্তক কখনই পূরণ করিতে পারে না। পুনর্ব্বার বলিতেছি, শিক্ষক ও পুস্তক—আমাদের ইচ্ছাশক্তির, আমাদের শৃঙ্খলা-পদ্ধতির, আমাদের ধৈর্য্যের সহায় ছাড়া আর কিছুই নহে।

শিক্ষক ও পুস্তক সম্বন্ধে গভীররূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অধ্যয়নের এই দুই সহায়, পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। পুস্তককে অবহেলা করিয়া যাহারা কেবল শিক্ষকের সাহায্যেই শিখিয়াছে, তাহারা সেই "আত্মশিক্ষকের"ই মতো কু-শিক্ষিত—যাহারা কেবল গ্রন্থের মুদ্রিত পৃষ্ঠার সাহায্যেই জ্ঞানলাভ করে। শিক্ষার এই প্রত্যেক উপায়টি আমাদের বিভিন্ন মনোবৃত্তির অনুরূপ। যে অন্ধ অথচ বধির নহে, যে বধির অথচ অন্ধ নহে, সে পণ্ডিত হইতেও পারে; কিন্তু যে চোখ ব্যবহার করিতে পারে, কাণ ব্যবহার করিতে পারে, সে এই দুয়ের কোন এক ইন্দ্রিয়পথকে কেন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে—কেন পারিপার্শিক জ্ঞান-ধারাকে তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে দিবে না? চক্ষু ও কর্ণ যেমন উভয়ই নব-দেশপর্য্যটককে সাহায্য করে, সেইরূপ জ্ঞানের তীর্থ-যাত্রীকে ঐ একইরূপ সাহায্য করিয়া থাকে। আমাদের প্রত্যেকেরই ভিতর একটা ব্যক্তিগত দিঙনির্ণয় বুদ্ধি আছে, এই বুদ্ধিকেও যেন আমরা অবহেলা না করি। এই বুদ্ধি, নবদেশানুসন্ধানীকে যেরূপ ঝোপঝড়ের ভিতর দিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানের অজ্ঞাতে দেশের মধ্য দিয়া উদ্ভাবককেও লইয়া যায়। অতএব শিখিবার কলাকৌশলের মোট কথা দাঁড়াইতেছে এই :—শিক্ষক ও পুস্তকের ব্যবহার বিবেচনার সহিত করিবে,—কিন্তু দেখিবে যেন এই ব্যবহারে আমাদের উদ্ভাবনাবৃত্তিকে রুদ্ধ করিয়া না দেয়।

শিখিবার কলা-কৌশলের মধ্যে, উদ্ভাবনার কি-কাজ তাহা এই পরিচ্ছেদেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা এই অন্য বিষয়টির আলোচনা করিব :—শিক্ষক ও পুস্তকের ব্যবহার বিবেচনার সহিত কিরূপ করিতে হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘর ও বাহির

শিক্ষা

আমাদের ছেলেদের কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমরা প্রায় প্রত্যহই প্রবন্ধ পাঠ করি; প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই ঐ বিষয়ে কিছু না কিছু উপদেশ দিতে পারেন। কিন্তু কি জাতীয় বিদ্যাপীঠ, কি বিদ্যা-মন্দির কি বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠানই আমাদের হাতে সুন্দররূপে গড়িয়া উঠিতেছে না। আমাদের শিক্ষার কথা ছাড়িয়া যদি ব্যবসায়ের কথা ধরা যায়, সেখানেও আমাদের চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই। বাঙ্গলা দেশে যে কয়টি যৌথ কারবার আছে তাহা এক হাতেই গণিয়া ফেলা যাইতে পারে। এই সকলকার কারবার যাঁহারা চালান, তাঁহারা ব্যবসা চলা সম্পর্কে বড় বড় জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দান করিতে পারেন, কেহ বা বিলাত হইতে ব্যবসার মূলমন্ত্র শিখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে সকলে মিলিয়া তাহা গড়িয়া তুলিতে পারিতেছেন না। মোট কথা, আমরা প্রায় সকল বিষয়ই জানি, কিন্তু যাহা জানি তাহা করিতে পারি না। জানা ও করার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। কোনো জিনিষ করিতে হইলে চরিত্রের মধ্যে যাহা থাকা দরকার আমাদের তাহা একেবারেই নাই। জানা অনেক হইয়াছে, এখন করায় দিন আসিয়াছে।

—হিন্দুস্থান।

জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে না পারিলে যে স্বরাজের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইবে এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হইলে সহজ ও সরল পন্থা সম্বন্ধে কেহই বড় কিছু লেখেন না। শিক্ষক বিনা পয়সায় শিক্ষা দিতে পারেন না, কেননা তারও সংসার চলা চাই। দরিদ্র কৃষক অর্থ দিয়াও শিক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু ফসলের সময় ২০ কাঠায় ১ কাঠা বা শতকরা পাঁচকাঠা ফসল দেওয়া তাদের পক্ষে খুব কঠিন নয়। যদি প্রতি গ্রামে কৃষকগণ এই বন্দোবস্ত করে যে, প্রতি ফসলের সময় তারা গুরুমহাশয়কে ফসলের কিছু অংশ দিবে, তার বিনিময়ে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন, তাহা হইলে বোধ হয় কার্য্য বেশ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলিয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া তরি-তরকারী, প্রভৃতিও সময় সময় গুরুকে দেওয়ায় তাদেরও বিশেষ গায় বাধে না, গুরুরও একটা আয় বাড়ে। প্রতি গ্রামের সুধিগণ ও মোড়লগণ একটু সময় নষ্ট করিয়া এই বিষয়ে চিন্তা করিবেন কি? —রায়ত বন্ধু।

—

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের নূতন যুগ আরম্ভ হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঐ সময় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন; তাঁহার চেষ্টায় এবং প্রিন্সিপ্যাল এডওয়ার্ড কাউয়েলের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখনই এই নিয়ম হয় যে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকেই কলেজে লওয়া হইবে—আগে কেবল ব্রাহ্ম এবং বৈদ্য-ছেলেদিগকেই এই কলেজে লওয়া হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় হইতে সংস্কৃত কলেজে স্কুল বিভাগ এবং কলেজ বিভাগ এই দুই বিভাগে শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই স্কুল এবং কলেজে পাশ্চাত্য ধরণে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, দুরূহ সংস্কৃত ব্যাকরণকে সহজ এবং সরল করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। পাশ্চাত্য ধরণে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার এই নীতি এতটা সাফল্য লাভ করে যে, তাহার ফল এক সময় সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগের উপর ছেলেদের ঝোঁক একেবারে কমিয়া যায়। কিন্তু ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দেশীয় ধরণে শিক্ষার স্রোত আবার একটু ফিরিয়া আসে। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি কলেজের উপাধি-বিভাগ খুলেন, ২৫ জন ফ্রি ছেলেকে লইয়া এই বিভাগের শিক্ষা আরম্ভ হয়। সংস্কৃত কলেজে প্রথমতঃ চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে কলেজের ঐ বিভাগ তুলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে সংস্কৃত কলেজ মোটের উপর তিনটী বিভাগে বিভক্ত হয়—(১) ইংরাজী-সংস্কৃত কলেজ, (২) ইংরাজী-সংস্কৃত স্কুল (৩) এবং টোল বা শুধু সংস্কৃত বিভাগ। সংস্কৃত কলেজে বর্ত্তমানে এই ভাবে শিক্ষাদান কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। এই তিন বিভাগের শিক্ষায় কিরূপ ফল লাভ হইয়াছে কিংবা কোন্ বিভাগে কি ফল পাওয়া গিয়াছে, এখন তাহাই আলোচ্য বিষয়। —হিন্দুস্থান।

—

রামানুজম্ নামক এক মাদ্রাজী যুবক গণিতে অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন—মাদ্রাজ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। রামানুজম্ ইংলণ্ডে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই লোকান্তরে গমন করেন। সম্প্রতি মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রে শ্রীযুক্ত সি, পি, কৃষ্ণমূর্ত্তি বি, এ, এল, টি, আর একজন প্রতিভাশালী যুবকের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই যুবকের নাম শ্রীমান চিরঞ্জীবী রাজনারায়ণম্। ইঁহাকে দ্বিতীয় রামানুজম্ বলিয়া উল্লেখ করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না; শ্রীমান রাজানারায়নম্ কোন কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন নাই, অথচ বি, এ বা এম, এ ক্লাসের বিশুদ্ধ গণিতের যে কোন অঙ্ক তিনি অনায়াসে করিতে পারেন। মাদ্রাজ-গবর্ণমেণ্ট এই যুবককে মাসিক ৭৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। রাজানারায়ণম্ গণিতে বিশেষ পারদর্শী হইলেও ইংরাজী ভাষাতেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি আছে। মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয় যদি তাঁহাকে একেবারে গণিতে এম, এ পরীক্ষা দিবার অধিকার দেন, তাহা হইলে ভাল হয়। —হিতবাদী।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু কার্য্য-ভার-গ্রহণকালে বলেন,—আমরা এখানে অদ্ভুত কিছু করিতে পারিব না। স্যর আশুতোষ আমাদের জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহার গঠনকার্য্যে যত দোষই থাকুক না কেন, ইহার কল্পনা অতি চমৎকার। ইহা চিরকাল আমাদের দেশ এবং পরবর্ত্তী যুগ অতি সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিবে। তিনি যে প্রচেষ্টা, কর্ম্মতৎপরতা, প্রতিভা এবং সর্ব্বোপরি দেশের যুবকবৃন্দের প্রতি ভালবাসা ইহাতে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না এবং খুব কম লোকই অনুকরণ করিতে পারিবে। আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিব যে, তাঁহার উৎসাহদান সত্ত্বেও যখন মনে হয় আমাকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে, তখন আমার আত্মপ্রত্যয় হারাইয়া ফেলি। আমি তাঁহার প্রচেষ্টা এবং কর্ম্মতৎপরতার অনুকরণ করিতে পারিবনা, কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্য

প্রণোদিত তাহা করিয়াছিলেন আমি করিতে চেষ্টা করিব। যে ভাবে একটী শিক্ষা-সংসদের অগ্রসর হওয়া উচিত, সে ভাবে যদি কার্য্যের দিকে অগ্রসর হই, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সম্মুখস্থ বিপদ হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব। —স্বরাজ।

মনুষ্যত্ব

ডাঃ হাওয়ার্ড সমারভেল গৌরীশঙ্কর অভিযাত্রীদের একজন। তিনি সম্প্রতি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতবাসীরা তাহার জন্য চিরদিন তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। গৌরীশঙ্করের অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ভারত ভ্রমণে বাহির হন। এই ভ্রমণের সময় দেখিতে পাইয়াছেন যে চিকিৎসকের অভাবে ভারতের অবস্থাটা কিরূপ শোচনীয় হইয়া রহিয়াছে। এমন দুই একটি জেলাও নাকি তাঁহার চোখে পড়িয়াছে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের রোগের চিকিৎসার জন্য একজনের বেশী ডাক্তার নাই। এই অবস্থা নিজের চোখে দেখিয়া ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে তিনি লোকের সেবাব্রতের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিদেশী মহাপ্রাণ ব্যক্তিটি এদেশের লোকদের জন্য যে দরদের, যে সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা দুর্লভ। ডাক্তারের অভাব ভারতের সর্ব্বত্র—বিনা চিকিৎসায় মারা যায় এদেশের অসংখ্য লোক। অনেকের চোখেই এই দুর্দ্দশার চিত্র পড়ে। কিন্তু কয়জনের বুকে ডাঃ সমারভেলের মত এ চিত্র ব্যথার সঞ্চার করে? কয়জনের চিত্ত এ চিত্র দেখিয়া সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠে? বিদেশী হইলেও ডাঃ সমারভেলের মত এদেশের দরিদ্র জনসংঘের পরমাত্মীয়, দেশী লোকদের ভিতরেও যে বেশী নাই, এ কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়। —স্বরাজ।

মহেশ্বরদী পরগণার অন্তর্গত ভাটপাড়া গ্রামনিবাসী স্বনামখ্যাত সিভিলিয়ান স্যার কে জি গুপ্ত উক্ত গ্রামে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কালী-নারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের নামে একটী ডিস্‌পেন্‌সারী স্থাপন করেন। কিন্তু এই ডিস্‌পেনসারী পরিচালনার্থ যে ম্যানেজিং কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা ইহার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বহিত না হওয়ায় সম্প্রতি স্যার গুপ্ত ইহাকে ঢাকা জিলা বোর্ডের হাতে অর্পণ করিয়া এককালীন ১৮০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। তদনুসারে গত রবিবার জিলাবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় একজন ডাক্তারসহ ভাটপাড়া পৌঁছিয়া উক্ত ডিস্‌পেন্‌সারীর চার্জ্জ গ্রহণ করিয়াছেন। জিলা-বোর্ড সত্বরই এই ডিস্‌পেন্‌সারীর জন্য উত্তম গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবেন। —ঢাকা প্রকাশ।

কয়েক দিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে লোন অফিসের ঘাটে দুইটী বালিকা স্নান করিবার সময় কোনক্রমে গভীর জলে যাইয়া পড়ে। তাহারা তীরে আসিতে না পারিয়া একটী প্রায় তলাইয়া যায়, আর একটী তখনও তীরে আসিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল; এমন সময়ে স্থানীয় উকিল মোহরার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্নান করিতে সেই ঘাটে যাইয়া বালিকাটীকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পান। শরৎ বাবু তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বালিকা-টীকে ধরিতেই তাঁহার পায়ে আর একটী বালিকার দেহ স্পর্শ করে। তিনি সেই বালিকাটীকেও তুলিয়া দুই হাতে দুইজনকে লইয়া বহু কষ্টে তীরে আসিয়া উঠেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে দুইটী বালিকাই প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে। এইরূপ সৎসাহসী ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি লোক-সমাজে আদর্শ; এবং ভগবানই ইহাদের পুরস্কার-দাতা। —শান্তিবার্ত্তা।

জন-গণ-মন

আজ-কাল হিন্দুর বিবাহে কন্যার পিতার নিকট হইতে যে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা হয় এবং অর্থাভাবে দরিদ্র ব্যক্তিকে কন্যার বিবাহ দিতে যে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় এ কথা কাহারও অবিদিত নহে। বলিবার সময়ে সকলেই একপক্ষে বলেন যে ঐ কুপ্রথার বিলোপ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়; কিন্তু পণদান ও পণ গ্রহণ অবাধে চলিতেছে, এবং পণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। সমাজের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহারা এই প্রথার বিলোপ-সাধনে অসমর্থ, কাজেই হতভাগ্য কন্যার পিতার সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। কচিৎ দুই একজন মহাপুরুষ এ বিষয়ে উদারতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সমাজের আদর্শ স্থানীয় হইতেছেন বটে, কিন্তু কয়জন তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে? এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল হইতে আন্দোলন চলিতেছে। অনেক সভা সমিতি ও বক্তৃতাদি হইয়াছে, সংবাদপত্রে বহু সুদীর্ঘ প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছে, কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রোগ সমাজের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, ইহার একমাত্র উপায় রাজবিধান প্রণয়ন দ্বারা ঐ প্রথার নিরাকরণ। পণদান ও পণগ্রহণ আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইলে এই কুপ্রথার বিলোপ সম্ভবপর। আমাদিগের বিশ্বাস ব্যবস্থাপক সভার কোন হিন্দু সভ্য এইরূপ একটী বিধানের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিলে হিন্দু সাধারণ উহার সমর্থন করিবে। রোগ যেমন গুরুতর ঔষধও সেইরূপ কঠিন না হইলে কোন ফল হইবে না। কোন হৃদয়বান সদস্য এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে আমরা প্রীতিলাভ করিব।

—হিতবাদী

পোড়া দেশের দৈন্যাবস্থার কথা আর কত লিখিব! যে দিকে তাকাই সেইদিকেই দেখি 'বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে'। এত বড় দেশ অথচ পাঠাগারের ব্যবস্থা অত্যন্ত অল্প। দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই—বরোদায় ১৯১১ সনে ২৭৫টী লাইব্রেরী ছিল, এক্ষণে উহার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৬২৮টী হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮২টী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বরোদার সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীটীতে ৯০ হাজার পুস্তক আছে। ইহাই নাকি ভারতের বৃহত্তম পুস্তকাগার। এই লাইব্রেরী সংলগ্ন শিশু এবং নারীদের পাঠের ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। এককালে এই স্থানে প্রায় ২৩ হাজার শিশু সমবেত হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা দেশে এরূপ একটীও লাইব্রেরী নাই। লাইব্রেরী দ্বারা জনসাধারণের যে নানাপ্রকার উপকার সাধিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কলিকাতায় কয়েকটী উল্লেখযোগ্য পাঠাগার থাকিলেও আরও বহু লাইব্রেরীর প্রয়োজন। আশা করি, সর্ব্বসাধারণ এ বিষয় বিবেচনা করিয়া দেশের পুস্তক-সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন। —শান্তিবার্ত্তা

ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতির মধ্যে বিবাহে পণ-প্রথা কি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। এই খুলনা সহরে একটা বিবাহের বাটীতে বরপক্ষ বিবাহ দিতে আসিয়া কন্যার পিতাকে বলিলেন, একখানি সাইকেল না দিলে পুত্র বিবাহ করিবে না। কন্যার পিতাকে অনেক পীড়ন করিয়া সাইকেল দিতে স্বীকার হইলে তবে পুত্র বিবাহে মত দিলেন। বেশীদিনের কথা নয়, কয়েক দিন পূর্ব্বে এখানে কোনও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ মহাশয়ের কন্যার বিবাহে বরপক্ষ যথেষ্ট জুলুম করেন। তিনি অবস্থাপন্ন তাই রক্ষা, নতুবা আমাদের মত লোক হইলে ভিটা মাটী বিক্রয় করিতে হইত। পাত্র বি. এ. পাশ, পাত্রের পিতা শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সমাজের মাথা, বিশেষতঃ তিনি একজন পুরাতন শিক্ষক, তাই বলি সমাজের হোল কি? এরাই আবার সমাজের মাথা ও রক্ষক? যে সমস্ত ছেলে পাশ করে এই রকম হয়, ধিক তাদের জীবনে ধিক, তাদের শিক্ষা, দীক্ষায়! এতদিন লালন পালন করিয়া কন্যা দান করিলাম, তাতে হলো না, কন্যার পিতার ভিটা মাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় হওয়া চাই! বিবাহে কি কেবল কন্যার দরকার, পুত্রের দরকার নয়? কন্যার পিতারা প্রতিজ্ঞা কর, আজন্ম কন্যা ঘরে রাখবে, তবু কুপ্রথায় কাজ করবে না, দেখি, ছেলের বাপের পুত্রের বিবাহের দরকার হয় কি না! আর এই প্রকার পাশ-করা ছেলেকে বলি, দড়ি কলসী গলায় বেঁধে ডুব দাও, সমাজ তোমাদের মত পাঁঠা কিনিতে চায় না। অত্র সহরে ঐ তারিখে কোনও কায়স্থের বিবাহে বরপক্ষ দাবি করলেন, পাত্র একটী বন্দুক চায়। কন্যার পিতা বড় লোক তাই স্বীকার হলেন। এখন কেউ উড়ো জাহাজে উড়তে না চায়! —খুলনা

'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বাংলার সামাজিক ভদ্রতার এবং শিষ্টাচারের চমৎকার একটি নমুনা প্রকাশিত হইয়াছে। ফরিদপুর হইতে জনৈক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন যে সম্প্রতি কোন বিশিষ্ট উকিলের কন্যার বিবাহে অনেক গণ্যমান্য লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রিতদের ভিতর একজন এম, এ, বি, এল বারুই ভদ্রলোকও ছিলেন। পাতা যখন পড়িল তখন এই বারুই ভদ্রলোকটিকে কায়স্থদের পংক্তির এক ধারে বসাইয়া দেওয়া হয়। পোলাও পরিবেশন হইতেছে এমন সময় হঠাৎ কায়স্থদের খেয়াল হয়, বারুই তাহাদের সঙ্গে খাইতে বসিয়াছে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে উঠিয়া যাইবার আদেশও জারী হইয়া গেল। যে ভদ্রলোকটি উঠিয়া যাওয়ার কথাটা সটান এই ভদ্রলোকের মুখের উপর বলিয়া দিলেন, তিনি নাকি মহাত্মা গান্ধীর একজন মহাভক্ত। কিন্তু এইখানেই ভদ্রলোকের দুর্দ্দশার শেষ নহে। ইহার পর স্রোতের তৃণের মত একবার এখানে তাহার পর একবার অন্য স্থানে, এইরূপ ওঠা বসা করিতে করিতে ক্লান্ত দুপুরে দুটি অন্ন পেটে দিয়া তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসেন। ভদ্রলোকটি যখন এম, এ, বি এল, তখন শিক্ষিত এ কথা স্বচ্ছন্দেই ধরিয়া লওয়া যায় এবং যখন উকিল তখন পদস্থ একথাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষিত এবং পদস্থ লোকের যখন সমাজে এরূপ দুর্দ্দশা, তখন যাহাদের শিক্ষাও নাই পদ-গৌরবও নাই তাহাদের অবস্থা যে কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়। দেশে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন কম হয় নাই। অথচ তাহার ফল যে কি হইয়াছে তাহার পরিচয় এই সব ঘটনার ভিতর দিয়াই পাওয়া যায়। নিজের জাতির লোককে যাহারা এইরূপ ভাবে 'পারিয়া' করিয়া রাখে, দুনিয়া যে তাহাদিগকে 'পারিয়া' করিয়া রাখিবে, তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নাই। —স্বরাজ

জাতি-হিসাবে আমরা যাহা জানি, তাহার কিঞ্চিৎও যদি করিতাম, তবে আমাদের চেহারা যে বদলাইয়া যাইত, ইহাতে আর সন্দেহ করা চলে না। আমরাই জানি 'যত্র জীব তত্র শিব'; কিন্তু আমরাই জাতি হিসাবে এই পরম সত্যকে আমাদের সমাজ-জীবনে অস্বীকার করিয়াছি। উপনিষৎ-বেদ-বেদান্ত-ভাগবৎ আমরা যত অনর্গল বলি এবং আমরা কার্য্যতঃ তত তাহার বিরুদ্ধাচরণ করি, তাহা বস্তুতই বিস্ময় উৎপন্ন করে। নারীকে মহামায়া ও শক্তির অংশ বলিয়া স্তব করার পরই আমরা কার্য্যতঃ সমাজে নারীকে যে সম্মান দেখাইয়া থাকি, তাহা আমাদের নিদারুণ ভণ্ডামীই প্রকাশ করিয়া দেয়। এই ভণ্ডামীর মূলে ঐ কর্ম্মবিমুখতা ও সত্যপ্রিয়তার অভাব। যাহা জানি তাহা কাজে করিতে যে শক্তি-সামর্থ্যের দরকার, যে বাধা-বিপত্তি ঠেলিতে হয়, তাহা আমাদের নাই, তাহা আমরা করি না। এই সমস্ত কারণে জাতীয় চরিত্রে একটা মস্ত ভণ্ডামী আশ্রয় করিয়া আছে। কর্ম্ম-বিমুখ

অলস ব্যক্তিরও কর্ম্ম-সন্ন্যাসের আলোচনায় বাধা থাকে ; দুর্ব্বল নির্য্যাতিত যে ব্যক্তি, সেও ক্ষমা ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে বিরত হয় না. চতুর্থ পক্ষে বিবাহ করিয়াও বালিকা বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিতে ক্ষান্ত হয় না। শুধু কি তাই, আমরা স্বাস্থ্য বিষয়ে, আহার, ব্যায়াম পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যাপারেও যাহা পুস্তকে শিখি বা শুনি, কাজে তাহা করি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঐ সব শিক্ষার কোনও নিদর্শনই পাওয়া যায় না। কিন্তু অপর জাতির দিকে তাকাইয়া দেখ সেই কর্ম্ম-প্রবণতা তাহাদের আছে বলিয়াই তাহারা জাতি-হিসাবে শ্রেষ্ঠ, আর আমরা দীন হীন। —স্বরাজ

—

দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য কিন্তু দেশের জন-সাধারণের চিত্ত যদি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হয়, তাহারা যদি অজ্ঞান তিমিরেই আচ্ছন্ন থাকে, তবে তাহাদের দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই আজ গণ-শক্তি ভোটের কাঙ্গাল হইয়াছে। তাহারা মনে করে যে, ভোট পাইলেই তাহাদের মুক্তি হইবে। যে সকল পাশ্চাত্য দেশে তথাকথিত গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের আইন-কানুনে, বিধি-বিধানেও নানা গলদ বাহির হইতেছে। পাশ্চাত্য চিন্তা জগতের অন্যতম নেতা মনস্বী এইচ, জি, ওয়েলস সম্প্রতি লিখিয়াছেন, "Not votes but knowledge will bring salvation" ইউরোপ ও আমেরিকার গণ-তন্ত্রের অবস্থা আলোচনা করিয়াই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমাদের দেশেও আজকাল ভোটের জন্যই যত মারামারি কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের মত আমরাও যেন বিপৎগামী না হই। "জ্ঞানাৎ পরতরং নহি" ইহা ত আমাদেরই দেশের অনুশাসন। —যুগবার্ত্তা

—

সমগ্র ভারতে যে-সব দেবসম্পত্তি আছে, সে সকলের আয় বড় অল্প নহে। সে-সব আয় যদি সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয়, তবে সে আয়ে দেশের লোকের অনেক উপকার হইতে পারে। কিন্তু অনেক স্থলে এমনও দেখা যায় যে, দেবতার সেবা "নামমাত্র" হয়—অতিথি, আতুর প্রভৃতি আহার পায় না ; কিন্তু মোহান্ত ২০ বা ২২ হাজার টাকা দামের মোটরে বিহার করেন।

এ দেশে দুই চারিটি ধর্ম্মসভাও স্থাপিত হইয়াছে—সে সব সভার মুখপত্রও দেখিতে পাই। কিন্তু এই সব ব্যাপারে তাঁহাদিগকে কোনরূপ কাজ করিতে দেখি না। দেশে দেবস্থানগুলির কার্য্য যাহাতে সুচালিত হয় এবং দেবস্থানের টাকা যাহাতে অপব্যয়িত না হয়—সে দিকে লক্ষ্য রাখা দেশের লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দক্ষিণ ভারতের কতকগুলি মন্দিরে যেমন দেবস্থান কমিটী গঠিত হইয়াছে এবং সেই সব কমিটী মন্দিরের সেবাদি সকল কার্য্য দেখে, তেমনই ভাবে দেবস্থানের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এখন আমরা আশা করি, হিন্দু জনসাধারণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন এবং যাহাতে দেবদেবী অনাচারে কলুষিত এবং দেবস্থানের অর্থ অপব্যয়িত না হয় সে জন্য চেষ্টা করিবেন। —বসুমতী।

—

অলৌকিক

১৯শে তারিখে বোম্বায়ের 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া' পত্র প্রকাশ করিয়াছেন :—তিব্বত অভিযানের মেজর ক্রস নামক এক ব্যক্তি পোয়ার পশ্চিমে এক সাধারণ সভায় বলিয়াছেন যে, তিনি ২৪০ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছেন। ঐ সন্ন্যাসী থিয়সফিক্যাল সোসায়িটীর প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কীর গুরু। তিনি একজন মহাজ্ঞানী এবং যদিও তিনি কখনও নিউটনের নাম শুনেন নাই তথাপি তাঁহার উদ্ভাবিত গণিতের বিষয়গুলি বেশ ভালরূপই জানেন। তিনি ইচ্ছামত লোকের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইতে পারেন। তিনি ইচ্ছামত নিজের অঙ্গ-প্রতঙ্গ বাড়াইতে বা কমাইতে পারেন। হিমালয়ের মধ্যে আমি যত ঋষি দেখিয়াছি ইনি তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা অদ্ভুত রকমের। যোগবলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ মহাযুদ্ধ হইবে এবং পর বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইবে। এক সময়ে ঐ যোগী একটী ছেলের ভূত ছাড়াইয়াছিলেন ; সেখানে মেজর ক্রস উপস্থিত ছিলেন। মেজর আরও একটী অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছেন—ঐ যোগী মনসংযোগের দ্বারা সম্মুখস্থ একটী কাঁচের গ্লাস চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। —স্বরাজ

—

বিদেশী বাঙ্গালী

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি ইংলণ্ডে গিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেখানে দুই বৎসরের মধ্যে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের দুইটী ট্রাইপসএর অনার পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তিনি কিছুকালের জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার নিযুক্ত হইয়াছেন।

—

নারীপ্রসঙ্গ

নিউইয়র্কের "দি ইভিনিং টেলিগ্রাম" পত্র সম্প্রতি শ্রীমতী সুশীলা দেবী নাম্নী জনৈকা ভারতীয় মহিলার সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে প্রকাশ যে শ্রীমতী সুশীলা দেবী পাঞ্জাবের কোন জমিদারের পত্নী। বিধবাদিগের সাহায্যের জন্য তিনি একটি শিল্পবিদ্যালয় খুলিয়াছেন। সেই বিদ্যালয়ে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার জন্য এবং মার্কিণে হিন্দু-ধর্ম্মের মর্ম্মকথা প্রচার করিবার জন্য তিনি মার্কিণে গমন করিয়াছেন। শ্রীমতী সুশীলা দেবী বিশেষরূপ শিক্ষিতা। মহাত্মার একজন গোঁড়া শিষ্যা। অনেকগুলি ছেলেমেয়েকে তিনি গ্রহণ করিয়া তাহাদের শিক্ষার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মার্কিনে অনেক বিষয় তিনি বেশ পছন্দ করেন—কিন্তু তাহাদের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-হীনতাকে তিনি অত্যন্ত নিন্দা করেন। ভারতবর্ষের নারীদিগের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে যদিও তাহাদের অনেকে অশিক্ষিত তথাপি জালিয়ান-ওয়ালার নৃশংস ব্যাপারের পর মহাত্মার বাণী তাহাদের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়াছে—তাই তাহারা আজ স্বামীপুত্রের সঙ্গে দেশের কাজে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। —আনন্দবাজার পত্রিকা

গৌহাটীর বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোকের সমক্ষে সনাতন ধর্ম্ম সভার প্রাঙ্গণে মেয়েদের জন্য একটি কুমারী পাঠশালা খোলা হইয়াছে। বাঙ্গালা ও বিহারের মহাকালী পাঠশালার অনুকরণে মেয়েদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এ পর্য্যন্ত ২৬টী মেয়ে পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছে। —স্বরাজ

কলিকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম সাহেব জানাইয়াছেন যে, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সুশিক্ষিতা কন্যা গত ৯ই জুন স্বেচ্ছায় ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক গুপ্তকে আমরা একজন ভক্ত-বৈষ্ণব বলিয়া জানি, তাঁহার কন্যা কেন ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, জানিতে কৌতূহল হয়। ইতিপূর্ব্বে ঢাকার ও গৌহাটির একজন শিক্ষিত হিন্দু যুবকও ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। নব-প্রকাশিত "সোলতান" সাপ্তাহিক পত্রে প্রায়ই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণকারী হিন্দুদের নামের তালিকা দেখিতে পাই। এই সব ব্যাপারে হিন্দুরা উত্তেজিত হইয়া ইসলামের বিরুদ্ধে কোনরূপ আন্দোলন চালাইতেছেন না। আর মালকানারা হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই যত কিছু গণ্ডগোল! —আনন্দবাজার পত্রিকা।

এক পত্রপ্রেরক 'অমৃতবাজার' পত্রে একখানা চিঠি লিখিয়াছেন। তাঁহার কোন আত্মীয় তাহার দ্বাদশ বয়স্কা কন্যাকে একমাস আগে বিবাহ দেন, মেয়েটি বিধবা হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, মেয়েটির দশা কি হইবে, তাহাকে কি চির-বৈধব্যের কঠোর ব্রহ্মচর্য্যই আজীবন পালন করিতে হইবে—জীবনের কোন সুখই কি সে আর ভোগ করিতে পারিবে না? বাঙ্গালার সমাজ এ কথার উত্তরে কি বলেন! পুরুষদের অনুচিত অত্যাচার, অবিচারে বাঙ্গালার নারী সমাজ আর কতদিন এমন নির্ম্মমভাবে লাঞ্ছিত এবং নিপীড়িত হইবে? শিক্ষিত সমাজের মধ্যে মধ্যেও কি বুদ্ধি বিবেচনা ফিরিবে না? আমরা মুখে—না জাগিলে সব ভারত-ললনা এ ভারত আর জাগে না, জাগে না,—এই গান গাহিব, অথচ মেয়েদিগকে মানুষের অধিকারও দিব না! —হিন্দুস্থান

শিক্ষার কথা বলিতে হইলেই নারী-শিক্ষার কথা উঠে। নারীদের অশিক্ষিত করিয়া রাখিবার কুসংস্কার দেশ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইলেও তাহাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত এখনও কিছুই হয় নাই। শিক্ষার অর্থ জ্ঞানলাভ করা, আচার ব্যবহার পরিমার্জ্জিত করিয়া বিনীত হওয়া। ইহা পুরুষ নারী দুই জনেরই প্রয়োজন। বাঙ্গলার প্রায় দুই কোটী জননী ভগিনী ও স্ত্রীকে নিরক্ষর রাখিয়া তাঁহাদের পুত্র, ভাই ও স্বামী সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত হইতে পারে না, ইহা নিশ্চিত কথা। লাহোরে হিন্দু-শিল্প-বালিকা-বিদ্যালয়ে স্যর গঙ্গারাম একলক্ষ টাকা দিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের একটীও নারী-শিল্প-বিদ্যালয় নাই। যাহা আছে, তাহাও সংরক্ষণের চেষ্টা নাই—ইহার চাইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে! —শান্তিবার্ত্তা।

বাঙ্গালায় নারীজাতির মধ্যে আত্মহত্যা সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ আত্মহত্যার কারণ অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, স্বামী শাশুড়ী প্রভৃতি কর্ত্তৃক লাঞ্ছনা ও অত্যাচার। ইতিমধ্যে আদালতের বিচারে দুই এক স্থলে স্বামী বা শাশুড়ীর শাস্তিও হইয়াছে। নিগৃহীত ও লাঞ্ছিতকে পদদলিত করিতে সমাজের শক্তি বিকাশ পায়। কিন্তু সমাজের জঞ্জাল দুর করিতে সমাজ বাতগ্রস্থ রোগী হইয়া পড়ে। 'প্রবাসী' স্বাস্থ্য-রিপোর্ট হইতে বাঙ্গালী নারীর আত্মহত্যার যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ১৯২০ সালে ২০,০০২ এবং ১৯২১ সালে ১৮১৯ জন নারী আত্মহত্যা করিয়াছে। —শান্তিবার্ত্তা।

সম্প্রতি লাহোর বিধবা-বিবাহ সহায়ক সমিতির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ, সমগ্র ভারতে ১৯১৫ হইতে ২২ সাল পর্য্যন্ত ১২৭৬ জন বিধবার পুনর্বিবাহে তাঁহারা সাক্ষাৎ অসাক্ষাৎভাবে সাহায্য করিয়াছেন। যে বৎসর ঐ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বৎসর মাত্র ১২টি

বিধবার বিবাহ দেওয়া হয় ; কিন্তু ১৯২২ সালে ঐ সংখ্যা ৪৫৩ জনে উঠিয়াছে এবং এই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িবে বলিয়াই আশা করা যাইতেছে।

"ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ঐ রে।"—কবির মর্ম্মব্যথার সকরুণ বাণীর প্রতিধ্বনি যাহার আকাশে বাতাসে এখনও ভাসিয়া বেড়াইতেছে, বিধবার তপ্তশ্বাসে বিগলিত-হৃদয় দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর যেখানে-বিধবা-বিবাহের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সেইখানেই আজ বিধবা-বিবাহের প্রতি উৎকট উদাসীনতা পরিলক্ষিত হইতেছে। সমিতির রিপোর্টে প্রকাশ, মাত্র ৩টি বিধবা বঙ্গদেশ হইতে পরিণীতা হইয়াছেন, অথচ বঙ্গের বিধবা-সংখ্যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কোনক্রমে কম নয়, বাংলার বিধবার মত এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন নারীই নহে। যে দেশে দশবৎসর বয়স্কা বিধবার সংখ্যা দশ হাজারকেও অতিক্রম করিয়াছে এবং যে দেশে ১৫ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্কা বিধবার সংখ্যা ৩,৩৫,৪৬০ সে দেশে মেয়ের বাপেরা নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন কি জন্য ?—মেয়ের থান কাপড়, খালি হাত, আলুথালু বেশ, শুষ্ক মুখ আর একাদশীর উপবাস ও নিরামিষ ভোজন নিষ্কম্প স্বচ্ছন্দ চিত্তে দেখা যা'—কষাইয়ের গোবধে কুণ্ঠাহীনতা ঠিক তাই নয় কি ?—মা-বাপ সে দৃশ্য কোন্ প্রাণে দেখেন? যদি সে দৃশ্য না দেখিতে পারেন, তবে কোন্ প্রাণে তাঁহারা বিধবা বালিকাকে বঞ্চিত করিয়া দুবেলা মাছ ভাত মুখে দেন?—তাহাতে যদি হাত না উঠে, তবে বিধবা মেয়েকে পুন পাত্রস্থ করিতে তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন্ কেন? মিথ্যা জাতিগত সংস্কার, লোকাচার ও সমাজের ভয়ে কি? কিন্তু সমাজ কোথায়? বিশ্বকবির ভাষায় বলিতে গেলে—"সে বুড়ো কর্ত্তা বেঁচেও নেই, ম'রেও নেই। ভূত হ'য়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না।' কিন্তু দেশবাসী তাহার মায়াকে ছাড়িলে, তাহার মায়াটিও দেশবাসীকে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু আলস্য ও আশঙ্কা নিবন্ধন দেশবাসী ম্যাক্‌বেথের মত ব্যাঙ্কোর ছুরী-বিভীষিকার হাত কিছুতেই এড়াইতে পারিতেছ না।

কিন্তু বিধবাকে আর অসহায় উৎপীড়নের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। ইহাতে জাতি সংখ্যাও নীতি হিসাবে অধোগতি লাভ করিতেছে। বিধবা-বিবাহ সহায়ক সমিতি সাধারণতঃ ২৫ বৎসরের কম যাহাদের বয়স, তাহাদিগকেই বিবাহযোগ্যা বলিয়া ধরিয়া লন্; এ ব্যবস্থা আমাদের মতে খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তরুণ সহযোগী 'যুগান্তর' এই সম্পর্কে একটি বড় সুন্দর সুসাধ্য সুসঙ্গত যুক্তি প্রদান করিতেছেন, সেটুকু উদ্ধৃত করার লোভ-সংবরণ আমাদের নিকট অসম্ভব হইয়া উঠিল :—"এই শতাব্দীব্যাপী অত্যাচার দূর হ'তে কেবল একটি আইনে, আর সে হচ্ছে—বিপত্নীকদের বিধবা-বিবাহ কত্তে বাধ্য করা। কুমার ছাড়া কুমারীকে কেউ বিয়ে কত্তে পারবে না ; আর যত পুরুষ বিধবা আছেন, তাঁরা হয় ব্রহ্মচর্য্য ক'রে দিন কাটাবেন, নয় বিধবা মেয়ে বিয়ে করবেন। এ আইন পাশ হ'লে কয়েক বছরেই যে সব বিধবার বিয়ে চুকবে তাই নয়, বর-পণের কামড়ও ও আলগা হ'য়ে যাবে। আর কুমারিদেরও দোজবরে আর তেজবরে বিয়ে করবার দুর্ভাগ্য বইতে হবে না।

স্বাস্থ্য, সুখ ও শান্তির দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, দাম্পতীর মধ্যে বয়সের খুব বেশী পার্থক্য থাকা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। হিন্দুর ঘরে স্ত্রী-পুরুষের অন্যূন ছয় ও অনধিক চোদ্দ বৎসরের ব্যবধান থাকা চলে। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা"য় ব্যক্তিগত, গৃহগত ও সমাজগতভাবে কত অনর্থ ঘটাইতে পারে ও ঘটায়—তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আরো অনেকেই জানেন। স্পষ্টকথা বলিতে গেলে বৃদ্ধের মরা গাঙে যুবতীর যৌনবৃত্তি কখনই চরিতার্থ হয় না ; সুপ্রজনন ও মনস্তত্ত্বগত আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিলেও কোন বৃদ্ধেরই ঐরূপ বিবাহ করা উচিত নহে। বয়স্কের বয়স্থাকেই বিবাহ করা উচিত। "যুগান্তরে'র যুক্তি অনুসারে কাজ হইলে এক গুলিতে দুই পাখী মরিবে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার বিখ্যাত ডাক্তার রবিনসনের একটী উক্তি মনে পড়িল, তিনি একবার ঘটনাক্রমে বলিয়াছিলেন—"A good cook and a young wife are the worst foes of old age" কথাটার জ্বলন্ত সত্যতা এদেশের বৃদ্ধেরা স্বীকার করিবেন কি?

—স্বাস্থ্যসমাচার।

মনু পরাশর থেকে রঘুনন্দন অবাধ মহাপুরুষরাই এ জাতিকে মেরে রেখেচেন এর ধমনীতে সনাতন পক্ষাঘাত ইন্‌জেক্ট ক'রে। ব্যক্তিশাতন্ত্রাই হচ্চে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। আর মনু যখন 'নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' ফতোয়া জাহির করে দেশের অর্দ্ধেক মানুষকে অমানুষ ক'রে রাখবার ফন্দী করলে জঘন্য স্বার্থের অনুরোধে, তখনই মহামানবের মহাশত্রুর মনে মৎলব ছিল যে বাকী অর্দ্ধেকও তাদের পঙ্গুত্বের আর্ত্ততায় পড়ে অচিরে পোড়া ব'নে যাবে—আর তারা চলবে না, চিন্তা করবে না কেবল তাঁরই শেখান বুলি কপচে দিন কাটিয়ে দেবে। তিনি যদি নি-খরচায় অমর হয়ে থাকবার জন্যে এই ব্যবস্থা করে থাকেন তবে তিনি সিদ্ধকাম হয়েচেন বলতে হবে—কিন্তু তাঁর অমরত্ব কিন্‌তে হয়েচে আমাদেরই মৃত্যুর বিনিময়ে।

—যুগান্তর।

ভারতের অন্যতম দেশীয় রাজ্য রাজ-কোটের প্রতিনিধি সভায় দুইজন মহিলা সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই রাজ্যটি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও রাজ্যের শাসন কার্য্য জনসভার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, রাজ্যের সকল অধিবাসীই ভোট প্রদানের অধিকার লাভ করিয়াছে। জনগণের নির্ব্বাচিত ৯০ জন প্রতিনিধির সাহায্যে ঠাকুর সাহেব দেশশাসন করেন।

উক্ত জনসভার সভাপতিও ঠাকুর সাহেব কর্তৃক মনোনীত হন না—জনসাধারণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ভারতের অনেক দেশীয় রাজ্যেই শাসন সংস্কার ও সমাজ সংস্কার ব্যাপারে এমন সব বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা দেখিয়া শুনিয়া ব্রিটিশ সরকার পরে উহার অনুসরণ করিয়াছেন। যদিও রাজকোট রাজ্য ছোট তথাপি এই রাজ্যের জনসভাকে পার্লিয়ামেণ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ইংলেণ্ডে যেমন মহাসভার দুইজন মহিলা সভ্য আছেন এই রাজ্যের মহাসভায়ও দুইজন মহিলা সভ্য আছে। রাজকোটের ঠাকুর সাহেব যেমন প্রজার প্রতি সদয়, প্রজারাও তেমনি তাহার প্রতি সদয়, প্রজারাও তেমনি তাহার প্রতি অনুরক্ত। —স্ত্রীধর্ম্ম।

বিজ্ঞান

হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বায়ু হইতে তাড়িত বাহির করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইংলিশম্যানে এই সুসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যদি ইহা বহু ব্যয়সাধ্য না হয়, তবে ব্যবসায় ও গার্হস্থ্য কার্য্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

—সঞ্জিবনী।

সমগ্র বঙ্গে সাধারণতঃ মৎস্যের পরিমাণ ক্রমেই যেরূপ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের এই পোনা সরবরাহের বা মৎস্য বৃদ্ধির প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়; আর গবর্ণমেণ্টের এ চেষ্টা একেবারেই নূতন নহে; বহু বর্ষ পূর্ব্ব হইতে গবর্ণমেণ্টের এ দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে সামুদ্রিক মৎস্য সরবরাহের অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে এবং চেষ্টায় একখানা ষ্টীমার পর্য্যন্ত কতককাল যাবৎ চলিয়াছিল। কিন্তু এ দুঃখের বিষয় এই যে, গবর্ণমেণ্টের এই সব চেষ্টার ফলে এবং বৎসর বৎসর বর্ষাকালে গবর্ণমেণ্ট হইতে এইরূপ পোনা সরবরাহের ফলেও বঙ্গে মৎস্য আবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না! ইহার কারণ কি? বর্ষাকালে চন্দননগর এবং মগরা-ত্রিবেণী প্রভৃতি বহু স্থান হইতেই গঙ্গার পোনা আর দামোদরের তীরবর্ত্তী বহু স্থান হইতেই দামোদরের পোনা খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। তবে বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সব পোনার দর যেরূপ ছিল, আজকাল আর সেরূপ নাই;—দর এখন অনেক বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া,—এই সব পোনা পল্লীগ্রামের অনেক পুকুরেই আর পূর্ব্বের মত শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে না; অনেক পোনা পুকুরের পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ইদানীং এদেশে মৎস্যাভাবের একটা গুরুতর কারণ। আরও একটা কারণ,—বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের মফঃস্বলে জলপূর্ণ পুকুরের সংখ্যা যত অধিক ছিল এখন তার তত অধিক নাই; বহুসংখ্যক পুষ্করিণী চটান এবং শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে। বিল-ঝিল অনেক কমিয়া এবং শুকাইয়া গিয়াছে। কাজেই মাছের পরিমাণও অনেক কমিয়া গিয়াছে। —বঙ্গবাসী।

শ্রীহট্ট জিলার কালাজ্বর পরিদর্শক, শ্রীযুক্ত কালীপদ গুহ মহাশয় একটা অত্যাশ্চর্য্য বৃক্ষের অত্যদ্ভুত গুণের বিষয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—"আসামের নওগাঁ জিলার অন্তর্গত বড়ভুগিয়া মৌজার অধীন মিছা নদীর উপরিভাগস্থ লোহার পুলের সন্নিকটে আমি একটী সুদর্শন বৃক্ষ দেখিয়াছি; মনুষ্য বা মনুষ্যত্বের প্রাণীদিগের মধ্যে কোন্দল উৎপাদন করাই উহার প্রধান কার্য্য বলিয়া আমি উহার কোন্দলী বৃক্ষ নামকরণ করিয়াছি। ঐ কোন্দলী বৃক্ষটী ১৭।১৮ হাত উচ্চ। সুপারি, তাল প্রভৃতি গাছের ন্যায় উহার কাণ্ডের মস্তকভাগ ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে শাখা প্রশাখা নাই। কাণ্ডের নিম্ন ও উচ্চভাগ মধ্যভাগ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক স্থুল; কাণ্ডের নিম্নভাগ অনেকাংশে সাগু-গাছের কাণ্ডের ন্যায় স্থুল ও সুগোল। কাণ্ডটি গাঢ় সবুজবর্ণের; কিন্তু উহার স্থানে স্থানে ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা সাদা রেখা বা ফাটা ফাটা দাগ রহিয়াছে। কোন্দলী বৃক্ষের মস্তকের নিম্নদেশে যদি কখনও দুইজন নিরীহ বন্ধুব্যক্তিও কিয়ৎকাল উপবেশন করে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যেও অকারণ উদ্ভিদের অত্যদ্ভুত ক্রিয়াশক্তিতে বিষম কলহ উপস্থিত হয়। —কৃষিসম্পদ।

লোক-সেবা

বিহার-উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভার ১৯২৩-২৪ সালের বাজেটে পল্লী অঞ্চলে ঔষধ প্রভৃতির ব্যবস্থার জন্য ২,০০-৩০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনেই যাহাতে একটি করিয়া ছোট-খাট ডিস্পেন্সারী বসানো যায় সেই জন্যই চেষ্টা চলিতেছে। এত অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও যে বিহার উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভা এদিকে নজর দিতে ত্রুটি করেন নাই, ইহাতে স্বাস্থ্য সচিবের জনসাধারণের প্রতি দরদের পরিচয়টাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এ আশ্বাসও পাওয়া গিয়াছে যে, আরো ৩,০০,০০০ টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে। বিহার-উড়িষ্যার এই আদর্শ যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলির পক্ষেও অনুকরণ যোগ্য, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কারণ সমস্ত প্রদেশেই রুগ্ন ব্যক্তির সংখ্যা যেমন বেশী চিকিৎসক এবং ডিস্পেন্সারীর সংখ্যা তেমনি কম। —স্বরাজ।

পাইকপাড়ার পরলোকগত রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মৃত্যুর পূর্ব্বে এক উইলে ৪৩ হাজার টাকা জনসাধারণের কাজে দান

করিয়া গিয়াছেন। দানের উদ্দেশ্য গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। পাইকপাড়ার বালক-বালিকাদের একটি স্কুলের জন্য দশ হাজার টাকা, একটি দরিদ্রাশ্রমে পাঁচ হাজার, গঙ্গার একটি ঘাট গাঁথিয়া তুলিবার জন্য দশ হাজার কান্দীর বালিকা বিদ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিশ হাজার। দানের উদ্দেশ্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বোঝা যায়, এই পরলোকগত লক্ষ্মীর বর-পুত্রটীর দেশের উন্নতির জন্য কিরূপ গরজ ছিল, দেশবাসীর জন্য তাঁহার মনের ভিতর কতখানি দরদ ছিল! দেশের বড়লোক যাঁহারা, দেশের কথা দশের কথা ভাবিবারও তাঁহাদের অবকাশ হয় না। সুতরাং এ দেশে যাঁহারা বড়লোক হইয়াও জনসাধারণের কথা ভাবে, তাঁহারা একটু স্বতন্ত্র ধরণের লোক। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র অল্প বয়সে পরলোকের পথে যাত্রা করিয়াছেন, এটা বাংলার পক্ষে দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করিতে হইবে। —স্বরাজ।

——

স্বাস্থ্য

আমরা অবগত হইলাম, গত সপ্তাহের চারুমিহিরে নানাস্থানের জ্বরের বিবরণ পাঠ করিয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের কর্তৃপক্ষ উহার অনুসন্ধান ও প্রতীকার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহারা এই বিষয়টীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিবেন। আবশ্যক হইলে অন্যান্য কার্য্য স্থগিত রাখিয়াও এই বিপদ হইতে লোককে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টা করা উচিত। কেবল ডাক্তার ও ঔষধ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেই হইবে না; কেন এইরূপ সর্বব্যাপী জ্বর হইতেছে তাহার মূলানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য এবং সম্ভবপর হইলে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

বলা বাহুল্য এই সর্ব্বব্যাপী জ্বরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে একমাত্র কুইনাইনই ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু এই কুইনাইন ঘোর দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে সস্তাদরে কুনাইন প্রতি ডাক ঘরেই বিক্রয় হইত। গবর্ণমেণ্ট সময় বুঝিয়া কুইনাইনের মূল্য বাড়াইয়া দিয়াছেন। মরিবার সময়েও গবর্ণমেণ্টকে ডবল হারে ট্যাক্স না দিয়া মরিবার উপায় নাই। যাহা হউক ডাকঘরগুলিতে উহা সর্ব্বদা পাওয়া গেলে বেশী পয়সাও দিয়া লোকে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিত। কিন্তু এখন তাহা পাওয়া যায় না। ডাকঘরে অধিকাংশ সময়েই কুইনাইন থাকে না। আমরা অবগত হইলাম, ডাকঘরে কুইনাইন পঁহুছিলেই কোনও কোনও শ্রেণীর দোকানদার উহা কিনিয়া লয় এবং পরে প্রয়োজনের অবস্থা বুঝিয়া অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে।

—চারুমিহির।

——

বোধ হয় স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্তাদের "মশার বাতিক" অনেকটা কমিয়াছে। যে কারণেই হোক, মশক-ধ্বংস করাই তাঁহারা ম্যালেরিয়া নিবারণের একমাত্র পন্থা বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন। এবং বৎসরে হাজার হাজার টাকা এই উদ্দেশ্যে 'অপব্যয়' করিতেছিলেন। জলনিকাশের পথ রোধ হওয়াতেই যে বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব হইয়াছে,এ কথা বড় বড় বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন; নদীমাতৃক বাঙ্গালার কতকগুলি বড় বড় নদী ও তাহার শাখা-প্রশাখা ক্রমে ক্রমে ভরাট হওয়াই ইহার অন্যতম কারণ। ডাক্তার বেণ্টলী সেই জন্য অবরুদ্ধ স্থানের জল-নিকাশের ব্যবস্থা ও কৃত্রিম উপায়ে জল প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া ম্যালেরিয়া-নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন।

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুরে কৃত্রিম জলপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। নদীয়া জেলার কুমারখালি একটা প্রসিদ্ধ জনপদ। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় এই গ্রাম ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল, কুমারখালির মধ্য দিয়া একটা খাল কাটিয়া নিকটবর্ত্তী গৌরী নদীর সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই খাল দিয়াই গ্রামের রুদ্ধ জল বাহির হইয়া নদীতে পড়ে। জল-নিকাশের এমন বন্দোবস্ত হওয়াতে কুমারখালি হইতে ম্যালেরিয়া প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে; প্লীহাগ্রস্ত শিশুর সংখ্যাও খুব কমিয়া গিয়াছে।

আমরা জানি, পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজবাড়ী ষ্টেশন পর্য্যন্ত দুই ধারে আশে পাশে যত গ্রাম আছে—সবই ম্যালেরিয়ায় ধ্বংশ হইতে চলিয়াছে। ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত অনেক প্রাচীন গ্রামই প্রায় জনশূন্য। রেলওয়ে বাঁধের ফলে জল-নিকাশের পথ রোধ এবং গৌরী নদী ও তাহার শাখা-প্রশাখা ভরাট হওয়াতেই এরূপ ঘটিতেছে, এ কথা নিশ্চয়। এখন হইতে চেষ্টা না করিলে এই বিস্তীর্ণ ভুভাগ শীঘ্রই অরণ্যে পরিণত হইবে। —আনন্দবাজার পত্রিকা

——

পল্লীবাসীর অভাব-অভিযোগের আন্দোলনটা চাপা দিবার ও তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য জেলা রোড সকল সময় বেশ এক কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। পল্লীবাসীরা যখন চিকিৎসালয় নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ ও পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য বোর্ডে তীব্র আন্দোলন করে, তখন তাহাদিগকে জানান হয় (অবশ্য সব ক্ষেত্রে নহে) "খরচের অর্দ্ধেক টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে কার্য্য আরম্ভ হইতে "পারে"। যে গ্রামে অবস্থাপন্ন লোক বাস করে তাহারা কোন মতে ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রার্থিত বস্তুটি লাভ করে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দরিদ্র প্রার্থীরা টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আর ঐ বিষয়ে উচ্চ বাচ্য করিতে সাহসী হয় না নিতান্ত অভাব অসুবিধা ভোগ করিয়া অনন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া সব যন্ত্রণার অবসান করিয়া ফেলে। —হিন্দুরঞ্জিকা

——

চাঁদপুর মহকুমা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সেখানে কয়েকটী গ্রামে এক প্রকার নূতন রকমের জ্বর দেখা দিয়াছে। গত দুই মাসের মধ্যে সেখানকার ছয়টি গ্রামের প্রায় সাত শত লোক মারা গিয়াছে। এই অসুখে নাকি লোকে তিনচারদিনের বেশী জীবিত থাকে না। বেঙ্গল হেল্‌থ এসোসিয়েশনের ডাক্তার নীরদবন্ধু ভট্টাচার্য্য এই রোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে চলিয়াছেন। এ নতুন আপদ আবার কোথা হইতে আসিল? কলেরা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লেগে কি আশ মিটিতেছে না? —স্বরাজ

—

রাজনীতি

কেনিয়া উপনিবেশে ভারতবাসীর দশা কি হইবে তৎসম্বন্ধে এখনও সিদ্ধান্ত হয় নাই। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেই ডেপুটেশন বিলাতে গিয়া এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতেছেন। এদিকে কিন্তু কেনিয়ার শ্বেতাঙ্গ ভলাণ্টিয়ারগণ তত্রত্য ভারত সন্তানদিগকে বয়কট করিয়াছেন। যে সকল ভারত সন্তান সেখানে শ্বেতাঙ্গদিগের অধীনতায় কার্য্য করিতেছিল, তাহাদিগকে পদচ্যুত করা হইতেছে। যাহারা ব্যবসায়াদি করিতেছে, স্থানীয় অধিবাসীরা তাহাদিগের নিকট হইতে কোন দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে না। ফলে তাহাদিগের ক্ষতি হইতেছে। শ্বেতাঙ্গগণ দেখাইতেছেন যে কেনিয়াতে ভারতবাসীরা না থাকিলে কাহারও কোন প্রকার ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই, শ্বেতাঙ্গগণ না থাকিলে রাজ্যটা রসাতলে যাইবে। কেনিয়া রাজ্য শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধারের সময়ে অবশ্যই ভারতীয় সেনার প্রয়োজন হইয়াছিল। এখন কাজ ফুরাইয়াছে সুতরাং ভারতবাসীর সে দেশের অনাবশ্যক হইয়াছে। হায় রে—স্বার্থ!

—হিতবাদী।

—

কলিকাতার 'হল্‌ওয়েল' স্মৃতি-স্তম্ভটি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার একটা হুজুগ উঠিয়াছে। 'অন্ধকূপ হত্যা' সত্যই হইয়াছিল কিনা, তাহাতে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সত্যই হাত ছিল কিনা; ইহার কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা; অথবা ইহার সবখানি কথাই সত্য অথবা ইহার সবখানি কথাই মিথ্যা কিনা,—ইহার ঐতিহাসিক যুক্তি-তর্ক উঠানো বৃথা। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকদের মতে ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিকও ইহার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন।

ইহাকে জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চেষ্টা যে কেবল উচ্ছৃঙ্খল ও বে-আইনিজনক বলিয়াই অন্যায় তাহা নহে, ইহাতে অনর্থক মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি আঘাত করা হয়—ইহা মার্জ্জিত রুচিসম্মতও নহে। স্মৃতিস্তম্ভের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে চাহ, স্বা সঙ্ঘ কর। শুধুই একটা হুজুক বাধাইয়া, কতকগুলি নির্ব্বোধ ছেলেকে পাঠাইয়া লাভ কি? একটা সামান্য ঐতিহাসিক সত্যাসত্যের দ্বন্দ্বে এত হৈ চৈ করিবার কি প্রয়োজন? এই সমস্ত হুজুক বাধাইবার ফলে অজ্ঞ জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে, গণ্ডী কাটিয়া গিয়া জোর জুলুম করিতে পারে; আর তাহার সাংঘাতিক ফল যে এই সমস্ত সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিদেরই বিশেষ করিয়া ভুগিতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। —স্বরাজ।

—

সৈন্য বিভাগের ৮টি 'ইউনিটকে' ভারতীয় করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। এই 'ইউনিট' কয়টির জন্য সেনানী ভারতীয়দের ভিতর হইতে মিলিতেছে না। ডাঃ এস, কে মল্লিক বাংলার 'টেরিটোরিয়াল ফোর্স এডভাইসরী কমিটির প্রেসিডেণ্ট। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতীয় সেনানীরা যে এই কয়টি 'ইউনিটের' সেনানীদের পদগ্রহণ করিতে রাজি হন নাই তাহার কারণ, এই কয়েকটি ইউনিটকে সৈন্যদল হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই ইউনিটগুলির সম্মান ও প্রতিপত্তি সেনাদলের অন্যান্য ইউনিটের সমান হইবে না আশঙ্কা হইতেই তাঁহারা উহাতে নাম লেখাইতে রাজি হইতেছেন না। এগুলিকে তাঁহারা পরীক্ষা হিসাবেই ধরিয়া লইয়াছেন। এ পরীক্ষা সফল হইতেও পারে না ও হইতে পারে। সুতরাং পরীক্ষার খাতিরে, যে প্রতিষ্ঠা তাঁহারা সৈন্য বিভাগে অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা যে হারাইতে নিজে রাজি হইবেন না তাহা স্বাভাবিক। এইরূপ আলাদা করিয়া দিয়া সৈন্য-বিভাগকে যদি ভারতীয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা হয় তবে সে চেষ্টা কখনও সফল হইবে না। সৈন্য বিভাগকে ভারতীয় করিয়া তুলিবার এই স্কিমটিকে সফল করিতে হইলে ধীরে ধীরে ইউরোপীয়ান সেনানীদের স্থানে ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত করিয়াই তাহা করিতে হইবে।" লর্ড সিডেনহ্যাম প্রমুখ 'ভারতবন্ধু'রা তো ইহা লইয়া রীতিমত গলাবাজি করিতে সুরু করিয়া দিয়াছেন। ভারতবাসীরা ভারতবাসীদের অধীনে থাকিতে চায় না, স্বদেশী উপরওয়ালা অপেক্ষা বিদেশী উপরিওয়ালা দিগকেই তাহারা পছন্দ করে এইরূপ অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান তাঁহারা ইহার ভিতর পাইয়াছেন। অবশ্য ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনো কারণ নাই। লর্ড সিডেনহ্যাম প্রভৃতিকে যাঁহারা জানেন তাহারা একথাও জানেন যে ইহাই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক —স্বরাজ।

—

ডাক্তার মুঞ্জি এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মালাবারের হিন্দুদিগের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য ঐ অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। পণ্ডিত মদনমোহনের প্রশংসা করিতেই হইবে, সেদিন তিনি কন্যার শোক পাইয়াছেন এমন দুঃসময়েও মালাবারের হিন্দুদের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিয়া সেইদিকে ছুটিয়াছেন। পাঞ্জাবে হিন্দুদের সংখ্যা কম, মালাবারে হিন্দুদের

সংখ্যাই বেশী কিন্তু তবু দেশের হিন্দুরা মোপলাদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, হিন্দুজাতির শক্তিহীনতা এবং সংহতি-শক্তির অভাবেরই ইহা পরিচায়ক। সম্প্রতি ডাক্তার মুঞ্জি কালিকটে হিন্দুদের একটি সভায় বলিয়াছেন, আমি এরনাদ জেলার নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, এবং তথাকার হিন্দুদের অসহায় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমার এই মন যে হিন্দুরা যদি সংহতিবদ্ধ হন, এবং নিজদিগকে শক্তিশালী করিতে পারেন, তবে তাহাদের এমন অবস্থা দূর হইতে পারে। শুধু মালবারে কেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দুদিগের সংহতিবদ্ধ হওয়া এবং নিজেদের সমাজকে শক্তিশালী করা উচিত—হিন্দু-মুসলমানের মিলন যদি করিতে হয়, তবে হিন্দুকে শক্ত হইতে হইবে, মুসলমান শক্ত হইতে হইবে। জোড়াতালি দেওয়া মিলনের কোনই মূল্য নাই।

—হিন্দুস্থান

শুদ্ধি উৎসবে যে বহু মুসলমান ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেদিন বারাণসীর মুসলমানরা প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া এই উৎসবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং উহার বিপক্ষে মুসলমান আন্দোলন সতেজ ও সজীব করিবার মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন। আবার গত ৩১শে মে বৃহস্পতিবার বোম্বাই সহরে বোম্বাইবিভাগের জমিয়াত উলামা এবং আঞ্জুমানেই-মসলিমিন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় বহু গণ্যমান্য মুসলমান স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি উৎসবের বিরুদ্ধে তীব্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই উৎসবের ফলে মুসলমান সমাজ কিরূপ বিচলিত হইয়াছেন, তাহা বক্তাগণ সভায় বুঝাইয়া দেন এবং আগ্রা ও পাঞ্জাবে এবং অন্যান্য স্থানে মুসলমানরাও হিন্দুকে ধর্ম্মত্যাগী করিবার রীতিমত আয়োজন করুন, এইরূপ উপদেশ দেন। মওলানা আবদুল আলিম বলেন, 'আর্য্যসমাজীরা আমাদের মনে যে আঘাত দিতেছে, তাহা অসহ্য হইয়াছে। ইহার প্রতিকারই করিতে হইবে। এসব কথায় কি মনে হয়? ভিতরে যখন এত উষ্মা, তখন মিলনের আশা কোথায়?

—বসুমতী।

ঘর-সংসার

ডাক্তার ব্রজবল্লভ সাহা এম বি, ডি টি এব ইত্যাদি সংবাদপত্র মারফৎ সংবাদ দিতেছেন যে, সহরে এক নূতন রোগের আগমন হইয়াছে। এই রোগের নাম এখনো কিছু দেওয়া হয় নাই। খুব বেশী জ্বর হয় এবং শরীরে লাল লাল ছোট দাগ বাহির হয়। সহরে এত রোগ থাকিতেও আবার নূতন রোগ!

- হিন্দুস্থান

দেশের লোকের ব্যাধিপ্রবলতা এত বাড়িল কেন? শরীর দুর্ব্বল না হইলে, ব্যাধিবিষ সহসা প্রবল হইতে পারে না। বাঙ্গালীর দেহ দিন দিন দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই ব্যাধি তাহার দেহে মৌরশী পাট্টা পাইয়া বসিতেছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম স্বাস্থ্যের আনন্দ-নিকেতন ছিল। আর আজ? মফঃস্বলের বন্দরে উড়িয়া বা হিন্দুস্থানী কুলী, মজুর মাল বহন করে—বাঙ্গালী তাহাও পারে না। বাঙ্গালার পল্লী গ্রামের অবস্থা দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। এককালে সমৃদ্ধ গৃহস্থদিগের পরিত্যক্ত গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; তাহাতে শৃগাল কুক্কুরে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র ও আশ্রয় পাইতেছে। পুষ্করিণী শুকাইয়া উঠিয়াছে—গ্রামে জল কষ্ট। কচুরী পানায় নদী মজিয়া উঠিতেছে—নৌকা চলা দায়। বাঙ্গালার পল্লীর যদি সর্ব্বনাশ হয়, তবে যে বাঙ্গালীরও সর্ব্বনাশ তাহা বলাই বাহুল্য। সেই পল্লী শ্মশান হইতে চলিয়াছে। ফলে বাঙ্গালার সম্পদ হ্রাস হইতেছে। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে জমী পতিত হইতেছে—লোকের অভাব স্বর্ণপ্রসূ ভূমিতে চাষ হইতেছে না। অথচ কৃষিজ পণ্যের দাম চড়িয়া যাইতেছে।

—বসুমতী।

আগে শুনা যাইত, বেশী ছাঁটা পরিষ্কার এবং পুরানো চাউল খাইয়া বাঙ্গালীদের বেরি বেরি হয়। সেদিন আসামের ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়সনের বক্তৃতা কালে মেজর নোলেস বলিয়াছেন—বেশী ছাঁটা এবং পুরাণো বালাম চাউল খাইয়া কলিকাতার মধ্যবিত্তশ্রেণীর বাঙ্গালীদের ড্রপসি হইতেছে। এ ব্যারাম অতি গরীবের হয় না—কারণ, পেটের কাঁড়া আকাঁড়া চাউল বাছিবার অবসর তাদের নাই, অবসর তাদের নাই, অথবা বেশী বড় লোকদেরও হয় না—কারণ তাঁরা ভাতের সঙ্গে অন্যান্য পুষ্টিকর জিনিষ খান। এ ব্যাপার কেরাণী শ্রেণীর বাঙ্গালীদেরই নাকি বেশী হয়। মেজর বলিয়াছেন, খাওয়াতে বাবুয়ানার জন্যই এ ব্যারাম প্রধানতঃ হয়, অন্য পুষ্টিকর জিনিষ কিনিতেও পয়সা জুড়ে না, অথচ চাউলের যে পুষ্টিকর জিনিষ তাহাও ছাঁটিয়া ফেলা চাই—পাতলা পরিষ্কার ফুর ফুরে ভাত না হইলেও মুখে রুচে না—বড় মানুষ না হইলেও বড় মানুষী চাল আমরা রাখিতে চাই—ফলে হয় বোকামী।

—হিন্দুস্থান

জাতি হিসাবে আমরা যে মরিতে বসিয়াছি, আমরা কয়জন তাহা ভাবি? আমাদের অকালমৃত্যু, আমাদের শিশুমৃত্যু, আমাদের ম্যালেরিয়া কলেরা, প্লেগ, বসন্ত আমাদের জীবনীশক্তি হরণ করিতেছে, সে দিকে লক্ষ্য নাই। বিলাসিতার আড়ম্বরে আমরা—সামর্থ্যহীন আমরা উৎসন্নের পথে যাইতেছি, বিরাট সমাজ কুটস্থ চৈতন্যের মত নির্ব্বিকার চিত্তে তাহা কেবল দেখিয়া যাইতেছে, প্রতীকারের পন্থা কেহ খুঁজিতেছে না। আছে দলাদলি, ক্ষুদ্র স্বার্থদ্বন্দ্ব অলসতা, প্রাণহীনতা কিন্তু আমাদেরই এই দেশে সদৃষ্টান্তের অভাব নাই, উচ্চ আদর্শের বিরলতা নাই সে দৃষ্টান্ত—সে আদর্শ কয়জন অনুসরণ করেন কয়জনের সে মানসিক বল আছে, নৈতিক সাহস আছে?

—বসুমতী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সায়াহ্ন

প্রাচীন চিত্র হইতে
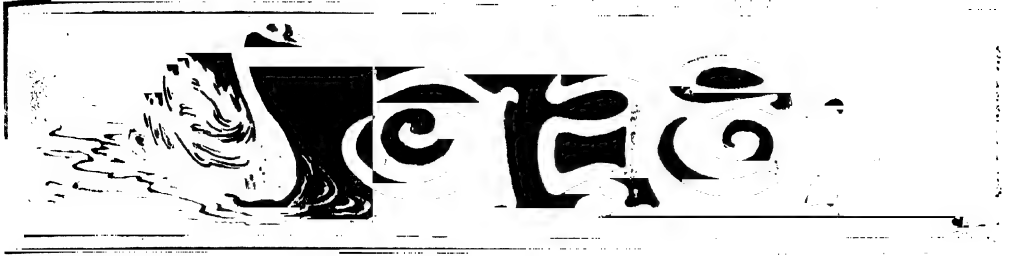
৪৭শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৩০ | পঞ্চম সংখ্যা

ফুলশর

দেবতা তোমার কুসুম-শরে ধিক।
সে হৃদয় বিঁধে বিঁধে হল শিক-কাবাবের শিক্॥

*　　*　　*

ও দেবতা! ফিরাও তোমার শর।
তার ফুল কোথা পাইনে খুঁজে কাঁটাই নিরন্তর।
　　হৃদয়-কুসুম গেঁথে চলে,
　　ফুলশর তাই কি বলে?
তা'হলে নাম বদলে বল' বজ্র অতঃপর!

*　　*　　*

আহাহা! এই ত ফুলশর!
যাদের ফুলের চেয়ে কোমল হিয়া পড়ে তাদের পর।
　　কারো হৃদয় আম্রমুকুল,
　　কারো নবমল্লিকা ফুল,
কারো অরবিন্দ, কারো অশোক মনোহর।
(তাদের) বিঁধে বিঁধে গেঁথে গেঁথে চলেছে এ শর!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গাঁয়ের মানুষ

গাঁয়ের মানুষ বুন্‌ছে কাপড়—গাঁয়ের মেয়ে কাট্‌ছে সুতো।
আয়রে তোরা কিন্‌বি যদি দেশের কাপড় দেশের জুতো।
　　ঢাকাই কাপড় হোক্ না চড়া—
　　আমরা কিনে পরব 'গড়া'—
দুঃখী যারা লক্ষ্মীহারা—কাজ কি তাদের অত-শত!

　　দেশের লোকে গড়ছে তালা,
　　পিতল-কাঁসার ঘটি, থালা,—
দেশের কলু যোগায় যে তেল তার আলোতে নাই বিপদ।
　　ও মেয়েরা, ঢাকার শাঁখায়
　　দেখ্ দেখি গো কেমন দেখায়,
কাশীর চুড়ি, ফুলের মালায়—লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর মত।
　　কত যে গুণ দেশের নুনে,
　　শেষ করা কি যায় সে গুণে,
কাশীর চিনি মিষ্টি দেন—অন্নদার প্রসাদের মত!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৩

গাড়ী ছাড়িয়া দিতে শৈল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাব্‌লার পানে চাহিল; বাব্‌লা ঘুমাইতেছে। শৈল তখন চলন্ত ট্রেনের গতির সঙ্গে মনের রাশ ছাড়িয়া দিল, কলিকাতার পানে!

সেখানকার ষ্টেশনে একরাশ লোকের মাঝে পূর্ণ অমনি চোখে অধীর উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি ও মুখে হাসি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে—! দুইজনের চোখে চোখে মিলিতেই হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, তার পর পূর্ণর হাত ধরিয়া সে তার গৃহে চলিল। গিয়া সেখানে যে নূতন ঘরখানি পাতিবে, সে ঘর শুধুই হাসিতে গানেতে আরামে আনন্দে ভরিয়া থাকিবে! সে নিজের হাতে রাঁধিয়া-বাড়িয়া স্বামীকে খাওয়াইবে, স্বামীও খাইয়া-দাইয়া চাকরিতে বাহির হইয়া যাইবে। সে সারাদিন বাবলাকে দেখিবে, ঘর-সংসার গুছাইবে, তারপর সন্ধ্যার সময় স্বামীর আশায় তার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিবে! স্বামী আসিবে,—সে তার জামা-জোড়া খুলিয়া তার পা ধুইবার জল আনিয়া দিবে, গামছাখানি হাতে তুলিয়া দিবে, স্বামী মুখ-হাত ধুইয়া জল খাইয়া ঘরে বসিবে, বাব্‌লাকে লইয়া খেলা করিবে—সে গিয়া রান্নাবান্না করিবে,—মাঝে মাঝে নানা অছিলায় ঘরে আসিবে ও দুইজনের চোখে চোখে চকিতে বিদ্যুতের চমক্ ফুটিবে! এই লইয়া কত কথা হইয়াছে দু'জনে! সেও যত দেবতার কাছে মাথা কুটিয়াছে, এ বিচ্ছেদ দূর করিয়া দাও ঠাকুর, এ ব্যবধান সরাইয়া লও! ঠাকুর এত দিন পরে মুখ তুলিয়াছেন!...তার আর কে আছে? স্বামী, বাবলা! এই দুইজনকে কাছে কাছে পাইয়া, চোখে চোখে রাখিয়া তার জীবন যে স্রোতে এখন চলিবে—সে আর কোন সাধ রাখে না, ভগবান! এ সাধটুকু তার যে আজ মিটাইয়াছ, তার জন্য, প্রণাম, তোমায় প্রণাম ঠাকুর!

আবেগের উচ্ছ্বাসে সত্যই শৈল কোন্ অনির্দিষ্ট দেবতার পায়ে উদ্দেশে প্রণাম জানাইল।

অমনি মনে পড়িল, এই গৌরী মেয়েটির কথা! সে এখন আর-একটা রেলে চড়িয়া কতদূর চলিয়াছে! ঐ বুঝি একটা ষ্টেশনে গিয়া তাদের ট্রেণখানি দাঁড়াইল, আর তার স্বামী আসিয়া তার কামরার সামনে হাজির, চোখে হাসি, হাতে একঠোঙা খাবার আর পান—আর গৌরীও অমনি সরিয়া গিয়া কামরার এককোণে দাঁড়াইয়াছে, দৃষ্টি হাসি-মাখা, আর সে দৃষ্টি ঘোমটার অন্তরাল দিয়া তার স্বামীর 'পরেই পড়িয়াছে! বেশ মেয়েটি! তারাও সন্ধ্যার পর তাদের নূতন ঘরে গিয়া উঠিবে, সে ঘরে প্রেমের আলো, হাসির আলো অমনি যেন ফিনিক ফুটাইয়া রাখিয়াছে! আর...সন্ধ্যার পর সেও যে ঘরে গিয়া উঠিবে, সে ঘরও অমনি......সহসা বাহিরে কড়কড় শব্দে মেঘ ডাকিল, ও একঝলক টক্‌টকে লাল বিদ্যুতের আলো তার কামরায় ঢুকিয়া পড়িয়া চকিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল! শৈলর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল! তার মনে হইল, ঐ কালো আকাশের বুক চিরিয়া একটা দৈত্যের প্রচণ্ড অট্টহাস্য তার এই বিচিত্র রঙিন কল্পনাকে যেন ছিঁড়িয়া ফাঁসাইয়া দিয়া গেল! সে ছুটিয়া বাব্‌লাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া চাপিয়া ধরিয়া তাকে দোলা দিতে লাগিল—পাছে সে শব্দে ঘুম ভাঙিয়া সে চমকিয়া কাঁদিয়া ওঠে!

বাহিরে ম্লান রৌদ্রটুকু তখন আবার কালো মেঘের আড়ালে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। কালো মেঘের রাশ ইতস্ততঃ ছুটিয়া আরো গাঢ় আরো ঘন হইয়া উঠিতেছিল! এবং আর একটা ষ্টেশন পার হইতেই আবার মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। বাহিরের বিশ্বটা একেবারে যেন ভাসিয়া উঠিয়া যাইবে, এমনি মনে হইতেছিল। ট্রেণ তবু চলিয়াছে; বর্ষার এই চপল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়াই সে চলিয়াছে—কোন মতে ঠিকানায় গিয়া সে পৌঁছিবে,

এমনি তার গোঁ! শৈল ভগবানকে ডাকিতে লাগিল,—নিরাপদে কোন মতে পৌঁছাইয়া দাও, ঠাকুর, এ যা দুর্যোগ চলিয়াছে, ভরসা যে হয় না ··

তার ভয় হইতেছিল এ দুর্যোগে ট্রেণ যদি বন্ধ হইয়া যায়! যদি এরা বলে, না, আর পারা গেল না—এ প্রলয়-বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব···! কথাটা ভাবিতেই তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। বাব্লাকে শোয়াইয়া সে আবার নিজের জায়গায় আসিয়া বসিল।

আকাশে দারুণ বর্ষা নামিয়াছে। ঝম্ঝম্, ঝম্ঝম্ বৃষ্টির ধারা! অবিরাম অবিশ্রাম ধারা! কে জানে কেন, শৈলর মনটা আঁধারে ভরিয়া উঠিতেছিল। এই বৃষ্টি,—চারিধারে কেমন এক নিরানন্দ ভাব! হঠাৎ তার মনে হইল, এই বৃষ্টিতে স্বামী যদি ষ্টেশনে না আসিতে পারে! যদি তার অসুখ হইয়া থাকে—যদি...উঃ, মাগো! শৈলর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। থাকিয়া থাকিয়া মনটা এমন কু গাহিয়া ওঠে কেন! যত সুখের কথা সে ভাবিতে যায়, ততই তার মধ্যে কালো পেন্সিলের মোটা দাগ টানিয়া সে সুখের কথাটুকু কে কাটিয়া দেয়! গাড়ীর মধ্যে নিজেকে বড় একা নিঃসঙ্গ মনে হইল! বাহিরে ঘন বর্ষা,—আর চলন্ত ট্রেনের কামরায় সে একা! বাবলা? সে তো ঘুমাইতেছে! সমস্ত জগৎ হইতে সবার কাছ হইতে উপড়াইয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া এই ক্ষুদ্র কামরাটার মধ্যে কে যেন তাকে পুরিয়া দিয়াছে!

হঠাৎ মনে হইল, একা কেন! স্বামীর সাহচর্য্য পাইবার আশায় সে বুকের মধ্য হইতে স্বামীর লেখা এক-তাড়া চিঠি বাহির করিয়া কোলের উপর রাখিল। এই চিঠিগুলাকে সর্ব্বদাই সে সঙ্গে সঙ্গে রাখে! বুকের মাঝে সে যেন এক-ঝাঁক পাপিয়া-কোকিল পুষিয়া রাখিয়াছে! যখন ইচ্ছা হয়, বুকের মাঝের চাপা হইতে বাহির করিয়া সেগুলিকে সামনে ধরে, আর তারাও অমনি আশায় আনন্দে কি কল-ঝঙ্কার তুলিয়াই না তাকে মশ্গুল করিয়া দেয়!

শৈল চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। একেবারে সব-শেষের খানি—কাল যেখানি পাইয়াছে। পূর্ণ লিখিয়াছে—

শৈল, শৈ—

আজ ছাপাখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি ঘর-দোর গুছাইয়া ফেলিব। একখানি তক্তাপোষ কিনিয়াছি, পাঁচ টাকায়। আর নূতন তোষক, নূতন বালিশ তৈয়ার করিয়াছি, পুরানোর খোল ছিঁড়িয়া সেই তুলার সঙ্গে নূতন আরো কিছু তুলা কিনিয়া মিশাইয়াছি—দাম বেশী পড়ে নাই। তোমার চুল বাঁধার জন্য ফিতা, কাঁটা চিরুণী কিনিয়াছি। আর এমন চমৎকার একটি সিঁদূরের কৌটা কিনিয়াছি, ভারী সুন্দর-তোমার পছন্দ হইবে খুব, এ আমি নিশ্চয় বলিতে পারি।

শৈ, এই একটা দিন যেন আর ধৈর্য্য মানে না! কাল তুমি চিঠি পাইবে, পরশু বাহির হইবে। ভগবানকে কেবলই ডাকিতেছি, আর যেন কোন বাধা না পড়ে! ভালোয় ভালোয় আমার কাছে চলিয়া এস! তারপর দুটাতে কেমন বাসা বাঁধিয়া থাকিব,—সর্ব্বক্ষণ তোমাদের চোখে-চোখে রাখিব। এত দিনের অদর্শনের কি কষ্ট, দুজনেই তা বুঝিয়াছি তো!

তোমার জন্য কতকগুলি বাঙ্লা বই রাখিয়াছি। তুমি দুপুর বেলায় একা থাকিবে যখন, তখন পড়িবে। তার পর আমি আসিয়া দেখিব, তুমি মেজেয় আর্শী পাড়িয়া চুল বাঁধিতেছ, আমায় দেখিয়া তোমার ঐ ঢেউ-খেলানো চুলের রাশ না বাঁধিয়াই আমার কাছে ছুটিয়া আসিবে—! তোমার মুখে হাসি খেলবে, সে কি সুন্দর দেখাইবে! কপালটি বেড়িয়া ফিতা আঁটা, খোলা চুল, চোখে-মুখে হাসি! আমাদের কিসের অভাব, শৈল? পয়সা? পয়সাটাই কি সব-চেয়ে বড় জিনিষ! না—দু'জনে দুজনকে ভালবাসিয়া যদি একসঙ্গে থাকিতে পাই তো তার চেয়ে সুখ আর কি আছে! পয়সার কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনেও করিনা।

আজ চারদিন একষ্ট্রা কাজ করিতেছি, রাত্রি দশটা অবধি। উপরি যে পয়সা পাইতেছি তাহাতে একটা ভালো মশারি কিনিব। টাকাটা আজই পাইব—কাজ তুলিয়া দিলেই। যাঁর কাজ তিনি দু'টাকা বক্শিস্ দিবেন বলিয়াছেন। তাহা হইলে একষ্ট্রায় পাইব সাত টাকা বারো আনা। মশারির দাম আট টাকা। আজ টাকা পাইলেই

যদি সময় থাকে তবে আজই কিনিব, না হইলে কাল। সে মশারি তুমি পরশু আসিয়া টাঙাইবে। কেমন?

আজ আসি। হ্যাঁ, এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি কিনিয়াছি; বেশ হাল্‌কা। তোমার ভাত নামাইতে কষ্ট হইবে না।

বাড়ী-উলি মা বেশ ভালো লোক। তিনি তো 'বৌমা কবে আসিবে' বলিয়া অধীর হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের মেয়ে, স্বামী-পুত্র কেহ নাই,—একটি ভাই-পো শুধু—বছর ছয় বয়স! তাকে মানুষ করিতেছেন—আছে এই বাড়ীখানি, আর কিছু নগদ টাকা। আমায় ছেলের মত ভালবাসেন। তুমি তাঁকে মা বলিয়া ডাকিয়ো, আর তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করো, দেখাশুনা করো। তোমায় এ কথা বলা বাহুল্য।—তুমি আমার লক্ষ্মী, তুমি তো সব জান - তোমায় আবার শিখাইব কি?

আজ আসি শৈল। শৈ, আর একটা দিন পরে যখন তোমায় পাইব, আঃ, আমি প্রহর গণিতেছি! কালিকার দিনটা যদি একেবারে ঠেলিয়া মুছিয়া একেবারে পরশুর দিনটা আনিয়া ফেলিবার কোন উপায় থাকিত!

আমার ভালবাসা নিও। বাব্‌লাকে চুমু দিও। চিঠির জবাব আর লিখিয়া দিতে হইবে না, এর জবাবে তুমি নিজে চলিয়া এসো।

ইতি

তোমার পূর্ণ।

চিঠিখানা শৈল একবার-দুইবার পড়িল। পড়া হইলে সে বাহিরে চোখ মেলিয়া উন্মনা বসিয়া রহিল। দুই চোখের পাতা সজল হইয়া আসিল। আর অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা দুই চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল, কলিকাতা সহরের একটি ক্ষুদ্র ঘর। সে ঘরে আর্শী পাড়িয়া সে চুল বাঁধিতেছে, দাঁতে একটা ফিতা চাপিয়া, একটা ফিতা কপাল ঘিরিয়া বাঁধা, গায়ের কাপড় সরিয়া গিয়াছে একপাশে বাবলা শুইয়া খেলা করিতেছে—এমন সময় পূর্ণ আসিয়া উপস্থিত! সে অমনি লজ্জায় জড়ো-সড়ো হইয়া গায়ে কাপড় টানিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। আর পূর্ণ…সে কি আনন্দের খেলা! এ সুখ অর ভাগ্যে আছে কি! এমন অদৃষ্ট!

আবার সেই কু-চিন্তা! মনকে সে রাশ টানিয়া জোর করিয়া ফিরাইল—আর একটা চিঠি খুলিল। পূর্ণ লিখিয়াছে,—

শৈল, বুড়ী—

এখানে আসিয়া অবধি মন খারাপ হইয়া আছে। কবে যে তুমি আসিবে! কবে—কবে?

বাড়ীউলি-মা ভালো একখানি ঘর দিয়াছেন; তার ভাড়া অন্যলোকে দশ টাকা দিতে চাহিয়াছিল, আমায় সাত টাকায় দিয়াছেন। ঘরে চারটি জানলা আছে—আর ঘরের সামনে দাওয়ার একধারে রান্নাঘর। তার পাশে একটা জায়গা দরমা দিয়া ঘিরিয়া ভাঁড়ার করা হইতেছে। কলতলাটি বেশ ঢাকা; কলতলায় গেলে কেহ দেখিতে পায় না। তবে খোলার ঘর। তা হোক, ঘর বেশ বড়। কলিকাতায় এমন ঘর পাওয়া যায় না।

বাড়ীউলি-মা ভারী চমৎকার লোক। আমায় ছেলের মত ভাল বাসেন। তাঁর একটি ভাইপো আছে, লাল-বেহারী। ছেলেটিকে রোজ সকালে আমি পড়াই। ছেলেটিও আমায় খুব ভালবাসে।

আমাদের ছাপাখানার কৈলাস আমাদের বাসায় একটি ঘর লইয়াছে। সে একটু বেশী বয়সে বিবাহ করিয়াছে—তার স্ত্রীটি নেহাৎ ছেলে মানুষ। তুমি আসিলে সেও তার স্ত্রীকে আনিবে। সে বলে, একজন সঙ্গী নহিলে তার স্ত্রী ছেলে মানুষ, কার সঙ্গে কথা কহিবে? সেও ভারী ব্যস্ত হইয়াছে তোমার আসার জন্য। তুমি আসিলে তার স্ত্রীও আসিতে পায়।

বাড়ীউলি-মার দুটী গরু আছে। বাবলার দুধ তাঁর কাছ হইতেই লইব। আর আমি আড়াই-শো টাকা জমাইয়াছি। বাড়ীউলি-মার কাছে আছে। তিনি সুদে বাড়াইয়া দিবেন। বাড়ীউলি-মার টাকা-কড়িও কিছু আছে নিজের।

এ বাড়ীতে আরো তিনঘর ভাড়াটিয়া আছে। তাঁরা অফিসে কাজ করেন। একজন তিনকড়ি দত্ত, রাধাবাজারে কাঁচের কারখানায় কাজ করেন, পরিবার লইয়া আছেন; তাঁর পরিবার তোমার চেয়ে ঢের বড়; ছেলে-পুলে নাই। আর একজন ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী, ছোট আদালতের এক উকিলের মুহুরি; তাঁর স্ত্রী আর এক বিধবা বোন, তার

...ট মেয়ে। আর একজন এই আমাদের কৈলাস। এরা সকলেই আমায় ভাল বাসে। ইহাদের কথা তোমাদের বলিয়া রাখি। নামগুলি জানিয়া রাখো। এখানে আসিলে দেখিবে, সকলেই কেমন ভালো লোক!

এবার যেন বিপিনের সঙ্গে আসা ঠিক হয়। আমি বিপিনকে চিঠি লিখিতেছি; তুমিও দেখা করিয়া তাকে বলিয়ো। ওখানকার ঘরদোর সব ছাড়িয়া দেওয়া যাক। মিছামিছি খাজনা দিয়া ফল নাই। আর তো আমরা ওখানে ফিরিব না।

আমি জমিদারকে চিঠি লিখিতেছি—ঘর ছাড়িয়া দিব। ঘরের দাম যা দেন, তাই লাভ। তোমার হাতেই দিবেন। তবু তো ষাট-সত্তর টাকাও হইবে। আজই জমিদারকে চিঠি লিখিয়া দিতেছি।

আমি এখানে কত বই জড়ো করিয়াছি তোমার পড়ার জন্য। কেমন ভালো ভালো সব গল্পের বই। কতক আমাদের ছাপাখানার ছাপা, কতক পুরানো বই কিনিয়াছি।

তোমার যাতে কষ্ট না হয়, তার বন্দোবস্ত করিতেছি—দেশের জন্য তোমার মন কেমন না করে, আমায় তা দেখিতে হইবে তো।

আমার ভালবাসা জানিও। চুমা নিও। বাব্লাকে চুমু দিও। সে কি করে?

তোমার পূর্ণ।

চিঠি পড়িয়া সেখানা বুকে চাপিয়া শৈল একেবারে আবেগে উছলিত হইয়া উঠিল। দুই চোখে তার জল ঝরিল। এত ভালবাসো, তুমি আমায় এত ভালবাসো! ওগো, আমার আরামের জন্য এমন আয়োজন করিতেছ! আড়াইশো টাকা জমাইয়াছ! নিজে ভাল খাও নাই, ভাল পর নাই,—দুঃখ করিয়াছ, কষ্ট করিয়াছ,—শুধু আমার সুখের জন্য। ওগো, আমি তোমার এ ভালোবাসার যোগ্য কি! আমার কি আছে—কি আছে! তোমার ও ভালোবাসার প্রতিদান দিতে আমার যে কিছুই নাই! চরণাশ্রিতা চির-সাধনী আমি—তোমার এ প্রেমের ঋণ শোধ দিবার নয়, শুধু আজন্ম তোমার পায়ে নিজেকে বিকাইয়া রাখিব। তোমার পায়ে কাঁটাটিও না ফোটে,—সেখানে বুক পাতিয়া পড়িয়া থাকিব! ভগবান শুধু এটুকু অবসর আমায় যেন দেন! আমি তাঁর মুখের হাসি,বুকের সাধটুকুতে যেন এতটুকু ঘা না দিই—! আর আমার প্রার্থনা করিবার কিছু নাই, কিছু নাই ঠাকুর!

চক্ষু মুদিয়া শৈল ভাবিতে লাগিল, স্বামীর মুখ, স্বামীর চোখ, স্বামীর হাসি, স্বামীর কথা! আঁধার-করা মনটার মধ্যে অমনি আলোর ফুলঝুরি ফুটিয়া উঠিল,—আলোয় আলো, জ্যোৎস্নার পাথার ছুটিল!

হঠাৎ গাড়ীটা থামিয়া পড়িতে তার চমক ভাঙ্গিল। সে চোখ মেলিয়া চাহিল। বাহিরে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে—গাছপালার উপর যেন কে জলের ঝর্ঝর ঝারি ঝুলাইয়া দিয়াছে! সে জলের ধারার আর বিরাম নাই! তাড়াতাড়ি সে চিঠিগুলা ভাঁজ করিয়া বুকের মধ্যে জামার আড়ালে লুকাইল! গান-ভরা পাখীগুলাকে বুকে চাপিয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল, চুপ, চুপ!

গাড়ী চলিল, এবং অতি মৃদু গতিতে আসিয়া হলুদ রঙের থামে-ঘেরা একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষীণ কণ্ঠে দূর হইতে কে হাঁকিল,—বা-রা-ক পু-র!

৪

শৈল উদাসভাবে বসিয়া রহিল। আঁধারে-অস্পষ্ট প্লাটফর্মে বৃষ্টিতে নির্জীব লোকজনের ছুটাছুটি—একটা অস্ফুট কোলাহল—একটা মৃদু চাঞ্চল্যের ঝাপ্টা...যেন কোন্ স্বপ্ন-লোকের ফটক খুলিয়া গিয়াছে! স্বপ্নের মধ্যে এদের ঘোরাঘুরি চলাফেরা চলিয়াছে! ঐ একটি ছোট মেয়ে,—লাল পাছা পাড় শাড়ীপরা—একটি লোক তার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—সেও ষ্টীমারের পিছনে বাঁধা ছোট নৌকার মত ঐ মৃদু লোক-তরঙ্গে কখনো সোজা, কখনো ছিট্কাইয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে! শেষে—ঐ ওধারকার একটা কামরায় তাকে ঠেলিয়া তুলিয়া সঙ্গী-পুরুষ এদিকে ওদিকে চাহিতে চাহিতে অনেকটা ভড়কানো-মূর্ত্তিতে একটা কামরায় উঠিয়া পড়িল। তার পর কলরব ক্রমে মূর্চ্ছিত হইয়া আসিল—লোকের চলাফেরাও থামিয়া গেল—ষ্টেশন চুপচাপ! গাড়ী কিন্তু আর নড়িতে চায় না!...শৈল অস্থির

হইল। এতক্ষণ থামিয়া আছে কেন? এমন তো থামে নাই কোথাও। মন ভারী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ট্রেণের গতির চেয়েও দ্রুত ছুটিয়া! সে বেঞ্চে শুইয়া পড়িল।

বিপিন আসিয়া ডাকিল,—বৌদি—

শৈল ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল; বলিল,—বিপিন-ঠাকুরপো—

বিপিন বলিল,—গাড়ীর ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। গাড়ী এখন যাবে না।

শৈলর দুই চোখ কপালে উঠিল। সে বলিল,—উপায়?

হাসিয়া বিপিন বলিল,—এখানেই থেকে যেতে হবে।

এ হাসি আগুনের গোলার মত শৈলর বুকে বাজিল। সে কি, তাও কি হয়! সে বিপিনের পানে আঁধার চিন্তিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বিপিন বলিল,—তুমি পাগল হয়েছ বৌদি। গাড়ী পৌঁছে দেবেই!···ওরা ইঞ্জিন সারাচ্ছে।···তবে দেরী হবে যেতে!

শৈল বলিল,—কি দুর্য্যোগই পড়েছে। ভালোয় ভালোয় পৌঁছুতে পারলে হয়।

বিপিন বলিল,—পৌঁছে যাবই—তবে কখন্‌—এই যা কথা!

শৈল বলিল,—কলকাতা আর কতদুর?

বিপিন বলিল,—এখনো ছ'টা ষ্টেশন পরে শেয়ালদা। ...আমি ভাবচি, এ বৃষ্টি কলকাতাতেও হয় যদি, পূর্ণদা তাহলে ষ্টেশনে আসবে কি করে! সেখানে শুনেচি একটু বৃষ্টি হলেই পথে একেবারে নদী বয়ে যায়।

মৃদু হাসিয়া শৈল বলিল,—সে ঠিক আসবে...

কথাটা সে বলিল বটে,কিন্তু বুকের মধ্যে কে যেন চাপিয়া ধরিল—ওরে এত বড় আশা কি সাহসে করিস্ তুই! তোর এমন ভাগ্য···বুকের মধ্যকার এ ধ্বনিটাকে সে চাপিয়া ধরিল—! বুকে কি একটা অত্যন্ত ভারী হইয়া বসিয়াছিল! তার দুই চোখের সামনে হইতে সব যেন মুছিয়া মিলাইয়া যাইতেছিল!

বিপিন বলিল,—যদি এমনই হয়, পূর্ণদা আসতে না পারে?

শৈল শিহরিয়া উঠিল—কোন জবাব দিতে পারিল না, শুধু বিপিনের পানে চাহিয়া রহিল।

বিপিন বলিল,—আমায় যেতে হবে দর্জীপাড়ায়, সেখানে আমার মামার বাড়ী। তা, পূর্ণদার বাসাটা কোথায়?

শৈল বলিল,—ভগবতী দেবীর বাড়ী, ৭৭ নম্বর সাতকড়ি দত্তর গলি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

বিপিন বলিল,—আমি তো চিনি না কোথায় কোন রাস্তা। পূর্ণদা আসতে না পারলে মুস্কিল হবে।

শৈল জোর করিয়া বলিল,—তোমায় ভাবতে হবে না, ভাই। কল্‌কাতা ভেসে গেলেও তিনি আসবেন ঠিক!

এমন সময় ঘণ্টা পড়িল। বিপিন বলিল,—ঐ যে ঘণ্টা পড়ছে। গাড়ী ছাড়বে—যাই, বসি গে।

বিপিন চলিয়া গেল; শৈল জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

তার পর আবার সেই একঘেয়ে দৃশ্য, মাঠ, বাগান, পুকুর, মাঝে মাঝে দুই-চারিটা বাড়ী-ঘর—সব বৃষ্টির জলের ঝাপ্‌টা খাইয়া যেন কাতর জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে!

ট্রেণ আসিয়া দমদমায় থামিল। বিপিন ছুটিয়া মেয়ে-কামরার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল—এইবারে শেয়ালদা —বলিয়াই সে গিয়া নিজের কামরায় উঠিল।

শৈল এলানো-ছড়ানো মনটাকে তখন গুছাইয়া লইতে লাগিল। আর কি—সব কষ্ট, সব দুশ্চিন্তা-ভাবনার শেষ এইবার! তার মন হইতে রেল, লাইন, বৃষ্টি সব মুছিয়া গেল। মনের সামনে জাগিয়া রহিল, শুধু একজোড়া আঁধার চোখের চঞ্চল দৃষ্টি, আর দুটি তৃষিত ঠোঁটে হাসির উচ্ছ্বাস!···

তবু প্রাণটা খাঁচায়-বদ্ধ পাখীর মত ছটফট করিতে লাগিল—আর পারা যায় না! মনে হইল, কামরা হইতে বাহির হইয়া এ পথটুকু সে ছুটিয়া এখনই গিয়া কলিকাতায় ওঠে! গাড়ীটা বড় আস্তে যাইতেছে। তার কেমন হাঁপ ধরিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার, তায় মেঘের আঁধার চারিধার নিবিড়ভাবে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল.. ঐ মাঝে মাঝে আলোর ফোঁটা, কাছে, দূরে—আরো দূরে—একটা, দুটা, তিনটা, অনেকগুলা আলো। ওগুলা যেন সহর-লক্ষ্মীর প্রহরী! ঐ তাদের সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখ জ্বলিতেছে

—উহারা আঁধারে চোখ মেলিয়া দেখিতেছে, কে যায় ? কেন যায় ? কোথায় যায় রে ?

ট্রেণের গতি আবার মন্থর হইল, এবং নিমেষে দেখা গেল, গাড়ী,গাড়ীর পর গাড়ী—কত ইঞ্জিন,—সব জলে ভিজিতেছে, —অতিকায় দৈত্যের মত আকার—অথচ শান্তভাবেই সব পড়িয়া ভিজিতেছে ! ঐ দূরে মেঘের অন্ধকারকে পরিহাস করিয়া আলোর তীব্র উচ্ছ্বাস—উঃ, ওধারটায় যেন আলোয় ফিনিক ফুটিয়াছে—! ঐ ঘর, কতগুলা ! ঐ সব ছেলের দল, বৃষ্টির আড়ালে ঘরে দাঁড়াইয়া গাড়ী দেখিয়া লাফাইতেছে—হাঁকিতেছে…

গাড়ী আসিয়া ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম্মে ঢুকিল। একটা বিরাট কোলাহল দূর হইতে গুঞ্জন তুলিয়া তাকে অভ্যার্থনা করিল।

গাড়ী থামিতেই শৈল উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পা কাঁপিতে লাগিল—আশা-নিরাশার রঙীন কল্পনার ঢেউয়ে দুশ্চিন্তার ধাক্কায় সারা বুক টলমল করিতেছিল ! সে উঠিয়া বাব্‌লাকে কোলে লইতে গেল, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভয়ঙ্কর একটা আগুনের হল্‌কা ফুটাইয়া,কক্কড় কড়াৎ প্রকাণ্ড গর্জ্জনে আবার বাজ হাঁকিল। যেন ভীষণ রাগে এক প্রচণ্ড দৈত্য তার হাতের যা-কিছু অস্ত্র সব ছুঁড়িয়া পৃথিবীটাকে চূর্ণ করিয়া দিবে ! শৈল পড়িতে পড়িতে কোনমতে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল ; বাবলা সে শব্দে ভয়ে কাঁপিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে !

৫

প্লাটফর্ম্মে যাত্রীর দল নামিয়া যে যেখানে যাইবার চলিয়া গেল। প্লাটফর্ম্ম একরকম খালি। তবুও,…কোথায় পূর্ণ ? কোথায় সেই দুটী চোখ, যার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য শৈলর দুই চোখ সীমাহীন অধৈর্য্যে পাগল দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে ? পূর্ণ ত আসে নাই !…

দারুণ দুর্ভাবনায় শৈলর বুক ভরিয়া উঠিল। বাহিরের আকাশ-জোড়া প্রকাণ্ড কালো মেঘ তার কাছে কিছুই নয়—সে-আঁধার শৈলর সমস্ত বুকটাকে ভরিয়া জুড়িয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে…

কেন সে আসে নাই…? অসুখ,নিশ্চয় ভারী রকম অসুখ করিয়াছে ! সামান্য অসুখ পূর্ণ গ্রাহ্যও করিত না ! আজ জীবনে এমন একটা দিনের মত দিন ! যে দিনটার জন্য সে অমন…একরাশ দীর্ঘ নিশ্বাস ঠেলিয়া ফুলিয়া শৈলর বুকটাকে বিঁধিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার জো করিল।

বিপিন অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল,—তাই তো বৌদি, পূর্ণদা এল না ! কি হবে ?

শৈল সে কথার জবাব দিতে পারিল না। কি জবাব দিবে ? ডাগর দুই চোখ মেলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। সে চোখে রাজ্যের বেদনা আসিয়া কুণ্ডলী পাকাইতেছিল।

বিপিন বলিল,—আমার মামাতো ভাই এসেচে—আমি তো বাড়ী চিনি না—এই বৃষ্টি ! আর দাঁড়ালে গাড়ীটাড়ীও পাব না।… তুমি চলো আমাদের সঙ্গেই—নামিয়ে দিয়ে যাব।

শৈল তবু কোন কথা বলিতে পারিল না।—তার কণ্ঠ যেন কে তপ্ত সীসা ঢালিয়া আঁটিয়া দিয়াছে—স্বর বাহির হয় না ! বিপিন বলিল—যে রকম বৃষ্টি,—দ্বিজেনদা বলছিল, গাড়ী পাওয়া শক্ত ! অনেক পথে এক হাঁটু জল—তাই বোধ হয় পূর্ণদার দেরী হচ্ছে ! হয় তো গাড়ী পায় নি—তাই বলে তোমায় এখানে একলা ফেলে যেতেও পারি না ত। তুমি চল, …কত নম্বর বল্লে,—৭৭ ? ৭১ নম্বর সাতকড়ি দত্তর গলি ? আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে ? আচ্ছা, আমি দ্বিজেনদাকে জিজ্ঞাসা করি।

অদূরে বিপিনের দ্বিজেনদা দাঁড়াইয়া ; বিপিন তার কাছে গেল—আর শৈল ছেলে কোলে করিয়া উদাস চোখে গভীর দৃষ্টি মেলিয়া দিকে দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। …কৈ, না…পূর্ণর চিহ্নও নাই… !

শেষে স্থির হইল, বিপিনই গাড়ী করিয়া শৈলকে নামাইয়া দিয়া তবে বাড়ী যাইবে। সে বলিল,—যেমন পূর্ণদার কাণ্ড ! এসে ফিরে যাবে'খন ভাবতে ভাবতে—তার পর বাড়ী গিয়ে দেখবে, তুমি দিব্যি রান্না চাপিয়ে দেছ—ভারী মজা হবে, না, বৌদি ?

বিপিনের মুখে হাসি দেখিয়া এ অকূলেও শৈল যেন কূল পাইল ! সে বলিল,—তাই হোক ভাই, মা কালী তাই করুন ! গিয়ে যেন অসুখ-বিসুখ না দেখতে হয় কারো ! আমার যা ভাবনা হচ্ছে…

বাহিরে ঘোড়ার গাড়ী একখানিও নাই। কয়েকখানা ট্যাক্সি—অন্ধকারে গা ঢাকিয়া প্রকাণ্ড দুই চোখে আলো জ্বালাইয়া দৈত্যের মত এই বিরাট অন্ধকারের বুকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া আছে! বৃষ্টির বেগ কমিয়া গিয়াছিল। বাবলাকে বেশ করিয়া ঢাকিয়া শৈল বুকের মধ্যে তাকে আঁটিয়া ধরিল—গায়ে পাছে জল বা ঠাণ্ডা-হাওয়া লাগে।

অনেক কষ্টে বিপিনের সঙ্গা একটা গাড়ী ধরিয়া আনিল; মোট-ঘাট চাপানো হইল। শৈল যেমন গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, অমনি একখানা ট্যাক্সি মোড় বাঁকিয়া তার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। ট্যাক্সিওয়ালা হর্ণের সঙ্গে 'এই মাগী' বলিয়া এমন তীব্র ভৎসনা করিয়া উঠিল যে হর্ণের সে বিকট আওয়াজ, আর সে তীব্র ভৎসনার স্বরে শৈল পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। বিপিন তার হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিল, বলিল—খুব বেঁচে গেছ বৌদি···মস্ত ফাঁড়া কাটল! পূর্ণদার কাছে কোন্ মুখে দাঁড়াতুম!

বিপিনের দ্বিজেনদা বলিল,—ঐ ব্যাটারই দোষ, দেখছে জেনানা-সওয়ারী গাড়ীতে উঠছে, তার ঘাড়ের উপর দিয়ে মটর চালিয়ে দিলি!

গাড়ী চলিল, খড়খড়িটা জলে ভিজিয়া এমন আঁটিয়া গিয়াছিল যে টানাটানি করিয়াও সেটাকে বন্ধ করা গেল না। গাড়ী পথে আসিয়া পড়িল। জলে পথ চক্‌ চক্‌ করিতেছে—পথে কে যেন তেল ঢালিয়া দিয়াছে! এখানে-ওখানে লোক চলিয়াছে, ছায়ার মত যেন কোন্ প্রেত-লোকের জীব! স্তব্ধ পথে আলোগুলা স্তম্ভিত প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে! শৈলর মনে হইল, চারিদিকে যেন কিসের একটা মহা ষড়যন্ত্র চলিয়াছে! আর ঐ আলোগুলা রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া আছে—কি হয়, তাহ দেখিবার জন্য! তার গা ছম-ছম করিতে লাগিল! এ কোন্ প্রেতলোকে সে ঢুকিয়া পড়িল—! এই তার কাম্য লোক? সেই হাসি-ভরা আলো-ভরা সুখ-ভরা কলিকাতা··

শুব্ধ রাজপথ সচকিত করিয়া গাড়ী এ পথ ও পথ ঘুরিয়া একটা গলির মোড়ে আসিলে গাড়োয়ান বলিল—এই গলি বাবু?

দ্বিজেন বলিল,—হাঁ।

গাড়ী গলিতে ঢুকিল। বিপিন বলিল,—এই গলিতে পূর্ণদার বাসা, বৌদি..

সে কথা শৈলর কাণেও গেল না। তার বুকটার মধ্যে কিসের সাড়া উঠিয়াছিল—আশা-নৈরাশ্য, হর্ষ-বেদনা সবগুলা মিলিয়া ভীষণ যুদ্ধ লাগাইয়াছিল—তার বুক তাদের সে বিক্রমে রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল! বিপিন ও দ্বিজেন উদগ্রীবভাবে বাড়ীর নম্বর লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ দ্বিজেন চীৎকার করিয়া উঠিল,—সবুর, সবুর—

গাড়ী থামিতে থামিতে খানিকটা আগাইয়া গেল যেখানে থামিল, সেখানে সাম্‌নে একটা মস্ত মুদির দোকান বিপিন গাড়ী হইতে নামিয়া দোকানে গেল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিল—ঐ মাঠটার কোণে বাড়ী।

গাড়ীকে এ গলিতে ঘোরানো সহজ নয়। কাজেই সেই খানেই শৈলকে নামিতে হইল। বিপিন মাঠের ধারে গিয়া তখনই ফিরিয়া আসিল, বলিল,— ৭৭ নম্বর বাড়ীই বটে ভগবতী দেবীর বাড়ী। গাড়োয়ানের সঙ্গে যে ছোকরা ছিল, সে মোট লইয়া গিয়াছিল। বাড়ীর দ্বার খোলাই ছিল ছোকরাটা মোট রাখিয়া বাহিরে আসিল। শৈল ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতেই বিপিন বলিল,—আমি তাহলে চললুম আজ বৌদি। বাড়ী দেখে গেলুম তো—কাল আসব'খন পূর্ণদার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। আর দাঁড়াব না। আমার মামাতো ভাই ভিজে একশা হয়ে আছে—তার ওপর গাড়োয়ান বকাবকি করবে! বিপিন চলিয়া গেল। শৈলও চৌকাঠ পার হইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল।

ঢুকিয়াই সামনে উঠান। চারি পাশে ঘর—উঁচু দাওয়া—দাওয়ায় একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে। চারিধারে কেমন একটা নিঝুম ভাব। শৈলর বুক কাঁপিতে লাগিল, প টলিতেছিল। মনে হইল, নিস্তব্ধ বাড়ী ঐ একটি মাত্র আলোর চোখ মেলিয়া যেন কি এক ফন্দী আঁটিতেছে!

বাবলা কাঁদিয়া উঠিল। তার কান্না শুনিয়া ঘরের ভিতর হইতে একজন পুরুষ মানুষ বাহিরে আসিল ও আলোটা তুলিয়া শৈলকে লক্ষ্য করিল। শৈল দুই চোখে অসহ আকুলতা লইয়া তার পানে চাহিল, ও হঠাৎ একজন অচেনা পুরুষকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল। পুরুষটি

ললাটে দ্বিধার রেখা টানিয়া আলো নামাইয়া আর একটা ঘরে ঢুকিল। শৈল ভাবিল, এ সে কোথায় আসিল! কাহারো দেখা নাই তো!

এক প্রৌঢ়া নারী গায়ের কাপড় সামলাইতে সামলাইতে বাহিরে দাওয়ায় বাহির হইল। শৈল তখন উঠানে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রৌঢ়া আবেগে দুই চোখ মুছিয়া শৈলকে দেখিয়া উঠানে নামিল—ও একেবারে নিতান্ত পরিচিত ঘরের লোকের মতই তার গায়ে হাত দিয়া বলিল,—দেখি মা,—তুমি চুয়াডাঙ্গা থেকে আসচো? আমাদের পূর্ণর বৌ তুমি?

শৈল কেমন এক দৃষ্টিতে যে তার পানে চাহিল,—গলার কোথা হইতে একটু ক্ষীণ স্বর ফুটিল,—হ্যাঁ।

—এসো, মা এসো—বলিয়া প্রৌঢ়া তার হাত ধরিয়া তাকে দাওয়ায় আনিয়া বসাইল। তারপর গাঢ়স্বরে ডাকিল,—শবুর মা—

আর-একটি রমণী সেখানে আসিল। প্রৌঢ়া কহিল,—এটিকে নাও, পূর্ণর খোকা। তোমার ঘরেই শোয়াওগে তো বাছা! যে ঠাণ্ডা...

যন্ত্রচালিত পুতুলের মতই নির্ব্বাক শবুর মা বাবলাকে শৈলর কোল হইতে লইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। শৈলর বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল। পূর্ণ কোথায়? স্বামী?—প্রৌঢ়ার পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে চাহিল; প্রৌঢ়ার ঠোঁট ফুলিতেছিল, দুই চোখে অশ্রু! এ কি,...তবে... তবে...

হঠাৎ প্রৌঢ়া কাঁদিয়া শৈলকে জড়াইয়া বুকে টানিয়া বলিল,—কার কাছে আজ এলে মা! সব যে চুকে গেছে।

শৈল দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল,—মা।

—হ্যাঁ, মা। আমাকে মা বলেই ডাকত সে! কালামুখী আমি, আমার এত সুখ সয় কখনো! আজ তুমি আসবে, তার কি আহ্লাদ! সাতদিন ধরে ঘর গুচোচ্ছে। কত কি সামিগ্রী আনছে, আর কেবলি বলছে, মা, এইটি দেখ, আর কি চাই? আহা, বৌ আসবে, ছেলে আসবে, যেন ইন্দ্রপুরী সাজিয়ে রেখেছেন!...

এ সব কি কথা! এ সব কথার মানে? শৈলর চোখের সম্মুখে সমস্ত ঘর বাড়ী চাকার মত ঘুরিতে লাগিল, মাথার উপর ঝড় ঝাঁকিয়া উঠিল, বুকে ভাবনার ঢেউ ছুটিল! মরার মত মুখের ভাব লইয়া সে বলিল,—কি বলছেন...মা...

প্রৌঢ়া কাঁদিয়া জড়িত স্বরে বলিল,—কাল, বাছা আমার কাজ থেকে ফিরে মশারি কিনতে গেলেন—সেই গেলেন, আর ফিরলেন না। সারা রাত একবার ঘর, একবার বার, এই করেছি—ভাবনায় চোখের পাতা বুজ্‌তে পারিনি! কি হলো—কি হলো? তারপর ভোর হতেই পুলিশ থেকে লোক এসে হাজির, আমাদের সর্ব্বনাশের খপর নিয়ে! কি? পূর্ণবাবু রাত্রে মটর চাপা পড়েছেন, হাঁসপাতালে আছেন—

শৈলর দুই চোখে যেন কে আগুনের তপ্ত শলা গুঁজিয়া দিল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল—কোথায় হাঁসপাতাল? আমায় নিয়ে চলো গো—তার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

প্রৌঢ়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—তখনি ছুটলুম। গিয়ে কি দেখলুম! বাছা আমার কথাটি কইলে না, শুধু দুই চোখ মেলে তাকিয়ে রইল—দুই চোখে দর-দর শ্রাবণের ধারা! উঃ... তারপর এই বেলা দুটোয় সব চুকে গেল।...শ্মশানে তাঁর সব শেষ করে এই একটু আগে আমরা বাড়ী ঢুকছি।... তুমি যে আসবে, সে কথা মনেও ছিল না মা...

শৈলর চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন কে রবার ঘষিয়া বিলকুল মুছিয়া দিল,—আলো দপ্‌ করিয়া নিবিয়া গেল এবং তার বুক লক্ষ্য করিয়া যেন একসঙ্গে হাজার কামান দাগিল! ঘর বাড়ী লোকজন সব একটা বিপর্য্যয় রকমের ভূমিকম্পের দোলনে এমন দুলিয়া উঠিল...

—মাগো—বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া শৈল প্রৌঢ়ার কোলের কাছে লুটাইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

যাদব রাজা গোপালদাসের জন্মকথা

চম্বল নদের ধারে চরণদাস ও গোপালদাস দুইজন মোহন্ত সন্ন্যাসী বাস করিতেন। গোয়ালিয়র রাজ্যে সমলগড় পরগণায় হাল্‌সীপুর নামক গ্রাম এই মোহন্তদের জায়গীর এবং তাঁহারা হালসীপুরের মোহন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চরণ ও গোপাল উভয়েই সচ্চরিত্র ও সর্ব্বদা ধর্ম্মনিষ্ঠায় রত। চরণ আবার যোগাভ্যাস করিয়া কতকটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন ধ্যানে বসিয়া জানিতে পারিলেন যে তাঁহার গুরুভ্রাতা গোপালদাসের স্পৃহা এখনও শেষ হয় নাই, সংসারের মায়া-মোহ ত্যাগ করিতে পারে নাই, বরঞ্চ তাঁহার রাজা হইবার বড়ই ইচ্ছা। ধ্যান-ভঙ্গের পর গোপালকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্বীকার করিলেন। তখন চরণদাস বলিলেন,—তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তুমি যাদবরাজ চন্দ্রসেনের পৌত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইবে। গোপাল কহিলেন,—তাহা কখনই হইবে না। চরণদাস বলিলেন,—আচ্ছা, সময়মত সমস্ত দেখা যাইবে!

সিদ্ধ পুরুষের বাক্য নিষ্ফল হইবার নহে। সময়-মত গোপাল চন্দ্রসেনের গৃহে তাঁহার পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এ জন্মেও তাঁহার নাম গোপালদাস হইল। বাদশাহী সময়ে তিনি যদুবংশে একজন ভূপতি হইয়াছিলেন।

চরণদাস হালসীপুরের মোহন্ত পদেই রহিলেন। তাঁহার দৈনিক প্রধান কার্য্য যোগ-সাধন ও গো-সেবা। প্রায় দুই গাভী ও বলদের প্রত্যহ তিনি সেবা করিতেন। তাহাদের দুগ্ধ-পানে জীবন-ধারণ ও অতিথি-অভ্যাগত আসিলে গো-দুগ্ধ দ্বারা সৎকার করিতেন! এই প্রকারে কিছুকাল কাটিয়া গেল। ও দিকে গোপালদাস জন্মগ্রহণের পর চন্দ্রকলার ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

যখন গোপালদাস ১৯।২০ বৎসরের যুবা, তখন বাদসাহের নিকট হইতে হুকুম আসিল যে তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে হইবে। বাদসাহের স্বপ্ন হইয়াছে যে গোপালদাস যুদ্ধে না গেলে আলিরগড়ের দুর্গ বাদসাহের দখল হইবে না। চন্দ্রসেন পৌত্রটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কিন্তু রাজপুতের ধর্ম্ম যুদ্ধ করা—তাহার উপর বাদশাহের আজ্ঞা। তিনি হৃষ্টচিত্তে আশীর্ব্বচন দিয়া গোপালদাসকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন।

গোপালদাসের উপর আলিরগড়ের দুর্গ দখল করিবার ভার। তজ্জন্য তিনি বাছিয়া বাছিয়া বাদশাহের যত বড় বড় কামান ছিল, সমস্ত সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু সে কামান সাধারণ বলদে টানিতে পারে না, তজ্জন্য উপায় চিন্তা করিতে করিতে মনে পড়িল, তাঁহার দেশস্থ উটগাঁর দুর্গের অনতিদূরে চরণদাস মোহান্তের নিকট উৎকৃষ্ট বলদ আছে, সেই সকল বলদে কামান বেশ টানিতে পারিবে। তৎক্ষণাৎ তিনি বলদগুলিকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিবার জন্য তথায় কতক গুলি লোক পাঠাইলেন। তাহারা চরণদাসের নিকট গিয়া বলিল,—রাজকুমার গোপালদাসের আজ্ঞায় আমায় বলদ-গুলি দাও, নচেৎ জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া যাইব।

চরণদাস মনে বুঝিলেন গোপালদাস পূর্ব্ব-কথা সব ভুলিয়াছে। তিনি বলিলেন,—বেশ কথা! অনেকদূর হইতে তোমরা আসিয়াছ, অদ্য রাত্রি এইখানে বিশ্রাম কর; প্রাতে দুগ্ধ দোহন করিয়া যখন গাভীগুলিকে মাঠে চরিতে পাঠাইব, সেই সময় বলদগুলি লইয়া যাইও। গোপালদাসের লোক চরণদাসের কথায় সম্মত হইয়া সেই রাত্রি তথায় বাস করিল। চরণদাস গাভীদুগ্ধ দ্বারা তাহাদের আতিথ্য করিলেন।

প্রাতে গাভী-দোহনের পর চরণদাস লোকগুলিকে বলিলেন,—ভাই সকল, গোয়াল খুলিয়া দিয়াছি, এখন তোমরা যথা-ইচ্ছা বলদগুলিকে লইয়া যাইতে পার। তাহারা হৃষ্টচিত্তে যেমন গোয়ালের দিকে বলদ ধরিতে গেল, অমনি যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাহারা দেখিতে পাইল, তাহাতে ভয়ে বিহ্বল হইয়া কেহ বা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, কেহ বা

পলায়ন করিল। তাহারা দেখিল, এক-একটি গাভী গোয়াল হইতে বাহির হইতেছে এবং সেই সেই গাভীর পশ্চাৎ এক একটি ব্যাঘ্র আসিতেছে! এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের বলদ ছিনাইয়া লওয়া হইল না। তাহারা তথা হইতে পলাইয়া গোপালদাসের নিকট এই অদ্ভুত কাণ্ডের সংবাদ দিল। সংবাদ পাইয়া গোপালদাসের পূর্ব্বকথা মনে পড়িল। তিনি অতি শীঘ্র চরণদাসের নিকট আসিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। চরণদাস স্বীয় গুরু-ভ্রাতাকে উঠাইয়া আপন আসনে সস্নেহে বসাইয়া বলিলেন,—দেখ গোপাল, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা সত্য হইল কি না! তুমি চন্দ্রসেনের পৌত্র-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়াছ। যাহা হউক আমি যোগ-বলে মায়া রচিয়া তোমার লোকগুলিকে ভয় দেখাইয়াছিলাম, যাহাতে তোমার পূর্ব্ব কথা মনে পড়ে। এমন তুমি ভাল ভাল বলদ বাছিয়া লইয়া যাইতে পার। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাদশাহের নিকট যথেষ্ট যশ লাভ কর।

গোপালদাস যথাসময়ে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং ভীম বিক্রমে আলিবগড় দুর্গ আক্রমণ করিয়া এক মাসের মধ্যে তাহা হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। এ কার্য্যে বাদশাহ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাকে পঞ্চ-হাজারী মনসব এবং উক্ত মনসবের যোগ্য নাগাড়া ইত্যাদি দিয়া সম্মানিত করিলেন। তিনি উটগীর পুনরাগমন করিয়া গুরুভাই চরণদাসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথায় তিনি চরণ-দাসকে একাসনে বসাইয়াছিলেন বলিয়া সমলগড় পরগণার হালসীপুরের মোহন্তদের যদুবংশীয় রাজাদের সহিত একাসনে বসিবার অধিকার বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই! হালসীপুরের মোহন্তরা নির্ব্বংশ। যদুবংশীয়দের হস্ত হইতে সমলগড় পরগণাও বিচ্যুত।

৺ রাও ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।

পরিচয়

ট্রেণের কামরায় আমি ছিলাম একা। ইণ্টার ক্লাশ, থার্ড ক্লাশ, সব একেবারে ভরিয়া গিয়াছে, তবু সেকণ্ড ক্লাসের দিকে কেহ ফিরিয়া চাহে না, সুতরাং সারা পথ আমায় সঙ্গী-হীন অবস্থায় যাইতে হইবে! কারণ সেকণ্ড ক্লাসের যাত্রীরা প্রায় সকলেই পঞ্জাব-মেলে যাইবেন। বাতিকগ্রস্ত না হইলে কে আর আমার মত সখ করিয়া রাত জাগিয়া এই প্যাশেঞ্জারে যায়!

কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বেই সুরাহা হইল। দেখি, এক ভদ্র লোক একেবারে আমার কামরাটি খুলিয়া হাঁকিলেন—"আসুন, আসুন এইটেতেই উঠে পড়ুন," এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই জন স্ত্রীলোক কামরার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ভদ্রলোক মালপত্র বোঝাই করিতে ব্যস্ত হইলেন; এবং শেষে 'এটাও না নিলে নয়' বলিয়া একটা কুঁজা বেঞ্চের তলায় গুঁজিয়া দিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়ের কোথা যাওয়া হবে?"

"মধুপুর।"

"ভালই হলো মশাই, আপনি এঁদের একটু দেখবেন—এঁরা দেওঘর যাবেন।" তাঁদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আপনাদের সুবিধে হলো—যদি বিশেষ দরকার হয়, ইনি আছেন—আর পাশের কামরাতেই ত রামধনি রইল।" এমন সময় গাড়ী নড়িয়া উঠিল।

ভদ্রলোক আমাকে "গুড্ নাইট্" জানাইয়া ফিরিয়া গেলেন।

আমার বোধ হয় নেহাৎ কুম্ভকর্ণ না হইলে কেহ ট্রেণে ঘুমাইতে পারে না, কারণ আমি বহুবার চেষ্টা করিয়াও এ ব্যাপারটিকে তিলমাত্র আয়ত্ত করিতে পারি নাই। অতএব বাধ্য হইয়া আমাকে কখনও শুইয়া কখনও বসিয়া কাটাইতে হইতেছে, এবং বোধ করি, এই ব্যায়ামের জন্যই শীঘ্র এমন পিপাসা পাইল যে প্রাণ যায় আর কি! অগত্যা

আমার নজর পড়িল রমণীদের কুঁজাটির উপর। করি কি? একবার মাথাটা একটু চুলকাইয়া এবং একটা ঢোক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের কুঁজো থেকে একটু জল নেব কি?"

রমণীদ্বয়ের মধ্যে একজন বর্ষীয়সী—তাঁর তন্দ্রা আসিতেছিল। তিনি আমার আহ্বানে তন্দ্রা ভাঙ্গিতে বলিয়া উঠিলেন, "এঁ্যা! জল! হঁ্যা, তা নেবে বৈ কি বাবা। নাও না—"

বারবার ত্যক্ত করা সঙ্গত নয়, তাই জল একটু বেশী পরিমাণেই উদরসাৎ করিয়া আবার স্বস্থানে ঝাঁকাইয়া বসিতেছি, এমন সময় বর্ষীয়সী আমায় প্রশ্ন করিলেন—"বাবার স্থানে পৌঁছুতে কত দেরী হবে বাবা?"

"আজ্ঞে, সে ঢের দেরী। কাল সেই বেলা একটা দুটো বোধ হয়। এটা প্যাশেঞ্জার কি না!"

"প্যাশেঞ্জার! দেখ দেখি আক্কেল!" বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনীর দিকে চাহিয়া বলিয়া চলিলেন, "বল্লুম উমেশকে যে প্যাশেঞ্জারে দিয়ো না।...তা যা হোক্, ভাগ্যে তুমি ছিলে, নাহলে রাত্রে যদি কোন বিপদ ঘট্‌ত! ঠুক্ ঠুক্ করে গাড়ী যাবে আর এই রাত-বিরেতে যেখানে-সেখানে দাঁড়াবে!... হঁ্যা, তোমার নামটি কি বাবা?"

"আমার নাম শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ।"

রমণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধুপুরেই কি তুমি থাক?"

"আজ্ঞে না, আমার বাড়ী কল্‌কাতায়। মধুপুরে আমার বাবা আছেন, সেইখানে যাচ্ছি।"

"কলকাতাতে ত আমাদেরও বাড়ী। তোমার বাড়ী কোন্ রাস্তায়?"

"গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে।"

কিশোরীটি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলেন; হঠাৎ তিনি বর্ষীয়সীকে ইসারা করিয়া জনান্তিকে তাঁহাকে কি একটা কথা বলিয়া লইলেন। বর্ষীয়সী বলিলেন, "কি কর তুমি বাবা?"

"ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ি।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়াছে,—প্রৌঢ়া ঘুমাইয়াছেন, আমি সেই একই ভাবে বেঞ্চের উপর ছট্‌ফট্ করিতেছি, এমন সময় দেখি, সেই কিশোরী—যিনি ঘোমটা দিয়া এককোণে বসিয়াছিলেন, ও মাঝে মাঝে তাহারি অন্তরালে আমার পানে কালো চোখের কজ্জল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিলেন—ঘোমটাটি তাঁর অনেকখানি সরাইয়া দিয়াছেন! ভাবিলাম, এমনিই! কিন্তু চপলতার মাত্রা বাড়িতে দেখিয়া আমি একটু বিস্মিত হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম,—তিনি স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, তুমি ঘুমোলে না?"

আমি অবাক হইলাম। তাইতো, অপরিচিতা কিশোরী—বাঙালীর মেয়ে—জানা নাই, শোনা নাই, এমন পরিচিতের ভঙ্গীতে কথা কন্,—তা'ও একেবারে 'তুমি' বলিয়া... আশ্চর্য্য! তরুণীর সাজ-সজ্জা ও প্রকৃতি এতক্ষণ যা দেখিতেছিলাম, তাহাতে তাঁহাকে পর্দ্দা-লোকের জীব বলিয়াই মনে হয়। পর্দ্দার বাহিরে তাঁর আসা-যাওয়া আছে, অন্ধও বুঝি এমন ভুল করিতে পারে না! অথচ তিনি... আমার মনের যা ভাব হইল, সে আর কহতব্য নয়! একটা...

গোপন করিব না;—একটা কেমন সন্দেহের আব্‌ছায়াও মনে জাগিল!

কিশোরী আবার কথা কহিলেন, বলিলেন, "সন্তোষ বাবুর বুঝি ট্রেণে ঘুম হয় না?"

ভাবিলাম, এ আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না তো?—এ কি রোমান্সের ছেঁড়া পাতা একখানা ট্রেণের কামরায় উড়িয়া আসিয়া পড়িল! তখন মনের অতি-গোপন কোণে এমনি একটা হাওয়াও মাঝে-মাঝে সঞ্চিত হইত কি না!

কথার জবাব দিতে পারিলাম না। গা 'কেমন ছমছম করিতেছিল।

তরুণী বলিলেন, "ছি ভাই, কথার জবাব দাও না কেন?"

আমি তেম্‌নি নিরুত্তর।

"তুমি বোবা না কি? শুন্‌ছো!"

ভগবান, তোমার বাজ-টাজ্ যা থাকে, মাথায় ফেলিয়া এই নারী জাতিটারই বিলোপ সাধন করিয়া দাও! ভাবিলাম, দিই দুই-চারিটা কড়া কথা শুনাইয়া!... পারিলাম না।

তরুণী বলিলেন, "দেখ ভাই, গাড়ীতে এখন শুধু তুমি আর আমি, যদি তুমি একটি কথাও না বল, তবে সারা রাত কি করে কাটবে? আমি আবার ট্রেণে ঘুমোতে পারি না—ঘুম হয়ই না!" কথার সহিত হাসি! অসহ্য!

আমি বলিলাম, "আপনি কি বল্‌ছেন?" এছাড়া আর কোন কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না।

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "বল্‌বো আর কি! মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে নেই? তুমি এমন কুনো! বুনো না কি? ছি!"

আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। রোমান্সের যা-কিছু নেশা তরুণ প্রাণে ছোঁয়াচ্ লাগাইয়াছিল, সব কোথায় সরিয়া পড়িল—সারা দুনিয়াখানা একটা প্রকাণ্ড ধোঁয়ার গোলায় রূপান্তরিত হইয়া চোখের সাম্‌নে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

তরুণী বলিলেন,"দেখ,তুমি যদি কথা না বল, তবে আমি কিন্তু ওখানে গিয়ে বসব।" বলিয়া তিনি উঠিতে গেলেন। আমি শশব্যস্তে বলিলাম, "আজ্ঞে না, এই যে গল্প করছি।"

ভয়ে গা শিহরিয়া উঠিল। এ কি, বিলাতী কায়দায় ভয় দেখাইয়া পয়সা-উপার্জ্জনের চেষ্টা না কি! এ্যালার্ম সিগনালটার পানে একবার চাহিলাম,—সেটা বেশী দূরে নয়।...কিন্তু...বাঙালীর মেয়েকে কোনদিন ভয় করা যাইতে পারে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে! আজ ...!

প্রশ্ন হইল, "তোমার বে হয়েছে?" চোখে আবার সেই হাসির বিদ্যুৎ!

আমি বলিলাম, "হয়েছে।" হায়রে,—আমার স্ত্রী, সেও ইহাদের জাতেরই একজন!

"বৌটি দেখতে কেমন?"

"অমনি একরকম।"

"আমার মত?"

কোন জবাব দিলাম না। দেওয়া যায় না!

তরুণী বলিলেন, "না, বল্‌তেই হবে। আমার পানে চেয়ে দেখ, দেখে বল। ছাড়চি না।"

আমার কপাল ঘামিয়া উঠিল। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস যেন ঝড় তুলিল।

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া তাঁর পানে চোখ তুলিয়া চাহিতেই দুইজনে চোখোচোখি হইল। চমৎকার ডাগর চোখ! কুণ্ঠায় আমার চোখ নামিয়া পড়িল। তাঁর চোখে-মুখে একেবারে তীব্র বিদ্যুৎ ছুটিয়াছে!

তিনি বলিলেন, "বল!" আঘাত দিবার লোভ সম্বরণ করা গেল না! এত দর্প! তুমি কি এমনি রূপসী যে—

বলিলাম, "আপনার চেয়ে নিরেস নয়!"

কিশোরী হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "বাঙালী বরেরা তাদের কচি কনেদের সেরা রূপসী বলেই ভাবে!"

নাঃ,এ যে ছাড়ে না! অগত্যা তাঁর হাত এড়াইবার জন্য বলিলাম, "আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে—যদি মাপ করেন। রাত্রে না ঘুমোলে আমার অসুখ করে। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আছে কি না!"

তরুণী যেন একটু বিব্রত হইলেন; বলিলেন, "অসুখ করে! তবে তুমি ঘুমোও! আমি জেগেই থাকবো। উপায় নেই! রেলে চড়লে আমার ঘুম হয়ই না!" স্বরটা করুণ! কিন্তু...

আঃ! মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কিশোরীর দিকে পিছন ফিরিয়া চক্ষু মুদিলাম। নানা চিন্তা ঢেউ তুলিয়া মনের মধ্যে আথালি-পাথালি করিতে লাগিল। কে বলে, রমণী দেবী!...পিশাচী, শয়তানী...! তাকে স্বাধীনতা দেওয়া!...

একটা প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম বাঙালীর পর্দ্দাকে গালি দিয়া। ভাবিলাম, ভাগ্যে ক্লাবে সেটা পড়ি নাই! নাঃ— প্রণাম, হে আমার সনাতন সমাজ, হে আমার জীর্ণ আচার-সংস্কার, বাজাও, বাজাও তোমার লৌহ-শৃঙ্খল ঝম্‌ঝম্, ঝম্‌ঝম্! এই নারীজাতিটাকে তাহাতে কষিয়া আঁটিয়া চাপিয়া রাখো! এদের স্বাধীনতা দেওয়া...না, না!

সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিতেই আবার চোখো-চোখি! কিশোরী হাসিয়া বলিলেন,—"ঘুম ভাঙ্‌লো? কি অঘোরেই ঘুমিয়েছ!—যাক্, এখন মুখহাত ধুয়ে এসো দিকি। চা তৈরী করে দি, খাও। আমার সব সরঞ্জাম আছে।"

আবার অবাক হইলাম—এত দরদ! আর বলিবার

ভঙ্গী...একেবারে আদেশ! হতভম্বের মত মুখ হাত ধুইয়া আসিলাম।... এ কি হেঁয়ালি!

তিনি চা তৈয়ারী করিয়া আমায় পেয়ালা ভরিয়া দিলেন। তারপর পেয়ালা ধুইয়া যখন বসিলেন, তখন প্রৌঢ়া জাগিয়াছেন। তরুণী ঘোমটা টানিয়া চুপ্‌চাপ রহিলেন। কি ছল, কি চাতুরী-ভরা নারীর চিত্ত!...

যথাসময়ে মধুপুরে গাড়ী থামিল,—নামিবার সময় তরুণী কাম্‌রার দ্বারের কাছে আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আবার দেখা হবে। মনে রেখো ভাই।"

ভাবিলাম, মনে রাখিব বৈ কি! পাপীয়সী, পিশাচিনী!

মধুপুরে তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। একদিন সকালে একখানি উপন্যাস লইয়া বসিয়াছি, এমন সময় বাবা আসিয়া বলিলেন, "ওরে কাল তোর শ্বশুর চিঠি লিখেছেন, আজ তোর শালা তোকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য আস্‌বে!"

"কোথায়?"

"দেওঘরে। সেখানে তোর শ্বশুরবাড়ীর সকলে এসেছেন।"

আমার বিবাহ হইয়াছে আজ এক বৎসর, কিন্তু বিবাহের পর আর সে-দিকই মাড়াই নাই। বিবাহের দুই দিন পরেই শিবপুর চলিয়া যাই; এবং এই এক বৎসর পরে বাড়ী আসিয়াছি। সুতরাং সংসারের সার-স্থানে যাইবার জন্য মন যে কী হইয়া পড়িল, সেটা বোধ হয় খুলিয়া বলার প্রয়োজন নাই!

সাজানো থালার সাম্‌নে বসিয়া সত্যই আমার সব গোলমাল হইয়া গেল; আরও গোলমাল হইল যখন একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাই, চিন্‌তে-টিন্‌তে পারো?"

"এ কি! আপনি! আপনি তবে...আমার..."

"পরিবারের ভগ্নী! ভাগ্যে গাড়ীতে পিসিমা তোমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তাই তো ধরা পড়ে গেলে, নইলে আমরা জান্‌তেও পারতুম না যে তোমরা মধুপুরে আছ। তোমার বের সময় আমি ছিলুম দিনাজপুরে, আর পিসিমা ছিলেন কটকে—কাজেই কেউ তোমায় চিনি না। পিসিমা ট্রেণেও তোমায় চিন্‌তে পারেন নি, নাম শুনে। আমি টিপে দিয়েছিলুম, সাবধান, আমাদের পরিচয় দিয়ো না...ভেবে ছিলুম, সাবধানে জেনে নেব, কেমন ভাব-সাব হলো তোমাদের—তা তুমি তো ঘুমিয়ে কাদা!...তুমি খুব অবাক হয়ে গেছলে, না,—আমার গায়ে-পড়ে আলাপের ভঙ্গী দেখে...?" বলিয়া তিনি হাস্য করিয়া উঠিলেন।

আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! ভাগ্যে তখনকার মনের মধ্যকার সে তপ্ত ঝাঁঝালো ভাব ভাষায় প্রকাশ করি নাই! নিজের উপর রাগ ধরিতেছিল, একজন ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে অমন ধারণা করা—না হয়, নিঃসঙ্গ অবস্থায় একজন পুরুষের সঙ্গে আলাপই করিয়াছেন, তাই বলিয়া...ছি, ছি, এমন বেকুবও মানুষ হয়!

শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অতিথি

নির্জ্জন প্রান্তরে
চলেছে কে যাত্রী?
—ধু ধু ধু ধু জ্যোচ্ছনা,
ঝক্‌মকে রাত্রি—
স্বপ্নের জুঁই বেল
চলেছে সে ছড়িয়ে,
সুপ্তির সুষমাটি
চোখে তার জড়িয়ে;

গান গায় বয়ে যায়
অমৃতের ঝরণা,
এ ত ধুলো-কাদা-মাখা
পৃথিবীর স্বপ্ন না;
যা লো সখি-যা লো ছুটে
ডেকে তারে আন্‌তো,
যায় যায় চলে যায়
কে বিদেশী পান্থ!

এসো এসো হে অতিথি,
মুখ তুলে চাও গো !
যে গানটি গাইছিলে
সে গানটি গাও গো !
ভরে দাও হাসি-গানে
সমুদায় সৃষ্টি,
চেয়ে ছাখো আজকের
রাতটি কি মিষ্টি !

তরুলতা তৃণদলে
আলো করে নৃত্য,
তারা করে ঝল্‌মল্‌
দুলে ওঠে চিত্ত ;
চায় প্রাণ ছাড়া পেতে—
চায় পেতে মুক্তি—
শুনচেনা মন আজ—
কোন মানা-যুক্তি ;

অজানার অচেনার
যাচে তাই সঙ্গ,
সরমের শৃঙ্খল
ছিঁড়ে একদম্‌ গো !
ক্ষমা কর ধৃষ্টতা,
ক্ষম মোর উক্তি,—
বলেচি ত মন মোর
মানচে না যুক্তি !

উড়ো পাখী একঝাঁক্‌
যায় ছাখো বেরিয়ে,
আলোকের পারাবার
পাড়ি মেরে পেরিয়ে ;
সাধ যায় প্রান্তর
কান্তার লঙ্ঘি—
ওরি পিছে পিছে ছুটি—
পাই যদি সঙ্গী !

নয় বঁধু এসো তুমি
নাও মোরে ছিনিয়ে,
দাও মোরে বিপথের
পথ কটা চিনিয়ে !
কাঁটা আছে ? ভয় নেই,—
কাঁটা তাতে ভয় কি ?
তুমি যদি রাখ বুকে,
বুকে ভয় রয় কি ?

চলো বঁধু চলো চলো
দুর্গম তীর্থে—
প্রণয় কি কল্পনা ?
প্রেম, সে কি মিথ্যে ?
হে নিঠুর ! ঘৃণা-ভরে
উঠে তুমি চল্লে !
ভালো কথা একটাও
আমারে না বল্লে !

পায়ে পড়ি যেওনাকো—
থাকো আজ রাতটা,—
ঢং ঢং ঘড়ি বাজে—
একি ! বেলা সাতটা !
যা লো যা লো ছুটে
দে না জল চড়িয়ে,
স্বপ্নের ঘোর চোখে
এখনো যে জড়িয়ে !

কোথা গেল সে বিদেশী ?
দেখা নেই তার ত !
যাবে যদি চাটা খেয়ে
গেলেই ত পারত !

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী

গত ৬ই অগষ্ট পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী মহাশয় হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কার্ব্বাঙ্কল রোগে ভুগিতেছিলেন। কিন্তু মৃত্যু যে এত শীঘ্র তাঁহাকে লইয়া যাইবে, এ আশঙ্কা কেহই করে নাই।

পণ্ডিত রামভুজ দেশের সেবায় অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন।

শ্রীমতী সরলা দেবী ও রামভুজ দত্ত চৌধুরী
(প্রবাসীর সৌজন্যে)

তাঁহার প্রথম জীবন সমাজ-সংস্কারের কাজে তিনি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সমাজকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া যাঁহারা গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামভুজ অগ্রণী। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অল্প ছিল না; তিনি ছিলেন লালা লাজপৎ রায়ের ডান হাত। পঞ্জাবের সেই অরাজকতার যুগে যাঁহারা ডায়ার ও-ডায়ারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, রামভুজ তাঁহাদেরও অগ্রণী ছিলেন। নেতার সাহস এবং ধৈর্য্য, দৃঢ়তা এবং আত্ম-সম্মান-জ্ঞান সে সময় তাঁহার প্রতি কাজেই প্রকাশ পাইয়াছে। নির্য্যাতনের পাহাড় তখন তাঁহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে নির্যাতন মনকে দুমড়াইতে পারে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভেই তিনি তাহাতে যোগদান করেন। সেখানেও তিনি যে ত্যাগ, সাহস ও আত্মনির্ভরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা দুর্লভ।

বাংলার সহিত রামভুজের বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাঁহার পরিণয়-সূত্রে। তিনি বাঙালী মহিলাকুল-গৌরব ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা শক্তি-সাধিকা শ্রীমতী সরলা দেবীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়ে উভয়কে আশ্রয় করিয়া দেশের সকল কাজে শক্তিলাভ করিয়াছেন, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন—সুখে-দুঃখে, সম্পদে বিপদে যে দোসর আশ্রয় ছিল, তাঁহাকে হারাইয়া শ্রীমতী সরলা দেবীর চিত্ত যে-শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। তবে তাঁহার এ শোক তাঁহারই একার নয়, আমাদেরও। সারা দেশ আজ তাঁহার সহিত এ মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে—এইটাই মস্ত সান্ত্বনা। এ ত মৃত্যু নয়—এ যে অমরত্ব! পণ্ডিত রামভুজ আজ 'পঞ্জাব-বাঙ্গলা-রাজপুতানা' সর্ব্বত্র তাঁর অমরত্বের আসন বিছাইয়া রাখিয়াছেন! তাঁর কার্য্য আমাদের কার্য্য বলিয়া যদি আজ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারি, তবেই তাঁর স্মৃতির প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধা আমরা জানাইতে পারিব। দেশের এ দুর্দ্দিনে তাঁকে হারানো এ মস্ত বড় দুর্ভাগ্য—এ দুর্ভাগ্যে সান্ত্বনার কিছুই নাই।

বাঙ্‌লা বায়োস্কোপ

২

তাজমহল কোম্পানির পূর্ব্বে আর-একটি বাঙালী বায়োস্কোপ কোম্পানি খোলা হইয়াছিল,—ইণ্ডো ব্রিটিশ কোম্পানি। ইঁহাদের ষ্টুডিও ছিল বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে। ইঁহারা ম্যাডান কোম্পানির ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র সরকার মহাশয়কে লইয়া আসরে নামিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রধান আর্টিষ্ট ছিলেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গে বাঙ্‌লা থিয়েটারের এমন কয়েকজন অভিনেতাকে ইঁহারা আসরে নামাইয়াছিলেন, যাঁহাদের কলা-জ্ঞানে দখল খুব কম।
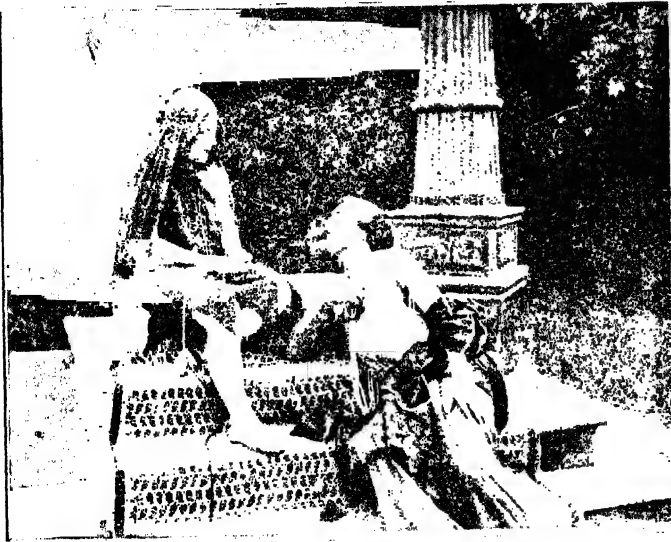
ধর্ম্মপাল ও রমলা

এই কোম্পানি প্রচুর অর্থ এবং অত্যধিক সময় ব্যয় করিয়া তিনখানি ফিল্‌ম্ তোলেন। ইঁহাদের প্রথম ফিল্‌ম্ 'বিলাত-ফেরত।' বাঙালী এই প্রথম বাঙ্‌লা বায়োস্কোপ কোম্পানির প্রথম ফিল্‌ম্ দেখিবার জন্য এমন উদ্‌গ্রীব ছিল যে ইঁহাদের চিত্র দেখাইবার তারিখ বিজ্ঞাপিত হইবামাত্র টিকিট সব বিক্রয় হইয়া গেল। কিন্তু ইঁহাদের চিত্র-নাট্যের গল্প এমন আজগুবি, আর অভিনয়েও বিলাতীর নকল এমন ভীষণভাবে প্রকটিত হইয়াছিল যে বাঙালী বাঙলা-বায়োস্কোপের নামে শেষে দমিয়া গেল। বাঙ্‌লা এবং ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ লইয়া উঁহারা ছবি খাড়া করিলেন; কিন্তু সে ছবি না হইল বাঙালী সমাজের না হইল বিলাত-ফেরত সমাজের ছবি! তার পাত্র-পাত্রী ও তাদের কার্য্যকলাপ এদেশের কোন সমাজের সঙ্গেই মেলে না—বিশেষ করিয়া নায়ক প্রবরের চাল চলন ও ভাব-ভঙ্গী। প্লটেও না ছিল মাথা, না ছিল ধড়! ছবি দেখিয়া আমাদের তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল, এ বাঙালীর বেশে, বাঙ্‌লা নামে এ কাহাদের আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতেছি! কেবল মাত্র ঐ কারণেই এই কোম্পানি সাধারণের সহানুভূতি হারাইল! ইঁহারা আরো ছবি তুলিয়াছিলেন, যশোদানন্দন, এবং সাধু কি শয়তান! যশোদানন্দনে কৃষ্ণ-লীলার বহু দৃশ্য খাড়া করা হইয়াছিল। কয়েকটি দৃশ্যে অলৌকিক কাণ্ড দেখানো হইয়াছিল, সেগুলি বেশ হইয়াছিল, কিন্তু অভিনয় জমে নাই। সাধু কি শয়তানের প্লটেও ঐ আজগুবি দোষ ঘটিয়াছিল! কাজেই দর্শকের সহানুভূতির অভাবে কোম্পানি উঠিয়া গেল।

এই কোম্পানি উঠিয়া যাওয়ার ফলে বাঙলা বায়োস্কোপের গতি প্রচণ্ড বাধা পাইল। তাই আজ বাঙালী দর্শক বাঙলা বায়োস্কোপকে একটু দ্বিধার চক্ষে দেখে, অর্থাৎ দো-ভাবা মন লইয়া বাঙালী ভাবে, ছবিটা কেমন হইবে, কে জানে—বিলাতীর নকল? না, আর্টের শ্রাদ্ধ? সুতরাং বাঙলা বায়োস্কোপকে এই বাধা ঠেলিয়া চলিতে

হইবে আরো কিছুকাল; এবং কয়েকটা ভালো ছবি দেখাইতে পারিলে তবেই বাঙলা বায়োস্কোপের উপর বাঙালী দর্শকের নষ্ট বিশ্বাস আবার ফিরিয়া দাঁড়াইবে। কাজেই বাঙলা বায়োস্কোপের প্লট ও অভিনয় সম্বন্ধে ভারী হুঁসিয়ার ভাবে চলিতে হইবে; এবং রসজ্ঞানহীন পরিচালককে যেন একেবারে এদিকে ঘেঁষিতে দেওয়া না হয়! এ ফাঁকির কাজ নয়! সখের থিয়েটার নয়!

তক্ষশিলায় ধর্ম্মপালের প্রাসাদ-দ্বারে রমলা ও দাসবিক্রেতা

তাজমহল কোম্পানি ছাড়া আরো একটি বাঙলা কোম্পানি ইতিমধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। সে কোম্পানির নাম ফটো-প্লে সিণ্ডিকেট অফ ইণ্ডিয়া। ইঁহারা বহু দিন খাটিয়া একখানি মাত্র ছবি তুলিয়া দেখাইয়াছেন—The Soul of a Slave অর্থাৎ বাঁদীর প্রাণ। এই কোম্পানির অধ্যক্ষ ও পরিচালকগণ বাঙালী। বেহালায় ইঁহাদের ষ্টুডিও। এ দলে সাহেব-মেমও অভিনয় করিয়াছেন। তাঁদের মধ্যে জুন রিচার্ডস্ পূর্ব্বে বিলাতী বায়োস্কোপে কয়েকটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—আর মিস্ আডেল উইলিসন-ওয়ার্থও এই চিত্র-নাট্যের অভিনয়ে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।
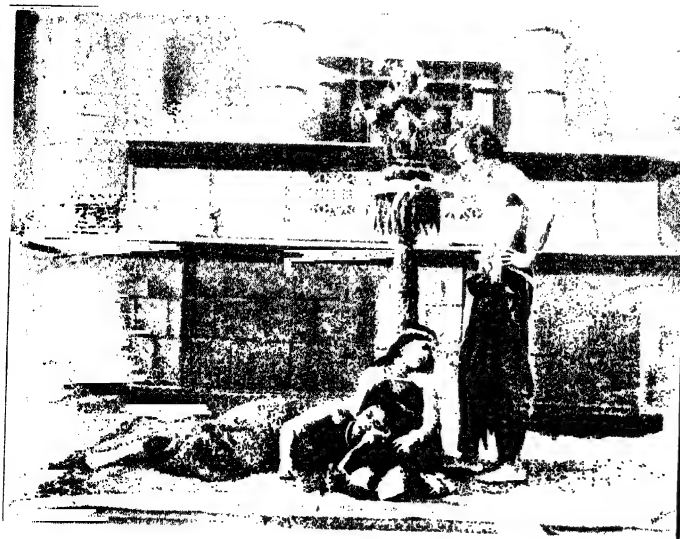
নৃত্যশেষে রাহুসেন ও নর্ত্তকী

এই কোম্পানির পরিচালকগণ একটা জিনিস এই দেখাইয়াছেন যে, তাঁদের আইডিয়া আছে, এবং সে আইডিয়া ছবিতে ফলাইতে তাঁরা যথেষ্ট পরিশ্রম-স্বীকারেও রাজী এবং আর্টেও তাঁরা খুঁৎ রাখিতে চান্‌না। এই যে সম্পূর্ণ একটি মৌলিক নাটক লিখিয়া আসরে নামা, ইহা হইতে বুঝা যায়, ইঁহাদের সাহসও আছে। সাহস না থাকিলে, নিজের শক্তির উপর নির্ভর না থাকিলে কেহ কখনো কোন বড় কাজ বা নুতন কাজ করিতে পারে

না। ইঁহারা গতানুগতিকের মায়া কাটাইয়া তক্ষশিলার এক প্রাচীন কাহিনীর—খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর ঘটনাবলী-স্খলিত কাল্পনিক কাহিনীর—ভিতর দিয়া আপনাদের শক্তি ও প্রতিভা দেখাইতে নামিলেন। কাহিনীটি খুব সুসমঞ্জস না হইলেও তার ফটোগ্রাফি, সেটিং (setting), title, ও অভিনয় সকলের কাছ হইতেই বহু তারিফ আদায় করিয়াছে এবং সে তারিফ পাইবার যোগ্যতার দাবীও ইঁহারা রাখেন, এ কথা বলিতে পারি। 'বাঁদীর প্রাণ' The Soul of a Slave চিত্র-নাট্যের গল্প মোটামুটি এই—তক্ষশিলার বণিক-রাজা জয়পালের একমাত্র পুত্র ধর্ম্মপাল আনন্দে বিলাসে সুখৈশ্বর্য্যে দিন কাটাইতেছিলেন; সুরা ও নারী ছিল তাঁর চিত্ত-বিনোদনের একমাত্র বস্তু। হঠাৎ একদিন দুর্দ্দান্ত দস্যু জাদ্-উল জরের কবল হইতে পর্ব্বতবাসিনী এক অনার্য্য বালিকার আপনাকে পরিত্রাণের বিপুল চেষ্টা দেখিয়া তাঁর মনে ভাবান্তর হয়, বিলাস-ঐশ্বর্য্যে অবসাদ জাগে।

এই বালিকা তার ভাই মানহাতার সঙ্গে পাহাড়ে বাস করিত; উক্ত ঘটনার পর সে ভাইয়ের সঙ্গে পাহাড় ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। পথে একদল দাস-বিক্রেতা তাকে ধরে। মানহাতা তাদের হাতে প্রচণ্ড প্রহারে জর্জ্জরিত হয় এবং বালিকাকে তারা আনিয়া তক্ষশিলায় ধর্ম্মপালের কাছে বিক্রয় করে। ধর্ম্মপাল বালিকার নাম রাখেন, রমলা।

ধর্ম্মপালের এক গণিকা ছিল, তার নাম ইলা। হাস্যে-লাস্যে ছলায়-কলায় সে ধর্ম্মপালের উপর আপনার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখে। তার মনে ভয় হইল, রমলা পাছে তার জায়গা দখল করিয়া বসে, ধর্ম্মপালের হৃদয় জয় করে! ইলার এক গুপ্ত প্রণয়ী ছিল রাহুসেন, ধর্ম্মপালের প্রিয় সদস্য। রাহুসেনের সাহায্যে ইলা রমলাকে ধর্ম্মপালের দৃষ্টি হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

দীর্ঘ যাত্রা-শেষে ক্লান্ত মানহাতা ও রমলা

ধর্ম্মপাল একদিন পিতাকে সাফ্ বলিলেন যে বাঁদী রমলাকে তিনি ভালবাসেন; কিন্তু পিতা অনার্য্য বালিকার সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিতে অমত করেন এবং শেষে কোনমতে ধর্ম্মপালের অলক্ষ্যে বালিকা রমলাকে তিনি প্রাসাদ হইতে তাড়াইয়া দেন।

রমলা আবার ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই পাহাড়ে ফিরিয়া আসে—প্রাণ তার তখন ধর্ম্মপালের প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ। এখানে তার দেখা হয় ভাই মানহাতার সঙ্গে। মানহাতাকে দস্যু-সর্দ্দার অনুচরগণ সহ ভগ্নীর সন্ধানে পাঠাইয়াছে। ভাই ও ভগ্নী দুইজনের দেখা হইল। দুইজনে গোপনে পলাইবার সঙ্কল্প করে; কিন্তু পলায়ন-কালে ধরা পড়ে ও দুই জনেই জাদ্-উল-জরের কাছে আনীত হয়। বালিকাকে সর্দ্দার বিবাহ করিতে চায়, বালিকা রাজী হয় না—তখন ভাইয়ের উপর নানা অত্যাচার চলে। ভাইকে রক্ষা করিতে রমলা সর্দ্দারের হাতে আত্মদানে স্বীকৃতা হয়। সর্দ্দার তখন ভাইকে বিদায় দেয় এই বলিয়া, যেন তার অধিকারের মধ্যে মানহাতাকে কেহ আর কখনো না দেখিতে পায়! যাইবার পূর্ব্বে মানহাতা ভগ্নীকে দেখিবার অনুমতি পায়। রমলা ভাইকে বলে,

দাসবিক্রেতা জোর করিয়া রমলাকে ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে

তক্ষশিলায় ধর্ম্মপালের কাছে গিয়া শুধু রমলার নাম লইয়ো, তাহা হইলেই আশ্রয় ও সাহায্য দুই পাইবে।

ধর্ম্মপালের কাছে মানহাতা আসিয়া হাজির হইল। ধর্ম্মপাল তখন নিরাশ প্রেমের জ্বালা সুরার পাত্রে ডুবাইতেছিল। মানহাতার কাছে সব কথা শুনিয়া সে সসৈন্যে আসিয়া সর্দ্দারকে আক্রমণ করিল। দুই দলে বিপুল যুদ্ধ চলিল। এই যুদ্ধে মানহাতার হাতে সর্দ্দারের মৃত্যু ঘটে; মানহাতা যখন সর্দ্দারের মৃত দেহ বক্ষে লইয়া আনন্দে আত্মহারা, তখন এক শত্রুর গোপন শরে সেও আহত হইয়া মারা পড়ে।

ধর্ম্মপাল তখন রমলাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চান্ কিন্তু রমলা রাজী হয় না। ধর্ম্মপাল প্রাসাদে ফিরিয়া ইলা ও রাহুসেনকে তাড়াইয়া দেন্ এবং রমলাকেও ভুলিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে কি ভোলা যায়! প্রাসাদের বিলাস লীলা তখন ধর্ম্মপালের অসহ্য ঠেকে। ধর্ম্মপাল এক দিন প্রাসাদ ছাড়িয়া পাহাড়ের দিকে যাত্রা করেন; যাইবার সময় ভৃত্যকে দিয়া পিতাকে সংবাদ পাঠান। তারপর বহুদিন ধরিয়া দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটিয়া ধর্ম্মপাল পাহাড়ের সীমানায় আসিয়া পৌঁছান্ এবং রমলার সঙ্গে দেখাও হয়—রমলা তখন মৃত্যু-শয্যায়। ধর্ম্মপালের মিলন-পাশে রমলার মৃত্যু হইল। এই আশা লইয়া রমলা মরিল যে, স্বর্গে আবার দুইজনে দেখা হইবে! ধর্ম্মপাল সুখহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইখানেই নাটকের শেষ।

চিত্র নাটকের উপাখ্যানটি একটু বেশী মাত্রায় melodramatic; তবু ইহাতে বৈচিত্র্য বেশ ফুটিয়াছে। এবং এ চেষ্টার জন্য কোম্পানিকে আমরা সাধুবাদ দি। নাট্যচিত্রে এই ভারতীর রোমান্স আঁকিবার কারণ—আধুনিক বাঙালী নর-নারীর সুখ-দুঃখের কাহিনী বাঙালীর বিশেষ আচার-ব্যবহারের মধ্যেই ফোটে; সে কাহিনী য়ুরোপ

ইলা ও রাহুসেনের গোপন প্রেম

বা আমেরিকায় হয়তো বিকাইবে না। কেননা, বাঙালী চরিত্রের মজ্জাগত বিশেষত্বগুলির সহিত পরিচিত না থাকার দরুন সে সব ছবির সবটা হয়তো সেখানকার লোকে বুঝিতে পারিবে না। তাই এই কোম্পানি ভারতীয় রোমান্স ছবিতে তুলিয়াছেন। তার নর-নারীর চিত্তবৃত্তির নানা ভাব বিশ্বজনীন; এখনকার বিশেষ সমাজের বিশেষ আচার-ব্যবহারের গণ্ডীভুক্ত নয়। কাজেই তাহা বিশ্ববাসীর প্রাণে সহানুভূতি ফুটাইতে পারিবে। আমাদের মনে হয়, এ চেষ্টা তাঁহাদের কতক সফল হইয়াছে; কারণ ঐ নাট্যে কোন দেশের বিশেষ আচার বা রীতির অবতারণা নাই। পোষাকে ও সাজসজ্জায় এবং দৃশ্যপটের ব্যাপারেও সর্ব্বপ্রকার সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে এই কোম্পানির পরিচালকগণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা ঘাঁটিয়া তখনকার আবহাওয়ার ধাঁচ বেশ বজায় রাখিয়াছেন। এজন্য তাঁরা সেকালের ছাঁদে আদরা ছকিয়াছেন, পোষাক তৈয়ার করিয়াছেন, অলঙ্কার

ধর্ম্মপালের প্রাসাদ-দ্বারে বিস্মিত মান্‌হাতা
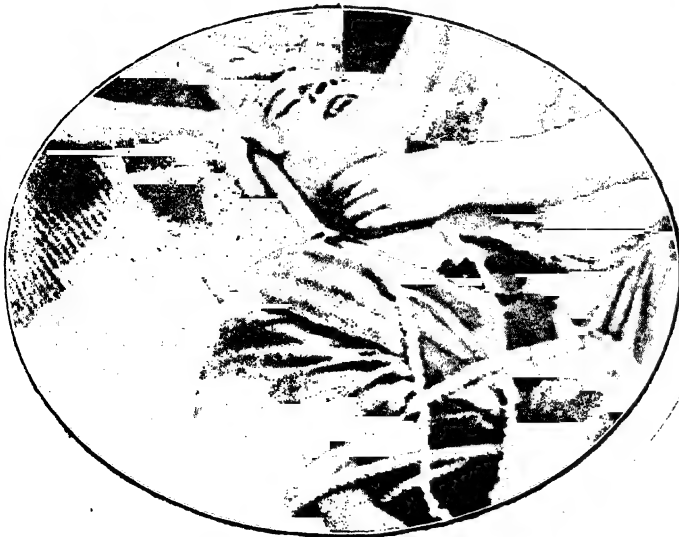
দস্যুসর্দ্দারের আদেশে মানহাতার উৎপীড়ন

গড়াইয়াছেন—এবং দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার আসবাব-পত্র কতক সংগ্রহ করিয়াছেন, কতক বা তৈয়ার করাইয়াছেন। এদিকে ওদিকে নজর না দিয়া কোন কোম্পানি উৎকৃষ্ট অভিনয়ই করুন, তাহাকে সেরা আর্টিষ্ট কখনই বলিব না। ধরুন, 'সীতার বনবাস' অভিনয় হইতেছে—সীতা খুব ভালো অভিনয় করিলেন—কিন্তু যদি দেখি, তিনি দস্তুরমত লেস-বাডিসে অঙ্গ ঢাকিয়াছেন, মুক্ত কেশে বো বাঁধিয়াছেন, আর সিল্কের রুমাল ঘুরাইয়া রামের বিরহে করুণ গান সুরু করিয়াছেন,—তবে তাঁকে আর্টিষ্ট বলিব কি করিয়া? এ সম্বন্ধে দেশায় অপর কোম্পানীর চেয়ে এ কোম্পানীর এদিকে নজর বেশী। এটুকু ভারী চমৎকার লাগিয়াছে। এবং ইহাতে উঁহাদের কলা-জ্ঞানেরও বেশ পরিচয় পাই। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সংগ্রহ হইতে বহু আসবাব দিয়া এই কোম্পানিকে সহায়তা করিয়াছেন—scenaraio লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী—নাট্যাধ্যক্ষতা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত হেম মুখোপাধ্যায়; আর ফটোগ্রাফ

তুলিয়াছেন ম্যাডান কোম্পানির অন্যতম ফটোগ্রাফার মিঃ ক্রীড্‌।

অভিনয়ে সব-চেয়ে ভালো খুলিয়াছে বিলাস-রঙ্গ ও নৃত্য-লীলার দৃশ্যগুলি—orgies। বিলাতী উৎকৃষ্ট চিত্রের সঙ্গে সে দৃশ্যগুলিকে একাসনে বসানো যাইতে পারে। রমলা ও ইলার অভিনয় চমৎকার—বিদেশিনী বলিয়া তাঁহাদের মোটে বুঝা যায় না। হাব-ভাব-ভঙ্গী এমন নিখুঁৎ যে অভিনয় দেখিতে দেখিতে আমরা দেশ-কাল-পাত্র সব ভুলিয়া যাই। মনে হয়, সেকালের একটি করুণ প্রেম-লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি। জাদ-উল-জর্, মানহাতা, দাসবিক্রেতা—এ সব চরিত্রগুলিও বেশ অভিনীত হইয়াছে। ধর্ম্মপাল মাঝে মাঝে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটু বেশী ঝাঁকানি দিয়াছেন, তাঁর অভিনয়ে চাঞ্চল্যের মাত্রা একটু বেশী—

রমলার অন্তিম সুখ

ধর্ম্মপাল ও মান্‌হাতা

এই তরুণ অভিনেতাকে একটু সংযত হইয়া অভিনয় করিতে হইবে। অভিনয়-কলায় তাঁর দখল কম নয়—সংযমের সঙ্গে অভিনয় করিলে তিনি অচিরে একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। তাঁর idea আছে,—এবং সে idea ফলাইবার যোগ্য শক্তি ও প্রতিভাও তাঁর আছে। অভিনয়ে তিনি একটু শান্ত ও মৃদু ভাব আনুন, এইটুকুই আমাদের অনুরোধ। রাহুসেনের ভূমিকা লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত গোকুল নাগ। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই তরুণ অভিনেতা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। রোগা বলিয়া তাঁহাকে রাহুসেনের ভূমিকায় তেমন মানায় নাই—তাঁহাকেও বুঝিয়া-সুঝিয়া ভূমিকা বাছিয়া লইতে হইবে। যুদ্ধের দৃশ্যও নেহাৎ সাজা-সাজা গোছের! পাছে কারো গায়ে আঘাত

লাগে, তাই খুব হুঁসিয়ার হইয়া সকলে যুদ্ধ করিয়াছে! তার ফলে যুদ্ধের দৃশ্য নেহাৎ . নির্জীব ঠেকিয়াছে।

ছবির Title সব চেয়ে ভালো খুলিয়াছে। মোটের উপর, এই চিত্রনাট্যখানি বাঙালীর গৌরবের বস্তু হইয়াছে। এখন এ কোম্পানি কোন ছবি তুলিতেছেন কি না জানি না—যদি নিশ্চেষ্ট থাকেন, তবে বড়ই আপশোষের কথা!

এগুলি ছাড়া আরো একটি বাঙালী কোম্পানি মাঝে মাঝে দেশী ছবি তোলেন। সে কোম্পানির নাম, অরোরা বায়োস্কোপ কোম্পানি। ইঁহারা স্থানীয় ব্যাপারের ছবি তোলেন। বাঙলা থিয়েটারের কয়েকটি নাটকের জন্য কয়েকটি দৃশ্য এবং 'রত্নাকর' ও 'বিদ্যাসুন্দর' ছবিতে তুলিয়াছিলেন। এ কোম্পানিতে ভালো অভিনেতার একান্ত অভাব। 'রত্নাকর' দেখিবার মত ছবিই নয়। 'বিদ্যাসুন্দরে' বাহাদুরী দেখিয়াছি এইটুকু যে,যে অংশ সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি আছে, সেটুকু সুকৌশলে পরিহার করিয়া ইঁহারা 'বিদ্যাসুন্দরের' খাঁটী রোমান্সটুকু ছবিতে ফুটাইয়াছিলেন। তবে অভিনয় তেমন জুৎসই হয় নাই—বিশেষ নায়ক সুন্দর একেবারে নির্জীব, এবং অ-চল। বিদ্যা মন্দ নয়, তবে আপত্তিকর ভাবে অনর্থক বিদ্যার অঙ্গাবরণ মাঝে মাঝে সরানো হইয়াছে, সেটা bad taste; অত্যন্ত কদর্য্য ঠেকে, অথচ তার কোন কারণও ছিল না। রাজা, রাণী, সখীর দল সেই মামুলি যাত্রার নিকৃষ্ট সংস্করণ! মালিনী খোলে নাই। ফটোগ্রাফিও যে খুব clear, তা নয়—মাঝে মাঝে ঝাপ্‌সা ঠেকে। এই সব দোষ কাটাইয়া তাঁরা ভালো লোক দিয়া ভালো ছবি তুলিবার চেষ্টা করুন, নহিলে অনর্থক পয়সা জলে ফেলিয়া কোন লাভ নাই, তাছাড়া বাজারে বদ নাম কেনাতেও কোম্পানির লাভ নাই।

শিবসুন্দর।

যন্ত্র-পরিচালিত শিল্পের ভবিষ্যৎ

বর্ত্তমান সভ্য যুগ বিশেষভাবে শিল্প-বাণিজ্যেরই যুগ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। যন্ত্রই এই শিল্প-বাণিজ্যের প্রধানতম সহচর হইয়াছে। ইহার সহায়ে শিল্প বাণিজ্য দিন দিন অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া পৃথিবীতে এক অভূতপূর্ব্ব যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। মানব জাতির পরম মানসিক বিকাশ রূপ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও নূতন যন্ত্রাদি উদ্ভাবনের দ্বারা শিল্প-বাণিজ্যের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কিন্তু এত শ্রীবৃদ্ধি সত্ত্বেও পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ শান্তির প্রতিষ্ঠায় বর্ত্তমান সভ্যতার কৃতকার্য্যতার তেমন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। ইতিমধ্যেই ইহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া পাশ্চত্য মনীষিগণ নিরাশ হইয়া পড়িতেছেন। বিলাতের অন্যতম মুখ-পত্র সুবিখ্যাত Nineteenth Century and After ("উনবিংশ শতাব্দী ও তৎপর") নামক পত্রিকায় ইহার মধ্যেই এ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। গত মার্চ্চ মাসের পত্রিকায় এই আলোচনা প্রকাশ পাইয়াছে। আলোচনাকারী মনস্বী লেখকের নাম পেন্টী (Penty)। অবাধ যন্ত্রচালিত শিল্পযোগে সমাজের মূল ভিত্তিই যে জর্জ্জরিত হইয়াছে তাহা পেন্টী মহোদয় দৃঢ়তা-সহকারেই বলিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে যন্ত্রের কার্য্যকারিতা দ্বারা শ্রমজীবীদের স্বাধীন উপার্জ্জনের পথ অবরুদ্ধ হওয়ার কুফলে সামাজিক সাম্যবাদাদলের Socialist অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। তিনি কার্ল মার্কস্ Karl mark নামক অপর একজন মনস্বীর মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যন্ত্র-প্রভাবে অর্থ সাধারণের হাত হইতে এক ব্যবসায়ী দলের হাতে কেন্দ্রীভূত হইবে এবং মজুরের সংখ্যা ক্রমেই বিপুলতর হইবে। নূতন নূতন শিল্প-যন্ত্রের উদ্ভাবনের সহিত ক্রমে অধিকতর শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হওয়াতে, এই সমস্ত দ্রব্যের জন্য অধিকতর খরিদ্দারেরও প্রয়োজন হইবে। এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত খরিদদারের পর আর যখন খরিদ্দার জুটিবে না, তখনই বেকার সমস্যা ঘোরতর রূপে দেখা দিবে। এই বেকার সমস্যার সমাধানের আর কোন আশা যখন দেখা যাইবে না, এবং বেকারদিগের দুঃখ-দুর্গতি বাড়িয়া যখন চরম সীমায় উপনীত হইবে, তখন তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কারখানা, মূলধন, শিল্পের

সরঞ্জাম ও ক্রয়-বিক্রয়ের বন্দোবস্ত প্রভৃতি সমস্ত দখল করিয়া বসিবে এবং সাম্যতন্ত্রের উপর নূতন ভাবে সমাজের গঠন করিবে। কলের দ্বারা স্বাধীন জীবিকাকে স্থানচ্যুত করার ইহাই একমাত্র প্রতিফল।

পেণ্টী বলেন, রাস্কিন (Ruskin) যে মত প্রচার করিয়াছেন যে, সর্ব্বনাশই যন্ত্রের শেষ ফল, তাহা এক্ষণে প্রমাণিত হইতেছে। কেবল সামাজিক ও অর্থনৈতিক গোলযোগেই যন্ত্রের পশ্চাৎ অনুসরণ করে। যন্ত্রের দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপ্লব উৎপাদিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সমরূপতাপ্রাপ্ত সমাজে বিষমরূপতা প্রবেশ করিয়াছে। সমাজ পূর্ব্বের ন্যায় আর সমষ্টিভূত নাই, এক্ষণে পরমাণু-পুঞ্জের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে ব্যাপিভূত হইয়াছে। লোক সকল যুগপৎ ধর্ম্ম, কলা ও প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হইয়াছে। পূর্ব্বের জনসাধারণের স্থলে এক্ষণে দরিদ্র সাধারণ সমাজে পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পরিশেষে ইহা আত্মসৃষ্ট সভ্যতারই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কারণ যুদ্ধ ব্যাপারে ইহার প্রতিক্রিয়াদ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে ইহা মনুষ্য ও তৎকৃত কার্য্যের সম্যক্‌রূপে ধ্বংস-সাধনে বিশেষ সহায়ক। এই সমস্ত সত্ত্বেও যন্ত্রশক্তি যে আমাদের সভ্যতাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিতেছে—ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও যে আমাদের সমাজনৈতিক ভাবুকগণ ইহাকে উপেক্ষা করার বিষয় মনে করেন, ইহা একান্তই বিস্ময়ের বিষয়!

এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে স্রোত এক্ষণেই ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতে, রুসিয়ায় এবং ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চলে যন্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। রুসিয়াতে বল্‌শেভিক-প্রাধান্যের পরাভবের পর, পূর্ব্ব-ইউরোপে রাজনৈতিক ক্ষমতা কৃষকদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বত্র যন্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা যন্ত্রশিল্পের প্রতি এরূপই ঘৃণার ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে সহর বা কারখানার কথা হইলেই লোকে ভূতের ভয়ে যেমন করে, তাহারা সে-রূপেই আপনাদের সামনে ক্রশ-চিহ্ন অঙ্কনের দ্বারা বিদ্বেষ ভীতির ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। আন্দোলন যে বিস্তার লাভ করিবে, তাহা অনিবার্য্য। কারণ মনুষ্য ও যন্ত্রের মধ্যে সমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পৃথিবীতে সম্প্রতি প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা-শক্তি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে ভারতে যে সূতাকাটার চাকা বা চরকার পুনরাবির্ভাব হইয়াছে তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়। এখানে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, যখন যন্ত্রকে আমাদের অধীন ও অনুগত করাই বর্ত্তমান যুগের প্রধান প্রশ্ন হইবে, সে সময় বেশী দূরবর্ত্তী নহে।

গ্রেট্ ব্রিটেনেও যে চিন্তার স্রোত এই দিকেই প্রবাহিত হইতেছে, তাহারও যথেষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। উপসংহারে পেণ্টী জীবন ও সমাজের সরলভাবে সকলের প্রত্যাবর্ত্তন ও কৃষির পুনরুদ্ধারই প্রতীকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ মানবজাতির পুনর্জ্জাগরণ ব্যতীত যন্ত্র ও জড়বাদকে আয়ত্তে আনয়ন করা, চিরকালের জন্য অসম্ভাবিত রহিবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে আমাদের দেশের বাহ্য-সম্পদের উপাসকরূপে নূতন কর্ম্মীদল স্বদেশে যন্ত্রশিল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাদের উৎকট সাধনার কিরূপ বিকট সিদ্ধি হইবে, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টান্ত দ্বারাই কি আমাদের জ্ঞানোদয় হওয়া উচিত নয়?

মনস্বী পেণ্টী যে পাশ্চাত্য যন্ত্র-শিল্পের ঘোর বিপ্লব হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কৃষিকর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনকে মহতী সাধনারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই দুইটী কি ভারতের সভ্যতার চিরন্তন মূলমন্ত্র নহে? এই মূল-মন্ত্রের অপূর্ব্ব সাধনা-বলেই ভারত ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের মধ্যে আশ্চর্য্য সমন্বয় সম্পাদন করতঃ প্রকৃত পুরুষার্থের একটী সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন আদর্শ পুষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। পৃথিবীতে এ-পর্য্যন্ত অন্য কোথাও এই পূর্ণাঙ্গ আদর্শের তুলনা পাওয়া যায় নাই।

বৈদেশিক আদর্শের পশ্চাদ্ধাবিত না হইয়া, নিজের আদর্শে নিজে ফিরিয়া আসা এতদপেক্ষা ভারতের আত্ম-রক্ষার অন্য প্রকৃষ্ট পন্থা আর হইতে পারে না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মুক্তি-পরশ

ক

ডালিমতলার জমিদার ইন্দ্রমোহন রায়ের কল্‌কাতার বাড়ীতে আজ কি একটা কাজ উপলক্ষে একটু বিশেষ রকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছে। সন্ধ্যা-বেলায় আত্মীয়-বন্ধু-সমাগত বাড়ীতে উঠানে ফরাস পেতে আসর তৈরি হয়েছে। আলোর মালা পরে বাড়ীখানি চঞ্চলা রূপসী তরুণীর মত যেন হাস্যে-লাস্যে বিভাষিত হয়ে উঠেছে।

ইন্দ্রমোহন মদের নেশায় রঙীন্ হয়ে একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে বোধ হয় আসন্ন-আগত বাইজীর রূপ ধ্যান করছিল। সে নিজে গিয়ে এই বাইজীকে ঠিক করে' এসেছে, গান গাইবার জন্যে। বাইজীর আসতে দেরী হচ্ছে দেখে সবাই একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঠিক এমনি সময় মোটরের ভেঁপু বাজিয়ে বাইজী এসে উপস্থিত হলো। চারিদিকে একটা সোর-গোল পড়ে' গেল। সকলেই ইন্দ্রমোহনের পছন্দের তারিফ্ করতে লাগ্‌লো। ইন্দ্রমোহন নিজে উঠে গিয়ে বাইজী লীলাকে অভ্যর্থনা করে' হাত ধরে' নিয়ে এসে আসরে বসিয়ে দিলে; তার পর নিজে গিয়ে বন্ধু-দলের মধ্যে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসে' পড়্‌লো। বন্ধুদলে তার সুখ্যাতির কূজন গুঞ্জরিত হয়ে উঠ্‌লো।

লীলা তার রূপের বিজলী ছড়িয়ে আসর জমিয়ে বস্‌লো। পরণে তার একটা সাদা ধব্‌ধবে রেশমী কাপড়, জরীর বুটি দেওয়া, আর গায়ে তারই মিল-করা কাপড়ের জামা। তাকে এই বেশে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল! চোখ তার লীলা-চঞ্চল। মুখে তার চঞ্চল হাস্যের লীলা-তরঙ্গিত ভাব। লীলা কয়েকটা হিন্দী-বাংলা গান গাইবার পর গান ধর্‌লে,—

দিবস-রজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি!
(তাই) চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,
তৃষিত আকুল আঁখি!

গান শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই হঠাৎ তার চোখ পড়্‌লো গিয়ে উঠানের এক কোণে এক চেয়ারের উপর—সেখানে বসে' ছিল ইন্দ্রমোহনের এক বন্ধু শচীন্দ্র, তার যৌবন-দেহের সুগৌর ভাস্বর জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয়ে। লীলা কিছুক্ষণ চোখ ফেরাতে পার্‌লে না সেদিক্ থেকে। তার রূপ সে দেখেনি। রূপ সে অনেক দেখেছে, কারণ রূপের বাজারে কেনা-বেচা করাই ত হচ্ছে তার কাজ। সে দেখ্‌ছিল, যে, সকলের মুখেই একটা হর্ষের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কেবল এই ব্যক্তির মুখেই কি এক বিরক্তি ও করুণার মিশ্র-ভাব খেলা করে' বেড়াচ্ছে। এক পাশে চুপ করে সে বসে আছে। তার এই মুখের ভাব, কি জানি কেন, লীলার বুকে যেন কিসের ধাক্কা দিলে! সে হঠাৎ কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়্‌লো। গান আর সেদিন তেমন জম্‌লো না।

গান-শেষে যখন ইন্দ্রমোহন লীলাকে নিয়ে বৈঠক-খানা-ঘরে উঠে' গেল একটুখানি স্ফূর্তি জমাবার জন্যে, তখনো লীলার মনটা ঠিক তেমনি অবস্থায় আছে। সে ভাব্‌ছিল, কত লোকের কত মুখ কত ভাবেই তার চোখের সামনে এসেছে···,কিন্তু আজ এ কি জ্বালা! মন যে তাকে কেবলই চাবুক মার্‌ছে! মনের এই ভাব দমন কর্‌বার জন্যে সে মদ খেতে লাগ্‌লো গেলাসের পর গেলাস।

হঠাৎ লীলা বলে' উঠ্‌লো ইন্দ্রমোহনের গলা জড়িয়ে,—ঐ উঠোনের চেয়ারে-বসা বাবুটিকে ঘরে ডেকে আনো না ভাই। বলে আঙুল দিয়ে শচীন্দ্রকে দেখিয়ে দিলে।

ইন্দ্রমোহন স্খলিত কণ্ঠে বল্‌লে,—ও অরসিকটাকে ডেকে কেন এ আসরটা মাটী কর্‌বে বিবি! তার পর একটু থেমে বল্‌লে,—তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন ডাক্‌ছি। বলে' ইন্দ্রমোহন চাকরকে শচীন্দ্রকে ঘরে ডেকে আন্‌তে বল্‌লে।

এক দিন ছিল, যখন এই শচীন্দ্র না হলে ইন্দ্রমোহনের একদিনও চল্‌তো না। তার পর কালের চক্র-পরিবর্ত্তনের ফলে ইন্দ্রমোহন পতনের ধাপে ধাপে একটু একটু করে' একেবারে চরম সীমায় নেমে গেছে, শচীন্দ্র তাকে সাম্‌লাতে পারেনি। বিরুদ্ধ গতিকে প্রতিহত কর্‌তে হলে বিশেষ রকমের জোর দর্‌কার। সে জোর শচীন্দ্র প্রকাশ কর্‌তে পারেনি। ইন্দ্রমোহনের এখন অনেক বন্ধু জুটেছে, তবুও শচীন্দ্র তাকে ছাড়্‌তে পারেনি—কিসের টানে—তা ঠিক বলা যায় না।

ইন্দ্রমোহনের ডাকে শচীন্দ্র ঘরে যাবে কি না-যাবে ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘরে এসে ঢুক্‌ল—অম্‌নি লীলা স্খলিত আলুথালু বস্ত্রে টল্‌তে টল্‌তে উঠে এসে শচীন্দ্রর গলা জড়িয়ে ধরে' নেশা-জড়িত কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লো,—বসো না ভাই একটুখানি এইখানে। সত্যি বল্‌ছি, কিচ্ছু খারাপ হবে না। বলেই লীলা উচ্ছৃঙ্খলভাবে হেসে উঠ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে মাতালের দলও উচ্চ হাস্যে ঘর মুখরিত করে' তুল্‌লে। শচীন্দ্র লীলার চোখের উপর একটা করুণা-ভরা দৃষ্টি হেনে, আস্তে আস্তে তার গল-বেষ্টিত লীলার হাত দুটো খুলে দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লীলাকে বল্‌লে—যেদিন সত্য ছোঁবার অধিকার নিয়ে 'তুমি' হয়ে ছুঁতে পার্‌বে, সেই দিন ছুঁতে এসো—তার আগে নয়।—বলে' যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে, ঘর থেকে সে বেরিয়ে চলে' গেল।

লীলার মনটাকে কে যেন আছাড়ে-পট্‌কার মত মাটিতে সজোরে আঘাত কর্‌লে এবং তারই তীব্র শব্দে সে ভয়-বিহ্বল চকিত হয়ে মাটীর উপর থপ্‌ করে' বসে' পড়্‌লো—তার নেশা তখন একেবারেই ছুটে গিয়েছে। নিশ্চল হয়ে চুপ করে' সে বসে' রইলো।

মাতালদের মধ্যে থেকে একজন বলে' উঠ্‌লো,—তখনি তো বলেছিলাম বিবি, যে, ওটাকে ঘরে এনো না, সব পণ্ড করে' দেবে, তা তো শুন্‌লে না। এখন এমন আসরটাই মাটী করে' দিয়ে গেল! আবার তোমার অপমানও করে' গেল।

আর একজন টল্‌তে টল্‌তে উঠে' এসে লীলার পা দু'টো জড়িয়ে ধরে' ভেউ ভেউ করে' কেঁদে উঠে' বল্‌লে,—ও অবোধ। তোমার মর্য্যাদা বুঝ্‌তে না পেরে অপমান করেছে। ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি, ওকে ক্ষমা করো।—বলে' তেমনি কাঁদতে কাঁদ্‌তে তার পা দু'টো আরও জোর করে' জড়িয়ে ধর্‌লে।

লীলার তখন এ-সব মাতলামী কাণ্ডের দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্‌বার মত মনের অবস্থা ছিল না। সে তার পা দু'টো মুক্ত করে' কাউকে কিছু না বলে' সোজা গিয়ে পূর্ব্ব-নিযুক্ত মোটর-গাড়ীতে উঠে' বল্‌লে,—'চালাও।' তার পরই অবসন্নের মত গাড়ীর উপর শুয়ে পড়ে' ভাব্‌তে লাগ্‌লো, কেন আজ হঠাৎ তার এ রকম মনের অবস্থা হলো! উপেক্ষা তো কত লোকের কাছ হতে কতবার কত রকমে পেয়েছে; কিন্তু আজ এই উপেক্ষা তাকে এত জোরে আঘাত কর্‌লে কেন! উপেক্ষা তাকে তো অনেকের কাছ হতেই পেতে হয়, কারণ সে যে ঘৃণিতা, পতিতা। আজকের এই ঘটনা তাকে যেমন হঠাৎ সজাগ করে' দিলে, এমন আর কোনো দিন হয় নি।

মানুষের চিত্তের দুর্ব্বলতাই এইখানে। সে যে কখন্ কোন্ সময়ে একটুতেই নিজের সব মতটা বদ্‌লে ফেলে, তা ঠিক বোঝা যায় তখন, যখন সেটা সম্পূর্ণ বদ্‌লে গিয়ে অন্য ছাঁচে অন্য রকম হ'য়ে দাঁড়ায়। তখনই মনের কাছে নিজের কাছে এই অদল-বদল বড়-হয়ে ধরা পড়ে এবং মনকে কখনো আনন্দোৎফুল্ল করে, কখনো বা বিষাদপীড়িত করে' তোলে। সময় সময় ফল ভাল হয়, আবার মন্দও হয়। এ-সব জেনেও কিন্তু তাকে রোধ কর্‌বার ক্ষমতা মানুষের থাকে না। থাক্‌লে হয়তো নিজেকে ঠিক সময়েই সাম্‌লানো যেতো। কিন্তু মানুষের ক্ষমতা কতটুকু! তার দুর্ব্বলতার পরিচয় সে নিজেই! কাজেই তাকে এই-সমস্ত আবিষ্কার নির্ব্বিচারে সহ্য কর্‌তে হয়, নিতান্ত উপায়বিহীন হয়ে।

খ

সন্ধ্যার ধূসর আলো পৃথিবীর বুকের উপর যেন মশারির মত বিছিয়ে পড়্‌ছিল। লীলা তার বাড়ীর ছাদের উপর পায়চারি করে' বেড়াচ্ছিল। মনটা ভারী খারাপ হয়ে

ছিল সেইদিন থেকে। তাই নিজেকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্য সে ছাদে উঠে একলা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। একলাও ভাল লাগ্‌ছিল না, অথচ লোকের সঙ্গও কেমন বিরক্তিকর মনে হচ্ছিল। হঠাৎ সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আপন-মনে গুন্‌গুন্ করে' গান ধর্‌লে,—

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে—
তাই আকাশ-কুসুম করিনু চয়ন
হতাশে।

গান-শেষে লীলা একটা মাদুরের উপর শুয়ে পড়্‌লো। চারিদিকে তখন বুক-চাপা অন্ধকার জমে' উঠেছে। লীলার মনটাও সেদিন থেকে এই রকম একটা অন্ধকারের বাসা হয়ে উঠেছে। সে অন্ধকার কি ভীষণ, আর কি গাঢ়! কোথাও দিয়ে একটু আলো দেখা যায় না। সে অন্ধকারের কেবলই দাহ কর্‌বার শক্তি আছে, শান্তি দেবার ক্ষমতা নেই,—সে অন্ধকার যেন দহনের কালো দাগ। তার মনের অন্ধকারের তুলনায় এই বাইরের অন্ধকার যে কত তুচ্ছ, তা ধারণা করা যায় না।

লীলা শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছিল,—চিরদিনই কি তার এমন দশা ছিল! আজ না হয় সে এই পাপের পঙ্কিল জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে হাঁফিয়ে উঠেছে; কিন্তু চিরদিন তো এরকম ছিল না। আর এর জন্যে সেই বা কতটুকু দায়ী! তার সরল মনের উপর বিশ্বাসের ছাপ ধরিয়ে দিয়েই না তাকে আজ এই অবস্থায় এনে ফেলেছে। নইলে কে জানে, কি অবস্থায় আজ তাকে থাকৃতে হতো।

লীলা ছিল মায়ের একমাত্র মেয়ে। এক পল্লীগ্রামের শুভ্র সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, যেন স্বচ্ছ ক্ষীণ উদ্দাম নদীটি! গরীবের মেয়ে হয়ে জন্মেছিল সে, কিন্তু রূপ পেয়েছিল রাজা-জমিদারের ঘরের মেয়ের মত। বাপকে সে কখনো দেখেনি। মায়ের শান্তিময় কোলের আড়ালেই বড় হয়ে উঠেছিল। তার মা ছিলেন বিদুষী। মেয়েকেও তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন তাঁর নিজের পুঁজি শূন্য করে'।

বয়সে যদিও লীলা বড় হয়ে উঠেছিল, তবু মনটা তার মোটেই বয়সের উপযুক্ত হয়ে গড়ে' ওঠেনি। সেটা যেমন সরল ছিল, তেমনি মধুর। কোথাও এতটুকু কপটতার লেশ মাত্র ছিল না। মনটা তার কোনো জিনিষের ভাল-মন্দ বিচার কর্‌বার ক্ষমতার বাইরে ছিল। ঠিক যেন দেব-পূজার জন্য সজ্জিত সুগন্ধি একটি নির্ম্মাল্য! এতটুকু অপরিষ্কার, এতটুকু মলিনতাও যেন সেখানে থাকৃতে পারে না, এমনি শুভ্র সে! আর এত মসৃণ যে তার উপর দাগ পড়ে না; কিন্তু যখন পড়ে তখন বেশ গভীর হয়েই পড়ে; সে দাগ আর ওঠে না।

সেদিন কাল-বৈশাখের রুদ্র অপরাহ্ণ। সমস্ত আকাশে মেঘ জমে উঠেছে। চারিদিকে একটা থম্‌থমে ভাব—যেন একটা বিরাট তাণ্ডব-নৃত্যের আয়োজন চলেছে। সেই নৃত্যের চরণাঘাতে সমস্ত ওলোট-পালট হয়ে যাবে, কেবল আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি বলেই যেন এতক্ষণ সুরু হতে দেরী কর্‌ছে।

লীলার জীবনেও সেইদিন থেকেই কাল-বৈশাখের সূত্রপাত। বৃষ্টি যখন আকাশে আসন্ন হয়ে উঠেছে, ঠিক এমনি সময় লীলার মা তাকে বল্লেন,—ওরে লীলা, আমাদের গরুটা এখনো বাড়ী আসেনি। যা না মা, সেটাকে খুঁজে নিয়ে আয় না। নইলে আবার অবেলায় ভিজ্‌বে।

লীলাও তো তাই চায়। এই কথা শুনে তার মন মেঘ-দেখে-নৃত্যশীল ময়ূরের মত নৃত্য করে উঠলো। 'যাচ্ছি মা'—বলেই কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে দৌড়ে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল বিদ্যুতের মত একটা চমক হেনে।

লীলা যখন গরুটাকে খুঁজে তাদের বাড়ীর পিছনের বাগানে এসে পৌচেছে, ঠিক এমনি সময় প্রবল বেগে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হলো। ঝড় ও বৃষ্টি যেন একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই পৃথিবীতে নেমে পড়্‌লো। গরুটা নিজেকে বৃষ্টি-ঝড়ের হাত হতে রক্ষা করবার জন্যে টানাটানি আরম্ভ করলে। লীলা গরুর সঙ্গে আর ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই কর্‌তে কর্‌তে ক্রমেই যেন অবশ হয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। বৈশাখ যেন নিজে রুদ্র মূর্ত্তি ধরে' বালিকাকে জব্দ কর্‌তে এসেছেন—কি দোষে, তা তিনিই জানেন।

এমনি সময় বৃষ্টি-ঝড়ে আলু-থালু-বেশ এক ব্যক্তি এসে এক হাতে গরুর দাড়টা লীলার হাত থেকে নিয়ে আর-এক হাতে লীলার হাত ধরে' বল্‌লে,—চল, তোমাদের বাড়ী কোন্‌টা, দেখিয়ে নিয়ে চল। তোমায় পৌছে দিয়ে আসি।—বলে' লীলার হাত ধরে' অগ্রসর হলো।

লীলাকে গরু আন্‌তে পাঠিয়ে অবধি লীলার মার মন খাঁচায়-বন্ধ পাখীর মুক্ত হবার নিষ্ফল প্রয়াসের মত কেবলই ছট্‌ফট্‌ করেছে।

লীলা যখন বাড়ী এসে ঢুক্‌লো, তখন তিনি তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে' তার সেই সিক্ত মুখে একটা চুম্বন করে' তাড়াতাড়ি একটা গামছা এনে তার গা মুছিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। মেয়েকে নিয়ে তিনি এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, সেখানে যে আর-একজন অপরিচিত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে, তা তাঁর নজরেও পড়ে নি।

লীলা তাঁকে বল্‌লে,—মা, আজ কি বিপদেই পড়েছিলুম। ইনি যদি না থাক্‌তেন, তাহ'লে যে কি হতো, বল্‌তে পারি না।—বলে' সেই লোকটির দিকে দেখিয়ে দিলে।

লীলার মা সেই দিকে তাকাতেই লোকটি তাঁর পায়ের কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে' বল্‌লে—আমায় চিন্‌তে পার্‌বেন না মাসিমা। আমি কল্‌কাতায় থাকি। হরগোবিন্দ রায়ের ভাগ্‌নে আমি, আমার নাম শশাঙ্ক।

গ্রামের জমিদার হরগোবিন্দ রায়ের ভাগ্‌নে—শুনে, আর কতকটা এই পরিচিতের মত ঘনিষ্ঠতা দেখে, লীলার মা তাড়াতাড়ি লীলাকে বল্‌লেন,—যা তো মা, একখানা শুক্‌নো কাপড় আর গামছা নিয়ে আয় তো। বাছা সেই থেকে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখ্‌তে পাইনি। বলে' লীলাকে কাপড় গামছা আন্‌তে পাঠিয়ে নিজে শশাঙ্কর জল-খাবারের জোগাড় করতে চলে' গেলেন।

শশাঙ্ক যদিও যৌবনের মায়া-রাজ্যে প্রবেশ করেছিল, তবুও তার দেহে কেমন একটা মাধুর্য্যের অভাব ছিল। লম্বা ছিপ্‌ছিপে, রংটা সাধারণের চেয়ে একটু ফর্‌সা। মাথায় এক-মাথা লম্বা চুল ঢেউ খেলিয়ে আঁচ্‌ড়ানো। চোখে এক-জোড়া বড় বড় কাঁচকড়ার বেষ্টনীতে বাঁধা চশ্‌মা। স্বভাবটা একটু মেয়েলি ধাঁচের। সেটা সে বেশ গৌরবের মনে কর্‌তো। কলের চিম্‌নীর মত তার মুখ দিয়ে অনবরত সিগারেটের ধোঁয়া বের হচ্ছে। তারপর লুকোন-চোরান যে আরও দু'-একটা বিশেষ গুণ ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

সেই দিন থেকেই লীলাদের বাড়ীতে শশাঙ্কর যাওয়া-আসা ক্রমশই বেড়ে উঠ্‌লো। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের ভিতর দিয়ে ঘনিষ্ঠতা বেশ জমে' উঠ্‌লো। শশাঙ্ক লীলাকে কোনো দিন একখানা বই, কোনোদিন কাপড় জামা, এই রকম নানা রকমের জিনিষ উপহার দিয়ে তার মনকে ক্রমেই তার দিকে ঝুঁকিয়ে নিয়ে আস্‌ছিল। লীলার মা প্রথম প্রথম একটু আপত্তি করেছিলেন; কিন্তু তার উত্তরে শশাঙ্ক এমন একটা ঘনিষ্ঠতার জবাব দিয়েছিল যাতে তাঁকে বাধ্য হয়েই চুপ করতে হয়েছিল! লীলার শিশু-সরল মন কোনো রকম ভাল-মন্দর খবর রাখ্‌তো না। সে নিত্য নূতন জিনিষ পেয়ে বেশ খুসীই হয়ে উঠ্‌তো। শশাঙ্ককে তার বেশ ভালই লাগতো। অবশ্য ভালবাসা বলে' যে জিনিষটা, সেটা ঠিক করে' বোঝ্‌বার মত মনের অবস্থা তার তখনো হয়নি। শশাঙ্কর নিত্য নূতন উপঢৌকন ও তার গল্প লীলার বেশ লাগ্‌তো, এই পর্য্যন্ত।

সেই বেশ-লাগাটুকুই হয়েছিল তার জীবন-আকাশের কোলে কাল-বৈশাখীর জমাট-বাঁধা কালো মেঘ। সেই মেঘের কোলে লুকোনো বজ্রের মরণ-আঘাতেই তার জীবনটা ধ্বংস ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

মানুষের প্রকৃতি চেনা বড় কঠিন ব্যাপার। প্রত্যেক মানুষেরই মনের এমন একটি গোপন অংশ আছে, যা সকলের কাছেই গোপন। এমন কি তার নিজের কাছেও সেটা ধরা পড়ে না অনেক সময়। সেই গোপন অংশটুকুর জন্যই অনেক সময় সৎ-অসৎ নানা ব্যাপার ঘটে' যায়।

লীলার মা যদি সেই সময় শশাঙ্ককে দেখে একটু সতর্ক হতেন তা হ'লে হয়তো কোনো গোলই হতো না। সেইখানেই তিনি মস্ত-বড় একটা ভুল করেছিলেন। কিন্তু তাঁরই বা দোষ কি,—যেটা ভুল, সেটা যে চিরদিনই ভুল। সেটা

যদি ভুল না হয়ে সত্য হতো, তা হলে তো কোনো গোলই হতো না!

লীলার কাছে শশাঙ্ক প্রায়ই কল্‌কাতার মনমুগ্ধকর গল্প বলে' তাকে প্রলুব্ধ কর্‌তো। লীলার মনে এই গল্প একটা মায়া-রাজ্যের সৃষ্টি করে' তুলেছিল। তার মনে হতো, আমি যদি একবার সেখানে যেতে পারি তো বেশ হয়, কত জিনিষ দেখি!

লীলার মন যখন এমন অবস্থায় এসেছে, এমনি সময় একদিন শশাঙ্ক লীলাকে নিভৃতে পেয়ে এ-কথা সে-কথার পর বল্‌লে,—লীলা, কাল আমি কল্‌কাতা যাবো—তুমি যাবে আমার সঙ্গে? লুকিয়ে যেতে হবে কিন্তু—মাকে বল্‌লে তিনি যেতে দেবেন না। তারপর লীলার হাত দু'টো দু হাতে চেপে ধরে' বল্‌লে,—আর আমি তোমায় সেখানে নিয়ে গিয়ে বিয়ে কর্‌বো—কেমন রাজী তো?

বিয়ের কথা শুনে লীলার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌লো, আবার আনন্দও হলো কল্‌কাতা যাবার কথা শুনে। সে আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে' জানালে, সে যেতে রাজী আছে।

শশাঙ্ক বল্‌লে,—তুমি কাল রাত্রে ঠিক হয়ে থেকো, আমি লুকিয়ে নিয়ে যাবো। বলে' শশাঙ্ক চলে গেল।

গ

কল্‌কাতায় এসে লীলার দিনগুলো আনন্দের ঢেউ-খেলানো রাস্তা দিয়ে বেশ কেটে যাচ্ছিল। আজ এখানে, কাল সেখানে গিয়ে, নানা জিনিষ দেখে দিন কাট্‌ছিল। সব-চেয়ে তার আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল, সে যে বাড়ীটায় এসে উঠেছিল সেই বাড়ীটার লোকজনদের আচার-ব্যবহার—তাদের সে কিছুতেই ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌তো না। বাড়ীতে মেয়ের দলই বেশী। দিনের বেলা পুরুষ দৈবাৎ দু'একজন দেখ্‌তে পেতো। কিন্তু যত বেলা পড়ে' আস্‌তো, ততই তার বিস্ময়কে বাড়িয়ে মেয়ের দলে পরিপাটী বেশ-ভূষা কর্‌তে বস্‌তো আর পুরুষের আনা-গোনা বেড়ে উঠ্‌তো। তারপর গান-বাজ্‌না চীৎকার গালাগাল বমি করা—নানা রকমের ব্যাপার সে শুন্‌তে ও দেখতে পেতো। তার এ-সব কেমন বিসদৃশ ঠেক্‌তো, অবাক্ হয়ে তাদের দিকে সে চেয়ে থাক্‌তো। তার সঙ্গে সবাই আলাপ কর্‌তে' চাইতো, সে কিন্তু কি একটা অবুঝ ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতো, কারো সঙ্গে কথা কইতো না। তবু সে সব সময় রেহাই পেতো না তাদের অত্যাচার থেকে।

একদিন লীলা শশাঙ্ককে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—আচ্ছা, ওরা কারা, বল না? দিনের বেলা কোনো পুরুষ দেখ্‌তে পাই না, আর রাত্রি হলেই সব এসে অমন চীৎকার করে কেন? আমার বড় ভয় করে। তুমি সমস্ত দিন থাকো না, আমি কেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকি।

শশাঙ্ক বল্‌লে,—ওদের স্বামীরা সব দিনের বেলায় কাজ করে, আর রাত্রে বাড়ী এসে একটু আমোদ-আহ্লাদ করে। এতে আর ভয় কি! আর সয়ে গেলে তুমিও আমার সঙ্গে ঐ রকম কর্‌বে। চাই কি ওদের সঙ্গেও সমানে তাল দিতে পার্‌বে।—বলে' শশাঙ্ক একটা বিশ্রী সুরে হেসে উঠ্‌লো।

লীলার গাটা কেমন অজান্‌তে শিউরে উঠ্‌লো। মনে হলো তার—মাগো মা! এই রকম বেহায়াপনা লোকে কর্‌তে পারে নাকি? জানিনা, ওরা কি রকম। আমি কখ্‌খনো ও-রকম পার্‌বো না।

বিধাতা হয়তো তার এই ভাবনা দেখে অলক্ষ্যে তখন হাস্‌ছিলেন!

শশাঙ্ক ক্রমশ নিজ-মূর্ত্তি ধারণ কর্‌তে লাগ্‌লো। আজ-কাল প্রায়ই মদ খেয়ে এসে মাত্‌লামী কর্‌তো। লীলার ভারী ভয় কর্‌তো—সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে চুপ করে থাক্‌তো। কতদিন বারণ করেছে, তাতে শশাঙ্ক তাকে এমন ভয়ানক জঘন্য বিদ্রূপ করেছে যে, লীলার সমস্ত দেহের রক্ত মুখে এসে জড়ো হয়েছে। কিন্তু শশাঙ্কর অত্যাচার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এত বেড়ে উঠ্‌তে লাগলো যে লীলাও ক্রমশ বুঝ্‌তে লাগলো যে, এতটা ভাল নয়, এর নীচে নিশ্চয় একটা কিছু মন্দ লুকোনো আছে।

এই-সমস্ত অত্যাচারের ধাক্কা খেতে খেতে লীলার নারী-প্রকৃতি ক্রমশ সজাগ হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সে নিজেই বুঝ্‌তে লাগ্‌লো যে, সে এমন একটা অন্যায় করেছে যার জন্যে তাকে সারা জীবন এক ঘৃণ্য ধিক্কারভরা রাস্তা দিয়ে

ভারাক্রান্ত জীবনটাকে অলস মন্থর গতিতে টেনে নিয়ে যেতে হবে। তার মন এজন্য তাকে ছি-ছি কর্‌তে লাগ্‌লো। ঘুম ভাঙার পরই যেন সে একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতিতে চম্‌কে উঠ্‌লো।

তার পর তার মায়ের কথা মনে পড়্‌লো। কি ব্যথাই না দিয়েছে সে তাঁর প্রাণে! কিন্তু এক সান্ত্বনা যে তিনি তার দেওয়া ব্যথা হতে মুক্ত হয়ে ব্যথা-হরণের পায়ে ব্যথা জানাতে চলে গেছেন।

সব-চেয়ে সে সজাগ হয়ে উঠ্‌লো, যেদিন সে জান্‌তে পার্‌লে, বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, সে আজ মাতৃত্বের দায়িত্ব-পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিতা হতে চলেছে। সেইদিন তার প্রাণটা আকুল হয়ে বিশ্বপ্রকৃতির কোলের উপর আছাড় খেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌লো। কিন্তু সহানুভূতি সে কোথাও থেকে পেলে না, এতটুকুও।

শশাঙ্ককে বিয়ের কথা বল্‌তেই সে বিকট চীৎকার করে' হেসে উঠে' বল্‌লে,—বেশ্যার সঙ্গে বিয়ে? এ যে হাসালে লীলা। আমার সমাজের ভয় আছে তো। এ কথা দু' দিন আগে বলনি কেন, তাহলে সাবধান হতাম। আজকেই তোমার সঙ্গে আমার শেষ। এই টাকা রইলো—যতদিন আর কেউ না জোটে,ততদিন এতেই বেশ চল্‌বে। তোমাকে কষ্ট দেবো, এতটা অভদ্র আমি নই।—বলে' পকেট থেকে এক-তাড়া নোট বের করে' লীলার গায়ের উপর ফেলে দিয়ে ঘর থেকে সে চলে গেল, লীলার প্রাণটাকে থেঁৎলে দলিত পিষ্ট করে'।

লীলা মাটির উপর বসে' পড়্‌লো। কোনো প্রতিবাদ, কোনো যুক্তি তার মুখ দিয়ে বের হলো না। আর বের কর্‌তে ইচ্ছেও কর্‌লে না। যে এত বড় বিশ্বাসের এই রকম প্রতিফল দেয়, তার কাছে যুক্তির মূল্য কি? তার সমাজের ভয় আছে—সে চলে' গেল অম্লান বদনে সমাজের উচ্চাসনে বস্‌বার জন্য! কিন্তু সে কি পার্‌বে সমাজে ফিরে ঐ রকম করে' চল্‌তে ফির্‌তে! না, পার্‌বে না। সমাজ তা হলে তাকে চোখ রাঙিয়ে তাড়া করে' আস্‌বে। কারণ, সেখানে তারাই দলপতি, যারা এই অনিষ্টের মূল। তারা তো ভুলেও ভাব্‌বে না যে, কার দোষে আজ তার এই অবস্থা, আর সেই বা কতটুকু দোষে দোষী, যার জন্যে তাকে আজীবন পাপের পসরা মাথায় নিয়ে বেড়াতে হবে। তারা পীড়ন কর্‌তে জানে শুধু তাকেই যে বেশী করে' পীড়িত! ব্যথার স্থানে আঘাত করাই তাদের কাজ।

শশাঙ্কর দেওয়া নোটের তাড়াটা যেন তার গায়ে আগুনের হল্‌কার মত লাগ্‌লো। মনে হলো, যেন সেখানটা পুড়ে' গেল, সেদিকে সে ফিরেও তাকালে না, তেমনি করে' বসে' রইলো।

লীলা যখন এই রকম করে' বসে' আছে, আর তার গত জীবনের এলো-মেলো পাতাগুলো উল্টে দেখ্‌ছে, ঠিক এমনি সময় তার পাশের ঘরের বেলা এসে ঘরে ঢুকে তাকে বল্‌লে,—হ্যাঁরে লীলা, তোর বাবু অমন রাগ করে' চলে গেল কেন রে? ঝগড়া করেছিস্ বুঝি? তা ভাবিস্ নে, অমন কত আস্‌বে কত যাবে। তা বলে' কি অত ভাব্‌তে গেলে চলে!—বলে' একটু সহানুভূতি জানাতে কাছে এগিয়ে আস্‌তেই লীলা বোমার মত ফেটে উঠে চীৎকার করে' বলে' উঠ্‌লো,—বেরোও আমার ঘর থেকে, আমি চাই না ও-সব শুন্‌তে।—বলে' বিদ্যুতের হঠাৎ-ধাক্কায় মানুষ যেমন হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি করে' লাফিয়ে উঠে বেলার মুখের কাছে এসে দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে লীলা বল্‌লে,—ওগো যাও, যাও, যাও। আমায় আর জ্বালাতে এসো না তোমরা সবাই এমন করে'।

অত দেমাক ভাল নয় লো, ভাল নয়। আমাদেরও একদিন ছিল, কিন্তু তোর মতন এমন দেখিনি—মাইরি।—বলে' বেলা মুখটা বেঁকিয়ে ঘাড়টা ঘুরিয়ে দুম্-দুম্ করে' ঘর থেকে চলে' গেল।

বেলা ঘর থেকে চলে' যেতেই লীলা দোরে খিল দিয়ে মাটীর উপর লুটিয়ে পড়্‌লো—নিজেকে আর সোজা করে' রাখতে পার্‌লে না। তার উচ্ছ্বসিত কান্না দু'চোখে শ্রাবণের ধারা বইয়ে দিলে। সবাই মিলে তাকে এ রকম করে' কেন থেঁত্‌লাচ্ছে! কি দোষ করেছে সে, যার জন্যে তাকে এমন কঠোর শাস্তি পেতে হচ্ছে!

তার মনে হতে লাগ্‌লো, বাড়ীর প্রত্যেক লোকটা হতে আরম্ভ করে' দরজা-জান্‌লাগুলো পর্য্যন্ত সমস্ত সজীব নির্জীব পদার্থ আজ তাকে ব্যঙ্গ কর্‌ছে, হাস্‌ছে, আর তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌ছে,—ঐ, ঐ সে! যে এত বোকা যে, কুটিলতাকে সরল ভেবে তাকে আশ্রয় করে' নিয়েছিল। আর তার ফলে পেয়েছে—উপেক্ষা, আর ঘৃণা, আর বিদ্রূপ! ইচ্ছা হলো, জীবনটার শেষ করে' দিতে আত্মহত্যা করে'। কিন্তু তখনি ভাব্‌লে, না, সে নিজে দোষ করেছে বলে' তার সন্তান কিসের দোষী! তার কি অধিকার আছে, তাকে নষ্ট কর্‌বার! আত্মহত্যা হতে পারে না।

তখনি আবার মনে পড়্‌লো, তার সন্তান কি লোকের কাছে মুখ তুলে বেড়াতে পার্‌বে! না, তা তো পারবে না! একের দোষের বোঝা যে তাকেও বইতে হবে, কেন না, সে এই অভাগিনীকে অবলম্বন করেই পৃথিবীর বুকের উপর খেলা কর্‌তে আস্‌ছে! সেখানে তো তাকে ইট-পাথরে হোঁচট্ খেতে হবেই। মুক্ত সরল পথ যে তার সাম্‌নে বন্ধ।

অন্তর ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লো—হে ভগবান্, তোমার দান তুমিই নিয়ে নাও, প্রভু! চাই না আমি, আমার জন্যে ও বিনা-দোষে কলুষিত জীবন দুর্ব্বহভাবে বহন করে' বেড়াবে! ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আমায় মুক্তি দাও প্রভু! জানি আমি, অন্যায় প্রার্থনা আজ আমার বুকের সকল ব্যথাকে এক করে' তোমার পায়ে জানাচ্ছি; কিন্তু এ ছাড়া তো আর কোনো উপায় নাই প্রভু! আমার হৃদয় যে ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে আস্‌ছে।

ভগবান্ বোধ হয় তার সে প্রার্থনা কানে শুন্‌লেন। তার কোল শূন্য করে' ছেলেটিকে নিজের কাছে তিনি টেনে নিলেন। সেদিন লীলার কি কান্না ছেলেটিকে বুকে করে! ওরে, কেন তুই এ হতভাগিনীর কাছে এসেছিলি, তার কলুষিত জীবনে পুণ্যের আলো দেখাতে!

তার মনে হলো, বেশ হয়েছে, এইবার সে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত। এইবার আত্মহত্যা করে' নিজেকেও মুক্তি দেবে। কিন্তু কাজে তা পার্‌লে না। কোথা থেকে কেমন করে' নানা চিন্তা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে' বাধা দিতে লাগ্‌লো।

তারপর তার নিজের জীবনের সঙ্গে সে কি যুদ্ধ চল্‌লো, নিজেকে রক্ষা কর্‌বার জন্য। সে যেখানেই যে-ভদ্রলোকের বাড়ীতে কোনো কাজের জন্য গেছে, সেখানেই সে পেয়েছে কেবল তীব্র বিদ্রূপ আর জঘন্য উপদেশ। সকলেই তার রূপের ভক্ত! সকলেই তার রূপটাকে ভোগের সামগ্রী কর্‌তে চায়! যেখানে যায়, সেইখানেই কেবল রূপের প্রশংসা! এইজন্য সে প্রথম প্রথম কোথাও বিশ্বাস করে' স্থির হয়ে কাজ কর্‌তে পার্‌তো না। কিন্তু ক্রমাগত রূপের প্রশংসা শুন্‌তে শুন্‌তে তার মনটাও ক্রমে কেমন আত্ম-বিহ্বল হয়ে পড়্‌লো।

মানুষের মনে যখন একটা প্রবল ধাক্কা লাগে, তখন সে হয় ভালর দিকে নয় মন্দর দিকে ফিরে দাঁড়ায়। আর সেই সময় সাম্‌নে যাকে পায়, তাকে অবলম্বন করে' তার অনুযায়ী হ'য়ে চল্‌তে থাকে।

এমনি সংশয়-দোলায় যখন তার মন দুল্‌ছে, ঠিক এমনি সময় তার ঘরে ইন্দ্রমোহনের আবির্ভাব। সেই প্রথম দিক্‌টা লীলার কি গা-ঘিন্‌ঘিনের দিনই গেছে! তারপর সব ক্রমে সয়ে গেছে। আজ সে কল্‌কাতার শ্রেষ্ঠ বাইজী! তার নাম সকলের মুখে মুখে। তাই বলে' সে তার দেহটা এ পর্য্যন্ত কারো কাছে বিক্রী করেনি। এটা হয়তো এতই বিসদৃশ, যে, কোনো লোকেই বিশ্বাস কর্‌তে পারে না, কি করে' এ হতে পারে। তবু এটা সত্য—হলোই বা সে আজ এই অবিশ্বাসের রাজ্যের অধীশ্বরী!

তারপর যেদিন সে শচীন্দ্রকে দেখ্‌লে, সেইদিন আবার তার প্রাণের সুপ্ত মহিলা জাগ্রত হয়ে উঠলো। তার বাইরের খোলস রূপটার উপর ধিক্কার জন্মে' গেল।

ঘ

শচীন্দ্রর মনটাও সেদিন ভারী খারাপ হয়ে গেল। যে সকলের করুণা-বঞ্চিতা তাকে এতটা উপেক্ষা করা হয় তো ভাল হয়নি! কি অধিকার আছে তার তাকে উপেক্ষা কর্‌বার! যে সকলের উপেক্ষণীয় তাকে উপেক্ষা না করে' সহানুভূতি দেখানোই তো উচিত। তার প্রাণটা

আকুলি-বিকুলি করতে লাগ্‌লো লীলাকে একবার দেখ্‌বার জন্য। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কিছু বল্‌তে পার্‌লে না। নিজের অন্তরের দুঃখ অন্তরেই চেপে রাখলে। লীলার মুখ তার প্রাণে এক অপূর্ব্ব মাদকতার সৃষ্টি করে' তুল্‌লে। সেদিন থেকে সে কোনো কাজে আর মন দিতে পার্‌লে না। লীলার করুণা-ভরা চোখের চাহনি তার প্রাণে এক নিবিড় নেশার সৃষ্টি করে' তুলে' ক্রমেই যেন তাকে পাগল করে' তুল্‌তে লাগ্‌লো। যখনি তাকে পাওয়ার কামনা তার বুকের মধ্যে পল্লবিত হয়ে উঠেছে, তখনি যেন আবেশে সমস্ত অবশ হয়ে এলিয়ে পড়েছে।

লীলাও কি সেদিন থেকে কম ভেবেছে! তার কানে কেবল শচীন্দ্রর সেই কথা অহর্নিশি বেজেছে—যেদিন তুমি হয়ে ছুঁতে পার্‌বে সেদিন ছুঁয়ো। পার্‌বে কি সে ছুঁতে! পার্‌তেই হবে। নইলে তার জীবনের সার্থকতা কোথায়!

হঠাৎ একদিন লীলা ইন্দ্রমোহনকে বল্‌লে,—হ্যাঁগা, একদিন কোনো রকমে শচীন-বাবুকে এখানে আন্‌তে পারো না? লোকটিকে বেশ লাগে আমার। আমার অসুখ করেছে, কি এই রকম কোনো ছুতো করে' ভুলিয়ে এনো!

ইন্দ্রমোহন হেসে বল্‌লে,—তোমার ভাব বোঝা ভার। কখন যে কার ওপর সদয় হও!···আচ্ছা, দেখ্‌বো চেষ্টা করে। কিন্তু আমায় যেন পায়ে ঠেলো না, নতুন লোক পেয়ে।—বলে' সে হো-হো করে হেসে উঠ্‌লো।

লীলা হেসে একটু গড়ানে সুরে বল্‌লে,—পুরোনো জিনিষের আদর বেশী। তোমায় কি কোনো দিন অনাদর কর্‌তে পারি! তোমার আসন চিরদিন অটল থাকবে।

ইন্দ্রমোহন কৃতার্থ হয়ে চলে গেল, শচীন্দ্রকে ভুলিয়ে আন্‌বার জন্য। লীলা অসাড় হয়ে বসে' রইলো চুপ করে'। তার প্রাণের ভিতর কে যেন বল্‌লে, শচীন্দ্র আস্‌বে।

ছায়া-অলস সন্ধ্যার আলো-আঁধারের খেলার মাঝে খোলা ছাদের উপর বসে' শচীন্দ্র ইন্দ্রমোহনের মুখে লীলার কথা শুন্‌ছিল।

শচীন্দ্র অন্যমনে শুন্‌ছিল। তারপর যখন ইন্দ্রমোহন বল্‌লে, লীলার খুব অসুখ, সে একবার শচীন্দ্রকে দেখ্‌তে চেয়েছে, তখন শচীন্দ্র হঠাৎ চম্‌কে উঠে তার হাতটা চেপে ধ'রে বল্‌লে—কেমন আছে সে? আমায় নিয়ে চল ভাই তার কাছে।—বলেই ইন্দ্রমোহনকে এক রকম জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে সে তার গাড়ীতে উঠে বস্‌লো। গাড়ীতে বসেই সে অবসন্নের মত গদীর উপর নিজের দেহ এলিয়ে দিলে। ইন্দ্রমোহন ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লে না, কিসের টানে সেই আদর্শ-চরিত্র শচীন্দ্র আজ ছুটে চলেছে! তাকে সে কতবার কত প্রলোভনে কত জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি···আর আজ এ কি! তারও কেমন ভাল লাগ্‌লো না, শচীন্দ্রর এই ব্যবহার! একবার ভাব্‌লে, না, ফিরিয়ে নিয়ে যাই। বলি, সব মিথ্যা।...মুখ ফুটে কিন্তু কিছু বল্‌তেও পার্‌লে না।

শচীন্দ্রও ঠিক এই রকমই ভাব্‌ছিল। আজ সে কেন একটা পতিতার অসুখ হয়েছে শুনে এ রকম উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে চলেছে!···কিন্তু লীলার মুখে তো সে পাতিত্যের ছোপ দেখ্‌তে পায়নি, তাকে দেখেছে কুমারী নারী-মূর্ত্তিতে।

ইন্দ্রমোহনের গাড়ী প্রায় লীলার বাড়ীর কাছে এসেছে; ইন্দ্রমোহন দেখ্‌লে, লীলা বারাণ্ডার উপর উৎসুক নয়নে দাঁড়িয়ে আছে!

লীলাও তাদের দেখ্‌তে পেলে, পেয়ে তার মন ঈপ্সিত পাওয়ায় আনন্দে নৃত্য করে' উঠ্‌লো।

এমনি সময় হঠাৎ ইন্দ্রমোহনের গাড়ীর ঘোড়াটা একটা মোটর-গাড়ীর আচম্‌কা ভেঁপুর আওয়াজে ভড়্‌কে, গাড়ীটাকে উল্টে দিলে। ইন্দ্রমোহন লাফিয়ে নেমে পড়্‌লো, শচীন্দ্র নাম্‌তে গিয়েও নাম্‌তে পার্‌লে না, মাথায় চোট লেগে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌লো। লীলা তাড়াতাড়ি নেমে এসে রাস্তার মাঝেই তার মাথাটা কোলে তুলে নিলে। তারপর ধরাধরি করে' একখানা গাড়ী করে' শচীন্দ্রকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। লীলাও সঙ্গে গেল; কিন্তু শচীন্দ্রর জ্ঞান হবার ঠিক পূর্ব্বেই সে সেখান থেকে চলে' এল,—সাহস হলো না তার শচীন্দ্রর সামনে দাঁড়াতে।

লীলা তার বাড়ীর জান্‌লায় বসে' বসে' ভাব্‌ছিল,—আমার জীবনের আরাধ্য-দেবতাকে মিথ্যার আবরণ দিয়ে

পেতে চেয়েছিলাম বলেই কি তিনি বিমুখ হয়ে এমন আঘাত করে' বাড়ীর দোর হতেই চলে গেলেন—বাড়ী পর্য্যন্ত ঢুক্‌লেন না! সে আঘাত তো তার নয়, সেটা যে আমাকেই আঘাত করে' বল্‌লেন, ওরে, এখনো যে তোর পাবার সময় হয়নি। যখন হবে, তখন তুই আপনিই পাবি। এত মিথ্যা ঢাকাঢাকি কেন! মিথ্যা মিলন-কামনা এই রকম ভয়ানক হয়েই দাঁড়ায়।

তার ভাবনাকে সচকিত করে' ঘরে ঢুক্‌লো ইন্দ্রমোহন একমুখ হাসি নিয়ে। লীলাকে কি একটা কথা বল্‌তে যেতেই লীলা তাকে বাধা দিয়ে স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লে,—কোনো কথা শুনতে চাই না তোমার। আজ থেকে তুমি আর আমার কাছে এসো না। বলে' দোরটা দেখিয়ে দিলে।

ইন্দ্রমোহন লীলার এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে রেগে বল্‌লে,—তোমার কদিন কি হয়েছে, বল তো। আর যাও বল্‌লেই কি যাওয়া হয়! এতদিন এত গয়না-পত্র দিলাম, সেগুলো কি একেবারে বাজে?

লীলার যেন হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ে' গেল ইন্দ্রমোহনের এই কথায়। সে তেমনি ভাবে বল্‌লে,—ওঃ, খুব একটা কথা মনে করে' দিয়েছো বটে! না, একেবারে বাজে নয় তোমার দান। নিয়ে যাও তোমার দান,—মিলিয়ে সব কড়া-ক্রান্তি হিসাব করে' নিয়ে আমায় রেহাই দাও।—বলে' একে একে তার গা থেকে সমস্ত গহনা খুলে ইন্দ্রমোহনের পায়ের কাছে উজাড় করে' ঢেলে দিলে এবং কাপড়-চোপড় বার করে' ঘরের মেঝেয় জড়ো করে' দিলে।

ইন্দ্রমোহন লীলার এই অবস্থা দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে দ্বিরুক্তি না করে' হতভম্বের মত ঘর থেকে চলে' গেল।

হাসপাতালের একটা একানে ঘরে শচীন্দ্র শুয়ে আছে একলা। বেশ ভাল হয়ে গেছে, কাল সেখান থেকে মুক্তি পাবে। সে শুয়ে একটা খবরের কাগজ পড়্‌ছিল। হঠাৎ এক জায়গায় তার চোখ পড়্‌লো,—লেখা রয়েছে,—

'অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। কল্‌কাতার শ্রেষ্ঠ বাইজী লীলা তার আজীবন-সঞ্চিত সমস্ত ধনরত্ন, এমন কি বাড়ীখানি পর্য্যন্ত, দেশের কাজে দান করেছে। জানিনা কার মুক্তি-পরশ লেগে পতিতার এমন ত্যাগ-স্বীকার……।' পড়ে শচীন্দ্রর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌লো। চুপ করে' চোখ বুজে সে শুয়ে রইলো।

হঠাৎ তার ঘরের দোরটা কে খুব আস্তে আস্তে সন্তর্পণে খুলে ভিতরে এলো। সে ভাব্‌লে, কোনো সেবিকা ঘরে এলো। চোখ বুজেই সে শুয়ে রইলো, তেমনি করে'। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেও যখন সে কোনো সাড়া পেলে না, তখন চোখ খুলে দরজার দিকে চেয়েই আর চোখ ফেরাতে পার্‌লে না। সেখানে দাঁড়িয়ে শুভ্রবসনা নিরাভরণা লীলা। জ্যোৎস্না-বিবশা নিশীথিনীর মত অবশ চরণে কুণ্ঠিতা লজ্জিতা, পাথরের মত নিস্পন্দ নিশ্চল দাঁড়িয়ে—ত্যাগের উজ্জ্বল প্রভায় মণ্ডিতা হয়ে! হেমন্তের শিশির-পাতের মত চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু! মনে হচ্ছিল, এই চাঁদিনী-গর্ব্বিতা যামিনীর সমস্ত বুক ব্যেপে সাহানা-সুরের পাষাণ-ফাটা কান্না আকণ্ঠ ফুঁপিয়ে উঠ্‌ছে, আর তাই সে শুধু সিক্ত চোখে মৌন মুখে আকাশ-ভরা তারার দিকে তাকিয়ে আছে, ভাব্‌ছে,—আকাশের মত আমারও মর্ম্ম ভেদ করে' এমনি কোটি কোটি আগুন-ভরা তারা জ্বল্‌ছে—উষ্ণতায় সেগুলো সূর্য্যের চেয়েও উত্তপ্ত! স্থির সৌদামিনীর মত সেগুলো শুধু জ্বালাময় প্রখর তেজে জ্বল্‌ছে!

লীলা এতদিন কতবার শচীন্দ্রকে দেখ্‌তে আস্‌তে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। কিসের একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জা এসে তার পা জড়িয়ে ধরেছে। গরুকে মাঠে যেমন একটা লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয় আর সেই দড়ির শেষ সীমানাটুকু পর্য্যন্তই থাকে তার চর্‌বার সীমা, তেমনি লীলার মনটাও একটা সীমার মধ্যেই এতদিন ছট্‌ফট্ করেছে। আজ রিক্ত মুক্ততায় সে সীমার বাধা ছাড়িয়ে অসীমের ভিতর এসে পৌচেছে। তাই আজ সে সকল সঙ্কোচ জয় করে' সাহস করে' শচীন্দ্রকে দেখ্‌তে আস্‌তে পেরেছে, এতদিন পরে!

শচীন্দ্র আস্তে আস্তে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। লীলা তার বাহুর বন্ধনের ভিতর না গিয়ে আস্তে আস্তে তার পায়ের কাছে এসে তার পায়ের উপর মাথাটা লুটিয়ে উচ্ছ্বসিত অশ্রুর বন্যায় তার পা ধৌত করে' দিতে

লাগ্‌লো। শচীন্দ্র তাকে বাধা দিলে না। তার চোখও সজল হয়ে উঠলো।

মানুষের প্রাণে যে কখন্ কেমন করে' মুক্তি-পরশ লাগে, আর তাতে তার সারা জীবনের ধারাই একেবারে বদ্‌লে ছাঁচে অন্য রকম হয়ে দাঁড়ায়, তা বলা কঠিন।

আজ লীলারও সেই অবস্থা।

নীরব অশ্রুর ভিতর দিয়েই তাদের মিলন সফল হয়ে উঠলো এমনি করেই।

শ্রীপ্রমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিরাটপুরের পথে

বিরাটপুরের এই রাঙা পথ
নয়ন-জলে পিছল করা,
দিবস ধরে নীহার ঝরে
রাত্রে নামে বাদল-ধারা।
কেউ কাহারে চিনতে নারে
চলে মনের অন্ধকারে
ভিখারিণীর বেশ পরে যায়
রাজার পুরের অঙ্গনারা।

২

পথের মাঝে রয় পড়ে রয়
ছিন্ন চামর, ছত্র ভাঙ্গা,
ভাঙ্গা ভালের রক্ত ঝরে
পথকে করে গভীর রাঙ্গা।
সোনার মুকুট গৌরবেরি
কর্দ্দমেতে লুটায় পড়ি
অনাদৃত বাণীর বীণা
কুবের হেথায় ছন্নছড়া।

৩

'রামীর' আঁচল আড়াল দিয়ে
অমন করে যাচ্ছে ও কে,
অকলঙ্কী কবির কবি
কলঙ্কিত লোকের চোখে!
তাপস কবি দস্যুমতি
অসতী হায় সতীর সতী
ও কে ক্রসের ভার বহে যায়
চিন্‌তে নারে ভ্রান্ত ধরা!

৪

নর সেজে হায় নারায়ণের
এই পথেতে গতায়তি—
জটার মাঝে গঙ্গা লুকোন্
বাঁজের ভিতর বনস্পতি।
অপমানের এইখানে শেষ
রাজার রাজার চণ্ডাল বেশ,
পুণ্য এবং দৈন্য দিয়ে
সাজায় এ পথ বসুন্ধরা।

৫

চলতে হলে এই পথেতে
সকল স্মৃতি ভুলতে হবে।
গাণ্ডীব এবং তুণীর সখা
শমীর শাখে তুলতে হবে।
গ্রহণ-লাগা ভাগ্য-মেঘে
কোথাও রবি উঠেছে জেগে
কোথাও নয়ন-লবণ-জলে
সুবর্ণ দ্বীপ হচ্ছে গড়া।

৬

এই মহাপথ ঝঙ্কৃত নয়
বিহগগণের গিট্‌কিরীতে,
মুখর এ পথ বন্ধু বেশী
শত্রুগণের টিট্‌কিরীতে।
এই পথেতে যায় যে পাওয়া
নিরঞ্জনার স্নিগ্ধ হাওয়া
যাত্রীরা হায় অলক্ষিতে
জয় করে যায় মৃত্যু জরা
বিরাটপুরের এই রাঙ্গা পথ
নয়ন-জলে পিছল করা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

২

বাঙলা নাট্য-সাহিত্য

বাঙ্‌লার প্রথম নাটক সম্বন্ধে মতভেদ আছে; কেহ বলেন তারাচাঁদ শিক্‌দারের ভদ্রার্জ্জুন; কেহ বলেন হরচন্দ্র ঘোষের Merchant of Veniceএর অনুবাদ ভানুমতী চিত্র-বিলাস; কেহ বলেন রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব। আমি যতদূর জানি, তাহাতে ভদ্রার্জ্জুনকেই প্রথম প্রকাশিত বলিয়া বোধ হয়—এবং হরচন্দ্র বাবুর মার্চেণ্ট্ অব ভিনিস্-এর অনুবাদ তাহার অতি অল্প পরেই প্রকাশিত হয়—কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব তাহার পর। প্রথম দুইখানি কখনও অভিনীত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই, গরাণহাটায় ৺জয়রাম বসাকের বাটীতে তাঁহার দ্বারা বদ্‌লানো কুল-সর্ব্বস্বের অভিনয় হইয়াছিল। প্রায় ঐ সময়েই বোধ হয় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের বাটীতে তাঁহার অনুবাদিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকও অভিনীত হয়। কেহ কেহ বলেন যে কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব তর্করত্ন মহাশয়ের লেখা নহে; তাঁহার অগ্রজ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ নাটকখানি রচনা করেন। আমারও মনে কতকটা ঐ কথা লাগে, কেননা তর্করত্ন মহাশয়ের রচিত রত্নাবলী, বেণী-সংহার, মালতী-মাধব, নব নাটক প্রভৃতি পুস্তকে দেখা যায় যে তিনি বর্ত্তমান কালের অভিনয়-উপযোগী করিয়া তাঁহার নাটক সকল ইংরাজী ধরণে অঙ্ক ও 'সীন্' বা গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করিয়াছেন; কিন্তু কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বে সে রকম একেবারে নাই। উহাতে এক ব্রাহ্মণ আগন্তুককে বলিলেন, আপনি দাঁড়ান, আমি বাড়ীর ভিতর গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসি—তার পরই লেখা (অনন্তর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া) ও ব্রাহ্মণী,ও ব্রাহ্মণী, শোনো—এইরূপ সব আছে। হইতে পারে যে পাইক-পাড়ায় অভিনয়-সময়ে বঙ্গের নটগুরু স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির ইঙ্গিতে তিনি ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বের সেই—

> ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি,
> কচুরি তাহাতে খান দুই।
> ছক্কা আর সরভাজা, মতিচুর, বোঁদে গজা,
> ফলারের যোগাড় বড়ই।
>
> * * * *
>
> গুমো চিঁড়ে জলো দই—চিন্তো গুড় ধেনো খই,
> পেট ভরা থালি নাহি হয়—

লেখার প্রলোভন সহজে পরিত্যাগ করা দায় বলিয়া বোধ হয় না; অন্ততঃ নব-নাটকে ওরূপ দু-একটা বুক্‌নি তিনি না দিয়া ছাড়িতে পারিতেন কি? দীনবন্ধু নীলদর্পণে "ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজেছ কই"—লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; নবীন-তপস্বিনীর "মালতী মালতী মালতী ফুল" ভুবনে অতুল বিয়ে-পাগলা বুড়োরও "এলোচুলে বেণে-বৌ আল্‌তা দিয়ে পায়—নোলোক নাকে কলসী কাঁখে জল আনতে যায়—" এ কি আর কেহ লিখিতে পারিবে? লীলাবতীর অত মধুর কবিতার মধ্যেও "মাছি মাছি মাছি সতীন হলে বাঁচি" এ কথাও আছে।

সে যাহা হউক প্রথমেই অভিনয়-উপযোগী নাটক রচনা করিয়া পণ্ডিতবর রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় যে বঙ্গদেশে অভিনয়ের পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এদেশে যাঁহারা নাট্য-চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের "তর্করত্ন-তিথি" বলিয়া তাঁহার জন্মদিন-উপলক্ষে একটি পর্ব্বাহ প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। এ বুদ্ধি আমার আগে আসে নাই বলিয়া অনুতপ্ত হইতেছি। * * *

ইংরাজী নভেল বা রোমান্সের ছাঁচে বাঙলা ভাষায় নভেল বা উপন্যাসাদি প্রচলনের পূর্ব্বে এদেশে নাটকই অনেক পরিমাণে লিখিত হয়। এক সময়ে শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে এমন ধারণা ছিল যে কথোপকথনে পুস্তক লিখিলেই তাহা নাটক হয়; যদু বাবুর "ধাত্রী-শিক্ষা"কেও নাটক মনে করিতেন, এমন লোক বিরল ছিল না। বটতলার এক সময়ে-প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা বেণীমাধব দের এক পুত্র

লালবিহারী আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন; তাঁহার স্নেহে আমি অনেক বাঙলা পুস্তক ক্রয় না করিয়া পাঠ করিয়াছি। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কলিকাতায় একটিও সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ঐ সময়ে এক দিন আমি আইন-সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক বলিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করি; কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়াই দেখিলাম, দুই সইয়ের কথোপকথনচ্ছলে উহা ভাল উকিলের লেখা একখানি penal codeএর বঙ্গানুবাদ! তবে আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে তখনকার ঐ বটতলা-প্রকাশিত নাটক ও প্রহসনের মধ্যে কোন কোনখানির ভিতর এমন সুন্দর ও সরস জিনিষ ছিল, যাহা এক্ষণে কোন ভাল লোক দ্বারা সম্পাদিত হইলে অভিনয়-উপযোগী ও রসজ্ঞগণের মনোরঞ্জনকারী ভাল নাটকই হইতে পারিত।

আর একজন প্রশংসনীয় নাট্যকার ছিলেন ৺মনোমোহন বসু। ইনি যেন তর্করত্ন এবং দীনবন্ধু ও মধুসূদনের মধ্যে সংযোগস্থল, সেকালের সহিত একালের মিলনের গাঁট-ছড়া।

কিন্তু দীনবন্ধু ও মধুসূদন হইতেছেন দুইজন যাঁহারা বিলাতী দিয়াশলাই ঘষিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া বর্ত্তমান বঙ্গে নাট্যকারগণের পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন। বিলাতী দিয়াশলাই ঘষিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা সুরভি তৈলাধার মঙ্গল-প্রদীপই জ্বালিয়াছিলেন - চর্ব্বির বাতি জ্বালেন নাই! উক্ত কালে সেই দীপ হইতেই নিজে প্রদীপ্ত প্রতিভাপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া বঙ্গের সর্ব্বজন-সমাদৃত গিরিশচন্দ্র রামায়ন, মহাভারত, চৈতন্য-চরিতামৃত, ভক্তমাল প্রভৃতি তীর্থস্থ দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নাট্যকলা প্রতিমার আরতি করিয়াছিলেন। * * *

বাঙলা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত এমন কোন নাটক, নাটক কেন বলি, অন্য কোনরূপ কাব্য প্রকাশিত হয় নাই, যাহাতে এ দেশের পল্লী-জীবন, সেই জীবনের গার্হস্থ্য দৈনন্দিন ঘটনা, সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, অবসাদ-উত্তেজনা নীল-দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল জীবন্তভাবে প্রতিফলিত আছে! যাঁহারা নীল-দর্পণের ভাষাদি লইয়া এক্ষণে সমালোচনা করিতে বসেন, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, নীল-দর্পণ লেখা হয় বারো-শত সাতষট্টি সালে। * * *

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে গ্রীক ধরণে ট্রাজেডি লেখা নিষিদ্ধ; কিন্তু কালের সঙ্গে সঙ্গে মানবের বৃত্তি ও রুচিরও পরিবর্ত্তন হয়, সেইজন্য দীনবন্ধুর নীলদর্পণে ও মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীতে বাংলায় ট্রাজেডি লেখার প্রথম সূত্রপাত। পরবর্ত্তী অনেক নাট্যকারই কৃষ্ণচন্দ্রকে তাঁহাদের আদর্শ করিয়াছেন। কৃষ্ণকুমারী সম্বন্ধে আমার একটা সংস্কারের কথা বা কুসংস্কারের কথা এখানে বলিয়া রাখি। আমার বোধ হয় কোন বিঘ্নকারী নক্ষত্রের সঞ্চার-কালে মধুসূদন তাঁহার কৃষ্ণকুমারী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন! অমন অভিনয়োপযোগী উৎকৃষ্ট নাটকখানি নহিলে এত অপয়া হইল কেন? রত্নাবলী একখানি অতি উৎকৃষ্ট নাটক হইলেও ঐ দৃশ্যকাব্যের অভিনয়ে পূর্ব্বরাগ বিরহ ঈর্ষা বিস্ময় প্রভৃতি রসের অবতারণা অতি মৃদু-কোমল ভাবেই হইত, তাহাতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আগ্রহ-উত্তেজনাদির এমন তীব্রতা ছিল না, যাহাতে বর্ত্তমান বঙ্গের প্রাণে তরঙ্গ উত্থিত করিতে পারে। সেইজন্য পাইকপাড়া রাজ-বাটীতে অভিনয়ের জন্য মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনা করেন। কিন্তু কি জানি, কি গোল হইয়াছিল, বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই,--কিন্তু অভিনয়ের উদ্যোগেই পাইক-পাড়ার নাট্যসমাজ উঠিয়া গেল। পরে শোভাবাজার রাজবাটীতে কৃষ্ণকুমারী অতি প্রশংসার সহিত অভিনীত হয়, কিন্তু প্রথম অভিনয়ের অল্পদিন পূর্ব্বেই ঐ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি কয়েকজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা ও উদ্যোগী সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ন্যাশন্যাল থিয়েটারের আদি রঙ্গমঞ্চে ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশবাবু প্রথমে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ শক্তি সঞ্চার করেন বটে, কিন্তু তাহার কয়েক সপ্তাহ পরে আমাদের মধ্যে যে একটু দলাদলি ঘটিল, তাহা ঐ কৃষ্ণকুমারীর একটা অভিনয়ের পরেই! স্বর্গীয় মনোমোহন বোষ মহাশয়ের পরামর্শে ও নিজ নিজ হৃদয়ের ভক্তি-

আদর্শে যতবারই আমরা মধুসূদনের অনাথ সন্তানগণের সাহায্যার্থে কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় করিয়াছি, ততবারই হয় একটা জল-ঝড় হইয়া দর্শক-সমাগমে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে অথবা সম্প্রদায়ের ভিতর দুষ্ট রক্ত প্রবাহিত হইয়া তাহাকে অঙ্গহীন করিয়াছে—শ্যামের পাঠ রামকে দিয়া, রাখালের পাঠ নেপালকে দিয়া একরূপে কাজ চালাইয়া লইতে হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারী, তোমার অলৌকিক রূপ উদয়পুরের রাণা-বংশে অনর্থ ঘটাইয়াছিল, নিজ-দেহ-দানে তোমার পিতৃগৃহের শান্তি তুমি কতকটা রক্ষা করিয়া ছিলে, আর কৃষ্ণকুমারী নাটক তোমার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বার-বার রঙ্গমঞ্চে বিপর্য্যয় ঘটায় দেখিয়া বর্ত্তমান নাট্যশালার পরিচালকগণ তোমার বক্ষে আর ছুরিকা বিদ্ধ না করিয়া পূজা-ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন!

"একেই কি বলে সভ্যতা" লিখিয়া মধুসূদন বঙ্গ ভাষায় প্রহসনের সৃষ্টি করেন। এখানিতে বঙ্গের যে নবীন সমাজ তখন উদয়াচলে, তাহারই বিদ্রূপাত্মক আলেখ্য সুনিপুণ শিল্পীর দক্ষতায় অঙ্কিত; ছোট-বড় প্রত্যেক চরিত্র পূর্ণাবয়বে গঠিত, ছায়ালোকের সমতা রক্ষা করিয়া প্রাকৃতিক বর্ণে রঞ্জিত "একেই কি বলে সভ্যতা" প্রথম পটোত্তোলনে দর্শকের অধরে মৃদু মধুর হাসি ফুটাইতে আরম্ভ করিয়া শেষে সকলকে হা-হা-হা-হো-হো-হো করিয়া হাসাইয়া যবনিকা ফেলিয়া দেয়। তাঁহার দ্বিতীয় প্রহসন "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"। প্রাচীন সমাজে যে দুষ্ট গ্রহ তখন অস্তাচলে, ব্যঙ্গরঙ্গে তাহাকে বিদায় দিবার জন্যই এই প্রহসনের অবতারণা। পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এই প্রহসনখানির নিন্দা করিয়াছেন! মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া বলিতেছি, ন্যায়রত্ন মহাশয় দৃশ্য-কাব্য-সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইলেই ভাল করিতেন, তাঁহার পুণ্য-পূর্ণ চক্ষু হরি-নাম মুদ্রাঙ্কিত বক্ষ দেখিয়াই শান্তি অনুভব করে, ঐ চক্ষের অভ্যন্তরে ব্যভিচার যদি বীভৎস ক্রীড়া করিতে থাকে, তাহা তাঁহার সরল দৃষ্টি অতিক্রম করে।

"একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়ে" কৌতুক অধিকতর পরিপুষ্ট ও সুন্দর করিয়াই দীনবন্ধু বাবু বঙ্গ সাহিত্যকে "সধবার একাদশী" ও "বিয়ে পাগলা বুড়ো" কৌতুক দিয়াছেন। আর একখানি প্রাচীন নাটকের উল্লেখ করিতেছি—স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্র রচিত "বিধবা বিবাহ" নাটক। বিধবা বিবাহের প্রথম আন্দোলনের দিনে ঐ নাটকখানি ঐ বিবাহের পক্ষাবলম্বী সম্প্রদায়কে বড়ই আকৃষ্ট করিয়াছিল। "বিধবা বিবাহে"র অভিনয়ে ভক্তাবতার কেশবচন্দ্র সেন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, বোধ হয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অক্ষয়চন্দ্রও ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; ন্যাশন্যাল ও গ্রেট ন্যাশন্যালে আমরাও দুই-চারি রাত্রি উক্ত নাটকের অভিনয় করিয়াছি। * * *

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ-ধ্যান-পরায়ণ দেশ-সেবক স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ রাজনৈতিক লেখক-বীর বলিয়াই জগতে সাধারণের নিকট পরিচিত; কিন্তু শিশির বাবু সঙ্গীত-বিদ্যা মল্লবিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিদ্যারই আধার ছিলেন। শিশির বাবুর অস্থি-সার দেহ স্মরণ করিয়া মল্লবিদ্যার নাম শুনিয়া কেহ হাসিবেন না! এক সময়ে তাঁহার শরীরে বিলক্ষণ শক্তি ছিল আর মনের ভিতর ভীমের পরাক্রম ছিল। চুয়াত্তর সালের কার্ত্তিকের ঝড়ের রাত্রে ঐ তালপাতার সিপাই একখানা শাল না কম্বল মুড়ি দিয়া যশোহরের একটা মাঠে সমস্ত রাত্রি পড়িয়াছিলেন, বন্ধু-বান্ধবেরা প্রাতঃকালে তাঁহার এই ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিয়াছিলেন যে কতটা সহ্য করিতে পারেন, তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। * * *

এদেশে এক সময়ে অনেক বন্দুকধারী শিশিরকে যম দেখিতেন। শিশিরবাবু অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় অনেকেই এখন জানেন না। তাঁহার "নয়শো রূপেয়া" নাটক একদিকে যেমন করুণ-রসের আধার, অন্যদিকে তেমনি হাস্য-রসের খনি। শিশির বাবুর সুপরামর্শেই আমরা দেশ-প্রেমোদ্দীপনকারী ভারত-মাতা প্রভৃতি দৃশ্যলীলা অভিনয় করি। বঙ্গীয় তরুণ যুবকগণের প্রাণে দেশাত্মবোধের পবিত্র বীজ

প্রথম রোপণ করেন ৺নবকুমার মিত্র ও শিশির কুমার ঘোষ। বঙ্গে প্রথম প্রকাশ্য নাট্যশালার অভ্যুদয় ঐ সময়েই। শিশির বাবুর ইঙ্গিতেই হেয়ার স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক হরলাল রায় "হেমলতা" নামক বীর-রসাশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক প্রথম রচনা করেন। হরলাল বাবু যখন হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক, তখন আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম। বড় ভালমানুষ বলিয়া হরলাল বাবুকে বড় ভালবাসিতাম, তাই এই পরিচয় দিলাম, নতুবা আমার মত ছাত্র দেখাইয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিন্দা করিবার অধিকার আমার নাই। "হেমলতার" অভিনয় দর্শককে মাতাইয়া তুলিত। সত্যসখা-রূপে মহেন্দ্র বসুকে আমি যেন এখনও চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি! হরলাল বাবু "শকুন্তলা"ও "বেণী-সংহার" ভাষান্তরিত করিয়া "কনকপদ্ম" ও "শত্রু-সংহার" নাম দিয়াছিলেন কিন্তু অভিনয়ে তাহা তেমন সাফল্য-লাভ করে নাই। শকুন্তলা মোটেই না। হরলাল বাবুর ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল, নহিলে তিনি শকুন্তলার নাম পরিবর্ত্তন করিতে যান্! ত্রিজগতের সকল সুষমার একত্র সমাবেশ করিয়াও গেটে যে শকুন্তলার নামান্তর নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই, তাহাকে কি না কনক-পদ্ম বলা! এই সভাস্থলে অনেকেই উপস্থিত আছেন, যাঁহারা গৃহে গিয়া স্যাকরা ডাকাইয়া এখনই দশটা কনক-পদ্ম গড়িবার অর্ডার দিতে পারেন, কিন্তু কালিদাস স্বয়ং আসিলেও আর-একটি শকুন্তলার সৃষ্টি করিতে পারেন না;—পারেন নাই! তিনি যখন বিক্রমোর্ব্বশী লেখেন, তখন শকুন্তলা লেখার কলম তাঁহার হারাইয়া গিয়াছিল! হরলাল বাবু আবার ম্যাকবেথেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন, নাম দিয়াছিলেন, "রুদ্রপাল"। তবে কুমার-টুলির হাঁড়ি-গড়া ভগবান পালের সঙ্গে কাঁসারীপাড়ার পোর্ট্রেট লেখক কৃষ্ণদাস পালের যে সম্বন্ধ, রুদ্রপালের সঙ্গে ম্যাকবেথেরও সেই সম্বন্ধ! রঙ্গমঞ্চে রুদ্রপালের শিশুপালের দশাই ঘটিয়াছিল! ম্যাকবেথের অনুবাদ করিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

জ্ঞাতিত্ব দূরে থাক, যে ভাষার সহিত দেশের মাত্র কয়জন পুরুষের আফিসি আলাপ, সে ভাষা হইতে যে ভাষা আমাদের জননী-ভগ্নী-বনিতা-দুহিতা ব্যবহার করেন, সেই ভাষায় একখানি অতি-উচ্চশ্রেণীর গভীর নাটক যে কতদূর উৎকৃষ্ট অনুবাদিত করা যাইতে পারে, গিরিশ বাবু তাহা ম্যাকবেথ অনুবাদে দেখাইয়া গিয়াছেন। ভবভূতির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে যে পৃথিবীও বিপুলা কালও নিরবধি, ভবিষ্যতে অন্য কবি ইংরাজি নাটক হইতে বাংলা অনুবাদের উৎকর্ষ নমুনা দেখাইতে পারেন, কিন্তু এখন সে রাজ্যের সিংহাসন গিরিশ বাবুরই অধিকারে। * * *

বঙ্কিমবাবু নাটকাখ্যা দিয়া কোন গ্রন্থই লেখেন নাই। কিন্তু তাঁহার অনেক উপন্যাসই নাটকের রসসৌন্দর্য্যে আলাপ-মাধুর্য্যে ও ক্রিয়া-প্রয়োগের অভিব্যক্তিতে অলঙ্কৃত। নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার প্রায় সকল উপন্যাসই পাঠকের ন্যায় দর্শকের মনও মোহিত করিয়াছে। বঙ্কিম বাবু কেবল সোনা রাখিয়া যান নাই, দানা পর্য্যন্ত গড়িয়া দিয়া গিয়াছিলেন—আমরা নাট্যশালার লোক সেই দানা লইয়া হার গাঁথিয়াছি, বড় জোর মাঝে মাঝে দুই-একখানি ধুকধুকি ঝুলাইয়া দিয়াছি।

মধুসূদনের "মেঘনাদ" এবং নবীনের "পলাশীর যুদ্ধ" নাট্য-পাকশালায় প্রবেশ করিয়া নূতন ব্যঞ্জনের আকারে চিত্তগ্রাহ্য আহার্য্যে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে মেঘনাদ অতি অল্প লোকেই যথারীতি পাঠ করিতে পারিতেন, অনভ্যস্ত রসনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাঠে অক্ষম হইয়া সাধারণ লোকে উহার তত আদর করিতেন না। আত্মশ্লাঘা মনে করেন, উপায় নাই; কিন্তু রঙ্গমঞ্চই প্রথমে মেঘনাদের আবৃত্তি সাধারণের পক্ষে সহজ ও সুন্দর করিয়া দিয়াছে। হরলাল রায়ের পর রাজপুতানার ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া প্রথম নাটক লেখেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। জ্যোতিবাবুর নাটক প্রহসন কয়খানি প্রতিভার জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। জ্যোতিবাবু যখন প্রথম প্রেসিডেন্সীতে পড়েন, আমি তখন হিন্দুস্কুলে পড়ি। দুইটী পাঠাশ্রম তখন একই বাড়ীতে; সংস্কৃত কলেজের পৈঁঠার উপর হেয়ার সাহেবের প্রতিমার পার্শ্বে এক একদিন যানের প্রতীক্ষায় তিনি

দাঁড়াইয়া থাকিতেন, আর আমি রাস্তায় গাড়ীতে বসিয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার রূপ দেখিতাম। তখন আমি কিশোর বালক না হইয়া কিশোরী হইলে আমার কি দশা ঘটিত, কে জানে! যেদিন প্রথম সরোজিনী নাটকে বিজয়সিংহ সাজিলাম, সে দিন আমি মনে করিয়াছিলাম, আজ হইতে সেই সুন্দর কবির সঙ্গে আমার একটা নিকট-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

আর-একজন নাট্যকার ছিলেন ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী; নন্দবংশের চেয়ে সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতি কয়েকখানি ভাল নাটক তিনি লিখিয়াছিলেন; তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন গীত-রচনায়। তাঁহার আনন্দ-কাননের এক-একটী গান এক-একটী সদ্য-ফোটা ফুল :—

"প্রাণ কি চায় রে কে জানে!
পোড়া মন টেঁকে না এখানে॥"

"শারদ-লতিকাসম ললিত ললনা কায়।"

"যুবক-যুবতী জাগো যামিনী যে যায় রে।"

* * খৃষ্টাব্দ ১৮৭০এর কোটার শেষে বঙ্গের নাট্যপ্রতিভা যেন ঘুমাইয়া পড়িল। যাহা কিছু নাটক অভিনয় করিবার উপযোগী ছিল, সবই পুরাতন হইয়া গেল, কমলাকান্তের দপ্তর পর্য্যন্ত dramatised হইয়া গেল। অপেরা নাম দিয়া নৃত্য-গীতের শ্রাদ্ধ করিলাম, নাটক আর কেহ লেখে না! ভুল হইয়াছে,লেখে বই কি! মধুসূদনের মায়া কাননের নামের অনুকরণে "ক্যাওড়া-কানন" নাটক এবং বিয়োগান্ত প্রহসন পর্য্যন্ত অভিনয়ের জন্য উপহার পাইয়াছি।

কিন্তু উক্ত প্রহসনের নায়িকার ন্যায় ঐ সকল পড়িয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, অভিনয়ে আর প্রবৃত্তি হয় নাই।

কোন কোন থিয়েটার এমন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল যে বঙ্গদর্শনখানি dramatise করিয়া একটা test case রুজু করিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল, শুনিয়াছি। গিরিশবাবু ইতি পূর্ব্বে "দুর্গেশ-নন্দিনী" "মৃণালিনী" "মেঘনাদ" "পলাশীর যুদ্ধ" dramatise করিয়াছিলেন, আগমনী, বিজয়া, দোল-লীলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিনাট্যও লিখিয়াছিলেন,কিন্তু আস্ত নাটক একখানিও এ পর্য্যন্ত লেখেন নাই। একটু বেড়ার মধ্যে বলিয়া যাই যে দুর্গেশনন্দিনী ও মেঘনাদ dramatised হইয়া প্রথমে অভিনীত হয় Bengal theatre এ। যতদূর জানি তাহাতে বোধ হয় এই দুইখানি পুস্তক নাটকাকারে পরিবর্ত্তনে হাত ছিল তিনজনের; লাটুবাবুর জ্যেষ্ঠ বংশধর চিত্র-বিদ্যা-সুনিপুণ মন্মথনাথ দেব, নাটোর রাজবংশের কুমার সঙ্গীতশাস্ত্রানুরাগী কৃতবিদ্য আমার সহপাঠী উমেশচন্দ্র রায় ও প্রবীণ নাট্যাচার্য্য বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

নাটকের এমন অভাব হইল যে অবশেষে আমরা গিরিশবাবুকে ধরিয়া বসিলাম যে, আপনি নাটক লিখিতে চেষ্টা করুন, উদ্যম নিশ্চয়ই সফল হইবে। গিরিশ বাবু অনেক ইতস্ততঃ করিয়া প্রথমে "মায়াতরু" ও "মোহিনী প্রতিমা" দুইখানি গীতিনাট্য লিখিলেন; পরে একটী স্বকপোল-কল্পিত গল্প লইয়া "আনন্দ রহো" নাম দিয়া একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখিলেন। গিরিশ বাবু স্বয়ং তখনকার সমস্ত উৎকৃষ্ট অভিনেতা ঐ নাটকে অভিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু গুণগ্রাহী দর্শকগণের নিকট হইতে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিলেও টিকিট-ঘরে ঐ নাটকের আদর হইল না।

"কেঁদে কেঁদে চল্ মা শ্যামা, আমি তোমার সঙ্গে যাব" প্রভৃতি ঐ নাটকে সন্নিবিষ্ট দুই একটী শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত এখনও পথ-ভিখারীর মুখে শুনিতে পাই; কিন্তু নাটকখানি গিরিশ-গ্রন্থাবলীতেই আটক পড়িয়া আছে। * * *

গিরিশ বাবুর জীবনে তখন এক নূতন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আবাল্যের নাস্তিকের মত ব্যবহার ছাড়িয়া তিনি হঠাৎ যেন একেবারে ভগবৎ-ভক্তিসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন! মা-মা করিয়া তিনি তখন যেন একেবারে পাগল! বিদ্যারূপিণী স্বয়ং জননী যেন তাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইয়া মাত্র তিন সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে তিনি "রাবণ বধ" লিখিয়া দিলেন। অমৃত মিত্র সাজিলেন রাবণ, স্বয়ং গিরিশবাবু শ্রীরামচন্দ্র। গীত-রচনায়, বিশেষ প্রেম-ভক্তিপূর্ণ গীত-রচনায় গিরিশ বাবু সিদ্ধহস্ত, তাহার উপর দিব্যশক্তি-সম্পন্ন রামতারণ সান্যালের সুর!—অভিনয়ে জয়-জয়-কার পড়িয়া গেল; বায়রণের ন্যায় এক প্রভাতে

ঘুম ভাঙ্গিয়া গিরিশবাবু হঠাৎ দেখিলেন, তিনি বঙ্গবিখ্যাত নাট্যকার! তার পর গিরিশবাবু কত নাটক লিখিয়াছেন, প্রত্যেক নাটকে কত প্রশংসা পাইয়াছেন, তাহার পরিচয় আমি তাঁহার সুহৃদ শিষ্য ও সহযাত্রী, আমার মুখে না শুনিয়া বঙ্গদেশকে জিজ্ঞাসা করুন। * * *

নাটককে শিক্ষাপ্রদ বলিয়া সুখ্যাতি করিলে আমার বুকের ভিতর হইতে কেমন যেন একটা "নীতি-বোধ" "নীতি-বোধ" "চারুপাঠ" "চারুপাঠ" ঢেঁকুর ওঠে! যিনি নাটক লিখিতে গিয়া শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা ঝাড়িতে যাইবেন, তিনিই ঠকিবেন। আনন্দ উপভোগ করিতে আসিয়া কেহই sermonising শুনিতে চায় না, কিন্তু প্রকৃতিপ্রদত্ত শক্তির সাহায্যে যিনি নাটক লেখেন, সুশিক্ষার বাণী তাঁহার লেখনী হইতে আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। যুবা পুত্র বিদ্যালাভের জন্য বিদেশে যাইতেছে, যাত্রাকালে বৃদ্ধ পিতা যে তাঁহাকে কয়েকটা উপদেশ দিবেন, ইহা অতি সহজ; সুতরাং পলোনিয়সও লেয়ার্টিসকে এইরূপ কয়েকটী কথা বলিলেন, কিন্তু এমনভাবে বলিলেন যে সেই উপদেশ কেবল লিয়ার্টিস্ একলা শুনিলেন না, শতাব্দী ত্রয় অতীত হইয়া গিয়াছে, আজও লোকে সেই উপদেশ শুনিতেছে, মান্যও করিতেছে।

পৌরাণিক ও প্রেমভক্তি বিষয়ক নাটক সকল লেখা হইতে লাগিল; বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও রাজকৃষ্ণ রায়ও ধর্ম্মমূলক নাটক লিখিতে লেখনী ধারণ করিলেন; বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণচরিত্র", নবীনের "কুরুক্ষেত্র", "প্রভাস" প্রভৃতি কাব্য, শিশিরকুমারের "অমিয়-নিমাই চরিত "প্রভৃতি পবিত্র গ্রন্থসকল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল; বঙ্গবাসীতে প্রতি সপ্তাহে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা হইতে লাগিল—বঙ্গমাতার ইংরাজি-শিক্ষিত সন্তানগণের চিন্তা-রাজ্যে একটী অপূর্ব্ব পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। গিরিশ বাবুর নাটক কেবল নাটক হিসাবেই বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে উৎকৃষ্ট রত্ন নহে, বাঙ্গালীর ভাবের ইতিহাসেও এক উজ্জ্বলতম পৃষ্ঠা।

অনেক নাট্যকবি-যশঃপ্রার্থী আমাদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের পাণ্ডুলিপি ফেরত পাইয়া বলিতেন, "থিয়েটারওলারা নিজেরাই নাটক লিখে নাম বাজাতে চায়, বাহিরের লোককে একেবারে ফিল্ড দেয় না"! যাঁহারা নাট্যশালার জন্য লিখিতে প্রয়াসী, এদেশের নাট্যশালার একটু ক্ষুদ্র ইতিহাসের সন্ধান লওয়া তাঁহাদের উচিত। তাহা হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে থিয়েটারওলারা সহজে নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই, অভিনয়োপযোগী ভাল নাটক যখন একেবারে পাওয়া গেল না, তখনই অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা লেখনী ধারণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সার্জ্জেণ্ট ব্যালেন্‌টাইনের ব্যারিষ্টারির অসাধারণ শক্তির কথা শুনিয়া আমি বরোদার গায়কোয়াড়ের মকর্দ্দমার বিবরণ একখানি বোম্বাইয়ের কাগজে পাঠ করিয়া একটা হৃদয়ের আবেগে "হীরকচূর্ণ" নাটকখানি লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা একটা সাময়িক খেয়াল মাত্র! আর নূতন প্রহসনের অভাবে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন সবার সমক্ষে আসিয়া আমাকে বলিলেন যে "আমি আগামী শনিবারে চোরের উপর বাটপাড়ি বলিয়া একখানি নূতন প্রহসন অভিনীত হইবে, এই বিজ্ঞাপন দিয়া ইর্যাস্‌ম্যাস্ জোন্সের বাড়ী প্ল্যাকার্ড ছাপিবার অর্ডার দিয়া আসিয়াছি,তুমি ঐ নাম দিয়া একখানা ফার্স চট্ করিয়া লিখিয়া দাও"—তাই দায়ে পড়িয়া একসন্ধ্যা ও পরদিন সমস্ত মধ্যাহ্ন পরিশ্রম করিয়া "চোরের উপর বাট্‌পাড়ি" খানি লিখিয়াছিলাম। যতদিন বাহিরের নাটক পাইব, ততদিন থিয়েটারের লোকের মধ্যে নাটককার হইবেন এ কথা কেহই মনে করেন নাই। যত নূতন নাটক অভিনয় করাইতে পারিবেন, নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের অর্থে ও যশে ততই প্রতিপত্তি বাড়িবে, সুতরাং গিরিশবাবুর ন্যায় দক্ষপ্রলেখনী-চালক ও অভিজ্ঞ অধ্যক্ষও তাঁহার নিজের নাটক অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কবির ভাল নাটক পাইলে তাহা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, বিমুখ কখনই হইতেন না।

মহারাজা স্তর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের নিকট বঙ্গের নাট্য কতখানি ঋণী, এ কথা অনেকেরই জানা নাই; কিন্তু তিনি যে নিজে একজন উৎকৃষ্ট নাটক-লেখক ছিলেন এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। "বিদ্যাসুন্দর" নাটক এবং "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" ও "উভয় সঙ্কট" নামক

দুইখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন তাঁহার নিজের রচনা। "কৃষ্ণকুমারী" নাটকের গীতগুলিও বোধ হয় মহারাজের রচিত। সেকালে যাঁহারা গীতে সুর সংযোগ করিতেন, তাঁহারা আপনাদের অভ্যস্ত কোন হিন্দী গানের শব্দের সহিত মিলাইয়া বাংলা পদ রচনা করিয়া না দিলে কোন ছন্দের উপর সুর বসাইতে পারিতেন না, সেইজন্য মহাকবি মধুসূদনও নিজের নাটকে নিজে গান রচনা করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণ রায়ের মত অক্লান্ত-কর্ম্মা লেখক বোধ হয় বঙ্গদেশে আজও জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভালমন্দের কথা বলিতেছি না, তবে তিনি সরস্বতীর সেবায় যে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। * * *

বেঙ্গল থিয়েটারে অতি দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়া তাঁহার রচিত "প্রহ্লাদ-চরিত্র" একদিন দর্শকের প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল। যখন পৌরাণিক কথা প্রায় পুরাতন হইয়া বসিতেছিল, দর্শকগণ যেন একটু মুখ বদলাইতে চাহিতেছিলেন, সেই সময় "ষ্টারের" জন্য "প্রতাপাদিত্য" লিখিয়া পণ্ডিতবর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বাংলার নাট্য-জগতে আর এক যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। ক্ষীরোদবাবুর অনেকগুলি নাটক ও উপন্যাস লিখিয়াছেন; এখনও তাঁর লেখনীর তেজ মন্দীভূত হয় নাই।

হাসিতে ভুলিয়া যাইতেছি, তাই বুঝি দ্বিজু মনের ব্যথায় মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান আমাদের অক্ষয় সম্পত্তি, পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদি-ক্রমে ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিব। আনন্দ দানের ন্যায় দান আর নাই। পুত্র আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে, এই আশায় কত ধনী নিজ-জীবন নিরানন্দে যাপন করিয়াও উত্তরাধিকারীর জন্য সম্পত্তি রাখিয়া যান, কিন্তু বিকারের তৃষার ন্যায় ধন-পিপাসার নিবৃত্তি নাই, কয়জন ধনীর পুত্র যথার্থ আনন্দ ভোগ করিতে পারে? হাসিকা প্রাণতোষিকা জীবনদায়িকা! যিনি একজনের বিরস অধরেও হাসি ফুটাইতে পারেন, তিনি পুণ্যকার্য্য করেন। দ্বিজু তাঁহার জাতিকে হাসির একটা নন্দন-কানন দিয়া গিয়াছেন; বংশ-পরম্পরায় বাঙ্গালী সেই আনন্দ-কাননে প্রবেশ করিয়া মন্দারের সৌগন্ধে প্রাণ পুলকিত করিতে পারিবে। দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলির জীবন জাতীয় ভাব, আর তাঁর নাটকের এক বিশেষ গুণ, তাঁহার নাটকে খুব action আছে; সুদক্ষ অভিনেতা তাঁহার কলা-শক্তি-প্রয়োগে অনেক সুযোগ ঐ সকল নাটকে পাইয়া থাকেন।

বলিয়াছি, ইতিহাস লিখিতেছি না, মোটামুটি নাট্য-সাহিত্যের কথা এইখানেই শেষ করিলাম।

কিন্তু যে নান্দীমুখ সকল শুভ কার্য্যের সূচনায় করিতে হয়, নানা কারণে তাহা আমায় উপসংহার-কালে করিতে হইতেছে। বঙ্গদেশের নাটক নাগরিক, যাত্রা তাহার পরম পূজনীয় গ্রাম্যজ্ঞাতি—পূর্ব্বপুরুষ। আমি নাট্যব্যবসায়ী, যাত্রার তর্পণ না করিলে আমার অপরাধ হইবে। তবে দুঃখের বিষয়, যাত্রা উঠিয়া যাইতেছে; এক্ষণে অধিকাংশ স্থলে যাত্রা বলিয়া যাহা অভিনীত হয়, অধিকারী মহাশয়েরা তাহার নাম দিয়া থাকেন "থিয়েটারী যাত্রা" কিন্তু আমার ন্যায় তাম্রকূট-ভক্তমাত্রেই জানেন যে শুদ্ধ নারিকেলের কলি হুঁকার জল ফিরাইয়া তামাক খাইলে যে মজা পাওয়া যায় রূপা-বাঁধানো হুঁকায় তার কিছুই পাওয়া যায় না, কেমন একটা ধাতব গন্ধ লাগে, মুখের কাছটা যেন ক্লেদপূর্ণ মনে হয়।

পরস্পরের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় না থাকিলেও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি বোধ হয় সকল সভ্যজাতির মধ্যে একরূপেই প্রকাশ পায়। আমাদের সেকালের কৃষ্ণযাত্রা ও ইটালির অপেরার মধ্যে প্রয়োগ-কলার একটী আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ইটালীর অপেরায় আরম্ভ হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত বিবিধ লীলা-তরঙ্গায়িত সুরের একটী প্রবাহ থাকে; আমাদের আগেকার যাত্রাতেও ঠিক তাহাই থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ রাধা রাখাল-বালক গোপী দূতী, সকলেই সুরে কথা কহিত, অপেরাতেও তাই! ইউরোপীয় ভাষায় তাহাকে recitation বলে। যাত্রায় একলার গান অপেরায় 'সোলো', দুইজনে পরস্পরে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বা কথা-কাটাকাটির গান অপেরার 'ডুয়েট', তিনজনের ঐ অপেরার 'ট্রাইও', যাত্রায় চার-ইয়ারীর গান অপেরার 'কোয়ার্টেট্,' যাত্রার দোয়ার্কি অপেরার 'কোরাস'। সামঞ্জস্যের

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়
চতুর্দ্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর
বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা
চতুর্দ্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর
ইতিহাস-শাখার সভাপতি

এই সুন্দর সজ্জার বর্ত্তমান কালে যাত্রার অধ্যক্ষগণ কেন বিসর্জ্জন দিলেন! আমাদের সঙ্গদোষে কি? দুইজনেই ধর্ম্মপথের পথিক, শাক্ত রক্ত বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন বলিয়া বৈষ্ণব কি তাঁহার বহির্ব্বাস তুলসীমালা তিলকের ভেক পরিত্যাগ করেন?

যাহা হউক যাত্রার পালা লেখার সূত্রে বঙ্গদেশে অনেক উচ্চ দরের কবির আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে এবং এখনও কয়েকজন সসম্মানে বিরাজিত আছেন। এই সকল কবিদের মধ্যে এক্ষণে অনেকেই অজ্ঞাত-নামা; গোপাল উড়ের "বিদ্যাসুন্দরের" টপ্পার রচয়িতা কে, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু কালের হিসাবে ঐ সকল গীতিগুলির বয়স শত বৎসরের উপর, তবু দেখিতে এখনও যেন ষোড়শী সুন্দরী! রাধাকৃষ্ণ অধিকারীর 'কৃষ্ণযাত্রা' ও কালী হালদারের 'নল-দময়ন্তীর' কবি কে, তাহা জানি না; কিন্তু গোবিন্দ অধিকারী যে তাঁহার যাত্রার পদকর্ত্তা নিজেই ছিলেন, তাহা জানি এবং জানিয়া গুরুজ্ঞানে তাঁহার চরণে প্রণাম করি। আমি তাঁহার বাড়ীতে ও তাঁহার আত্মীয়দের নিকট পালার পাণ্ডুলিপির জন্য বিস্তর অন্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা কিছুই দিতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে অধিকারী মহাশয়ের পুত্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তিনি পিতৃরচিত কয়েকটী গান শুনাইয়া প্রাণ জুড়াইলেন বটে কিন্তু পাণ্ডুলিপির বিষয় কিছুই বলিতে পারিলেন না।* * *

বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান্ মতিলাল ঘোষ মহাশয়দ্বয় যাত্রার পালা লিখিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। হরিপদ বাবুর "জয়দেব" নাটক ও যাত্রার ধর্ম্ম-বিষয়ক পালাগুলি অতি মনোহর। আর ভূষণ দাসের "অভিমন্যু বধের" পালায় অভিমন্যুর দুইটী গান বোধ হয় মতি বাবুর রচিত। ঐ গীত দুইটীতে বীণার কোমল সুরে করুণার কাতর ক্রন্দন যেন অক্ষরে অক্ষরে মিশাইয়া আছে! প্রাচীন অধিকারীগণের তিরোভাবের পর যাত্রার অবসন্ন দেহকে সঞ্জীবিত করেন দুইজন,—এক সাধক বৈষ্ণব শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ, আর ভক্তকবি মতি লাল রায়। মতি রায় ও নীলকণ্ঠ দুইজনেরই কণ্ঠে বীণাপাণি কবিত্ব এবং সঙ্গীত উভয় শক্তিই প্রদান করিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণ ও গোবিন্দর স্মৃতি স্মরণ করিয়া যে সকল বাঙ্গালী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, তাঁহাদের চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়াছেন নীলকণ্ঠ; আর সাধারণ যাত্রার অতি-অবনতির দিনে মতি রায় মহাশয় নিজের রুচি এবং কবিত্ব-শক্তির দ্বারা উহাকে সুসংস্কৃত করিয়া তোলেন। মতিবাবুর পুত্র ধর্ম্মদাসও গৌরবের সহিত পিতৃনাম রক্ষা করিতেছিলেন—হায়, অকালে কাল তাঁহাকেও কোলে টানিয়া লইল! হরু ঠাকুর, ভোলানাথ দাস, এন্টনি সাহেব, দাশরথি রায় এবং বঙ্গদেশে পূর্ব্বে যে সকল নারী-কবিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামমাত্র উচ্চারণ করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।* * *

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

একটি গোলাপ

একটি গোলাপ দিলে কেন? দিলে হ'ত দুটো,—
নয়ত গোটা-কতক নিয়ে একটি তোড়া বেঁধে';
কল্পনা সে ঘিরে' আমার দে'খায় ভ'রে মুঠো,
মাধুরী এর, চিন্তা যে এর,—ভাবায় মোরে সেধে'!
রহস্য গো এত ফুলের মাঝে
আগে জানিনি কই তা' যে!

আগুন আছে এর ভিতরে, নয়ত জগৎখানি,—
কোমল ইহার পাপ্‌ড়িগুলি ঘিরে';
সুষমা এর গন্ধ হ'য়ে করুচে কানাকানি,
পূর্ণতা এর এতই জানি কি রে!
একটি গোলাপ কেন আমায় দিলে?
মাধুরী এর মজায় তিলে তিলে!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

৮

গোপাল বেশ সূক্ষ্মবুদ্ধির সহিত সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিল, কিন্তু অবস্থা-গতিকে সামান্য একটু গোলযোগ দাঁড়াইয়া গেল।

রামগঞ্জে গিয়া দত্ত মহাশয় ভগ্নী ও ভগ্নীপতির কাছে সত্য-মিথ্যা নানা কথায় তাঁহার দুঃখ জানাইলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে কৃপাময়ী রাত্রে গোপালকে ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। গভীর রাত্রে তিনি যখন ঘুমাইয়া ছিলেন, তখন কৃপাময়ী তার বুকের উপর চাপিয়া বসে, আর গোপাল একখানা ছোরা হাতে করিয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ কাবু করিয়া তাঁহাকে দিয়া তাহারা দলিল সহি করাইয়া লইয়াছে,আর ভোর না হইতেই তাঁহাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া রেজেষ্ট্রী অফিসে লইয়া গিয়াছে। সেখানে তাঁহাকে এমন শাসাইয়াছিল যে তিনি ভরসা করিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। কোনও মতে দলিল রেজেষ্টারী করিয়া দিয়া তিনি প্রাণ লইয়া রাক্ষসী স্ত্রীর হাত হইতে পলাইয়াছেন ইত্যাদি।

রামগঞ্জের এক ভদ্রলোক হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাপন্ন উকিল ছিলেন। তিনি এই সময় গ্রামে আসিয়াছিলেন। দত্ত মহাশয়ের ভগ্নীপতি শ্যালককে তাঁহার কাছে লইয়া গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া উকীল মহাশয় তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় ও উদ্যোগে দত্তজা অবিলম্বে জেলায় গিয়া নালিশ রুজু করিয়া দিল।

রামগঞ্জে দত্ত মহাশয়ের কয়েক ঘর প্রজা ছিল, তাহাদিগের নিকট কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া মকর্দ্দমার সূত্রপাত হইল।

গোপাল তো ইহাই চায়। সে প্রবল বেগে মকর্দ্দমার তদ্বির করিতে লাগিল, অজস্র অর্থব্যয় হইতে লাগিল। যে পরিমাণ খরচ হইল, তার দশগুণ টাকা গেল গোপালের পেটে। কৃপাময়ীকে বাধ্য হইয়া সম্পত্তি রেহান দিয়া টাকা ধার করিতে হইল—সে বন্দোবস্তও গোপালই করিয়া দিল। সম্পত্তির স্বত্ব অনিশ্চিত বলিয়া রেহান দিয়া খুব বেশী টা[illegible] উঠিল না। তখন কতক কতক সম্পত্তি বিক্রয় করা [illegible] হইল। গোপাল সে বন্দোবস্তও করিয়া দিল।

পক্ষান্তরে দত্ত মহাশয়ও বিস্তর টাকা খরচ করি[illegible] মকর্দ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। তাঁর খরচ [illegible] হিসাবী কিছু হয় নাই, কিন্তু তবু তাঁহাকে সমস্ত সম্প[illegible] রেহান দিতে হইয়াছিল। ফলে স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া সমস্ত সম্পত্তি দুইবার করিয়া স্বতন্ত্র বন্ধকে আবদ্ধ করি[illegible] ফেলিলেন।

সব-জজ আদালতে দত্ত মহাশয় জিতিলেন। সে রায়ে[illegible] বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল। গোপাল মহা-সমারো[illegible] হাইকোর্টে যাত্রা করিল এবং দুই বৎসর ধরিয়া বার বা[illegible] করিয়া কলিকাতায় গিয়া মকর্দ্দমার তদ্বির করিয়া এম[illegible] ব্যবস্থা করিল যে কৃপাময়ীর সপক্ষে রায় প্রকাশ হই[illegible] দেখা গেল যে কৃপাময়ীর অর্দ্ধেকের বেশী সম্পত্তি বিক্রয় এ[illegible] অপরার্দ্ধ সম্পূর্ণ মূল্যে রেহানাবদ্ধ হইয়াও গোপালের কা[illegible] কৃপাময়ী প্রায় হাজার টাকা পরিমাণে ঋণী হইয়া আছে।

ব্যাপার দেখিয়া কৃপাময়ী মাথায় হাত দিয়া বসি[illegible] পড়িল। সে হিসাব-পত্র বুঝিত না, গোপালের উপর তা[illegible] পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস তার স্খলিত হয় নাই[illegible] কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া সে আকাশ হইতে পড়িল। সে দেখি[illegible] যে গোপালের ঋণ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে তাহার পে[illegible] চলিবারও উপায় থাকিবে না। দত্ত-গিন্নী মাথায় হাত দি[illegible] কাঁদিতে লাগিল।

গোপাল তখনও তাহাকে ভরসা দিতে লাগিল; বলি[illegible] "এর এক পয়সাও তোমায় দিতে হবে না। আমারে[illegible] ডিক্রীতে খরচাই তো প্রায় তিন হাজার টাকা পাওনা হয়ে[illegible] তারপর দত্তজা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আ[illegible] করেছেন তার ওয়াসিলাত দিতে হবে। পাঁচ সাত হা[illegible] টাকা তার কাছে আছে, সে টাকা না নিঙড়ে [illegible] ছাড়চি না।"

তাই গোপাল খরচার ডিক্রীজারির দরখাস্ত করিল। তাহা লইয়া কিছুদিন সদরে হাঁটাহাঁটি এবং পয়সার শ্রাদ্ধ হইল। তারপর দত্ত মহাশয়ের উপর জারী দিয়া মবলক একশত টাকা আদায় হইল। দত্ত মহাশয় একেবারে নিঃস্ব হইলেন।

গোপাল প্রথমে ফিরিয়া মুখভার করিয়া বলিল, "তাই তো. হতভাগা যে একেবারে ফতুর হয়ে গেছে, তা জানলে কে এ মকর্দ্দমা করতো! যাক, তার আর চারা নেই। কিন্তু আমার এ ছ' হাজার টাকার কি ব্যবস্থা করা যায়? এ টাকা যদি আমার হতো, তবে তো কোন কথাই ছিল না,—তোমার টাকা যা, আমার টাকাও তাই। এ টাকা আমি সান্ন্যাল মশায়ের কাছে অনেক করে ধার নিয়েছি, সান্ন্যাল মশায় যে আমাকে উৎখাত করে তবে ছাড়বে।"

দত্ত-গিন্নী বলিল, "তাই তো, তবে উপায়?"

উপায় চট করিয়া গোপাল বলিল না। সে বলিল, "দেখি, একটু ভেবে দেখি।"

এদিকে হঠাৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মারা গেলেন। ভবেশ রায় দত্ত পরিবারের জন্য একা সমস্ত গ্রামকে এক-ঘরে করিয়া বসিয়াছিল, সে এই সুযোগে সে ঝাল ঝাড়িবার চেষ্টা করিল। আর তা ছাড়া গ্রামের লোকের কাছেও ব্যাপারটা অসহ্য ঠেকিল।

দত্ত-গিন্নী যতদিন দত্ত মহাশয়কে খাড়া রাখিয়াছিলেন, ততদিন তাহারা ব্যাপারটাকে মোটের উপর কৌতুকের চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যখন সে দত্ত মহাশয়কে সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়া উৎখাত করিয়া তাহাকে মামলা মকর্দ্দমায় জের-বার করিতে লাগিল, আর তার উপর ভদ্রলোকের মেয়ে হইয়া নিজের বাড়ীর উপর গণিকার মত গোপালের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল, তখন সবারই অসহ্য হইয়া উঠিল।

গ্রামের লোকে এখন দত্তগিন্নির উপর বেশ উৎপাত আরম্ভ করিল। নানারকম সামাজিক উৎপীড়ন দত্তগিন্নী নির্ব্বিবাদে সহ্য করিল। সে আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া আপনার ঘরে গৃহকর্ম্মে রত রহিল। আর পর তার বাড়ীতে ইট-পাটকেল এবং ময়লা পড়িতে সুরু হইল। পথে ঘাটে তাহাকে ও গোপালকে সকলে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। পরিশেষে একদিন রাত্রে সত্য সত্যই দত্ত-গিন্নীর শয়ন-গৃহে তাহারা আগুন লাগাইয়া দিল।

গোপাল তখন সেই ঘরেই শুইয়াছিল, সে তখনও ঘুমায় নাই। আগুন লাগাইবার পূর্ব্বেই সে লোকের পায়ের শব্দ শুনিয়া মৃদু পদক্ষেপে বাহির হইয়া গিয়াছে। সেই কোণায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে লোক বেড়ায় আগুন ধরাইয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। গোপাল তাড়াতাড়ি বেড়াটা টানিয়া ফেলিল। ততক্ষণে চালায় আগুন একটু ধরিয়া উঠিয়াছে। গোপাল অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত চালা হইতে দুই হাতে জ্বলন্ত খড় টানিয়া ফেলিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিবাইয়া ফেলিল। ঘরের সে দিকটা একদম ফাঁক হইয়া রহিল।

ইহার পর গোপাল বলিল, "আমি বলি বউ ঠাকরুণ, চল, আমরা এ গ্রাম ছেড়ে যাই। সম্পত্তি যা' অবশিষ্ট আছে, বেচে কিনে চল দুজনে গিয়ে বৃন্দাবনে বাস করি গে। সেখানে বেশ শস্তায় থাকা যাবে, আর দেশের এ খেঁচাখেঁচি সেখানে পৌঁছুবে না।"

কৃপাময়ী বলিল, "তুমি যাবে কি? তোমার ঘর বাড়ী, আর ছেলে পিলে না হোক, তোমার স্ত্রী, তোমার ছোট ভাই —এদের সব ফেলে যাবে কি?"

"এতদিন পরে এই কথা বল্লে কৃপাময়ী! তোমাকে ছাড়া আমার আর কিছুরই দরকার নেই। আমি শুধু চাই তোমাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে। স্ত্রী আছে, ভাই আছে, আমার জমি-জমা যা' আছে, দেশে থাক। তুমি আমি উধাও হয়ে বেরিয়ে পড়ি, চল।"

গোপালের এই স্বার্থত্যাগী প্রেমে দত্তগিন্নী অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেচে কিনে কি-ই বা থাকবে, তোমার টাকাই হয় তো হবে না।"

"এখনো তুমি আমার টাকায় তোমার টাকায় তফাৎ করছো? আচ্ছা, তবে এই নাও"—বলিয়া তাহার বরাবর

কৃপাময়ী যে তমশুক লিখিয়া দিয়াছিল, সেখানা বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া কুচি-কুচি করিল।

অবাক্ বিস্ময়ে কৃপাময়ী চাহিয়া রহিল।

সমস্ত সম্পত্তি মায় বাস্তু-ভিটা বিক্রয় করিয়া প্রায় আট হাজার টাকা হইল। ইহা করিতে কিছুদিন সময় গেল। তার পর গোপাল একদিন দত্তগিন্নীকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

বৃন্দাবনে গিয়া তাহারা দুইজনে প্রায় এক বৎসর বাস করিল। টাকাটা গোপাল খুব সাবধানে নিজের কাছে রাখিল। দত্তগিন্নীর নিজের সিন্দুক ছিল, কিন্তু তাহাতে সে অত টাকা রাখিতে ভরসা করিল না। তাহার সঞ্চিত শ' তিনেক টাকা, আর হাজার খানেক টাকার গহনা ছিল।

একদিন গোপাল দত্তগিন্নীর আঁচল খুলিয়া সিন্দুকের চাবি চুরি করিল। তার পর দত্তগিন্নীর সঙ্গে পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়া যখন কোথাও সে চাবি পাইল না, তখন গোপাল বলিল,"তবে তো আর তোমার সিন্দুকে কিছু রাখা চলে না।"

কাজেই সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা এবং গহনা বাহির করিয়া গোপালের সিন্দুকে সে-সব রাখা হইল।

তার পর আর দত্তগিন্নী টাকা বা গহনার কোন খবর লওয়াও আবশ্যক বোধ করে নাই। ইত্যবসরে সেগুলি সমস্ত সিন্দুক হইতে অদৃশ্য হইয়া কলিকাতার কোন ব্যাঙ্কের নামে হুণ্ডীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গোপালচন্দ্রের বুক-পকেটে স্থান লাভ করিয়াছিল।

ইহার পর একদিন গোপাল একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "বড় বিপদ, সান্ন্যেল মশায় তাঁর টাকার দাবীতে আমার সম্পত্তি বাড়ী ঘর দোর সব ক্রোক্ করেছেন। একবার দেশে যেতে হচ্ছে, নইলে বউ আর ভাইগুলো সব না খেয়ে মারা যাবে। তুমি ক'টা দিন কষ্টে-সৃষ্টে থাকো, আমি এলাম বলে।"

গোপাল চলিয়া আসিল। সিন্দুকের চাবি সে সঙ্গে লইয়াই আসিল। অনেকদিন দত্তগিন্নী তার প্রতীক্ষার বিনিদ্র নয়নে শূন্য সিন্দুক পাহারা দিয়া কাটাইল।

গোপাল দেশে গিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল। বিপদের পর বিপদে তাহাকে একেবারে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, সে গোলযোগ মিটাইয়াই আসিতেছে। মাস চারেক পরে কৃপাময়ী গোপালের ভাইয়ের নিকট হইতে পত্র পাইল, গোপাল হঠাৎ মারা গিয়াছে।

কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করিয়া কৃপাময়ী কামার ডাকিয়া সিন্দুক ভাঙ্গাইল। শূন্য সিন্দুক দেখিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। এখন উপায়?

উপায় ঠিক করিতে দত্তগিন্নীর বেশী বিলম্ব হইল হইল না। গোবিন্দজীর পরিত্যক্ত ভাঙ্গা মন্দিরের এক কোণায় এক বাঙ্গালী বাবাজী এক বিগ্রহ বসাইয়া যাত্রীদের নিকট বেশ দু'পয়সা রোজগার করেন,—বাবাজীকে কৃপাময়ী অনেক দিনই দেখিয়াছে, আলাপ-সালাপও করিয়াছে। বাবাজীর চেহারা সুন্দর, তাঁহার বিগ্রহের বাবদে প্রাপ্তিও মন্দ নয়। কিন্তু উপস্থিত, বাবাজীর সেবা-দাসী নাই।

গোপালের অনুপস্থিতিতে কৃপাময়ী বাবাজীর আখ্ড়ায় আনাগোনা করিয়াছে। সে এক রকম ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল যে গোপাল যদি নাই আসে, তবে বাবাজীকেই তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া লইবে।

কাজেই এখন কৃপাময়ী ভেক লইয়া বাবাজীর সঙ্গে কণ্ঠীবদল করিয়া ফেলিল।

বাবাজীর সঙ্গে কিছু দিন মন্দ কাটিল না। বাবাজী রূপবান, তাঁর অবস্থাও স্বচ্ছল। কৃপাময়ী রূপসী নয়, কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠবে সে এখনও অনেক কিশোরীকে হার মানাইতে পারে; আর, স্বভাব তার যতই বলিষ্ঠ ও প্রভুত্বপ্রিয় হউক সাধারণতঃ বাহিরে সে বড়ই নরম ও নিরীহ; কথা বড় বেশী কয় না, যা কয় তাও মৃদুস্বরে। তা' ছাড়া সে কর্ম্মঠ ও সেবাসৌষ্ঠবে অতুলনীয়। ইচ্ছা হইলে তাহার পক্ষে যে কোন পুরুষের প্রীতি আকর্ষণ করা কাজেই খুব কঠিন নয়।

কাজেই কিছু দিন মন্দ কাটিল না। কাজ-কর্ম্ম বিশেষ কিছু ছিল না। মন্দিরটা ঝাঁট-পাট দিয়া পরিষ্কার করা, ঠাকুরের সেবার আয়োজন করা, আর রান্না করা।

তা' ছাড়া বাবাজীর সঙ্গে মাঝে মাঝে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইত। কিন্তু প্রায়ই বাবাজী নিজে ভিক্ষায় বাহির হন্, কৃপাময়ীকে মন্দিরেই রাখিয়া যাইতেন, তখন যাত্রী আসিলে কৃপাময়ীই তাহাদিগকে নির্ম্মাল্য চরণামৃত প্রভৃতি বিতরণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত।

এ সমস্ত কার্য্যই সে এতটা সৌষ্ঠব ও নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিত যে বাবাজী শীঘ্রই তার অত্যন্ত অনুরক্ত ও ভক্ত হইয়া উঠিলেন। কৃপাময়ী বাবাজীর উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল প্রীতি দেখিয়া আনন্দ বোধ করিল। সে নিজেকে আরও একাগ্রতার সহিত সেবায় নিযুক্ত করিল, আরও বেশী নম্র, আরও সে অবনত হইয়া পড়িল।

কিন্তু দেখা গেল যে বাবাজীর প্রেম যতই প্রবল হউক, টাকা-পয়সার উপর তাঁর আকর্ষণ তার চেয়ে অনেক বেশী। বাবাজীর রোজগার নেহাৎ মন্দ ছিল না, কিন্তু যথার্থ বৈরাগীর মত তিনি "ডোর কৌপীন" বই কোন কিছুতেই অর্থব্যয় করিতেন না এবং নিতান্ত অবৈরাগীর মত সকলই সঞ্চয় করিতেন। কোথায় যে তিনি সঞ্চিত অর্থ রাখেন, সে কথা কৃপাময়ী কিছুতেই জানিতে পারিল না। বাবাজীর অর্থের প্রতি তীব্র দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরিত্রে যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ়তা ছিল, তাহা কৃপাময়ী শীঘ্রই টের পাইল। বাবাজীর অনুপস্থিতিতে মন্দিরে যাহা কিছু প্রাপ্তি হইত তাহা গোপনে হস্তগত করিবার দুই-একটা চেষ্টা করিয়া কৃপাময়ী হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। বাবাজী এ বিষয়ে বিষম শক্ত।

কাজেই কয়েক মাস থাকিয়া কৃপাময়ী হাঁফাইয়া উঠিল। এমন করিয়া কয় দিন থাকা যায়! মোটা ভাত খাইয়া আর একখানা ভগবান বস্ত্র পরিয়া দিন কাটাইবার মত মেজাজ কৃপাময়ীর ছিল না। তা ছাড়া সে চিরদিন দত্তজাকে শাসন করিয়া আসিয়াছে। এখন সে দেখিতে পাইল, বাবাজী অতি সহজে তাহার উপর দিব্য প্রভুত্ব করিতেছেন। সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? সে কেবল মাঝে মাঝে গালে হাত দিয়া তার অতীত গৌরবের কথা ভাবিত, অনুগত স্বামীর কথা, তার সম্পদের কথা, গোপালের কথা, নিজের অতিলোভের কথা, গোপালের বঞ্চনার কথা, আর তার হঠাৎ মৃত্যুর কথা ভাবিত। ভাবিত আর ভবিষ্যৎ সুযোগের আশায় নীরস বর্ত্তমানকে কোন মতে সহিয়া যাইত।

একদিন মন্দিরে আসিল একদল যাত্রী। দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া কৃপাময়ী সরিয়া গেল। তার পর পথে তাহাদের সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিল। ইহারা দেশের লোক। ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া কৃপাময়ী জানিতে পারিল, গোপাল মরে নাই, কেবল তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে। সেই যাত্রীদলের সঙ্গেই দত্তগিন্নী দেশে ফিরিল।

৯

বলা বাহুল্য, গোপালের মৃত্যুর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কৃপাময়ীকে দিয়া তাহার যা প্রয়োজন তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল। এখন দত্তজার সমস্ত সম্পত্তি এবং কৃপাময়ীর নিজস্ব সব স্ত্রীধন তাহার হস্তগত হইয়াছে। যাহা সে বেনামীতে কিনিয়া রাখিয়াছিল, এখন সে তাহা বেনাম-দারদের নিকট হইতে নাদাবীপত্র লইয়া নির্ব্বিবাদে তাহাতে স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করিল। দখল সে বরাবরই রাখিয়াছিল। এখন সে গাঁয়ের দশের একজন। দত্ত মহাশয়ের পরিত্যক্ত ভিটায় টিনের ঘর উঠাইয়া একটা পাকা বাড়ী গাঁথিতে আরম্ভ করিল। তাহার বন্ধ্যা পত্নীকে তাড়াইয়া দিয়া সে দ্বিতীয় সংসার করিল। এ মেয়েটি খাঁটি ঘোষ-বংশীয়।

ইতিমধ্যে দত্ত মহাশয়ের পক্ষে তাঁহার উৎসাহদাতা হাইকোর্টের উকীলবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিলাতে আপীল দাখিল করিয়া দিয়াছিলেন। সে আপীলের খবর দত্ত-গৃহিণীর পক্ষের উকীল পাইয়া দত্তগিন্নীর নামে বহু পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন; গোপালকেও দুই একবার লিখিয়াছিলেন। তাহারা তখন বৃন্দাবনে। ঘটনাচক্রে এ সব পত্র তাহাদের কাছে পৌঁছায় নাই।

বিলাতে তিন বৎসর পর আপীলের শুনানী হইয়া একতরফা ডিক্রী হইয়া গেল, দত্তমহাশয়ের দানপত্র অসিদ্ধ সাব্যস্ত হইয়া তাঁহার স্বত্ব-দখল প্রতিষ্ঠিত হইল।

হঠাৎ এই সংবাদ শুনিয়া দত্তমহাশয় স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

আপীলের খরচ তিনি দেন নাই, তাহা চালাইয়াছিলেন তাঁহার উকীল, তাই দত্তজা এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতেন না।

গোপাল সংবাদ শুনিয়া বজ্রাহত হইল। সে কলিকাতায় তখনি ছুটিয়া গেল। জানিতে পারিল, প্রায় তিন চার হাজার টাকা খরচ করিতে পারিলে বিলাতে ছানি করা যাইতে পারে। ছানি করিলে যে বিশেষ ফল হইবে, এ আশ্বাস তাহাকে কেহ দিল না।

যথাসময়ে দত্তমহাশয় ডিক্রীজারী করিয়া নিজের সমস্ত সম্পত্তিতে পুনরায় দখল লইলেন, গোপালকে লাঙ্গুল গুটাইয়া তাহার বিহ্বরে আশ্রয় লইতে হইল।

গোপালের পাকাবাড়ী প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল, দত্ত মহাশয় তাহা সম্পূর্ণ করিয়া তাহাতে বসবাস করিতে লাগিলেন। গোপাল ইটকাঠের জন্য আদালতে নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইল, কিন্তু এবারে গ্রামবাসীরা তাহাকে রীতিমত শাসন করিল, সান্যাল মহাশয়ও তাহাকে সাহায্য করিলেন না। কাজেই সে আপাততঃ কিলচুরি করিয়া রহিল।

দত্ত মহাশয় সম্পত্তি ফিরিয়া পাইলেন, এবং তার উপর ফাও-স্বরূপ একখানা পাকাঘর ওয়াসিলাত স্বরূপ পাইলেন। কিন্তু চারিদিক হইতে তাঁহার পাওনাদারেরা আসিয়া তাঁহাকে ছাঁকিয়া ধরিল। সকলের পরামর্শে তিনি গোপালের বিরুদ্ধে একটা ওয়াসিলাতের মকর্দ্দমা করিলেন। সেই বাবদে গোপালের সম্পত্তি বাড়ী ঘর তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া হাজার দুই টাকা আদায় করিলেন। ইহাতে তাঁহার ঋণ সামান্যই শোধ হইল। বাকী ঋণের জন্য তাঁহার অর্দ্ধেকের উপর সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল। রহিল কেবল ভদ্রাসন ও পাচশত টাকা মুনাফার সম্পত্তি ও দুই হাজার টাকা ঋণ।

কিন্তু শীঘ্রই দত্তমহাশয় এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন যে এই বিপুল সম্পত্তি ভোগ করিবে কে? যতদিন দত্তগিন্নী ঘরে ছিলেন, ততদিন এ প্রশ্ন তিনি মনেও ভাবিতে সাহস করেন নাই, কিন্তু এখন তাঁহার বংশরক্ষার প্রয়োজনটা ভয়ানক তীব্র হইয়া উঠিল।

সুতরাং বিবাহের আয়োজন হইল। গ্রামের লোকে উৎসাহের সহিত তাঁহার সহায়তা করিল। নানা স্থানে মেয়ের সন্ধান হইতে লাগিল। দত্তজার বয়স এবং তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস এবং তদুপরি সম্পত্তির স্বল্পতা প্রভৃতি হেতুতে অনেক স্থলেই কথাবার্ত্তা অগ্রসর হইতে পারিল না। কিন্তু এক দুঃস্থ পিতা কোনও মতে কন্যা-বলির সুব্যবস্থা করিতে না পারিয়া এবং দত্ত মহাশয়ের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে প্রবঞ্চিত হইয়া নিজের বিংশ-বর্ষীয়া কন্যাকে দত্তমহাশয়ের ঘাড়ে চাপাইতে সম্মত হইলেন।

উভয় পক্ষেই তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিবার জন্য খুব আগ্রহ দেখা গেল দত্তজা ভাবিলেন যে অনেক খুঁজিয়া যদি বা একটা মেয়ে পাওয়া গিয়াছে এটা হাত-ছাড়া না হইয়া যায়। মেয়ের পক্ষ ভাবিল, অবশেষে বিনা পয়সায় মেয়ে পার করিবার এমন সুযোগ যদি ঘটল তবে সেটা কোন মতে না ফস্কিয়া যায়! কাজেই পঞ্জিকার সমস্ত বাধা এক "অরক্ষণীয়ার" জোরে কাটাইয়া সপ্তাহ-মধ্যে ভাদ্র মাসেই দিন স্থির করা হইল। কন্যাপক্ষ মেয়ে তুলিয়া আনিয়া বিবাহ দিবেন।

একদিন ভোর বেলায় গোপাল খেয়াঘাটে পার হইবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল। নৌকা ভিড়িলে সে সেদিকে অগ্রসর হইল। পর মুহূর্ত্তে সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল এবং চট্ করিয়া ঘুরিয়া চোঁচা দৌড় মারিল। তাহার পর আর কেহ তাহাকে গ্রামে দেখে নাই।

সেই খেয়ায় পার হইয়া আসিল একখানা ডুলির মধ্যে একটি মেয়ে এবং তাহার বাপ। আর সেই সঙ্গে নামিল একটি বৈষ্ণবী। মেয়ে লইয়া তাহার পিতা নদীর ধারে নটবর দাসের বাড়ী গিয়া উঠিল, বৈষ্ণবী ঘোমটা টানিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল।

দত্ত মহাশয় তাঁহার নূতন পাকা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় বৈষ্ণবী আসিয়া ধীরে ধীরে মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া তুলিয়া সেই ঘরের দিকে উঠিয়া আসিল। দত্ত মহাশয় মুখ চোখ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

দত্ত মহাশয়কে কোন কথা না বলিয়াই বৈষ্ণবী

ওরফে দত্তগিন্নী ঘরে ঢুকিল। একবার চারিদিকে সে চাহিয়া দেখিল। একখানা তক্তাপোষের উপর কয়েকখানা নূতন রংতে শাড়ী নব বধুর জন্য রাখা ছিল। গেরুয়া কাপড় ছাড়িয়া তাহার একখানা লইয়া সে পরিল। বলা বাহুল্য, এই স্বচ্ছ বস্ত্রের ভিতর দিয়া তাহার সুগঠিত দেহ সম্যক রূপে প্রকাশিত হইল। চুলটা ভাল করিয়া আঁচড়াইয়া সিন্দুরের টিপ কাটিয়া ও সিঁথিতে সিন্দুর দিয়া সে স্তব্ধ ভীত বিমূঢ় দত্ত মহাশয়ের কাছে দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল, "কি, বিয়ের আয়োজন হচ্ছে যে?"

দত্ত মহাশয় নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া লইয়া বলিলেন, "তা, তাই কি—?"

দত্তগিন্নী আরও কাছে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে সব হবে না, ওদের বিদায় করে দাও।"

দত্তজা কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। গিন্নি তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গেল, আর সেখানে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া একটি চুম্বন করিল।

দত্তজা একেবারে গলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রধান বর-কর্ত্তা কানাই ও পুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া তাগাদা করিলেন যে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধের ও গন্ধ পাঠাইবার আয়োজন করিতে হইবে।

দত্তজা আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী মশায় একটু বিঘ্ন ঘটেছে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কি রকম বিঘ্ন?"

দত্তজা। আজ বোধ হয় বিয়ে হতে পারবে না।

চক্রবর্ত্তী। আরে রাম বল, অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহে আবার বিঘ্ন কি? হতেই পারে না। এ সব বাজে কথা। ভাল কথা, কয়েক জন এয়ো যে এখনি চাই। কানাই, যা তো ভবির মা আর কুসুমকে ডেকে নিয়ে আয়।

একখানা সম্মার্জ্জনী হস্তে দত্তগিন্নী বাহির হইয়া বলিল, "দরকার হবে না চক্রবর্ত্তী মশায়, আমি এয়ো আছি। নতুন বউকে আর আপনাদের সবাইকে অভ্যর্থনার আয়োজনও করে রেখেছি।" বলিয়া ঝাঁটা গাছা উঠাইল। "এখন বিদায় হোন্।"

কানাই কট-মট দৃষ্টিতে চাহিল; দত্তজা কাতর নয়নে চাহিলেন; চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনেকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া শেষে বলিলেন, "তাই তো বউ মা, তাই তো—তা' চল কানাই একবার চৌধুরী-বাড়ী"—বলিতে বলিতে কানাইকে এক রকম ঠেলিয়া লইয়া তিনি বাহির হইলেন।

গ্রামে একটা প্রচণ্ড হট্টগোল বাধিয়া গেল। দত্তজাকে বার বার সকলে ডাকিয়া পাঠাইল। দত্তগিন্নী তাঁহাকে যাইতে দিল না। শেষে সকলে দল বাঁধিয়া দত্তজার কাছে আসিল। ঘোরতর তর্ক হইল। দত্তগিন্নীর যদিচ স্বল্প-ভাষিণী বলিয়া খ্যাতি ছিল, তথাপি উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি দত্তজাকে পিছনে ঠেলিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে সকলের সঙ্গে একা যে বাক্-যুদ্ধটা করিলেন, তাহা ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা।

একজন যুবক বলিল,"হাঁ দত্তজা, আপনি না বংশ-রক্ষার জন্য বড় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন?"

নটবর দত্ত বলিলেন, "তা দোষটা কি হয়েছে? বংশ বল, দণ্ড বল, দড়ি বল, কলসী বল, একা দত্ত-গিন্নীই যে ও'র সব।"

শরৎ দত্তকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিবার পক্ষপাতী লোক বেশী ছিল না। কেন না, হউক পরের মেয়ে, দত্ত গিন্নী যখন আবার ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়াছে, তখন তাহার সতীন করিয়া নিরাপরাধ মেয়েটির নিশ্চয় মৃত্যু কেহ কামনা করিতে পারিল না। কিন্তু ভদ্রলোকের জাত-রক্ষার উপায় কি? গ্রামের মধ্যে বিবাহের যোগ্য দুই-একটি যুবক ছিল, আর তা' ছাড়া মৃত-দারও দুই একজন ছিলেন। স্থির হইল যে মেয়েটা তাহাদিগকে দেখাইয়া তাঁহাদের কাহাকেও বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতে হইবে। সংকল্পিত বরেরা সকলেই প্রবল বেগে এই রকম ঘাড়ে পড়া মেয়ে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন। যাহা হউক গ্রামবাসীরা সবাই মিলিয়া মেয়েটিকে দেখিতে চলিলেন।

মেয়েকে সাজাইয়া সভার মধ্যে উপস্থিত করা হইল। দিব্য মেয়েটি। সে ফরসা নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রীতে তার অনাড়ম্বর দেহখানি ভরিয়া রহিয়াছে। ঈষৎ ভীত ঈষৎ ক্ষুব্ধ, ঈষৎ লজ্জিত, অথচ দৃঢ়, চঞ্চল দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তের

মধ্যেই সভাকে অভিভূত করিল। তখন যুবক ও মৃতদার দিগের মধ্যে এক রকম কাড়া-কাড়ি লাগিয়া গেল। দেখা গেল, এই ভদ্র লোকটিকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত।

সেই রাত্রেই বিবাহ হইয়া গেল।

দত্ত-গিন্নী পূর্ব্বের মত নির্ব্বিকার চিত্তে সংসার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এবার দত্তজাকে কয়েক বৎসর একঘরে হইয়া থাকিতে হইল।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

বিস্ফোরকের উপাদান

রাম-রাবণের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া 'মিত্র-শক্তির' সহিত 'শত্রু সেনার' যুদ্ধ পর্য্যন্ত বহু যুদ্ধ হইয়াছে—সর্ব্বত্রই যুদ্ধের উদ্দেশ্য, বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া জব্দ করা। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার জন্য যে সমস্ত দ্রব্য-সম্ভারের সহায়তা গ্রহণ করা হয়, তাহার বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রাচীন কালে গদা, ধনুর্ব্বাণ, তরবারি প্রভৃতিই ছিল যুদ্ধের প্রধান উপকরণ। তখনকার যুদ্ধ অধিকাংশই বীরে-বীরে সম্মুখ-যুদ্ধ হইত; কাজেই যথার্থ শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয়ও পাওয়া যাইত। যুদ্ধে বিস্ফোরকের প্রয়োগ যেদিন আরম্ভ হইল, সেদিন হইতে প্রকৃত বীরগণ যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, উহা "ছোট" লোকের 'ব্যবসা' হইয়া দাঁড়াইল; কারণ বিস্ফোরক, বীর বা কাপুরুষ, ভদ্র "বা" ইতর ভেদ করে না। বিস্ফোরক ছাড়িলে বীর ও কাপুরুষ উভয়েরই এক ব্যবস্থা—চম্পট-প্রদান! নিতান্ত পক্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া আত্ম-রক্ষা করা ও তদবস্থাতেই প্রতি-অস্ত্র-বিস্ফোরক নিক্ষেপ করা। কিন্তু ইহাতেও এক বিপদ। বিস্ফোরক-প্রক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই যে ধূম্র নির্গত হয়, তাহা লুকাইবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। কাজেই এমন-ধারা বিস্ফোরক জোগাড় করা দরকার, যাহা প্রয়োগে ধূম নির্গত হইবে না।' ইহাই নির্ধূম (smoke-less) বারুদের সৃষ্টির মূল।

কিন্তু বারুদ হইতে ধূম কেন নির্গত হয়? বাতি জ্বালাইলে বা কাঠ পোড়াইলে ধূম নির্গত হয়, ইহা সকলেই জানেন। কাজেই দাহ্যমান পদার্থ মাত্র হইতেই ধূম্র নির্গত হইবে, ইহাই সাধারণ ধারণা। ধূম মাত্রই অগ্নি-সম্ভাবনা সূচিত করে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও অগ্নিমাত্রেই ধূম্র থাকিবে, ইহা সত্য নহে। Hydrogen বা 'জলজান' বাষ্পকে জ্বালাইলে ধূম নির্গত হয় না—এক টুকরা magnesiumএর পাত পুড়াইলে তাহার আলো চক্ষু ঝল্সাইয়া দিবে, কিন্তু তবু ধূম্র নির্গত হইবে না। অথচ তৈল বা মোম জ্বালাইলে বিস্তর ধূম বাহির হয়। কিন্তু সমস্ত বাতি হইতে আবার সম-পরিমাণ ধূম নির্গত হয় না। মশালে বা কেরোসিনের 'ডিবা'য় যত ধূম বাহির হয়, "ডিট্স্" Lantern বা wall-lamp হইতে তত ধূম বাহির হয় না—আবার এমন বাতিও আছে, যাহা নির্ধূম। কি প্রকারে ইহা সম্ভব হয়, বুঝিতে হইলে ধূম জিনিষটা কি তাহা বুঝা আবশ্যক।

বাতির উপর কোন ঠাণ্ডা জিনিষ রাখিলে তাহাতে কালো দাগ পড়ে। পূর্ব্বে কেরোসিন বা অন্য তৈলের বাতির উপর মেটে সরা রাখা হইত ও তাহাতে সঞ্চিত প্রচুর কালি লিখিবার কালির জন্য ব্যবহৃত হইত। আজ-কালও ছাপাইবার কালি তাহা হইতেই প্রস্তুত হয়। ধূমই এই কালি বা অঙ্গারের মূল, ইহা বলা বাহুল্য। এই ধূম মৌলিক পদার্থ—carbon বা অঙ্গার ইহার মূল উপাদান—ইহা তৈলে বা মোমে বিদ্যমান আছে। অঙ্গার দাহ্যমান পদার্থ। দাহ্যমান পদার্থনিচয় স্বতঃই জ্বলে না; দাহনে সহায়ক উপকরণ চাই, তবেই জ্বলিবে। এই শেষোক্ত উপকরণটী আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুরাশিতে বিদ্যমান

আছে। উহাকে Oxygen বা অম্লজান কহে। অম্লজনে ইহাই মূল উপাদান মনে করিয়া উহাকে অম্লজান বলা হয়। যখন অম্লজান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, তখন সমস্ত অঙ্গার নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়, ধূম্র জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। অম্লজানের অভাবই অঙ্গার-সংযুক্ত দাহমান পদার্থে ধূম্র উৎপত্তির মূল কারণ।

সর্ব্বপ্রথম যে বিস্ফোরক সৃষ্টি হয়, তাহার মূল অনুপান ছিল সোরা, গন্ধক ও অঙ্গার। কথিত আছে, চীনবাসীরা প্রথম উহা প্রস্তুত করে। তবে তাহারা উহাকে লোক-ধ্বংস-ব্যাপারে প্রয়োগ করে নাই—বাজি তৈয়ারে ব্যবহার করিত মাত্র। Cressyর যুদ্ধেই নাকি সোরা-সংযুক্ত বারুদ সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, এই তিন অনুপান একত্র মিশ্রিত করিলে বিস্ফোরক সৃষ্ট হয় এবং আঘাতে উহা ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই অনুপানত্রয়ের মধ্যে গন্ধক ও অঙ্গার মৌলিক পদার্থ; সোরা যৌগিক পদার্থ,—পটাসিয়ম্, নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান ও অম্লজান তাহাতে বিদ্যমান আছে। গন্ধক ও অঙ্গার দাহমান পদার্থ, সোরার অম্লজান এই দাহনে সহায়ক। কাজেই সোরার পরিমাণ এই অনুপাতে লওয়া হয়, যেন সমস্ত গন্ধক ও অঙ্গার দগ্ধ হইতে পারে। কিন্তু আঘাতের ও ফাটিবার গোলমালে অম্লজান সমস্ত অঙ্গারের সাক্ষাৎ পায় না—কতক অঙ্গার অদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ থাকিয়া যায়—এই দগ্ধাবশিষ্ট অঙ্গার ধূম্রাকারে বহির্গত হয়। সোরার—তথা অম্লজানের পরিমাণ বাড়াইয়াও সমস্ত অঙ্গারকে দগ্ধ করা যায় না। তাহার কারণ দাহমান ও দাহক দ্রব্যনিচয় বিভিন্ন পদার্থ হইতে আসে। কিন্তু যদি এমন ব্যবস্থা করা যাইত যে উভয় উপকরণই এক পদার্থে বিদ্যমান এবং এমন অনুপাতে বিদ্যমান যেন কোনটার অভাব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না—তাহা হইলে ধূম্রের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত। শেষোক্ত উপায়ে ধূম্র-হীন শূন্য বিস্ফোরকের আবিষ্কর্ত্তা Paul Vielle যে পদার্থ বিস্ফোরকরূপে নিযুক্ত করিলেন, তাহার নাম Nitro-cellulose বা Gun-cotton

সোরা হইতে Gun-cotton পর্য্যন্ত যত বিস্ফোরক আছে, সমস্তেরই সাধারণ উপাদান Nitrogen বা যবক্ষারজান। এই উপাদানটী অম্লজানের সঙ্গে বায়ুতে আছে। তবে অম্লজান যেমন অতি সহজে অপরাপর পদার্থনিচয়ের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যাইতে পারে, যবক্ষারজান (Nitrogen) তেমন পারে না। ইহার বড় একেশ্বর ধাত—কাহারও সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া ইহার স্বভাবে নাই। জোর করিয়া সমাজে লইয়া গেলে ভদ্রতার খাতিরে কিছুক্ষণ থাকে বটে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই ছুটিয়া পলায়। কেবল তাহাই নহে, আসিবার সময় প্রতিদানস্বরূপ গৃহ-বিবাদের সৃষ্টি করে। মানবসমাজেও এই প্রকৃতির লোক বিস্তর আছে, যারা এম্নি বেশ লোক, কিন্তু কোন সভা বা বৈঠকে গেলে, সেই সভা বা বৈঠকের পরমায়ু দীর্ঘকাল থাকে না। নিজেরা তো চলিয়া আসিবেই, অপর সবাইকেও তাড়াইবার চেষ্টা করিবে। Nitrogenএর তেম্নি স্বভাব। বিস্ফোরকে তাহার এই স্বভাবের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। যেম্নি বিস্ফোরক প্রয়োগ করিতে যাইবে, অম্নি ছোরা প্রদর্শন করিবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলের একতা-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিবে। ইহাদের এই প্রকৃতির জন্যই বিস্ফোরকে তাহাদের এত আদর। বারুদে তাহারা বিদ্যমান আছে। বন্দুকের নলের আঘাতে উহারা মুক্ত হয়—এবং ইতস্ততঃ পলাইতে প্রয়াস পায়; কিন্তু সমস্ত-দিক অবরুদ্ধ বলিয়া যে দিক খোলা থাকে সেই দিকে ধাক্কা দিয়া গুলিটাকেও বাহির করিয়া দেয় এবং নিজেরাও বাহির হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সোরা বারুদের অন্যতম উপকরণ; তাহা গন্ধক ও অঙ্গারের সঙ্গে মিশাইয়া বিস্ফোরক প্রস্তুত করা হয়। অঙ্গার সোরা হইতে পৃথক বলিয়া গুলি ছুটিবার সময় অর্দ্ধ বা অদগ্ধ অঙ্গার ধূম্র সৃষ্টি করে। উহা দূরীকরণ-মানসে অঙ্গারকে ভিন্ন পদার্থ ভাবে না রাখিয়া সোরার সঙ্গে এক যৌগিক পদার্থে পরিণত করা আবশ্যক। কিন্তু বন্দুকে অঙ্গারই সমস্ত কালিমার একমাত্র কারণ নহে। সোরাতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়া পটাশিয়াম্ বলিয়া যে পদার্থ আছে, তাহা দহনান্তর

ক্ষারে পরিণত হয় ও "ছাই" এর আকারে বন্দুকের গায় লাগিয়া থাকে। তাহা দূর করা বড় কষ্টসাধ্য—তাই রসায়ন-বিদ্‌গণের ন্যায় অতঃপর সোরার আপত্তিজনক অংশ পরিত্যাগ করিয়া তাহা হইতে সুধু আবশ্যক অংশ গ্রহণে প্রয়াস পাইল ও তাহাকে দাহ্যমান কোন যৌগিক পদার্থে পরিণত করিয়া দিল। তাহার ফলে Nitro-glycerine, gun-cotton প্রভৃতির সৃষ্টি হইল।

যৌগিক পদার্থনিচয় দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সংশ্রবে সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই বিভিন্ন মৌলিক উপাদানগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঠিক একভাবে সংশ্লিষ্ট নহে। রাম, শ্যাম, যদু মধু, একসঙ্গে বেড়াইতে যায় বলিয়াই এই চারিজনের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের সমান আকর্ষণ, ইহা প্রমাণ হয় না। হয়ত এই চারিজনের মধ্যে রাম শ্যামের বন্ধুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী। দুই-দুই জন চলিতে হইবে বলিলে রাম শ্যামের সঙ্গে যাইতেই যত্নপর হইবে, যদু-মধুর সঙ্গে নয়। এইরূপ যদিও পটাসিয়ম্ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন K N ও O এই সকল একীভূত হইয়া সোরার সৃষ্ট করিয়াছে, তবু এক ভাগ Nitrogen ও দুইভাগ oxygen পরস্পরের প্রতি একটু বিশেষ আকর্ষণে আকৃষ্ট। এই মাণিক-জোড়কে রসায়নবিদ্‌গণ Nitro-group বলেন। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, বিস্ফোরক গুণের জন্য এই অংশ প্রধানতঃ দায়ী। অতএব এই অংশকে বিস্ফোরক দ্রব্যে চাইই। তাহা ভিন্ন দাহ্যমান পদার্থও চাই, যথা অঙ্গার, Hydrogen ইত্যাদি এবং তাহাদের এমন অংশে থাকিতে হইবে যেন দহনান্তর অঙ্গারের অংশ উদ্বৃত্ত না হয়, ধূম্র উদ্গীর্ণ না হয়। সেই হেতু এমন জিনিষের মধ্যে NO_2 অংশ প্রবেশের চেষ্টা করা হইল, যাহাতে অঙ্গার, Hydrogen আছে ও দাহক অক্সিজেনও প্রভূত আছে। এইরূপ বহু জিনিষ বিদ্যমান আছে। তুলা, cellulose, শর্করা প্রভৃতি ঐ জাতীয় জিনিষ। glycerine যাহা ঔষধরূপে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহাও তজ্জাতীয় জিনিষ। এই সকল জিনিষে যে স্বতঃই বিস্ফোরক গুণ নাই, তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু যদি কোন উপায়ে উহাদিগের ভিতর NO_2 group ঢুকাইয়া দেওয়া যায়, তবে আর রক্ষা নাই।

Sulphuric acid এর সাহায্যে Nitric—$HoNO_2$ acid হইতে Nitro groupটী বিচ্ছিন্ন করিয়া glycerine এ যুক্ত করিয়া দেওয়া যায়। Nitro-group যুক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে Nitro-glycerine বলে। প্রস্তুত-প্রণালী বেশ সোজা বটে, কিন্তু জীবন বীমা না করিয়া রাখিলে কদাপি তাহা প্রস্তুত করিতে কেহ প্রয়াস পাইবেন না। এই জিনিষটি তরল, তাই বিস্ফোরক রূপে ব্যবহার করায় একটু অসুবিধা। এক প্রকার সচ্ছিদ্র মৃত্তিকা বা করাতের গুঁড়ার সাহায্যে উহাকে কঠিন পদার্থে পরিণত করা হয় এবং ইহাই Dynamite নামে সর্ব্বসাধারণে পরিচিত। *

Glycerineএর পরিবর্ত্তে যখন celluloseএ (তুলা জাতীয় পদার্থ,—যাহা কাপড়, কাগজ ইত্যাদির প্রধান উপাদান) এই Nitro-group যুক্ত করা যায়, তখন উহাকে Nitro-cellulose বা gun-cotton বলে। উহা দেখিতে অবিকল তুলার ন্যায়। তুলাকে Nitric sulphuric acid সহযোগে উহা প্রস্তুত করা যায়। তুলার ন্যায় বলিয়া উহা বড় পাতলা ও বিস্তর জায়গা জুড়িয়া থাকে। বিস্ফোরক রূপে ব্যবহার করিতে হইলে উহাকে কোন তরল পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া গাঢ় করা হয়। Nitro cellulose জলে গলে না কিন্তু ether বা acetoneএ গলে; তাই শেষোক্ত তরল পদার্থ দুইটি সচরাচর ব্যবহৃত হয়। Nitro glycerine নামক যে বিস্ফোরকের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা

---

* Nitro-glycerine Sobrera কর্ত্তৃক ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। সুইডিশ্ কেমিষ্ট ও এঞ্জিনিয়ার নোবেল সাহেব ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উহাকে বিস্ফোরকরূপে প্রথম ব্যবহার করেন।

Dynamite—3 parts Nitrogen and 1 part Kieselghur (fine silicus earth, light and porrous). Gelatine- 7 parts Nitro-cellu'ose acid 3 Nitro-glycerine Cordite—18 parts Nitro-glycerine afid gun-cotton, 73 (acetone and vaseline). Gun-cotton—hexa—nitro-cellulose.

Colodien—lower Nitro cellulose and althol and Ether celluloid-lower Nitro cellulose and acetone and camphor. ইহারা রসায়ন শাস্ত্রমতে ঠিক Nitro-compound নহে। তবে এ প্রবন্ধের জন্য এই সূক্ষ্ম বিচারের ততটা আবশ্যকতা নাই।

তরল পদার্থ; তজ্জন্য করাতের গুঁড়া বা সচ্ছিদ্র মৃত্তিকার kieselghur সংস্রবে উহাকে কঠিন করতঃ ব্যবহারোপযোগী করা হয়। ব্যবহারের সুবিধা অসুবিধা হিসাবে এই দুই জাতীয় বিস্ফোরক পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। এই দুইয়ের মধ্যে একের অভাব অপরের দ্বারা পরিপূরণ হওয়া সম্ভব কি? যদি হয়, তবে পরস্পরের সহায়তায় এই নবসৃষ্ট পদার্থ দ্বিগুণ বলশালী বিস্ফোরকে পরিণত হইবে। কথাটা খুব সোজা, বুঝিতে কাহাকেও কোন বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু খেয়ালটা মাথায় ঢুকিলেই সোজা, নতুবা নহে।

শব্দ তাড়িতের সাহায্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরিত হয়। ধাতব তার তাড়িত-বাহক। কাজেই তারের অভাবে শব্দ প্রেরণ অসম্ভব কথা। তাই যে দিন বিনা-তারে বার্ত্তা প্রথম প্রেরিত হইল—যে দিন জগৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। এখন জিজ্ঞাস্য, আমরা যখন কথাবার্ত্তা বলি, তখন কোন তারের সহায়তা লই কি? এখানে যদি একটা বিস্ফোরক হঠাৎ বিদীর্ণ হয়, তবে তাহার বিদারণ-ধ্বনি শুনিবার জন্য কি টেলিগ্রাফ অফিসের তারের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে? বিনা-তারে শব্দ প্রেরিত হওয়া কি তাহা হইলে অধিকতর স্বাভাবিক ছিল না? কিন্তু এই সোজা কথাটা কয়জনের খেয়াল হইয়াছিল?

কাপড়-কাগজ আটকাইবার জন্য আলপিনের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তাহা ব্যবহারে এক অসুবিধা, সূক্ষ্ম দিকটা বড় আঘাত দেয়। একজনের খেয়াল হইল, তাইত! সূক্ষ্ম মাথাটা ঢাকিয়া দিলেই ত আর আঘাত লাগিবে না! সেই দিনই safety-pinএর সৃষ্টি হইল। কথাটা অতি সামান্য,—প্রত্যেকেরই এ খেয়াল হইতে পারিত; কিন্তু যাহার প্রথম এই খেয়ালটী হইয়াছিল, সে আজ ক্রোড়পতি।

এই কঠিন nitro-cellulose-কে তরল nitro-glycerineএ মিশাইয়া উভয়কে ব্যবহারোপযোগী করার খেয়ালও তদ্রূপ। কিন্তু এই সামান্য খেয়ালের মূল্য যে কত তাহা আপনারা কল্পনাই করিতে পারিবেন না। কত কোটী কোটী মুদ্রা এই খেয়ালের ফলে মহাত্মা নোবেলের করতলগত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্যর এলফ্রেড্ নোবেলই এই খেয়ালের জন্য দায়ী এবং তাঁহার সঞ্চিত বিপুল অর্থের মূল, ঐ সামান্য খেয়াল মাত্র। কি আকস্মিক ঘটনা হইতে এই খেয়ালের সূত্রপাত হয়, তাহা বড়ই কৌতুকাবহ। নোবেল সাহেব জাতে সুইডিশ, ব্যবসায়ে রাসায়নিক। বিস্ফোরক প্রস্তুত প্রণালী তাঁহার গবেষণার বিষয়। রসায়নাগারে পরীক্ষায় ব্যস্ত, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার একটী আঙুল কাটিয়া গেল। ইহা রাসায়নিকগণের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। একটু nitro-cellulose (ইহা collodion নামেও খ্যাত) ঈথর ভিজাইয়া তিনি কাটা আঙুলটাকে ঢাকিয়া দিলেন, ইহাও রসায়নাগারে অহরহ ঘটিতেছে। ক্রমে ক্ষত শুকাইলে কাটার উপর একটা পরদার মতন হয়; বাহিরের জিনিষের সম্পর্শে কাটা জায়গাটা আর বিষাক্ত হইতে পারে না। এই ঈথরে সিক্ত collodion তাঁহার আঙুলে শুখাইয়া শক্ত হইতেছে—দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হঠাৎ একটা খেয়াল হইল—এইখানেই তাঁহার বিশেষত্ব—তাইত! nitro-glycerine নামক বিস্ফোরক আছে, তাহা এই ঈথর nitro celluloseএ মিশাইলে এই মিশ্র পদার্থ ক্রমে জমাট বাঁধিবে কি? তাহা হইলে ত এক কঠিন সমস্যার অতি বিশদ সমাধান হইয়া যায়—। যাই না এই খেয়াল হওয়া, অমনি তিনি তাহার পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। এই পরীক্ষার ফলে Cordite বা Blasting gelatineএর সৃষ্টি হইল। cord বা সূতার ন্যায় উহাকে রিলে reel জড়ানো যায় বলিয়া উহাকে cordite; gelat এর ন্যায় চেহারা এবং পর্ব্বত হইতে প্রস্তরাদি বিচ্ছিন্ন করিতে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই বিস্ফোরককে Blasting gelatine কহে। ইহার বিস্ফোরণ-ক্ষমতা বর্ণনাতীত! তাই যুদ্ধে ইহার এত আদর। জনৈক গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন, "The great war might be traced back to Nobel's cut finger." নোবেল সাহেবের কর্ত্তিত অঙ্গুলিই বিংশ শতাব্দীর এই বিরাট কুরুক্ষেত্রের সূচনা করিয়াছে।" নচেৎ সাহেব ইহা আবিষ্কার করিয়াই ইহার অপব্যবহারের কত আশঙ্কা তাহা বুঝিতে পারিলেন। জগতের সভ্যতা ও

শান্তির ইহা কত বড় অন্তরায় হইতে পারে, তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, তাই বুঝি সভ্যতার উন্নতি-কল্পে ও জগৎময় শান্তি সংস্থাপনার্থে উহা হইতে উপার্জ্জিত বিপুল অর্থরাশি সমস্ত পৃথিবীকে দান করিয়া গেলেন—যাহার অংশ বিশেষ সুদূর ভারতেও আসিয়া পৌছিয়াছে।

Cordite-এর ন্যায় আরও কয়েকটী বিস্ফোরক আছে—যথা Trinitro phenole বা Picric acid, Tri nitro Tolure বা T. N. T.

কার্ব্বলিক এসিড অনেকেরই পরিচিত। রোগ-প্রতিষেধক হিসাবে ঔষধ-রূপে ইহা সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইতেছে। রসায়ন-শাস্ত্রে উহাকে "ফিনল্" (Phenol) কহে—(Phenol কে phenole-এর সঙ্গে গোল করিবেন না) nitro-glycerine বা nitro cellulose এর ন্যায় সল্‌ফিউরিক এসিডের সহায়তায় nitric acid হইতে nitro-groupটীকে বিচ্ছিন্ন করিলে এই phenol বা কার্ব্বলিক এসিডে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায়। পর পর তিনটী nitro groupএর সঙ্গে সংলগ্ন করা হয় বলিয়া উহাকে Tri-nitro-Phenol কহে। ইহা সর্ব্বসাধারণে Picric acid নামে পরিচিত।

Tolu ঠিক phenol জাতীয় পদার্থ—Phenol এর ন্যায় ইহাকেও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ক্রমান্বয়ে তিনটী nitro group সংযুক্ত করা যায়। এই রূপে প্রস্তুত পদার্থটীকে Tri-nitro tolure কহে। সাধরণতঃ সংক্ষেপ করিয়া ইহাকে T. N. Tও বলে। আজকাল ইহার প্রকৃত প্রয়োগ হইতেছে। ইহার সুবিধা এই যে, ইহা সহজে দ্রবণীয়—তাই Shell ইহা দ্বারা পূর্ণ করিতে সুবিধা হয়। তাপ-সংযোগে উহাকে দ্রব করিয়া Shell এ ঢালিয়া দেওয়া হয়—অল্প পরেই ঠাণ্ডায় উহা পুনরায় শক্ত হইয়া ওঠে তখন shell এর মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

বিস্ফোরকের মধ্যে Nitro-glycerine,nitro cellulose, nitros phenol প্রভৃতি—(High explosives) মহা বিস্ফোরক পদবাচ্য—কারণ তাহাদের বিস্ফোরণ-ক্ষমতা অসাধারণ—সাধারণ বারুদের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। অথচ তাহাদের এমন কয়েকটী গুণ আছে, যাহার জন্য তাহারা সর্ব্বদা ঔষধরূপে বা অন্য কারণেও ব্যবহৃত হয়।

Picric acid 'পোড়া ঘায়ের' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। পশমের বস্ত্রাদি রঞ্জনেও উহা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অতি সুন্দর খুব পাতলা হলুদে (Primros) রং হয়। এই মহা বিস্ফোরকদের আর একটী গুণ আরও আশ্চর্য্য-জনক। সাধারণ বারুদে এক টুকরা জলন্ত দিয়াশলাই পড়িলে কি হয়, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। কিন্তু ইহাদিগকে যদি জলন্ত দিয়াশলাইয়ের সংস্পর্শে আনা যায়, তবে উহারা সাধারণ তুলার ন্যায় জ্বলিবে—তাহাদের বিস্ফোরক গুণ প্রকটিত হইবে না।* কিন্তু অপর কোন বিস্ফোরককে বিশেষতঃ Fulminate জাতীয়—ইহাদের সংস্রবে রাখিয়া এই শেষোক্ত বিস্ফোরকে যদি উত্তপ্ত করা যায়, তবে প্রথমে ইহা বিদীর্ণ হইবে ও ইহার বিস্ফুরণের উত্তেজনায় 'মহা-বিস্ফোরক'গুলি বজ্র নিনাদ করিয়া উঠিবে—সে কি বিদারণ! তাহা বর্ণনাতীত। উত্তেজকের (Detonator) সহায়তায় মহা বিস্ফোরকদিগের বিদারণ সম্ভাবনা নোবেল সাহেবই প্রথম লক্ষ্য করেন। সাধারণ বিস্ফোরক হইতে এইরূপ উত্তেজক সংযোগে বিস্ফুরণ প্রবলতর হয়। তাহার কারণ উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে আবার বিস্ফোরণ-কারী তরঙ্গের আঘাত পড়ে। ইহাদের বিদারণ-জনিত আঘাত সামলাইতে পারে, এমন দুর্গ এখনো সৃজিত হয় নাই। আজকাল যুদ্ধ মানুষে-মানুষে বা জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ নহে, যুদ্ধ রসায়ণের সঙ্গে রসায়ণের—Explosive-এর সঙ্গে mortar ও cement এর। আক্রমণ-কারী ভীষণ হইতে ভীষণতর ক্ষমতাবান বিস্ফোরক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন—দুর্গ-ধ্বংসার্থে, আর আক্রান্ত mortar আর cementএর সহায়তায় কঠিন হইতে কঠিনতর দুর্গ সৃজন করিতে লাগিলেন। আত্মরক্ষার্থে এই বিরাট যুদ্ধে "মহা-বিস্ফোরক" প্রমাণ করিয়াছে, যে দুর্গের দিন অতীত—তাই পরিখাই (Trench) আত্মরক্ষার প্রধান আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

---

* সৈনিকেরা ঐ প্রকারে বারুদ জ্বালাইয়া চুরটও ধরায়। ভারতবর্ষ, ৯ম বর্ষ, ১খণ্ড, ২৫৪পৃঃ)

২

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে Nitro group বিস্ফোরকের প্রধান উপাদান। এই Nitro group H-O—NO_2 (নাইট্রিক এসিড্ হইতে সংগ্রহ করা হয়। Nitric Acid সোরা হইতে প্রস্তুত হয়। অতএব শোরাই বিস্ফোরকের উৎপাদক nitrogen সোরার অন্যতম মূল উপাদান—উহা প্রাণীজ ও উদ্ভিজ পদার্থ মাত্রেই বিদ্যমান। তত্তৎ-জাতীয় পদার্থ-নিচয় বিনষ্ট হইলে তাহাদের অভ্যন্তরস্থ nitrogen বিভিন্ন প্রকার আণুবীক্ষণিক প্রাণীর সাহায্যে প্রথমে ammonia, তৎপর nitros ও অবশেষে nitric acid এ পরিণত হয়। উহা মৃত্তিকার সোডায় বা পটাশের (Potash) সংস্পর্শে আসিয়া সোরাতে পরিণত হয়। উষ্ণপ্রধান দেশে উহার জন্মিবার সম্ভাবনা বেশী। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গঙ্গার উপকূলে বহু সোরা সৃষ্ট হয়। অতীতকালে উহা বিভিন্ন দেশে চালান দেওয়া হইত—অধুনা অনেকাংশে ভারতেই নাইট্রিক এসিড তৈয়ার করিতে ব্যবহৃত হয়। পশুপক্ষীর মলমূত্রাদি বিশেষতঃ গোময়—যদি এমন কোন স্থানে জমাইয়া রাখা যায়, যেন উহারা বৃষ্টি-জলে ধুইয়া যাইতে না পারে; তবে পূর্ব্ব-কথিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রাণীর সহায়তায় উহারা nitro বা সোরার পরিণত হয়—গোয়ালের আশে-পাশে যে সাদা সাদা দানা দানা জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই ঐ সোরা।

নেপোলিয়ন য়ুরোপ-বিজয়-মানসে বারুদার্থে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সোরা প্রস্তুতের জন্য বহু গোলা-ঘর করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত যুদ্ধে যত সোরা আবশ্যক না হইয়াছিল, এক Somme-এর যুদ্ধেই তদপেক্ষা অনেক বেশী সোরা ব্যয়িত হইয়াছে।

এত সোরা কোথা হইতে আসিল ? দক্ষিণ আমেরিকার পিরুপ্রদেশে এক অতি-বিস্তীর্ণ সোরার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা দৈর্ঘ্যে দুই শত মাইল, প্রস্থে দুই মাইল এবং গভীরতায় পাঁচ ফুট। একপ্রকার সামুদ্রিক পক্ষীর মল(gnats) হইতে উহা উৎপন্ন। পৃথিবীর যাবতীয় সোরা অধুনা ঐ খনি হইতে সংগৃহীত হয়। যুদ্ধের প্রাক্কালে জর্ম্মাণগণ ঐ প্রদেশ হইতে বহু সোরা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, বিস্ফোরকের উপাদান-রূপেই যে সোরার একমাত্র ব্যবহার, তাহা নহে, ভূমির উর্ব্বরতা-বৃদ্ধির উহা এক প্রধান উপাদান। জর্ম্মাণী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিতেছিল, তাই সে যথাসম্ভব সোরা সঞ্চয় করিতেছিল। ইংরাজ যখন তাহাদের অন্তর্নিহিত এই অভিসন্ধির আভাস পাইল, তখন তাহারাও সোরা-সংগ্রহে অতিমাত্র ব্যগ্র হইল। সুযোগ বুঝিয়া পিরুবাসীগণ বহুগুণ অধিক শুল্ক আদায় করিয়া অকাতরে উভয়কে সোরা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে প্রশান্ত মহাসাগরের শান্তিময় ক্রোড়ে পরিরক্ষিত nitrogen পরস্পরের বক্ষ হইতে বিযুক্ত হইল ও যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের কামানের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া পুনরায় একে অপরের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইল এবং অনন্তের পথে চলিয়া গেল। জগতের শান্তি ও সভ্যতার শত্রু দুরন্ত রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বিমর্দ্দন-জনিত কলঙ্ক-প্রক্ষালনের একমাত্র উপায়, এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা বুঝি ইহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়াছিল।

সকলেই জানেন, যুদ্ধের প্রারম্ভে পিরুর উপকূলে ইংরাজ-জর্ম্মণে এক যুদ্ধ হয়। ইহাদের উভয়েরই আবাসভূমি য়ুরোপে, ব্যবধান উত্তর সমুদ্র মাত্র—অথচ যুদ্ধ হইল পিরুর উপকূলে! কারণ কি ? কারণ কামধেনু যে দখল করিবে, বিজয়লক্ষ্মী তাহারই অঙ্কগত হইবেন। জর্ম্মাণগণ ইংরাজদের বহুপূর্ব্বে উহা বুঝিয়াছিল এবং যুদ্ধারম্ভেই তাহার চারিধারে রণ-তরী ও submarine দ্বারা বিশেষভাবে ঘেরিয়া ফেলিল। যুদ্ধারম্ভ হইলে দুর্গের পর দুর্গ মহাবিস্ফোরকের প্রয়োগে জর্ম্মাণগণ বিধ্বস্ত করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে ধ্বংসের বিরাট লীলা চলিতে লাগিল, মিত্রশক্তি ত্রাহি-ত্রাহি ডাক আরম্ভ করিল—মহাবিস্ফোরক সত্বর চাই, নতুবা মৃত্যু অনিবার্য্য বলিয়া যখন কলরব তুলিল, তখন ইংরাজের চেতনা হইল। ইংরেজ অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া বড় বড় জাহাজ বোঝাই করিয়া nitre আনিবার জন্য "কামধেনু"র কাছে পাঠাইল, কিন্তু সে গুড়ে বালি! এবার মিত্রশক্তির চক্ষুস্থির! বুঝিল, এখন আর মালের জাহাজ (cargo-boat) নহে, যুদ্ধ-

জাহাজ চাই। কারণ Nitre সংগ্রহ করিতেই হইবে, নতুবা যুদ্ধ আর চলে না। বস্তুতঃ যে সাত-আট সপ্তাহ জর্ম্মাণগণ এই পথ অবরুদ্ধ রাখিতে পারিয়াছিল, সেই সময়ের যুদ্ধে তাহারা বিশেষ লাভবান হয়। তাহাদের সর্ব্ব-বিধ্বংসী বিপুল কামানরাশির অবিশ্রাম গোলা-গুলি-উদ্গীরণে মিত্রপক্ষ সন্ত্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

যাহা হউক, অবশেষে মিত্রশক্তি পিরুর উপকূলে জর্ম্মাণদিগকে পরাস্ত করিয়া সোরার খনি দখল করিয়া বসিল ও জর্ম্মণির তথায় প্রবেশের পথ অবরুদ্ধ করিল। এইবার জর্ম্মাণি বিপন্ন হইয়া পড়িল। যুদ্ধে বারিধারার ন্যায় অজস্র গোলা বর্ষিত হইতেছে, অসম্ভব সোরা ব্যয়িত হইতেছে, সঞ্চিত সোরা প্রায় নিঃশেষ, অথচ পিরু হইতে সোরা সংগৃহীত হইতে পারিতেছে না। সকলেই ভাবিল, এইবার জর্ম্মাণি জব্দ হইবে। ফরাসী স্থলের ও ইংরাজ জলের রাজা,—জর্ম্মাণি এবার যায় কোথায়? কিন্তু জর্ম্মণি হটিবার পাত্র নয়। এই বিপদের আশঙ্কা জর্ম্মাণ রাসায়নিকগণ পূর্ব্ব হইতেই করিতেছিলেন। জল ও স্থল অবরুদ্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু বিরাট বায়ু-সমুদ্র তখনো কাহারও আয়ত্ত হয় নাই। জর্ম্মণি এইবার উহাতেই প্রভুত্ব স্থাপন করিল। যদি ইংরাজ জলের ও ফরাসী স্থলের রাজা, জর্ম্মণি অতঃপর বায়ুর রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তাহাদের বায়ুযান সকল বিস্তীর্ণ বায়ু-সমুদ্র মথিত করিয়া অবাধে ইতস্ততঃ বিচরণ করতঃ শত্রু সৈন্য-ধ্বংসে নিযুক্ত হইল।

কেবল তাহাই নহে, সোরা সংগ্রহের পন্থাও জর্ম্মাণি উন্মুক্ত করিল। আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন, তাহাদের "জেপ্লিন" বায়ুপথে উড্ডীয়মান হইয়া পিরুপ্রদেশ হইতে সোরা সংগ্রহে ব্যাপৃত হইল! তাহা নহে,—বায়ুরাশি হইতেই জর্ম্মাণি সোরা সংগ্রহ করিতে লাগিল।

যে সোরা মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের অপচয়ে অথবা পশু পক্ষীর মল-মূত্র হইতে উৎপন্ন হয়, বায়ু তাহার সরঞ্জাম কোথা হইতে জোগাইল, এ বিষয়ে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। ঐ কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করিতেছি।

নাইট্রোজেন বায়ুর প্রধান উপাদান—প্রতি ৫ ভাগে চারিভাগ নাইট্রোজেন ও ১ ভাগ oxygen। আমরা প্রত্যেকবার নিশ্বাসে এক ভাগ oxygenএর সহিত চারিভাগ নাইট্রোজেন গ্রহণ করি; কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, নিশ্বাস ফেলিবার সময় সমস্ত nitrogenই ফিরিয়া আসে শুধু oxygen টুকু শরীরে গৃহীত হইয়া যায়। অথচ oxygen-এর ন্যায় nitrogen ও প্রাণী-শরীরের অতি আবশ্যক সামগ্রী; nitogen শূন্য আহার্য্যে প্রাণীদেহ বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাক, জীবিতই থাকিতে পারে না। এই nitrogenএর জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী। সম্মুখে পশ্চাতে ইতস্তত সর্ব্বত্র nitrogen-সমুদ্র; অথচ nitrogenএর জন্য আমরা পরপ্রত্যাশী, ইহা কেমন হেঁয়ালির ন্যায় মনে হইবে। Ancient Mari erএ—

> Water, water everywhere,
> Nct a drop to drink.

সর্ব্বত্র জল থাকা সত্ত্বেও যেমন পানীয় জলের অভাব বোধ করিতে হইয়াছিল, সেইজন্য nitrogen সমুদ্রে নিরন্তর অবগাঢ় হইয়াও আমরা শরীরের আবশ্যক nitrogen সংগ্রহ করিতে পারি না—। কারণ বায়ুর nitrogen পরিপাচ্য নহে, তাই প্রাণী বা উদ্ভিদ-শরীরে গেলেও তাহা হজম হয় না। ইহা মৌলিক পদার্থ। রান্না দ্বারা সুসিদ্ধ করিয়া পরিপাক-উপযোগী করিতে পারিলেই যেমন খাদ্য-দ্রব্য মানবদেহের উন্নতি করিতে সক্ষম, মৌলিক nitrogenকেও সেইপ্রকার কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে পারিলে তবেই উহা উদ্ভিদের সাররূপে তাহাদের অঙ্গে প্রবেশ করে ও তথায় বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা protein নামক এক প্রকার পদার্থে পরিণত হয়। মানব-দেহে protein প্রস্তুত হইতে পারে না। ইহা মানব-দেহের অত্যাবশ্যক পদার্থ—মানব উহা উদ্ভিদ হইতে অথবা উদ্ভিদাশী প্রাণীদেহ হইতে আহার্য্য-রূপে সংগ্রহ করে।

নাইট্রোজেনকে যৌগিক পদার্থে পরিণত করার আজকাল অনেক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, একটীর উল্লেখ করিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব।

নাইট্রোজেনের বড় একেশ্বর-ধাত, পূর্ব্বে এ কথা বলিয়াছি। শুধু নিজে মিশিয়াই থাকে, অপরের সহিত মিশিতে চায় না। অপরের সঙ্গে মিশাইতে হইলে প্রথমে তাহাকে

স্বকীয় বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে হয়। তাপ-সহযোগে তাহা সহজে হয় না, বৈদ্যুতিক ঘা (spark) খাইলে তবে সাময়িকভাবে সঙ্গ ছাড়ে। সঙ্গচ্যুত হওয়া মাত্র খুব মিশুক-প্রকৃতির কোন জিনিষ যথা oxygen বা অঙ্গার ইত্যাদির সঙ্গে ইহাকে যুক্ত করা যায়।

N.N　O.O—NO.—NO
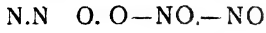
এই যে দাঁড়ি চিহ্ন, ইহা ভগবান ইন্দ্রদেবের বজ্র—এই বিদ্যুতের আঘাতে বিচ্ছিন্ন বায়ুরাশিতে অবস্থিত তাহার পার্শ্ববর্ত্তী oxygen এর সহিত সংযুক্ত হয়। বায়ুরাশিতে অনন্ত সহচর যে N ও oxygen, তাহাদের সংযোগে ইন্দ্রদেবের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বজ্রের আবশ্যক হইল—ইহা কেমন কথা? আপনারা কখনো কোন অপরিচিত সাহেবের সঙ্গে ট্রেণের এক-গাড়ীতে চলিয়াছেন কি? হয়ত এক দিন উভয়ে এক কক্ষে কাটাইলেন, এক স্নানাগারে স্নান করিলেন, এক ভোজনাগারে আহার করিলেন, একে অপরে একটা বাক্যালাপ নাই। কিন্তু আবার দুইজন বাঙ্গালী একসঙ্গে চলুন, এক ষ্টেশন না যাইতেই "মশায়ের নিবাস?"—তারপর হয়ত ডাকাডাকি সম্পর্ক পর্য্যন্ত হইয়া যায়! nitrogen অনেকটা ইংরাজী ধাতের। কিন্তু একবার কাহারও সহিত যুক্ত হইলে তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এত বড় যাহার একেশ্বর ধাত, সে আর একলা মোটেই থাকিতে পারে না। তাই, যেই oxygenএর সঙ্গে যুক্ত হইয়া নাইট্রিক্ অকসাইড (সাঙ্কেতিক চিহ্ন—"NO") হওয়া, অমনি সে nitrogenএর প্রকৃতি-গত গুণাবলীকে "না (no) তোমার ঐ একেশ্বর ধাত আর আমার পোষাইবে না" বলিয়া জানাইয়া প্রমাণস্বরূপ তৎক্ষণাৎ আরও oxygenএর সঙ্গে সম্বদ্ধ হইয়া যায় ও আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত বিস্ফোরকের প্রধান উপাদান NO_2 or up রূপে দেখা দেয়। উহা জলের সংস্পর্শে nitric acid-এ পরিণত হইয়া বারিধারার সহ পৃথিবীতে আনীত হয় এবং ভূমির পটাশ বা সোডার সহযোগে nitreএ পরিণত হয়।

আজ যে nitrogen হাওয়ায় দুলিয়া নৃত্য করিতেছে, কাল হয়ত তাহাই মায়াবিনী সৌদামিনীর সংঘাতে স্বীয় কক্ষচ্যুত হইয়া অম্লজানের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে এবং বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিস্বরূপ বুঝি স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া বারিধারাসহ পাপ মর্ত্তভূমিতে আনীত হইতেছে; তৎপরে উপবনের বৃক্ষরাজির দূর্ব্বাদল-শ্যামল সুকোমল পত্রপুষ্পে প্রবেশ লাভ করতঃ তাহার উদ্ভিদ জীবন সার্থক করিতেছে, আবার তথা হইতে খাদ্যরূপে নধর শ্যামল সুকুমার ছাগশিশুর ও ক্রমে মানবের দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া অপূর্ব্ব জীবনীশক্তিতে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। ক্রমে আবার মূত্র-পুরীষাদি রূপে অথবা বিগত-জীবন প্রাণী বা উদ্ভিদ রূপে মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পূর্ব্ব-কথিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রাণিগণ দ্বারা বিভক্ত হইলে কতক পাপ-মুক্ত হইয়া বায়ুরাশিতে মিলাইতেছে, কতক বা—Ammonia-nitrous-nitric এসিড্ ও অবশেষে সোরারূপে উদ্ভিদের সার বা বিস্ফোরকের উপাদান-ভূত হইতেছে।

স্বভাবের অনুকরণে রসায়নাগারে কৃত্রিম বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে জর্ম্মাণগণ বায়ুরাশির nitrogen ও oxygen কে সংযুক্ত করিল এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তাহাকে নাইট্রিক এসিড বা সোরায় পরিণত করিল। এই nitrc acid অথবা সোরাই তাহাদিগকে বিস্ফোরকের উপাদান যোগাইতে লাগিল। বিরাট অনন্ত বায়ুসমুদ্রকে জলের রাজা ইংরাজ অথবা স্থলের রাজা ফরাসী অবরুদ্ধ করিবার কোন উপায় উদ্ভাবিত করিতে পারিল না—তাই বায়ুর রাজা জর্ম্মনি পৃথিবীর রাজা হইবার উপক্রম করিয়াছিল।

শ্রীআনন্দকিশোর দাশগুপ্ত।

গ্রীষ্ম ও বর্ষা

বর্ষা বলে,—গ্রীষ্ম তুমি তপ্ত কর সবে,—
শান্ত হয়, তৃপ্ত হয়, আমি নামি যবে।

গ্রীষ্ম বলে,—শুষ্ক করি, সিন্ধু করি মেঘ,
তাহারি কল্যাণে তুমি ধর এত বেগ!

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

২৩

দিনকয়েকের মধ্যেই, সবিতার হাতের সেবায় যত না হউক, আনন্দের সংস্পর্শে জ্যোতির শরীর সারিয়া আসিতে লাগিল। সবিতার অফুরন্ত হাসি-মুখ দেখিয়া জ্যোতি মনে করিত, সবিতাও বুঝি তারই মত জীবনে দুঃখের আঁচ কখনো পায় নাই! প্রতিদিনই বেলা দুইটা কি আড়াইটার সময় সবিতা দীপ্তোজ্জ্বল মুখে আসিয়া তার বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া বলিত,—কি হচ্চে গো?

মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া জ্যোতি বলিত,—প্রহর গোণা আর কি!

—তাই না কি?

—সত্যি বলচি ভাই—একলাটী চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় পড়ে থাকা কি কষ্টভোগ, তা কি বলবো! রোজ এমনি সময় তোমার আশায় পথে চোখ পেতে বসে থাকি।

সবিতা একটী বালিসের ঝালর নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—আহা, কতকালে যে তোমার এ দুঃখ ঘুচ্‌বে, আমিও তাই ভাবি।

—তুমি! তোমায় তো তলব এলেই চলে যেতে হবে, তোমার ভাবনা!

—আমি যদি না আগ্রহ করি তো আমাকে জোর করে কেউ নিয়ে যাবে না, তা আমি জানি।

—ইস্! যদি কর্ত্তাই হুকুম পাঠান?

হঠাৎ সবিতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, পরক্ষণেই শিথিল কণ্ঠে সে বলিল,—না,—তা তিনি করবেন না।

—তবে তো তিনি ভদ্রলোক! আমার কপালে কি একরোখা লোকই হয়েছেন! তাঁর কানে যদি খপর যায় যে আমি বসতে পারছি, অমনি আবার সেই পাহাড়ে টানবেন!

সবিতা নিরুত্তরে একটু হাসিল।

জ্যোতি আবার বলিল,—দেখ না, আমার বাবা কতবার লিখছেন কটকে পাঠাতে, তা এঁরা পাঠাবেন না!

সবিতা বলিল,—এ অবস্থায় কি করে যাবে? সারলে যেয়ো। বলিয়া সবিতা আপন-মনেই একটু হাসিল, বলিল,—এখন মনে হচ্ছে যে, তুমি চলে গেলেও বুঝি দিনকতক বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগ্‌বে।

—তা না লাগলেই বুঝি তুমি খুব খুসী হতে! আমি যদি বলি যে, তুমি চলে গেলেও আমার ওমনি মনে হবে!

—আমি পূজোর আগে যাবই না! অনেক দিন পরে বাপের বাড়ী ফিরেছি যে!

জ্যোতির খোকাটীকে কোলে করিয়া তার শাশুড়ী ঘরে আসিলেন। সবিতা হাত বাড়াইতেই ছেলেটী তার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পুষ্প-স্তবকের মত সেই ছেলেটীকে নাচাইয়া দোলাইয়া খেলা দিতে দিতে সবিতার বুকের মাঝে শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। এমনি ছিল পুলক! যাকে সে একটী পলক চোখের আড়াল করিয়া রাখিতে পারিত না। তার জীবনের শুষ্ক কঠিন সাহারায় সে যেন একটী অমৃতের উৎসের মত ছিল! তার অদৃষ্টের রূঢ়তা! সেই পুলককে ছাড়িয়া তো দিতে হইলই, তার একটা খবর অবধি এখন পাইবার উপায় নাই। জ্যোতির ছেলেটীকে বুকে চাপিয়া তার মনে হইতেছিল যে, সে চোখ বন্ধ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করে যে, এও সেই পুলকেরই স্পর্শ!

জ্যোতি বলিল—কি ভাবছো? গুম্ হয়ে গেলে যে বড়!

—না, ভাবছিনে তো কিছু!

—বল না, কি ভাবছো? গোপনীয় কিছু?

—তা নয় কিছু! ভাবছি কি, জানো,—প্রথম যখন শ্বশুর-বাড়ী যাই, তখন তো সংসারের কিছুর সঙ্গেই পরিচয় ছিল না, কিন্তু সে বাড়ীতে পা দিয়েই সর্ব্ব-প্রথমেই ভাব হয়ে গেল, এমনি একটী ছোট্ট মানুষের সঙ্গে,—তাই আজ

একে কোলে করে তাকেই মনে পড়ে গেল! আর তার খবরটাও পাইনে।

—কেন, সেটী বুঝি বাড়ীর নয়?

—না। ননদ সেটীকে রেখে মারা যাওয়ার পর সে শাশুড়ীর হাতে এসে পড়ে. তারপর তার বাপ এসে তাকে নিয়ে গেলেন,—কিন্তু তাঁরা আগেও যেমন খপর-টপর নিতেন না, এখনো তেমনি খপর দেন না!

—তাঁরা তো মন্দ লোক নন্।

—"তা নন্. তবে তাঁরা মনে করেন না যে এদিকে তার জন্যে কারো আগ্রহ আছে।

জ্যোতির শাশুড়ী বলিলেন,—সে কথা কেউ মনে করে না গো! পরের ছেলেকে প্রাণ দিয়ে মানুষ করবার মত যন্ত্রণা আর নেই।

সবিতা চুপ করিয়া রহিল। পুলক তো তার যন্ত্রণা ছিল না, সেই যে তার একমাত্র আনন্দ ছিল। সেখানে পুলককে না পাইলে সে বুঝি পাগল হইয়া যাইত। এমন দিনও ছিল, যখন সে পাষাণ-পুরীতে শুধু পুলকই তাকে ভাল বাসিত, শুধু পুলকের জন্যই আর সকলেও একটু আধটু তাকে দরকার মনে করিতেন!

ইদানীং স্বামীর কাছেও সে একটু যেন কোমল ব্যবহারই পাইতেছিল। স্বামী —! সবিতা কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। মনের মাঝে কেমন একটা নব-বসন্তের মত উতলা হাওয়া বহিয়া গেল। সে বলিল,—আজ যাই ভাই।

—এখুনি? কেন, পরের ছেলেকে মনে করে মন খারাপ হয়ে গেল বুঝি!

—তা হবে! বলিয়া কোল হইতে জ্যোতির ছেলেকে নামাইতে গেল, কিন্তু ছেলে তাকে ছাড়িতে চাহিল না,—কান্না আরম্ভ করিল। জ্যোতি বলিল,—ওই নাও। ও তোমাকে যেতে দেবে না।

—এটী ওর মায়েরই দুষ্টুমি।

—তা বৈকি,— আমি ওকে শিখিয়ে দিলুম না কি!

—মায়ের মনের ইসারা ছেলে বুঝে চল্‌ছে।

—তবে তুমি ওকে নিয়ে যাও, ঝীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো।

—না, না, দুদিনের জন্যে আর অত মায়া বাড়িয়ে কাজ নেই।

—তবে, যেয়ো না,—বসো।

জ্যোতি হাসিতে লাগিল। সবিতা খোকাটীকে অনেক কাণ্ড করিয়া ঝীয়ের কোলে ফিরাইয়া দিয়া, পরে জ্যোতির দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল,—চল্‌লুম।

—এমন তাড়াতাড়ি আজ যাচ্চো তুমি, যেন বাড়ীতে তোমার কতগণ্ডা ছেলে-মেয়ে কেঁদে হাট বাধাচ্ছে।

সবিতা নীরবে একটু হাসিল।

২৪

পূর্ব্বদিক তখন সবে মাত্র পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু উষার পাণ্ডুর ললাটে তখনো রবিরশ্মিচ্ছটা দেখা দেয় নাই, দীপালীর প্রদীপ-মালার মত একটী তারার দীপ্তি ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া নিবিয়া যাইতেছিল।

আসন্ন প্রভাতের স্নিগ্ধ মধুর বাতাস দ্বারে দ্বারে ঘা দিয়া ফিরিতেছিল। জমিদার-বাড়ীর পিছন দিকে একটী বাঁধানো পুকুর। পুকুরটীর পশ্চিম দিকে তিন-চার ঝাড় বাঁশ ও প্রকাণ্ড একটী কলা-বাগান। পুকুরটীর একান্ত সন্নিকটে লেবু ও কামিনী ফুলের গাছ হইতে অতি মিষ্ট ফুলের গন্ধে ঘাট মাতাইয়া তুলিত।

ঘাটের উপর বসিয়া অযোধ্যা-জেলার ব্রাহ্মণ নিষ্ঠাবান পাঁড়ে ঠাকুর আপন-মনে গান গাহিতেছিল,—

দশরথকে জালা জি এ মত্ করো ব'হেলা,
ফিরে গলিয়ন মে রে সোয়ালিয়া—

* * * *

পূর্ব্বালোক কহি কহি মৃদু বচনা,
ফিরে গলিয়ন মে, রে সোয়ালিয়া—

গ্রামের ডাক-পিয়ন আসিয়া খানকয়েক চিঠি ও সংবাদ-পত্র পাঁড়ের কাছে রাখিয়া বলিল, পরণাম্ মহারাজ!

প্রসন্ন মুখে তাকে বাঁচিয়া থাকিবার আশীর্ব্বাদ করিয়া পাঁড়ে তাকে কুশল প্রশ্ন করিল। পিয়ন পুরানো লোক, জমিদারেরই প্রজা, সে বলিল,—কি পাঁড়েজী, এবার পূজোর তো কোনো আয়োজন দেখি না—হবে তো?

পাঁড়ে বলিল,—আরে, পূজা হোবে না তো কি হোবে! পূজো তো হোবেই করবে!

—বড় বৌমা কি এসেছেন?

পাঁড়ে চারিদিক চাহিয়া, গলার স্বর নামাইয়া বলিল,—না। না বাবুলোক কোই যাতেহেঁ,—না উন্‌হিকো লে আতে হেঁ,—আরে ভাইয়া, বড়ে আদ্‌মিকে বাত!

পিয়ন তার ব্যাগ কাঁধে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,বলিল,—কেন, আমাদের বড়বাবু তো বেশ আচ্ছা আদ্‌মি,—তবে?

—আরে, আচ্ছা তো হামলোককা লেগে, বাকী—তারপর কি একটু ভাবিয়া বলিল,—কেয়া জানে ভেইয়া, উন্ লোককা ঘরকে বাৎ।

পিয়ন বুঝিল যে, মনিবদের ঘরের কথা আলোচনা করিবার ইচ্ছা পাঁড়েজীর এখন তেমন নাই। পাঁড়ে আপন মনে গান করিতে করিতে পূর্ব্ব দিক্‌কার উঁচু অট্টালিকার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কেহ জাগিয়াছে কি না। তাহা হইলেই সে ডাকটা পৌঁছাইয়া দিয়া আসে! পিয়নও গল্প স্থগিত রাখিয়া তার নিজের কাজে চলিয়া গেল।

কোমরে কাপড় বাঁধিয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া উদয়াকাশের অরুণের মত স্নিগ্ধ সুন্দর কান্তি অরুণ ঘাটের কাছে ডাকিল,—পাঁড়ে!

সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাঁড়ে মাথা হেলাইয়া একটু অভিবাদন জানাইয়া ডাকের চিঠিপত্র সব অরুণের হাতে হাতে তুলিয়া দিল।

অরুণ চিঠিপত্রের উপরকার ঠিকানাগুলির উপর চোখ বুলাইয়া দেখিল; তার পরে বলিল,—দাঁড়াও পাঁড়ে, এই চিঠিপত্রগুলো সব বাবার আপিস-ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখ গে।

তার মুখে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন অসন্তোষের ভাব দেখা গেল। নিজের নামের চিঠি হাতে রাখিয়া বাকী চিঠিগুলি সে ফেরত দিল!

অরুণের নিষ্কর্ম্ম অলস দিনগুলি অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উপায় তো নাই। তার পিতার শরীর এত খারাপ, বুকের অবস্থা এমন সন্দেহের যে, তাঁকে রাখিয়া আর কোথাও যাইবার উপায় নাই।...আশা একে ছেলেমানুষ, তাতে সে সংসারের কিছুই তেমন বোঝে না, এমন অবস্থায় সে শুধু শুধু নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টায় বা[...] ছাড়িয়া যাওয়ার কথাও পিতার কাছে তুলিতে পার[...] না। তবে মধ্যে মধ্যে এই সময়ে সবিতাকে ম[...] পড়িত। পুলককে ছাড়িয়া তো যাইতে পারে নাই,—[...] এখনই বা এমন নিশ্চিন্ত হইয়া আছে কি জন্য? এক[...] তাগাদা দিলেই হয় তো আসে, কিন্তু এই তাগাদাটুকু তা[...] দেয় কে?

সে আসিলে,—আঃ, কত নিশ্চিন্ত! শীঘ্র আসি[...] বলিয়াই তো বাবা তাকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তা[...] আনার বিষয়ে তিনিই এখন সব চেয়ে নির্লিপ্ত, সব-চে[...] উদাসীন: যেন সে বলিয়া এ বাড়ীতে কখনো কে[...] ছিল না।

অরুণ খানিকটা ঘুরিয়া বেড়াইয়া হাতের চিঠি পড়িল প্রভাতের চিঠি! পুলকের খবরে আছে যে, পুলক [...] অবধি ক্রমাগত ভুগিয়া ভুগিয়া এখন খুব দুর্ব্বল হই[...] পড়িয়াছে। আর তাকে সেখানে রাখা চলে না। সেখা[...] রাখিলে সে বাঁচিবে না। সুতরাং প্রভাতে তাকে এখানে পাঠাইয়া দিতে চায়!

অন্য সময় হইলে অরুণ হয়তো এমন চিঠি পাইয়া রা[...] জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু আজ আর তা হইল না। বরং ম[...] হইল, তাই তো। পুলককে তো তা হইলে আনা দরকার!

কর্ত্তা যখন মুখ ধোওয়া শেষ করিয়া সুমুখে ঔষধের জোড় তোড় সাজাইয়া ঔষধ খাইতেছিলেন, ও তাঁর খানসামা গোপীনাথ সব জোগাড় দিতেছিল, সেই সময়ে অরুণ গিয়া দাঁড়াইল। গোপী এখন কত ভুল করে, কর্ত্তা সব চুপ করিয়া মানিয়া যান, আর সে একরোখা তীব্র স্বভাব তাঁর নাই, অনেক নরম হইয়া গিয়াছেন।

অরুণ বলিল,—প্রভাতের একখানা চিঠি এসেছে আজ।

কর্ত্তা অন্যমনস্ক ছিলেন, বলিলেন, -কি বল্লে? কার চিঠি?

—প্রভাতের।

—ও!

কর্ত্তা আর জিজ্ঞাসাও করিলেন না যে প্রভা[...] কি লিখিয়াছে? অরুণ কিছুক্ষণ তাঁর প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকিয়া

তারপর বলিল,—পুলকের শরীর খুব খারাপ বলে তাকে দিতে চায়, ভারি নাকি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে !

—দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে ! তা হবেই তো !

বলিয়া কর্ত্তা একটু ভাবিয়া বলিলেন,—ও চিঠির আর জবাব দিয়ে কাজ নেই—

অরুণ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল,—জবাব দেব না ?

তিনি বলিলেন—তোমাকে লিখেছে তো ?

—হ্যাঁ।

—অথবা, ভদ্রতার অনুরোধে এইটুকু তাকে লিখে জানাতে পারো যে, তার অনুরোধ রাখা এখন আমাদের অসাধ্য। যিনি এ যাবৎ কাল তার ছেলেকে মানুষ করছিলেন, একমাত্র তিনিই পুলককে রাখতে পারতেন, কিন্তু তিনি তো এখানে নেই।

অরুণ চুপ করিয়া রহিল। একবার ভাবিল বলে যে, তিনি আসিলে পাঠাইতে লিখিবে কি না? কিন্তু স্বাভাবিক দ্বিধায় তা পারিল না।

আসলে কর্ত্তার মন তখন একেবারেই উলটিয়া গিয়াছিল। যখন সবিতা কাছে ছিল, তখন সে-অভাবে যে কতখানি অসুবিধা হইবে, তাহা ভাবিবাৎ চিন্তার বিষয় ছিল। এখন এই দিন চলিয়া যাওয়াটা তাঁর বেশ সহিয়াও গিয়াছিল। তিনি মনে করিতেছিলেন, অনেকদিন তাকে অকারণ কষ্ট দিয়াছি, এখন দিনকতক এই সংসারের ভার এড়াইয়া সে সুখে থাকুক।

তাঁর মনে হয় তো আরো ছিল, যার জন্য তিনি সবিতার কোনো খবরই তিনি ইদানীং লইতেন না, দিতেনও না, আনাইবার কথা তিনি মুখেও আনিতেন না। বরং এমন ভাবই তাঁর কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পাইত যেন কোনো কালেই তার আর এ বাড়ীতে আসিবার সম্ভাবনা নাই। বোধ হয় কর্ত্তা দেখিতে চাহিতেছিলেন, যে তাঁর নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ছাড়া সবিতার নিজের আসন তাকে আহ্বান করিয়া আনে কি না !

অরুণ অন্যান্য বিষয়ে দুই একটা কথা বলিয়া তার পড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল। সকাল বেলাকার অম্লান রৌদ্রে ঘর ভরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু অরুণের কোনো কাজ নাই। জুটিলে অবশ্য জমিদারির কাজ ঢের জুটে, কিন্তু সে কাজ অরুণের কোন কালেই ভাল লাগিত না, এখনো লাগে না। যে দিন কর্ত্তার শরীর বড় বেশী খারাপ হইত, সেই দিনই খাতা-পত্র সব অরুণের ঘরে যাইত, তা না হইলে কর্ত্তা নিজেই সব দেখিতেন, শুনিতেন।

হাজার-বারকার পড়া একখানী ইংরাজী নভেলের দু'চার পাতা নাড়াচাড়া করিয়া যখন ভাল লাগিল না, তখন আস্তাবল হইতে ঘোড়া আনাইয়া সে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

সূর্য্যদেব তখন পূর্ব্ব দিক-প্রান্ত ছাড়িয়া অনেকখানি উপরে উঠিয়াছেন, তবে ছায়া-শীতল গ্রামের পথে রৌদ্র বেশী লাগে না। ঘোড়া হাঁকাইয়া অরুণ বাড়ী হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। তখন পাড়াগাঁয়ে কাজের সাড়া পুরোপুরি জাগিয়াছে, সর্ব্বত্র কর্ম্ম-ব্যস্ত লোক-জন চলাচল করিতেছে।

পথের ধারে একটা পানা-পড়া পুরানো পুকুর। সমস্ত জলটার উপর একটা অপরিষ্কার শ্যাওলার সর পড়িয়া জলটুকুকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ছেঁড়া সরের ফাঁকে যেমন দুধ দেখা যায়, তেমনি ছেঁড়া শ্যাওলার ফাঁক দিয়া সবুজ রংয়ের জল দেখা যাইতেছিল।

অরুণ বহুদিন এ সব পথে আসে নাই। তবু যেন তার সব চেনা-চেনা মনে হইতেছিল। পাশেই অতি পুরাতন গ্রাম্য স্কুল। একটী ছেলে বাহিরে ছিল, চেঁচাইয়া বলিল,—ওরে, এই যে পণ্ডিত মশায়ের নাতজামাই রে !

এতক্ষণে অরুণের হুঁস হইল যে সে বিবাহ করিতে একদিন এই গ্রামে আসিয়াছিল, তাই তার এই জায়গাটা চেনা বলিয়া মনে হইতেছিল !

পথের ধারে, কঞ্চির বেড়া-ঘেরা একটী রঙিন ফুল-ভরা বাগানের ধারে আসিয়া সে ঘোড়ার মুখ ফিরাইল। চার মাইল পথ যে এইটুকুতেই আসা গিয়াছে, তা সে টেরও পায় নাই !

২৫

সন্ধ্যার সময় প্রভাতের এক টেলিগ্রাম আসিল যে, সে পুলককে লইয়া রওনা হইয়াছে ; ভোরের ট্রেণে আসিয়া

পৌঁছিবে। টেলিগ্রাম পাইয়া কর্ত্তা একটু গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—গুপী, অরুণকে ডেকে দে!

অরুণ আসিলে বলিলেন,—প্রভাতের চিঠির কি জবাব দেওয়া হয় নি?

—না, আপনি বারণ করেছিলেন যে!

—বারণ করেছিলাম? না, বড় বৌমা এখানে নেই, তাই লিখে দিতে বলেছিলাম।

—প্রথমটা বারণই করেছিলেন বলে আমি আর তাকে উত্তর দিই নি।

—ভাল কাজ করনি। উত্তরটা দিয়ে দিলেই হত! এখন এই যে প্রভাত পুলককে নিয়ে আসছে, এর কি হবে! সেই তো রুগ্ন ছেলে!

—তা ছোট বৌমা তো আছেন, আপাততঃ তিনিই দেখবেন, এখন তো পুলক বড়ও হয়েছে।

—ছোট বৌমা!—কর্ত্তা একটু হাসিলেন।—তিনি তাকে মোটে পারেন না, আর সে বড় হয়েছে বলেই তো বেশী সাবধান করা দরকার!

অরুণ একবার ভাবিল যে বলে, কাশী থেকে তাকে আনিয়ে নিলেই তো হয়! কিন্তু বাপের কাছে তার সে কথা মুখে আনাও চলে না। কাজেই চুপ করিয়া রহিল। কর্ত্তাও চুপচাপ ভাবিতে লাগিলেন। বলিলেন,—পুলকের জন্যেই কি শেষটা বৌমাকে আসতে হবে না কি? এও একটা বিপদ্ আর কি! ভাল, এই পুলকের ভারটা আপাততঃ তুমি নিতে পার না কি? যাতে চাকরেরা কোনো অনিয়ম না করে?

অরুণ বলিল,—আমি তো কিছু বুঝি না, তবে দেখি, পারি কি না!

—যখন তুমি না পারবে, তখন তুমিই আবার তাকে তার ঠাকুমার কাছে দিয়ে এসো। যা ব্যবস্থা করবার, তুমিই করো,—এই সব গোলমালে আর আমাকে টেনো না,—আমি পারিনে আর এই সংসারের খুঁটিনাটি দেখতে,—আমার এ-সব কোন কালে অভ্যাস ছিল না।

বাস্তবিকই তিনি চিরদিন বাহিরের কাজেই দিন কাটাইয়াছেন। ঘরের ভিতর শুধু তাঁর দু'বেলা খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। গৃহিণী মারা যাওয়ার পরও তাই ছিল, কেবল সবিতাকে পাঠাইয়া অবধি তাঁর এই দুর্ভোগ বাড়িয়াছে!

অরুণ চুপ করিয়াই ছিল। বাবাকে সাহায্য করিতে সত্যই কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাদের মা এত বেশী আদর দিয়া দুই ছেলেকে মানুষ করিয়াছিলেন যে সংসারের অভিজ্ঞতা তাদের একেবারেই জন্মিতে পায় নাই!

সে রাত্রে জমিদারি সেরেস্তার মুহুরী নিবারণ অনেক দিন পরে কর্ত্তার কাছে একটা কড়া ধমক খাইয়া অবশেষে বলিল,—বড়বাবু, আজ কর্ত্তাবাবুর মেজাজ ভয়ানক খারাপ হয়ে আছে,—এ রকম চেঁচামেচি তো তিনি করেন না, কাগজ-পত্র সব ঘরময় ছড়িয়ে ফেলে দিলেন।

অরুণ তখন আত্মীয়-সম্পর্কিত দুজন বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া তাস খেলিতেছিল, বলিল,—সে কি, কেন?

—কেন, তা কি জানি! বাবু হঠাৎ আমার ওপরে রেগে উঠলেন!

—কাজের সময় বুঝি মাইনে বাড়াবার জন্যে ঘ্যাণ্ ঘ্যাণ্ করছিলে—? জানো তো ওঁকে এক কথা বারবার বলে কোনো লাভ নেই,—সময় হলে আপনিই—

—আজ্ঞে না। আমি কি আর তা জানিনে? আমি মাইনে-টাইনের কথা কিছুই বলিনি।

—তা হলে কি তিনি অকারণে রেগে উঠলেন? শুধু শুধু?

—হ্যাঁ, তাই তো। আমাকে খাতা হাতে দেখেই যেন জ্বলে উঠলেন,—আমি তো অবাক্। ভাবলাম যে, হয় তো আপনার ওপরে রাগ হয়েছে, ঝাড়লেন সেটা আমার ঘাড়ে!

—বা! আমি কি করেছি?

—আজ্ঞে, তা আমরা কি করে বুঝবো? তবে প্রথমটা তাই মনে হয়েছিল যেন! ওঁর তো বেশী রাগটাগ হওয়া ভাল নয়,—দেখবেন, ব্যারাম না বাড়ে!

—তাই তো! আমার মনে হয়, ওঁর রাগী স্বভাবের জন্যেই বুকটা খারাপ হয়ে গেছে,—ভাল, গুপী কোথায়, জানো?

বলিতে বলিতে গুপী আসিয়া অরুণকে কর্ত্তার তলব জানাইল। অরুণের তাস খেলা তখন মাথায় উঠিয়া গিয়াছিল, সে বলিল,—শোন্, শোন্, গুপী, বাবা রাগ করেছেন কেন রে?

গুপী অনেকদিনকার পুরানো লোক, সে একটু ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল,—সাত দিকের সাত রকম ভাবনা-চিন্তার জ্বালাতেই থেকে থেকে তেতে ওঠেন! বৌমা ছিলেন, তবু একটু দয়া-মায়া করে দেখতেন শুনতেন,—এখন তাও নেই!

অরুণ বলিল,—তা আমরা তো রয়েছি, একটু বললেই তো যা দরকার তা করে দিতে পারি।

গোপী বলিল,—তবে যান না বাবু,—কাশী থেকে বৌমাকে নিয়ে আসুন,—এখন পুলক আস্‌ছে, বৌমার আসার তো দরকারই এখন!

অরুণের বন্ধু দুজন তাস হাতে করিয়া বসিয়াছিল, তারা খুব হাসিয়া বলিল,—"বাঃ! বেশ বলেছ গুপী, বেশ বলেছ!

অরুণের কুঞ্চিত কপাল ঘামিয়া উঠিল, তবু সে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল,—কই, তেমন হুকুমও তো পাই নি।

গুপী অরুণদের কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। তার বেয়াদবি-দোষ কেহ ধরিতে পারে নাই, তায় এক বাড়ীতে চাকরি করিয়া তার চুল পাকিয়াছে। সে বিশ্বাসী ও ভদ্র চাকর। অরুণের কথায় আর সে উত্তর দিল না, ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অরুণ উঠিল, বলিল,—দেখে আসি, আবার বাবা কি বলেন! বাবার রাগকে আমি যত ভয় করি, তেমনি সব আমারই কপালে পড়ে,—পটলা সত্যিই ভাগ্যবান!

কর্ত্তা ইজি-চেয়ারে শুইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। রাগের পর মানুষের মুখে যে ক্লান্ত কাতর ভাব ফোটে, তাঁর মুখও তেমনি দেখাইতেছিল। তিনি অরুণের দিকে চোখ তুলিয়া বলিলেন,—তোমার হাতে তো এখন কোনো কাজ নেই?

—না।

—তবে যাও, নিবারণের কাছ থেকে দরকারি কাগজ যে ক'খানা আছে, নিয়ে একটু দেখে দাওগে, ওগুলি বোধ হয় এখনি দেখে দেওয়া দরকার!

অরুণ বলিল,—ওগুলি আজ রাত্রেই নিবারণকে ফিরিয়ে দিতে হবে কি?

—হ্যাঁ, আজ রাত্রেই।

—আচ্ছা। বলিয়া অরুণ একটু থামিল। তার তখন জিজ্ঞাস্য ছিল যে, আপনার শরীর সুস্থ আছে কি না? কিন্তু পাছে আবার বিরক্ত হন, এই ভয়ে কিছু বলিল না; তিনি নিজেও কিছু বলিলেন না। তবু তাঁর চিন্তা-ম্লান মুখখানি অরুণের মনকেও কেমন খারাপ করিয়া দিল।

নিবারণ আসিয়া খেরো-বাঁধানো খাতা-পত্র আগাইয়া ধরিল। সেই সব দেখিয়া দিতে দিতে অরুণের রাত সাড়ে আটটা নয়টা হইয়া গেল।

দোষ ছিল নিবারণেরই,—কেন না, এই অতি-প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র দিনের বেলায় উপস্থিত করাই তার উচিত ছিল, কিন্তু তার বুদ্ধির ভুলে সে রাত্রে আনিয়া হাজির করিয়াছে! কাজ সারিয়া হাঁফ ছাড়িয়া অরুণ বলিল,—বাঁচলুম! আমি যে আবার কখনো জমিদারীর কাজ নিয়ে বসতে পারবো, তা আমার কল্পনারও অতীত ছিল,—এখন দেখছি, সবই পারি।

নিবারণ খাতা পত্র বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল,—এত গণ্ডা পাশ করে এলেন বাবু, আর এই কাজ পারবেন না!

অরুণ হাসিল, বলিল,—বাবার শরীর এমন খারাপ না হলে আর আমি এ কাজে হাত দিতুম না।

রাত্রে যখন সে বিছানায় পৌঁছিল, তখন কেমন একটা ব্যর্থ বেদনায় সারা মন ভরিয়া উঠিল। দুঃখ-চিন্তায় ডুবিয়া থাকা সে বড় অপছন্দ করিত। তবুও তো কেমন একটা ক্ষোভ তার যৌবন-স্ফীত বুকে ক্লান্তির ভাব আনিয়া দিতেছিল।

বাপের মন ভার, সংসার ভারাক্রান্ত,—এখানে একটু আনন্দ নাই, হাসি নাই, নেহাৎ দরকার ছাড়া কেহ কথাও বলে না,—এ সকলই বুঝি তারই দোষে?…কিন্তু কেন?

তার মন আবার উগ্র বিদ্রোহে ঝাঁঝিয়া গরম হইয়া উঠিল। কেন, সে কি করিয়াছে? এক তো সে কারো

কাছেই কিছু চায় নাই,—আর নিজের সুখ? তাই বা সে কবে খুঁজিয়াছে? এই তো এতদিন সে এই বিশ্রী, আনন্দ-বর্জ্জিত বাড়ীর কোণেই চুপ-চাপ করিয়া পড়িয়া আছে,—আর সে কি করিবে? মানুষে আর কত সহ্য করিতে পারে? হঠাৎ মনে পড়িল, কিন্তু সে? এত দিন পরেই বোধ হয় সে সবিতার সহ্যশক্তিকে মনে মনে প্রশংসা করিল।

ভোরের ট্রেণে পুলকের আসিবার কথা,—কিন্তু ষ্টেশনে যাইবার সময়ও অরুণের ঘুম ভাঙ্গে নাই। গুপী গিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিলে তবে সে উঠিয়া ঘড়ির দিকে চাহিল। গুপী বলিল,—কর্ত্তা বাবু ষ্টেশনে যেতে বললেন।

অরুণ রাগিয়া বলিল,—তা আর খানিক বাদে ডেকে দিলেই ঠিক হতো তো,—ট্রেণটা এসে গেলে!

তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া সে ষ্টেশনে চলিয়া গেল।

পুলক বাড়ী আসিয়া প্রথমে কর্ত্তার কাছে পৌঁছিল; পৌঁছিয়াই বলিল,—কই? বৌমা কোথায় গেল? আমার বৌমা—

কর্ত্তা গোপীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—একে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যা।

পুলক বারবার বলিতে লাগিল,—বারে! বৌমা নেই!

অরুণ বলিল,—যাও, ছোট বৌমা আছেন।

পুলক ঠোঁট ফুলাইল,—ছোট বৌমা থাকুগে,—বৌমা কোথায় গেল, বল?

—সে বেড়াতে গেছে,—তার মায়ের কাছে।

—মায়ের কাছে? আসবে না?

—আসবে বই কি!

পুলক বলিল—আমিও সেইখানে যাবো!

—সেখানে যাওয়া যায় না।

—যায়। আমি বৌমার কাছে যাব।

এবারে পুলক রীতিমত চেঁচাইয়া কান্না আরম্ভ করিল। ছেলেদের কান্না অরুণ একেবারে সহ্য করিতে পারিত না। কাজেই সে পুলককে বাবার কাছে পাঠাইয়া দিয়া নিজে বাহিরের দিকে সরিয়া পড়িল, প্রভাত পুলকের কান্না শুনিয়া বলিল,—এখানে এসেও আবার চেঁচানি হচ্ছে কেন?

অরুণ একটু হাসিয়া বলিল,—বৌমা হারিয়ে গেছেন!

—কি রকম?

—কাশীতে গেছেন তিনি, তাঁর মায়ের কাছে।

—ওঃ, তবে তো ওর মুস্কিল বটে! বলিয়া প্রভাত চুপ করিল। ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

মিলনের বেলা

অমা-অন্ধকার কুন্তলে আমার, আজি জ্যোৎস্নার মেলা,
চির-মিলনের অলকা-আলোক বলে মিলনের বেলা!
বন্ধু তোমার পড়েছে নিশ্বাস, আমার ললাট' পরে,
সাগর-পারের গদ্‌গদ গাথা শ্রবণে উঠিছে ভরে,'
নয়নে আমার, মরমেতে আর, আলোর জোয়ার আসে,
আনমনা মনে নয়নে স্বপনে শরৎলক্ষ্মী হাসে!
আজিকে ধরণী দ্বিগুণ মধুর, শ্যামল শোভার ডালি,
ফুলে ফুলে ভরা কাণায় কাণায় কোথাও নাহিক খালি,
বাতাস আনিছে উত্তর-পথের বারতা নিরুত্তর,
স্নেহ-সুশীতল পরশের লাগি আর যে সহেনা স্বর!

প্রভাতে প্রদোষে আবছায়া চোখে, কুয়াশা করুণ চায়
বিদায়-বেলার ছল ছল দিঠি পথ যেন আগুলায়!
চরণ ভুলেছে চঞ্চল গমন-মৃদু তার যাওয়া-আসা,
যেতে হবে, তবু ভুলিতে পারেনা এ পথের ভালোবাসা!
দীর্ঘ বিরহের বেলা পড়ে অই মিলন-লগন আসে,
বন্ধু আমার চোখের সুমুখে, কেবলি ও মুখ ভাসে!
শান্তি-পতাকা দিয়েছ শিরোপা, নিয়েছি মাথায় করে'
যাত্রা করে' যে পথ চেয়ে আছি, নিয়ে যাও হাতে ধরে'!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

সঙ্কলন

নারী-প্রসঙ্গ

(করাচী নগরে নারী-সভায় কবি রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম)।

যে-কোন সাধনাতে প্রেরণা-দানের শক্তিটি নারীর শক্তি। শিক্ষায় রাজনীতিতে নারীর অন্তরের প্রেরণা না পেলে কখনও শক্তি সত্য ও গভীর হয় না।

আমাদের সব অনুষ্ঠানেই নারীর কর্ত্তব্য, নারীর সাধনা অনেক পরিমাণে দরকার। সেইটে যদি বাদ পড়ে, শূন্য থাকে, তবে অনুষ্ঠান একপেশে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার প্রাণশক্তি ফুটে ওঠে না। মানব-সভ্যতার সাধনা এতদিন পুরুষের সাধনা-মাত্র ছিল। কাজেই কেবলমাত্র পুরুষের সেবা পেয়ে এই সভ্যতার প্রাণ ক্ষতিগ্রস্ত, অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। বর্ত্তমান সভ্যতা নারীর সেবা হতে বঞ্চিত এবং কেবল পুরুষের চেষ্টাজাত বলে তার মধ্যে লোভ, দম্ভ, নিষ্ঠুরতা এ-সবই দেখা দিয়েচে। আজ তাই সর্ব্ব জগৎ পীড়িত ও ব্যথিত। পুরুষ কেবল তন্ত্র ও যন্ত্র নিয়েই কাজ করে, ব্যক্তিদের দিকে চায় না। তাই শক্তি, লাভ, সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্র লক্ষ্যের কাছে এই "ব্যক্তিত্বকে" বলি দেওয়া হয়। ব্যক্তিদের দুঃখ বোঝবার মত যথেষ্ট প্রশস্ত হৃদয় পুরুষদের নেই। তারা বিচ্ছিন্ন আসমানী তত্ত্ব (abstract truths) মাত্র বোঝে। ব্যক্তিত্বের দরদ বোঝে না।

যখন ছোট ছিলাম, স্কুলে থাকার দুঃখ আমি বুঝতাম। সেখানে দুঃখ কিসের? স্কুলে বড় দুঃখ, কারণ তাতে ক্লাশ আছে, ব্যক্তিগত ছাত্র নাই। কল-লোভী মাষ্টার ক্লাশ দেখেন ছাত্র দেখেন না—ব্যক্তির দরদ বোঝবার হৃদয় স্কুলের নাই, কাজেই এই রীতি নিষ্ঠুর। আমি বড় দুঃখ ও আঘাত পেয়ে স্কুল ছাড়লাম। স্কুল পুরুষের সৃষ্টি, ব্যক্তির হৃদয়ের দরদ বোঝবার শক্তি তার নেই।

সভ্যতার যন্ত্রের দরকার আছে, তবে তার ব্যক্তিগত দরদ বোঝবারও দরকার আছে। ব্যক্তিও যেন বাদ না পড়ে, এটাও তার বোঝা দরকার। আমি এই যন্ত্রের নিষ্ঠুরতা বুঝেচি; তাতেই আমার আশ্রমের সেবায় এই নারীর সেবাকে চাই। আমার কাজের হৃদয়ে তাঁদের চাই।

নারীর যে মহাশক্তি আছে, তা কেবল তাঁদের গৃহ-সংসারই লুটে নিচ্চে, দেশ আর নারীর সেবাকে পাচ্ছে না। কাজেই বঞ্চিত দেশ দরিদ্র রয়ে গিয়েচে। হৃদয়ের রস ও কর্ম্মের শক্তি ঘরে ও সংসারেই রয়ে গিয়েচে। এই হেতু দেশ বহু দুঃখগ্রস্ত। নারী পিছে থেকেও প্রেরণা দান (inspire) করে। এই প্রেরণার অভাব হলেও সেই অভাব সব সময় পুরুষরা বুঝতে পারে না বটে, কিন্তু সব কাজেই তারা শক্তিহীন হয়ে আছে। তাই তো দেশের কাজে শক্তি হচ্ছে না।

পুরাণের একটা গল্প বলি। নারী পত্নী-সাবিত্রী তাঁর স্বামী সত্যবানকে মৃত্যুলোক হতে ফিরিয়ে আনেন। এ কথা সত্য যে আমাদের দেশ যুগ যুগ ধরে মৃত্যুগ্রস্ত। সত্য-সাধনা যে নেই। নানা মৃত আচারে অনুষ্ঠানে ভিতরের সত্য চাপা পড়ে গিয়েচে। আজ সত্য দেখাই যায় না। ঋষিদের লক্ষ্য ভুলে গিয়েচি, ভারত তার সত্য হারিয়েচে। তোমরা এই দেশের কন্যা, আমাদের ভগ্নী ও মাতা। তোমরা সাবিত্রী, তোমাদের শ্রদ্ধায়, সাধনায় ও তপস্যায় ভারতের সেই গভীর জীবনকে, সত্যকে বাঁচাও। সরল প্রেমের জোরে সত্যকে, সাধনাকে মৃত্যুর দ্বার হতে ফিরাও। নূতন জীবন তাকে দাও। আমরা পুরুষেরা পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে তার বিরাট প্রকাণ্ড পার্থিবতার মোহে মুগ্ধ হয়েচি। তাই সত্য-লাভে বড় বাধা হয়েচে।

তোমাদের মিনতি, সরল শ্রদ্ধায় তোমরা ভারতের সনাতন সত্য-সাধনার নূতন জীবন দাও। গভীর অধ্যাত্ম জীবন (spiritual life) দিয়ে সাধনার জীবনকে বাঁচাও। এই পার্থিব শক্তির পদদলন থেকে আমাদের দেশের সাধনাকে রক্ষা কর। অন্ততঃ ভারত একমাত্র সেইরূপ দেশ হোক, যেখানে আত্মার সত্য পার্থিব সত্য হতে বড়। লোভ, অতি-উৎপাদন, নিষ্ঠুরতা-জর্জ্জরিত, বৈষয়িক-বুদ্ধি-কলুষিত, জরা-জীর্ণ, বিশ্বাসহীন জগৎকে শ্রদ্ধার দ্বারা, আশার দ্বারা, প্রেমের দ্বারা বাঁচাও। শ্রদ্ধাতে সাধনার জীবনকে জাগ্রত রাখ।

পরের অনুকরণ, স্বার্থান্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ প্রতিদিন আমাদের দুর্ব্বল করচে। তাদের সভ্যতার সুরা পান করে কেমন মত্ত হয়েছি তা দেখলে ভবিষ্যতের জন্য নিরাশা ও অবসাদ আসে। জানি, এই দুর্গতি আসবে ও যাবে, তোমরা যদি তোমাদের তপস্যার জ্যোতি দাও, তোমাদের শ্রদ্ধার জীবন দাও, প্রাচ্যের আত্মাও জাগ্রত হবে। আমাদের মৃতপ্রায় আচার, ভারগ্রস্ত সত্য তোমাদের সাধনার বলে প্রকাশিত হবে। নিত্যসত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আবার জাগবে। তোমরা জীবন দাও, যাতে ভারতের যথার্থ জীবনের প্রকাশ হয়। যাতে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত, ক্ষুধিত, তৃষিত, আহত প্রতীচ্য এদেশে এসে এই প্রাচ্যের সাধনার আশ্রমে জীবনে শান্তি ও কল্যাণ লাভ করে।

শ্রেয়সী আষাঢ় ১৩৩০   শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিলাতের শ্রমজীবী

প্রথমে বিলাতে যাইয়া সাহেব-মেমেদের মুটে-মজুরী বাসা-চাকুরী প্রভৃতি করিতে দেখিয়া কেমন কেমন ঠেকিত। এদেশে যে সাহেব, সেই আমাদের প্রভু। যার রং সাদা, তার ত কথাই নাই; যার বর্ণ ঘোর কালো—জুতার কালির মত কালো, সেও যদি হ্যাট-কোট পরিয়া বেড়ায়, তাকেও এদেশে সেলাম না করিলে চলে না। ইংরাজের জেলখানায় পর্য্যন্ত তাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। রেল-গাড়ীতে তাদের জন্য আলাহিদা বন্দোবস্ত। এই সকল কারণে এদেশের লোকের মনে কেমন একটা প্রত্যয় জন্মিয়া যায় যে ইংরাজ বুঝি কেবল কর্ত্তাগিরিই করে, নোকুরি কখনো করিতে হয় না। সেদেশে গেলে এ ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। আর এদেশে যাঁরা বড় বড় চাকুরী করেন, মোটর চড়িয়া বেড়ান, দেশে ফিরিয়া গেলে তাঁদেরও যে কি দুর্দ্দশা হয়, চক্ষে না দেখিলে, বিশ্বাস করা যায় না। বড় বড় মেমেরা বাবুর্চ্চি, খানসামা, আয়া, মশালচী, সহিস, কোচওয়ান, দরওয়ান, বেহারা,—গণ্ডায় গণ্ডায় নোকর-পরিবৃত হইয়া থাকেন। দেশে ফিরিয়া গেলে এ নবাবী আর করিতে হয় না। সাহেব হয় পায়ে হাঁটিয়া না হয় ট্রাম বা বাসে চড়িয়া চলাফেরা করেন। মেমসাহেব একটা চাকরাণী হইয়া ঘরকন্না চালাইয়া থাকেন। অতি অল্প লোকেই সেদেশে চাকর-চাকরাণী রাখিতে পারেন। পুরুষ চাকর ত খুব বড় লোক না হইলে কেহই রাখেন না বা রাখিতে পারেন না। তাদের মাহিনাও বেশী, আর তার উপর শুনেছি, এ সখের জন্য সরকারকে একটা ট্যাক্‌সও নাকি দিতে হয়। এখানে যারা খুব বড় চাকুরী করিয়া গিয়াছেন, তাঁদের বাড়ীতেও কোন দিন পুরুষ চাকর দেখি নাই। অনেকেই কেবলমাত্র একজন চাকরাণী রাখেন, কেহ কেহ বা একজন চাকরাণী ও একজন রাঁধুনী রাখিয়া থাকেন। চাকর-চাকরাণী রাখা সোজা নয়। চাকরাণীদের থাক্‌বার ঘর দিতে হয়। সে ঘরে খাট, আলমারী, মুখ-হাত ধোবার টেবিল ও চিলিমচী, কেশবিন্যাস করিবার টেবিল ও আর্সি, এসব জোগাইতে হয়। খাট গদি ও তোষক এবং জোড়া কম্বল ও ধপধপে চাদর দিতে হয়। ঘরের মেজেয় শতরঞ্চি বা গালিচা পাতিয়া দিতে হয়। এক কথায় গরীব ভদ্র-লোকদের শোবার ঘরে যে সব আসবাব থাকে তা সকলই চাকরাণীদের শোবার ঘরে সাজাইয়া দিতে হয়। এটা তাদের প্রাপ্য।

তারা বাড়ীতেই থাকে বটে, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাই তাদের ওপরে হুকুম খাটানো চলে না। কাজের সময় বাঁধা আছে। সাধারণ ভোর সাতটা হইতে রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত তারা খাটে। মাঝখানে দু-প্রহরে খাওয়া-দাওয়ার জন্য ছুটি পায়। কিন্তু রাত্রে সাড়ে নয়টা বা দশটার পরে তাদের ডাকিলে চলে না। সপ্তাহে তারা একদিন সন্ধ্যার পরে ছুটি পায়। রবিবার দিন দুটা তিনটা হইতে তাদের ফুরসৎ। রাত্রে সাড়ে নয়টার সময়ে মুনিবদের নিজেদের কাজ নিজেদের করিয়া লইতে হয়। আর যেই কাজের ছুটি হয়, অমনি তারা পুরা-মাত্রায় স্বাধীন হইয়া থাকে। তখন তারা ভদ্রতার সীমার ভিতরে, যা খুসী তাই করিতে পারে, সেখানে খুসি যাইতে পারে। তখন তারা ঠিক মুনিবের মতই সাজসজ্জা করিয়া বেড়াইতে বাহির হয়।

এইরূপে চাকরে-মুনিবে মিলিয়া নিজেদের দেনা-পাওনার একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করিয়া বিলাতে চাকরেরা যতটা সম্ভব নিজেদের স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে শিখিয়াছে। চাকুরীর বেলা চাকর, অন্য সময় আর দশজন মানুষ যেমন আমিও সেইরূপ—এই ভাবটা সে দেশের চাকর-বাকরেরা বেশ সাধন করিয়া লইয়াছে বলিয়া চাকুরী করিতে যাইয়া তাদের মনুষ্যত্ব একেবারে পিষিয়া যায় না।

আমাদের সমাজে এ ব্যবস্থাটা কবে হইবে? সংসারে চাকর-মুনিবের সম্বন্ধ চিরদিনই এক আকারে না এক আকারে থাকিবে বলিয়া মনে হয়। কেহ কারও চাকুরী করিবে না, এটা কল্পনা করা কঠিন। আর কেহ কাহারও চাকুরী না করিলেই যে সমাজ স্বর্গধামে পরিণত হইবে এমনটাও বোধ হয় না। কিন্তু চাকুরী করাটা হীন হইবে কেন? নিজের সম্মান, নিজের ইজ্জৎ, নিজের স্বত্ব-স্বাধীনতা পুরা মাত্রায় বজায় রাখিয়া অপরের সেবা বা সাহায্য করা কি যায় না? এইটাই আমাদের সমাজে যাঁরা চাকুরী করেন ও যাঁরা চাকর খাটান, উভয় পক্ষকেই সাধন করিতে হইবে।

সংহতি, বৈশাখ, ১৩৩০

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দস্যু ও দাস

আমরা 'দস্যু' অর্থে এখন যাহা বুঝি প্রাচীন আর্য্যগণ যখন এই কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন তখন ইহার দ্বারা তাঁহারা একটু অন্যরূপ বুঝিতেন। মানব-শত্রু বুঝাইতে দস্যু শব্দের প্রথম প্রয়োগ হয় নাই। আর্য্যগণ প্রকৃতি-উপাসক ছিলেন; সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় বা অনুভব করিতে পারা যায় তাহাদের পূজা করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, ইহাদের প্রত্যেকের এক-একটি প্রাণী-দেবতা আছেন এবং এই দেবতার উদ্দেশে তাঁহারা সম্ভ্রমে মাথা নোয়াইতেন। প্রাচীন গ্রীক, ইংরাজ প্রভৃতি আর্য্যগণও এই ভাবে বহু দেবদেবীর পূজা ও উপাসনা করিতেন। ইহা স্বাভাবিক যে প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনা বা বস্তু মানবের মঙ্গলদায়ক হইতে পারে না, সেইজন্য প্রাণী-দেবতাগণ কেহ বা শুভ দেবতা আবার কেহ বা অশুভ দস্যু বলিয়া কল্পিত হইলেন। ঋগ্বেদের ঋষিগণ মেঘকে এরূপ একটি দস্যু বা অসুর বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে মেঘ-দস্যু আকাশের সমস্ত জল আবদ্ধ

করিয়া রাখে, ইন্দ্র দেবতা বজ্র দ্বারা তাহাকে নিহত করায় সে সমস্ত জল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ঋগ্বেদে বৃত্রাসুর-বধের উল্লেখ বহুস্থানে পাওয়া যায়। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যদের জীবন যেমন নূতন চিন্তার স্রোতে ও কার্য্য-প্রণালী দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, দেবতা ও অসুরের সম্বন্ধে তাঁহাদের কল্পনাও তদনুযায়ী নূতন রূপ ধারণ করিল। আর্য্যগণ যখন আড়ম্বরপূর্ণ যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডে মত্ত হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক সুখান্বেষণে রত হইলেন, ইন্দ্র তখন আর আড়ম্বরহীন বর্ষা-অধিপতি কৃষিদেবতা রহিলেন না, তাঁহাকে নানা ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত স্বর্গ-রাজ্যের রত্নসিংহাসনে বসানো হইল এবং তিনি ভোগ-বিলাসী ও বহু অপ্সরা-পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। বৃত্রও তখন আর সামান্য মেঘ-দস্যু রহিল না, সে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের একজন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কল্পিত হইল। যখন কোন যজ্ঞ হইবার ব্যাঘাত জন্মিত, তখন আর্য্যগণ মনে করিতেন যে, দৈত্য-দানব প্রভৃতি ভৌতিক জীবগণের দ্বারা এই অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে এবং উহাদিগকে 'দস্যু' আখ্যা দিয়াছিলেন। এইরূপ কোন অতি-মানব জীব বুঝাইতে ঋগ্বেদে বহুস্থলে দস্যু শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের আর্য্যগণ কোন অনার্য্য মানব-শত্রুকে উদ্দেশ্য করিয়া দস্যু শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, যখন আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের সহিত সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন তাঁহারা মানবদেহধারী অনার্য্যগণকে 'দস্যু' এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। আমরা ঋগ্বেদ হইতে জানিতে পারি যে আর্য্য ও দস্যুদের বিরোধের প্রধান কারণ ধর্ম্ম লইয়া। এইজন্য ঋগ্বেদে দস্যুদের সম্বন্ধে 'অব্রাহ্মণ', 'অকর্ম্মণ,, 'অদেব্য' 'অযজ্যু' 'অব্রত' 'অন্যব্রত' প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য সুধীবর্গ বলেন যে যখন আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন উত্তর-ভারতে অনার্য্য-জাতিদের মধ্যে দ্রবিড়জাতি সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ছিল ও তাহাদের নাসিকা চ্যাপ্টা আকার; তাই তাহাদিগকে 'অনাস' বলা হইয়াছে; মেগাস্থিনিসের বিবরণও নাকি এই মত সমর্থন করে। অধুনা যে দ্রবিড়জাতি দেখিতে পাওয়া যায় ইহা প্রাচীন দ্রবিড় ও মুণ্ডা জাতির সংমিশ্রনে উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদে কোন কোন স্থানে দস্যুদিগকে 'মৃধ্রবাক' বলা হইয়াছে। আবার পুরু ও পণি জাতির বিশেষণ-রূপে এবং সাধারণ শত্রু বুঝাইতেও এই কথাটির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যে অপমান-সূচক কথা বলে তাহাকে 'মৃধ্রবাক্' কহে কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, যাহাদের ভাষা দুর্ব্বোধ্য ছিল তাহাদিগকে 'মৃধ্রবাক' বলা হইত এবং এই জন্য কোন কোন আর্য্যশ্রেণীকেও এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ইরাণদের ভাষায় দস্যু শব্দের অনুযায়ী 'দহ্যু' শব্দটি 'প্রদেশ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে দস্যু শব্দে প্রথমে আর্য্যকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত প্রদেশসমূহকে বুঝাইত। আবার কেহ বলেন 'দস্যু'র মূল অর্থ শত্রু এবং একদিকে ইরাণ জাতি এই কথাটি ক্রমান্বয়ে 'শত্রুদের দেশ' 'বিজিত দেশ,' প্রদেশ অর্থে ব্যবহার করিতেছিলেন, অন্যদিকে ভারতীয় আর্য্যগণ ইহার অর্থে শুধু অনার্য্য নহে; এমন কি দৈত্য-দানব প্রভৃতি দেব-শত্রুও বুঝিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে 'দস্যু' কাল্পনিক অসুর দানব প্রভৃতি হইতে ক্রমে মানব-শত্রুতে পরিণত হইয়াছে। ঋগ্বেদের আর্য্যগণ কোন অনার্য্য শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া দস্যু শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন কি না, তাহা সঠিক জানা গেলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, পরবর্ত্তী কালে দস্যু শব্দের অর্থে মানব-শত্রু বুঝাইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শুনঃশেপের আখ্যানে আমরা দেখিতে পাই যে, বিশ্বামিত্র ঋষির যে পঞ্চাশজন পুত্র শুনঃশেপকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদিগকে 'দস্যু' বলা হইয়াছে এবং অন্ধ্র, পুলিঙ্গ, শবর, পুন্ড্র, মূতিব প্রভৃতি ভারতীয় অনার্য্য জাতি তাহাদের বংশধর।

ঋগ্বেদের কয়েক স্থানে 'দাস' শব্দটি 'দস্যু' শব্দের ন্যায় ভৌতিক দৈত্য-দানব প্রভৃতি বুঝাইতে ব্যবহৃত হইলেও সাধারণতঃ মানব-শত্রু অর্থে ইহার বহু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে দ্রবিড়দের সহিত সংগ্রামের সময় আর্য্যগণ ইহাদিগকে 'দাস' আখ্যা দিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে যে দাসগণ প্রাচীর-বেষ্টিত সুদৃঢ় লৌহ-নির্ম্মিত 'পুর' বা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিত। শরৎ ও শীতকালের বাসোপযোগী করিয়া যে সমস্ত দুর্গ নির্ম্মিত হইত, তাহাদিগকে 'শারদীয়' বলা হইয়াছে। দাসগণ বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং তাহাদের ঐশ্বর্য্যের যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে দাসবর্ণের বহু উল্লেখ আছে এবং কোন কোন দাসকে 'কৃষ্ণত্বক্' বা কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে।

আর্য্যগণ যখন দাসদিগকে পরাজিত করিয়া ক্রমশঃ উত্তরভাগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন দাসদিগের মধ্যে অনেকে পর্ব্বতে ও অরণ্যে আশ্রয় লইল। যাহারা যুদ্ধে বন্দী হইল তাহাদিগকে আর্য্যগণ গোলাম বা নফর করিয়া লইলেন এবং তদবধি 'দাস' শব্দে সাধারণতঃ গোলাম বুঝাইতে লাগিল। ভারতে দাস-প্রথার (Slavery) উৎপত্তির ইহা একটি প্রধান কারণ। আর্য্যজাতির স্বভাবের ইহা একটি বিশেষত্ব ছিল বলিয়া মনে হয় যে, আর্য্যগণ যে দেশে অবস্থান করিতেন তথায় তাঁহারা পরাজিত অধিবাসীদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্ম, নীতি, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেককে গোলাম-শ্রেণীতে পরিণত করিতেন। ভারতবর্ষে আর্য্যধর্ম্ম ও

সভ্যতা বিস্তারের সময় এইরূপ ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষে দাসপ্রথা প্রচলনের একটি কারণ এই যে প্রাচীন আর্য্যগণ, যুদ্ধকার্য্যে ও শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকায়, কায়িক পরিশ্রমের বহু কার্য্যে পরাজিত দাসদিগকে নিযুক্ত করিতেন। অথর্ব্ব বেদে দেখিতে পাই যে, আর্য্যদের যে শুধু দাস-নফর ছিল তাহা নহে, দাসী নফরও ছিল। এই প্রকারে ক্রমে আর্য্য ও অনার্য্য রক্তের সংমিশ্রন হইতে আরম্ভ করে। আর্য্যগণ এই সমস্ত দাসীকে কোন কোন সময় উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিলেও অনেক সময় ইহাদের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, আর্য্যের ঔরসে ও দাসীর গর্ভে আর্য্যকবষ ও দীর্ঘতমার জন্ম হয়। আর্য্যকবষকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'দাসীপুত্র' বলা হইয়াছে। ইহাদের জননীদের নামও ঋষিগণ উল্লেখ করিয়াছেন : কবষ ও দীর্ঘতমা ঋষির মাতার নাম যথাক্রমে ইলুষও উশিজ ছিল। কিন্তু এই বিবাহ আর্য্যগণ খুব প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না এবং এই প্রকারের বিবাহজাত সন্তানকে কোন কোন সময় সমাজের গ্লানি সহ্য করিতে হইত। ব্রাহ্মণযুগে বংশ-মর্য্যাদার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা ছিল, তাই দেখিতে পাই যে বৎসপ্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া মেধাতিথিকে দেখাইলেন যে তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দাসী-জাত পুত্রকে পিতার নামে পরিচিত না হইয়া সাধারণতঃ মাতার নামে পরিচিত হইতে দেখা যায়, এই জন্য কবষকে 'কবষ-ঐলুষ' ও দীর্ঘতমাকে 'দীর্ঘতম ঔশিজ' বলা হইয়াছে। বর্ণ-বিভাগের সময় দাস ও দাসী যথাক্রমে শূদ্র ও শূদ্রাণীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল এবং মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, শূদ্রাণির যে কোন উচ্চবর্ণের সহিত বিবাহ বৈধ ও শাস্ত্রসঙ্গত ছিল ; কিন্তু এই প্রকারের বিবাহজাত সন্তানকে সমাজে তাহার পিতার অপেক্ষা কিছু নিম্ন স্থান দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে গো-ধনের ন্যায় দাস-দাসীকেও সম্পত্তি বলিয়া ধরা হইত এবং উহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা যে এক সময় বিদ্যমান ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। যতদূর জানা যায় এই প্রথা ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন জমিদারীর বাটোয়ারা হিসাবে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সহিত দাস-দাসী-বিভাগের কথাও জানা গিয়াছে এবং দাসী বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ লইবার দলিলও পাওয়া গিয়াছে।

প্রভাতী, আষাঢ়, ১৩৩০। শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী।

চক্ষুর যন্ত্র

চক্ষুর গঠন :—মানুষের চক্ষু গোলাকার। ইহার সম্মুখভাগে কাঁচের মত স্বচ্ছ কর্ণিয়া নামক অংশ অবস্থিত। ঠিক ইহার পিছনে চক্ষের তারা (iris)। এই তারার চতুর্দ্দিকের মাংসপেশী সকল তারাটিকে অধিক আলোকে সঙ্কুচিত করে ও অন্ধকারে বড় করে। এই তারার পিছনে লেন্স (lens) অর্থাৎ চক্ষুর মণি অবস্থিত। লেন্সের গঠ গোল ; মধ্যস্থান কিছু উঁচু। লেন্সের পশ্চাতে একটী জলের ঘর। ইহ পশ্চাতে সূক্ষ্ম স্নায়ুর জাল। এই জাল রক্তবাহী ধমনী ও শিরার পর্দ্দা বেষ্টিত। এই পর্দ্দা শক্ত সাদা চামড়ার মত জিনিষে বেষ্টিত। এক মোটা optic nerve নামক স্নায়ু সমস্ত চক্ষু গোলককে মাথার ঘিলুর সহিত সংযুক্ত করি আছে। ছয়টী মাংসপেশী গোলককে ডান দিকে বাম দিকে, উপরে ও নীচের দিকে অর্থা যখন যে দিকে দরকার সেই দিকে ঘুরাইতেছে
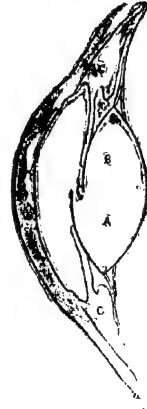
চক্ষুর গোলক সম্মুখ হইতে পশ্চাত দি কাটিলে নিম্নলিখিত অংশগুলি পর-পর পাইব :

(১) কর্ণিয়া—(Cornea)

(২) সম্মুখ প্রকোষ্ঠ—ইহা লোণা জ (aqueous humour) পূর্ণ থাকে।

(৩) চক্ষুর তারা ও ইহার চতুষ্পার্শ্ব চক্ষের মণি ও কর্ণিকা মাংসপেশী। (Iris and ciliary body)

(৪) চক্ষুর মণি বা (lens) লেন্স।

(৫) পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ ; ইহা ডিমের শ্বেতাংশের ন্যায় চট্‌চটে জ (Vitreous humour) পূর্ণ থাকে।

(৬) স্নায়ু-জাল (Retina)

(৭) কৃষ্ণবর্ণ ধমনী ও শিরার পর্দ্দা (Choroid)।

(৮) সাদা কঠিন পর্দ্দা (Sclerotic)।

চক্ষুর তারা

চক্ষুর কার্য্য—
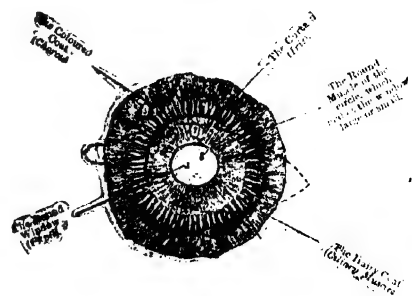
কোন দ্রব্য হইতে আলোক-রশ্মি কর্ণিয়ার ভিতর দিয়া সম্মুখ প্রকোষ্ঠের জল ভেদ করিয়া তারার ভিতর দিয়া চক্ষুর মণি ভেদ করিয়া পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠের জল পার হইয়া স্নায়ু-জালে পড়িলে আমরা দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখিতে পাই। এই বিষয়ে চক্ষু একটী অদ্ভুত ফটো তুলিবার ক্যামেরার মত কার্য্য করে। ক্যামেরায় বাহিরের দ্রব্যের আলোক-রশ্মি প্লেটের উপর পড়িলে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলে চিরকালের জ

প্লেটের উপর দ্রব্যটীর ছবি থাকিয়া যায় এবং নুতন ছবির জন্য অপর একটী প্লেটের দরকার হয়। চক্ষুতে প্রতি-মিনিটে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ছবি স্নায়ুজাল-রূপ একমাত্র প্লেটে পড়ে। ইহা বদলাইবার দরকার হয় না এবং আমরা অতি দ্রুত ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ দেখি। এই দেখিবার শক্তি কিন্তু চোখের নিজস্ব নয়। যে মোটা স্নায়ুটা চক্ষুকে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত করে তাহাই দৃষ্ট দৃশ্যগুলি মস্তিষ্কের দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রে
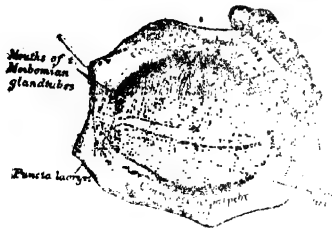
চক্ষুর মাংসপেশী

পৌঁছাইয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই। বিগত যুদ্ধে এই দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্র, মস্তিষ্কের কোন্ স্থানে অবস্থিত তাহা সঠিক জানা গিয়াছে। চক্ষুর যখন গোলাকার পরিবর্ত্তিত হইয়া ইহা চেপ্টা বা লম্বা হইয়া যায়, তখন আলোকরশ্মি স্নায়ুজালে পড়ে না এবং আমরা ঝাপ্সা দেখি। এই অবস্থায় চশমা ব্যবহার করিলে চশমার কাচ ভেদ করিয়া আলোক-রশ্মি ঠিক স্নায়ুজালে পড়ে এবং আমরা পরিষ্কার দেখি। Long sight বা Hypermtreopia নামক রোগে চক্ষু চেপ্টা হইয়া যায় এবং
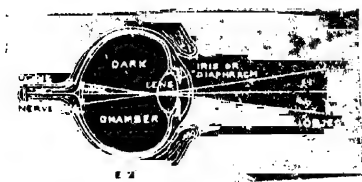
চক্ষুর দর্শনব্যায়

Short Mopiaয় চক্ষু লম্বা হইয়া যায়। প্রথমোক্ত রোগে নিকটে পড়িতে কষ্ট হয় এবং শেষোক্ত রোগে দূরে দেখিতে কষ্ট হয়। চক্ষুর একটা meridian লম্বা বা চেপ্টা হইয়া গেলে যথাক্রমে Myopic astigmatism বা Hypermetropi stigmatism বলা হয়। চক্ষুটী চেপ্টা এবং সেই সঙ্গে ইহার একটী Meridian লম্বা হইতে পারে কিম্বা লম্বা এবং একটী Meridian চেপ্টা হইতে পারে। ইহাকে Mixed Astigmatism বলে। এই সকল রোগে দেখিবার কষ্টের সঙ্গে খুব মাথার যন্ত্রণা হয় কিন্তু ঠিক চশমা পরিলে সকল কষ্ট দূর হয়। একজন বিশেষজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎসকের নিকট চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া এই সকল রোগে চশমার নম্বর ঠিক করানো উচিত। চশমাওয়ালার নিকট তাড়াতাড়ি একটা ভুল চশমা লইয়া ব্যবহার করিলে চক্ষের অনিষ্ট হয়।

সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে চক্ষুও ভাল থাকে। এই জন্য প্রত্যহ দুই এক ঘণ্টা ফাঁকা জায়গায় বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। ক্লান্ত অবস্থায় এবং ঘুম পাইলে পড়া উচিত নহে। চলন্ত রেলে, ট্রামে, মোটরে কিম্বা ঘোড়ার গাড়ীতে বসিয়া পড়া খারাপ।

বায়োস্কোপ (Bioscope) দেখিবার সময় ছবি হইতে যতদূরে বসা যায় চক্ষুর পক্ষে তত ভাল। যাহাদের বায়োস্কোপ দেখিলে চক্ষু ব্যথা করে তাহাদের ইহা দেখা উচিত নহে। যে ছবি (film) খুব
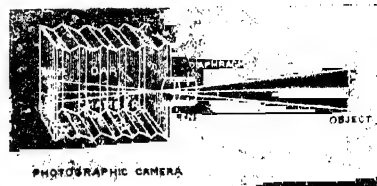
ক্যামেরার প্লেটে কি করে ছবি ওঠে

নড়ে বা আঁচড় কাটা বোধ হয় তাহা বায়োস্কোপে দেখান উচিত নহে। ক্রমাগত বহুক্ষণ ছবি না দেখাইয়া আধঘণ্টা কিম্বা পনের মিনিট অন্তর কিছুক্ষণ চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

ক্ষীণ বা অতি তীব্র আলোকে এবং ঘাড় নীচু করিয়া বইয়ের অতি নিকটে চক্ষু রাখিয়া কিম্বা শুইয়া পড়া উচিত নহে। খুব ছোট ছোট অক্ষর-যুক্ত বই পড়া অন্যায়। ডেস্কের উপরে বই অন্ততঃ চক্ষু হইতে এক ফুট দূরে রাখিয়া সোজা হইয়া টুলে বসিয়া পড়া সব চেয়ে সহজে পড়িবার মত ভাল। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের দেখা উচিত যেন পাঠ-গৃহে যথেষ্ট আলো থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাদিক্রমে না পড়িয়া প্রত্যেক ঘণ্টার পর চক্ষুর বিশ্রাম দেওয়া উচিত। পড়িবার সময় পুস্তকের উপর আলোক বাম দিক হইতে আসা ভাল। ডান দিক হইতে কিম্বা পশ্চাৎ হইতে আলোক আসিলে শরীরের ছায়া বইয়ের উপর পড়িয়া দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটায়। রাত্রে কৃত্রিম আলোকটিকে যাহাতে চক্ষে না পড়িয়া বইয়ের উপর পড়ে এইরূপ-ভাবে ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। কৃত্রিম আলোকে যত কম পড়া যায় তত ভাল। প্রত্যহ প্রাতঃকালে চক্ষু ভাল করিয়া ধুইবে, দেখিও যেন চক্ষের পাতায় পিচুটী না লাগিয়া থাকে। পড়া সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইল, সেলাই সম্বন্ধেও তাহা পালন করা উচিত। রাস্তায় বাহির হইবার সময় গাছের পাতার রঙের একখানি চশমা (Neutral Clelo

of shyl tinted glare protectors) ব্যবহার করিলে ধোঁয়া ধূলা বা অধিক রৌদ্র লাগিয়া চক্ষু লাল হইয়া ফুলিয়া কখনও কষ্ট দিবে না। চক্ষে তিলমাত্র কষ্ট হইলে বিলম্ব না করিয়া বিশেষজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎসকের উপদেশ-মত চলা উচিত।

স্বাস্থ্য, আষাঢ়, ১৩৩০

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

প্রাচীন ভারতের নগর বিন্যাস

পথের প্রয়োজন দ্বিবিধ ; প্রথমতঃ তাহাতে লোকজন কিম্বা যান-বাহনাদি চলাচল করে, দ্বিতীয়তঃ তদ্দ্বারা বসতিভূমি (building বা residential block) নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। পথগুলি আবার নগরের বায়ুপ্রবাহের প্রণালীস্বরূপ। কাজেই পথগুলিকে এমন ভাবে স্থাপন করিতে হইবে, যাহাতে পুরস্থ গৃহাবলীতে বায়ু-চলাচল এবং আলোক-আগমের সুবিধা থাকে ; সঙ্গে সঙ্গে, আপণ (বাজার), বিচারস্থান (court), সভাগৃহ (council), ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয়, পোতাশ্রয় (harbour) রেলষ্টেশন প্রভৃতি পুরবাসিগণের সাধারণতঃ যে যে স্থলে সমাগম হইয়া থাকে এইরূপ এক কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে সহজে বা স্বল্পসময়ে যাতায়াতের যাহাতে সুবিধা হয়, পথবিন্যাসের সময় তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়। পথে কিংবা পথের মোড়ে (crossing) যাহাতে পথিকসঙ্ঘ কিংবা বিপরীতগামী যানাদির সঙ্ঘট্ট না হয়, পথবিন্যাসের সময় তাহাতেও লক্ষ্য রাখিতে হয়।

প্রাচীন ভারতের পুরনির্ম্মাণবিদ্‌গণের রথ্যাবিন্যাস, পদবিন্যাস, জনস্থাপনা, রাজগৃহ, রাজসভাদি-বিন্যাসের সুকৌশলে প্রাগুক্ত বিধি-নিচয়ের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া যাইত। একটা নিয়ম তাঁহারা বেশ বুঝিতেন। সেটা :—পথে যানাদির সংঘর্ষ না হয়। দেবী-পুরাণে (৭২ অধ্যায় ৭৯ পঙক্তি) আছে, রাজপথ চল্লিশ হাত বিস্তৃত করিবে যাহাতে মানুষ, ঘোড়া, গাড়ী, হাতী প্রভৃতি পরস্পর ধাক্কা না খাইয়া সহজে চলাচল করিতে পারে। এইজন্য, বড় বড় সহরে ক্ষুদ্র বীথী কিংবা পদ্যা (foot-way) স্থাপন করা শুক্রাচার্য্য পছন্দ করেন নাই। প্রাচীন ভারতে পথভেদ ছিল বলিয়া মনে হয়। কৌটিল্য দুর্গনিবেশপ্রকরণে, 'রথপথ,' 'পশুপথ,' 'ক্ষুদ্রপশুমনুষ্যপথ' এবং তাহাদের বিস্তৃতি-পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে মাহিষ্মতীপুরীর বিন্যাসের কথায় লেখা আছে, রথ্যা (vehicular street), বীথী (avenue), নৃমার্গ, বন ও চত্বর স্থাপন করা হইল। একই নগরের বর্ণনায় বিভিন্ন পথের নির্দ্দেশে বিভিন্ন পথবাহীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ পথের ব্যবস্থা ছিল মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

সাধারণতঃ প্রধান প্রধান রাজমার্গগুলির প্রস্থ ষোল হাত হইতে চল্লিশ হাত পর্য্যন্ত করিবার বিহিত ছিল। দেবীপুরাণ এবং ব্রহ্মা পুরাণে আছে, রাজপথ চল্লিশ হাত, শাখারথ্যা ষোল হাত, উপর(গলি) তিন হাত, উপরথ্যিকা (ছোটগলি, bye-lane) দুই হা গৃহান্তর (দুইবাড়ীর মাঝখানে ফাঁক) দুই হাত, নালা বা নর্দ্দ অবকরপরীবাহ এক ফুট করা উচিত। রাজপথ চল্লিশ হাত চওড়া হই কলিকাতার হ্যারিসন রোড কিংবা সেন্ট্রাল এভিনিউ (Centr Avenue) এর মত বিশাল দেখা যাইবে।

নগরের আয়তন-অনুসারে কম বেশী পথের বিন্যাস করা বিধে রাজমার্গের সংখ্যা নানা গ্রন্থে নানা রকম নির্দ্দিষ্ট আছে। তবে লম্বাল তিন হইতে সতেরটা পর্য্যন্ত রাজমার্গবিন্যাসের ব্যবস্থা দেখিতে পাও যায়। প্রস্থের দিকের প্রায় তত সংখ্যক পথরচনার কথা আছে এমন ভাবে রাস্তা ফেলিতে হইবে, যাহাতে সমস্ত সহরটা 'সুবিভ (symmetrically divided) হয়।

পথবিন্যাসের পদ্ধতি সতরঞ্চের ছকের মত। অর্থাৎ পথবিন্য করিলে সমস্ত সহরটা কতিপয় আয়ত বা বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত হইয়া যাইবে অর্থাৎ দুইটী পথ সমকোণে কাটা চাই। বিদিকস্থ বা কোণা কুণি রা ঘর কিছু তৈয়ার করিতে নাই। কাজেই রাস্তাগুলি উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম দিকে প্রসারিত হওয়া দরকার। আধুনিক বড় বড় সহ সাধারণতঃ এই সতরঞ্চ প্রণালীতে (chess board বা trel system) রাস্তা আয়তক্ষেত্রে ভাগ হইয়া যাওয়াতে গৃহাদি নির্ম্মাণে পক্ষেও, (বিশেষতঃ, চতুষ্পথে) ইহা সুবিধাজনক। জয়পুরের প বিন্যাস এই পদ্ধতিরই রকমভেদ-অনুসারে হইয়াছে—উহার পা ভাষিক নাম প্রস্তরা।

পথের সংখ্যা এবং পথিপার্শ্বস্থিত গৃহপঙ্‌ক্তি রচনার বিভিন্নত অনুসা ভারতীয় নগরবৃন্দের পৃথক পৃথক নামকরণ হইয়াছে। এই শ্রেণীবিভা অনুসারে ময়মুনি—দণ্ডক, কর্ত্তরীদণ্ডক, কুটিকামুখদণ্ডক, কলকাব দণ্ডক, বেদীভদ্রক, মহাভদ্র, জয়াঙ্গ, বিজয় এবং সর্ব্বতোভদ্র এই ক রকমের সহরের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সমস্ত পথবিন্যাস পদ্ধতিরই বিভেদ মাত্র। মানসার, পথবিন্যাস এবং পদবিন্যাসের (site planing) বিভিন্নতা অনুসারে, দণ্ডক, নন্দ্যাবর্ত্ত, সর্ব্বতোভদ্র, প্রস্তরা চতুর্ম্মুখ, কার্ম্মুখ, পদ্মক এবং স্বস্তিক এই অষ্টবিধ নগর বা নগর বিন্যাসের বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রত্যেক গলি বা রাস্তার মাথায় কবাট-সহ তোরণ (গোপুর) নির্ম্মি হইত। কাশী, জয়পুর, আহাম্মদাবাদে এখনও ইহাদের নিদর্শন আছে। যদিও নগর রক্ষার জন্যই এই সমস্ত উদ্ভাবিত হইয়াছিল, এই তোরণা দিতে পথের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিও হইত।

মানসারের মতে, গ্রাম বা নগরকে (প্রাচীরের ভিতরে) বেষ্টন করিয়া যে মহা মার্গ বিস্তৃত হয়, তাহাকে মঙ্গলবীথী (boulevard) বলে

পূর্ব্ব পশ্চিম করিয়া বিস্তৃত পথকে রাজপথ বলে ; যাহার দুই প্রান্ত ভাগে দুই দ্বার আছে তাহাকে রাজবীথী বলে ; যাহার সন্ধি আছে, তাহাকে সন্ধিবীথী বলে ; যাহা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত তাহাকে মহাকাল বা বামন পথ বলে। দুই মহামার্গকে সংযোগ করিয়া স্থিত বলিয়া উহার নাম সন্ধিবীথী।

দুই বা ততোধিক পথের সঙ্গমস্থলকে বিশিষ্টাকার করা হইত। ত্রিপথকে ত্রিকোণাকৃতি (ত্রিক), চতুষ্পথকে চতুষ্কোণাকৃতি (চত্বর) এবং বহুপথকে (cross section of many roads) বৃত্তাকৃতি করা হইত। এই জন্য আজকালের মত পথের কোণ কাটিয়া, সোজা করিয়া বা ঘুরাইয়া দেওয়া হইত। এই রকম চৌমাথায় সভাবৃক্ষ কিংবা সভাগৃহ স্থাপন করা হইত। এইখানে গ্রাম বা নগরের অধিবাসীরা মিলিত হইত। প্রাচীন ভারতে চতুষ্পথে নগরের প্রধান সৌধ সমূহ নির্ম্মাণ বিহিত ছিল। মৎস্যপুরাণে (২১৭শ অধ্যায়) আছে, রাজধানীতে চারি বীথী রচনা করিবে ; একটীর প্রান্তভাগে দেব-মন্দির স্থাপন করিবে ; আর একটীর শেষে রাজবেশ্ম বিধান করিবে ; তৃতীয়টীর পুরোভাগে ধর্ম্মাধিকরণ নির্ম্মাণ করিবে, এবং চতুর্থ বীথীর অগ্রভাগে গোপুর বিন্যাস বিধেয়।

বড় বড় রাস্তার দুইধারে সারি দিয়া বৃক্ষ রোপণ করার কথাও আছে। কোন তামিল গ্রন্থকার লিখিতেছেন, কাঞ্চীপুর (আধুনিক Conjeeveram) নগরের রাস্তাগুলি এমন সুপ্রশস্ত ছিল যে এবং তাহাদের দুইপার্শ্বে আম্রশ্রেণী এত সুন্দরভাবে রোপিত ছিল যে, নগরের শোভা বাস্তবিকই মনোহারিত্ব লাভ করিয়াছিল। অনেক রাস্তার দুইধারে দেওয়াল থাকিত। সেই প্রাচীরের পুরাণ-তিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বন করিয়া সুচারু চিত্র অঙ্কিত হইত। জয়পুরে এই প্রাচীর-চিত্র দেখিয়াছি। সহরের বাড়ীগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হইত না। সমস্তই সুনিবদ্ধ ভাবে পঙ্‌ক্তিক্রমে নির্ম্মাণ করিতে হইত (পঙ্‌ক্তিকৃতানি গৃহাণি)। আজ-কালের মত রাস্তার মাঝখানটা উঁচু (কচ্ছপোন্নত) করা হইত—তাহাতে জল গড়াইয়া যাইবার পক্ষে সুবিধা হয়। রাস্তার দুইধারে নর্দ্দমা ছিল। এমন কি আজকালের মত কোন কোন নগরে রাস্তার নীচে ও জলপ্রণালী (sewers বা conduit sluices) স্থাপিত হওয়ার উল্লেখ আছে। ভাঞ্জী (Vanji) নগরে এই রকম জলপ্রণালী ছিল বলিয়া তামিল গ্রন্থকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন। মদুরা (Madura) নগরের বর্ণনায় প্রতি রাস্তার মোহানায় একটী করিয়া আবর্জ্জনাভাণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। তামিল ভাষায় তাহার নাম পুরীমাম্ [dust-bin]। এই সমস্ত পুরীমাম্ ইটের তৈয়ারী ও চুণকাম করা থাকিত।

রাজপথসমূহ বিন্যস্ত হইলে, সমস্ত সহরটীর কতকগুলি মহল্লায় (wards, সংস্কৃত পরিভাষায় 'গ্রাম' বলা হয়) ভাগ হইল। নগর-বিন্যাসেও জাতিভেদপ্রথা উপলক্ষিত হয়। কোন্ কোন্ স্থানে বা মহল্লায় কি কি জাতি বা ব্যবসায়ী অবস্থান করিবে, তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া হইত ইহাকে জাতিবিন্যাস [folk-planning] বলা যায়। সহজ এবং সুস্পষ্ট বলিয়া অগ্নিপুরাণে লিখিত পদ্ধতি এইখানে বিবৃত করা গেল। সমস্ত নগরটী একটীর ভিতর আর একটী করিয়া তিনটী আয়ত মণ্ডলে বিভক্ত করা হয়। বহির্মণ্ডলের অগ্নিকোণে স্বর্ণকারগণ, দক্ষিণে নর্ত্তকীগণ, নৈঋতে নট, চক্রিকাদি এবং কৈবর্ত্তাদি, পশ্চিমে রথ, আয়ুধ কৃপাণ ব্যবসায়ীগণ, বায়ুকোণে শৌণ্ডিক, কর্ম্মাধিকৃত ব্যক্তিগণ (ভৃত্য, অনুচর, চাকুরে প্রভৃতি), উত্তরে ব্রাহ্মণ, যতি এবং সিদ্ধবর্গ, ঈশানে বণিগ্‌জন এবং ফলাদি বিক্রয়কারিগণ এবং পূর্ব্বদিকে বলাধ্যক্ষগণ স্থাপন করিবে। দ্বিতীয় মণ্ডলের আগ্নকোণে বিবিধ বল (সৈন্য), দক্ষিণে বারবনিতা এবং সভাঙ্গনা [court-women] প্রভৃতির অধ্যক্ষ, নৈঋতে নীচ-জাতিবৃন্দ, পশ্চিমে মহামাত্যগণ, কোষপাল এবং কারুকগণ, artisans, উত্তরে দণ্ডনাথ (বিচারকগণ), নায়কবৃন্দ (পৌরপ্রধানগণ) এবং দ্বিজবর্গের বিনিবেশ করিবে। অন্তর্মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে ক্ষত্রিয়-বৃন্দ, দক্ষিণে বৈশ্যগণ, পশ্চিমে শূদ্রগণ, কোণে কোণে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীগণ এবং চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী পদাতিক স্থাপন করিবে। সহরের বাহির্ভাগে পূর্ব্বদিকে চললিঙ্গাদি, দক্ষিণে শ্মশানাদি, পশ্চিমে গোধন, উত্তরে কৃষককুল এবং ম্লেচ্ছবর্গকে ন্যস্ত করিবে। গ্রামেও এই রকম 'স্থিতি' হইয়া থাকে। এই রকম স্থিতিবিধান করিতে হইলে নগরে কাহারও নির্ব্যূঢ় স্বত্ব থাকিলে চলে না। কাজেই শুক্রাচার্য্যের মতে রাজা নগরের স্বত্বনিবর্ত্তন করিবে না, কেবল পুরবাসিগণের জীবনস্বত্ব থাকিবে।

নগরের উন্নতি ও বৃদ্ধির ব্যবস্থাও যে ছিল না, তাহা নহে। আজকালের মত Improvement Trust ছিল কি না বলা যায় না ; তবে প্রত্যেক নগরে কতকগুলি কর্ম্মচারী ছিল। স্থাপানার্হ, গণিতজ্ঞ, চিত্রজ্ঞ, সর্ব্বদেশজ্ঞ, বেদপুরাণেতিহাসবিদ্ এবং বাস্তুবিদ্যা-ব্দপারগ স্থপতি (Civic Architect) তন্মধ্যে প্রধান। স্থপতির অধীনে সূত্রগ্রাহি—ইনি জরিপ এবং পরিকল্পনায় পারদর্শী (রেখাজ্ঞ)। স্থূল, সূক্ষ্ম তক্ষণকার্য্যে দক্ষ তক্ষক সূত্রগ্রাহীর আজ্ঞানুসারী ছিলেন। তাঁহার অধীনে ছিলেন বর্দ্ধকি—ইনি কাঠ, ইট জোড়া লাগাইতে (joinery work) নিপুণ। এতদতিরিক্ত আরামকৃত্রিম-বনকারী, দুর্গকারী, মার্গকারক প্রভৃতিও ছিল। এই সমস্ত কর্ম্মচারীগণ রাজার গৃহাধিপতি নামক অন্যতম অমাত্যের (Minister with the portfolio of Civics) অধীনে ছিল। ইহাঁরাই Improvement Trustএর কার্য্য করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ একবার

দ্বারাবতী নগর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণাকার করিয়া পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগরাতে অতি প্রশস্ত আটটী মহারথ্যা, ষোলটী সুবৃহৎ চত্বর (cross-sections) এবং একটী বিশাল নগরবেষ্টিত মার্গ (Boulevard) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৯৮ অধ্যায়, ৫২—৫৬ পঙক্তি)। নব প্রপা (পানীয়শালা) আরাম, উদ্যানাদিও রচনা করিতে হইত; বাপী-তড়াগাদিরও অভাব ছিল না।

নব্যভারত, আষাঢ় ১৩৩০। শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত

শিখিবার কলা-কৌশল

দ্বিতীয় ভাগ

২

এমন কতকগুলি লোক আছে যাহারা—যাহা-কিছু জানে তাহার জন্য পুস্তকের ধার ধারে না। এমন কি সভ্য দেশেও, এমন-কি শিল্পকলার কর্ম্মীদিগের মধ্যেও এখনও কত নিরক্ষর লোক বিদ্যমান!

ইহার বিপরীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, সামান্যই হোক্, খ্যাতনামাই হোক্ কোন-না-কোন শিক্ষকের নিকট কোন কিছুর জন্য ঋণী নহে। যখন পৃথিবীতে গ্রন্থাদির অস্তিত্ব ছিল না, তখন মুখে-মুখেই শিক্ষার কাজ চলিত। মানবীয় বাণী ধ্বনিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের আদিম পিতৃ-পুরুষেরা, যাহা-কিছু নিজে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, অথবা তাঁদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা—আপন-আপন অনুষ্ঠিত কার্য্যের দ্বারা পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিতেন। এইরূপে চড়াই পাখী, ঝকার নীড়ের কিনারা হইতে বাচ্ছাদিগকে ডানার ব্যবহার শিখাইয়া থাকে। মানব-শিশু যদিও জ্ঞানলাভের জন্য প্রথমে আবিষ্কারের প্রণালী অনুসরণ করে, কিন্তু তাহার পরে তখনই আবার দৃষ্টান্তগত শিক্ষা আসিয়া শিক্ষার কাজে হস্তক্ষেপ করে,—কণ্ঠস্বর একটু একটু,করিয়া এই কাজে সাহায্য করে। অতএব কি মুখ-ভঙ্গী, কি শব্দোচ্চারণ উভয় সম্বন্ধেই শিক্ষকের শিক্ষাদানই সমগ্র মানব সভ্যতার এবং আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের মূলভিত্তি। মনোবিকাশের ইতিহাসে ইহা উদ্ভাবনারই ন্যায় নিতান্ত আবশ্যক ও শ্রদ্ধেয়।

শিক্ষক শুধু যে পুস্তকের অগ্রবর্ত্তী তাহা নহে —কেননা শিক্ষকের সাহায্যেই পড়িতে শেখা হয়; শিক্ষক শুধু আত্মপর্য্যাপ্ত তাহাও নহে—কেননা, খুব ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, পৃষ্ঠার স্থান বাক্যই অধিকার করে; কি কার্য্য-কারিতার হিসাবে পুস্তক অপেক্ষা শিক্ষকের শ্রেষ্ঠতা মানিতেই হয়। শিক্ষক সম্মুখে উপস্থিত থাকেন ও কাজ করেন। পুস্তকও সম্মুখে উপস্থিত থাকে বটে; কিন্তু এ স্থলে শিক্ষার্থী অনুপস্থিত পুস্তক শিক্ষার্থীর নিকটে গিয়া হাজির হয় পুস্তকের এরূপ কোন উপায় নাই। গ্রন্থ জড়বস্তুর সামিল, যতক্ষণ চোখ গ্রন্থের পংক্তি ও জীবন্ত মন এই উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন না করে। যে পুস্তক পাঠ করা যায়, তাহা চোখের সামনে যতই খোলা থাকুনা কেন, তাহাতে কোন কাজ হয় না। যদি চোখ উহা না পাঠ করে, তাহা হইলে উহা একটা নির্ব্বাপিত দীপ মাত্র, দৃষ্টির সংস্পর্শে আসিলেই উহা আবার জ্বলিয়া উঠে,—যেমন বিদ্যুৎ-প্রবাহ-সঞ্চারিত বৈদ্যুতিক ল্যাম্প। পক্ষান্তরে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে শিক্ষকই এই প্রবাহ সঞ্চারিত করেন। শিক্ষার্থী নিজে চেষ্টা না করিলেও এমন কি কখন-কখন তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, শিক্ষকের গুণগ্রাম ছাত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ছাত্রের দুর্ব্বল ইচ্ছাশক্তির স্থানে শিক্ষক তাঁহার নিজের উদ্যম-শক্তি স্থাপন করেন। তাঁহার সুশৃঙ্খল পদ্ধতির দ্বারা ছাত্রের বিশৃঙ্খলাকে দমন করেন। তিনি সময়ের অপব্যয় নিবারণ করেন, তিনি শিক্ষার্থীর ভিতরে আবিষ্কার-বুদ্ধি উদ্দীপিত করেন; তিনি তাহাকে পথপ্রদর্শন করেন, নিয়ম শাসনের দ্বারা তাহাকে অনুশাসিত করেন, পথচ্যুতি হইতে

রক্ষা করেন। উত্তম শিক্ষক ছলে, বলে, কৌশলে যেন মূর্ত্তিমান জ্ঞান হইয়া শিক্ষার্থীর অন্তরে প্রবেশ করেন। পূর্ব্বের ন্যায় তুলনাটা আবার প্রয়োগ করিয়া বলিতেছি যে, উত্তম শিক্ষকের যে শিক্ষা, উহা যেন সুচর্ব্বিত খাদ্য—কতকটা যেন আধো-হজম-করা খাদ্য। ভোজনকারী ব্যক্তি চেষ্টা-বিমুখ হউক না কেন, ইহা সে স্বাত্মকৃত করিবে, এবং ইহা হইতে সে জ্ঞান লাভ করিবে। Fenelonকে শিক্ষক রূপে পাইয়া Duc de Bourgoneর এইরূপই ঘটিয়াছিল। যখন ফেনেলোঁ তার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন তখন চতুর্দ্দশ লুইর পৌত্রের চেয়ে খারাপ ছাত্র দুনিয়ায় আছে—এরূপ কেহ স্বপ্নেও মনে করিতে পারিত না।—অলস, ঝগড়াটে, লম্পট, অজ্ঞ। কিন্তু এই রাজকুমারই শেষে শুধু যে কতকগুলি মানসিক সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, এমন কি তিনি তাঁহার রাজসভারও অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; এবং যখন ফেনেলোঁর ছাত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন সমস্ত ফ্রান্‌স তাঁহার বিয়োগে অশ্রুপাত করিয়াছিল। এ কথা সত্য এই শিক্ষক ছিলেন ফেনেলোঁ, এবং ফেনেলোঁ তাহার সমস্ত প্রতিভা এই একটি ছাত্রের উপর ব্যয় করিয়াছিলেন। এখন বল দেখি, কোন্ গ্রন্থের দ্বারা এই রূপান্তরের কাজটি সংসাধিত হইতে পারিত?

অতএব শিখিবার পক্ষে উত্তম শিক্ষকের কার্য্যের মত মূল্যবান জিনিস আর কিছুই নাই। কেবল,—যে-সব কারণে কোন উত্তম শিক্ষকের কার্য্য এরূপ উপাদেয় ও উপকারী হয় সেই একই কারণে কোন মাঝামাঝি বা খারাপ শিক্ষকের কার্য্য নিষ্ফল বা বিপদজনক হইয়া দাঁড়ায়। এক কথায় বলিতে গেলে, শিক্ষকটি যে-দরের লোক, তাঁর শিক্ষার দামও সেই দরের। শিক্ষক মানুষ বইত নয়; অতএব উত্তম শিক্ষকের সংখ্যা অপেক্ষা মাঝামাঝি শিক্ষকের সংখ্যাই বেশী। এইজন্যই শিক্ষক-প্রদত্ত শিক্ষা—যদি না শিক্ষার্থীর ধীশক্তি ও উত্তম চেষ্টা ঐ শিক্ষাকে সম্যক সাহায্য করে—সাধারণতঃ সুফলপ্রসূ হয় না। উত্তম শিক্ষক অতীব দুর্লভ। Figaroর পরিহাস-বাক্যটি একটু তারতম্য করিয়া এইস্থলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে:—শিক্ষার্থীর কাছে যে সব গুণের দাবী করা যায়, সেই গুণ-অনুসারে, কতজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীর যোগ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে? আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, শিক্ষার্থীর যে সব গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা এই:—ইচ্ছাশক্তি, শৃঙ্খলা, ধৈর্য্যশীল অধ্যবসায়। ঠিক্ এইগুলিই শিক্ষকেরও থাকা আবশ্যক। কেননা, শিক্ষকই শিক্ষার্থীর ইচ্ছাশক্তি, শৃঙ্খলা ও সময়—এই তিনের পরিচালনা ও সুব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইহা অতীব বিরল। ইহা ছাড়া শিক্ষকের আর কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, যাহা ছাত্রের নিকটে আমরা প্রত্যাশা করিনা;—প্রথমত জ্ঞান; কিন্তু এমন সব শিক্ষকও আছেন যাঁরা অজ্ঞ। তার পর, আমি যাহা জানি তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিবার পটুতা; কিন্তু এমন সব শিক্ষকও আছেন যাঁরা শুধু নিজেই পণ্ডিত; যে জ্ঞান তাঁহাদের অন্তরে একবার প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা কিছুতেই বাহির হইতে চাহে না। পরিশেষে প্রমাণ-স্থানীয় বিশেষজ্ঞতা; ইহা বড়ই বিরল, ইহা অল্পে-অল্পে ক্রমশঃ অর্জ্জিত হয়—ইহার অভাবে শিক্ষক খুব পণ্ডিত হইলেও বুদ্ধিমান হইলেও, বাগ্মী হইলেও, তিনি যে শিক্ষা দিবেন তাহা নিতান্ত মাঝামাঝি ধরণের হইবে। অ-প্রামাণিক অ-বিশেষ শিক্ষকদের সম্বন্ধে হাস্যজনক ও শোচনীয় স্মৃতি উদ্রেকের পক্ষে যৌবনের কয়েকবৎসর বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করাই যথেষ্ট।

দুঃখের বিষয়, ছাত্র শিক্ষকের দোষগুলারও অংশভাগী হয়। অজ্ঞতা, বিশৃঙ্খলা, সময়ের অপব্যবহার এই সমস্ত ছাত্র শিক্ষক হইতে প্রাপ্ত হয়। স্মরণ করিয়া দেখ, সেই অল্পবয়স্ক রুশীয় লর্ডের কি ঘটিয়াছিল; যুবক মনে করিয়াছিল, সে বিদেশাগত Bas-Breton প্রদেশীয় এক ব্যক্তির নিকট গ্রীক্ শিখিয়াছে—কিন্তু শেষে জানিতে পারিল সে Bre-Zounec ভাষা শিখিয়াছে; সেই বিদেশাগত লোকটি Xenophonএর ভাষা তাহাকে কি করিয়া শিখাইবে?—সে সে-ভাষা পড়িতেও জানিত না। আরও আমার স্মরণ হয়, একটি ভদ্রলোক আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন:—

"আলজিরিয়ায় আমি আরবদের গণিত শিখিয়ে জীবিকা অর্জ্জন করতেম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম:—"তোমাদের আরবেরা তবে ফরাসী জানে?"

—"আদপেই না।"

—"তবে তুমি কি আরবি-ভাষা জান্তে?"

—"একটুও না। কিন্তু তাতে বড় কিছু এসে যায় না, কারণ আমি গণিতও জানতেম না।"

উপরে বর্ণিত ঐ দুই খেয়ালী ভদ্রলোকের মত,—আমার কথায় বিশ্বাস কর—অধিকাংশ শিক্ষকই একেবারে অজ্ঞ না হউক তাহারা কিছুই ভাল করিয়া জানে না, যাহা জানিত তাহারও বেশীর ভাগ ভুলিয়া যাওয়ায় তাহাদের কোন বিষয়ের যথেষ্ট জ্ঞান থাকে না। যে ছাত্র মনে করে এই সকল শিক্ষকের নিকট সে শিক্ষালাভ করিয়াছে উপরিউক্ত আরব-গণিতিক ও রুশীয় লর্ডের ন্যায় নিশ্চয়ই একদিন তার ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। কোন শিক্ষক পণ্ডিত হইলেও তিনি তাঁহার সমস্ত মানসিক কু-অভ্যাসগুলা তাঁহার ছাত্রদের মনে বপন করিতে পারেন —এরূপ আশঙ্কা আছে। একজন দিগ্‌গজ জ্যামিতিক, ব্যবহারিক কলা-বিদ্যালয়ের বিশ্লেষণ বিষয়ক আমার অধ্যাপক, যেরূপ শিক্ষা দিতেন তাহা যার পর নাই খারাপ; একটা কালো তক্তার সম্মুখে, তিনি মনের স্থৈর্য্য বজায় রাখিতে পারিতেন না কেমন যেন থতমত খাইয়া যাইতেন। কোন উপপত্তি (Demonstration) কখনও শেষ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। তিনি যে বিষয়ের অধ্যাপনা করিতেন, সেই বিষয় সম্বন্ধে এত বাজে কথা অনর্থক বলিতেন যে, বৎসরের মাঝখানেও আসল বিষয়ের এক তৃতীয়াংশেও উপনীত হইতে পারিতেন না। তিনি কখনই শেষ করিতে পারিতেন না। একবার ভাবিয়া দেখ, ছাত্রদের উপর ইহার ফল কিরূপ হয়! শুধু যে তিনি আমাদিগকে কিছুই শেখান নাই তাহা নহে, তাঁহার শিক্ষার বিরুদ্ধে আবার আমাদিগের কাজ করিতে হইয়াছিল। তার দরুণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের কিছুমাত্রকমে নাই, কেন না, তিনি একজন খ্যাতনামা জ্যামিতিক ছিলেন। তথাপি তাঁহা অপেক্ষা কম প্রখ্যাত অথচ যাঁহাদিগকে ঠিক "অধ্যাপক" বলা যাইতে পারে—এইরূপ শিক্ষকই আমরা পছন্দ করিতাম; যথা:—Grimaux ও Sarraw।

*

* *

যাহা এতক্ষণ বলা হইল তাহা প্রবন্ধ-পাঠজনিত এক শুধু আমোদের জন্য নহে, পরন্তু একটা প্রচলিত সাধার ধারণার বিরুদ্ধে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ইহার উদ্দে অর্থাৎ শিক্ষার জন্যই শিক্ষকের দরকার; কোন শিশুর জ যখন কোন শিক্ষক ঠিক্ করা হয়, তখন এই মনে করিয় করা হয় যে ঐ শিশু যাহাতে শিক্ষার অবস্থায় আসি পারে। হাঁ,—এবং না। হাঁ, যদি শিক্ষক উত্তম হ না, যদি শিক্ষক খারাপ হয়। এবং এইজন্যই নিম্নলিখি অতি প্রচলিত বাক্যগুলা খুব জ্ঞান-গর্ভ ও সুবিবেচনা-সূচ বলিয়া মনে হয় না; যথা:—

—"আমার ছেলে ছবি-আঁকা শিখ্‌ছে"।—"ক কাছে?"

—"এক মহিলার কাছে।"

—"অমুক ব্যক্তি তাঁর সমস্ত অধ্যয়ন শেষ করেছেন।"

—"এই ইংরেজী ভাষার শিক্ষকটি খুব ভাল; কি তাঁর পারিশ্রমিক অত্যন্ত বেশী। আর একজনের খ পাওয়া গেছে, যিনি ওর অর্দ্ধেক নেন।"

ইত্যাদি ··

*

* *

একজন ভাল শিক্ষক ও একজন মন্দ শিক্ষক কিং মাঝামাঝি ধরণের শিক্ষক—ইঁহাদের পার্থক্য কিরূপে নি করা যাইতে পারে। উঁহাদের মধ্য হইতে ভাল শিক্ষকে কিরূপে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে?

প্রথম সমস্যাটা স্ব-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কেনন বাইবেল-গ্রন্থে আছে—"শিষ্য গুরুর উপরে নহে।" ত শিষ্য গুরুর বিচার কি করিয়া করিবে? গুরুর পরিম করিতে হইলে নিজের জ্ঞান থাকা আবশ্যক নহে কি?

বেশ কথা! কিন্তু ব্যবহার-ক্ষেত্রে একজন খারা শিক্ষকের মুখস্-খসানো ততটা শক্ত নয়। তিনি নিজে আলস্য এ বিশৃঙ্খলার দ্বারাই ধরা পড়েন। ছাত্র হইলে গুরুর অজ্ঞতা মনোযোগী ছাত্রের চোখ্ এড়াইতে পারে না সামান্য ছাত্রেরাও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগেরই মত কি করি শিক্ষককে ঠিক-মতো বিচার করে—তাহা ভারী আশ্চর্য্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় কর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা তোমাকে বলিবেন, Brest নগরের বিদ্যালয়ে, সমস্ত ক্লাসের সম্মুখে যে অধ্যাপকের "বিদ্যাবুদ্ধির ঘট খালি হইয়া পড়িয়াছে" তাহাকে Nimes নগরের বিদ্যালয়ে পাঠান যাইতে পারে। কিন্তু সেখানেও যে খালি হইয়া পড়িবে।

মা-বাপেরও কর্ত্তব্য—যে গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের হাতে তাঁদের শিশুদিগকে সমর্পণ করা হয়, সেই গুরুমহাশয়ের কাজের উপর তাঁরা কড়া নজর রাখেন। গৃহশিক্ষকের সম্বন্ধে এ কাজটা সহজ; যে স্থলে ছাত্র ক্লাসে বসিয়া অধ্যয়ন করে, সম্ভবত সে স্থলেও তদারক করা শক্ত নয়। তাঁরা শিক্ষককে ছাত্রের সংখ্যা গুণিতে বলিবেন; বইগুলা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন; অভ্যাসের জন্য যে-পাঠ দেওয়া হয় তাহা ঠিক্-ঠাক্ জানিয়া লইবেন; নির্দ্দিষ্ট কাজের তালিকাটা পড়িয়া দেখিবেন! ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—যে পাঠ সে অভ্যাস করিয়াছে, কিংবা যে নির্দ্দিষ্ট task সে সম্পাদন করিয়াছে, তাহার চরম পরিণাম কি? এইরূপ দুই চারিটা কথা তলাইয়া দেখিলেই, শিক্ষকের যোগ্যতা নির্দ্ধারিত হইবে।

পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন, আমি তোমাদের সকলকেই বলিতেছি:—

অযোগ্য শিক্ষকের সম্বন্ধে খুব দৃঢ় হইবে, নির্ম্মমভাবে কড়া হইবে! বিদ্যালয়ের অসঙ্গত প্রথার প্রতি দোষারোপ করিতে একটুকুও দ্বিধা করিবে না; সেইসব প্রথা, যথা:—বে-পরিমাণ বে-হিসাবী বড় বড় গ্রন্থ-নির্ব্বাচন, বে-হিসাবী রকমের অধ্যাপনা বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাওয়া, তারপর তাড়াতাড়ি শেষ করা। শিক্ষিত পাঠ ও সম্পাদিত task সম্বন্ধে কোন সুব্যবস্থায় না থাকা। স্বীয় ব্যবসার নির্ব্বাচন করিতে কোন অধ্যাপককে ত কেহ বাধ্য করে না। তিনি যদি তাঁহার ব্যবসা নিজেই নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, তবে শ্রম-সহকারে তাহার কার্য্য সম্পাদন করুন, নচেৎ অন্যত্র প্রস্থান করুন।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট এক-একটা অভিভাবক-সমিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত, সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য এবং যাঁহারা শিক্ষার কাজ ভাল করিয়া তত্ত্বাবধান করিতে সমর্থ, এইরূপ অভিভাবকদিগকে বাছিয়া লইতে হইবে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, ছাত্রেরাই এইরূপ কাজের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য অভিভাবক সুবিবেচনার সহিত নির্ব্বাচন করিবে।

*
* *

মনে কর, উত্তম শিক্ষক নির্ব্বাচিত হইল। কিন্তু, শুধু তাঁহার উপরেই শিক্ষার সফলতা নির্ভর করিবে না।

এক সঙ্গে অনেক ছাত্র থাকিলে, এই বিষয়ে সাফল্যলাভ করিবার তেমন সম্ভাবনা নাই। যদি ৩০।৪০ জন Duc de Burgundyকে লইয়া ফেনেলোঁকে একটা ক্লাস গঠন করিতে হইত, তাহা হইলে তিনি কি সেই পরিমাণে ৩০।৪০ গুণ পরিমাণ কৃতকার্য্য হইতেন?

তবে, একজন শিক্ষকের শুধু একটিমাত্র ছাত্র থাকা—এটা এমন-একটা বিশেষ অধিকারের কথা যে ইহাকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনা যায় না। অধিকাংশ লোক যাহারা শিক্ষকদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহারা ক্লাসে পড়িয়াই শিখিয়াছে। অবশ্য ক্লাসের ভিতর শিক্ষকের কাজ ততটা সাক্ষাৎ ভাবের নয়, ততটা প্রখর একটানা রকমের ন্যায়। কিন্তু শিক্ষকের পদ্ধতির ভিতরেই ছাত্রের শিখিবার অসুবিধা!

শিক্ষকের কাজে কর্ম্ম-তৎপরতা যত বেশী খরচ হয়, ছাত্রের কাজে কর্ম্মতৎপরতা সেই পরিমাণে কম খরচ হয়। নিজের ইচ্ছা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য্যের স্থানে অন্যের ইচ্ছা, অন্যের শৃঙ্খলা, অন্যের ধৈর্য্য বসাইয়া দেওয়া হয়। অন্যের মাথায় হাত বুলাইয়া সে আপনার শ্রীবৃদ্ধি করে। রক্তহীনতা-রোগে রুগ্ন কোন ব্যক্তির শরীরে যেরূপ শোণিত-বিন্দু সঞ্চারিত করা হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ। শিক্ষককে বিদায় করিয়া দিলে, অনেক সময় ছাত্র একাকী কোন কিছু শিখিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। ইহা রাজ-পরিবারের মধ্যে, রাজন্য পরিবারের মধ্যে, খুবই লক্ষ্য করা যায়; এই সব পরিবারের বালকেরা সাধারণত খুব ভাল শিক্ষা পায়, কিন্তু ঐ শিক্ষার ভিতর এমন একটা কিছু আছে, যাহা আকার-হীন, বর্ণহীন, শৈত্যভাবাপন্ন। এবং ইহাও লক্ষ্য করা

যায়, এই সব রাজ-পরিবারে যেখানে মানসিক শিক্ষা-সাধনা অবহেলা করা হয় না—সত্যকার বড়লোক খুব কমই জন্মে।

অতএব, প্রিয় পাঠক, তুমি আক্ষেপ করিও না যে তুমি ও তোমার ছেলেরা তোমরা "রাজার হালে" মানুষ হও নাই। শিক্ষক-প্রদত্ত আদর্শ শিক্ষা তাহাই যাহা একজন উত্তম গৃহশিক্ষকের দ্বারা আরম্ভ হয় এবং পরে উত্তম বিদ্যালয়ে যাহার জের চলে। কিন্তু যেহেতু দশজন গৃহ-শিক্ষকের মধ্যে প্রায়ই পাঁচজন অনিষ্টকর ও চারজন অনুত্তম, হইয়া থাকে; অতএব বিনা-পরিতাপে এই আরম্ভিক গৃহ-শিক্ষককে উঠাইয়া দেও এবং আনন্দের সহিত আবার সার্ব্বজনিক শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ কর। ক্লাসের ব্যবস্থা, ধারাবাহিক অধ্যাপনা এই প্রকরণের দ্বারাই সাধারণত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মনে কর, শিক্ষক তাঁহার কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সংসাধন করিতেছেন,—এখন দেখিতে হইবে, কি উপায়ে ছাত্র শিক্ষক-প্রদত্ত মৌখিক শিক্ষা হইতে সুফল লাভ করিতে পারে।

এ স্থলে, গৃহ-শিক্ষার মত, শিক্ষকও শিক্ষার্থীর মধ্যে মুখামুখী কথাবার্ত্তা চলিতে পারে না। এস্থলে শিক্ষার্থীর আরম্ভিক চেষ্টাই সর্ব্বপ্রধান। অবশ্য শিক্ষকের গুণবত্তার উপর শিক্ষার কার্য্যকারিতা অনেকটা নির্ভর করে; এবং এক সঙ্গে অনেক ছাত্রকে শিখাইবার একটা বিশেষ কলাকৌশলও আছে। কিন্তু যে শিক্ষার্থী কানে ছিপি দিয়া রাখে, মৌখিক শিক্ষাদান যতই চমৎকার হোক না কেন, তাহাতে কোন ফল হয় না।

কান না বুজিয়া কি করিয়া শিক্ষকের কথা ভাল করিয়া শোনা যাইতে পারে, অথবা সাধারণতঃ বাচনিক শিক্ষা কিরূপে অনুসরণ করা যাইতে পারে—এক কথায়, কিরূপে শুনিয়া শেখা যাইতে পারে, তাহারই কলা-কৌশল সম্বন্ধে এইবার আমরা আলোচনা করিব।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবিতৃ স্তুতি

[ঋগ্‌বেদ ৬ মণ্ডল ৭১ সূক্ত। সবিতা দেবতা।
ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ঋষি]

সেই সুকর্ম্মা দেবতা তপন উদ্যত করে স্বর্ণ-কর,
বিলাবে যেন সে সকল জিনিষে দৃপ্ত তাহার জীবন-বর,
মহান্ যুবা সে দক্ষ সবিতা ঘৃতেতে পুষ্ট হস্ত তার,
ধরিতে এ লোকে দীর্ঘ বাহু সে দিগ্‌দিগন্তে করে প্রসার।

যিনি বিশ্বের সকল প্রাণীরে, চতুষ্পদ ও দ্বিপদ জীবে
জাগায়ে তোলেন জীবনানন্দে, বিশ্রামে পুন প্রক্ষেপিবে,
সেই সবিতার প্রসবকর্ম্মে আমরা যেনরে সহায় হই;
শ্রেষ্ঠ বসুর এ দান আমরা সম্ভোগ যেন করিয়া লই।

বিথারি তোমার, হে দেব তপন, শুভ কর তেজ অহিংসিত
রক্ষা কর হে পালন কর হে গৃহ আমাদের কল্যাণিত,
স্বর্ণ-জিহ্ব সূর্য্য মহান্, নবতর সুখ করহে দান,
কর হে রক্ষা, অহিত-ইচ্ছু শাসে না'ক যেন প্রভু-সমান।

হিরণ্যতনু হিরণ্যপাণি, মন্দ্রজিহ্ব চিত্ত ধীর
যজ্ঞের যিনি যোগ্য দেবতা সেই সে তপন ভেদি নিশির
গহন কালিমা, উদিছে আকাশে ছড়ায়ে কিরণ দূর সুদূর
আমরা পূজি যে হব্য প্রদানি; করুন অন্নদান প্রচুর।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

স্বাধীন-মনোভাব

সুস্থ, সবল, শুদ্ধ মন যে মনস্তাব দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, তারই নাম স্বাধীন-মনোভাব বা ফ্রী-মেন্টালিটি। স্বাধীনতা বিধাতার সত্য সৃষ্টি বলেই মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা; আর পরাধীনতা বা দাসত্ব প্রভুত্ব-প্রয়াসী স্বার্থপর মানুষের মন-গড়া মিথ্যা সৃষ্টি বলেই মানবের অস্বাভাবিক অবস্থা। সুতরাং স্বাধীন-মনোভাবই জীবের সত্য ও স্বাভাবিক বৃত্তি, আর দাস-মনোভাব ও প্রভু মনোভাব—এ দুইটাই মিথ্যা ও অস্বাভাবিক মনো-বৃত্তি। যা সত্য ও স্বাভাবিক, তাই জীবকে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণের পথে নিয়ে যায়; আর যে-বস্তু মিথ্যা ও অস্বাভাবিক, তা শুধু জগতে অনর্থের সৃষ্টি করে।

শৈশবে শিশু, ছোট-বেলা ছোট্ট ছেলে-মেয়ে স্বাধীনতার সত্য ও স্বাভাবিক অবস্থার ভিতরে লালিত-পালিত হয় বলেই তাদের মনোভাব দূষিত ও বিকৃত হয় না; তাদের স্বাধীন মনের মতি ও গতি সবল ও সতেজ থাকে। তারা আপন-মনে হাসে, আবার আপনি চোখের জলে ভাসে, কখন-বা ধুলা-খেলায় মনের সুখে ছুটাছুটি করে, আবার কখনো হয়ত মা-বসুন্ধরার বুকে ধূলি-ধূসরিত দেহে শুয়ে পড়ে। দুনিয়ার কারুর ধারই ধারে না তারা। এই যে শিশুর, ছোট ছেলে-মেয়ের সরল ঋজু, মুক্ত গতি, এই যে তাদের স্বতন্ত্র আপন-ভোলা ভাব—সে তো স্বাধীন-মনোভাবেরই প্রভাব। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মা-বাপের অনর্থক শাসন, গুরুমশাইয়ের অনাবশ্যক আস্ফালন ও বেত্র-সঞ্চালন এই সজীব ভাবটিকে সঙ্কুচিত করে' দেয়, সুস্থ শিশু-মনকে ব্যাধিগ্রস্ত করে' তোলে, তাদের স্বাধীন জীবনকে শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খলিত করে।

কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর ছেলে আর দাসীর ছেলে একই বাড়ীতে একই সূতিকা-গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। শৈশবে দু'টি শিশু ওই দাসীর কোলেই লালিত-পালিত হয়—ছোট বেলায় খায়-দায়, কাঁদে-হাসে, ওঠে-বসে এক সঙ্গে দু'জনায়, তারা একে অপরের সাথী হয়ে ধুলা-খেলা করে একই আঙিনায়। তাদের এই সৃষ্টি-ছাড়া, আত্ম-হারা ভাব, গাল-ভরা হাসি, প্রাণ-ভরা মেশামিশি দু'জনকে একাত্ম করে' তোলে—তখন আর তাদের মাঝ-খানে প্রভুত্ব ও দাসত্বের কোনো মিথ্যা ব্যবধানের সৃষ্টি হয় না, তাদের মুক্ত মনের মধ্যে বড়-ছোটর অলীক বৈষম্য স্থান পায় না। দিনের পর দিন, ঐ দুটি ছেলে যখন বেড়ে উঠতে থাকে, তখন একদিন হঠাৎ কর্ত্রী-ঠাকুরাণী চোখ-রাঙানি দিয়ে তাঁর ছেলেকে আলাদা করে নিয়ে যান; আর চাকরাণীও ঠাকুরাণীর দেখা-দেখি তার ছেলেটিকে ধমকানি দিয়ে ভয়ে-ভয়ে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। দু'টি মুক্ত মানব-শিশুর সত্য ও স্বাভাবিক মিলনে এই যে বিচ্ছেদের মিথ্যা ও অস্বাভাবিক যবনিকা-পতন, কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব-প্রয়াসিনী গৃহিণীই এর মূল কারণ। দূষিত মনোভাবের প্রভাবই ছেলে দুটির স্বাধীন-মনোভাবের সরল ও সবল গতি বন্ধ করে দেয়; তাদের দু'জনের মাঝখানে যে মিথ্যা ব্যবধান ও অলীক বৈষম্যের প্রাচীর সৃষ্টি হয়, তা গড়ে ওঠে কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর আদেশে ও খরচায়, আর চাকরাণী তার চুণ-সুরকি, ইট-পাথর, মাল-মশলা জোগায়।

বিশ্ব-কর্ম্মার শিল্প-চাতুর্য্যের সম্বন্ধে মানুষ যত তীব্র ও তিক্ত সমালোচনাই করুক না কেন, সৃষ্টির আদি থেকে আজ-তক্ এ কথা বোধ হয় তাঁর অতি-উগ্র সমালোচকেরাও বলতে সাহস করে নি যে, তিনি তাঁর শিল্প-শালা থেকে মানুষকে তৈরী করে' পৃথিবীতে পাঠাবার বেলায় তার মর্ম্মের ভিতর প্রভুত্ব বা দাসত্বের কোনো দাগ, কিংবা চামড়ার উপর ঐ রকমেরই কোনো শীল্-মোহর দিয়ে দেয়!

মানুষ জন্ম গ্রহণ করে স্বাধীন হয়ে। স্বাধীনতা মানুষের বিধি-দত্ত স্বত্ব, জন্ম-গত অধিকার—স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে পারলেই স্বাধীন-মনোভাবের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয়। স্বাধীন-মনোভাবের স্ফুরণ ব্যতীত মানব-জীবন সার্থক হতে পারে না, মনুষ্যত্বের চরম বিকাশও সম্ভবপর হয় না। স্বাধীন-মনোভাবই মানুষকে মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়ে দেবত্বে নিয়ে যায়।

যেখানে এই শুদ্ধ স্বাধীন মনোভাবের অভাব, সেইখানেই দূষিত প্রভু মনোভাব ও কলুষিত দাস-মনোভাবের প্রভাব প্রসার লাভ করে। আর এ দু'টি বিকৃত মনোভাবই জগতে অসংখ্য অশান্তি ও অমঙ্গলের আদি কারণ। আবার এ-সব অশান্তি ও অমঙ্গলের উচ্ছেদ করে' শান্তি ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করতে হলে স্বাধীন মনোভাবের প্রভাব প্রয়োজনীয়।

ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই প্রভু-মনোভাবে এমনি আচ্ছন্ন ছিলেন যে, তিনি বলতেন—রাজ্য আবার কি? রাজাই তো রাজ্য 'I am the State' (l'e'tat c'est moi) তিনি মনে করতেন, রাজার জন্যই রাজ্য, রাজ্যের জন্য রাজা নয়। এই দূষিত মনোভাব যে রাজাকে পেয়ে বসে, তিনি স্বভাবতঃই অত্যাচারী ও প্রজা-পীড়ক হয়ে ওঠেন। আর এদিকে তাঁর প্রজা-পুঞ্জও দাস মনোভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে বলেই রাজার অত্যাচার-অবিচার, লাঞ্ছনা-নির্য্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলতে থাকে। লুইয়ের পরবর্ত্তী প্রভুত্বপ্রিয় রাজাদের স্বেচ্ছা-তন্ত্র শাসনেও প্রজাদের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। পরে নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত ফরাসী প্রজা-কুলকে অকূলে কূল দিলেন তাঁরাই—যারা স্বাধীন-মনোভাবে প্রণোদিত হয়ে সফল সংগ্রাম করলেন প্রভুত্ব ও দাসত্বের বিরুদ্ধে; স্বাধীনতার নির্ভীক সাধক রক্ত-গঙ্গার প্রবল প্রবাহের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেন ফরাসী-জাতিকে পরপারে, স্বাধীনতার অমৃত-লোকে।

য়ুরোপের খৃষ্টান্-সমাজে এক সময়ে পোপের প্রভুত্বের প্রভাব এমনি প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তার ফলে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম জীবনে স্বাধীন-মনোভাব একবারেই লুপ্ত হয়ে গেল। পোপের শিষ্য-মণ্ডলীর মন দাস-মনোভাবের প্রভাবে এমনি বিকৃত হয়ে' উঠ্‌ল যে. তারা সত্যই মনে করত—রোমের পোপ্ স্বর্গ-দ্বারের দ্বারী, আর ভূলোকের সেই পোপই হচ্ছেন দ্যুলোক-দুয়ারের কুঞ্চিকার অধিকারী। ফলে এই হল—খৃষ্টান্-সমাজে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম-অনাচারের অনুষ্ঠান হতে লাগ্‌ল, পোপের স্বেচ্ছাচার বাড়্‌তেই চল্‌ল, অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। তার বিরুদ্ধে protest করলেন, প্রতিবাদ করলেন স্বাধীন-মনোভাবের মহত্ত্বাবে অনুপ্রাণিত হয়ে মহাপুরুষ মার্টিন লুথার। সেই প্রতিবাদ বা 'প্রটেষ্টের' ফলেই প্রটেষ্টান্‌টিজ্‌মের (protestantism) অভ্যুত্থান ও রোমান্-ক্যাথলিসিজ্‌মের (Roman Catholicism) অধঃপতন হয়, খৃষ্টান্ সমাজের বিকৃত মনোভাব লোপ পায়, আর পোপের প্রভুত্বের প্রাসাদ নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভূমিসাৎ হয়ে যায়।

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহের উত্থান ও পতনের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে ঐ একই তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। কোরাণে পাঠ করেছি—মিশরের একজন ফারাও রাজা নিজের মূর্ত্তি গড়ে' তাঁর প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন; আর চড়া গলায় কড়া হুকুম বার করেছিলেন যে, তাঁর মূর্ত্তিকে সবাইয়ের পূজা অর্চ্চনা করতে হবে, যেহেতু তিনি স্বয়ং ভগবান। এই দূষিত মনোভাবের প্রভাব থেকে মিশর রক্ষা পেল মুক্ত-পুরুষ মুসার আবির্ভাবে।

কোরেশ্-বংশীয় লোকদের প্রভুত্বের প্রভাবে আরবীয় সমাজের এমনি অধোগতিই হয়েছিল যে, অসংখ্য অনাচার অত্যাচারের সঙ্গে জঘন্য দাসত্ব-প্রথার পর্য্যন্ত অবাধ প্রচলন হয়ে পড়েছিল। ঐশী-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের অভ্যুদয়ে কোরেশদের প্রভুত্ব সমূলে বিনষ্ট হয়ে গেল, অনাচার-অত্যাচার হতে আরবের সমাজ-জীবন রক্ষা পেল, দাস-কুল দাসত্বের নরক থেকে মুক্তি-লাভ করে' স্বাধীনতার স্বর্গ-সুখের অধিকারী হল। তিনি জগতে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করলেন—যার ফলে আরবের শুষ্ক ও তপ্ত মরু-হৃদয় পর্য্যন্ত সাম্য ও স্বাধীনতার মন্দাকিনী-প্রবাহে স্নিগ্ধ শীতল হয়ে উঠল।

রাষ্ট্রীয় জগৎ ও ধর্ম্ম-জীবন ছেড়ে সমাজের দিকে আস্‌লেও সেই একই সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের অধঃপতনের পর এ-কালের প্রভুত্ব-প্রয়াসী, কর্ত্তৃত্ব-কামী ব্রাহ্মণ-পুরুষরা মনগড়া শাস্ত্র-রূপ শস্ত্রের সহায়তায় সমাজ-জীবনের স্বাধীনতাকে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করলেন; তাঁদের অনাবশ্যক ও অন্যায় আচার-অনুষ্ঠানের মিথ্যা বাঁধনে নরনারী সবাইকেই তাঁরা আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধ্‌তে লাগ্‌লেন। সেই আক্রমণের ফলে ও বাঁধনের বলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বাতন্ত্র্য একেবারেই লোপ পেয়ে বস্‌ল। এই দূষিত মনোভাবের প্রভাব সব চেয়ে বেশী

সর্ব্বনাশ করল নারীর। তাই স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ-প্রমুখ মহাপুরুষরা আবির্ভূত হয়ে প্রভুত্বের দূষিত আব্-হাওয়া ও দাসত্বের কলুষিত পারিপার্শ্বিক প্রভাব থেকে সমাজ-জীবনকে রক্ষা করলেন। তারই ফলে হিন্দু সমাজে আজ অবজ্ঞাত জাতি-সমূহের জাগরণ ও সুপ্ত নারী-শক্তির উদ্বোধন।

তাহলে আমরা এই দেখতে পাই যে, স্বাধীন-মনোভাবের অভাবেই জগতে অশান্তি, অমঙ্গল ও উৎপাত-উপদ্রবের উৎপত্তি হয়, আর স্বাধীন-মনোভাবের প্রভাবই শান্তি ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করে, ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। তাই স্বাধীনতার সাধনাই সাধনা। আয়ার্লণ্ডের ডি-ভ্যালেরা, মিশরের জগলুল্ পাশা আর ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধী এই সাধনারই সাধক। তাঁরা স্বাধীনতার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে জগতের তিনটি সুসভ্য প্রাচীন জাতি আত্ম-বিকাশের মধ্য দিয়ে চরম মুক্তির অভিমুখে অগ্রসর হয়ে বিশ্ব-মানবের পরম কল্যাণ সাধন করবে।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়

বিদেশী গল্প *

মনে হল যেন দাঁড়িয়ে আছি স্বর্গে, দেবতার সিংহাসনের সম্মুখে, আর তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করছেন, আমার স্বর্গে আসার কারণ কি? বল্লেম, এসেছি এক পুরুষের নামে নালিশ করতে—সে আমার ভাই।

দেবতা জিজ্ঞাসা করলেন,—কেন, সে তোমার কি করেছে?

উত্তরে বল্লেম,—সে যে আমার মায়ের জাত্ বোনকে নিয়ে গেছে; নিয়ে গিয়ে তাকে বেদম মেরেছে। তার শরীরে ব্যথা দেগে ঘরের বার করে দিয়েছে। বোন আমার পথের ধুলায় পড়ে। তার হাত রক্তে লাল হয়ে রয়েছে। প্রভু, আমি এখানে তার নামে অভিযোগ করতে এসেছি—বল্তে এসেছি, তার হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নাও—সে যে নিতান্ত অযোগ্য। দাও প্রভু, সে রাজত্ব আমার হাতে—আমার এ দুই হাত অত মলিন নয়—এ হাত পবিত্র।

এই বলে আমি তাঁকে আমার হাত দুটি দেখালেম।

তিনি বল্লেন,—তোমার হাত-দুটি নিষ্কলঙ্ক বটে...তা... তুমি তোমার পোষকটা একটু তোলো ত দেখি।

পোষাক একটু তুল্লেম; চেয়ে দেখি আমার দুই পা লাল—একবারে রক্তবর্ণ জবাফুল! মনে হল যেন মদ মাড়িয়ে এসেছি।

দেবতা শুধোলেন—এ কি?

বল্লেম,—দেব, মর্ত্ত্যের পথ ধুলা-কাদায় ভরা। সে সব পথ মাড়িয়ে চল্তে গেলে আমার কাপড়ে দাগ ধরে যাবে—দেখ্ছ না আমার কাপড় কি-রকম শুভ্র। তাই ত আমি সাবধানে চলি।

দেবতা জিজ্ঞাসা করলেন,—কিসের উপর দিয়ে?

নীরব হলেম। পোষাক পা-পর্য্যন্ত নামিয়ে দিলেম। তার পর মাথার কাপড় টেনে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেম! ভয় হতে লাগ্ল, পাছে দেব-দূতেরা আমায় দেখে ফেলে!

২

আর একবার স্বর্গের দ্বারে দাঁড়িয়েছিলেম—তখন আমার সঙ্গে ছিল আমার এক সাথী। আমরা পরস্পরে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ছিলেম, দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেম। আমরা স্বর্গের সিংহ-দ্বারে চোখ তুলে চেয়ে দেখতেই দ্বার তারা খুলে দিলে, আমরা ভিতরে ঢুকে গেলাম। আমাদের কাপড়ে কাদা লাগা ছিল। পাথর-বাঁধানো মেঝের উপর দিয়ে চলে গিয়ে সেই সিংহাসনে উঠলেম। পরীরা আমাদের দুজনকে ছাড়াছাড়ি করে দিলে। সাথীটাকে তারা বসালে সব-উপরের সিঁড়িতে, আর

* অলিভ স্ক্রীনার রচিত গল্প হইতে

আমায় সিঁড়ির নীচে! এর কারণ বল্‌লে,—গেল-বারে এই স্ত্রীলোকটী এখানে এসে মেঝের উপর রক্তমাখা পদ-লেখা রেখে চলে যায়—সে লেখা আমাদের চোখের জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হয়েছিল। একে উপরে যেতে দেব না।

তার পর আমার সারা-পথের সাথী তার হাতখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে; আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম। আর সেই নিষ্পাপ পরীরা তাদের আলো-করা রূপ নিয়ে আমাদের আশে পাশে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। ভাগ্যে দুজনে ছিলাম,—নাহলে বড়ই একলা-একলা ঠেক্‌ত। এমনি ছিল পরীদের রূপের জলুশ্‌!

দেবতা আমার আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি আমার বোন্‌কে একটু সাম্‌নে এগিয়ে দিলুম—উদ্দেশ্য, তিনি যাতে একে দেখ্‌তে পান!

দেবতা বল্‌লেন,—এ কি, তোমরা দুজনে এখানে কি করে এক-সঙ্গে এলে?

আমি বল্‌লেম,—মেয়েটী পথের ধুলায় বসে ছিল, লোকে ওর গায়ের উপর দিয়ে চলে যেতে লাগ্‌ল; আমি পাশে শুতে, মেয়েটী হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে, আর আমি ওকে তুল্‌লেম। তার পরে আমরা দুজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলেম।

দেবতা বল্‌লেন,—কার নামে এবার অভিযোগ করতে এসেছ?

আমি বল্‌লেম,—আমরা কোন মানুষের নামে আর নালিশ করতে আসিনি।

দেবতা একটু নীচু হয়ে বল্‌লেন,—মা আমার, তবে কি জন্যে এসেছ?

আমার সাথী আমার হাত টেনে নিলে, আর একটু চাপ দিয়ে দু'জনের হয়ে কথা বল্‌বার জন্যে অনুনয় করলে।

আমি বল্‌লেম,—আমাদের ভাই,—ওই পুরুষকে শিক্ষা দাও। আর তাদের জন্যে আমাদের কাছে এমন একটি বাণী দাও, যেটা তারা বুঝ্‌তে পারবে। আর যাতে—

দেবতা বল্‌লেন,—আচ্ছা, যাও এই বাণী নিয়ে তার কাছে।

আমি বল্‌লেম,—সে বাণী কি?

দেবতা বল্‌লেন,—সে তোমাদের বুকের ভিতরে লেখা আছে, নিয়ে গিয়ে তাকে দাও।

আমরা যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়ালেম; পরীরা দ্বার পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল। তারা আমাদের দিকে চোখ মেলে চাইতে লাগ্‌ল।

একজন বলে উঠল,—বাঃ! বাঃ! এদের বেশ-ভূষা বেশ ত!

আর একজন বল্‌লে,—ওরা যখন এসেছিল, তখন কাপড়ে যেন কাদা দেখেছিলেম। কিন্তু দেখ, দেখ, এখন যেন সব সোনালি দেখাচ্ছে!

কিন্তু আর-একজন বল্‌লে,—চুপ্‌ কর, চুপ্‌ কর, দেখছ না, ও যে ওদের মুখের আলো!

তার পর আমরা সেই মানুষটির কাছে ফিরে এলেম।

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র।

তিন

কাঁখের কলস বলে,
ছল্‌-ছল্‌-ছল্‌!
কি তোর মনের কথা—
বল্‌ মোরে বল্‌!
হাতের কাঁকণ বলে,—
রিণি-রিণি-রিণি—
তোমার মনের কথা
চিনেও না চিনি!
পায়ের নূপুর বলে,—
ঝুম্‌-ঝুম্‌-ঝুম্‌!
নয়নে লেগেছে ওর
আবেশের ঘুম!

শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

হিন্দুসমাজ ও আচার *

সকল সমাজেই কোন না কোন প্রকারের আচার বর্ত্তমান আছে ;—সমাজ-রক্ষার জন্য তার প্রয়োজনও আছে। বিশেষতঃ সমাজ সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় আচারের দ্বারাই সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় ; বর্ত্তমান যুগেও অনেক আইনের মূলে আচার বর্ত্তমান এবং প্রাচীন যুগে আচারই আইনের স্থলাভিষিক্ত ছিল। সুতরাং আমরা প্রথমেই ইহা স্বীকার করিয়া লইতেছি যে সমাজে আচারের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু হিন্দু সমাজে আমরা একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি যে অতি-আচার অত্যাচার মাত্র। বৈয়াকরণিকের এই সন্ধিসূত্র ধরিয়া অভিধান-কার 'অত্যাচার' শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়াছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা তাহাই দেখিতেছি।

কোনও আচারের নিজস্ব কোন মূল্য (intrinsic value) নাই—পারিপার্শ্বিক অবস্থা, স্থান কাল ও পাত্র ভেদে উহার মূল্য নির্দ্ধারিত করা যায় এবং যে পর্য্যন্ত সমাজ সতেজ থাকে, সেই পর্য্যন্ত এই স্বাভাবিক নিয়মই চলে। সমাজের জীবনীশক্তি ও তেজ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আচারের চারিদিকে কুসংস্কার গজাইয়া ওঠে আচারের জন্যই আচার পূজা পাইতে থাকে, তখন উহা নীতি পবিত্রতা এমন কি ধর্ম্মজ্ঞানের উপরও আপনার আধিপত্য বিস্তার করে।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদের কথার সত্যতা বুঝা যাইবে। নীতি, সমাজ-ধ্বংসকারী কুসংস্কার আমাদের সমাজে ধর্ম্মের ও 'হিন্দুত্বের' ছদ্মবেশ ধরিয়া সমাজ-রক্ত পান করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় ; উদাহরণ-স্বরূপ দুই একটির বিষয় উল্লেখ করিব মাত্র।

সমাজের কোনও অবস্থায় আচার উপকারী হইলেও তাহা যে চিরদিনই উপকারী থাকিবে, বা কোনও নির্দ্দিষ্ট আচার চিরদিন পূজা পাইবে, এমন কোন কথা নাই। সমাজের ও সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী পরিবর্ত্তনের আবশ্যক কিন্তু আমাদের হিন্দুসমাজ অচলায়তন—তাহার পরিবর্ত্তন নাই। সুতরাং ক্রমশঃই আবিলতা-পূর্ণ হইতেছে।

সমাজের এমন একটা প্রাথমিক অবস্থা থাকে, যখন সকল আচার ব্যবহার বা আইন ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া অসম্ভব হয় ; তখন ঐগুলি হুকুমের (mandate) মত মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু সমাজ যখন ক্রমশঃ উন্নতির দিকে, সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়, সমাজে জ্ঞানের প্রসার হইতে থাকে, তখন মানব-মনে জিজ্ঞাসার উদয় হয়, যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রত্যেক বিষয় যাচাই করিয়া সে দেখিতে চায়, তখন আচার আর mandate থাকে না, যুক্তিযুক্ত কার্য্য-প্রণালী হয়। মন্দ হইতে ভালকে পৃথক করিয়া দেখা হয়, অন্ধভাবে হুকুম তামিল করা বন্ধ হইয়া যায়।

সাধারণ আচার সম্বন্ধে আমাদের দেশে এই অবস্থা কখনো হইয়াছিল কিনা, এবং হইয়া থাকিলে কি পরিমাণে হইয়াছিল তাহা জানিনা। "এটা কর, ওটা করিওনা" এই পর্য্যন্তই আমরা পাই—কেন করিব না, তাহার কোন উত্তর নাই!

তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল মানসিক শক্তির, ও বিচার-বুদ্ধির অধঃপতন। শুধু হুকুম তামিল করা, যন্ত্রের মত চলাই তখন কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। "কেন" বলিয়া যে প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহা মানুষ ভুলিয়া যায়, —শুধু তাহার "কেন" প্রশ্নটাই অধর্ম্মজনক হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদের অবস্থা হইয়াছে ঠিক তাই। ইহা করিতে হইবে, কেন না, মনু আদেশ করিয়াছেন। কেন করিতে হইবে, এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না! এরূপ মনোভাব যে জাতি বা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয় তাহার সম্বন্ধে যুক্তিতর্ক না দিয়া আমাদের সমাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেই চলে।

বর্ত্তমানে আমাদের সমাজের একটা বিশেষত্ব এই সমাজের নেতা ও পরিচালক বলিয়া যাঁহারা নিজের পরিচয় দেন তাঁহারা জন-সমাজকে অন্ধকারে রাখিতেই ভাল বাসেন। ইহাতে তাঁহাদের স্বার্থ সাধন হয় বটে, কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহারা সেই অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া নিজেরাই অন্ধ হইয়া পড়েন। আমাদের ব্রাহ্মণ সমাজ এই চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলও ফলিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সমাজের উপর একচ্ছত্র আধিপত্যের হাস্যজনক দাবী এখনও করেন, এবং সেই দাবী

---

* শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ সাহিত্য ও ব্রাহ্মণ সমাজ পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। 'ব্রাহ্মণ সমাজে' এ বিষয়ে কোন আলোচনা হইতে পারে না। 'সাহিত্যে' এই অভিভাষণের একটা ছোট আলোচনা পাঠাইয়াছিলাম—(সঙ্গে টিকিটও ছিল, কারণ সাহিত্যে অমন 'অহিন্দু আলোচনা বাহির হইতে পারে না—তাহা জানাই ছিল) তাহা ত প্রকাশিত হয়ই নাই—অধিকন্তু চিঠি লিখিয়াও উত্তর পর্য্যন্ত বা প্রবন্ধ ফেরৎও পাই নাই। প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়াও সম্ভবতঃ সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় সঙ্গত মনে করেন নাই। লেখক।

বজায় রাখিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেন তাহা ততোধিক হাস্যজনক। নিম্নে একটা উদাহরণ দিতেছি।

হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও তাঁহার মত সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

শাস্ত্রী মহাশয় আগাগোড়া তাঁহার অভিভাষণে একটী কথা বলিয়াছেন, তাহা 'আচার'—অন্যান্য বিষয় আনুসঙ্গিক মাত্র। প্রথমেই মনু হইতে ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—বেদ, স্মৃতি, 'সদাচার' ও নিজের প্রিয় বস্তু। "স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ" এটার উল্লেখ মোটেই করেন নাই। বেদ ও স্মৃতিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন; কেবল সদাচারের 'আচার' টুকু লইয়া যা আলোচনা।

"সে সমস্ত (বেদের) উপদেশমত কার্য্য করা আমাদের মত স্বল্পায়ু হীনবীর্য্য লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাই আমরা স্মৃতি শাস্ত্রের উপদেশ গুলির মধ্যে আচার ও ব্যবহার এই দুইটি অধিক পরিমাণে পালন করিয়া থাকি।" এখানে দেখা যাইতেছে যে হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি শুধু 'আচার'—তাও আবার কিরূপ আচার তাহার কিছু নির্দ্দেশ নাই—নির্দ্দেশ করিলে শ্রোতাগণ সম্ভবতঃ ক্ষুণ্ণ হইতেন!

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে আচারের স্থান ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপরে।…"যদি কোন ঈশ্বরই না মান তাহাতেও আমরা কোন ক্ষতি বোধ করি না। …কিন্তু 'আমাদের কতকগুলি আচার ও ব্যবহার আছে, সেগুলি পারত্রিক ধর্ম্ম নহে, ঐহিক ধর্ম্ম। সেগুলির এতটুকু ব্যত্যয়ও আমরা সহ্য করিতে পারি না।"

অতি সুন্দর কথা। আমরা এতদিন জানিতাম ও বিশ্বাস করিতাম হিন্দু পারত্রিক ধর্ম্ম-পরায়ণ জাতি ঈশ্বরার্থেই তাঁহারা সমস্ত কাজ করেন; ঐহিকতা তাঁদের নিকট অবহেলার বস্তু, কিন্তু তা ত নয়! শাস্ত্রী মহাশয় ব্যবস্থা দিতেছেন, নাস্তিক হও তাহাতে কোন আপত্তি নাই কিন্তু কোন চণ্ডালকে যদি তুমি ছুঁইয়া ফেল তবেই মুস্কিল—তোমার 'অহিন্দু' হইবার আশঙ্কা আছে।

শুধু তাই নয়, তিনি বলিতেছেন—"যিনি আচারবান তিনিই মর্ত্ত্যের দেবতা, তাঁহার শক্তি অলৌকিক।" ব্যস্, আর চাই কি? কলি যুগের দুর্ব্বল মানুষের জন্য এত সহজে যদি দেবত্ব লাভ না করা যায় তাহা হইলে আর 'হিন্দুত্বে'র মাহাত্ম্য রহিল কোথায়? অতএব সাবধান, সকলে স্নানার্থে গরদের জোড় পরিয়া দক্ষিণ মুখের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বমুখে খাইতে বসিবে ও ভোজন-পাত্র বাম হস্তে ছুঁইয়া থাকিবে, পঞ্জিকা দেখিয়া নখ কাটিবে, মেয়েদের সিন্দুকের ভিতরে পুরিয়া রাখিবে, জ্যৈষ্ঠমাসের মাটীফাটা রোদে অষ্টম বর্ষীয়া গৌরী বিধবা যাহাতে জল দেখিতে না পায় তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবে, দশ বৎসরের পূর্ব্বে মেয়ের বিবাহ দিবে, যে হেতু শাস্ত্রবচনানুসারে দশ বৎসর একদিন বয়স হইলেই মেয়ে রজঃস্বলা হইবে। বিস্তৃত তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন এই সমস্ত কার্য্য করিলেই দেবত্ব লাভ নিশ্চিত! অপর পক্ষে "এই দুইটীর (আচার ও ব্যবহার) লোপ হইলেই সনাতন ধর্ম্মের লোপ হইবে।" সুতরাং সাবধান।

সুতরাং আমরা 'নবহিন্দু-ত্বের' একটা সংজ্ঞা পাইলাম। 'হিন্দুত্ব' বলিতে যদি আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সংজ্ঞা গ্রহণ করি, তাহা হইলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। ঈশ্বরে বিশ্বাস, জপ, ধ্যান প্রভৃতি হিন্দুত্বের অংশ না হইলেও চলে, কিন্তু আচারের তালিকা মুখস্থ করিয়া রাখিও, তাহা দিবানিশি জপ করিও, তদনুযায়ী কাজ করিও, 'কেন' জিজ্ঞাসা করিও না—ধর্ম্ম-অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইবে।

এই নবহিন্দুত্বের ব্যাখ্যা এইখানেই শেষ হয় নাই। "প্রাচীন ঋষিরা চারি জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আমরা অনেক উন্নতি করিয়াছি।" অর্থাৎ সমাজ-দেহের উপর শব ব্যবচ্ছেদ করিতেছি। সুতরাং উন্নতি অনিবার্য্য। আমাদের এই জাতিভেদ প্রথাটা নাকি এতই উত্তম যে ইউরোপীয়েরা তাহার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যা হউক আমাদের আত্ম-তৃপ্তি-লাভের কারণ বটে। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই বয়সে এরূপ সরলতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

এই অপূর্ব্ব 'আচারের' আলোচনা আর না করিয়া আমাদের দ্বিতীয় কথা অর্থাৎ সমাজের নেতারা কিরূপ হাস্যজনক উপায়ে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার একটু নমুনা দিব।

ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য জাতিদিগকে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন বা এখনও চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, শাস্ত্রী মহাশয় তাহা সরল ভাবে স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ এটা বড়ই বিষম সময়—কলিযুগ। সুতরাং শুধু 'ব্রাহ্মণ-বাক্য' হইলেই কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না, একটু ব্যাখ্যার দরকার অর্থাৎ বাক্যদ্বারা সত্যকে ধামা চাপা দেওয়া চাই আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য উহা বুরোক্রেসীর একটা মস্ত বড় চাল।

তাই শাস্ত্রী মহাশয় লিখিলেন—"ব্রাহ্মণেরা যে অন্য জাতিকে অজ্ঞান অন্ধকারে রাখিয়াছিল, তাহা সত্য নয়।"

কিন্তু 'সত্যকে' নাকি চাপিয়া রাখা যায় না—তাই পরমুহূর্ত্তেই শাস্ত্রী মহাশয় অন্য রকম কথাও বলিয়া ফেলিয়াছেন। "কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র ব্রাহ্মণের হস্তচ্যুত হইতে দেখিলে আমাদের সত্য সত্যই ধর্ম্মলোপের একটা মহা 'আতঙ্ক' উপস্থিত হয়।" হইবে না? এরূপ আতঙ্ক বুরোক্রেসীর সর্ব্বদাই আছে। তার পরেই আবার—"যদি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিল…"

তাহা হইলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বা হিন্দু ধর্ম্ম কোথায় রহিল?" সত্যই ত! কি ভয়ঙ্কর কথা! ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি ধর্ম্মালোচনা করিবে এরূপ ভীষণ কথার আলোচনা করিতে আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে! তবে আমাদের ধারণা এই যে 'ব্রাহ্মণ্য' ধর্ম্ম লোপ পাইতে পারে, কিন্তু 'হিন্দু' ধর্ম্ম লোপ পাইবে না।

এই মহা-উদারতার কথা আর একজন—শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়—অন্যস্থলে প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ জাতিতে কায়স্থ, সুতরাং তিনি শাস্ত্র-পাঠে ও পঠনে অনধিকারী! এই সমাজ রক্ষীদের আস্ফালন হাস্যোদ্রেক করে মাত্র! বিবেকানন্দকে অনধিকারী বলিবার স্পর্দ্ধাও একটা উপভোগের বস্তু।

উদাহরণ দুটা লম্বা হইয়া গেল। কিন্তু আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার কারণ উহা দ্বারা অনেকটা বোঝা যায়। যে আচার একদিন সমাজ-রক্ষার হেতু হইয়াছিল আজ তাহাই সমাজ-নাশের কারণ হইয়াছে। আচারের উপযুক্ত ব্যাখ্যা না পাইলে সাধারণ মানুষ তাহার মনোমত একটা ব্যাখ্যা তৈয়ার করিয়া লয়। এইরূপেই অনেক কুসংস্কারের জন্ম হয়। আমাদের সমাজ-কর্ত্তারা জ্ঞানকে একচেটে করিবার চেষ্টায় পরোক্ষভাবে অনেক কুসংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন। সবগুলির বিশ্লেষণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যাহার উপর আধিপত্য করিতে হইবে তাহাকে অন্ধকারে রাখার মত আধিপত্য-বিস্তারের ও রক্ষার অন্য কোন সহজ উপায় নাই। মেয়েদের শিক্ষার কথা শুনিলে যে অনেকের কর্ণে গলিত সীসা বর্ষণ হয় তাহার কারণ এই আধিপত্য-লোপের আশঙ্কা। কিন্তু কুসংস্কার সংক্রামক রোগ—ক্রমে তাহা সমস্ত সমাজকে আক্রমণ করিল। তাহার ফলে আচার-সর্ব্বস্ব এই পদি পিসির হিন্দুত্বের জন্ম হইয়াছে! সত্যকার হিন্দুত্ব এই আগাছার নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

আমরা একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিব যে আজকাল অধিকাংশ আচারই সমাজের বিভিন্ন অংশকে চাপিয়া রাখার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। আচারের পূজায় যে সমস্ত বলি উপহার দিয়াছি তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলি, নারী। এই সম্বন্ধে যতগুলি 'আচার' পাইবেন তাহার শতকরা নিরনব্বইটি শুধু নারীকে চাপিয়া রাখিবার জন্য, উদাহরণ ও ব্যাখ্যার এখানে প্রয়োজন নাই।

জাতিভেদ 'আচারের' মস্ত বড় একটা রাজনৈতিক চাল, অসংখ্য জাতির মধ্যে এক জাতির অন্য জাতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই—বিদ্বেষের সম্পর্ক বাদে। অথচ প্রত্যেক জাতিই ব্রাহ্মণকে মানিয়া চলে। রাজনৈতিক ভারতের দিকে চাহিলে এই 'চালে'র মূল্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

কিন্তু প্রথমে হয়ত সব আচারের মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বার্থেচ্ছা ছিলনা—অনেক আচার তখনকার সমাজের উপযোগী ছিল। যতদিন সমাজ সতেজ ছিল, তাহার প্রয়োজনমত আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তনও করিয়াছে। কিন্তু ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন-স্রোত মন্দীভূত হইয়া বর্ত্তমানের আবিলতায় আসিয়া পৌছিয়াছে। নেতাদের শক্তি যতই কমিতেছে, অস্বাভাবিক উপায়ে প্রাবল্য বজায় রাখিবার চেষ্টাও ততই বেশী হইতেছে। এবং সেইজন্যই সমাজে এমন ব্যাখ্যাকারের সৃষ্টি হইয়াছে যাঁহারা ঈশ্বর বিশ্বাসের উপরেও আচারের স্থান দেন—সে আচার কু হউক সু হউক তাহার বিচার করিবার প্রয়োজনীতা আছে বলিয়া মনেও করেন না!

শুধু হুকুম মানিয়া মানিয়া আমাদের এমনি মতিগতি হইয়াছে যে হুকুম তামিল করিতে না পারিলে আমাদের সুনিদ্রা হয় না, হুকুমটা ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করিয়া দেখা দূরের কথা! এই সামাজিক জীবনের দাসত্ব ভাগ্যক্রমে এখন রাজনৈতিক জীবনেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথমে সামাজিক জীবনকে কুসংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে হইবে।

প্রথমেই স্বীকার করিয়াছি যে সমাজে আচারের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আচার সমাজ-মঙ্গলের জন্য—আচার-রক্ষার জন্য সমাজ নয়। আমরা মেষপালের মত আচারের জন্যই আচারের পূজা করিতেছি। কিন্তু আজ সম্ভবতঃ যে দিন আসিয়াছে চেষ্টা করিলে হাজার বছরের দুর্গন্ধময় আচারের আবর্জ্জনাকে ঝাটাইয়া দিতে সক্ষম হইব।

সমাজ-নেতা হুকুম করিতে পারেন, তাহাতে আপত্তি নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কারণ দেখাইতে হইবে। আচার মানিতে আমরা প্রস্তুত কিন্তু কেন মানিব তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। নবযুগের এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে সমাজ আবার সত্যকার শক্তিকেন্দ্র হইবে, নতুবা তার আরও পতন অনিবার্য্য।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত।

ভৌতিক তত্ত্ব

গত ২৯শে মে তারিখের ও তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বের "অমৃতবাজার পত্রিকায়" শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মৃত ব্যক্তির আত্মার যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে সন্দেহও উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের মৃত পিতার আত্মা কেন তাঁহার সহিত মাতৃভাষায় কথা না বলিয়া ইংরাজী ভাষায় কথা বলিলেন? যদি কলিকাতায় এই spirit (আত্মা) আনীত হইত তবে কি spirit ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিত? শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যদি মৃত পিতার সহিত মাতৃভাষায় বাক্যালাপ করিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইত, ইহাতে কোন প্রবঞ্চনা আছে কি না। মৃত পিতা পুত্রকে দুই-একটী

কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। "In the third space and very happy"। আত্মা (spirit) তাঁহার নিজের নাম বলিতে পারেন নাই কেন? শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের ভ্রাতা প্রথম দিনে নিজের নামটি শুদ্ধ করিয়া বলিতে পারেন নাই, দ্বিতীয় দিন বলিয়াছিলেন; ইহার কারণ কি? নাদা একটী ভারতবর্ষীয় মৃত বালিকার আত্মা, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত ইংরাজিতে কথা বলিল কেন? কয় জন ভারতবর্ষীয় বালিকা ইংরাজীতে কথা বলিতে পারে? Spirit ইংরাজী জানিলে সংস্কৃত, উর্দ্দ, ইত্যাদি দেশীয় ভাষা জানাও তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় কি বিশ্বাস করেন, তিনি নাদার সহিত সংস্কৃতে কথা বলিলে spirit সংস্কৃতে তাহার উত্তর দিতে পারিত? সেই অন্ধকার-পূর্ণ গৃহে কোন গুপ্ত দ্বার দিয়া Mrs. Cooperএর নিযুক্ত কোন ব্যক্তি "নাদা" সাজিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করে নাই ত?

শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের মৃত পুত্রের নাম "গিরীন্দ্রনাথ"; কিন্তু আত্মা নিজের নাম বলিতে পারিল না, শুধু বলিল in, বোধ হয় কল্পিত spirit জীবন্ত ইংরেজ হওয়ায় বাংলা নাম মনে রাখিতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় তাঁহার মৃতা ভগিনীর আত্মাকে নাম জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলেন, "সেজ"। শুধু এই ছোট নামটীই বাংলায় স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইয়াছিল। নাদা শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের মৃতা কন্যার নাম বলিতে পারে নাই, কেবল বলিয়াছে নামে ছয়টী অক্ষর আছে, নামের শেষাংশ L·A। তাঁহার কন্যার নাম ছিল "সুশীলা"। ইহাতে অনুমান হয়, "নাদা"র মাতৃভাষা ইংরাজী। প্রায় স্থলেই দেখা যাইতেছে spirit এর নাম বলিতে যত গোলযোগ, ইহার কারণ কি? শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের পৌত্র তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে মারা গিয়াছিলেন; কিন্তু নাদা তাহার বিপরীত বলিল,—ভুলিয়া গিয়া নাকি? Mrs Cooper এর নিযুক্ত কোন ব্যক্তি গুপ্ত দ্বার দিয়া অন্ধকার পূর্ণ ঘরে আসিয়া অথবা পূর্ব্ব হইতেই হয়ত তথায় লুকায়িত অবস্থায় ছিল,শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের কপালে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করা অসম্ভব নহে। Mrs Cooper ও Mrs Johnson একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া, musical instrument ও Planchet এর সাহায্যে অন্ধকারপূর্ণ গৃহে spirit আনয়ন করেন,—ইহাই কি তাঁহাদের ব্যবসা নাকি? শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের মনেও সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "Mrs Cooper asked me if my son had "passed over." I kept quiet and did not answsr the question to avoid giving any indication."

৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে "নব্যভারতে" কিছু আলোচনা হইয়াছিল। একজন সুদক্ষ হরবোলা (Ventrilcquist) Sir Arthur Conan Doyleকে তাঁহার মৃত পুত্রের আত্মার সহিত আলাপ করাইয়া দিবেন, ইহা বলিয়া তাঁহাকে এক অন্ধকার-পূর্ণ গৃহে লইয়াযান, হরবোলা মৃত পুত্রের স্বর অনুকরণ করিয়া Sir Conan Doyleএর সহিত বাক্যালাপ করেন ও তাঁহাকে এইরূপ প্রতারিত করেন। তিনি হরবোলার প্রতারণা বুঝিতে পারেন নাই। এই সুদক্ষ হরবোলাটী পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রের সহিত পরিচিত ছিল।

শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের লিখিত বিবরণে কয়েকটী আশ্চর্য্য ঘটনা আছে। আশা করি, সুধীমণ্ডলী এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া সত্য বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চয়ন

নাটা

কেহ-কেহ বাঁ হাতে লেখেন, বাঁ হাতে মাথা আঁচড়ান, অর্থাৎ সাধারণে যে-সব কাজ ডান হাতে করিয়া থাকে, তাঁরা তা বাঁ হাতে করেন। ছেলেরা এমন অভ্যাস করিতে গেলে তাহাদের উপর গুরুজনের শাসন অনেক সময় উদ্যত হইয়া ওঠে। এটা ঠিক নয়। নাটা হওয়া মানুষের রোগের লক্ষণ! সম্প্রতি আমেরিকার Good Health পত্রিকায় এক ডাক্তার লিখিয়াছেন,—

ছেলেরা যে বাঁ হাতে কাজ করিতে চায়, এর কারণ সেই ভাবেই তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছে! ইহার মধ্যে শারীর-তত্ত্বের কথা আছে—সেরূপ যে তারা করে, তার কারণ খামখেয়ালি নয়। তার অস্থি ও পেশীর গড়ন এমন যে ডান হাতে সহজে কাজ করিতে চায় না—অর্থাৎ ডান হাত বাঁ হাতের চেয়ে দুর্ব্বল তৈয়ার হইয়াছে। এ অবস্থায় যদি তাকে বাঁ হাত বন্ধ করিয়া ডান হাত চালাইতে বলা হয় এবং সেজন্য তার উপর শাসনের চাপ চলে, তার ফলে তার ডান হাতখানি একেবারে পঙ্গু হইয়া যাইবে—শুধু পঙ্গু কেন, হয়তো

...এ ডান হাতখানি কাটিয়া বাদ দেওয়াও দরকার ... পারে। এই বাঁ হাত চালানোর দরুণ তারা কিছুমাত্র ...বিধা বোধ করে না।

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

মোটরে মৃত্যু

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আমেরিকায় মোটর চাপা পড়িয়া গড়ে দিনে ৩৫ জন করিয়া লোক মরে। সেখানে ...টর গাড়ীর সংখ্যা সব-চেয়ে বেশী, আর পথ-চলা লোকের ভিড়ও বিষম। জার্ম্মাণ যুদ্ধে যে-পরিমাণ লোক মরিয়াছিল, ১৯২২ সালে আমেরিকায় মোটর চাপা পড়িয়া লোক মরিয়াছে তার চেয়ে ঢের বেশী। ১৯২২ সালে আমেরিকায় মোটর গাড়ীর সংখ্যা ছিল এক কোটি ছ'লক্ষ। আমেরিকার চেয়েও ইংলণ্ডে এ-ভাবে মৃত্যুর সংখ্যা ঢের কম। আমেরিকায় একবৎসরের মৃত্যু-হারের তালিকা দেওয়া হইল—

১৯২০ আমেরিকায় সর্ব্বরকমে মৃতের সংখ্যা—১১৪২৫৫৮

তার মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জায় … … … …	৬২০১৭
কাশীতে … … … … …	১০৯৬৮
হামে … … … … … …	৭৭১২
আত্মহত্যায় … … … … …	৬২০৫
দৈব-দুর্ঘটনায় … … … …	৬২৪৯২
পড়া, আগুনে পোড়া প্রভৃতিতে … … … …	১০৩২৩
মোটর চাপায় … … … …	১০১৬৮

মোটরের সংখ্যা প্রতিবৎসর যে-ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, ...হাতে রোগের বালাই না ভুগিয়া ইহার চাপে মৃতের সংখ্যা ... ক্রমে আরো বাড়িবে,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পথ পথিকের জন্য, গাড়ীর জন্যও। তবে পথিক তার ... দুইখানা মাত্র সম্বল করিয়া পথ চলে; কাহারো ...ড় যদি পড়ে, তবে তাকে সে জখম করিবে না ...চয়ই; তবু সে হুঁসিয়ার হইয়া চলে, পাছে কাহাকেও ...ক্কা দেয়, ধাক্কা দিলে গালি-গালাজটা ভাগ্যে মিলিতে ...র তো! সেটাকেই সে বাঁচাইবার জন্য তৎপর থাকে। আর মোটর গাড়ী তার যন্ত্র-পাতি, ভারী গা, ও ভারী চাপ সমেত চলিয়াছে ৪০টা ঘোড়ার বেগ লইয়া—সে কাহাকেও ধাক্কা দিলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব তার কতটা হুসিয়ার হইয়া চলা উচিত! ইহার মধ্যে কাজে চলিয়াছে যারা, তারা একটু দ্রুত চলিবেই; কিন্তু বিলাসীর দল হাওয়া খাইতে চলিয়াছে—তাদের তাড়ার জন্য যদি গাড়ীর ধাক্কায় পথিক জখম হয় বা কাহারো মৃত্যু ঘটে, তবে তার জোরে চলার বা বেহুঁসিয়ারির দরুণ কি কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে!

মোটরে মৃত্যু ব্যাপার আমেরিকাকে রীতিমত দুর্ভাবনায় চঞ্চল করিয়াছে। ইহার প্রতিকারের নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। পথ-চলা পথিককে রক্ষার জন্য সোসাইটি খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে। এই সোসাইটি দেখিবে গাড়ী যাহাতে কেহ বে-হুঁশিয়ার হইয়া বা দ্রুত না চালাইতে পারে! যদি চাপা দেয়, তাহা হইলে গাড়ীর মালিককে দস্তরমত খেসারৎ দিতে হইবে, আর চালককে কারাদণ্ড এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে, কিম্বা গাড়ী কয়েকবৎসর বাজেয়াপ্ত রাখা হইবে। মালিককে দুই-চার বৎসর মোটর ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না; ড্রাইভারকে জন্মের মত লাইসেন্স খোয়াইতে হইবে।

মুস্কিল হইয়াছে এই যে, কথাটা কাজে পরিণত করা যাইতেছে না। ধনকুবের মোটর-ব্যবসায়ীরা বাধা দিতেছে! গাড়ীর মালিকেরা বলিতেছে, তা কেন, পথিককে সামলাও। তারা পথে হুঁসিয়ার হইয়া চলে না কেন? ফুটপাথ ছাড়িয়া পথে নামে কেন? গাড়ীর হর্ণ শুনিবামাত্র তারা অমন বেকুবের মত হাঁ করিয়া দাঁড়ায় কেন? দড়ি-ছেঁড়া গরুর মত এধার ওধার ছোটে কেন?

এই বাদ-বিসম্বাদে কাজ হইতেছে না বলিয়া অনেকে অনুযোগ তুলিয়াছেন। গাড়ীর গতির বেগ বাঁধিয়া দিলেও সে ভাবে গাড়ী চালানো হয় না।

এখন কথা হইতেছে,—ড্রাইভারকে জেলে পুরিয়া বা তার লাইসেন্স কাড়িয়া লইলেই ফল পাওয়া যাইবে না। মালিককে দায়ী করা দরকার। ড্রাইভারের সঙ্গে সঙ্গে মালিককেও ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা হৌক্—তাহা

হইলে মালিক নিজেকে বাঁচাইবার জন্য ড্রাইভারের উপর কড়া নজর রাখিবেন।

শুধু আমেরিকা কেন! এখানে কলিকাতাতেও মোটরে মৃত্যুর হার যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, মোটর-কোর্ট খুলিয়াও কোন ফল হইতেছে না। মালিককে ফৌজদারী আইনের গণ্ডীভুক্ত করিয়া এখানেও নূতন আইন তৈয়ার হৌক—তবেই এ অমঙ্গল কাটিবে। নচেৎ রোগে নয়, শোকে নয়—এমনি অকস্মাৎ পথে লোকে প্রাণ খোয়াইবে, ইহাও আর বরদাস্ত করা যায় না!

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

চীনের চা

আমাদের বাঙালীর বাড়ীতে চায়ের ব্যবহার আজকাল এমনি বাড়িয়া গিয়াছে যে চাল-ডাল নুন-তেলের মতই গৃহস্থ-বাড়ীতে চায়ের জোগাড় থাকে বারো মাস। সেকালে বাড়ীতে আত্মীয়-বন্ধু বা কুটুম্ব আসিলে তাঁদের আদর-অভ্যর্থনার জন্য দুইটা মিষ্টান্নও অন্ততঃ দেওয়া হইত; এখন মিষ্টান্নের ঠাঁই গ্রহণ করিয়াছে এক পেয়ালা চা। মিষ্টান্ন-গ্রহণে আত্মীয়-বন্ধুরা ওজর-আপত্তি তোলেন, কিন্তু চায়ের পেয়ালা সাদরে অনেক জায়গায় চাহিয়া লওয়া হয়! কালের গতিই এমনি!

চা আমরা খাই তো অনেকেই, -কিন্তু চায়ের কাহিনী ক'জনই বা জানি!

চায়ের প্রথম রেওয়াজ চীনে। খৃষ্টের জন্মের ২৭০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃ-পূঃ ২৭০০ অব্দে চীনে চা পানীয়ের মত ব্যবহৃত হইত। ৪০০ খৃষ্টাব্দে সাধারণ লোকে চায়ের বৃত্তান্ত প্রথম জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়। ৭৮০ খৃষ্টাব্দে চীনা লেখক লোয়া ছোট্ট একখানি কেতাবে চায়ের সম্বন্ধে লেখেন,—চা-পানে মনের অবসাদ ঘোচে, মন চাঙ্গা হয়, তাজা হয়, ক্লান্তি যায়। চায়ে মানুষের চিন্তা করিবার শক্তি ও একাগ্রতা বাড়ে। চায়ের গুণ অনেক; দোষ শুধু এই যে চা-পানে ঘুমের ব্যাঘাত হয়। কি করিয়া চা তৈয়ার করিতে হইবে, তাহারি প্রসঙ্গে লেখক লোয়া বলিয়াছেন—দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থী তিথিতে গাছ হইতে চায়ের পাতা তুলিতে হয়; মেঘলা বা বর্ষার দিনে চায়ের পাতা কখনো তুলিবে না। পাতা তুলিয়া পিতলের পাত্রে ধরিয়া রৌদ্রে কিংবা জ্বলন্ত কয়লার আঁচে তাহা শুকাইয়া লইবে। পাতা শুকাইলে তাহা গুঁড়াইয়া বড়ি পাকাইয়া লও—এই বড়ি পরে গরম জলে গুলিয়া পান কর।

সেই সুদূর অতীতকালেও চীনা গবর্ণমেণ্ট চায়ের উপর শুল্ক বসাইয়াছিল।

চায়ের প্রচলন কি করিয়া হইল,সে সম্বন্ধে একটা পুরানো গল্প আছে। এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সিদ্ধি-লাভের আশায় ভারতবর্ষ হইতে চীন অবধি পরিভ্রমণ করেন; প্রার্থনা ও উপাসনায় বহু বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া তিনি বড় ক্লান্ত হইয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়েন। ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি অনুতপ্ত হন —সাধনার এমন বিঘ্ন ঘুম! তখনই তিনি রাগ করিয়া চোখের পাতা কাটিয়া ফেলিলেন। সেই চক্ষুপল্লব যে জমিতে পড়ে হয়, সেখানে দুটা তাজা গাছ গজাইয়া ওঠে—এই গাছের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ঘ্রাণ বা পান করিলে ঘুম আসে না। এই গাছকেই চীনারা বলে 'টে', বা Te, অর্থাৎ Tea বা চা।

২০০ খৃঃ পূঃ অব্দে চীন হইতে চায়ের গাছ চালান হয়, জাপানে। এই চায়ের বদলে চীনারা জাপানী বন্দরে নৌকা ভিড়াইবার অনুমতি পায় এবং চীনা মাল জাপানে পাঠাইবার বন্দোবস্তও হয় এই সময়ে। চায়ের বাজারের নাম ছিল, 'হুঙ'। জাপানীরা চীনা চায়ের স্বাদ পাইয়া চায়ের ভক্ত হইয়া ওঠে। তারপর তিব্বতে চা যায়, এবং তিব্বতের বৌদ্ধ লামারা চা-খোর হইয়া পড়েন।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ যখন ভারতে আমদানী করিতে আসিল, সে সময় আসামের চা ইহারা জোগাড় করিলেও,—১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের বাজারে চায়ের প্রথম আমদানী হয়। চীন ও জাপান দুই জায়গা হইতেই চা আসিতে লাগিল। তারপর দেখা গেল, ভারতবর্ষে যদি চায়ের চাষ করা যায়, তবে চীনে ও জাপানে যে অনেক টাকা শুল্ক দিতে হয়, তার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, এবং এই সময়ই ইংরাজ চা খাইতে শিখে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে

ব্রুস্ সাহেব—তাঁরা দুই ভাই—আসামের সীমান্ত হইতে চায়ের বীজ আনাইলেন। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া চীন হইতে মজুর আনাইলেন চায়ের চাষ শিখাইবার জন্য। তখন চায়ের ভাল-মন্দ কিছু জানা ছিল না। চা পাইলেই মহা লাভ হইল, পান কর—এমনি ছিল অবস্থা।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বিস্তর জমি লইয়া আসামে আসাম টী কোম্পানি খোলা হয়। তারপর রীতিমত চা-বাগান খোলা হইল ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। বিস্তর কোম্পানি এ কাজে হাত দিল এবং তখন হইতেই চায়ের সম্বন্ধে গভীর গবেষণা সুরু হইল; তখন মোটা পাতা বাছিয়া মিহি পাতা খুটিয়া, নানা পাতায় মিশেল করিয়া (blend) উৎকৃষ্ট চা তৈয়ার করিতে সকলে মন দিল। সেই সময় হইতে নানা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া চলিতে লাগিল এবং চা যাহাতে ঘর-ঘর চালাইয়া প্রকাণ্ড লাভজনক ব্যবসায় দাঁড় করানো যায়, তারো ফন্দী-ফিকির চলিতে লাগিল। চায়ের দামও ক্রমে খুব শস্তা করা হইল। এই ব্যবসায়ে চা-করদিগকে বিশেষ কষ্ট ও স্বাস্থ্যহান বিশ্রী জায়গায় কি অসুবিধাই যে ভোগ করিতে হইয়াছিল, তার আর সীমা নাই—তবুও কেহ দমে নাই। সে কষ্ট সহ্য করিয়া আজ চায়ের ব্যবসায়ে ইংরাজ সকল জাতির অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তখনকার চা-বাগান মৃত্যু লোকেরই সামিল ছিল। বাস ও আহারের অসুবিধা-অস্বাচ্ছন্দ্য, রোগ, নিঃসঙ্গতা এ-সবের আর সীমা ছিল না। তার তুলনায় এখনকার চা-বাগান তো স্বর্গ-পুরী! সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব নাই! বরং প্রাচুর্য্য! তবে বেচারা কুলির দল! অদৃষ্ট! নাহলে পরদেশে আসিয়া পরদেশী পূর্ণ-সুখ ভোগ করে কেন, আর দেশের লোক দুইবেলা খাটিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না!...কিন্তু শুধুই কি অদৃষ্ট!

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

ব্রেজিলে-বেতার

আমেরিকার কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ার ব্রেজিলের রিয়ো-ডি-জেনেরোর সীমানায় Corcovado পর্ব্বতের উপর একটী রেডিও বা বে-তার টেলিগ্রাফের ষ্টেশন স্থাপন করেছেন। ওয়েষ্টিংহাউস কোম্পানির লোকেরা মিঃ ষ্ট্রোবেলকে পাঠিয়েছিলেন ব্রেজিলে—ওই ষ্টেশনটীর নির্ম্মাণ ও পরিচালনা-কার্য্য নির্ব্বাহ করবার জন্য। মিঃ ষ্ট্রোবেল তার বিবরণ এইভাবে লিখেছেন—

রিয়ো-ডি-জেঁরোতে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে Corcovado পর্ব্বতের ছবির মত মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! পর্ব্বতটা সমুদ্র-ভূমি থেকে খাড়া উঠেছে, ২০০০ ফিট্ উঁচুতে।

বেতার ইঞ্জিনিয়াররা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে পর্ব্বতের চূড়ায় কি করে ওঠা যেতে পারে? এ কথার উত্তর দেন, Tramway Light & Power Companyর প্রধান ম্যানেজার মিঃ F. A. Huntress। তাঁর একটী দাঁতওয়ালা চাকার রেলগাড়ী আছে, তাতে করে অনায়াসে ও খুব শীঘ্র Corcovadoর চূড়ায় পৌঁছানো যায়।

একদিন সকলে যাত্রা করলেন পাহাড়ের চূড়া পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য। কিছুক্ষণ ধরে উঠতে উঠতে তাঁরা ১২০ ফিট্ লম্বা একটী রাস্তা দেখতে পেলেন, সেইটে শিখরে গিয়ে ঠেকেচে। চূড়াটাই তাঁদের একমাত্র গন্তব্য স্থান ও সেখানকার সৌন্দর্য্য দেখাই সকলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা আরও সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখ্‌তে পেলেন একেবারে চূড়ার মাথায় পৌঁছে! তাঁরা আরও দেখ্‌লেন যে নীচে জাহাজ থেকে এবং পাহাড়ের তলা থেকে বহুলোক তাঁদের দেখ্‌চে। সমস্ত ব্রেজিল সহরটাই যেন ভেঙ্গে পড়েছে তাঁদের সেই অলৌকিক সাহসিক কাজ দেখবার জন্য!

চূড়ার গায়ে ১২৫ ফুট লম্বা দু'টো পোল্ পোঁতা হোল, পরে ঐ পোল্ থেকে কতকগুলি তার পাহাড়ের চারপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে নেমে এলো, একশ' ফিট্ নীচে এক বে-তার টেলিফোনের পরিচালনা-ঘরে।

যদিও ব্রেজিলে বে-তার যন্ত্রাদি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ, তবু দেখা যায় অধিকাংশ ব্রেজিল-বাসীই ব্রেজিলের চারিপাশ হতে বে-তারে কথা কইবার ও কথা শোন্‌বার

অবসর পেয়েছে। ব্রেজিলের যিনি প্রেসিডেণ্ট, তিনি এবং তাঁর কর্ম্মচারীরা প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদে স্থাপিত বেতার-যন্ত্রটী ব্যবহার করেন।

রিয়োর চূড়াটী বে-তারের পক্ষে খুব সুন্দর ও উপযোগী স্থান বলে বিবেচিত হয়েছে। মাঝে মাঝে ষ্টেশন ও বে-তার পোংটী মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। রিয়ো সহরটী temperate ও torrid zoneএর মাঝে একটী সামানায় অবস্থিত। ইলেক্ট্রিকের কাছ থেকে যে বাধা পাওয়া যায়, সেটা নিবারণ করবার জন্য এখন খুব চেষ্টা করা হচ্ছে।

আরও শোনা যাচ্ছে যে নিউ ইয়র্কের মিঃ Mawhinny এখন না-কি বেতারের যে কলকব্জা করেছেন তার দ্বারা এক ঘণ্টায় ছাব্বিশটা সহর থেকে বেশ স্পষ্ট কথা শোনা যাবে। মিঃ Mawhinny তাঁর ঠিকানা দিয়েছেন, মিঃ এ, এস্, ম্যহিনী, ৮০১ রিভারসাইড ড্রাইভ, নিউ ইয়র্ক।

সমুদ্রের জীব

সমুদ্রের মধ্যে যে কতরকম অদ্ভুত জানোয়ার বাসা বেঁধে বসে আছে, তার আর কিছু ঠিক্‌ঠিকানা নেই। সম্প্রতি ফ্লোরিডায় এমন এক ভীষণ জন্তু দেখা গেছে যে তা দেখে সকলের তাক্ লেগেছে। Sea-serpent বলে তাঁরা যাকে হেসে উড়িয়ে দেন, এ সে জাতীয় জন্তু নয়।

'রাক্ষস'টা ওজনে প্রায় পনেরো টন। গায়ের চামড়াও তার প্রায় তিন ইঞ্চি পুরু হবে। জন্তুটার পেটের মধ্যে থেকে অনেক রকম জিনিষ পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু তা'র মধ্যে একটা পাঁচ মণ ভারী Octopus, একটা উনিশ মণ ভারী কালো মাছ আর প্রচুর প্রবালাদি। তাছাড়া আরো যে কত কি পাওয়া গেছে, তার কথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র।

কিন্তু এইটেই তা বলে প্রথম দানব-মাথা-আবিষ্কার নয়। প্রায় দু'বছর আগে বোম্বাই থেকে দশ মাইল দূরে এক জায়গায় আর-একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস ধরা হয়েছিল। সেটার মুখ ছিল তিন ফুট লম্বা, এবং তার দাঁত ছিল ভয়ঙ্কর ধারালো।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার Fair Bay বন্দরে একটী হাতির মত মাথা-ওয়ালা জন্তুকে জল থেকে ধরা হয়েছিল। জন্তুটী ছিল লম্বায় ন-ফুট ছ' ইঞ্চি, লেজ তার করাতের মত ধারালো এবং নাক গণ্ডারের মত। এর চেয়ে একটু ছোট কিন্তু অদ্ভুত জন্তু—প্রায় ৬' বছর আগে ইয়ারমাউথে একটী ছোট লস্করের হাতে ধরা পড়েছিল।

কয়েক বছর আগে মেন নদীর তীরে, এক আড়াই-মণ মাছ ধরা হয়েছিল। মাছটার মুখখানা দেখ্‌তে ছিল, অনেকটা প্রকাণ্ড থলের মত; কিন্তু দাঁতগুলি ছোট ছোট মুক্তার মত। মাছটীকে তোলার পর অনেকক্ষণ পর্যান্ত সে বেঁচেছিল।

এই রকম কত জন্তুই যে প্রায় মানুষের অলক্ষ্যে জলের মধ্যে লুকিয়ে আছে, কে তার হিসাব রাখে! তবে খুঁজলে বোধ হয় সবাইকেই পাওয়া যায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত।

প্রাচীন রোমে বিয়ে

মানুষের ইতিহাস যতটা থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায়, বিয়েটা সেই অতি-অসভ্য জাতি থেকে সুসভ্য জাতির মধ্যে বরাবর চলে আসছে। তবে তার রীতি নানা রকমের। কনেকে নিয়ে পালানোর খবর আমাদের পুরাণে পাই; তাছাড়া অন্য দেশের ইতিহাসেও এমন খবর মেলে। তখনকার আব-হাওয়ার সঙ্গে সেগুলো কিন্তু এতো খাপ খেয়েছিল যে তার দরুণ সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটতো না।

রোম-রাজত্ব সুরু হওয়া থেকেই ন্যায় আর ধর্ম এই দুটোর শাসন মানা হলে তবে এই বিয়ের ব্যাপার শেষ হতো।

অপরিচিতা মেয়েকে নতুন ঘরে নতুন বাঁধনের মাঝে চির-পরিচিত করে নেবার জন্য দু-দলেরই মতের মিল থাকা দরকার। রোমেও এই চিরন্তন ব্যাপারের উপর কেউ ওস্তাদী করেননি।

বিয়ের বর-কনে দুজনকেই একটা অনুষ্ঠানে বাঁধনে

ধরা দিতে হতো; অবশ্য এ বাঁধনে সুখ ছিল যথেষ্ট; কেন না, খালি পেটে এই প্রেমের ব্যাপারে অবগাহন করতে হত না।

'Far' বলে ইটালীতে একরকম দানা পাওয়া যায়, তারই কেক্ তৈরী করে বর-কনে দুজনকেই খেতে হয়। খাওয়া সুরু করবার আগে Jupiter Farrews-কে উৎসর্গ করে দেব্‌তার 'দোহাই' দিয়ে নিতে হয়। এই ব্যাপারটাকে সেখানে Confarreatio বলে। দশজন লোককে সাক্ষী না রাখ্‌লে খাওয়া কিন্তু না-মঞ্জুর হয়ে যাবে। এরই সঙ্গে সঙ্গে একটা ভেড়া বলি দিয়ে Ceresকে সন্তুষ্ট করতে হয়। মরা ভেড়াটার উপর এই তরুণ দম্পতীকে চড়ে বস্‌তে হয়; তাহলে নাকি দু-জনে কখনও ছাড়াছাড়ি হয় না! আর আগেকার কেক্ খেলে জুপিটার এই দুই নবীন আত্মাকে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বেঁধে দেন। 'Confarreatio'র সাহায্য না নিয়ে আরও দুরকমে বিয়ে হতে পারে।

রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্ট হবার পরে এই তিন রকম ব্যবস্থাই উল্টে গেছে। বিয়ের দিন কনে তার আটপৌরে পোষাক ছেড়ে তখনকার-জন্যে-তৈরী পোষাক পরে। লাল-রঙা একটা ভেইল্ মাথায় দেয়, কোমরে পশমের একটা কোমর-বন্ধ জড়ায়···এই girdleএর গায়ে একটা মস্ত knot (গেঁাট) থাকে, তাকে 'knot of Hercules' বলে। সৌখীন পোষাকে অপ্সরা সেজে, কনে বাপের বাড়াতেই বরের জন্য অপেক্ষা করে।

এরই মধ্যে বিয়ের লগ্ন, আর কনের ভাগ্য নির্ণয় করা হয়।

বহুকাল পূর্ব্বে পাখীর ঝাঁক উড়্‌তে দেখ্‌লে তবে সব ব্যবস্থা শুভ বলে ঠিক করা হত। এখন একটা ভেড়া মেরে তার নাড়ী-ভুঁড়ির গ্রন্থি-বন্ধন দেখে এই তরুণ দম্পতীর মিলনের ফলাফল ঠিক করা হয়। তারপর এই ফলাফল-বিচারে সন্তুষ্ট হলে বিয়ে আরম্ভ হয়।

বর আর কনে, পরস্পরের ডান হাত স্পর্শ করে। তখন আর একটা বলি দেওয়া হয়।

তারপর wedding-feast। সেট চুকলে কনে বরের সঙ্গে নতুন ঘরে যাত্রা করে। সঙ্গে তিনজন ছেলে যায়; এদের তিনজনেরই আবার বাপ-মা দুজনই বেঁচে থাকা চাই। এদের একজন মশাল ধরে পথ-আলো করে অর্থাৎ বর-কনের অজ্ঞাত জীবনে আলো ধরে চলে, আর দুজন কনের দু হাত ধরে তাকে জীবনের ঠিক পথে নিয়ে যায়। অবশ্য এই তাদের উদ্দেশ্য। ভিড়-করা ছেলেদের মাঝে Nuts ছুড়ে ফেলা হয়। সানাইএর দলও গোলমাল করতে করতে আগে-আগে চলে।

বরের বাড়াতে পা দিলে পর কনে তেল আর চর্ব্বি দিয়ে দরজার সারা গা ভরিয়ে দেয়। আর এই সঙ্গে একটা করে দড়ির প্যাঁচ্ তাদের আঙ্‌টায় লাগিয়ে দেয়।

সমস্ত ব্যাপার শেষ হলে বর কনেকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যায়।

কনে অনেক টাকা যৌতুক নিয়ে আসে বলে বরের বাড়াতে তার ভারী খাতির হয়। এমন কি, তাকে সকলে দেবী (domina) বলে।

এই যে ভাবটা এ শুধু এই টাকা-আনা-ব্যাপারটার জন্যই নয়, নতুন বিয়ে রোমানদের ঘরে সত্যসত্যই একটা শ্রদ্ধার বস্তু।

আমাদেরই মত ছেলেবেলাতেই সেখানে বিয়ে চলে বেশী।

এমন কি সিসেরো তাঁর মেয়ে Tulliaকে Calpurnius Piso Frugiর সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে খৃঃ পূঃ ৬৬ অব্দে সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে ফেলেছিলেন। এই বিয়ে হয়েছিল খৃঃ পূঃ ৬৩ অব্দে; আর Tulliaর জন্ম হয় খৃঃ পূঃ ৭৬ অব্দে; তার মানে, যখন সে দশবছরের মেয়ে, তখনই সে বাগ্‌দত্তা হয়েছিল; আর ১৩ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়।

প্রেমের খাতিরে না হলেও অনেক সময় এই সব বিয়েগুলি রাজনৈতিক কারণে দেওয়া হয়।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়।

পম্পির সজ্জা

প্রাচীন রোমের পম্পি—সৌন্দর্য্যের,ঐশ্বর্য্যের ও বিলাসের লীলা-নিকেতন,—একদিন কি ভীষণভাবে আগ্নেয়গিরির
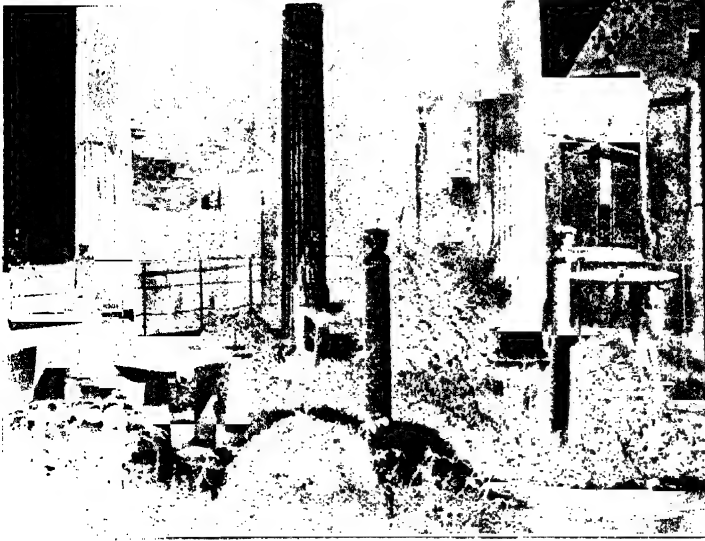
সেকালের পম্পির ধ্বংস-স্তূপে একালের সাজ

অগ্নিস্তূপে ঢাকা পড়িয়া গেল! কি পাষাণ কঠিন কালো অঙ্গারের আবরণে লোক-লোচনের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল! তার পাশে কত কবির বাঁশী বাজিল কত না সুরে—কত নাট্যকার কত ঔপন্যাসিক কল্পনার কত ছাঁদে তার অশ্রুময় কাহিনী, নর-নারীর চিত্তের অপরূপ ছবি রচিয়া বিশ্ববাসীর প্রাণে কত দোলাই না দিয়া গেলেন—! তবু পম্পির কথা আর শেষ হয় না! সেই পম্পি মানুষের অসাধারণ যত্নে ও চেষ্টায় অঙ্গারের আবরণ খুলিয়া আজ আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তার সেই প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের কঙ্কাল, তার সেই বিলাসের ছায়া আজ নর-নারীর চোখে অশ্রুর উৎস খুলিয়া দিতেছে!

পম্পি ধ্বংস-স্তূপ

কিন্তু সৌখীন ইতালিয়ানরা পম্পির এই কঙ্কালকে নানা সজ্জায় সাজাইয়া তুলিতেছেন! মৃতের প্রতি, অতীতের প্রতি পূজার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া পম্পিকে তাঁরা সুন্দরীর বেশে সজ্জিত করিতেছেন। পাশের দু' খানি চিত্রে এই সজ্জার পরিচয় পাই।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট

নারী পুরুষের চেয়ে হীন নন্ অন্ততঃ বুদ্ধিবৃত্তিতে—এ কথা মনে মনে জানিলেও বাহিরে অনেকে তা প্রকাশ করিতে চান্ না। অনেক পুরুষ নারীর দাবী উপেক্ষা করেন, পাছে নিজেদের অসুবিধা ঘটে, এই কারণে। তাঁদের কথা ছাড়িয়া দিই। এই জাতীয় জাগরণের দিনে নারীকে যে উপেক্ষা করা চলে না, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বোঝেন। তাঁরা শুনিয়া সুখী হইবেন, এই ভারতেই মান্দ্রাজে মিসেস্ কাজিন্স্ অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মান্দ্রাজের ভারতীয় মহিলা সম্প্রদায় মিসেস্ কাজিন্স্কে সম্প্রতি অভিনন্দিত করিয়াছেন।
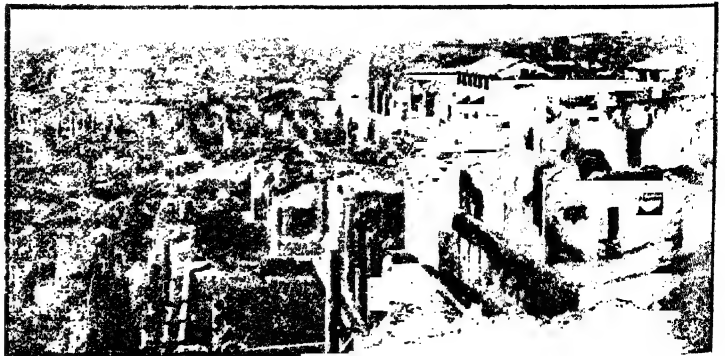
আমাদের মনে হয়, ছোক্রা অপরাধীর (juvenile offenders) বিচার করিতে সব-চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি নারী।

মার প্রাণ লইয়া ভগ্নীর প্রাণ লইয়া তাঁরা বিচার করিলে তাহাতে জেলখানায় বয়স্ক কয়েদী বাড়িবার পরিবর্ত্তে এই সকল ছোক্‌রা অপরাধীর মতিগতির পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে।

শ্রীশিশিরকুমার রায়।

পিয়ের লোটি

পিয়ের লোটি

প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক পিয়ের লোটি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর আসল নাম জুলিয়েঁ ভিয়ো—পিয়ের লোটির ছদ্মনামে তিনি গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। তাঁর রচনা সম্বন্ধে ভারতীতে বহু আলোচনা হইয়াছে এবং তাঁর বহু উৎকৃষ্ট রচনার বঙ্গানুবাদও ভারতীতে সময় সময় প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১০ই জুন তাঁর মৃত্যু হইয়াছে—মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স হইয়াছিল ৭৩ বৎসর।

প্রাচ্য পোষাকে পিয়ের লোটি

প্রাচ্যের ঘটনাবলী, প্রাচ্যের নর-নারীর চিত্তবৃত্তির বিচিত্র বিকাশ দেখাইতেই তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি নাবিক ছিলেন—সাগর-তরঙ্গেই তাঁর জীবন কাটিয়াছে! নীলোর্ম্মির ফেনিল উচ্ছ্বাসে তাঁর কল্পনাও দীপ্ত তরঙ্গ-ভঙ্গে নাচিয়া ছুটিত। তাঁর রচনাবলী আটের খেলায় ভরপুর। যেমন মিঠা রচনার ভঙ্গী,—তেমনি চরিত্রের বিচিত্র চিত্রে তিনি যেন রঙের ফুলঝুরি রচিয়া গিয়াছেন! তাঁর আঁকা নর-নারীর নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে হাস্যে-লাস্যে সারা বিশ্ব-আকাশ আজ ভরপুর—এবং চিরদিন তাহা এমনি ভরপুর রহিবে। তাঁর রচনা যে একবার পড়িয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

ভূদেব চরিত।—দ্বিতীয় ভাগ। প্রকাশক, ভূদেব পাবলিশিং হাউস, ৪৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বুধোদয় প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। নব্য-বাঙ্‌লা-গঠনে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাত কতখানি ছিল, বর্ত্তমান বাঙ্‌লার ইতিহাসের যাঁহারা খবর রাখেন, তাঁহারা তাহা জানেন। বাঙ্‌লা যখন পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রথম স্পর্শ-মোহে টলমল করিতেছিল, আচারে, ব্যবহারে বাঙালী যখন সাহেব সাজিতে উদ্যত, বাঙ্‌লার সেই শঙ্কাকুল দারুণ দুর্দ্দিনে ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রমুখ মহাত্মারা বাঙ্‌লাকে জ্ঞানে-কর্ম্মে ঠিক পথে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন; সে স্রোতে গা ভাসান্ না দিয়া এই বাঙ্‌লার মাটীকে আঁকড়িয়া যে চিন্তার যে জ্ঞানের স্রোত বাঙ্‌লায় বহাইলেন, নানা রচনায় দেখাইলেন, ভারতীয় সভ্যতার বহু পরিচয়, ভারতে যা নাই, তা কোথাও নাই—এবং তাহা হইতেই বাঙালী দেশমাতার পূজার মন্ত্র পাইয়াছে, দেশকে চিনিতে শিখিয়াছে। এই দেশাত্মবোধ, এই দেশ হিতৈষী—এসবের মূলে ভূদেবের চিন্তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বড় সামান্য কাজ করে নাই। সেই ভাঙ্‌চুরের যুগে ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাঙ্‌লার সমাজ ও ধর্ম্মকে কতখানি গড়িলেন, তার বিশদ পরিচয় এগ্রন্থে আছে। ১৮৭২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ অবধি ভূদেবের কর্ম্ম, ধর্ম্ম এবং চিন্তাধারার একটা ধারাবাহিক কাহিনী এই দ্বিতীয় ভাগে পাওয়া যায়; সেই সঙ্গে বাঙ্‌লার সামাজিক ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠাও বেশ জ্বলজ্বলে হইয়া ফুটিয়াছে। দেশের বহু কৃতী সন্তানের কথা, তাঁদের কর্ম্ম ও চিন্তার কাহিনীও এই গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি। যাঁরা বাঙ্‌লাকে জানিতে চান, বাঙালীকে জানিতে চান্, বর্ত্তমান বাঙ্‌লার চিন্তাধারার পরিচয় চান্, তাঁরা এ গ্রন্থখানি পাঠে অবহেলা করিবেন না। সাল-তারিখের ও বাজে কথার জঙ্গাল ঘাঁটিয়া জীবনী-কার ভূদেব-জীবনীর ও বাঙ্‌লার সমাজ-কাহিনীর যে বিবরণ দিয়াছেন, নানা দিক দিয়া তাহার সার্থকতা আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, জীবনীকার মহাশয় পরলোকে;—তবে তিনি আরো একভাগে এ জীবনী গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁর বিপুল চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে তিনি যে মালমশলা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, গোটা বাঙ্‌লার ইতিহাস-লেখক তাহা বুঝিয়া বাছিয়া কাজে খাটাইতে পারিলে বাঙ্‌লায় অমর কীর্ত্তি লাভ করিবেন। আমরা এ জীবনী-গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ পড়িবার জন্য উদগ্রীব রহিলাম।

হোমিওপ্যাথিক গৃহ বৈদ্য।—প্রথম ভাগ। সামান্য পেটের অসুখ, আমাশয়, ওলাউঠা। প্রকাশক, এস, রায় এণ্ড কোং, ৯০।৩এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। শাস্ত্রপ্রচার প্রেসে মুদ্রিত। খুব সহজ কথায় সরল প্রণালীতে পেটের অসুখের বিবিধ লক্ষণ ও তাহার চিকিৎসার কথা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। অল্পশিক্ষিতা মেয়েরাও ইহা পড়িয়া ছোট-খাট ব্যাধি চিকিৎসা করিতে পারিবেন। প্রকাশকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

বৌদ্ধ-ভারত।—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বিদ্যারত্ন সাহিত্য-ভূষণ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায় বি, এ, ১৬নং শ্যাম-চরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা মেটকাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে বুদ্ধ ও বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা হইতে সুরু করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসার ও বৌদ্ধগণ জ্ঞানে কর্ম্মে ভারতের নানা দিকে তাঁহাদের যে কীর্ত্তি রাখিয়াছিলেন, তাহারি বিশদ বিবরণ গ্রন্থকার সংগ্রহ করিয়াছেন। এখানি রাষ্ট্রীয় ইতিহাস-গ্রন্থ নয়। যে বিরাট সভ্যতা বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া প্রাচীন ভারতকে অপূর্ব্ব দীপ্তিতে উজ্জল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারি পরিপূর্ণ ছবি আঁকা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। একখানি মানচিত্রের মত তিনি বৌদ্ধ ভারতকে উজ্জলবর্ণে আঁকিয়া আমাদের চোখের সামনে ধরিয়াছেন। লেখক যে ভূমিকায় বলিয়াছেন,—প্রাচীন ভারতের বিচ্ছিন্ন ঘটনারাজির অভ্যন্তরে ঐক্যের একটি চিরন্তন ধারা…নিঃসন্দেহে প্রবাহিত হইতেছে …বৌদ্ধ ভিক্ষুদের-বিহারগুলিই সেকালে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র ছিল। সাধুরা শিষ্যদিগকে কেবল ধর্ম্ম নহে, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পরা ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিতেন। এইরূপে ভগবান বুদ্ধের সাধনা হইতে প্রাচীন ভারতে যে আশ্চর্য সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, এই পুস্তকে তাহাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে—এ কথার যাথার্থ্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে গ্রন্থকার সমগ্র বৌদ্ধ যুগের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এই একখানি গ্রন্থ পড়িয়া আমরা বৌদ্ধ যুগের মূল তথ্য ও সত্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থখানি ইতিহাস-বিভাগে অমূল্য; জ্ঞানে-আলোচনায় অপূর্ব্ব।

ইংলণ্ড।—পৃথিবীর ইতিহাস সিরিজ। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি এ, শিশির পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা। সূর্য্য প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। ইংলণ্ডের ইতিহাসের সমস্ত কথা বেশ সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় এ গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। প্রধান ঘটনা—যাহা দ্বারা বর্ত্তমান ইংলণ্ড গড়িয়া উঠিয়াছে--ইহাতে গল্পচ্ছলে আগা-গোড়া বর্ণিত হইয়াছে। পাঠ্য পুস্তকের নীরস আবহাওয়া বইখানির কোথাও ছোঁয়াচ লাগায় নাই, ছেলেমেয়েরা আগ্রহের সহিত এ বই

পড়িবে, এবং পড়িয়া ইংলণ্ডকে চিনিবে, জানিবে। বইয়ে অনেক ছবি আছে, ছাপা কাগজ বাঁধাইও চমৎকার। এক টাকায় এত বড় বই যে সব ছেলের হাতে উঠিবে না, তারা সত্যই দুর্ভাগা।

বৈদিক ভারত—রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট প্রণীত। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। শিশির পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা; শাস্ত্র-প্রচার প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানিও পৃথিবীর ইতিহাস-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ গ্রন্থে গল্পচ্ছলে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতার কাহিনী খুব সহজ ভাষায়, সরল ও স্বচ্ছ ভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে। তখনকার ভারতের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি কোন প্রয়োজনীয় কথাই বাদ যায় নাই। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের হাতে এ গ্রন্থ দেওয়া দরকার—তারা দেশকে জানিতে শিখিবে। এ বইয়ে ছবি আছে প্রচুর এবং ছাপা কাগজ বাঁধাই চমৎকার। প্রকাশককে এ চেষ্টার জন্য সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

কিশোরী।—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রলাল দাস বি এল প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। ৩৯নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চেরী প্রেসে মুদ্রিত। এখানি কবিতা-গ্রন্থ ; খণ্ডকবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি বিশেষত্বহীন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

একখানি চিঠি

মাননীয় ভারতী সম্পাদক মহাশয়—সমীপেষু,

কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের কতিপয় উৎসাহশীল যুবকের উদ্যোগে ৩নং সুতোরপাড়া লেনে একটী পণ-নিবারণী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংবাদ-পত্র-পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত আছেন। বর্ত্তমান সময়ে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে একটা প্রবল জন-মতের সৃষ্টি করা যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। প্রত্যেক পল্লীতে ভদ্র সমাজের মধ্যে কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতামাতার অভাব নাই। সর্ব্বদাই তাঁহাদের হাহাকার, দীর্ঘ নিশ্বাস ও পরিতাপ শুনিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের অবস্থা এত শোচনীয় যে ভাবিয়া দেখিলে পণ-প্রথাকে একটা পাশবিক অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। পণগ্রাহী পিতা 'সাইলকের' মত বৈবাহিকের উপর যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া থাকেন, তাহা ভাবিলে মন ঘৃণায়, লজ্জায় দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই বর্ব্বরোচিত ব্যবহারের জন্য কেবল পিতামাতা দায়ী নহেন, যিনি বিবাহ করেন, তিনিও দায়ী। অসহযোগ-আন্দোলনের সময় যাহারা স্কুল, কলেজ পরিত্যাগ করিবার বেলায় পিতামাতার আদেশের অপেক্ষা রাখেন নাই, বিবাহে পণ-গ্রহণ ব্যাপারে তাঁহাদের পিতৃ-মাতৃ-ভক্তির যেরূপ বন্যা ছুটিতে থাকে, তাহা দেখিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। যাহারা দেশের ও সমাজের আশা-ভরসা, তাঁহাদের মনোবৃত্তি এই প্রকার হইলে এদেশের ভবিষ্যৎ যে খুব উজ্জ্বল নহে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যাঁহারা উপদেশ দিয়া থাকেন যে,—নারী জাতির উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ কর, তাঁহাদিগকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিয়া আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলো, তাহা হইলে পণপ্রথা অচিরাৎ দূর হইয়া যাইবে—আমরা তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত সন্দেহ নাই। কিন্তু যে দেশের আজও বেশীর ভাগ পুরুষ নিরক্ষর, সে দেশের শতকরা ৯৯জন নারীর নিরক্ষরতা ঘুচাইতে কত যুগ অতিবাহিত হইবে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের নিকট আমাদের এই জিজ্ঞাস্য যে তাঁহাদের জাতি ও সমাজের মধ্যে যে অন্যায় প্রথাগুলি প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা দূর করিবার পক্ষে তাঁহাদের কোন কর্ত্তব্য আছে কিনা। যদি থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া সত্বর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমাজের সমুদয় আবর্জ্জনা দূর করিয়া ফেলিবার জন্য অগ্রসর হউন। এ বিষয়ে দেশের যুবকগণ অগ্রগামী না হইলে ইহার প্রতিকারের কোনই উপায় দেখিতেছি না। লোকের অবস্থা এত শোচনীয় এবং মনের মধ্যে পুরাতন সংস্কারগুলি এত বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে তাহারা কন্যাদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত উপযুক্ত ভাবে শিক্ষাদান করিতে পারিতেছেন না। ছেলেদের মত মেয়েদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত সংশিক্ষা-দানে উৎসাহিত করা এবং পণ-প্রথাকে সমাজ হইতে সমূলে উচ্ছেদ করা আমাদের সমিতির প্রধান লক্ষ্য। আমাদের সমিতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কেহ কোন পণগ্রাহীর বিবাহে কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারিবেন না। আমরা যোল বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের বিবাহের পক্ষপাতী নই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যতই উপাধি মণ্ডিত হউন না কেন, উপার্জ্জন-ক্ষম এবং পরিবার-প্রতিপালনের যোগ্যতা না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা যুবকদিগের বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার সাব্যস্ত হইতে পারে কিনা, তাহাও আমাদের চেষ্টার বিষয়ীভূত হইবে। এ বিষয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মতামত জানিবার জন্য আমরা কলিকাতায় একটী বিরাট সভা আহ্বান করিবার জন্য উদ্যোগী হইতেছি। আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি লিখিয়া জানাইয়াছেন। বাঙ্গালার প্রধান প্রধান দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদ পত্রসমূহ আমাদের কার্য্যে সহানুভূতি জানাইয়া আমাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতেছেন। দেশের যে-সকল শুভানুধ্যায়ী যুবক ও সহৃদয় অভিভাবক আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীসুশীলকুমার হাত
সহঃ সম্পাদক, পণ-নিবারণী সমিতি
৩নং সুতোর পাড়া লেন, কলিকাতা।

ঘর ও বাহির

জন-গণ-মন

আমাদের জাতীয় উন্নতির অন্তরায় স্বরূপে আজকাল যে সব সমস্যা দেখা দিতেছে, স্বদেশপ্রেমের অভাবই প্রধানতঃ সেগুলির কারণ। আজকালকার সব চেয়ে বড় যে সমস্যা—হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষি-দ্বেষাদ্বেষি, স্বদেশপ্রেমের অভাব বশতই তাহা এমন জটিল হইয়া উঠিয়াছে এবং দেশের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিতে বসিয়াছে। সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ত বিলাতের লোকদের মধ্যেও ছিল ; হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যেমন বিরোধের ভাব এখন দেখা যাইতেছে, এক সময়ে বিলাতের রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্টান্টদের মধ্যেও ভেদের ভাব তাহা অপেক্ষা বরং বেশীই ছিল, কিন্তু সে ভেদের ভাব ইংরেজের জাতীয় উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই, তেমন ভেদের ভাব সত্ত্বেও স্বদেশপ্রেমের প্রভাবে ইংরেজ দেশের কাজের জন্য এক হইয়াছে।

আমরা চাই, ইংরেজের মত তীব্র স্বদেশপ্রেমে এদেশের লোকের অন্তরে জাগিয়া উঠুক ; আমরা চাই, ইংরেজের মত স্বদেশ-প্রেমে এদেশের যুবক সম্প্রদায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠুন, আমরা চাই, রাজনীতিকেরা ইংরেজের মত স্বদেশ-সেবার প্রেরণা অন্তরে লইয়াই দেশের কাজে অগ্রসর হউন, ইংলণ্ডের মন্ত্রীরা যেরূপ মনোবৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডের মন্ত্রীপদ গ্রহণ করেন, এ দেশের মন্ত্রীরা তাঁহাদেরই মত মনোবৃত্তির সহিত মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হউন, আমরা ইহাই কামনা করি। —হিন্দুস্থান।

মহাত্মা গান্ধীর নিকট শ্রীযুক্ত লালা লাজপৎ রায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে একখানা পত্র লেখেন। লালাজী লিখিতেছেন, "আমার মনে হয়, 'বর্ত্তমানে আমাদের দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান ও সার্ব্বজনীন প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা। আমার যদি ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির উপর কোন প্রভাব থাকিত, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতাম, প্রত্যেক সংবাদপত্রের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিতে—

দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন

বালকগণের জন্য দুগ্ধ

পূর্ণবয়স্কগণের জন্য খাদ্য

সকলের জন্য শিক্ষা"

যাঁহারা লাজপৎ দিবস করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতে চাহেন ও কর্ত্তব্য শেষ করিতে চাহেন, তাঁহাদের এই পত্র খানা বিশেষ করিয়া পড়িতে অনুরোধ করি। আইন অমান্যের হুজুক বাধাইয়া বা অন্য প্রকারে দেশের আবহাওয়াকে উত্তপ্ত না করিয়া, লালাজীর প্রার্থিত "বালকগণের জন্য দুগ্ধ", "পূর্ণ বয়স্কগণের জন্য খাদ্য," "সকলের জন্য শিক্ষা"র বন্দোবস্ত করিতে যদি সকলের শক্তি একত্র করা যাইত—তবে দেশেরও সত্যকার কল্যাণ হইত, শ্রীযুক্ত লালা লাজপৎ রায়কেও সম্মান দেখান হইত। —স্বরাজ।

নারী-প্রসঙ্গ

মাধবচন্দ্র সেন এবং তাহার কন্যা জগৎকিশোরী দাসীকে উত্তর বিভাগের পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা রাধারাণী দাসী নাম্নী একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে বে-আইনী ভাবে আটক রাখে এবং তাহাকে প্রহার করে। রাধারাণী মাধবচন্দ্র সেনের পুত্রবধূ। অভিযোগে প্রকাশ, বালিকাটিকে গত তিন মাস কাল হইতে একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। আসামীদের পাড়া-পড়সীরা তাহাদের বাড়ী হইতে বালিকাটির চীৎকার শুনিতে পাইত, প্রতিবেশীরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রথম আসামী যাহা বলিত, তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইত না। সংপ্রতি কয়েকজন বালিকাকে উদ্ধার করিতে সাহায্য করিবার জন্য শ্যামপুকুর থানার ভার-প্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট একখানা চিঠি দেয়। এসিষ্টান্ট কমিশনার শ্যামপুকুর থানার ইনস্পেক্টরকে লইয়া ঐ বাড়ী হইতে বালিকাকে উদ্ধার করেন। বালিকা তখন পীড়িতা ছিল। চিকিৎসার জন্য তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়। আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামী-পক্ষ হইতে বলা হয় যে, বালিকার উপর নির্য্যাতনের অভিযোগ সত্য নহে, বালিকা সম্প্রতি পীড়িতা ছিল বটে, কিন্তু ডাক্তারদের দ্বারা তাহার রীতিমত চিকিৎসা করান হইতেছিল। আসামীরা জামীনে খালাস আছে এবং ঘটনা সম্বন্ধে আরও তদন্ত চলিতেছে। —স্বরাজ।

শিয়ালদহ পুলিশ আদালতে পটলমণি দাসীর পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে এক অভিযোগ উপস্থিত হয় যে, তাহার স্বামী অমূল্যচরণ এবং শাশুড়ী ননীবালা তাহার উপর এরূপ দুর্ব্যবহার করে যে, তাহাতে তাহার জীবন বিপদাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। পটলমণি আরও বলিয়াছে যে, তাহাকে একটা খোঁটার সহিত হাতে পায়ে বাঁধিয়া উভয়ে মিলিয়া অমানুষিকভাবে প্রহার করে। এবং তাহাকে অপরিমিত আহার্য্য দিয়া একখানি ঘরের মধ্যে আটক করিয়া রাখা হইত। আদালতে বালিকাটি তাহার গায়ে প্রহারের অনেক দাগ দেখাইয়াছে। পটলমণির বয়স মাত্র ১০ বৎসর। —হিন্দুস্থান।

রাজনীতি

কলোনিয়াল গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর দাবীকে যে কোন্ যুক্তির বলে অগ্রাহ্য করিতেছেন তাহা অনেকের মনেই একটা সমস্যার সৃষ্টি করিবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী যে সেখানে অগ্রাহ্য হওয়া উচিত নহে এবং ভারতের অধিকার সাম্রাজ্যের আর সকলের সমান হওয়াই যে সঙ্গত, কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এদিক দিয়া অবিচার করিলে তাহাতে সাম্রাজ্যের সংহতি শক্তিই যে ক্ষুণ্ণ হয়, রাজনীতির প্রথম পাঠ যাঁহাদের পড়া আছে, এ কথাটা তাঁহাদের কাছেও পরিচিত।

ভারতীয় ডেলিগেশন ভারতীয় জনসঙ্ঘকে এবং ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই ব্যাপারটা লইয়া একান্ত দৃঢ়তার সহিত লড়াই করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই অন্যায় যে ভারতবর্ষ নিরাপত্তিতে সহ্য করিবে না, তাহা ইম্পিরিয়াল গবর্নমেণ্টকে নিজেদের দৃঢ়তার দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টার যাহাতে ত্রুটি না হয়, সেদিকেও নজর দিতে তাঁহারা অনুরোধ জানাইয়াছেন। ভারতের জন-সঙ্ঘ এই অন্যায় এবং অবিচার কি ভাবে গ্রহণ করিবে তাহার পরিচয় তাহাদের আন্দোলনের ভিতর দিয়াই ধরা পড়িয়াছে। ভারতের এই জনসঙ্ঘের আকাঙ্ক্ষা ও দাবী ভারত গবর্মেণ্টের মারফৎ যাহাতে প্রকাশ পায়, ভারত গবর্নমেণ্ট যাহাতে দৃঢ় ভাবে ভারতের স্বার্থটাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, তাহা ভারত গবর্নমেণ্টেরও একটা খুব বড় রকমের কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্যে যাহাতে ত্রুটি না হয়, ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কথায় এবং কাজে ভারতবাসী আজ তাহাই যাচ্ঞা করিতেছে, তাহাদের এ যাচ্ঞা যে অন্যায় এবং অনাবশ্যক নহে তাহা বলাই বাহুল্য। —স্বরাজ।

ভারতবর্ষের তিনটি সরকারী রেলের ট্র্যাফিক বিভাগে উচ্চপদে ত্রিশ জন ভারতীয় কর্ম্মচারী আছেন। ইহাদের মধ্যে চৌদ্দজন গ্রাজুয়েট এবং ষোলোজন গ্রাজুয়েট নহেন। তাহাদের মাহিনা তিনশত হইতে আরম্ভ করিয়া দেড় হাজার টাকা পর্য্যন্ত। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা বিলাতে কিছুকাল শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং সেখান হইতে চাকুরী যোগাড় করিয়াছেন, তাঁহারা মাসিক দেড়শত টাকা (overseas allowance) পাইয়া থাকে। এ কি প্রকার ব্যবস্থা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

* * *

বিদেশী—অর্থাৎ ভারতবাসী যদি বিলাতে কাজ করে অথবা বিলাতবাসী যদি ভারতবর্ষে কাজ করে, তাহা হইলে সেরূপ বিদেশীকে overseas allowance দেওয়া হইয়া থাকে, অন্ততঃ allowanceএর একটা অর্থও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভারতবাসী ভারতে বসিয়া বিলাত বাসীর allowance ভোগ করিবে এ কি ব্যবস্থা! বিলাতে যাঁহারা কিছুদিন বাস করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট কি তাঁহাদের ইংরেজ বলিয়া মনে করেন নাকি? পয়সার জন্য এরূপ বিদ্রূপ একমাত্র ভারতবাসীই সহ্য করিতে পারে। —হিন্দুস্থান

লোকসেবা

৩৭নং বেনেটোলা ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্তমহাশয় তাঁহার পরলোকগত কন্যা বিপুলা দত্তের স্মৃতিরক্ষা কল্পে কলিকাতায় থাকিয়া কলিকাতায় কোন কলেজে পড়িতে ইচ্ছুক এরূপ ৫ পাঁচ জন মফঃস্বলবাসী দরিদ্র হিন্দু ছাত্রকে বিনা ব্যয়ে ২ বৎসরের জন্য বাসস্থান ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। ৭নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে বাবু ললিত মোহন পাল বি এস সি মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

—খুলনা

নদীয়া জিলার শান্তিপুরের বাবু অটলবিহারী মৈত্র এবং তাঁহার পরিবারবর্গস্থ সকলে মিলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৬০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। টেক্‌নোলজিকাল এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিদ্যার বিস্তারের জন্যই এমন দান। যিনি ভারতে কিম্বা ভারতের বাহিরে টেক্‌নোলজিকাল বা তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহাকে ঐ সম্পত্তির আয় হইতে বৃত্তি দেওয়া হইবে। —খুলনা

টাঙ্গাইল মহকুমার নাগরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী ইতিপূর্ব্বে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়া তাঁহার স্বগ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা ঐ চিকিৎসালয়ের উন্নতিকল্পে দান করিয়াছেন। এরূপ একটি বৃহৎ হাসপাতাল বঙ্গদেশের নাগরপুরের মত পল্লীগ্রামে আর কোথাও আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। সৎকার্য্যে এরূপ নিঃস্বার্থ দান অতি বিরল। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন। —শান্তিবার্ত্তা

গত ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে কলিকাতার হাসপাতাল সমূহে বাহিরের রোগীদের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থাপ্রবর্ত্তনের সময় সাধারণ হইতে প্রতিবাদের ঢেউ উঠিয়াছিল, কিন্তু সে কথায় কেহই কর্ণপাত করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ৭ই জুলাই তারিখ হইতে এই ব্যবস্থা রদ করা হইল। এজন্য আমরা স্যর সুরেন্দ্রনাথকে সাধুবাদ ও ধন্যবাদ দুই দিতেছি। জনসাধারণের মতামতকে মানিয়া চলা দুর্ব্বলতা নহে। —হিন্দুস্থান

স্বাস্থ্য

এদেশের ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য ত অনেকেই লাগিয়াছিলেন। লর্ড রোণাল্ডসে গবর্ণরি লইবার সময় বলিয়াছিলেন, আমি বাঙলা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিব। আবার স্যর সুরেন্দ্রনাথও মন্ত্রিত্ব লইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, তিনি ম্যালেরিয়া তাড়াইবেন। এই ম্যালেরিয়া তাড়াইবার কতদূর কি হইল, সেদিন বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট সে হিসাবটা চাহিয়াছিলেন। মন্ত্রী মহাশয় ডাক্তার বেন্টলীর মন্দিপত্র—কাগজের তাড়া দেখাইয়া দিয়া বলিলেন কি, ম্যালেরিয়া তাড়াইবার জন্য কিছু করি নাই, আমরা আঁধারে ছিলাম, এখন আমাদের চোখ খুলিয়াছে। ম্যালেরিয়া কিসে হয় কিসে যায় এ কথা জগতের সকল দেশের লোকেই জানে, অন্যদেশের লোকে ম্যালেরিয়া তাড়াইয়াছেও। বাঙলা সরকারের কাগজের তাড়া বাড়ানতে ম্যালেরিয়া কিছু কমিয়াছে কি? সেদিন কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবে বক্তৃতাকালে ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাঙালা দেশে ম্যালেরিয়া যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে; ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা বলেন, আরও বাড়িয়াছে। যাহা হউক মন্ত্রী মহাশয়ের দৌলতে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমাদের চোখও খুলিয়াছে, এখন ঐ ম্যালেরিয়াকেই মুদিব নয়ন সুখে! —হিন্দুস্থান

বিবিধ

জনৈক পত্রপ্রেরক শিখদের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের প্রকাণ্ড পুষ্করিণীটি জঙ্গলে আচ্ছন্ন, কাদায় সেটি ভরিয়া উঠিয়াছে, এই পুষ্করিণীর ধারেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অমর সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন। হিন্দুরা যদি আজ শিখদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করেন, তাহা হইলে ভারতভূমি পৃথিবীতে স্বর্গধামে পরিণত হইবে। কুরুক্ষেত্রের একটা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিলেই যে ভারতভূমি স্বর্গে পরিণত হইবে, এতটা ধর্ম্ম-বিশ্বাস আমাদের নাই, তবে গ্রামে গ্রামে যে সব মজা পুকুর পড়িয়া আছে, সেগুলির পঙ্কোদ্ধার করিতে পারিলে যে এদেশের অনেকটা উপকার হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—হিন্দুস্থান।

হিন্দুর পুণ্যময় তীর্থ দ্বারকাধামের গমন-পথ সঙ্কট-সঙ্কুল ছিল। পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে তিন দিন সমুদ্র-পথে জাহাজে করিয়া দ্বারকায় যাইতে হইত। তারপর বোম্বাই হইতে পোর বন্দর পর্য্যন্ত রেল হইলে তথা হইতে অর্দ্ধদিনে সমুদ্র-পথে জাহাজে কিম্বা তিন দিনে স্থল-পথে গোযানে দ্বারকায় যাইতে হইত। সম্প্রতি দ্বারকা পর্য্যন্ত নূতন রেলপথ প্রস্তুত হওয়ায় দ্বারকা যাত্রার পথ সুগম হইয়াছে। —নীহার।

মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে সাক্ষীগণের প্রতি সমন দিবার কালে তাহাদের খোরাকী ও বারবরদারী দাখিল করিবার যে নিয়ম আছে, সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্ট ঐ খরচের হার বাড়াইয়া দিয়া এই নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে, শ্রমজীবী সাধারণ কৃষক ও তৎশ্রেণীর অন্য লোকের জন্য দৈনিক ॥৹আনা (নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, খুলনা, যশোহর ও মেদিনীপুর জেলার ।৶৹ আনা), এবং উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের জন্য দৈনিক ৫৲ টাকা খোরাকী দিতে হইবে। যাঁহারা হাঁটিয়া আসেন না, এমন শ্রেণীর সাক্ষীর বার বরদারী মাইল প্রতি ।৹ আনা এবং যে সকল জেলায় জলপথে যাতায়াত করিতে হয়, সে সকল স্থানে দৈনিক সর্ব্বোচ্চ নৌকা ভাড়া ২৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীগণ ট্রাভেলিং বিলের নিয়মমত বারবরদারী খরচ পাইবেন। —নীহার।

নিম্নে পৃথিবীর দশজন শ্রেষ্ঠ ধনকুবেরের নাম দেওয়া গেল :—

নাম			সম্পত্তির মূল্য
হেনরী ফোর্ড	...	...	১১০,০০০,০০০
জন ডি রকফেলার	...	...	১০০,০০০,০০০
ডিউক অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার	...	...	৬০,০০০,০০০
মিঃ এণ্ড্ মেলন	...	...	৩০,০০০,০০০
স্যার বেসিল জেহেরফ্	...	...	২০,০০০,০০০
হুগো ষ্টিনেস্	...	...	২০,০০০,০০০
পার্শী রকফেলার	...	...	২০,০০০,০০০
ব্যারন্ এইচ মিটশুই	...	...	২০,০০০,০০০
„ „ ইওয়াস্কী	...	...	২০,০০০,০০০
বরোদার গাইকোয়ার	...	...	২০,০০০,০০০

—আনন্দবাজার পত্রিকা

শিক্ষা

শেষটায় কাঁচি চলিল দুর্ভাগা ছাত্রদের উপর! আসাম গেজেটে গবর্ণমেণ্ট জারী করিয়াছেন যে, আসাম-ছাত্রদের বৃত্তির পরিমাণ অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থা এই এক বৎসরের জন্য করা হইল। এর অর্থ কি এই যে আগামী বৎসর আরও কমাইয়া দেওয়া হইবে? আমাদের ত সেই ভয়ই হইতেছে। —পারিদর্শক।

জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা। আমরা অবগত হইলাম, বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টার গ্রীফিৎ সাহেব মহাশয় কাঁথি হাই স্কুল পরিদর্শন কালে ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা তাঁতের কাজ কেমন পছন্দ কর? তাহারা একবাক্যে বলে, "আমরা তাঁত পছন্দ করি না, লেখাপড়া বড়ই পছন্দ করি।" বাঙ্গালীর ননীর পুতুলরা শারীরিক পরিশ্রমের কোনও কাজই যে পছন্দ করেন না তাহা সকলেই জানে। স্বাধীন ব্যবসা না করিয়া দাসত্ব করিতেই পটু হইতেছে। এই দাস-মনোভাব দূর করিতে হইলে শিল্প শিক্ষার সহিত জাতীয় ভাবোদ্দীপক শিক্ষার ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। —নীহার।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নন্দোৎসব

(প্রাচীন চিত্র হইতে)
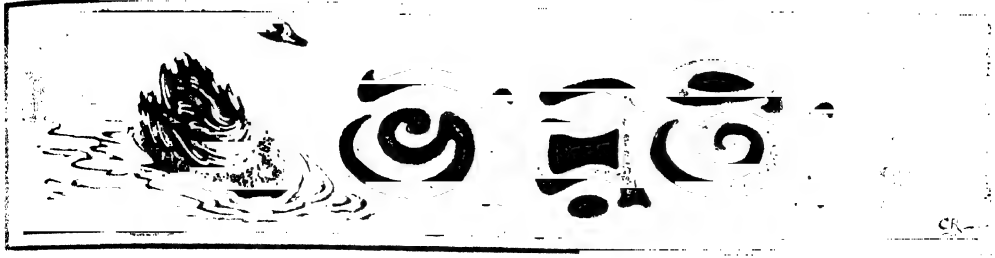
৪৭শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৩০ | ষষ্ঠ সংখ্যা

এস্পার-ওস্পার

দৃশ্য ১

[যবনিকার এপার—সাদা দেওয়ালের উপরে বিকট ছটো কালো ছায়া ফেলে ভয়ঙ্কর সাদা ও ভয়ানক কালো সাজ এবং সাদা ও কালো দাড়ি-গোঁফ হর্ত্তা কর্ত্তার প্রবেশ।]

(কনসার্টের সঙ্গে শিঙ্গা-বাদন)

হর্ত্তা। আরে থাম বাপু, শিঙ্গে ফুঁকেই চলো!

কর্ত্তা। ওহে একটু রয়ে বসে, এত তাড়া কিসের! যাত্রা আরম্ভ হবার দেরী আছে।

হর্ত্তা। একটু সাজ-গোজ করে নিই। সব দিকে একটু গুছিয়ে নিতে দাও।

কর্ত্তা। তাড়াতাড়ি শিঙ্গেতে ফুঁ দিলে কি হবে? ভদ্রলোক কি এ অবস্থায় যাত্রা করতে যেতে পারে, মুখে একটু পাউডার, গায়ে একটু রং-চং মেখে নিতে তো হবে।

হর্ত্তা। পোটো যে এখনো এসে পৌঁছল না—

কর্ত্তা। আরে নিজে নিজে একটু রং মেখে নাও না, যাত্রার সময় হয়ে এল, পোটোর জন্যে বসে থাকা তো চলে না, সে লোকটা খেয়াল-মত আসে যায়, নাও আসতে পারে।

হর্ত্তা। তবেই তো মুস্কিল!

কর্ত্তা। মুস্কিল বল্লে চলবে কেন? ঠিক সময়ে যাত্রা আরম্ভ করে দিতেই হবে, সময় হয়ে এল।

হর্ত্তা। আরে তুমি তো হুকুম দিচ্ছ যাত্রা করতে—এদিকে অধিকারীর যে এখনো দেখা নেই।

কর্ত্তা। তুমি আমি হর্ত্তা কর্ত্তা দুজনে থাকতে অধিকারীর আবার কি দরকার!

হর্ত্তা। তিনি সঙ্গে থাকলে খানিক ভরসা থাকে, তাই বলছিলেম।

কর্ত্তা। আর ভরসাতে কাজ নেই, যাত্রার গোড়াতেই আজ ভরা ডুবি না হলে বাঁচি! কৈ হে, এখানে একটু আলো দাও না, ভারি যে অন্ধকার দেখছি—

হর্ত্তা। মিছে চেঁচিয়ে মরছো, ওরা শিঙ্গে ফুঁকে দিয়েছে! ফরাসটা মায় তার আলো গঙ্গাযাত্রা করে চলে গেছে যবনিকার ওপারে।

কর্ত্তা। ওই না কে দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে আসছে!

হর্ত্তা। ও যে উল্টো রাস্তায় চল্লো দেখি—

কর্ত্তা। চল, চল, ওকে ধরে আনা যাক।

হর্ত্তা। ইস্, অন্ধকারে যেন পিছলে যাচ্ছি—এমন জানলে বাড়ী থেকে আলো-বাতি সব গুছিয়ে আনতেম।

কর্ত্তা। সব দোষ সেই অধিকারীর। যাত্রা করাবে ভদ্রলোক সবাইকে নিয়ে, তা একটু আলো পর্য্যন্ত দেবার নামটি নেই! চল।

দৃশ্য ২

যবনিকার ওপার। অন্ধকারে আত্মারাম গায়ের গেরুয়া কাপড় ঝেড়ে-ঝুড়ে নিচ্ছে—চিত্রকরের চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে প্রবেশ।

আত্মা। কে হে রুট ফুঁকচো, ধুমপান নিষেধ লেখা আছে, দেখনি?

চিত্র। দেখতে পাচ্ছি অন্ধকারে খালি নিজের মুখের কাছে আগুনের ফুল্‌কিটি।

আত্মা। বলি, তুমি কে, তাই বল না,বাজে বকো কেন!

চিত্র। আমি চিত্রকর, বাজে কাজেই আছি।

আত্মা। তা থেকো,এখন একটা কাজ করতে পার?

চিত্র। কি কাজ?

আত্মা। বলি, সঙ্গে রংটং কিছু এনেছ, না, তাড়াতাড়ি আনতে ভুলে এসেছ রংএর কথা?

চিত্র। রং ছাড়ি! একেবারে রংমশালের বাণ্ডিল সঙ্গে এনেছি।

আত্মা। আচ্ছা, দাও তো আমাকে একটুখানি সুন্দর করে, দেখি কেমন চিত্রকর!

চিত্র। আগে তোমার নামটাই বল, তবে তো বুঝি কোন্ সাজ কোন্ রং মানাবে তোমাকে।

আত্মা। আমি আত্মারাম।

চিত্র। আত্মার তো রং নেই—তাছাড়া আত্মা হন সূক্ষ্ম শরীর! তোমাকে তো এ পাট মানাচ্ছে না।

আত্মা। কেন?

চিত্র। তুমি একে ভারি মোটা, তার উপর এত পুরু কম্বল চাপিয়েছ! তোমায় খুব মিহি কাপড় পরতে হবে, হাওয়ায় মত একেবারে ফিন্‌ফিনে।

আত্মা। শীতকালে যাত্রা, এই হিমে পাতলা কাপড় পরে কেঁপে মরি আর কি তোমার কথায়! যাও, আমায় সাজাতে হবে না।

চিত্র। দেখ, তুমি তাহলে আত্মারাম পাখী সেজে নাও—ঠোঁট লাল করে দিই এস, আর মুখে একটু সবুজ—

আত্মা। না, না, লাল ঠোঁট পর্য্যন্তই থাক্। যে অন্ধকার, কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে, সাজাটা কেমন হল।

চিত্র। রোসো, একটা রংমশাল জ্বালি।

আত্মা। এঃ, এ যে একেবারে রঙ্গীন আলোর ভোজ-বাজি লাগিয়ে দিলে হে! আমারো যে নেচে যেতে ইচ্ছে করছে।

চিত্র। তা নাচো না! ইচ্ছেই যদি হচ্ছে তো নেচে ফ্যালো। যাত্রার আগে একটু হাত-পায়ের মিল ছাড়িয়ে নেওয়া চাই তো।

আত্মা। তাহলে একটু হরিবোল দিয়ে নাচি!

চিত্র। তাহলেই দপ্ করে আলো নিভে যাবে।

আত্মা। আমি তো অন্য গান শিখিনি—

চিত্র। ঐ যে তিনটে ছেলে কোণ থেকে উঁকি দিচ্ছে, ওদের ডাকো না! ওদের হাতে বাঁশি দেখছি, গাইতেও জানে বোধ হচ্ছে।

(কানু হারু জালুর প্রবেশ)

কানু। আমরা ওম্‌নি বাঁশি বাজাইনে—

হারু। গান কি ওম্‌নি গাইবো!

জালু। বল, আমাদেরও যাত্রা করতে দেবে?

আত্মা। অধিকারীর হুকুম না হলে কি কেউ যাত্রা করতে পারে!

চিত্র। তা তুমি না হয় যাও, আমাদের এই কজনের হয়ে অধিকারীর কাছে হুকুম নিয়ে এস!

আত্মা। আরে বাস্, সেটি হবার জো নেই। অধিকারী চটবে। হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরে না! তার হুকুম ছাপানো হয়ে গেছে। আসর জম্‌কে সে বসে আছে দেখ খুলে, কার সাধ্য তার কাছে গিয়ে একটি কথা বলে এ সময়! হুকুম আসবে,তবে আমি এখান থেকে যাবো। ঐ দেখ,অধিকারির হুকুম নিয়ে হর্ত্তা কর্ত্তা দুজনে এদিকে ছুটে আসছে।

(হর্ত্তা কর্ত্তার প্রবেশ)

হর্ত্তা। আত্মারাম কোথায়?

আত্মা। এই যে আমি—

কর্ত্তা। এখনো সাজ হয়নি? যাও, যাও, তোমার ডাক পড়েছে।

আত্মা। ততক্ষণ নহুষকে নিয়ে যাওনা! সে যাত্রা করতে সেজে বসে আছে।

হর্ত্তা। আরে নহুষ আগে যাবে, না, তার আত্মাটা আগে যাবে!

কর্ত্তা। যাত্রা করবে আগে নহুষের সূক্ষ্ম শরীর পরে যাবে তার স্থূল দেহ, ভুলে গেলে নাকি?

আত্মা। কিছু ভুলিনি। শুধু সেখানে গিয়ে আমায় কি বলতে হবে সেইটেই ভুলে গেছি।

হর্ত্তা। এই তো মুস্কিল হল—

কর্ত্তা। চল না, আমরা হর্ত্তা কর্ত্তা থাকতে মুস্কিল কিসের! কাজ চালিয়ে খুসি করে দেবো অধিকারীকে, যেমন করে পারি!

আত্মা। এ তেমন অধিকারী পাওনি! সে পাট ভুল্লেও খুসি, না ভুল্লেও খুসি। এ একেবারে যমের মতো নিয়মের দণ্ড উঁচিয়ে বসে আছে, যাত্রা করতে যাবার পথে! যাই, কপালে যা থাকে হবে।

(প্রস্থান)

কানু। ওরা তো গেল।

হারু। আমরাও—

জালু। যাই চল না, যাত্রা দেখি গিয়ে

চিত্র। শুনলে তো—হুকুম না এলে এখান থেকে যাবার জো নেই!

কানু। অধিকারীর হুকুম না হলে কি কেউ যাত্রা করতে পারবে না?

হারু। ও যেমন অধিকারি হয়ে যাত্রার দল নিয়ে বসে আছে, তেমন কি আর কেউ পারে না!

জালু। ছোট-খাটো একটা যাত্রার দল বেঁধে ফেল্লে কেমন হয়!

চিত্র। যাত্রা করতে তো সহজে কেউ রাজী হয় না, সবাই দেখতেই চায় যাত্রা। এই তুমিই তো খানিক আগে যাত্রা দেখতে চাচ্ছিলে!

জালু। আরে, আমার মনে হচ্ছে যাত্রা দেখে শিখবো, কেমন করে যাত্রা করতে হয়।

কানু। পালা গায় কেমন করে, শিখতে চাই।

হারু। লেখা যাত্রা লেখা পালায় কি মজা! দেখে মন বলে, পালা রে পালা! এমন যাত্রা দেখে সুখ হয় না!

চিত্র। ঠিক বলেছো। গুরুমশায়ের মতো অধিকারী বেত হাতে বই হাতে বসে রইলো, আর মুখস্ত পড়ার মতো পালার পর পালা হয়ে চল্লো, এমন যাত্রা দেখেও সুখ নেই, করেও সুখ নেই।

কানু। একটা যেমন খুসির দল বেঁধে যাত্রা করে চল্লে কেমন হয়?

চিত্র। খুব ভালো হয়। তুমি যেমন খুসি বাঁশি বাজিয়ে চল্লে, আমি যেমন খুসি সিন্ এঁকে চল্লুম, ও যেমন খুসি গান গেয়ে চল্লো, সে যা খুসি তাই করেই চল্লো নেচে নেচে—এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে?

কানু। এই যা-খুসির যাত্রার সবাই অধিকারী, কি বল?

হারু। সবাই হর্ত্তা কর্ত্তা।

জালু। বিধাতা।

চিত্র। এই হলে তো ভালই হয়। আমি এতে রাজি আছি। কেবলি যাত্রা যাত্রা খেলা, আসল যাত্রা একেবারেই নয়।

গান

এইতো ভাল এইতো ভাল
যেমন খুসী তোক্‌না খেলা
সাঁঝ-সকালের তালে তালে
পড়ুক্‌না পা
যেমন খুসী কাটুক বেলা।
সেই তো ভাল সেই তো ভাল—
মনসুখে গেয়ে যাওয়া
বনে বনে ছাওয়ায় ছাওয়ায়
যেমন খুসী ধেয়ে যাওয়া—
এই তো ভাল এই তো ভাল!
খুসি মনে খুসির চলা,
নদীজলের চলে চলা,
বাতাসেরি দুলে চলা
যেমন খুসি নেচে চলা!

কানু। এই মাঠে ঘাটে খেলতে খেলতে আমরা যেমন যাত্রা করি, ঠিক তেমনি যাত্রা,—কি বল?

হারু। কিন্তু এখানে যে আসল যাত্রার জায়গা!

জালু। মাঠও নয়, ঘাটও নয় এটা, এখানে আলো ছায়া ফুল বাতাস আসা-যাওয়া তো করতে পারে না—এখানে যাত্রা জমবে না।

চিত্র। কেন জমবে না? সব ধরে আনবো এখানে,—বলতো যাত্রার অধিকারী মায় তার যাত্রাটাকেও ধরে আনতে পারি।

কানু। তুমি মন্তর জানো না কি?

হারু। এ যদি পারো তো—

জালু। তোমাকে খুসি করে দেবো।

চিত্র। ইস্, খুব তো দিল্‌দরিয়া ছেলে তোমরা! আচ্ছা, বলতো কি দিয়ে খুসি করবে?

কানু। কেন, বাঁশী বাজিয়ে!

চিত্র। বাঁশী আমিও বাজাই,—এমন যে শুনলে তোমরাই খুসি হয়ে যাবে।

হারু। গান গেয়ে—

জালু। নেচে—

চিত্র। আমি চিত্রকর, তা জানোনা বুঝি? আমাকে খুসি করা সহজ নয়! আমি বাজাতে পারি, নাচতে পারি, গাইতে পারি—এমন যে বনের হরিণ, গাছের পাখী, নদীর জল, আকাশের চাঁদ সূর্য্য তারা, আলো অন্ধকার সব চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে থাকে আমার সামনে।

জালু। তবে তোমার সঙ্গে খুসি বদল করে তোমাকে খুসি করে দেবো।

কানু। সে কেমন হবে, বলতো!

চিত্র। বহুৎ আচ্ছা—এস,খুসি কর, যা চাইবে,দেবো—

হারু। আমরাও তার বেশী চাইবো না—

গান

আমায় যা খুসি তাই দিও
আমার যা আছে তাই নিও।
শুধু কাঁদিয়ে যেও না রে
তুমি কেঁদে চেও না—
তোমায় আমায় দেখা হল
দুখ-সাগরের পারে
চোখের জলে মিলন-মালা
ভিজিয়ে দিওনা রে।
হাসি দিয়ে করবো বরণ
বাঁশী আমার ভরবো গানে
বেদন-ভরা সুরের টানে
টানে টানে টেনে নিও
তোমার পানে।

(হর্ত্তা-কর্ত্তার প্রবেশ)

কর্ত্তা। এই গোলমাল হচ্ছে—

হর্ত্তা। যাও এখান থেকে, যাত্রা সুরু হচ্ছে।

চিত্র। যাবো কেন? তোমরা নিজের জায়গায় যাও, এখানে এলে কি করতে?

কর্ত্তা। কে হে বট তুমি—

হর্ত্তা। হুকুম চালাও এখানে—

চিত্র। চিনতে পারলে না? আচ্ছা, আমার লিখন চেনো তো, এই নাও লেখা হুকুম,—

কর্ত্তা। এ যে অধিকারীর লিখন, দেখি—

হর্ত্তা। ইনি—

চিত্র। যাও, লিখন-মতো যাত্রা চলবে একটু অদল-বদল করে আমাদের যেমন খুসি, বুঝলে?

কর্ত্তা। পালাটা যে উল্টে-পাল্টে গেছে। আগা এনেছে গোড়ায়, গোড়া গেছে আগায়—

হর্ত্তা। আলো-আঁধারে ধাঁধাঁ লেগে যাওয়ার মতো! কিছুই ঠিক নেই।

চিত্র। এই ভাবেই যাত্রা করাও সবাইকে—রং-বেরং আলো-আঁধারে মিলিয়ে। ধর খাতা, যাও ওধারে।

কানু। আর আমরা—

চিত্র। এধারে বাঁশি ধর, গান ধর, নাচ সুরু করে যাত্রা হোক।

কানু। আমাদের একটু রং করে দেবে না?

চিত্র। রং অন্ধকারে লুকিয়ে আছে, বাঁশি বাজলেই ছুটে আসবে।

হারু। ধর কানু, বাঁশি ধর।

কানু। তুই গান ধর্—

জালু। আমি নাচি!

চিত্র। ওই দেখ রং আসছে বাঁশি শুনে রঙ্গীন হাওয়া বইয়ে সুরে সুরে মিলতে।

গান

দিনে রাতে মিলিয়ে দেওয়ার গান
রংএ রংএ—
ওই আকাশে লুকিয়ে ছিল
বাতাস বয়ে সেই তো এল
বাঁশির বুকে
রইলো বাঁধা সুরে সুরে।
এই বাতাসে লুকিয়ে ছিল
বেণু-বনের তলায় তলায়
আলো ছায়ার মিলিয়ে দেওয়া গান,
বাঁশি তারে বাঁধলো সুরে সুরে
এই বাতাসে রংএ রংএ।

(আত্মারামের প্রবেশ)

আত্মা। তোমরা থামো, আমি যাত্রা করি—

চিত্র। যাত্রা করলেই হলো ঝুপ করে!

আত্মা। গান শুনে কি চুপ করে বসে থাকা যায়?

চিত্র। তাই বলে যখন খুসি যাত্রা করবে না কি? সময় অসময় নেই!

আত্মা। অধিকারি তো এই রকমই হুকুম দিয়ে লিখন পাঠিয়েছে—

চিত্র। বটে, বটে, ভুলে গিয়েছিলেম! আচ্ছা—তাহলে তুমি নির্ভয়ে যাত্রা কর ওধারে।

আত্মা। ওধারে ভারি অন্ধকার, আমি এইখানেই বসে রইলেম।

চিত্র। যাত্রা করবে না?

আত্মা। না, আমার খুসি আমি বসে বসে তোমাদের যাত্রা দেখবো, গান শুনবো, নাচ দেখবো, আরামে—তবে আমার নাম আত্মারাম—

চিত্র। তোমার মতো আর কেউ কি যাত্রা করতে আসছে?

আত্মা। আসছে কি! ঐ দেখ, এসে পড়েছে।

(নহুষের প্রবেশ)

নহুষ। কই কোন্ দিকে গেলেন?

চিত্র। কাকে খুঁজছো?

নহুষ। আত্মারাম গান শুনে এই দিকে এলেন, তারপর আর দেখতে পাচ্ছিনে, হারিয়ে গেছেন।

কানু। এই যে এখানে চুপটি করে—

হারু। লুকিয়ে—

জালু। আমাদের গান শুনতে এসেছেন।

আত্মা। আরে চুপ! আমার এখন আত্মপ্রকাশের সময় হয়নি!

চিত্র। সময় আবার কি! আমাদের খুসি আত্মপ্রকাশ করতেই হবে তোমায়।

আত্মা। আমি আত্মপ্রকাশ করলে শুধু ছেলেরা নয়, তুমি শুদ্ধ অস্থির হয়ে পড়বে—রাগে ভয়ে দুঃখে সুখে হাসি কান্নায় মিলে একটা বিপর্য্যয় ঝড় বয়ে যাবে এখানটায়।

কানু। তা যাক—

হারু। আমরা ভয় পাই, পাবো—

জালু। ঝড় বইলে ভয়টা কি?

আত্মা। আত্মারাম যে দিন আত্মপ্রকাশ করবেন, সেদিন ভয় পাও কি না, দেখা যাবে। এখন ঐ নহুষের মুখ দেখে বোধ হচ্ছে যেন উনি প্রকাশ করতে চাচ্ছেন মনের কথা।

নহুষ। হে আত্মারাম! স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের মুখে এসে আটক থেকে আমার মন চঞ্চল হয়েছে, আমাকে যেখানে হয় একটা জায়গায় পাঠিয়ে দাও। খেয়া-নৌকোর মতো খালি এপার আর ওপার দুটোর মাঝে বাঁধা থাকতে চাচ্ছেনা মন।

চিত্র। গান গেয়ে মনটা খুসী করে নাওনা কেন!

নহুষ। স্বর্গে যাবার পথ পরিষ্কার করতেই আমার দিন গেছে—গান শেখবার সময় পাইনি। কেউ যে এখানে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে গান গাইবে, তেমন জায়গাও নয় এটা। দিন নেই রাত্রি নেই, এই বৈতরণীর ধারে বসে কেবলি শুনছি, পার কর পার কর বলে সবাই ছুটছে! জল ডাকছে পার কর, বাতাস গর্জ্জে বলছে পার কর! গান কর—এ কথা কেউ বলে না।

আত্মা। নহুষ, ঠেকে শিখেও তোমার চৈতন্য হলো না? আবার এখানটা থেকে পালাবার ইচ্ছে করছো!

নহুষ। তবে কি চুপ করে এইখানেই বসে থাকবো?

চিত্র। গান গাও না!

নহুষ। গাইতে জানলে কি এ দুঃখু পাই! ভাবতেমই না কোথাও যাবার কথা—বীণা বাজাতেম আর গাইতেম মনের আনন্দে যেখানে থাকি সেখানে।

আত্মা। আমি তো এখানটিতে বেশ আছি—অথচ গানও গাইনে, বীণাও বাজাইনে!

চিত্র। তাই এত করে বলেও তোমাকে আত্মপ্রকাশ করাতে পারলেম না! গান জানলে এতক্ষণ ছটফট্ করতে, আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যে।

আত্মা। কায নেই গানে! বেশ চুপচাপ থাচ্ছি-দাচ্ছি দিব্যি আরামে।

নহুষ। কিন্তু এই নহুষ হলেন একটু স্থূলকায়—ইনি তোমার মতো অতটা সূক্ষ্ম বুদ্ধি তো ধরেন না, কাযেই—

চিত্র। ইনি ছটফট করছেন ঘাটে-বাঁধা ঐ খেয়া নৌকোটার মতো—

আত্মা। তা তো দেখছি। কিন্তু ও বলতে চায় কি, তা বলে ফেলুক না!

নহুষ। মন যে কি করছে, কোথায় যেতে চাচ্ছে, তা আমি বলতে পারিনে—কিন্তু চাচ্ছে কিছু—

চিত্র। আচ্ছা, আমরা বলছি—দেখ দেখি মেলে কি না তোমার মনের কথার সঙ্গে।

গান

এপারে ওপারে
যাওয়া-আসা করে
ভরলো না তোর খেয়া তরীর মন—
সে যে কাঁদে সে যে বলে
বাঁধা রইবো না রে!
পারে পারে ঢেউ দিয়ে যায়
নদীর জলে, তালে তালে
নেচে চলে যে!
পারাবারের সেই সে হাওয়া
অকারণে কাছে আসে রে
দোল দিয়ে যায়
কয় সে কানে কানে রে
অকারণে!

নহুষ। মনের কথা টেনে বলেছ,—খুলে দেরে, খুলে দে কাযের বাঁধন, কুলের বাঁধন, বাঁধা পথের বাঁধন!

গান

ভেসে যাক্
কুল ছেড়ে কাং ভুলে
খেয়া তরী আমারি—
ভেসে যাক্
মনোতরী আমারি।
ঝড়ের হাওয়া
চলছে যেমন ধারা
চলুক তরী
ছুটুক্ বাঁধন-হারা—
ভেসে যাক্ বহে যাক্
চলে যাক্ ফেলে যাক
ভুলে যাক্ ঠিক-ঠিকানা
কাযের মানা—
বাঁধন-ছেঁড়া খেয়া তরী
আমারি আমারি।

আত্মা। নহুষ, আমার শরীরটার মতো দৃষ্টিটাও সূক্ষ্ম, জানোই তো!

নহুষ। জানি।

আত্মা। আমি সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখছি, তুমি এদের সঙ্গে গান গেয়ে যে দিকটার গা ভাসান দিতে চাচ্ছ, সে দিকটায় কি রয়েছে—

চিত্র। বলতো শুনি, কি রয়েছে—

আত্মা। তাহলে আত্মপ্রকাশ করতে হল আমাকে।

চিত্র। কতক কতক করেছো দু'চারটে কথায়! আর একটু বাদেই ঠিক ধরে ফেলবো, তুমি কি বস্তু!

কানু। নহুষ আত্মপ্রকাশ করেছেন—

হারু। এবারে তুমিও কর—

কানু। না হলে ছাড়চিনে—ফাঁদে পড়েছ এবার—

আত্মা। যাও, আমি আত্মপ্রকাশ করবো না।

চিত্র। তুমি বলেছিলে করবে, এখন পিছোও কেন?

আত্মা। আমার খুসি—

নহুষ। আচ্ছা, ঐ যে ও দিকটার কথা বলছিলে, ও দিকে কি যেন দেখতে পাচ্ছ—

আত্মা। তাও বলবো না, আমার খুসি। তোমার খুসি হয় গিয়ে দেখতে পাবো—ওদের সঙ্গে আমি তো যাচ্ছিনে।

নহুষ। তুমি যাবে না! এই তো খটকা লাগালে! আমার তো তাহলে পালানো হয় না, দেখছি!

আত্মা। পালাবার দরকার পালাটা কেমন হয়—এইখানে বসেই না হয় দুজনে দেখলেম, শুনলেম! ওরা যাত্রা করুক, আমরা বসে থাকি আরামে—এতে তোমার দুঃখুটা কি?

চিত্র। নহুষ, আমার সন্দেহ হচ্ছে, ইনি তোমারি আত্মা কি না!

আত্মা। কেন, সন্দেহের কারণ?

চিত্র। রাজার আত্মা হলে তোমার ধরণ-ধারণ অন্য এক রকমই হতো—বুক ফুলিয়ে চলতে, লড়ায়ের পথে পিছোতে না—

আত্মা। তোমরা এগিয়ে চলেছো, না, পালিয়ে চলেছো?

নহুষ। জবাব দাও!

আত্মা। আমি নিজের সিংহাসনে গট্ হয়ে বসে আছি, রাজার মতো—আর তোমরা ফুঁয়ে উড়ে চলেছ!

নহুষ। কোথায়, তা জানোই না—

চিত্র। তোমরা দুটিতে কোথায় বসে রাজত্ব করছো—তা জেনেছ কি?

(ঝরা ফুল, ঝরা পাতার প্রবেশ)

ফুল-পাতা। সেটা যেদিন জানবে, সেদিন আমাদের মতো পালাতে চাইবে, ঠিক বল্‌ছি।

গান

ঝরা ফুল পালিয়ে চলে
জানে না
ও সে কোন্ দেশে যে পালিয়ে চলে
জানে না, ধরা থাকে না।
ঘুর্ণী জলের গভীর ডাকে
দেয় সে সাড়া—
চলে যায় জানা-শোনার
জগৎ-ছাড়া নিরুদ্দেশে
আপন-হারা ভেসে ভেসে
চলে সে ঝড়-বাতাসে
ঝরা পাতার মেলিয়ে ডানা
কোন্ দেশে যে জানে না,
ধরা থাকে না।

নহুষ। তোমরা কে?

ফুল। আমরা ঝরা ফুল।

পাতা। আমরা ছেঁড়া পাতা—

নহুষ। গান গেয়ে চলেছ কোথায়? ওদিকে যে যমপুরী।

ফুল। আর ওদিকে?

নহুষ। স্বর্গলোক।

পাতা। ওধারে?

নহুষ। মর্ত্ত্যভূমি—

আত্মা। আর এদিকটা সব দিকের বার—

ফুল। কি বলিস ভাই, এ জায়গাটায় একটু রয়ে বসে গেলে হয় না?

পাতা। তাই ভাল।

আত্মা। রয়ে যাবার পক্ষে এ জায়গাটা মন্দ নয়। এস না, এখানেই বসে যাও।

(বাতাসের প্রবেশ)

বাতাস। এটা রয়বার জায়গা নয়, বয়বার জায়গা—বয়ে চল গান গেয়ে, রয়ে বসে চলা চলবে না,—নেচে যাও।

গান

তালে তালে নেচে চলে যে
সেই তো চলে সেই তো চলে রে—
সুরে সুরে গেয়ে বলে যে
সেই তো বলে সেই তো বলে রে—
পাতায় ফুলে দুলিয়ে দিয়ে যায়
বনে বনে যে সেই তো বলে রে
মনে মনে সেই তো বলে রে
মনের কথা বাঁশীর গানে
লুকিয়ে চলে যে সেই তো বলে
সেই তো বলে রে।

সকলে। চলে চল, রয়ো না এখানে—চল, বয়ে চল।

আত্মা। কোথায়—কোন্ দিকে?

নহুষ। কোথায় যাবো? কোন্ পথে?

আত্মা। নহুষ, কি কর? যাচ্ছো কোথায়?

নহুষ। তাই তো, কি করি! কোনদিকে যাই!

(ষাঁড় ও মহিষের মুখস-ধারী হর্ত্তা-কর্ত্তার প্রবেশ)

কর্ত্তা। ফের বাজে বকছো! বইখানাতে যেমন যেমন লেখা আছে, বলে যাও না।

হর্ত্তা। সেই হারাও কেন?

নহুষ। সব হারিয়ে গেল তো সেই! নিজেই যাই কোন দিকে ভেবে পাচ্ছিনে।

কর্ত্তা। ছোঃ, যাত্রা করতে এসেছিলে কি বলে?

নহুষ। হাওয়ায় মনটাকে শুদ্ধ, উড়িয়ে নেবার যোগাড় করেছে—

কর্ত্তা। এই নাও লেখা কাগজ—এইটে দেখে পাঠ বলে যেও।

গান

চলে নেচে চলে
বলে গেয়ে বলে
তালে তালে, সুরে
সেইতো বলে
সেইতো চলে রে
চলে চলে লুকিয়ে চলে
গানে গানে মনের কথা
সেইতো বলে সেইতো চলে রে
লুকিয়ে বলে লুকিয়ে চলে যে।

ফুল ফোটানো
আলোর ধারায়
সাঁতার দিয়ে যায়
ভেসে যায় গেয়ে যায়
সেই তো যায়
সেই তো গায়
ঝরা পাতার তালে তালে
যাবার বেলা যারা চলে
তারাই চলে
তারাই বলে রে
সাঁঝ সকালে
দলে দলে
তারাই চলে
তারাই চলে রে।

কালু। ওরে, একটা ষাঁড়—

হারু। ইস্, একটা মোষ!

ভানু। অন্ধকার হয়ে আসছে—

বাতাস। পালাই চল্—

ফুলপাতা। আমাদের গা কাঁপছে—

চিত্র। ভয় কি সাজা ষাঁড়, সাজা মোষ—

হর্ত্তা। এরা বলে কি? সাজা ষাঁড়! হাঃ হাঃ ও কর্ত্তা—,

কর্ত্তা। আবার কর্ত্তা কি! এখন আমি মহাকালের মাহিষ, আর তুমি—

হর্ত্তা। আমি যা, তাই। কি করতে এখানে এলেম, মনে পড়ছে না—

কর্ত্তা। তোমাকে নিয়ে কাজ চলা মুস্কিল। আচ্ছা, আমি কি করতে এসেছি, মনে আছে?

হর্ত্তা। তুমি কে ভালো, রোসো—

কর্ত্তা। চিনতে পারছো না? বাতাসটা পর্য্যন্ত যাকে ছুঁয়ে কালো হয়ে যায়, সেই কাল-পুরুষকে বহন করে চলি আমি, আমাকে চিনতে পারছো না?

হর্ত্তা। দেখতে পেলে তো চিনবো, তুমি আসামাত্র যেটুকু বা আলো ছিল এখানে, সেটুকুও পালাই-পালাই করছে।

কর্ত্তা। রসিকতা রাখো, যাত্রা হচ্ছে মনে থাকে যেন। ঐ দিক দিয়ে প্রস্থানের পথ, ওদিককার ভার তোমার উপর—তুমি ওধারে দাঁড়াও

হর্ত্তা। আর তুমি—

কর্ত্তা। ঢুঁসিয়ে যাত্রা করানোর ভার হয়েছে আ[illegible] উপর। এই পথ আগলে রইলেম—দেখি, কে আসে এবাগে—

হর্ত্তা। আমি দেখি, কে না যায় ওবাগে—

সকলে। তাহলে তো আমরা—আমরা—

(নেপথ্যে বাঘ)

বাঘ। (নেপথ্যে) গেলুম—

ষাঁড়। ডাকলো কি ও?

মহিষ। এ যে ভয়ের ডাক!

ষাঁড়। এ যেন বলছে, খেলুম—

মহিষ। তাই তো দেখছি—

সকলে। আরে দেখলে তো বুঝতুম।

চিত্র। সত্যি ভয়, না, মিথ্যে ভয়?

সকলে। এসে খালি শুনছি, গেলুম খেলুম এলুম।

বাঘ। হা, র, লু, ম্!

চিত্র। ভয় কি? ঐ শোনো ভয় বলছে, হারলুম।

ষাঁড়। ঠিক বুঝতে পারলুম না। মনে হচ্ছে যেন বলছে, এই ঘাড় ভাংলুম্!

কর্ত্তা। বোধ হয় কেউ যাত্রা করতে আসছে। ঠিক হয়ে থাকো, ওর প্রবেশ-পথে তুমি, প্রস্থানের পথে আমি।

হর্ত্তা। প্রস্থানের পথে তো আমার থাকার কথা—বা!

কর্ত্তা। না হে, সেটা আমার বলার ভুল হয়েছিল—

হর্ত্তা। আচ্ছা,ভুলটা এ ক্ষেপের পরে শুধরে নিলেই হবে।

কর্ত্তা। ও তো দেখি এদিকেই যাত্রা করতে আসছে। আমরা তাহলে আমাদের যাত্রাটা ওদিকে গিয়ে করি না—কি বল?

হর্ত্তা। কোন্ দিকে? অন্ধকারে দিক্‌-বিদিক হারিয়ে বসে আছি যে।

কর্ত্তা। আরে ওই যে গো গ্রীণ-রুমটার দিকে চটপট চলে এস না।

হর্ত্তা। কারু প্রবেশ না হতেই আসরখানি রেখে পালিয়ে যাওয়াটা কি ভাল হবে। এই অন্ধকারেই কোন রকমে গা-ঢাকা হয়ে থাকা যায় না?

কর্ত্তা। বাঘে-গরুতে একসঙ্গে যাত্রা তো কেতাবে লেখা নেই! এই দেখ, তোমার আমার নামের নীচে অধিকারি নিজে লিখেছেন ব্রাকেটের মধ্যে,—প্রস্থান করহ।

হর্ত্তা। প্রস্থান তো দেখছি আছে লেখা কিন্তু ভয়ের ডাক শুনে হাত-পায়ে যে খিল ধরে গেল!

কর্ত্তা। দেখ, না যাও তো তোমাকে আমি ঢুঁসিয়ে প্রস্থান করাবো।

হর্ত্তা। আমার বোধ হয়,ছাপার ভুল আগাগোড়া হয়েছে বইটাতে। আমাদের প্রস্থানের পরে কারু প্রবেশ তো থাকা চাই—দেখ ফাঁক।

কর্ত্তা। সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?

সকলে। আমাদের পাট আমরা এ্যাক্ট করে গেলুম—

চিত্র। বাস্, ফুরিয়ে গেল কায—

ষাঁড়। আবার যদি এখানে পুনঃ-প্রবেশ করতে হয়—

মাহষ। আবার ঘাড় ধরে ঠেলে পাঠাব এখানে।

ষাঁড়। এ কেমন যাত্রা ভাই, বোহসেবি রকম—?

মহিষ। মাথামুণ্ডু কিছুই নেই—প্রস্থান আর প্রস্থান!

(জাল দড়ি হাতে কালকেতুর প্রবেশ)

কাল। প্রস্থান নয়, প্রবেশ। ঢুকতে না ঢুকতেই বলে, প্রস্থান! এ জাল দাড় দড়া নিয়ে কি নড়া সহজ! বোসো মশায়, নিজেই নিজের জালে জড়িয়ে গেছি, ফাঁসগুলো একটু এলিয়ে নিই, তবে তো চলবো। সঙ্গে যমদুতের মতো কটা যে আসছিল, গেল কোথায়? আমার আগেই তারা প্রস্থান করল নাকি? ও কে ও, চুপি চুপি আসে।

(চোরের প্রবেশ)

চোর। চুপ্, অত চেঁচাও কেন?

কাল। কে তুই ?

চোর। অপরে বলছি।

কাল। হাতে ও কি ?

চোর। এ আমার—

কাল। কি ওটা ?

চোর। সিঁদ-কাঠি!

কাল। সিঁদেল নাকি ?

চোর। না, আমি চোর-চক্রবর্ত্তী!

কাল। তবে তো সাবধান হতে হল, কাছে এগিয়ো না—ঐ ও কোণটাতে বোসো।

চোর। ভয় নেই, তোমার জালটার আগাগোড়াই ফুটো, সিঁদ দেবার দরকারই হবে না।

কাল। নাঃ, তুমি আসল চোর নও।

চোর। কেমন করে জানলে?

কাল। কথাতেই ধরা গেছে। ফুটোফাটা তুমি বাছো!

চোর। তুমি সত্যি ব্যাধ নও—

কাল। হাঁ আমি কালু ব্যাধ কালকেতু।

চোর। কখনই নয়। ব্যাধের চোখ কি অমন খঞ্জন পাখীর মতো নেচে বেড়ায়—বাজ পাখীর মত সুঁচ দৃষ্টি ব্যাধের!

কাল। যে অন্ধকার,—এখানে সুঁচ গলেনা কিন্তু তবু তোমায় চিনি-চিনি করাছ। আমাদের হারু নয় তো!

চোর। হারুই এসেছেন বটে। পথ হারিয়ে তোমার গলাটা যেন শোনা শোনা বোধ হচ্ছে যে—কালু নয়?

কালু। আমার দিকে চেনা তোমার দিকে শোনা—

হারু। চেনাশোনা হয়ে গেল তো এখন—

কালু। তোমার সঙ্গে সান্ধ—

হারু। সান্ধ দিতে আমি চিরকালই মজবুদ—

কালু। আর ফান্দতে আমায় পেরে ওঠা শক্ত। আমার দেবীও আমার ফাঁদে আটকে পড়েছিলেন মনে আছে?

হারু। কিন্তু যমের ফাঁদে তো এড়াতে পারছো না, দাদা!

কালু। তুমিই কি যমের সঙ্গে সন্ধি দিয়ে বসে আছ নাকি!

হারু। যমের বাড়ীতে সিঁদ দিয়ে সোজা গিয়ে যখন উঠবো স্বর্গের দুয়োরে, তখন দেখবে—

কালু স্বর্গের দুয়োরেই হারু আমাদের আটকে আছেন—

হারু। এবং আস্তে আস্তে দেবলোকের দেঁউড়িতে সিঁদ কাটছেন।

কালু। তারপর—

হারু। সব কথা তোমার কাছে ফাঁস করবো নাকি?

কালু। দেবলোকের মেঘ আর হাওয়ার পাঁচিলে

ফুটো করবার জন্যে অমন ভারি সিঁদ-কাঠিটা বয়ে আনবার প্রয়োজনটা কি ছিল ?

হারু। আরে, আসবার সময় কি অতটা ভেবে এসেছিলেম! একটা সেঠির বাড়ীতে সিঁদ দিতে হঠাৎ দেয়াল চাপা পড়লেম, তারপর আসবার সময় কি জানি যদি কাজে লাগে, এই ভেবে সেখানে তারা জপমালার মতো এটা আমার হাতে গুঁজে দিয়েছে—

কালু। আমি তো গুর্জ্জর দেশে রাজত্ব করছিলেম, পাখি ধরার কম্ম প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেম, আসবার কালে সেখানে তারা ভাবলে, আমি চল্লেম আর আমার জাল-দাড়িগুলো স্বর্গে যাবে না, তাই এগুলো পায়ে পায়ে সঙ্গে এলো। ভাবছি, এখানেই এদের ঝেড়ে ফেলে হাল্কা হয়ে চলে যাই!

চোর। অমন কায করো না—পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে রেখো।

কালু। দেখ্ দেখ্ একটা ছাগল তাড়া করেছে একটা কাকে!

চোর। মানুষটাকেও দেখতে যেন ছাগলের মতো, টেরীর দুপাশে চুলের গোছা যেন ছাগলের শিংএর মতো পেঁচিয়ে উঠেছে।

কালু। গলায় গাঁদা ফুলের মালা, কপালে সিঁদুর!

(সবেগে ছাগল ও পাণ্ডার প্রবেশ)

ছাগল। (ঢুঁ দিয়া) ও দিকে যাচ্ছ কোথায়?

পাণ্ডা। রও, গতিরোধ করোনা।

ছাগল। গতি হবে, এখন কেমন লাগছে? (ঢুঁ)

পাণ্ডা। আরে যাচ্ছি! উঃ লাগে যে! আরে বাপু বলি দিয়ে তোকে বাসনা-মুক্ত করে স্বর্গে পাঠিয়ে দিতেই তো চেয়েছিলেম—এতে রাগ কর কেন।

ছাগল। আমিও তোমাকে একটুখানি পিট চুলকে দিয়ে সেখানে পাঠাচ্ছ আরামে, এতে উ-আঁ কর কেন? (ঢুঁ)

পাণ্ডা। যাচ্ছি, যাচ্ছি, গেলেম— (প্রস্থান)

কালু। আমাদেরও এমনি ঢুঁ দিয়ে স্বর্গে পাঠাবে নাকি?

হারু। আমি কিছুই স্বর্গে পাঠাতে চাইনি। যা কিছু ছিল সব মাটিতেই পুঁতে এসেছি চিরকাল, আমার ভয় নেই।

কালু। জাল আটা কাঠি ফাঁদ নিয়েই ছিল কারবার—কত কি ধরেছি—তার ঠিক নেই (জাল-হাতে ধীবরের প্রবেশ) ও বাবা, এ আবার কে আসে? আমাকে জালে ফেলবে নাকি?

জেলে। ধরে নেবো গো, ভয় নেই।

গান

জাল ফেলেছি—জাল ফেলেছি—
বারে বারে প্রেমেরি জাল
তোমায় ধরবো বলে—
নয়ন-জলে ফেলেছি জাল।
ধরা দিল না রে
চপল চোখের চাউনি, তাও
ধরা দিল না হারে!

হারু। এ লোকটা তো চেনা বোধ হচ্ছে?

কালু। ওর হাতে যেটা সেটাকে চিন্‌লেম জাল বলে, কিন্তু—

হারু। ওকে চিনলে না! ও যে আমাদের জালু!

কালু। আরে দুর! সে নেংটি পরে বেড়ায়, আর এর মাথায় জরির তাজ, শাল দোশালায় সাজা, দেখছিসনে!

হারু। রোস্‌তো শুধোই—আপনার নাম?

জালু। আমার চিনবে না! আমার নাম নেই।

কালু। নাম একটা নিশ্চয় আছে।

হারু। ধুমধাম খুব তো দেখছি।

জালু। বলছি আমায় চিনবে না। আমার নাম নেই, আমি আরব্য উপন্যাসের দেশ থেকে আসছি।

কালু। লোকটাকে তো ভাল বোধ হয় না।

হারু। আপনি তাহলে?

জালু। টাইগ্রীস আর ইউফেটিকের মাঝে জাল ফেলে জালা ধরতুম।

হারু। তার মধ্যে নতুন কিছু থাকতো, না, শুধু জল?

জালু। আল্ মারিদ্।

কালু। সে আবার কি?

জালু। জিন্!

হারু। জিন্ তো ঘোড়ার পিঠে থাকে।

জালু। দৈত্য—

কালু। আরে বাস্! দেখুন, তাহ'লে আপনার জায়গা তো এদিকে নয়—আপনি ভুলে এসেছেন।

হারু। আপনার প্রবেশটার কোন ভুল হয়নিতো? যাত্রার শেষ হবো-হবো সময়ে কি—

জালু। শেষ হবো-হবো সময়ে যে কি, তা আমার মনে নেই, হাকিম দাঁদাঁ আমাকে বল্লেন, সময় হয়েছে,—আমি চলে এলুম।

কালু। দাঁদাঁ আবার কে? ওই অন্ধকারে যিনি দাঁত বের করে হাসছেন, উনি না কি?

জালু। আমি যেখানে চার রংএর চার মাছ ধরেছিলেম, সেই হ্রদের ধারে এক বাদশা ছিলেন, যাঁর রান্নাঘরে ভাজা মাছ উল্টোতে গেলেই মাছগুলো হেসে ফেলতো, সেই বাদশার এক হাকিম ছিল, নামতার দাঁদাঁ—

কালু। এমন অদ্ভুত নাম তো শুনিনি?

হারু। এর সবই অদ্ভুত! মাছে কখনো হাসে?

কালু। তা হ'লে বল না পাখির মতো মাছও গান গায়!

হারু। পাখির গান তো শুনেছি, মাছের গান!

কালু। শোনোনি! আমি অনেকবার শুনেছি, নাচ পর্য্যন্ত দেখেছি।

কালু। কই, একবার দেখিয়ে দাও তো জী।

জালু। তা হলে দৈত্যটাকে ডাকা যাক একবার।

কালু। আবার দৈত্যকে কেন?

হারু। মাছের নাচ থাক, আর কিছু নাহয় হোক!

জালু। দেখছো সুলেমানি সিল।

হারু। সিল কই? একটা তো সিসের আংটি।

জালু। এইটি ঘসবো আর দৈত্য আসবে।

হারু। জোরে ঘসো না, সিসে ক্ষয়ে যাবে।

কালু। থাক্ না দৈত্য তুমি আঁটিটা পরে ফেল তো!

জালু। মাছ কি জল ছেড়ে অমনি আসবে সহজে!

কালু। থাকনা বাপু জলের মাছ জলে।

জালু। দৈত্যটা সমুদ্র-সুদ্ধ মাছগুলোকে এখানে এনে ফেলবে আঁজ্‌লা আঁজ্‌লা, তবে তো মজা!

হারু। এমন মজায় কায নেই।

জালু। আরে দেখই না!

কালু। আরে রাখ না!

(সমুদ্রের দৃশ্য—মাছ কিলবিল করছে)

হারু। ইস্, এ যে মাছের বিষ্টি নামলো!

কালু। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে—

জালু। ঐ শোনো, গাইছে—

গান

অতল জলের তলে তলে
মাণিক জ্বলে প্রদীপ জ্বলে
আমার মনের মানস যত
সেই আলোতে তলিয়ে চলে।
সুনীল জলের ফেনিল মালা
সাজিয়েছে যার বরণ-ডালা
তার মিলনের বাসর পানে
পলে পলে মালস চলে।
জলের বুকে উঠছে যে ঢেউ
তারি তলায় তারি তলায়
মন যে আমার থেকে থেকে
খেলতে পালায় খেলতে পালায়—
রূপ-হারাণো রঙ্গীন জলে
রং-হারাণো রূপকে তুলে
দুলিয়ে খেলি ভাসিয়ে চলি
নয়ন-জলে নয়ন-জলে।

হারু। জলের মধ্যে আরো সব কিলবিল করে বেড়াচ্ছে কি!

কালু। যেন একএকটা জালা আসছে ভেসে—

(জলমগ্ন কনসার্ট পার্টির প্রবেশ)

১। জালা কি! আমি ফ্লুট্, জলে ভিজে ফুলে উঠেছি।

২। আমি বেহালা তথৈবচ।

৩। আমি মৃদং ভিজে গলিতপ্রায়।

৪। আমি হারমোনিয়া তিন সপ্তক সুরে একেবারে জল করে ছেড়েছি।

৫। আমি বাঁয়া-তবলা একসঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছি।

৬। আমি বাস্।

চিত্র। তোমাদের বাজাবে যে, সে কোথা?

কনসার্ট। বাজাবে আবার কে! আমরা বাজনদারের ধার ধারিনে।

নহুষ। এরা যে আবোল-তাবোল কি বলে, বুঝিনে!

কনসার্ট। বোঝবার দরকার কি! কানের ফুটো দিয়ে যখন আমরা মর্ম্মে গিয়ে ধাক্কা দেবো, তখন—

নহুষ। তখন কি?

চিত্র। মর্ম্মান্তিক সুর উঠবে।

কনসার্ট। আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে, বাজাতে হয়তো বল, নয়তো যাই—

কালু। আচ্ছা, ফোঁকো শিঙ্গে তবে,—আমি পাখি ধরার গান ধরি—

গান

তোমারে আমার এ বাঁধনে
ধরে রাখি কেমনে
নীল আকাশের রঙ্গীন পাখি!
অচিন পাখি লুকিয়ে থাকো
ফুল-বনে
শুধু ডাকো মোরে ডাকো
গোপনে!
সমীরণে কেমনে
নয়নে নয়নে
ধরে রাখি!

হারু। কই তোমরা কেউ যে সুর ধরছো না!

(পুলিশের প্রবেশ)

পু। আমরা কি সুর ধরি? আমরা চোর ধরি।

চিত্র। এখানে চোর পুলিশ সব এক সঙ্গে ধরা গেছে—বাকি আছে শুধু সেই, যে ধরা দেয় না যাকে তাকে।

হারু। সুরে সুরে চোরের মত সুড়ঙ্গ কেটে তাকে গিয়ে ধরতে হয়।

গান

ধরি ধরি করে পালায় যে
তারে ধরে কে তারে ধরে কে
সোনার হরিণ বাঁশী শোনে
বাঁধা পড়ে কি!
মালায় গাঁথা ফুল সে
ধরা থাকে কি!
পালিয়ে যায়—
ধরি ধরি করে পালিয়ে যায়
স্বপন-পুরে, লুকিয়ে রয় সে।
বিনা তারের বীণায় যে সুর নাচে,
তারের বীণার বাঁধন সে কি যাচে!
পালিয়ে যায়—
তার কেটে সে যে পালিয়ে যায়
দূরে দূরে, হারিয়ে যায় রে।

হারু। ও জমাদার সাহেব, অমন চোরের মতো অন্ধকারে লুকুচ্ছো কেন! ধরসে না এগিয়ে এসে সুর।

জমা। এই ধরেছি—

হারু। এই পালিয়েছি—

কনসার্ট। আমরা সুর ধরছি এবারে—

(বিকট শব্দ)

চিত্র। বেসুর হচ্ছে?

কালু। কিসের বাজনদার—

হারু। সুরটুকু ধরতে জানো না?

সকলে। ছোঃ!

জমা। কেউ গান ধর না—কি করছো বসে?

হারু। এদিকে বাজনদার, ওদিকে জমাদার সুরের দুয়োর আটকেছে যে!

চিত্র। আটকেছে না কি? তাহলে আমি চিত্রকর আছি কি করতে! ওরে রং আন্‌তো,—জ্বেলে দে রংমশাল—জুড়িতে গান ধর—

গান

জ্বলে জ্বলে রঙ্গীন আলো
জলে স্থলে,
সাঁঝ সকালে বাইরে ঘরে
দিনের শেষে রাতের পারে
সুরে ঢালা রঙ্গীন আলো
আমরা জ্বালি তুমি জ্বালো,
আগুন-ঢালা বরণ-মালার ছলে।
দোলে রে রঙ্গীন আলো দোলে
চোখের তারায়
হাসির ছলে দোলে।
ঝরে রঙ্গীন আলো
নয়ন জলে ঝরে
ঝরে বুকের পরে
ফুলের হারে
শিশির-ভেজা
পাতায় পাতায়
ঝলে।

(বৈরাগীর প্রবেশ)

বৈ। রঙ্গরসে মেতে পারের কথা ভুল্লে যে—

"ভাব দেখি মন সেদিন কেমন

যেদিন জীবন যাবে রে—"

জানু। চোপ রও!

বৈ। "শমন এসে ধরবে কেশে"

কালু। এ বৈরিগীটা এখানে কোত্থেকে এল?

হারু। এ যে বইয়ের পাতা উল্টেই চল্লো।

বৈ। বাবা, তোমরা এ সব কি ছেলেমানুষি করছো! এ সময় কোথা দুটো ঠাকুর দেবতার নাম করবে, না, কন্সার্ট বাজিয়ে গান ধরেছো!

কালু। একটু আহ্লাদ করছি, তাতে দোষ কি হল?

হারু। এ প্রহ্লাদ নয়, এবা আহ্লাদ করে

জালু। যাকে বলে আমোদ আহ্লাদ, তাই।

বৈ। থাকতো প্রহ্লাদ তো গান শুনে প্রাণ খুস হতো—

ষাঁড়। প্রহ্লাদ নেই তাঁর গুরু আছেন, দেখছো?

বৈ। আরে তেড়ে আসে যে—

ষাঁড়। যাও, প্রস্থান—

কানু। বেশ আনন্দে ছিলেম নানা পক্ষী এক বৃক্ষে কোথা থেকে—বৈরিগিটা এসে মন খারাপ করে দিয়ে গেল।

হারু। ওকে দেখেই আমার সেই দেশের কথা মনে পড়ে মন খারাপ হয়ে গেল। সেখানে একটা ঠিক ঐ রকম ভিখিরী আসতো, মনে আছে!

কালু। খুব মনে আছে।

জানু। সেই আমি একদিন একটা খেলনা-ওয়ালার কাছ থেকে মাছের ঝারা কিনেছিলেম, তুই একটা তীর ধনুক, আর হারু একটা বাঁশি কিনলি—

জালু। বৈরিগিটা কোথায় ছিল, এসে বল্লে, বাবা আমার বেলায় পয়সা বার হয় না, খেলনার বেলায় খুব—

হারু। আমরা কাবুলিওয়ালার ঝুলিতে লুকিয়ে বোম্বাগড়-মুল্লুকে পালিয়ে যাবার ফন্দি এঁটে ছিলুম—বৈরিগিটা আড়াল থেকে শুনেছিল—

জালু। মনে নেই ভয় দেখালে পুলিশে দেবো বলে!

কালু। আর সেই সময় কাবুলি তাকে ধমকে উঠলো।

হারু। কাবুলি আমাদের কত জিনিষ দেবে বলেছিল!

কালু। সা-মোরগের ডিম,

হারু। আলাদিনের পিদিম,

জালু। জলগুজিয়ার জালা।

কালু। মন খারাপ হয়ে গেল। এখানে আর ভালো লাগছে না। সেখানে কেমন আনন্দে ছিলেম জাল দড়ি ধনুক-বাণ খেলা-ধুলো নিয়ে!

জালু। আমাদের সেই নদীর ধারে ঘর, সেই নদীর চরে ঝিক্‌মিকে বালি, সেই সকাল-সন্ধ্যের তারা, সেই ঘরের মধ্যে মিট্‌মিটে আলো, ঘরে-বাইরে মনের মতো খেলা মনের মানুষদের সঙ্গে—

হারু। ভেল্‌সা তামাকের মতো সময়টা কেমন বিশ্রী লাগছে, দেখছিস ভাই?

জালু। তলবের নামটি নেই।

সকলে। অন্ধকারটা আবার যেন চেপে এলো।

জালু। ঘাড়ে পড়বে নাকি?

হারু। হাঃ, এ কি মাটির দেয়াল যে ঘাড়ে পড়বে?

জালু। জলে-ভরা কালো চোখের মতো ঝক্ ঝক্ করছে, দেখ না।

চিত্র। কালো চোখে আলো আছে—গান গাও, গান গাও।

গান

তোমার ঐ কালো চোখের
ঝিলিক দিয়ে চাওয়া
মন-মাতানো রে
মন-ভোলানো
কালো মেঘের শীতল হাওয়া।
তোমার ঐ কাজল-পারা
দুটি চোখের কালো তারা
কালোর স্বপন ভরা
কাজল রাতের চাওয়া
বাদল মেঘের
আড়াল দিয়ে চাওয়া—

(দাঁড়ির প্রবেশ)

আত্মা। তুমি কে ?

দাঁড়ি। দেখতে পাচ্ছনা, দাঁড়—

নহুষ। এ যে দাঁড়ি—

কালু। দাঁড়ে বাঁধবে ?

হারু। দাঁড় টেনে পার করবে ?

জালু। না, দাঁড় করিয়ে রাখবে সবাইকে।

দাঁড়ি। চুপ্ একদম চুপ—

নহুষ। এ যে বিষম দাঁড়ি টেনে দিলে খচ্ করে—

আত্মা। সব রঙ্গরসের ফুল-ষ্টপ—

চিত্র। দাঁড়ি আছে, কসি নেই না কি ? কসে সুর ধর—একেবারে লম্বা কসি টেনে চলতো দেখি, বাঁশিতে সুরের টান লাগাও সোজা—

গান

তরল সুরে সরল বাঁশী
বাজাতে জানে
জানে সে মন টেনে নেয়
মনের গানে —
সুরে সুরে মনকে টানে
নয়ন-জলে ভাসিয়ে টানে।
উদাস-করা
চোখের দেখার ওই ওপারে
সুরে ধরা দেয় যেখানে
গহন বনের মনের বেদন
গানে গানে, মনে রে নেয় সেখানে।

হারু। তাঃ বল্লেই যাত্রা করবো, বল্লেই থামাবো না কি !

জালু। তেমন ছেলে আমরা নই।

কালু। ধরতো সবাই যাত্রার গান—

মনে বেদনা বাজে
প্রাণ কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে
আজ এ
ভোলা কথা বুকে বাজে
সুখে বাজে দুখে বাজে
রাতে বাজে দিনে বাজে
ঘুমে বাজে জাগরণে
মনে আজ এ।
অকারণে মনে আসে
ভুলে থাকা।
বেদনারি সুরে সুরে
বুকে বাজে বারে বারে
ভুলে থাকা।
বাঁশী বাজে কাছে দূরে
বাজে থেকে থেকে কাঁদে হারে
জলে ভরা আকাশেরি মাঝে
আজ এ।

আত্মা। থামো, থামো, আমি এইবার আসছি আত্মপ্রকাশ করতে, ঝড় উঠবে, বাজ পড়বে—সাবধান, সাবধান—

চিত্র। ভয় কি, গেয়ে চল

গান

ভয় কিরে আজ পড়ুক না বাজ
অন্ধকারে বুক চিরে
ভয় কিরে ভয় কিরে ভয় কিরে
মেঘের পারে চাঁদ লুকালো বলে
ভয় কি যেতে আঁধার ঠেলে চলে
বিনা আলোয় আলোর খোঁজে রে
ভয় কিরে
আঁধার করা ঘরের স্বপন
লাগলো মনে যার
ভয় কি আছে তার
চল্‌তে পথে আঁধার রাতে
ঠিক ঠিকানা পায়।
কালোয় কারো পথ ধরে দেখ
অভিসারে চলো দিন
নিভিয়ে দিয়ে সকল আলো
রাত চলেছে বাজিয়ে বীণ—
অন্ধকারে লুকিয়ে নিজে
আছে যেজন ঐ তীরে,
তারি পানে চল্‌চে তরী
অন্ধকারে বুক চিরে—
ভয় কি রে ভয় কি রে !

(গুরু মশায় ও বৈরাগীর প্রবেশ)

গুরু। নচ্ছার ছেলেরা।

বৈ। ইস্কুল পালিয়ে যাত্রার দলে ভিড়েছে।

কালু। আঃ, মারেন কেন ? যাচ্ছি।

গুরু। বেরো বল্‌ছি।

জালু। পালিয়ে চল না—আঃ, কাণ মলেন কেন !

হারু। আমি পড়বো না, যাত্রাই করবো, যাও—কি করবে ?

দাঁড়ি। থামো।

চিত্র। এইবার আসল পালা।

যবনিকা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রেম-মহাবিদ্যালয়

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ

নাম শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না, এক কাল্পনিক বিদ্যা-ঠের কথা বলিতে বসিয়াছি। এই মহা-বিদ্যালয়টি দ বৎসর পূর্ব্বে দেশভক্ত রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বাহাদুরের ও অর্থে বৃন্দাবনে খোলা হয়—এবং আজ আকারে-আয়োজনে, সাজে-সরঞ্জামে ও কার্য্যকারিতায় এই বিদ্যালয় এক বিশাল বাণী-ভবনে পরিণত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যাহা স্বতঃই শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করে—সে কথা পরে বলিতেছি।
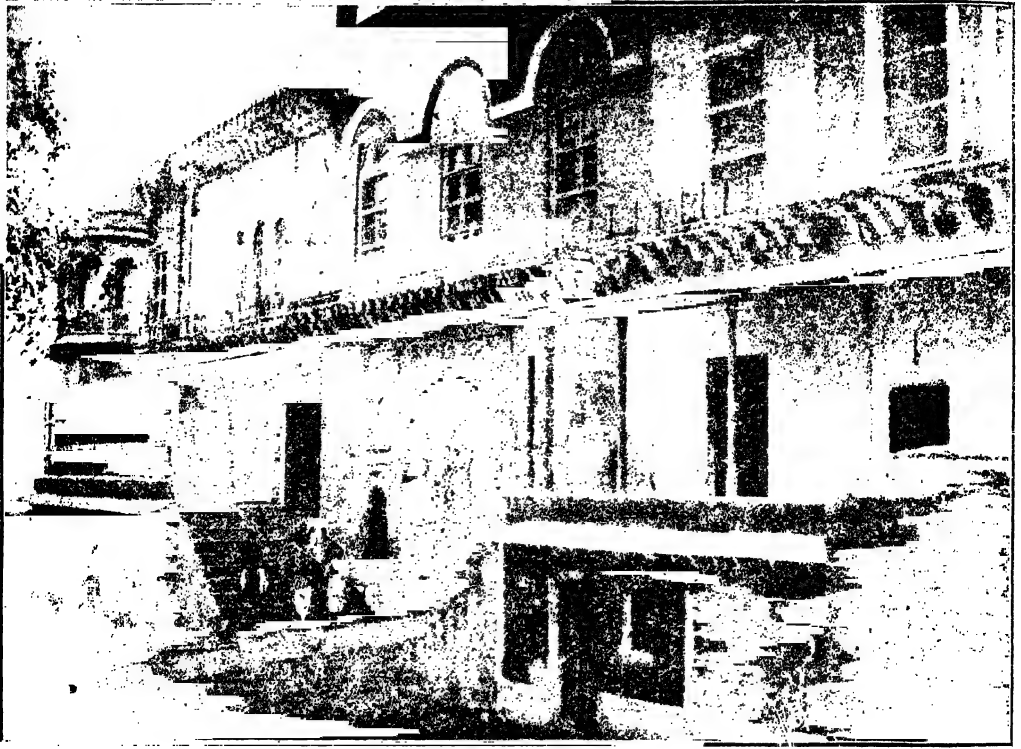
প্রেম-মহাবিদ্যালয়—সামনেকার দৃশ্য

আজকাল—শুধু আজকাল বলি কেন,—বরাবরই আমাদের দেশে শিক্ষা যে প্রথায় চলিয়া আসিতেছে,তাহাতে আমরা ঠিক তৃপ্তি পাইতেছি না। তাহাতে না পাই মনের খোরাক, অথচ শরীরের খোরাকও সংগ্রহ করিতে পারি না। চৌখস মানুষেরই বা সৃষ্টি হইতেছে কৈ? বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া আদালতে ভিড় জমাইয়া অর্থ বা শান্তিই পাইতেছি কি? অন্ন-সমস্যা যেমন তেমনি রহিয়া যাইতেছে। রাশ-রাশ পাশ করিয়া শতকরা একজনের হয়তো অবস্থা ফিরিতেছে, বাকী ৯৯জন অতৃপ্তির নিশ্বাস টানিয়া কোনমতে দিন-গুজরান করিতেছি।

দেশ-নেতারা বক্তৃতা করিয়া আসর মাতাইতেছেন,—চাকুরি ছাড়ো, আদালতের নেশা কাটাও, হাতে-কলমে কাজ কর—কিন্তু তার ব্যবস্থা কোথায়? ভদ্রলোকের ছেলে সত্যই কিছু কামার-শালে গিয়া হাতুড়ি পিটিয়া কাজ শিখিতে পারে না! আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার বন্দোবস্ত হইতেছে। ব্যবস্থা পাকা হইলে অবস্থা ফিরিবে বলিয়া আশা হয়।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে দেশভক্ত রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ মানস-নেত্রে দেশের ভবিষ্যতের ছবি দেখিয়াছিলেন। তাই ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃন্দাবনে এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নগরের বাহিরে বিদ্যালয়—কোন কলরব নাই, কোলাহল নাই,—প্রচুর আলো ও হাওয়ার ঝর্ণার মধ্যে

ছাত্রদের কাঠের কাজ শেখানো হইতেছে
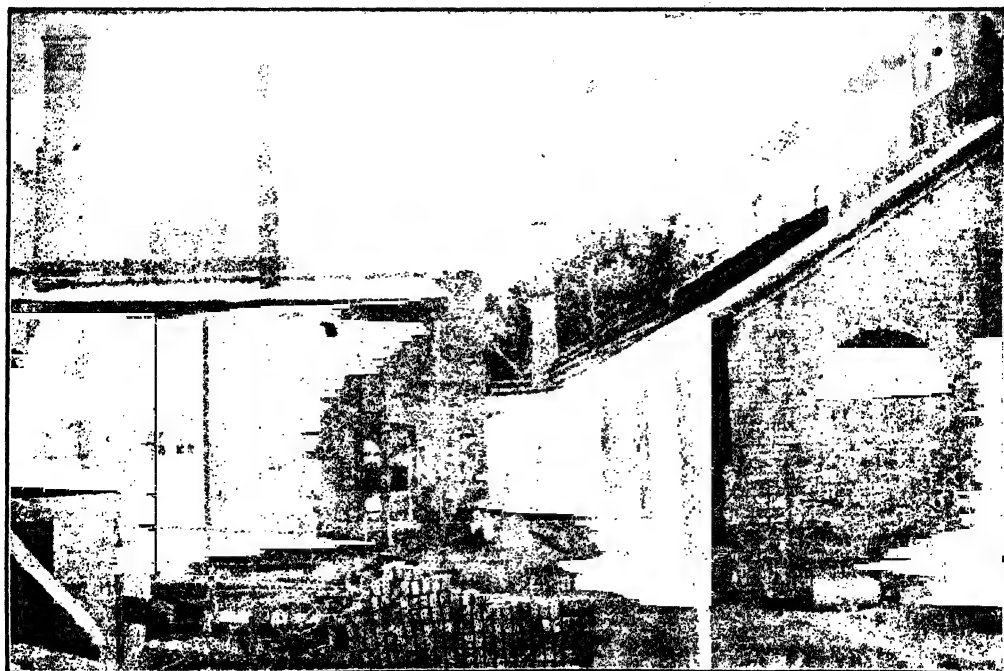
ওয়ার্ক-শপ

কমার্শ ক্লাশ—টাইপ-রাইটিং ও শর্টহাণ্ড প্রভৃতি শেখানো হইতেছে

উদ্যান-বাটিকার মতই মনোরম গৃহ। শরীর ও মন যেন সেখানে অপ্রফুল্ল বা অবসন্ন হইতে জানে না। বিদ্যালয়ের ঠিক নীচে যমুনা—চড়া পড়িলেও বর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া যায়—তখন সেখানকার দৃশ্য যা হয়, সে অপূর্ব্ব !

এই বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একটি কমিটি আছে। একজন জেনারেল ম্যানেজার আছেন, মন্ত্রী—তিনি বেতন লন্ না। তাঁর সহায়ক আছেন, আরো বিস্তর সদস্য আছেন। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক-বিভাগে একজন করিয়া কর্ত্তা আছেন ; তাঁরা মন্ত্রীর অধীন। তা ছাড়া একজন legal adviserও আছেন।

এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় তিন রকম।

১। বিদ্যালয় সাধারণ-শ্রেণী—শিক্ষার সহিত লিখন

২। শিল্প-শ্রেণী—শিল্পশিক্ষার সহিত সাহিত্য-শিক্ষা।

৩। বাণিজ্য-শিক্ষা

প্রথম বিভাগে—প্রাথমিক বাল-শিক্ষা। এ বিভাগে সাতটি ক্লাশ আছে। এই সব ক্লাশে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, ড্রয়িং, অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া সেলাই, খেল্‌না তৈয়ার, ছুতোরের কাজ—এই তিনটির মধ্যে একটি কাজ এই বিভাগে শিখানো হয়। এবং প্রত্যেক ছাত্রকে এই তিনটির মধ্যে একটি বিষয় শিখিতেই হইবে—ইহাই নিয়ম।

বাল-শ্রেণীর পর—অর্থাৎ সাত বৎসর এখানে কাটাইয়া
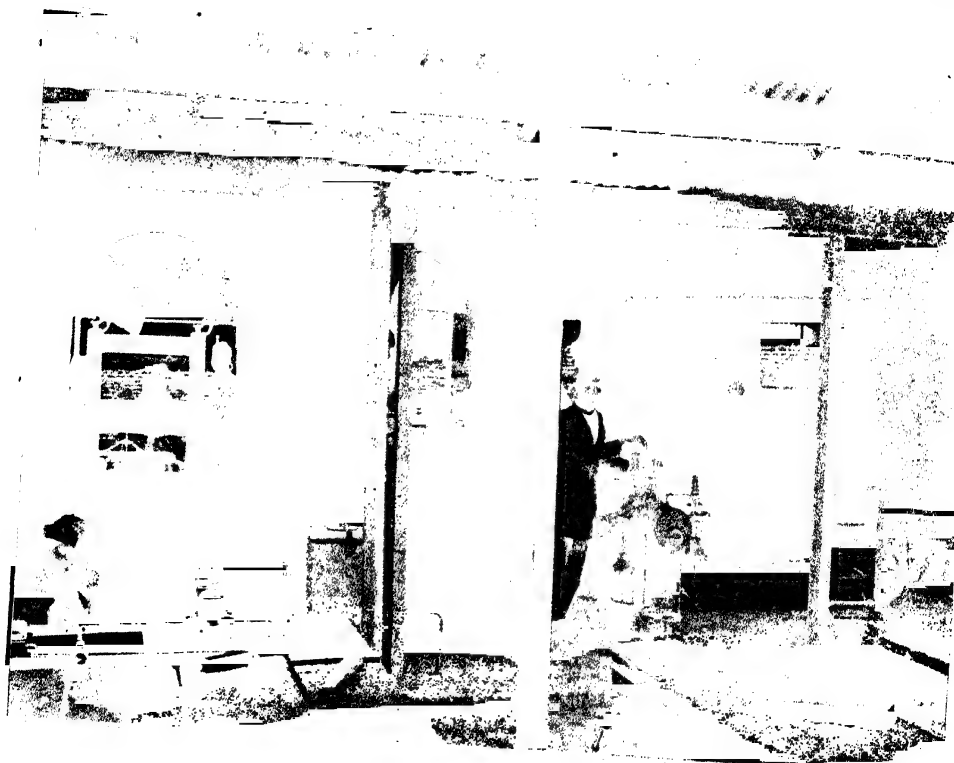
মেকানিকাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাশ

ঔদ্যোগিক শ্রেণী। এই শ্রেণীতে ম্যাট্রিকুলেশনের উপযোগী বিষয়সমূহ পড়ানো হয়। এ শ্রেণী হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় বিভাগ, শিল্পশ্রেণীতে ছয়টি উপ-বিভাগ আছে—

১। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

২। কাঠের কাজ

৩। গালিচা তৈয়ার

৪। কাপড় বোনা

৫। খেলনা ও বাক্স তৈয়ারী

৬। লোহা ঢালাই

এই বিভাগে গণিত ও হিন্দী এবং প্রেসের কাজও শেখানো হইয়া থাকে।

তৃতীয় বিভাগ, বাণিজ্য-শিক্ষা। প্রেম-বিদ্যালয়ের ছাত্রও এ বিভাগে ভর্ত্তি হইতে পারে। তবে তার পক্ষে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হওয়া বা তদনুরূপ শিক্ষা থাকা দরকার। এই বিভাগে টাইপ-রাইটিং, শর্টহ্যাণ্ড, বুক-কীপিং প্রারম্ভেই শেখানো হয়। তারপর নাগরিক ধর্ম্ম, অর্থশাস্ত্র,—এ দুইটিই পড়িতে হয়। তিনটি শ্রেণীতেই ড্রয়িং শিখিতে হয়।

এ ছাড়া মহিলা-শ্রেণী আছে; তার নাম মহিলা-বস্ত্র-কলা শ্রেণী। সুতা-কাটা, কাপড় বোনা, সেলাই—এ সমস্তই এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। হার্ম্মোনিয়ম শিক্ষার ব্যবস্থাও এ শ্রেণীতে আছে।

তার উপর আলোচনা, সাহিত্য-রচনা শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সকল বিভাগেই ডিবেটিং ক্লাব আছে—'প্রেম-বাল-

দড়ি-সতরঞ্চ তৈয়ারী

সভা', 'প্রেম-যুবক-সভা', 'প্রেম-মহিলা-সভা'। প্রতি সোমবার এই সভার বৈঠক বসে। এই সকল সভায় ছাত্রেরা প্রবন্ধ রচনা করিয়া পাঠ করে, নানা বিষয়ের আলোচনা করে—এবং বিশেষজ্ঞগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহাদের দ্বারা বক্তৃতা ও আলোচনা প্রভৃতি করানো, হয়। ইহার দ্বারা ছাত্রদের মানসিক শক্তির বিকাশ হয়,—এবং যাহাদের প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হয়, তাদের পারিতোষিক দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি আছে—২৪০০৲ টাকার। তন্মধ্যে ৮০০৲ বিদ্যালয়-বিভাগে, এবং ১৬০০৲ওয়ার্ক-শপ বিভাগে।

শিক্ষা দেওয়া হয় হিন্দী ভাষায়। হিন্দীতে যে সব বিষয়ে গ্রন্থ নাই, বিদেশীয় গ্রন্থ হইতে অধ্যাপক তাহার ব্যাখ্যা প্রভৃতি করেন হিন্দী ভাষায়, ইংরেজীতে নয়। যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী এ বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে। তবে সকল ছাত্রই যাহাতে নিজেদের ধর্ম্মাচরণে মনোযোগী থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়। ছাত্রদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যাহাতে সহানুভূতি জাগে, সকলে সকলকে সহিতে পারে, বনাইতে পারে—সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। পড়া আরম্ভ করিবার বা ওয়ার্ক-শপে বাহির হইবার পূর্ব্বে সকল ছাত্রকেই নিজের প্রথানুযায়ী উপাসনা করিতে হয়। ছাত্রদের থাকিতে হয় ছাত্রাগারে (বোর্ডিংয়ে), নয় কোন যোগ্য ও দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে। সে অভিভাবককে আবার বিদ্যালয়ের মন্ত্রী দেখিয়া লন, তিনি অভিভাবকত্ব করিবার পক্ষে যোগ্য
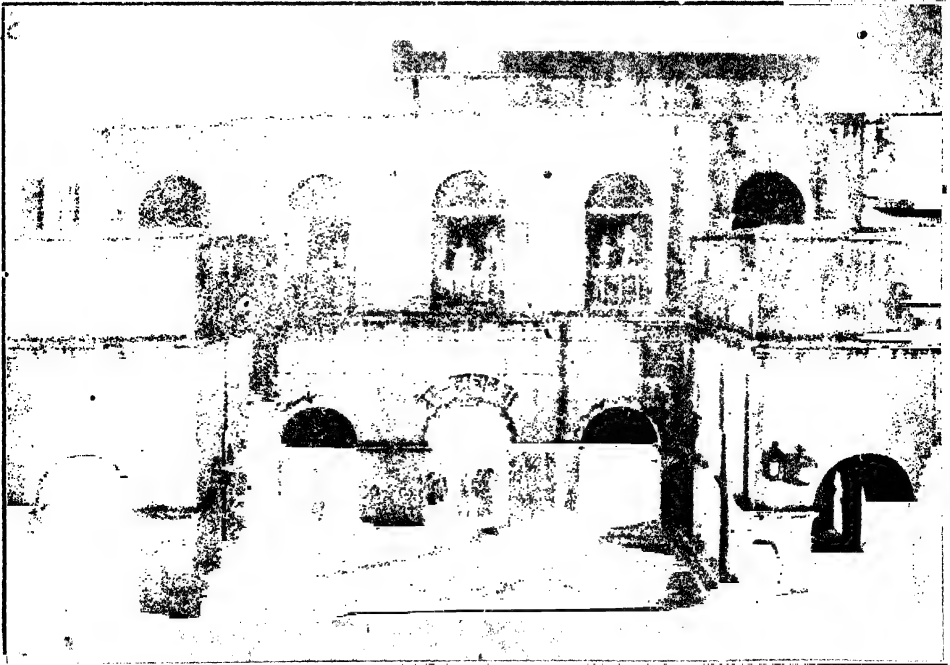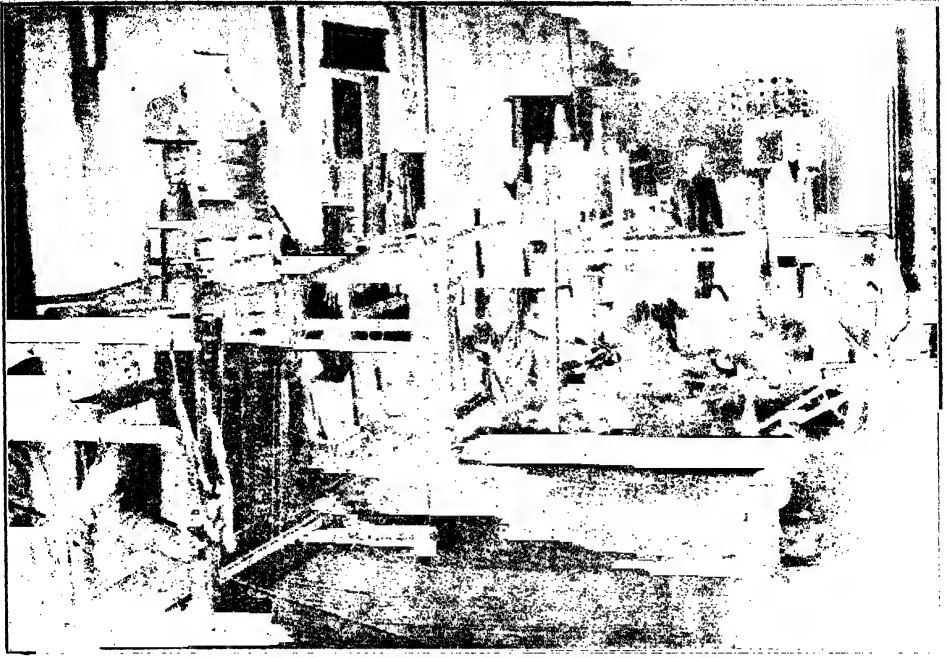
বিদ্যালয়ের ছাত্রাগার

ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাশ—বয়লার ও এঞ্জিন-ঘর

লোহা প্রভৃতি ঢালাই শেখানো হইতেছে

মহিলা-বস্ত্র-কলা-শ্রেণী
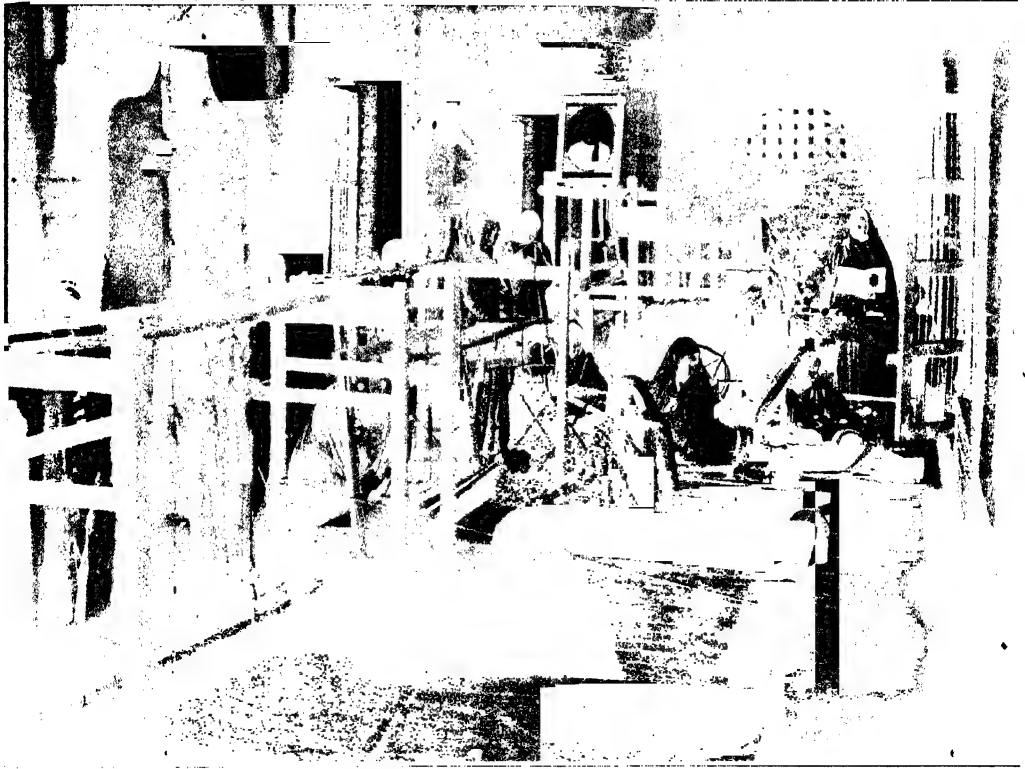
ব্যক্তি কি না এবং ছাত্রের উপর যথার্থ নজর রাখিবেন কি না!

ছাত্রদের যাহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, সেজন্য খেলা-ধূলার আয়োজনও আছে। খেলা-ধূলার জন্য প্রত্যেক শুক্রবারে বিদ্যালয়ের ছুটী হয় বেলা ২টায়—অর্থাৎ সেদিনটা half-holiday. খেলায় প্রাইজ আছে বিস্তর। দেশী-বিদেশী সব খেলারই এখানে সমান আদর। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতিদিন কোনরূপ খেলায় বা ব্যায়ামে যোগ দিতেই হইবে—ছাড়ান্ নাই।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সময় প্রত্যেক ছাত্রকে একটা পরীক্ষা দিতে হয়। যোগ্যতা-অনুসারে ছাত্রের শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হয়। বারো বছরের কম বয়সের বালককে লওয়া হয় না।

ছুটীর ব্যবস্থা পাল-পার্ব্বণ-উপলক্ষে একমাস, বার্ষিক পরীক্ষার পর ১৫ দিন, পূজার সময় একমাস—এই যা ছুটি। রবিবারে বিদ্যালয় খোলা থাকে। তার পরিবর্ত্তে প্রতি মঙ্গলবার বিদ্যালয়ের ছুটী থাকে—সেদিনটা অনধ্যায়।

বিদ্যালয়ের বোর্ডিংয়ে ৯০ জন ছাত্র থাকিতে পারে। বাসের জন্য ঘর-ভাড়া লাগেনা—শুধু দশ টাকা জমা রাখিতে হয়। এই ছাত্রাগারে বা বোর্ডিংয়ে যে-সব ছাত্রের স্বাস্থ্য খুব ভাল, তাহাদেরই থাকিতে দেওয়া হয়। কর্ত্তৃপক্ষও বিশেষ লক্ষ্য রাখেন, যাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে। ছাত্রদের অভিভাবকেরা যদি দেখা করিতে আসেন, তবে তাঁহাদের বাসের জন্য অতিথি-শালা আছে। এই অতিথি-শালায় তিন দিন তিনি থাকিতে পারেন, ভোজনের ব্যয়টা তাঁকেই দিতে হয়। তাছাড়া এখানে যদি কেহ বিদ্যালয় দেখিতে যান, তিনি মন্ত্রীর অনুমতি পাইলে তিন দিন থাকিতে পারেন—রন্ধনের জন্য তিনি বাসন প্রভৃতি পান্; কিন্তু রন্ধন-কার্য্যটা তাঁহাকে অপর লোক দিয়া করাইতে হয়।

চীনামাটির খেলানা তৈয়ারী শিক্ষা

বিদ্যালয়ের সহিত লাইব্রেরী আছে। এই লাইব্রেরীতে আপাততঃ বিদ্যালয়ের উপযোগী ৬০০০ গ্রন্থ আছে—তার সঙ্গে বাচনালয় (রীডিং রুম) আছে। তাহাতে হিন্দী ও ইংরাজী দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক পত্রাদি সংরক্ষিত হয়। এই পাঠাগার বেলা ৯॥০ হইতে ৪টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। সাধারণের জন্য মুক্ত, চাঁদা লাগে না। যাহার খুশী আসিয়া কাগজ-পত্র পড়িয়া যাও। বিদ্যালয়ের নিজের প্রেস আছে। এই প্রেসে বিদ্যালয়ের যত কিছু কাগজ ও সাপ্তাহিক পত্র "প্রেম" ছাপা হয়।

বিদ্যালয়টির প্রধান লক্ষ্য—দেশে কর্ম্মী মানুষ তৈয়ার করা। পুঁথি-জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানের দিকে নজরও কাজেই বেশী। বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি মিউজিয়ম আছে ছাত্রদের তৈয়ারী সুন্দর দ্রব্য সেখানে রক্ষিত হয়।

এই বিদ্যালয়টি মাত্র-একজনের অর্থে, একজনের বহু যত্নে মঙ্গল-কার্য্য সাধন করিতেছে। উঁহারই আদর্শে বাংলায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এমন ধনী কি কেহ না—যিনি মোটর, আরাম ও উপাধির মায়া ত্যাগ করিয়া এত বড় দেশের হিতে অর্থ ও মন নিয়োগ করিতে পারেন ?

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

এই প্রবন্ধের ব্লকগুলি হিন্দী-মাসিক-পত্রিকা 'মাধুরীর' সৌজন্যে ছাপা হইল।

নারীর স্থান

কয়েক বৎসর হইতেই লক্ষ্য করিতেছি, নারী সম্বন্ধীয় সমস্যা আমাদের সাহিত্যে একটা স্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছে এবং এ লইয়া দু'দলে যে সকল আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে, তাহা কোথাও কোথাও কবির লড়াইয়ের কাছ-বরাবরও যে পৌঁছিতেছে, এমনও দেখিতেছি! এর মধ্যে কোনো ভূমিকা লইয়া উপস্থিত হইবার আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কারণ দুইপক্ষের মতের সহিত সর্ব্বত্র মত মিলিবে না জানিতাম এবং স্বজাতির বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে সহজে কেহ ভালবাসে না। কিন্তু আমি ছাড়িলে কি হইবে—কম্লী ছাড়িতে চাহে না! অগত্যা আমার ক্ষুদ্র মতামত সম্বন্ধে দু একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহা পূর্ব্বেই মানসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতিতে ছাপা হইয়াছে, অতএব বলিবার কথা আর আমার বড় বেশী কিছু নাই। তবে সামান্য দু'চারিটী কথা বলিব।

ভারতী কয়েক মাস দেখি নাই, সেদিন বৈশাখের ভারতীতে নারীর অবস্থা প্রভৃতি কয়েকটী প্রবন্ধ দেখিলাম। এ সম্বন্ধে আমি প্রথম কথা এই বলিব যে নিজেদের অবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া আমরা নারীর দল যেরূপ ধৈর্য্যহারা, উত্তেজিত ও অসংযত হইয়া পড়িতেছি, তাহা একেবারেই সঙ্গত নহে। এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা যথেষ্ট সংযম ও গাম্ভীর্য্যের সহিতই হওয়া আবশ্যক। নতুবা আমাদের অযোগ্যতার একটা নজীর খাড়া করা হইবে মাত্র। রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান যে নীতিতে হয়, সামাজিক সমস্যার সমাধান ঠিক সেই রীতির আশ্রয়ে যে কখনই হয় নাই তাব লিতে পারি না—বিশেষ নব্য ইউরোপে—তবে সেটা বেশ শোভন বলিয়া মনে হয় না এবং সাহিত্যক্ষেত্রও ঠিক মাছের বাজার নয়।

লেখিকা মনু হইতে বঙ্কিমবাবু এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, প্রভাত বাবু, নরেশ বাবু কাহারও কোন ত্রুটিই থাকিতে দেন নাই। যতীন্দ্রবাবুর অনুপমা বিধবা বিবাহে সম্মত হয় নাই; নরেশবাবুর স্বেচ্ছাতন্ত্রী মনোরমা মৃত পতির কথা মনে করে না বলিয়া কোন সময়ে অনুতপ্তা হইয়াছিল, প্রভাত বাবুর নায়িকার অপরাধ আরও বেশী! "রত্নদীপের বিধবা নায়িকা স্বামী ভাবিয়া অপরকে ভাল বাসিয়াছিল, কিন্তু সে ভুল ভাঙ্গিবা মাত্র তাহার মনও ফিরিয়া গেল। সে স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া গেল।" এই সব স্বামীপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লেখিকার ভাল লাগে নাই! ইহার উত্তরে আর বলিবার কিছু নাই; শুধু নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের দেশকেই বলিতে হয়—"কি ছিলে, কি হইলে, কি হইতে চলিলে!" "কথায় কথায় সীতা-সাবিত্রীকে টানিয়া আনায় তাঁদের অপমান করা" সত্য সত্যই হয়, বিশেষতঃ এযুগে—"তথাপি যখন আমাদের ঐটুকুই সম্বল বাকি রহিল, তখন কাজেই এই সকল কথা স্বতঃই স্মরণে আসে" এবং তাঁদেরই দোহাই পাড়িয়া বলিতে হয়, হায় মা, তোমার দেশের কি শেষে এই আদর্শ হইল!

সকল দেশের সংস্কারক ও সংস্কারিকারা সংস্কার করার ঝোঁকে পড়িয়া ভুলিয়া যান যে আদর্শটাকে উচ্চ রাখাই প্রকৃত (হাই আইডিয়াল) মনুষ্যত্ব-লাভের পথ। নারী সে পথে চলায় সাহায্য এ দেশে অন্ততঃ চিরদিন পাইয়া আসিয়াছেন; আজ তাহা হারাইতে বসিয়াছেন বটে। তাঁর সে পথ রুদ্ধ হইল কখন কিসে? না, যেদিন হইতে নরনারী, নিজেদের পল্লীভবন ও পল্লীসমাজের নিয়ম-তন্ত্রতা হইতে জীবনের গণ্ডী কাটাইয়া স্বেচ্ছা-স্বতন্ত্রতার স্রোতের মধ্যে সহরের বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। পল্লী-সমাজের ভগ্নাংশ আমি দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, সেখানে স্ত্রীজাতির অবাধ বিচরণ, সমস্ত সমাজ-বাসী নরনারী ভদ্র-ইতরের পরস্পর আন্তরিক আত্মীয়তা—অবরোধ-প্রথা আদৌ সেখানে নাই, জাতিভেদ আছে, কিন্তু যথেষ্ট ভদ্রভাবে, কথকতার দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অঙ্গ ধর্ম্ম-শিক্ষা, পুরাণাদি শিক্ষা, নীতি-শিক্ষার যথেষ্ট সুব্যবস্থা ছিল। [ইহার সঙ্গে ইতিহাস ভূগোল ও সাহিত্যে শিক্ষা যোগ করা মোটেই অসম্ভব ছিল না] প্রতিদিন

দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যায় কোন কোন বাড়ীতে মেয়ে-মজলিস বসিয়া ভাগবত-পুরাণাদি পাঠ, কোথাও সমাজতত্ত্বের আলোচনাও চলিত। সামাজিক কুনীতির অতি তীব্র আলোচনা হইত। [আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধেও বলিয়াছি] পুরুষেরও গুপ্ত পাপ ধরা পড়িলে তাহাকে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়াছি; তবে নারীর পাপের অবশ্য যেরূপ কঠোর বিচার হইত, পুরুষের তেমন দেখি নাই; কিন্তু পূর্ব্বে যে তাহাও ছিল। যখন দেশে হিন্দু রাজা ও সমাজপতি ছিলেন, ইংরাজের আইনের কড়াকড়ি ছিল না, পঞ্চায়েত সভার প্রতিপত্তি ছিল, তখন সমাজ-রক্ষকগণ অগম্যা-গমনকারী পুরুষের যে তুষানলেরও ব্যবস্থাও করিতেন,তাহার প্রমাণ হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেখিয়া লইতে পারেন। যাদের সধর্ম্মী রাজা নাই, বিচার নাই, সমাজ নাই, তারা যে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারী ও অবিচারক হইয়া পড়িবে ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে, সে আর বিচিত্র কি! এখন পুরুষ নারী উভয়েরই ব্যভিচার সমাজ কি সহিয়া লইতেছে না? তবে নারীর পাপকে এখনও সকলেই সহিতে সমর্থ হয় নাই এবং—[অবস্থাভেদে নারীর পাপ পারিবারিক নিয়মের অধিকতর ব্যাঘাতক *] সকল নারীও পুরুষের পাপকে ক্ষমা করিতে পারেন না। আবার পুরুষের পাপের প্রশ্রয় সমাজ [সমাজ কোথায়? সমাজ কাহাকে বলিব?] দিতেছেন বলিয়া নারীও কি সেই দাবী তুলিবে? পুরুষের সহিত পাপের বখরা লইয়া আদালত করিবে? পুরুষের সহপাপিনী হইবে? তার চেয়ে তিনি উপায়ান্তর গ্রহণ করুণ না! পতিত পুরুষের সহবাস পরিত্যাগ করুন। নিজের নাসিকা ছেদন করিয়া অপরের যাত্রা-ভঙ্গ না করাই ভাল। পুরুষ ব্যভিচারী হয়, অতএব নারী কেন না হইবে? পুরুষ পুনর্বিবাহ করে নারী কেন না করিবে, পুরুষ অসংযত স্ত্রীই বা সংযত রহিবে কি জন্য? এ সকল উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষা নারী-সমাজকে দান করায় শিক্ষিতা মেয়েদের কি লাভ হইতেছে, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা প্রবিষ্ট হয় না। ইউরোপীয় নারী-সমাজের ওইরূপ স্বেচ্ছা-তান্ত্রিকতা আসিয়া এদেশের নারী-সমাজে জুড়িয়া বসে তাহাতে খুব বেশী লাভের মত লোভনীয় কিছু আছে কি? "কথায় কথায় ইউরোপে ছুটিয়া যাইতে" অবশ্য নরেশ বাবুর নিষেধ আছে এবং নজীরস্বরূপ তিনি মহারাষ্ট্র-মহিলাদের উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রী-স্বাধীনতা কি এই পুরুষের মাথায় সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থা করা? বিধবা বিবাহ [যে ব্যবস্থায় ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত সকল বিধবাই বিবাহ-যোগ্যা বলিয়া দেশীয় সামাজিকগণ কর্ত্তৃক সার্টিফিকেট পান] সধবা বিধবা ও বিধবার ব্যভিচারের সমর্থনকারী স্ত্রী-পুরুষের সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকারে সত্ব সাব্যস্ত হওয়া যে স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য আমার লেখিকা ভগিনীগণ সজোরে কলম চালাইতেছেন, সেই স্ত্রী-স্বাধীনতা? ইহাঁরা যাহা চাহিতেছেন, তাহা যে ইউরোপীয় সাফ্রিগেটদিগের প্রতি-ধ্বনি মাত্র, তাহাতে সন্দেহ আছে! এবং তাঁরাও বোধ করি তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহা স্থিতির কথা নয়, ধ্বংসের ব্যবস্থা! আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর মনে হয়, ও ধরণের স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রয়োজন এদেশে নাই এবং ওদেশেও তার পরিণাম ভাল নয়। কেন ভাল নয়? কারণ উচ্ছৃঙ্খলতার নাম উন্নতি নহে। সমাজকে সংস্কার করিবার প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন, কিন্তু সে শিক্ষার রথ যে কুপথে পরিচালিত হয়, ইহা একেবারেই সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ ইউরোপীয় সমাজের যতটুকু সংবাদ জানি, তাহাতে উঁহাদিগের মধ্যে নারী-পুরুষের ব্যভিচার অপেক্ষাকৃত অধিক। স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, উহাঁদের তীব্র পানাসক্তি এবং বক্ষ বাহু-বদ্ধ হইয়া যুবক যুবতীর উদ্দাম-নৃত্য, এ সকলই উভয়তঃ ব্যভিচারের মূল কারণ ঐ সমাজে বর্ত্তমান আছে। ইহার ফলে উহাঁদের সর্ব্বদাই বিবাহ-বিচ্ছেদের আবশ্যকও হইয়া থাকে। মদ্যপ স্বামীর হাতে স্ত্রীর লাঞ্ছনাও এদেশের চেয়ে অনেক বেশী ঘটে। ও দেশের স্ত্রীদের এব উপর অপর পক্ষের সন্তান-সন্ততি অনেকেরই বর্ত্তমান থাকায় পারিবারিক সমস্যা আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই সকল নানা কারণে উহাঁদের নারীদিগের স্বতন্ত্র জীবকার্জ্জনের প্রয়োজনও আমাদের অপেক্ষা বেশী। "বিবাহচ্ছেদ ও নারী

* ইহা অস্বীকার করা চলে না, স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ-সঙ্কর।

স্বাতন্ত্র্যের" লেখিকা 'ইউরোপীয় ডাইভোর্সের আলোচনার মধ্যে আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থারও তুলনা-মূলক বিচার করিতে বসিয়া দেশের এই সকল প্রভেদগুলি মনে না রাখায় কিছু ভ্রমে পতিত হইলেও তাঁর কতকগুলি কথার বেশ মূল্য আছে এবং তাহা সকল দেশের পক্ষেই খাটিতে পারে। উহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম,—

"স্বামী বা স্ত্রী কাহারও একবার পদস্খলন হইলে কিম্বা পূর্ব্বে কোন প্রণয়-ব্যাপার (love affair) ঘটিয়া থাকিলে দোষী-পক্ষ যদি দোষ স্বীকার করিয়া যথার্থ অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাহার পর ভালভাবে থাকে ও অপর পক্ষকে ভালবাসে, তাহা হইলে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়। কিন্তু ইহা স্বামী ও স্ত্রী দুজনের বেলাই মনে রাখা উচিত। দোষী-পক্ষকে ভাল করিয়া লওয়ার চেষ্টাও উভয়ের সমান ভাবে করিতে হইবে। এ বিষয়ে স্ত্রীর সম্বন্ধে যে নৃশংসতা হয়, তাহার কথা বলিতে ঘৃণা বোধ হয়। অনেক স্থলেই কিছুই না জানিয়া না বুঝিয়া, না শুনিয়াই যে সকল কাণ্ড হয় তাহার উদাহরণ দিতে গেলে মহাভারতেও কুলাইবে না। কিন্তু কাণ্ডা-কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হইবার আগে মানুষ যে বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন জীব এবং স্নেহ দয়া ক্ষমা ইত্যাদি চরিত্র-সম্পদেই [আমার মনে হয়, এই চরিত্র-সম্পদ নারীর মধ্যে অধিকতর থাকায় তাঁদের মধ্যে অনেকেই এতদিন দুশ্চরিত্র পতিকেও সহিতে পারিতেছেন] যে সে ঐ আখ্যার অধিকারী, স্বামীর ইহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কথাটা প্রাচীনেরা মেয়েদের বাদ দিয়া বলেন নাই। তবে সংশোধনের আশা ও সম্ভাবনা না থাকিলে দুই পক্ষেরই স্বতন্ত্র থাকা উচিত।"

যে শাস্ত্রকারেদের ইঁহারা কথায় কথায় গালি পাড়িতেছেন, [নব্য পুরুষদিগেরই ইহা অনুকরণ মাত্র] সেই শাস্ত্রকারদেরই অন্যতম গৌতম ঋষিও বোধ হয় যেন এই যুক্তির অনুসরণে তাঁহার পতিতা-স্ত্রী অহল্যাকে সংশোধন ও পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন।* সমাজের মধ্যে যাঁহারা অ-মানুষ নন, এ চেষ্টা বোধ হয় তাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের ঘরেও বিপদ ঘটিলে করিয়া থাকেন। তবে যারা অ-মানুষ, তারা যে স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন বা আদেশ-উপদেশের অপেক্ষা রাখিবে, মানব-চরিত্রের সামান্য অনুশীলনে আমি তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাই নাই। তাহা করিলে এ সকল আলোচনার প্রয়োজনই থাকে না।

আমার একটী প্রবন্ধে এ বিষয়ে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতামত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, তাঁর মতে কুচরিত্র রোগগ্রস্ত পতির সহিত একত্র বাস না করিয়া পতিব্রতা স্ত্রীও স্বতন্ত্র ভাবেই বসবাস করিবেন। তবে ঐ স্ত্রীর পুনর্পতি-গ্রহণের ব্যবস্থা অবশ্য তিনিও করেন নাই; আমিও করি না। সংসারে বিবাহচ্ছেদ ও বিবাহ, বিধবা হওয়া এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ পক্ষে বিবাহ করা—ইহাই যে জীবনের চরম লক্ষ্য, এ আমার আদৌ বিশ্বাস নহে; এ ভিন্ন অনেক কর্ত্তব্য, অনেক কাজ মনুষ্য-জীবনে বর্ত্তমান আছে। আর ইউরোপীয় মেয়েরা চির-কুমারী থাকিতে পারেন, এদেশের অনেক মেয়েই যখন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারেন, তখন হতভাগিনী হিন্দু বিধবাদের ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বিধবা হইলেই বা বিবাহ করিয়া মরিতে হইবে কেন, তাহা বোধগম্য হয় না! ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং যাঁরা তাঁদের সহিত সমান সামাজিক মর্য্যাদা লাভের জন্য চেষ্টিত হইতেছেন, তাঁহাদের ছেলেমেয়ের শিক্ষা দেওয়া গোড়া-গুড়িই নিবৃত্তি-মুখীন্ হওয়া বিধেয় এবং বৈধব্য বা বিপত্নীকত্ব ঘটিলে পুনর্বিবাহের কথা মাত্র না তুলিয়া তাঁহাদের জন-সেবায় দেশ-সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্যই চেষ্টা করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন—সংসার-বন্ধন-হীন ঐ শ্রেণীর নর-নারী কি দেশের কার্য্য করার ঠিক উপযোগী নয়? পূর্ব্বে বাল-বিধবারাই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, মাতা ও ভ্রাতৃজায়া তাঁদেরই হাত-তোলার উপর থাকিতেন। অশনে-বসনে বিধবা সধবার শুধু একটা লাল পাড় ও দুগাছা শাঁখা খাড়ু বা বালার এবং ভাতের পাতে একখানা মাছের টুকরার যা প্রভেদ ছিল। এখন তাহা নাই। এখন নব্য স্বার্থপরতা

* তপোবলবিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশানুগাম।
গৌতমোঽপি মহাতেজা অহল্যা-সহিতঃ সুখী।
বাল্মীকি রামায়ণ।

আমাদের পারিবারিক নিয়মের এই পবিত্র অংশটুকুকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে; কিন্তু যে বড় জিনিষ পূর্ব্বে ছিল অথচ নষ্ট হইতে বসিয়াছে, সেটার পুনরুদ্ধার-চেষ্টা সহজ, না, যেটা নাই এবং এদেশের অনুকূলও নয়, সেইটাকে জোর করিয়া টানিয়া আনা সঙ্গত? বিধবা, শুধু বিধবাই বা কেন,— সকল মেয়েরই বিদ্যাশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি প্রখর দৃষ্টি প্রদান করা এখনকার অভিভাবকদিগের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়াই আমি মনে করি। স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী ভাবে অসংখ্য নারী-প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা হউক [নারী-মহা মণ্ডলের অনুকরণে, পুনা বিধবাশ্রমের অনুকরণে], দেশে মাস্ (mass) এডুকেশনের চেষ্টা নারীর দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হউক, মহাত্মা গান্ধি মহারাজের আত্মোৎসর্গের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার বাণী তাঁহার আন্তরিক অনুরোধ অন্ততঃ এঁদের দ্বারাও অংশতঃ প্রতিপালিত হউক, তাঁত এবং চরকার প্রচলন ইঁহারাই করুন। বালিকা বিদ্যালয়ের অভাবের সীমা নাই, বয়স্কা নারীর গৃহ-শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই,—বেহারী মহিলাদের আরও না—অসংখ্য উপযুক্ত পেরিপেটটিক (peripatetic) টিচারের সৃষ্টি করিয়া উহাঁদেরই দ্বারা তাঁদের সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করা হউক! হে বিধবা-সধবার ও কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতৃগণের, কুৎসিতা কন্যাদলের প্রতি মমতা-পূর্ণ তাঁদের বান্ধব ও বান্ধবীগণ, আপনারা কথায় কুট তর্কের পরস্পরকে কাবু করার চেষ্টা ছাড়িয়া একটু হাতে-কলমে তাঁদের উপকার-চেষ্টায় নিজেদের অবসর-কাল ক্ষেপণ করুন না কেন!

"বাগবৈখরি শব্দ ঝরি শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বৎ ভুক্তয়ে নতু মুক্তয়ে।"

শুধু কথার মালা গাঁথিলে যার জন্য গাঁথা হয় তারও কোন কাজে লাগে না। ইউরোপীয়ারা বহুদিন হইতে শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াই আসিতেছিলেন; কিন্তু "নজাতু কামকামানমুপভোগেন শাম্যতি" তাই হবি-প্রাপ্ত ঘৃতের ন্যায় তাঁদের বাসনা-বহ্নি লেলিহান হইয়া উঠিয়া আজ আংশিক স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া পূর্ণ ভাবেই পুরুষের সমকক্ষতা দাবী করিতেছে। আমাদের অবস্থা ঠিক উহাঁদের সঙ্গে একই রূপ কি? স্ত্রীশিক্ষা আমাদের মধ্যে যেটুকু সত্যকার ছিল, তাহা কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে, নূতন যেটুকু স্কুলের শিক্ষা মেয়েরা পাইতেছে, সে একটা মানব-জীবের পক্ষে কতটুকু এবং তা কি অসম্পূর্ণ ও নগণ্য! অবরোধ-প্রথা আমাদের মধ্যে, এমন কি যাঁদের কাছে উহার শিক্ষা, সেই মুসলমান আমলেও রাজধানী ও সহর ব্যতীত ছিল না। আজ অধিকাংশেরই সহর-বাস জন্য তাহা এক্ষণে বর্দ্ধিত মূর্ত্তি ধরিয়া আছে। মেয়েদের স্বাস্থ্য, বাল্য বিবাহ ও অকাল মাতৃত্বের দিনের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হইতেছে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াই স্থির করা ভাল, এ বিষয়ে বলিবার কিছু দেখি না। এ অবস্থায় এ সকল বিষয়কে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আমরা কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির অনুরোধে সধবার বিবাহচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ, বিধবা মাত্রেরই বিবাহ দেওয়া, চরিত্রহীন স্বামীর সহিত চরিত্রহীনা স্ত্রীর সমানভাবে চরিত্রহীনতার অধিকারের সত্ত্ব সাব্যস্ত না করিতে বসি! যাহাতে পূর্ব্বোক্ত ত্রুটিগুলির সংশোধন হয়, "দুর্ব্বল অনাথ বিধবারা"—যাহাতে চরিত্র-সংশোধনে তীব্র চেষ্টাশালিনী, পতিতারা, পতিতা-গর্ভজাতা শিশু কন্যারা যথোচিত ভাবে আশ্রয় ও জীবিকালাভ করিতে পারে, চরিত্র গঠন করিয়া নিজেদের জন্য প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয়, ও দেশের কার্য্য করিতে পারেন, তাহারই জন্য এখন সকল মহিলারই কি সমবেত চেষ্টা ও যত্ন লওয়া উচিত নয়? অবান্তর চর্চ্চায় দলাদলি বাধানোই কি দেশের এ অবস্থায় সঙ্গত? কোন প্রকৃত মহৎ কর্ত্তব্যের ভার অন্তরের সহিত গ্রহণ করিলে "নৃশংস পাষণ্ড পুরুষেরা" যে বাধা দেয় না,তাহা অনেক স্থলেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা একটা শব্দ মাত্র নহে, এবং উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতাও স্বাধীনতা নয়। মানব চিত্তের অনেক ভাল মন্দের গুণেই প্রকৃত স্বাধীনতা। এই ইউরোপীয় আন্দোলনের প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা কি আমাদের সেই মানসিক স্বাধীনতার প্রমাণ দেখাইতেছি? অথবা নিজেদের প্রকৃত ও উপস্থিত অভাবকে ঠেলিয়া সরাইয়া সেখানে একটা কল্পিত এবং সুদূর অভাবকে টানিয়া আনিয়া শাস্ত্রকার [না বুঝিয়া এবং না পড়িয়াই] এবং সমাজ-বিধির প্রবর্ত্তক পুরুষ জাতির অশেষবিধ লাঞ্ছনা করিয়া একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিতেছি মাত্র।

আমার মানসীর প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি—যে, যে নারী কন্যা ভগিনী সহধর্ম্মিণী এবং জননী, তিনি পুরুষকে জাতি তুলিয়া ঐ সকল অপভাষা প্রয়োগ করিতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ কখনই অধিকারিণী নহেন। পুরুষের মধ্যে দেবতা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের না দেখাও থাকে, তথাপি "স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা"—সেই নিজপিতাকে দেবেরও দেবতা-বোধে পূজা করা তাঁদের ধর্ম্ম। পিতার যাঁরা স্বজাতি, তাঁদের মধ্যে স্বার্থপর ও পাপী থাকিলেও তাঁদের গালি দিবার অধিকার বা স্পর্দ্ধা আমাদের থাকা উচিত নয়। অথবা এ কথাই বা কাহাকে বলি?—আধুনিক উপন্যাসে ও নাটিকায় পিতার সহিত কলহ করিয়া পৃথক হওয়াই যে পৌরুষের কার্য্য, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এ সব লেখক হয় ত বাল্যে পিতৃহীন!

"নারীর অবস্থার" অনেক কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। অভয়ার মত পাপিষ্ঠাদের এবং তার স্বামীর মত মহা-পাপীদের জন্য সমাজে কোন স্থান থাকার জন্য ভদ্র গৃহস্থ-কন্যাদেরই বা এত মাথা ব্যথার দরকার কি? তাদের পথ ত তারা বাছিয়াই লইয়াছে। "খৃষ্টান বা মুসলমান নারী এস্থলে স্বচ্ছন্দে কুলবধূর মর্য্যাদা রাখিয়াই সমাজের একজন হইয়া থাকিতে পারিত। হিন্দুধর্ম্ম উদার বলিয়াই সেখানে তাহার স্থান নাই।" জিজ্ঞাসা করি, আমার লেখিকা ভগিনী ঐ অভয়া নাম্নী যুবতীটীকে স্বীয় পুত্রবধূর আসন দিতে সম্মত আছেন কি? সংসার রসাতলে গেলেও আমি ত তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। হিন্দু ধর্ম্ম যে উদার তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। হিন্দুধর্ম্ম অভয়ার বা তাহার জারজদের ফাঁসির হুকুম দেয় না, তাদেরও তার কোলে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে;—হিন্দু সমাজের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ আছে। ইহাতেও তর-তম আছে। [এদেশে কৌলীন্য অর্থকরী নহে] প্রথম শ্রেণীর মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর মিশ্রনকেই সে সযত্নে নিবারণ করে মাত্র। তাহা নৃশংসতা নহে, আত্মরক্ষা। যখন জাতিভেদের সৃষ্টি হয়, তাহাতেও এই নীতি,এই আত্মরক্ষার চেষ্টাই ব্যাকুলভাবে কার্য্য করিয়াছিল এবং ফলে সর্ব্বত্র সাঁওতালের মূর্ত্তি এত দিনেও দেখিতে পাই না! বৌদ্ধ যুগের উদরতার হাওয়ায় তবু অনেক-খানি কার্য্য-সিদ্ধি ঘটিয়াছে এবং ঋষি মূর্ত্তির সঙ্গে ঋষি মস্তিষ্কও বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া আধুনিক নর-নারীর সৃষ্টি করিয়াছে। উদার হিন্দু সমাজ কাহাকেও ত্যাগ করে না; তবে সে উদার বলিয়াই কাহাকে-কাহাকে পবিত্র ও স্বতন্ত্র রাখে এবং সকল ঘরেই চরিত্র-দুষ্ট ও কলুষিত রক্তে উৎপন্ন জীবকে টানিয়া লইবার সহায়ক নহে! দয়া কি শুধু এক-দেশদর্শী ভাবেই করা উচিত? যাহারা ভ্রষ্টাচার ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে চাহেন না, তাঁরাই কি দয়ার যত অযোগ্য?

আর একটী কথা ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অদূর-দর্শী ও হঠকারী ভাবেই বলিয়া ফেলিতেছেন। নারীর অবস্থার লেখিকা বলিতেছেন—"ব্রহ্মচর্য্যের এই উদ্দেশ্য যে, ইহলোকে জীবিত বা মৃত একেরই থাকিয়া পরলোকে আবার তাহাকেই পাওয়া। কিন্তু প্রথমতঃ পরলোক আছে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, অনিশ্চিত ও অজ্ঞাত পরলোকের আশায় ইহলোকের সুখ ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহারা "শ্যাম ও কুল" দুইই যে হারান না, তাহা কে বলিতে পারে?" ইত্যাদি—সহজে দুর্ব্বল ও অল্পজ্ঞা বাল-বিধবা প্রভৃতির মনে এই নাস্তিকতার বীজ-বপন, এই অবিশ্বাসের মন্ত্রে দীক্ষাদান, এও তাঁদের কি বন্ধুর উপযুক্ত কার্য্য মনে করিতে হইবে? তিনি হয় ত হক্‌স্লে ডারুইন স্পেন্‌সার পড়িয়া সন্দেহ-বাদী বা নিরীশ্বর-বাদী হইয়াছেন, কিন্তু এরূপ দুরূহ স্থলে অপরের মনে সেই নাস্তিকতার বীজ কোন মতেই বপন করা বিধেয় নহে। বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর, এ যুক্তি চিরদিনের, ইহাতেই অজস্র শান্তি, অসীম সুখ। ইহারই বলে সাধক সর্ব্বত্যাগী প্রেমে সাধ্যের সাধনায় তন্ময় হইয়া জীবন ক্ষয় করিতেছেন, ইহারই প্রবল আশ্বাসে পুত্র-হীন পিতা, মাতা, পতি-হীনা সতী, পিতৃহীন ভক্ত সন্তান তাঁহাদের সকল ক্ষতিকেই সহনীয় করিয়া লইয়া দিন যাপন করিতে পারিয়া থাকেন। মানব-মনের উপর এই অতি পবিত্র ও অত্যন্ত সুকুমার ভাব-প্রবণতার উপর এমন আঘাত কি দিতে আছে! এ বিশ্বাস, পরলোকের পরে' এই একান্ত শ্রদ্ধা ও ভরসায় হারা হইলে কত জীবনই যে দুঃখভারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, যাঁহারা পরের মনের সূক্ষ্ম

অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া মদোদ্ধতভাবে কলম চালাইয়া যান, তাঁহারা হয়ত একবার অণুমাত্র ভাবিয়া দেখেন না!

তারপর সাকার ও নিরাকার পূজার কথা—বিধবার মৃত পতির স্মৃতিপূজাকে নিরাকার উপাসনা বলা যায় না। যাহার সম্বন্ধে কোন একটা আবছায়ামাত্রও পাই না,—তাহাকেই নিরাকার বলি। স্বামীর মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তি আলেখ্য লইয়া অনায়াসেই প্রতিক উপাসনা করা চলে এবং সুযোগ পাইলেই যে হিন্দু বিধবারা বিবাহে প্রস্তুত হইবেন, তাঁদের চরিত্র বিশ্লেষণ পূর্ব্বক এমন ধারণা আমার নাই। সুযোগ সত্ত্বেও অধিকাংশ মেয়ে হাঁড়ি পাড়িয়া খাইতে বসে না! মানুষের জীবনে সুযোগই সব নয়, চরিত্র বলিয়া একটা জিনিষের সত্তা আছে। পুরুষের চেয়ে নারীর সংযম-শক্তি অধিক, সেই জন্যই তাঁদের জন্য এ বিধি হইতে পারিয়াছিল। পুরুষের জন্য ইহা (কমপল্‌সরি) বাধ্যতা-মূলক হইতে পারে নাই। তবে যে সকল বিধবার চরিত্র-হীনা হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হইবে, তাদেরই পত্যন্তর-গ্রহণের ব্যবস্থা পরাশর দিয়াছেন। [যে শ্লোকটীকে লেখিকা মনুর ঘাড়ে চাপাইয়া যতীন্দ্র বাবুর তদ্বিষয়ক অজ্ঞতার জন্য বিদ্রূপের সুরে টিপ্পনী কাটিয়াছেন, তাহা মনু-বচন বলিয়া যতীন্দ্রবাবুর জানা সম্ভব নহে, উহাই পরাশর-সংহিতার লঘুচরিত্রা সধবা ও বিধবা সম্বন্ধীয় মতামত।]

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধিয়তে॥

যদি পতি নিরুদ্দিষ্ট, মৃত, সন্ন্যস্ত ক্লীব বা পতিত হয়, তবে ওই পঞ্চবিধ আপদ উপস্থিত হইলে নারীগণ পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। পরন্তু পরাশর-সংহিতার যে প্রসঙ্গে এই শ্লোক লিখিত আছে, তাহা বিচার করিলে বিদিত হওয়া যায়, যে ঐরূপ অবস্থায় ব্যভিচার হওয়া সম্ভব বলিয়াই তাহার প্রতিরোধ-কল্পে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই শ্লোকের পরেই পাতিব্রত্যের মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পরন্তু কথা ইহাই, প্রবৃত্তি-মার্গীদের প্রথমতঃ নিবৃত্তির পথ দেখানোই শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য। কারণ মুখে মান, না মান, পৃথিবী নশ্বর এবং জীবনও ভঙ্গুর বটে। পুরুষ-সঙ্গ, পুত্রপ্রসবই মানব জীবনের চরম প্রাপ্তিও নয়। তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ পথ নরনারী উভয়ের জন্যই খোলা আছে। তারপরেও যারা প্রবৃত্তির মার্গ অবলম্বনকেই প্রাধান্য দান করিবে, তাদের জন্য পুনর্বিবাহের ঘর খোলা থাকাই ভাল। তাহা নাই কি? তবে ৪৫০ বিধবার বিবাহ সম্বাদ প্রবাসী ছাপিলেন কোথা হইতে? এই সংখ্যা বাড়াইতে চাও, বাড়াও। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজেরও কর্ত্তব্য এই যে ব্যবস্থা-তান্ত্রিক প্রবৃত্তি মার্গীদের সংস্রব পরিবর্জ্জন করিবার উপায় রাখা।

আর এক কথা বলি, বিধবাদের বিবাহ তাদের পূর্ণ যৌবন-প্রাপ্তির একটুও পূর্ব্বে দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই। তাহার পরিণত চিত্ত যদি কামনার পথকে, প্রেয়কে নিকৃষ্ট মনে করিয়া নিবৃত্তিকেই, শ্রেয়কেই আশ্রয় করিতে চায়, তবে কিসের অধিকারে তাহার সে অধিকার খর্ব্ব করিয়া রাখিবেন? বিধবা বিবাহ দিবার অধিকার কাহারও নাই; সে অধিকার শুধু বিধবার নিজের হাতেই থাকা উচিত। বিপত্নীক সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা। তবে কখনও বংশরক্ষার্থ অপুত্রক বিপত্নীকের বিবাহ সমর্থন করা চলে [বিশেষ ধনী-গৃহে, যেখানে দত্তক লওয়া হয়] কিন্তু বিধবার পৌনর্ভব পুত্রের দ্বারা কাহার বংশ কে রক্ষা করিবে? সেজন্য মাত্র প্রবৃত্তি-মার্গীয়া নারীদের যদি নিজের ইচ্ছা থাকে, সমাবস্থাপন্ন পুরুষকে বরণ করিতে পারে, এবং শাস্ত্রেও ইহার বিধান আছে। সাধারণ ভদ্র হিন্দু গৃহের নারী নিবৃত্তির পথকেই সাদরে বরণ করিয়া থাকেন, আত্মীয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধা হইয়াও পুনর্বিবাহে সম্মতা হন না, তাহার দৃষ্টান্ত সাহিত্যে নহে, বাস্তবেই যথেষ্ট দেখিয়াছি। সুযোগের অভাবেই তাঁরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন না। লেখিকা হিন্দুসমাজে যে সকল "নামে-মাত্র" ব্রহ্মচারিণী বিধবা দেখিয়াছেন, তাঁরাও বোধ হয় সকলেই বিবাহার্থিনী নহেন!

কথায় কথা বাড়িয়া চলে, প্রবন্ধ আর বাড়াইব না। কেবল যাঁহারা শাস্ত্রকারদের এক-দেশদর্শিতায় তাঁদের লাঞ্ছনার একশেষ করিতেছেন, তাঁদের এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি যে শাস্ত্রকারেরা নারী-মহিমাকে কেবল খর্ব্বই করেন নাই, নারী বলিতে তাঁরা যেখানে দেবী দেখিয়াছেন, তাহাও স্বীকার করিয়াছেন, আবার রাক্ষসী-

দেরও ছাড়িয়া কথা কন্ নাই। কেমন করিয়াই বা কহিবেন! নিজেরা যে ইহার ভুক্তভোগী! বিশ্বামিত্র মেনকা, শুকদেব ও রম্ভা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত যে দেখিয়াছেন! নারীর পতনের সহায়ক যে পুরুষ, তাহা নিশ্চিতই। তবে পুরুষের পতনে যে নারী একান্ত নিরপেক্ষ নহেন, তাহারও লজ্জাকর দৃষ্টান্ত কি চোখের বালির বিনোদিনীতে, চরিত্র-হীনের কিরণময়ীতে দেখিতে পাই না? বাতাসে থুতু না ফেলাই সুবুদ্ধি ও সুস্থ বুদ্ধির কার্য্য।

যাক্, এখন হিন্দুশাস্ত্রে নারী-সম্বন্ধীয় দু'একটী মতামত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাই যে দেশাচার লোকাচার ও ব্যক্তি-বিশেষের হস্তে নারীর লাঞ্ছনা আমরা যতই কেন দেখি না, শাস্ত্রকার তাঁদের প্রতি অন্যায় করেন নাই। অবশ্য বহুস্থলেই ইহলৌকিক সুখের পরিবর্ত্তে নর-নারী উভয়ের জন্য তাঁহারা পারলৌকিক সুখের বিধানই দিয়াছেন। তাহার কারণ খুঁজিয়া লওয়াও বোধ করি খুব কঠিন নয়; তাঁহারা হকস্লে টিণ্ডেলের ছাত্র ছিলেন না, পরলোককে অন্তরের ও অন্তরের মধ্য হইতে গভীর শ্রদ্ধার সহিত মানিতেন এবং জাগতিক বস্তু-উপভোগ ও ইন্দ্রিয়-সুখকেই চরমপ্রাপ্তি-বোধ তাঁদের ছিলনা। পুরুষকে তাঁরা নারীর চেয়ে দুর্দ্দান্ত জীব মনে করিয়া তাদের জন্য সংসার-সম্ভোগের পথ কথঞ্চিৎ সহজ রাখিয়াছিলেন। এদেশে নারীর সংখ্যা অধিক ও প্রজাবৃদ্ধির প্রয়োজন সে সময় যথেষ্ট বেশী থাকায় এবং ধনী-গৃহে বিলাসভোগের সঙ্গে ব্যাভচারের প্রাদুর্ভাব অনিবার্য্য-বোধে পুরুষের একাধিক বিবাহের পথ রাখা হইয়াছিল। ইউরোপে তাহা থাকিলে সম্রাট নেপোলিয়ানের শেষ জীবনে অনেকখানি শান্তি লাভ ঘটিত। [সকল জিনিষের মধ্যেই ভাল-মন্দ দুইটা দিক আছে, নিছক মন্দ কোন-কিছুতেই নাই।] অবশ্য এক-পত্নী-ব্রতই এ দেশের শাস্ত্রেরও আদর্শ এবং প্রথম বিবাহের পত্নীই সহধর্ম্মিণী, তদ্ভিন্ন অপর সকলে কামজ পত্নী। এখনও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বিবাহাদি শুভকর্ম্মে কোন অধিকার নাই। পুরুষের একপত্নীত্ব সম্বন্ধে পারিবারিক প্রবন্ধে যে সকল প্রবন্ধগুলি আছে, আমার ভগিনীরা একবার মনোযোগী হইয়া তাহা পাঠ করিবেন কি!

এখন শাস্ত্র নারীসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, দেখা যাক—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥

সৃষ্টির সময় পরমাত্মা নিজের দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধভাগ পুরুষ এবং অর্দ্ধভাগে নারী হইলেন এবং সেই নারীর গর্ভেই চেতনার সঞ্চার করিয়া সমস্ত বিশ্ব নির্ম্মাণ করিলেন। [ঈশ্বর বোধ হয় ইহাদের সৃজন করেন নাই—পুরুষেই করিয়াছে! ইত্যাদিরূপ আক্ষেপ করা অন্ততঃ শাস্ত্রকারদিগের সম্বন্ধে খাটে না। তারা নারীকে পুরুষের সহিত সহজাত বলিয়াই অঙ্গীকার করিয়াছেন, দেখা গেল।]

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও লেখা আছে:—সোঽনুবীক্ষ্য নাঽন্যদাত্মনোঽপশ্যৎ। সর্ব্বে নৈবচরমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে। সদ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। সহৈতাবানাস যথা স্ত্রী-পুমাংসৌসম্পরিষ্বক্তৌ। সইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ন্ততঃ পতিশ্চ পত্নী ইব চাঽভাবাতম্। তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্বইতি স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তস্মাদয়মাকাশঃ। স্ত্রিয়া পূর্য্যতে এব তাং সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত। এখানেও তাঁহার (পরমাত্মার) শরীর দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পতিপত্নী সম্বন্ধের আদি সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সৃষ্টিকার্য্য চলে না; লয়ের অবস্থা আসিয়া পড়ে।

দেবী-ভাগবতেও লেখা আছে—

যা যাশ্চ গ্রামদেব্যঃ স্যুস্তাঃ সর্ব্বে প্রকৃতেঃ কলাঃ।
কলাংশাংশ সমুদ্ভূতা প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ॥

নারীকে মহা প্রকৃতির অংশভূতা বলিয়াছেন, তবে প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই ভাবই আছে। যথা দেবী-ভাগবতে—

বিদ্যাঽবিদ্যেতি তস্যা দ্বে রূপে জানীহি পার্থিব।
বিদ্যয়া মুচ্যতে জন্তুর্বধ্যতেঽবিদ্যয়া পুনঃ॥

প্রকৃতির বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইরূপ। বিদ্যার দ্বারা জীবের মুক্তি এবং অবিদ্যার দ্বারা বন্ধন হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতি প্রকৃতির অংশরূপিণী হওয়ায় প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যেই বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় ভাবই বর্ত্তমান আছে। বিদ্যা সত্ত্বগুণময়ী এবং অবিদ্যা তমোগুণময়ী। বিদ্যাভাবের

পুষ্টি হইলে নারী সাক্ষাৎ জগদম্বা-স্বরূপা হইতে পারেন এবং অবিদ্যা ভাবের বৃদ্ধিতে তিনি নরকের কীট হইয়া সমস্ত সংসারকে পাপ-পঙ্কে লিপ্ত করিতে পারেন। দেবী ভাগবতে লেখা আছে :—

সত্ত্বাংশাশ্চোত্তমাঃ জ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ।
অধমাস্তমসশ্চাংশো অজ্ঞাত-কুল-সম্ভবাঃ
দুর্ম্মুখাঃ কলহাধূর্ত্তাঃ স্বতন্ত্রা কলহপ্রিয়াঃ।
পৃথিব্যাং কুলটা যাশ্চ স্বর্গেচাপ্সরসাং গণাঃ॥

প্রকৃতির সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্না বিদ্যা-ভাবময়ী নারীরা উত্তমা স্ত্রী হইয়া থাকেন। তাঁহারা সুশীলা ও পতিব্রতা হন। প্রকৃতির তামসাংশ হইতে উৎপন্না স্ত্রীগণ অধম কোটির অন্তর্গত। তাঁহারা অজ্ঞাত-কুলজাতা দুর্ম্মুখী কুল-ঘাতিনী ধূর্ত্তা স্বতন্ত্রা এবং কলহ প্রিয়া হইয়া থাকেন।

পৃথিবীতে বেশ্যা এবং স্বর্গে অপ্সরাগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তা—অতএব নারী জাতিকে শাস্ত্রকারেরা শুধুই হীন চক্ষে দেখিয়া অবমাননা করেন নাই। দিন-কা মোহিনী রাত-কা ডাকিনী কিম্বা নারীর অধরে সুধা ইত্যাদি দোঁহা সঙ্গীত এ সকলও এই সকল অবিদ্যারূপিণীর উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমার স্থির বিশ্বাস এবং সেজন্য ও-সব দেখিয়া আমার কখনো মস্তিষ্ক উত্তপ্তও হয় নাই। আমি যে পিতামহের নিকট নাতিনীর, পিতার নিকট দুহিতার, পতির নিকট পত্নীর আদরের বিশ্বাসের সম্মানের ও শ্রদ্ধার অজস্র উদাহরণ জন্মাবধি দেখিতেছি; সন্তানের ভক্তি শ্রদ্ধারও [শুধু ভালবাসা নয়] অভাব দেখি নাই—যেখানে এ সকলের অভাব আছে, আমার বিশ্বাস, সেখানে শাস্ত্রকার বা সমাজ-বিধি (পূর্ব্বতন) দোষী নহে, আধুনিক চরিত্র-গঠনের অপূর্ণতা, মনুষ্যত্বের অপরিস্ফুটতাই ইহার জন্য দায়ী। স্ত্রী-স্বাধীনতা পুরুষ স্বাধীনতারই অঙ্গ। অধীন দেশে নিরস্ত্র দেশে ইউরোপীয় স্বাধীনতা কোথা হইতে আসিবে? যে সব পুরুষ সাহিত্যিক গালি খাইয়াও লজ্জা বোধ করিবে না, সে গালি যাদের কাণেও পৌঁছিবে না, এই নিরক্ষর-প্রধান দেশে কি তাহারই সংখ্যা অধিক নহে? যেমন অসতী নারী আছে, তেমনি অসৎ নরও আছে। সকল দেশেই তাহা থাকিবে। সত্যযুগ না আসিলে সবাই ধার্ম্মিক হইবে না। অধীন দেশে ভিন্ন-ধর্ম্মী রাজার শাসনে, সামাজিক প্রশ্রয় প্রাপ্তির দেশে, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আবকারী আয় প্রাচুর্য্যের দেশে এবং অস্ত্র আইনের বিষম কড়াকড়ির দেশে কি ইউরোপীয়ের ন্যায় নারীগণ পূর্ণ স্বাধীনতাকে পূর্ণরূপে রক্ষা ও উপভোগ করিতে পারিবেন? না, তার জন্য ভোজপুরী (পুরুষ) দ্বারবান শরীর রক্ষীর প্রয়োজন থাকিবে? তবে আংশিক ভাবের স্বাধীনতা লাভে কাহারও আপত্তি হওয়া উচিত নয় এবং সেটুকু সহজেই হয়ত পাওয়া যায়। যেমন আমাদের তীর্থস্থানে স্বাস্থ্যাবাসে স্যেনিটেরিয়মে ও পল্লীগ্রামে আজও পত্নীর মেলা-মেশায় বাধা দেখি নাই। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, লেডি ডাক্তার প্রভৃতিকে সেক্রেটারী, ডাক্তার ও অনেক ভদ্র পুরুষের সহিতও দেখা-সাক্ষাৎ করিতে হয়। অবস্থা-ভেদে সামাজিক বিধির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। মুসলমান আমলের পর্দ্দাপ্রথা ইংরাজ আমলে শিথিল হইয়া আসিতেছে—যদি আমরা স্বরাজ পাইতাম, অস্ত্র আইন উঠিয়া যাইত, এতদিনে সে প্রথা অধিকতরই উঠিয়া যাইত। অতএব নিজেদের অবস্থার আগে যাহাতে বদল হয়, সেইদিকেই যত্ন লওয়ার ব্যবস্থা নর-নারী সকলকারই প্রাথমিক কর্ত্তব্যের মধ্যে।

স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়েও আর্য্যশাস্ত্র উদাসী ছিলেন না।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥

এরূপ আদেশের দ্বারা কন্যার শিক্ষার, সৎপাত্রে—বিদ্বান পাত্রে সমর্পণের ও পিতৃধনের কতক অধিকার দেওয়ার উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। ("বস্ত্র ও অলঙ্কারের উপরও তাহাদের কতখানি অধিকার,—তাহা সকলেই জানি" "নারীর অধিকারে"র লেখিকার লেখার এ হেঁয়ালি বোধগম্য হইল না। স্ত্রীর পিতৃদত্ত ধনটা অন্ততঃ স্ত্রীধন এবং তাহাতে স্বামীর কোনই অধিকার নাই, এমন কি সন্তানবতী স্ত্রী মরিলেও না!)

তার পর আরও দেখা যায় :—

যদি কুলোন্নয়নে সরসং মনঃ, যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্
যদি নিজত্বমভীপ্সিতমেকদা—কুরু সুতাং শ্রুতশীলবতীং তদা॥

যাঁহারা বংশগৌরব গার্হস্থ্য সুখ এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার অভিলাষ রাখেন, নিজ দুহিতাকে বিদ্যাবতী ও শীলবতী করা তাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে সে শিক্ষা যে ইউরোপীয় শিক্ষা হইতে বিভিন্ন হওয়াই উচিত, তাহাতে তাঁহারা নিঃসন্দেহ ছিলেন, এবং আমরাও। নারীকে নর-রূপে দেখিতে তাঁহারাও চাহেন নাই, তাঁদের ভক্তগণও নহে। যত বড় বিদুষীই হোন, বিবাহিতা হইলেই যখন নারীকে মাতা হইতে হইবে, তখন সন্তান যাহাতে পিতা এবং মাতা উভয় বস্তুই লাভ করে, শিক্ষা সেই ভাবেই দেওয়া কর্ত্তব্য। দৈবাৎ যদি ভদ্র মহিলাকে খাটিয়া খাইতেই হয়, সেজন্য প্রস্তুত থাকাও সঙ্গতই, ধরিলাম। অতএব স্কুল কলেজের শিক্ষাতেই সেই স্বাতন্ত্রিকতা রক্ষার চেষ্টা করা হোক।

তারপর হিন্দুশাস্ত্র নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারের যে সমর্থন করেন নাই, তাহার প্রমাণ কাত্যায়ন-সংহিতায়—

মান্যাচেন্ম্রিয়তে পূর্ব্বং ভার্য্যাপতিবিমানিতা।
ত্রীণি জন্মানি সা পুংস্তং পুরুষঃ স্ত্রীত্বমর্হতি॥

যদি নির্দ্দোষ- মাননীয়া স্ত্রী পতি কর্ত্তৃক অবমানিতা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তবে এই পাপের ফলে তাঁহার পতি তিন জন্ম স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হয় এবং সেই স্ত্রী তিনজন্ম পুরুষ-যোনি লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ অদুষ্টা ভার্য্যাকে যৌবনকালে পরিত্যাগে বন্ধ্যা স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এমন অভিশাপ আছে। [এস্থলে বলা সঙ্গত যে শাস্ত্রকারগণ পরলোকে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন, চার্ব্বাকের ছাত্র ছিলেন না।] মনু প্রভৃতিতে স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারে স্বামীর শারীরিক দণ্ডপ্রাপ্তি সম্বন্ধেও বিধি আছে। এ সকলের মধ্যে কয়েকটি আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে উদ্ধৃত করায় এস্থলে তাহার আলোচনায় ক্ষান্ত হইলাম।

মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন,

দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নমগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা চ॥

স্ত্রীজাতি দুই শ্রেণীর। যথা ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যো বধূ। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীদিগের জন্য উপনয়ন, অগ্নীন্ধন, বেদাধ্যয়ন এবং নিজগৃহে ভিক্ষাচর্য্যের বিধান করা হইয়াছে। সদ্যোবধূ নারীগণের জন্য এরূপ বিধান করা হয় নাই। উহাদের পক্ষে বিবাহই উপনয়ন সংস্কার এবং পতি-সেবাই গুরুকুলে বাস।—সত্যত্রেতাদি জ্ঞান প্রধান পুণ্যময় যুগে জ্ঞানী পুরুষ অনেক ছিলেন, এজন্য ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীও পাওয়া যাইত। এই হেতু ঐ সকল যুগে ব্রহ্মবাদিনী নারীর একটী বিভাগ হিন্দু সমাজের মধ্যে ছিল। এক্ষণে দিনে দিনে প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষেরই যখন বিশেষ অভাব ঘটিতেছে, তখন ব্রহ্মবাদিনী নারীরই বা উদ্ভব কোথা হইতে হইবে! জাতীয় অধীনতার মধ্যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান এদেশের নর-নারীকে উচ্চ হিমালয়-শৃঙ্গ হইতে নিম্নে বঙ্গোপসাগরের কূলে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে! যদি আবার উন্নত হইতে চাও, তবে পরানুকরণ ত্যাগ করিয়া লুপ্ত রত্নোদ্ধারের জন্য চেষ্টিত হও। যাহারা কয়েক শত বর্ষ পূর্ব্বেও আরণ্যক ছিল, তাদের অনুকরণে সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেকার মানব-সভ্যতার সৃষ্টি-কর্ত্তা অসাধারণ জ্ঞান গৌরব-দৃপ্ত মহিমায় জগৎপূজ্য পূর্ব্ব-পিতামহগণকে হীনভাবে গালি বর্ষণ না করিয়া তাঁহাদের সুগভীর চিন্তা ও মানব-হিতৈষণা-প্রসূত সূক্ষ্ম বিচার সকলের যথার্থ ভাবার্থ গ্রহণ-চেষ্টায় পূর্ণভাবে যত্নবান হও—সংগুরুলাভানন্তর হিন্দু শাস্ত্রের বাণী উত্তমরূপে বুঝিতে যত্ন কর; নিজেদের সামাজিক পারিবারিক রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক অবস্থা স্থির-চিত্তে প্রণিধান করিতে থাক। তারপর বৈদেশিকের সহিত তুল্য মূল্য ভাবে নিজ সমাজে এই সকল বিদেশী বিষ ইন্‌জেক্ট করার আবশ্যকতা আছে; অথবা রোগদুষ্ট ক্ষত শরীরকে স্বদেশী প্রলেপ প্রয়োগ দ্বারা সহজেই সুস্থ করিতে পারা যায় কি না, তাহার বিচার করিও। আমার মনে হয়, এদেশে বিদ্যার প্রচারের আবশ্যক যথেষ্ট আছে; কিন্তু অবিদ্যার নাই। অর্থাৎ মর্ত্ত্যের মোহিনীদের এবং স্বর্গের উর্ব্বশীদের জন্য সমস্ত এনার্জীটা (শক্তি) ব্যয় না করিয়া তৎপূর্ব্বে নিজেদের ঘরের মেয়েদের যাহাতে বিদ্যারূপিণী বাণী-কমলায় পরিবর্ত্তিতা করিতে পারি, তাহারই যত্ন লওয়া আবশ্যক। আর এই উপায়েই রম্ভা তিলোত্তমার সংখ্যা-বর্দ্ধন রোধ

হইবে। নতুবা অত্যাকে ঘরের বধূ করিলেও না, রাজ-লক্ষ্মীকে সমাজের নেত্রীর প্রতিষ্ঠা-প্রদানেও নয়; বরং ইহাতে ঐ শ্রেণীর মধ্যে পাপ-ভীতির হ্রাস হওয়া বিচিত্র নহে। তবে এই সঙ্গে পুরুষের পূর্ব্বের ন্যায় ব্যভিচারের জন্য কঠোর দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা যদি নর-নারীর সমবেত চেষ্টার দ্বারা পুনর্বিহিত হয়, তবে সমাজের অনেকখানি উপকার করা হইবে।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

এই যে এখানে সবুজ পাথর বসানো কী সুন্দর একজোড়া কাণের দুল! এর আগে কতবার এই দোকানটার পাশ দিয়ে গিয়েচি, কৈ, একবারও তো নজরে পড়েনি! কিনে নিই এটা তার জন্যে—পছন্দ হবে তো! জিনিসটা কিন্তু বেশ মানাবে তাকে—তার মিশ কালো চুলের থোকায় ঢাকা তুল্ তুল্ কাণদুটির কোল বেয়ে যেন দুটি ছোট্ট সবুজ পরী দোল খাচ্ছে!…ওধারে ওটা কি? একছড়া হীরের কণ্ঠি, না? পাথরগুলো কী ভয়ানক জ্বল-জ্বল করচে! ওর ওপর চোখ পড়লে চোখ একেবারে ঝল্‌সে যায়! সমস্ত টিকিটটা জুড়ে মণি-কার ওর দাম টুকে রেখেচে…ওটা কেনবার সাধ্য আমার নেই—ধীরা আমার হাতটা চেপে ধরে তার দুটি ডাগর আঁখি মেলে অনুরোধের স্বরে ঐ অলঙ্কারটা চাইলেও আমি হয়তো ওটা তার গলায় পরিয়ে দিতে পারতুম না…সত্যই পারতুম না! তা' এতে আর দুঃখ কি?…ধীরাকে আমি যা দিয়ে এসেচি, এবং দিতে থাকবো, তার দাম সে ওই রকম শত হীরের কণ্ঠির চেয়েও বেশী—ঢের বেশী!…ধীরাকে আমার দেবার আর কিছুই নেই…বাইরের কোন জিনিসই, কেন জানিনা, আমার চোখে লাগে না…কিন্তু এই দুল জোড়াটা! দাম এর খুব সামান্য হলেও প্রাণটা যেন এর কত উঁচু—এটা ব্যবহারের আনন্দ কোন বিশেষ শ্রেণী-সম্প্রদায়ের ভিতরে আবদ্ধ নেই—সবার কাছেই এ কেমন সুলভ আর সুন্দর!… অন্যদিকে আমার এই অতুল সৌভাগ্যের কথা জানানো হয়নি। ধীরা যে শেষে আমারই হবে, এ কথা শুনলে বড্ড সুখী হবে সে…এ পথটা আমার সম্পূর্ণ অজানা…বেশ যাচ্ছি! চাঁদের চোখে কি আজ ঘুম নেই…রাস্তার ওধারে গ্যাসের আলোর কাছে দাঁড়িয়ে ঐ লোকটা নিবিষ্ট মনে কি যেন পড়চে…নিশ্চয়ই কোনো জরুরী চিঠি হবে…ভোঁ! ভোঁ শব্দ করে মোটরটা একেবারে ওর গা ঘেঁশিয়ে চলে গেল…ভিজে মাটির গন্ধ নাকে এসে লাগচে আমার… বাগানের এ-পাশের এই বেঞ্চিটায় কতদিন এসে বসেচি। অজস্র ফুলের সুবাস এখানকার বাতাসকে ভারী করে' তুলেচে আজ…মাথাটা আমার ঝিম্ ঝিম্ করচে, সমস্ত দেহটা অল্পে অল্পে অবশ হয়ে আসচে…ঐ দূরে জাহাজের মাস্তুলের উপরকার ছোট্ট লাল আলোটা দপ করে' নিবে গেল!…আর ধীরা, ধীরা, তোমায় খুব বেশী করে' মনে পড়চে আজ! তুমি আমায় কত ভালবাস যে—হাঁ, বাস বৈ কি, নিশ্চয়ই! আমি তোমার কত অযোগ্য, কত দীনহীন আমি—তবুও তুমি অমন একান্ত ভাবে আমারই হাতে এসে আত্মসমর্পণ করলে!…তোমার গভীর অনুরাগের উত্তাপ আমার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে আচ্ছন্ন করে' রেখেচে আমাকে…ধীরা, আমার ধীরা! এমন যদি হোত—তুমি যদি আজ এখানে উপস্থিত থেকে আমার মাথাটা অতি সন্তর্পণে তোমার স্নেহ-কোমল কোলের উপর শুইয়ে রেখে আমার এই কপালে, চুলের ভিতরে তোমার নরম আঙুলের প্রান্ত ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিতে পারতে! ভারী আরাম লাগতো আমার! জীবনকে আমি…। কি যেন দেখলাম না? সামনের ওই বেঞ্চীতে ও কারা?…ধীরা, তুমি—ওখানে বসে, তুমি! তোমার পাশের ওই ছেলেটি কে? অবনী বুঝি?…না না, আমার এই চোখদুটোকে কিছুতেই যে বিশ্বাস করতে পারচি না! না, না,—হাঁ, ধীরা, তুমি

তো, সত্যিই একেবারে তুমি! কি কথা হচ্চে তোমাদের ওখানে, ধীরা?...হায়, হায়, আমায় দেখতেও পাচ্চো না? আমি কিন্তু তোমাদের আলোচনার প্রতি অক্ষরটি পর্য্যন্ত এখানে বসে' বেশ শুন্‌তে পার্‌চি!—উঃ ধীরা, এই কি জগতের ধারা, শেষটা তুমিও—? যা বল্‌বার আছে তোমাদের, এখানেই শেষ করে যাও তোমরা—শুনে আমি চলে যাই আমার এই অতৃপ্ত, উপবাসী দীন হৃদয়কে টেনে নিয়ে ওই নির্জ্জন পথ ধরে' এক সীমাহীন অন্ধকারের বুকের মাঝখানে!—

*　　*　　*

—ধীরা—

—কি, বলুন!

—অমন চম্‌কে উঠলে যে!

—হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম—

—কি ভাবছিলে ধীরা, বলবে কি আমায়? আমার জান্‌তে—

—কিন্তু সে জেনে তো আপনার কোন লাভই নেই অবনীবাবু!

—না, তবু—এমনি!

—কথাটা কি আপনার না শুনলেই নয়, অবনীবাবু?

—আচ্ছা তবে থাক, তোমার যদি প্রকাশ করতে একান্তই বাধা থাকে—

—বাধা! হাঁ, তা কিছু আছে বটে!

—কিন্তু আমি কি ভাবছিলুম জানো, ধীরা?

—কি ভাবছিলেন?

—সে একটা খুব প্রয়োজনীয় কিছু, যাকে কেন্দ্র করে আমার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আশা-ভরসা সমস্তই ঘোরা-ফেরা করচে!

—বেশ তো, বলুন না, সেটা কি—অবশ্য যদি আপনার কোনরকম আপত্তি না থাকে—

—আপত্তি নাও থাকতে পারে! কিন্তু কি জানো ধীরা, কথাটা হয়তো কারো কাণে অদ্ভুত বিসদৃশ শোনাতে পারে। আর তার ফলে তার সেই ভাল-না-লাগার দুঃখটা ঘুরে এসে আমার কাছে নিদারুণ শোণিতস্রাবী হয়ে উঠবে।

—এমন কি কথা অবনীবাবু?

—এমন আর কি! একটা সবুজ প্রাণ তার জীবনের সাঞ্চিত আশা-আনন্দ, সম্পদ, সুখ-সার্থকতা আর একজন মহিমময়ী দেবীর চরণতলে উৎসর্গ করে দিতে চায়!

—ধরুন, দেবী যদি তাঁর মহৎপ্রাণ ভক্তের শ্রদ্ধোপহার গ্রহণ করতে নিতান্তই অক্ষম হন, তাঁর যদি সে রকম সুকৃতি নাই থাকে? যদি তাঁকে বাধ্য হয়েই—

—প্রত্যাখ্যান করতে হয়! তা হলই বা! তাতে আর বিশেষ ক্ষতি কি? লোকটা হয়তো সেই মুহূর্ত্তেই উপেক্ষার পরিপূর্ণ ব্যথা বুকে নিয়ে তার ইহজীবনের আনন্দ-প্রতিমার সুমুখ থেকে নিঃশব্দে সরে যাবে আনন্দ-উত্তেজনার সম্পর্ক-বিহীন নিরাশার কোন্ এক গহন অরণ্যের শেষ প্রান্তে! সেখানে তার সঙ্গীহারা চিত্ত গোপন ব্যথায় মাঝে মাঝে আপনার মধ্যে আপনিই গুমরে উঠবে, চোখের জল ঝরতে ঝরতে চোখের কোণেই কখন আবার শুকিয়ে যাবে। তারপর একদিন—জেনো ধীরা সেদিন নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন সে এই নির্লিপ্ত জগতের তুচ্ছ দেনা-পাওনার হিসাব মিটিয়ে দিয়ে নিশীথ রাতের একটা ঘোর ঝড়-বাদলের ক্ষণে আপনাকে বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দেবে—জগতের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই থাকবে না!...সে আর এমন বিশেষ কি ধীরা!

—কিন্তু সে যে বড় করুণ, বড় দুঃখের হবে অবনীবাবু! আমার তো শুনে—

—না, না, এতে শিউরে ওঠার কোন প্রয়োজন দেখিনা। এ যে সুনিশ্চিত, এ যে ঘট্‌তেই হবে ধীরা! এর ভিতরে আর—

—যাই বলুন অবনীবাবু, আমার যদি সাধ্য থাক্‌তো তাহলে এমন অসম্ভবকে কিছুতেই সম্ভব হতে দিতুম না! দেখচেন না, এ একটা কত বড় হৃদয়-বিদারক দুর্ঘটনা! আমি যদি পারতাম, তাহলে—

—কি বললে ধীরা, তুমি যদি পারতে! হায়, এ কথা আমি তোমায় কেমন করে বোঝাবো ধীরা যে, সে এক তুমিই পারো, তুমি ছাড়া আর কারো সে সাধ্য নেই!

—আমি ছাড়া?

—হাঁ ধীরা, তুমি ছাড়া আর কেউ সে কাজ পারবে না! বুঝচো না যে, তুমিই সেই আনন্দ-প্রতিমা, যার কাছে সে—

—ক্ষমা করবেন অবনীবাবু! গোড়ায় আপনার কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝতে পারিনি, তাই এতটা প্রগল্‌ভতা দেখাতে পেরেচি। যদি আপনার কোন দুঃখের কারণ হয়ে থাকি, ক্ষমা চাইচি তার জন্যে। আমার কোন ক্ষমতাই নাই—সামান্য নারী আমি—আমার সম্বন্ধে এমন উচ্চ ধারণা আপনার না করাই উচিত ছিল! আপনার দুঃখ,—না, না, দুঃখই বা বলি কেমন করে! সংসারের সকলের কাম্য, আরাধনার বস্তু যা-কিছু সবই আপনার অপর্য্যাপ্ত আছে, এতটা পরিমাণে আছে সে, যা দেখলে অপরের মনে হিংসা পর্য্যন্ত জাগতে পারে, তবে—অকারণ মনের মধ্যে অশান্তিকে ডেকে আনবেন না এই আমার একান্ত অনুরোধ রইল আপনার কাছে। বাস্তবিক আপনার কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হচ্চে। ভগিনীর মতো সান্ত্বনা আপনাকে দিতে সব সময়েই আমি প্রস্তুত থাকবো কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়—তার বেশী দেবার শক্তিও আমার নেই! যে-কথা জীবনে একবার মাত্র বলা যায়—যার পুনরাবৃত্তি সারা জীবনেও আর সম্ভব হয়ে ওঠে না, সে কথা যে আমার বলা হয়ে গেছে অবনীবাবু! আপনি যেমন আমার বন্ধু ছিলেন তেমনিই রইলেন। আর আপনার মন যখন এত উন্নত, তখন আমায় ক্ষমা করা আপনার পক্ষে কিছু দুঃসাধ্য হবে না। চলুন, অনেক রাত হয়ে গেছে, আর এখানে থাকা যায় না। সুহাস বাবুর আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীতে আসবার কথা আছে—তিনি হয়তো এসে এতক্ষণ আমার জন্যে একা-একা অপেক্ষা করেন!

—কে ধীরা, সুহাসবাবু!

—হাঁ অবনীবাবু, তিনিই। আপনি বোধ হয় ভাবচেন, অনেক বড় বড় নামজাদা পাত্র হাতের কাছে থাকতেও সামান্য গৃহস্থ সুহাসবাবুকে কি না আমি—হয়তো আমার এই অপরিণামদর্শিতার জন্যে শেষে বহু দুঃখ ভোগ করতে হবে আমাকে! তা হোক, এ ছাড়া যে আর কোন উপায়ই নেই। আমাদের দুজনের অদৃষ্ট যে আমাদেরই অজ্ঞাতে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে যাবে।—সকল ইচ্ছার নিয়ামক যিনি, এ তাঁরই ইচ্ছা! যাক সে কথা! আপনার শোফারকে ডাকুন, বাড়ী ফেরা যাক্...ওই কোথায় একটা ঘড়িতে বোধ হয় আটটা বাজচে।

উঃ আমার নিশ্বাসকে যেন আমি ফিরিয়ে পেলুম...কি পরিপূর্ণ গ্লানিই এতক্ষণ আমার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিল...আর আমি...ধীরা, ধীরা, তুমি চল্লে···একবার জেনেও গেলে না—আজ আমার কত না বেদনা, কত আনন্দ...এখানকার সমস্ত বাতাস তোমার প্রেম-নিশ্বাসে ভরে উঠেচে···এই আলো ওই ছায়া···দূরে জলের কল-কল শব্দ···এই শীতলতা···ওই ফুল···এই গন্ধ আর এই সুনিবিড় নির্জ্জনতা সব মিশে গিয়ে একত্র হয়ে আমার অনুভূতিকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্চে···আমার জাগ্রত চেতনাকে আমি ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে ফেলচি...ধীরা, ধীরা, তুমি এত সুন্দর, তুমি এত···

২

পথ আমায় টেনে নিয়ে চলেচে···আমি চলেচি উধাও হয়ে—গতি আমার কত হাল্কা, কত লঘু···এ জায়গাটা কেমন গড়ানে গড়ানে বলে মনে হচ্চে· এখানকার বাড়ী গুলোর দেওয়াল সব খুব মাজা, কিন্তু—তার উপর আবার গ্যাসের আলো পড়ে আয়নার মতো চক্‌চক্ করচে · মার্কেট পার হয়ে গেলুম · এ সেই আপিসটা···কিনেমা হাউসে আজ এত ভিড় কিসের? কি বই প্লে হচ্চে? বাইরের ছবিগুলো কিন্তু খুব মন-মজানো! এই চেয়ারখানায় বসা যাক···আমার পাশের ওই তরুণ-তরুণী দুটি কারা?···মেয়েটিকে অনেকটা ধীরার মতোই দেখাচ্চে না? তাইতো, এ কি, ধীরাই যে ওখানে!...পাশে বসে ও লোকটি কে?···হীরেনবাবু বুঝি,—হাঁ, তিনিই তো দেখচি!···ধীরা আমার দিকে একবার চেয়েও দেখচে না কেন? আমিও এসেচি যে···অমন বিভোর হয়ে ও কি সব কথাবার্ত্তা হচ্চে তোমাদের···তোমার মুখে অমন শীর্ণ কাতরতার চিহ্ন

ফুটে উঠেচে কেন ?··· আমায় কি একেবারে ভুলে গেচ তুমি !···তোমার জগতে কি স্থহাসের স্থান আর মিলবে না ? তুমি ধীরা, তুমি যে আমার ··না, না, থাক···আমায় মুক্তি দাও তুমি—আমি আর এ সহ্য করতে পারচি না।··· বেশ তাই হোক, তোমার নিজের মুখ থেকেই তোমার মনোগত ভাবটা জেনে রাখি··· .

*   *   *

—না জেনে তোমায় অনেক দুঃখ দিলুম, ধীরা !

—না, না, দুঃখ কিছু নয়। মিথ্যে নিজেকে ও-রকম অপরাধী করে তুলবেন না ! ভুল আর কার না হয় হারেনবাবু !

—কিন্তু এ যে একটা—আমি কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারচি না ধীরা। হয়তো ভাবচো, আগেকার এই মানুষের সঙ্গে এখনকার এই মানুষটার কতই না তফাৎ ···বিলেত ঘুরে এসে এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে বোধ হয় ! যে সুন্দর সম্বন্ধটা এতকাল অটুট থেকে এসেচে, আজ কিনা স্বেচ্ছায় এ-লোকটা সেটাকে নিষ্ঠুর অবিবেচকের মতো মাড়িয়ে ফেলে অকস্মাৎ নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করে দিলে···উচ্চ শিক্ষা লাভ করে এর কত না গর্ব্ব··· একবার গোপনে অনুসন্ধান করবার প্রয়োজনও বোধ করলে না যে, এ পর্য্যন্ত কি জিনিসই সে পেয়ে গেচে ··

—থাক ! থাক ! আর ও-সব কথার উল্লেখ করবেন না ! কেন নিজেকে এমন করে শুধু শুধু পীড়ন করচেন বলুন তো ? এতে যে আমার দুষ্কৃতির বোঝা বেড়েই যাচ্ছে হারেনবাবু।

—তোমার ?

—হ্যাঁ আমারই ! আপনার যা-কিছু অনুশোচনার কারণ সে তো এক আমিই ! আমার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেচেন আপনি, অথচ আমায় ক্ষমা করার তো কোনই চেষ্টা করচেন না ?

—তোমায় আবার ক্ষমা কিসের ধীরা ?

—ক্ষমা সে আমারই সব চাইতে বেশী প্রয়োজন হারেন বাবু ! সাধারণ মানুষে যা করে থাকে, আপনিও ঠিক তাই করেছেন। এতে দোষ আপনাকে মোটেই দেওয়া যায় না, বরং এইমাত্র যে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান-বাণী আমার মুখ থেকে পেলেন—

—না, না, প্রত্যাখ্যান একে কোন মতেই বল্‌তে পারি না। আপনার মত কৃতবিদ্য সুশ্রী ও অর্থবানকে বঞ্চিত করা আমার কেন অনেক মেয়েরই বোধ হয় নেই··· বেশী কিছু বলে আমায় প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেন নি, যে, এইটেই হচ্চে আপনার মহৎ প্রাণের প্রকৃষ্ট পরিচয়··· বুঝতেই পাচ্চেন, কেন, আপনাকে স্বীকার করতে পারচি না আমি···আমার জীবনের আনন্দ বলুন, সফলতা বলুন, নারীর পূর্ণ বিকাশের সমস্ত আয়োজনই আমি স্বেচ্ছায় আর একজনের হাতে সঁপে দিয়েচি যে···মাকে বুঝিয়ে বলবেন···আপনার কথা শুনে তিনি হয়তো খুবই দুঃখিত হবেন···বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় আপনি, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি সুখী হতে পারি, সকল সময়েই স্বামীর উপযুক্ত হবার সুকৃতি যেন আমার হয় !

--বেশ ধীরা, তাই হোক ! সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, তোমাদের বিবাহিত জীবন আনন্দের হোক। আমার আর বিশেষ কিছু দুঃখ নেই ধীরা, তুমি আজ আমাকে যে অধিকার দান করলে, ভবিষ্যতে সেই অধিকারের মর্য্যাদাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখে চল্‌তে পারি, নিজের মনের কাছ থেকে এই বিশ্বাসটুকুই চাই ! আর···আর···

*   *   *

ওগো সুন্দর, ওগো মহৎ, আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার নমস্কার গ্রহণ কর তুমি ! তোমার শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণের যে মহিমা তুমি আজ আমার চোখের সামনে প্রচার করে দিলে, যে বিপুল আত্মত্যাগের পরিচয় জানিয়ে দিল তোমার ওই সৌম্য প্রশান্ত করুণ মুখখানি—সমস্ত জীবন ধরেও আমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে উঠ্‌তে পারবো কিনা সন্দেহ !—এর আগে যতটুকু পরিচয় তোমার পেয়েছিলাম, তাতে তোমায় আমার জীবনের কুগ্রহ বলেই জেনেছিলাম কিন্তু এখন বুঝচি যে, তুমিই আমার আনন্দ-বিধায়ক দেবতা, আমার জীবনের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ—আর ধীরা, তুমি ?—

তোমার নিষ্ঠা-সুন্দর মুখের পানে সমাজ সংসার সব ভুলে অপলক দৃষ্টিতে কেবল চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়—তোমার ওই চাউনি কী গভীর রহস্যাকুল, অথচ কেমন স্নিগ্ধ আবেশময়, সংযত ও স্থির—এখন কি আনন্দ, কি গৌরব আর কি এক অব্যক্ত ব্যথায় সারা বুকটা আমার তোলপাড়িয়ে উঠচে, তা যদি তোমায় জানাতে পারতাম ধীরা। …আলোয় অন্ধকারে সব একশা হয়ে যাচ্চে, আমার চোখের সামনে, সব……

৩

—মুখ ফুটে না বল্লেই কিছু সকল কথা গোপন থাকে না, ধীরা! এখানে আসার পর থেকেই দেখচি, তোমার অমন সুন্দর মুখশ্রী যেন দিন দিন ম্লান বিষণ্ণ হয়ে যাচ্চে! আমার মনে হয়, তোমার পূর্ব্বেকার সেই অগাধ স্বচ্ছন্দ স্ফুর্ত্তি যেন তুমি হারিয়ে ফেলেচ!—সবই প্রথম থেকে জানতে তুমি, কিন্তু জেনেও কেবল আমার মুখ চেয়ে আমার স্বার্থ-পূরণের জন্য নারী-জীবনের অনেক-কিছু সুখ-স্বচ্ছন্দতাকে চির-নির্ব্বাসিত করে এমন ভাবে ছুটে এলে কেন? কত সময়ে তুমি যে মানবী, সেই কথাটাই ভুলে যাই—কোন্ এক শাপগ্রস্তা দেবী এসেচো তুমি আমার আঁধার-মলিন কুটিরকে উজল-মধুর করে তুলতে সুশুভ্র প্রেমের অনির্ব্বাণ প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরে—

—ওগো, পায়ে পড়ি তোমার, অমন ভুল বুঝোনা আমায়! দেবী আমি নই একেবারেই—দেবতার পাশে স্থান পেয়েচি বলে মর্য্যাদা যদি কিছু বেড়ে থাকে আমার ত সে অন্য কথা, কিন্তু মনে রেখো যে, সেটা তোমারই অনুগ্রহে—নিজের স্বার্থ বুঝি না, এমন সহজ সুস্পষ্ট সত্য গোপন রাখাও যে পাপ গো—স্বার্থের সম্বন্ধে চেতনা সবার মনেই জেগে আছে—তোমায় বরণ করেচি আমার নিজেরই স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে—জাননা। তোমাকে দিয়েই আমার সেই স্বার্থকে অপূর্ব্ব সার্থকতায় ভরিয়ে তুলবো—আমার সকল অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে নেবো!

—জানিনা ধীরা, কতটা আকাঙ্ক্ষা তোমার পূর্ণ হবে আমাকে দিয়ে, কতখানি সফলতা এনে দিতে পারবো আমি তোমার জীবনের ক্ষেত্রে—কেবলি মনে হয়, এই যে গৌরব আর মর্য্যাদার বিপুল বোঝা ক্রমাগতই আমার দুর্ব্বল ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে আসচো, এদের উপযুক্ত আমি নইতো বটেই—এ শুধু তোমারই পরিপূর্ণ নারীত্বের নিদর্শন, আমায় পুরস্কৃত করে এ তার নিজেকেই মহিমান্বিত করে তোলা—

আপনাকে তুচ্ছ অবনত করে দেখানোই যদি তোমার কাছে বিনয় হয়, তাহলে সে রকম বিনয়ে পুণ্য তো নেই-ই বরং পাপ যথেষ্ট আছে—তাতে অন্ততঃ সত্যি কথা বলতে কি, আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। কেন তুমি আপনাকে এত হীন ভাব বল দেখি, কার চাইতে কিসে ছোট তুমি, বুঝিয়ে দিতে পার আমায়?—হয়তো তোমার এই সাদাসিদে চালচলনটা বাইরের লোককে লুব্ধ নাও করতে পারে। আর তাতে আসে-যায় কি? আমি বলি কি, অন্তরের দিকটা—সেখানে তো আসল জিনিসকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না! সে হিসাবে কারো ঘৃণার কিম্বা তাচ্ছিল্যের পাত্র তো তুমি নও! হৃদয়ের সম্পদে শ্রদ্ধার অঞ্জলি অনেকেরই কাছে পেয়েছ তুমি—

—না ধীরা, তোমার এই প্রশংসাগুলো আমার প্রতি তোমার সুগভীর অনুরাগের নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়…আমি যে সম্পদ-বিহীন…বাস্তব নিষ্ঠুর বলেই তাকে বাদ দিয়ে দিলে তো চল্‌বে না!

—কিসের বাস্তব? কেন আমায় এত করে দুঃখ দিচ্চো! কি সুখ, কি তৃপ্তি, আর কি সফলতার প্রার্থী হয়ে মিলিত হয়েচি আমরা?…সে কি বাইরের ই সাজসজ্জা আভরণের মহোৎসব,…আড়ম্বর আর বাহুল্যের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে জীবনের খাঁটি জিনিষটাকে বর্জ্জন করতে প্রাণ চায় কি তোমার?…আমার সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানের একান্ত প্রয়াসী তুমি, এ কথা আমি কোনদিনই ভুলে যাব না।… কিন্তু বলি কি, বিরাট সাজসজ্জার নিষ্পেষণ প্রকৃত অস্তিত্বকে আমার অসাড় করে দিয়ে একটা প্রাণহীন জড়পদার্থের মতো আমাকে ঘুরিয়ে বেড়িয়ে নিয়েই কি সুখী হবে তুমি… আর ভাব কি, সেই রকমটি হলে আমিও নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো…আমার এতকালের শিক্ষা-দীক্ষা, আমার

সুস্থ মনের সুন্দর সুসংহত গতি, আমার...এই গুলোই কি আমার অতুল ঐশ্বর্য্য নয়? এ দিয়েই তোমার বুকের আনন্দকে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হবে না? যাই বল তুমি, এরাই আমার সংসার-পথের পাথেয়,—এ ছাড়া আর কোন সম্বলই আমার নেই। বিলাস-লীলায় আমার মন উঠলো না, তাই না তোমার সরল প্রাণের শীতল ছায়ায় একটু আশ্রয় পাবার জন্য এমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চ'লে এলাম—কোন-কিছুরই প্রলোভন আমায় ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না! আমি চাই আমার আধ-ফোটা নারীত্ব তোমার প্রেমের স্বর্ণালোকে পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠুক! তোমার অপ্রমেয় ভালবাসার কাছে দীক্ষা লাভ করে আমার ভিতরকার নারী-মহিমা সহানুভূতির মন্ত্র নিয়ে বিশ্বের বেদনাক্লিষ্ট মানবতার বুকে আশার সঞ্চার করতে শিখুক্—ওগো তাতেই আমার মুক্তি, আমার স্ত্রীজন্মের সার্থকতা!

—ধীরা, ধীরা তুমি যে এত সুন্দর আর এমন আশ্চর্য্য আগে তা জানতুম না তুমি এই পৃথিবীতে বাস করচো, এখানকার বাতাস থেকে নিশ্বাস গ্রহণ করচো, তাই বুঝি এ এত সুন্দর! এই যে আমার বুকের উপর তোমার মাথাটা এলিয়ে রয়েচে, তোমার অবাধ্য চুলের গোছার সূক্ষ্ম কোমল স্পর্শ আমার গায়ে হাতে সর্ব্বত্র একটা তড়িৎপ্রবাহ বইয়ে দিকে এরা কত সুন্দর আমি কত সুন্দর আজ এইখানেই আমাদের নিবিড় মিলনের অবসান হোক না ধীরা! তোমায় আর বেশী করে পেতে চাই না আমি—অন্ততঃ আশা করবার জন্যও কিছু থাক! যেটুকু পাওয়া বাকী রইল—জীবনের শেষ নিশ্বাস নেবার সময় পর্য্যন্ত আমার সেই না পাওয়ার দুঃখের ভিতর দিয়ে আজকার দিনের এই পাওয়ার স্মৃতি আরো উজ্জ্বল, আরো মধুর, স্বপ্ন মণ্ডিত হয়ে উঠবে!

শ্রীবিনয় চক্রবর্ত্তী।

প্রেম

মন-ভোলা নীল-গোলা কা'র দুটি আঁখিতে
দরদী এ আঁখি মোর মন চায় রাখিতে?
ভালোবাসা মাখা কা'র দরশন লাগিয়া
শিহরিয়া ওঠে মোর তনু মন জাগিয়া?

লজ্জায় উজ্জ্বল চোখ মুখ সিঁদুরে,
উন্মুখ উৎসুক দৃষ্টি কি মধুরে!
আল্‌তার রং ঢালে কার দুটি অধরে—
ঝরঝর্ ঝরে তায় শিউলি সে নধরে!

অঞ্চলে বাঁধা কা'র জুঁই-চাঁপা-কবরী,
চারিধারে ভারে ভারে ঢালে শুধু সুরভি।
সুষমার কারাগার অঙ্গের গহনা
জ্যোৎস্নায় ঝিল্‌মিল্ ঢেউ তোলে লহনা!

ঝঙ্কারে কা'র বীণা বাদলের কি সুখে?
ঢলঢল্ কাঁধ দুটি হার মানে শিশুকে!
বাধ-বাধ উচ্ছল কা'র আধ হাসিতে
অবহেলে সুর তোলে মরমের বাঁশীতে?

ঝিনিঝিনি শিঞ্জিনী ওঠে কা'র নূপুরে,
স্বপনের মোহ ঢালে বোশেখের দুপুরে!
চলনেতে গুরুভার পায়ে পায়ে বাঁধনা,—
দেখিবারে কবি তায় করে কত সাধনা!

থর থর পরে পর চুম্বন চপলে—
সিঁদুরের রঙ খেলে কা'র রাঙা কপোলে?
মুখ'পরে মুখ রেখে বুক রেখে বুকেতে,
স্বর্গের কোন্ ঘুম ঘুম দেয় সুখেতে!

শ্রীমনোরমা দেবী।

ভারতে শ্রমিক বিবর্ত্তন

শ্রমিক বিবর্ত্তন সম্বন্ধে ভারতের চিন্তাশীল নেতৃবর্গ কি বলেন, দেখা যাক্। প্রথমে ভারত-জীবনে জীবনদাতা নবযুগ-প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধীর কথা শুনুন। তিনি কলকারখানা-যুগের বিরোধী। ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রে এক কথায় লিখেছিলেন, "আধুনিক কল-কারখানায় যুগ আদিম প্রস্তর যুগ অপেক্ষা উন্নত কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, সে বিষয়ে আমি উদাসীন।" এই ইনড্‌সট্রিয়লিস্‌মের ভয়েই চরকা-তাঁতের প্রচলনে তিনি সতত জাগ্রত। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় Industrialismএর যে বিশেষ বিরোধী ছিলেন, তা তাঁর "কমলাকান্তের দপ্তর" পড়লে বেশ বোঝা যায়। ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জনও এর বিরোধী। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন ;—"Industrialism বাঙ্গলা দেশে চালাইতে আরম্ভ করিলেই আবার নূতন করিয়া আমাদের বিনাশের পথ প্রস্তুত হইবে। বিলাতি ফ্যাক্টরী রাক্ষস তাঁহার রাক্ষসী মায়ায় আমাদিগকে একেবারে শেষ করিয়া ফেলিবে। বিলাতি কারখানায় নানান কারখানা করিবে। নিজেরা সেই কল-কারখানায় কলের চাকার মত ঘুরিব, প্রাণহীন স্তব্ধ জড়বৎ হইয়া সে চাকায় দাঁতের সঙ্গে মিলাইয়া আমাদিগকে লাগাইয়া দিব—সেই দাঁতে দাঁত লাগিয়াই থাকিবে,বিদ্যুতের কল টিপিয়া ধনী মালিক আমাদের চালাইবে—তাহাদের টাকা আছে, আমাদের পোকাপড়া রসযুক্ত অস্থি-মজ্জা আছে, যতদূর পারিবে মালিক আমাদের রসভার হরণ করিবে।······ইউরোপের এই কল-কারখানায় ফল, শ্রম, ব্যর্থ হইয়া আকাশ-পানে নিরর্থক চাহিয়া আছে এবং যে সব শ্রমজীবীদের রক্ত-মাংস দিয়া এত অর্থ অর্জ্জিত ও সঞ্চিত হইয়াছে, সে অর্থও সার্থক হয় নাই। ইহারই ফলে Strike Combine Socialism! খৃশ্চান ইউরোপ গত তিনশত বৎসরের Industrialismকে বরণ করিয়া খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করিয়াছে ; মানুষকে, মানুষ ও দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে এবং শুধু অর্থের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া নিজের জীবনকে পিশিয়া মারিতেছে। আমরাও কি এই Industrialismকে বরণ করিয়া আমাদের জীবনকে অমনি করিয়া সকল রকমে ব্যর্থ করিয়া দিব ?······এই Industrialismএর যজ্ঞে শুধু হৃদয় নহে, এই জাগরিত বাঙ্গালী জাতির যে আত্মা, তাহাই ছাগবলি. আমাদের মরিবার ইহাই প্রশস্ত পথ, আমাদের বাঁচিতে হইলে ইহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে।"

বর্ত্তমান যুগের প্রায় সকলেই ইহার বিরোধী এবং যথেষ্ট নিন্দা করেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই নবজাত ইনড্‌সট্রিয়ালিস্‌ম্ শিশু ভারতের প্রাঙ্গণে শৈশবের খেলা আরম্ভ করেছে, তাকে আমরা বুকে তুলে নেব, না, ফেলে দেব, তার দীর্ঘজীবন কামনা করব, না, য়ুরোপের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ভয়ে একে দূরে পরিহার করব, বা গলা টিপে কি বিষদানে এর অকাল মৃত্যু ঘটাব ? অনেকে সমস্বরে হয়ত বলে উঠবেন, না, না, সাবধান, ওটা একটা বিলিতি শয়তান দানব, সুকুমার শিশুরূপে আমাদের ভোলাতে এসেছে—মার, মার, ওকে এখনি মেরে ফেল, ওর এক ফোঁটা রক্তও যেন মাটিতে না পড়ে।

ভারতের মনীষীরা যাকে হাসিমুখে বিদায় দিতে চেয়েছেন—আশ্রয় দিচ্ছেন না—যার আশু মৃত্যু কামনা করছেন, তাকে কেমন করে কোন্ সাহসে আশ্রয় দেব—বুকে তুলে নেব ! যে সাহসে ঈশা অভীতিকুঞ্চিত ললাটে ক্রশবদ্ধ হয়েছিলেন, লিওনিডস্ থার্ম্মোপালি-গিরিসঙ্কটে অগণিত পারস্য সেনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই সাহসে বলছি—ওগো নবীন অতিথি, ভয় নেই, তুমি এস, তুমি বস ধূলা-পায়ে তোমায় বিদায় দিতে পারব না। মৃত্যুকে কেন আলিঙ্গন করলাম, পিশাচকে কেন দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করলাম—সর্পকে কেন গৃহে আশ্রয় দিলাম—ধ্বংসকে কেন শরণ করলাম—অমঙ্গলকে কেন বরণ করলাম—সবার দুয়ার হতে হতাশে যে ফিরেছে তাকে কেন স্থান দিলাম ! এই কেনর উত্তর দেবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা।

যাঁরা ভারতে এই বিবর্ত্তন প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী নন তাঁরা সকলেই পাশ্চাত্য ইনডস্‌ট্রিয়ালিসমের যৌবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি দেখে ভয় পেয়েছেন। তাঁদের প্রকৃত আপত্তির কারণ ত ঐ এক যে ধর্ম্মের কাঁচাবুনন পাতলা কাপড়খানা যা ভারতের জনসাধারণকে ঢেকে রেখেছে, কল-কারখানা হলে তার উষ্ণ নিশ্বাসে ওখানা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এইটেই যদি ভয়ের কারণ হয়ে থাকে তা হলে Industrialism-কে একমাত্র দায়ী করলে চলবে না। দায়ী হল অর্থ। অর্থই যদি দায়ী হয় তা হলে হস্তশিল্পের দ্বারাও অর্থ আসতে পারে—দেশ সমৃদ্ধিশালী হতে পারে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রধান প্রধান জাতি ও দেশের পতন হয়েছে যখন তাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা এসেছে; দুর্ব্বলতা এসেছে, যখন তারা ধর্ম্মভাব হারিয়েছে; ধর্ম্মভাব হারিয়েছে, যখন তারা বিলাসী হয়েছে; বিলাসী হয়েছে যখন তারা অর্থশালী হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে দুঃখের মূল ঐ অর্থ, পণ্ডিতেরা যাকে অনর্থ বলেন। কাজেই দেশে কলকারখানা হলেই যে লোকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও নীতিচ্যুত হবে সে ধারণা ভুল। দেশ যখন বিত্তশালী হবে, নীতি তখন তখন শীতের পাতার মত আপনি ঝরে পড়বে, ধর্ম্ম তখন সাপের খোলসের মত স্বতই লোকদের ছেড়ে যাবে।

এঁদের দ্বিতীয় আপত্তির কারণ হচ্ছে যে এখানে যদি কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা হয়, আর তাতেই যদি সমস্ত উদ্যম, অধ্যবসায় ও অর্থ নিয়োজিত হয়, তা হলে আর একটা বড় জিনিষ রয়েছে—যার ওপর জীবন-মরণ নির্ভর করে, সেটার সমান আদর হবে না। সে জিনিসটা হচ্ছে কৃষি! কৃষির অনাদর হলেই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হবে। দেশে Industrialismএর প্রসার হলে কৃষির প্রসার কমে যাবে, এটাও একটা ভুল ধারণা। হবে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঠিক এর উল্টা। আধুনিক কল-কারখানাগুলোকে সচল রাখতে হলে দেখা যাচ্ছে যে raw material অর্থাৎ কৃষিজাত কাঁচা মালের দরকার। বর্ত্তমান ব্যবসায়-বাণিজ্যের মূল সূত্র হচ্ছে Competition। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করতে হলে শস্তায় মাল সরবরাহ করতে হবে। এক দেশে ফ্যাক্টরি করে আর এক দেশ থেকে কাঁচা মাল আমদানি করতে হলে খরচায় পুষিয়ে ওঠে না। যেখানে কারখানা সেখান থেকেই কাঁচা মাল সংগ্রহ করতে হবে। Industrialism খুব বেশী সফল হয়েছে যুক্তরাজ্য আমেরিকায়—কেন না সেখানে কাঁচা মাল তৈরী হয়, সেখানে চাষের আদর যথেষ্ট আছে, Raw materialএর জন্যে তারা পরামুখাপেক্ষী নয়। কাজেই আশা করা যায়, ভারতবর্ষের মত প্রকাণ্ড জায়গায় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হ'লে চাষের অনাদর না হয়ে আদর হবে—এক নূতন উদ্দীপনা জাগবে। যত বেশী কল-কারখানা হবে, চাষের প্রসার ততই বেড়ে যাবে—তখন যে সমস্ত জমি পতিত ছিল, তার আবাদ আরম্ভ হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, industrialism চাষের ক্ষতি না করে উল্টে বরং সাহায্য করবে—কেন না, সে ত স্পষ্ট বুঝতে পারছে তার জীবন-প্রদীপের সলতে হল কৃষি—এর জীবনে তার জীবন, এর মরণে তার মরণ! এদের সম্বন্ধে অচ্ছেদ্য!

তারপর দুর্ভিক্ষের যে ভয় করা হচ্ছে, সেটাও অমূলক। আমাদের দেশে কতবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে—সে খাদ্যের নয়, অর্থের দুর্ভিক্ষ। ভারতবর্ষের মতন এত-বড় জায়গায় এমন কখনও হয়নি—যতই অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উৎপাত হউক না কেন—যে একেবারে খাদ্য-শস্য জন্মায় নি! তবে কিছু কম জন্মাতে পারে, এই পর্য্যন্ত। প্রতি বছর যে দলে দলে লোক মরছে সে খাদ্যের অভাবে নয়—খাদ্য কেনবার সামর্থ্যের অভাবে। ১৯১৮ সালে যে ফ্যামিন কমিশন বসেছিল, তাঁরা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন:—We think the surplus produce of India, taken as a whole still furnishes ample means of meeting the demand of any part of the country likely to suffer from famine at one time, supposing such famine to be not greater in extent and duration than any hitherto experienced.*

এই আসন্ন দুর্ভিক্ষের হাত হতে পরিত্রাণ পেতে হলে দেশের অর্থ বাড়াতে হবে—আর অর্থ বাড়াতে হলে কল-কারখানার আশ্রয় নিতে হবে। এখন কথা হতে পারে

* Report on Famine Commission, 1918 p. 358

যে কুটীর-শিল্পের দ্বারাও দেশকে সম্পদশালী করা যেতে পারে। সত্য, কিন্তু তাতে অনেক বিলম্ব হবে—বিলম্ব যে নয় না। কুটীর-শিল্প কল-কারখানার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। Industrialism কে ডাকতেই হবে। Sir H. S. Cunningham বলেছেন, The direct, deliberate and systematic promotion of industrial enterprise is not a less important duty and its thorough recognition by the state would, I believe, be the most important administrative reform of which the Indian system is capable. *

একটু আগে যাকে নবীন অতিথি বলে উল্লেখ করেছি, সে শুধু নবীন অতিথি নয়, অনিমন্ত্রিত অভ্যাগতও বটে—সে বিনা-নিমন্ত্রণে আমাদের বাড়ী এসেছে। তাকে তাড়ানো দায়! ও শিশুর মৃত্যুর কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না—ওকে বিষ দিলে প্রহ্লাদের মতনও তা হজম করে ফেলবে। একটা প্রবাদ আছে, সময় ও জলস্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য-স্রোতও কারও জন্য অপেক্ষা করবে না। সুবিধা আমি না গ্রহণ করলে আর একজন করবে। আমরা না হয় শ্রমিকবাদকে দূর ছাই করে তাড়িয়ে দিলাম—আমল দিলাম না; কিন্তু মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষ শুধু আমাদের নিয়ে নয়—আমরা ছাড়া আর একটা জাত ভারতে বাস করে। তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও ক্ষমতায় অতি প্রবল। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই শ্রম-বিবর্ত্তনকে প্রবর্ত্তন করতে না চাইলে সাগর-পার থেকে শ্বেতের দল দলে দলে এসে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবে। Industrialism এর দরুণ যে সমস্ত ভয় করা হয়ে থাকে, সে সবই সত্য হবে, তা ছাড়া লাভের সময় ব্যাঙ্ আর লোকসানের সময় ঠ্যাং প্রবাদেও সফল হবে। এ দেশের লোক শুধু মজুরে পরিণত হবে আর তাদের কঠোর পরিশ্রম-প্রসূত অর্থ চলে যাবে সাত হাজার মাইল দূরে একটা ছোট দ্বীপে এবং সেই অর্থে কামান-গোলাগুলি খরিদ হয়ে এদেশের অধিবাসীদের আত্ম-কর্ত্তৃত্বের চেষ্টাকে অবমাননা করতে, এদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে বিনষ্ট করতে নিত্য নূতন জালিয়ানওয়ালা সমাধি-সৃষ্টির সাহায্য করবে। ব্যাপার হচ্ছেও তাই। আমরা ধর্ম্ম কর্ম্ম সব নষ্ট হবার ভয়ে দেশে industrialism চালাতে ভয় পাচ্ছি—চোখ বুজিয়ে চুপ করে বসে আছি অথচ দেখতে দেখতে চোখের সামনে ভাগ্যান্বেষীর দল ভাগীরথীর দুই পারকে factoryর মালা পরিয়ে দিল, তা আমাদের হুঁস নেই! তাদের ষ্টীমার তাদের জাহাজ ভাগীরথীর বুক চিরে বাঁশি বাজাতে বাজাতে বিজয়-উল্লাসে সকালে সন্ধ্যায় রোজ দুবেলা পাট বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই পাট যখন ম্যানুফ্যাক্চর্ড্ হচ্ছে, কিনচি আমরা—তারা পাচ্ছে শতকরা দেড়শত দু' শত টাকা লাভ। বছর বছর রপ্তানি করছি তুলা ৪১ ক্রোর টাকার, বীজ ২৬ ক্রোর টাকার, পাট পৌণে ৩১ ক্রোর টাকার, চামড়া সাড়ে ১১ ক্রোর টাকার, পশম ২½ ক্রোর; এমনি করে ১২২½ ক্রোর টাকার জিনিস; আর এই জিনিস যখন বিলাত থেকে তৈরী হ'য়ে আসছে তখন দাম দিচ্ছি ১৯১ ক্রোর টাকা। বছরে ৬৯ ক্রোর টাকা লোকসান দিচ্ছি। এমনি করে কয়লা, সোনা, অভ্রের খনি থেকে আরম্ভ করে পাটের, কাগজের কারখানা পর্য্যন্ত কিছুতেই আমরা হাত দিচ্ছি নে—ভয়, পাছে industrialism ঢুকে পড়ে। এত ভয় সত্ত্বেও ১৯১৯ সালেই ২৫৬০টা কারখানা স্থাপিত হয়েছে। তাদের একটা বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল। †

কাপড়ের কল	...	২৩৫ টা
তুলা জাঁত দেবার কল	...	১১৬৬
পাট কল	...	৬০
পাটজাঁত দেবার কল	...	১১৫
পশমের কল	...	৪
কাগজের কল	...	৮
রসদের কারখানা	...	১৬
মদ চোলাই কারখানা	...	২২
ধানের কল	...	২১৯

* Quoted by Dr Banerjee.

† A study of Indian Economics By Prof, P, N, Banerjee, ১০৮পৃঃ

ময়দার কল	...	৩৮
চিনির কারখানা	...	২৫
জাহাজের কারখানা	...	২৩
নীলকুঠী	...	৪৯
লোহা-পিতল ঢালাই কারখানা	...	৮৫
পেট্রোলিয়ম পরিষ্কারের কারখানা	...	৩৪
গালার কারখানা	...	৭
ছাপাখানা	..	৬০
রেলওয়ে কারখানা	...	৫৯
কাঠ-চেরাই কল	...	১০২
রেশমের কারখানা	...	৬৩
টালির কারখানা	...	২৮

এই যে এত গুলা ফ্যাক্টরি হয়েছে, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এতে ভারতবাসীর ভাগ খুব কম আছে। দেশের সর্ব্বনাশ উপস্থিত—সমস্ত টাকা বিদেশ চলে যাচ্ছে তবু আমরা একবারও ফিরে চাইচি নে! টাকা কেবল সুদে খাটাচ্ছি নতুন কলকারখানা করে নিজেদের ঝুঁকি নিতে রাজী নই। ভারত গবর্ণমেন্টের জিওলজিক্যাল সরভের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর জেনারেল স্যর টমাস হল্যাণ্ড বলেছেন, বড়ই দুঃখের বিষয় যে মাদ্রাজে পেট্রোলিয়ম খনির জন্য যে টাকার প্রয়োজন তা য়ুরোপ থেকেই তোলা হয়; লভ্যাংশ কাজে কাজেই এ দেশ ছেড়ে সেখানে চলে যায়। এই ভাবে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতবর্ষের লোকসান হতে থাকবে, যত দিন না এ দেশের ধনীরা তাঁদের পুঁজি খাটাবার ঝুঁকি না নেবেন। Sir. P. C. Roy এদের foreign exploiters বলেছেন। আমরাও সকলে হাঁক্-ডাক ছাড়ছি চোর, দস্যু, ডাকাত, শয়তান সব নিয়ে গেল—কিছু রাখলে না গো, কিছু রাখলে না! এখন রাগ করলে চলবে কেন? অভিমান করলে সাজবে কেন? গাল দিলে শোভা পাবে কেন? আমরা নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি আর মারছি। যাদের দস্যু ডাকাত বলছি তাদের ত আমরাই এনেছি—আর আমরাই ত আমাদের রত্নরাজি যেচে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আমার টাকার সিন্দুকটা যদি ডালা খুলে রাজপথে বসিয়ে রেখে দি আর যদি কোন ভাগ্যবান দেখতে পেয়ে নিয়ে যায়, তা হলে তাকে চোর বল্‌লে চলবে কেন? বিদেশী শাসক, সে ত লাভ করতেই এসেছে। দোষ আমাদের, আমরা তাদের লাভের পথ পরিষ্কার করে দি কেন?

১৯০৬ সালে Indian Industrial Conference-এর সভাপতির অভিভাষণে স্যর ভিটলদাস দামোদর ঠকারসে বলেছেন, "But when we turn to the petroleum industry in Burma, the gold mines of Mysore, the coal mines of Bengal, the tea and jute industries, the carrying trade by sea, and the financing of our foreign trade by foreign banks we come upon another and less favourable aspect...... It is the huge profits of some investments that we find cause for complaint. In such cases, I cannot but think that it would be to the permanent good of the country to allow petroleum to remain under-ground and gold to rest in the bowels of the earth until the gradual regeneration of the country...enables her own industrialists to raise them and get the profits of industries."

আমাদের অবস্থা হয়েছে ঠিক সেই কুকুরের মতন—যে নিজে ঘাস খাবে না এবং ঘাস যাদের খাদ্য তাদেরও খেতে দেবে না! আমরা নিজেরা কোন কাজ করব না; অথচ সেই কাজ অপরকে করতে দেখলে মুখ চুলকে উঠবে। আসাম কালাজ্বরের ডিপো বলে চিরদিন খ্যাত ছিল। ভয়ে আমরা তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষ দিতাম না। এখন উৎসাহী ইংরাজেরা চা-বাগিচাকে স্বাস্থ্যনিবাস করে তুলেচে দেখে আমাদের গাত্রদাহ উপস্থিত!

এই যে আমরা পথে-ঘাটে নিত্য বিদেশীর হাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছি আর আদালতে গিয়ে বিচার পাচ্ছি নে, সেটার মূলেও আমাদের দোষ রয়েছে। এইটে প্রায় সব দেশে দেখা যায়, ধনী-সম্প্রদায়ের দরিদ্রের চেয়ে রাজ-

দরবারে একটু বেশী সম্মান আর প্রতিপত্তি আছে। আমাদের দেশে Anglo-Indianদের সংখ্যা অল্প হলেও এদের হাতে সমস্ত Industryটা গিয়ে পড়েছে। কাজে কাজেই তারা অর্থশালী হয়ে উঠছে আর এই অর্থের বলেই তারা আমাদের ওপর প্রভুত্ব, অত্যাচার করে নিষ্কৃতি পায় এবং দরকার হলে সরকারকে বলে repressive lawও পাশ করিয়ে নেয়।

যাক সে কথা। এখন কলকারখানা ভিন্ন চলতে পারে কি না, তাই দেখা যাক্। মনে করুন, আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছি—কোন বিষয়ে আমরা জগতের কোন জাতির অধীন নই। এমন অবস্থায় আমরা industrialism ভিন্ন কাজ চালাতে পারি কি না? এক কথায় উত্তর,—চালাতে পারিনে—কল-কারখানা চাইই চাই। কেন চাই, সেই কথাই বলি।

পরাধীন জাতির শান্তিপূর্ণ নাগরিক জীবন যাপন করতে যতটুকু পাশ্চাত্য বিপ্লবের প্রয়োজন, তার কথা ভেবে দেখা যাক। প্রথমে পাটের কথা ধরুন। পাট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রধানতঃ গানিব্যাগ, শাল, আলোয়ান, ক্যানভাস, রগ্, ব্লাঙ্কেট্ প্রভৃতি তৈরি হয়। ভাগীরথীর দুই পারে সাহেবদের যে সমস্ত ফ্যাক্টরি আছে সেগুলো তুলে দিয়ে কুটীর-শিল্পের দ্বারা এই জিনিস তৈরি সম্ভব কি, না? পাট থেকে আঁশ বার করে চরকায় সূতা কাটা যাবে না—আর যদি বা সূতা কাটা সম্ভব হয়, তাতে মোটা মোটা ক্যানভাস, কম্বল বোনা তো পরের কথা, এই সমস্ত জিনিষ তৈরি করতে হ'লে যে সমস্ত preliminary process আছে তার একটাও কলকারখানা ছাড়া হওয়া অসম্ভব। এ জিনিসগুলো আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য। এগুলো চাই। কাজেই Industrialsmএর ভয়ে দেশে তৈরি না করলে বিদেশ থেকে ডবল দাম দিয়ে কিনতে হবে—দেশের টাকাগুলো বাইরে চলে যাবে—এখানকার লোকের উপায়ের একটা পথ বন্ধ হবে—দারিদ্র্যেরও প্রতিকার হবে না।

জেমসেটজীপুরে Tata Iron and Steel worksর কথা ধরুন। এখানে যে সমস্ত সুবৃহৎ লোহার কড়ি, বরগা, রেলিং পূর্ত্তবিভাগীয় জিনিষ-পত্র তৈরি হয়, সেগুলো কি সাধারণ কামারের কারসাজির ওপর নির্ভর করে থাকলে হতে পারে? যুদ্ধজাহাজ মোড়বার জন্য ইস্পাতের পাত দরকার। এই পাত হাজার হাজার টন ওজনের হাতুড়ির আঘাতে তৈরি হচ্ছে। এই হাতুড়ি কি যন্ত্র ভিন্ন শারীরিক শক্তিতে চালানো সম্ভব? আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা থেকে এগুলোকে বাদ দিতে পারিনে—আর পারিনে যখন, তখন সেগুলোকে বিদেশ থেকে আমদানি করে আমাদের অন্ন-সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলি কেন?

আজকাল ভূর্জ্জপাতায় বা তালপাতায় লেখার চলন নেই—সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের প্রচলন হয়েছে। আমার বোধ হয় এই কাগজ উক্ত শিল্পের দ্বারা সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এখানে কোন্‌টা কুটীর-শিল্পের দ্বারা সম্ভব, আর কোন্‌টা অসম্ভব তা দেখানো উদ্দেশ্য নয়। উদাহরণ-স্বরূপ গোটাকতকের নাম করা গেল—কল-কারখানা চাইনে, ইনডস্‌ট্রিয়ালিস্‌ম্ আমাদের ধাতে সহ্য হবে না, এ রকম কথা বলা সমীচীন নয় দেখাবার জন্য।

প্রাচ্যের এই শ্রামিক বিবর্ত্তনকে প্রতীচ্যে প্রবেশের পথে বাধা দেবার আর একটা কারণ হচ্ছে যে এই ইনডস্‌ট্রিয়ালিস্‌মের ফলে মাত্র এক সম্প্রদায় বড় লোক হচ্ছে—যার টাকা আছে তার টাকার গদিটা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। সাধারণের দুঃখ ঘুচ্‌ছে না—তাদের অবস্থা পূর্ব্বাপর সমান রয়ে গেছে। অন্যায় হলেও এই বিষয়ের প্রতিকার অসম্ভব। Socialism, Communism, Collectivism, Bolshevism প্রভৃতি নানান মত উঠলেও কোনটা কতদূর কার্য্যকরী জীবনে সম্ভবপর তাও বিবেচ্য। ধনী, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত এই তিন শ্রেণীর লোক নিয়ে সমাজ। এদের একটাকেও বাদ দিয়ে সমাজ তৈরি করা যায় না। একজন খাটবে আর একজন তাকে খাটাবে, এই নিয়ম আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। পরিশ্রম করবার লোক আছে কিন্তু পারিশ্রমিক দেবার লোক নেই, এমন হলে চলবে কেন? একখানা দেশী দৈনিক এ সম্বন্ধে লিখেছিল, "Now all lessons of historical experience teach us that a nation is and must be composed of

three estates...These are aristocracy, bourgeoise and prolitariate. Their true meaning is administration. Commerce and labour, that is to say control nourishment and energy. Without these three estates no state can possibly exist. Revolutions merely effect the composition of one or other or all of these; but their existence never can and never will be effected."

টাকা এক হাতে গিয়ে উঠছে; কিন্তু তার ত প্রতিকারের সম্ভাবনা নেই। সোনা থেকে কয়লা পর্য্যন্ত যে কোন খনি প্রত্যেকে এক একটা কিনে ত আর কাজ চালাতে পারে না। বড় লোকেরা খনি কিনবে, গরীবেরা কাজ করবে—মজুরী পাবে। এইভাবে দেশে রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, টেলিগ্রাফ, ষ্টীমার প্রভৃতি যে কোন ব্যাপারে Industrialism আসবে—আর এগুলো চালাতে হলে ধনীর ধনের প্রয়োজন। কাজেই যত চেষ্টা করি না কেন, টাকা একজন বা এক সম্প্রদায়ের হাতে গিয়ে উঠবে। তবে যদি লোকে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বলে, বাহ্য সজ্জার চিহ্ন-স্বরূপ বর্ত্তমান সভ্যতা সভ্যতাই নয়—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, মোটর, জাহাজ আমাদের প্রকৃত সুখ-শান্তি এনে দিতে পারে না, আমরা প্রাচীন বৈদিক যুগে—যে-যুগে জীবন-সংগ্রাম ছিল না, দ্বেষ-হিংসা-কলহের অস্তিত্বও ছিল না সেই যুগে ফিরে যাব, তা হলে Industrialismএর দরকার হয় না বটে!

কিন্তু আমরা এই আদর্শাত্মক কাল্পনিক স্বপ্নজড়িত স্বর্ণযুগের ধারণা করতে পারি নে বলে এবং বর্ত্তমান কালের সমস্ত দিক আলোচনা করার ফলে বুঝতে পেরেছি, আমাদের তথাকথিত সভ্য বলে পরিচয় দিতে হলে বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে হবে—তারা যে ভাবে উন্নতি করেছে আমাদেরও সেইভাবে উন্নতি করতে হবে, material world এ তাদের পিছনে পড়ে থাকা চলতে পারে না। তাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে জীবনের পথে অভিযান করতে হ আমাদেরও এই পাশ্চাত্য শিল্প-বাদ প্রয়োজন। আ ভাবা উচিত, একে 'দূরমপসর' বলে দূরে তাড়িয়ে দি শাসক-সম্প্রদায় সে সুযোগ গ্রহণ করবেন। আ এর হাত থেকে পরিত্রাণ কিছুতেই পাব না, উপ নিজ-বাস-ভূমে পরবাসী হয়ে থাকব। এ সমস্ত ভে আর আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা কিছুতে উচিত নয়—একে আহ্বান করাই উচিত। আহ্বান ক বলছি বলে কেউ যেন মনে না করেন, আমাদের সম মন, প্রাণ, উৎসাহ, উদ্যম এর পায়ে সঁপে দিতে হবে এটাও চাইনে যে সমস্ত ভারতবর্ষ বিশ্বকর্ম্মার বিরা কর্ম্মশালায় পরিণত হোক! এমন চাইনে যে আমাদের নাসিক অন্য কোন গন্ধ নেবে না ফ্যাক্টরীর ধোঁয়ার গন্ধ ছাড়া চাইনে যে আমাদের চক্ষু অন্য কোন দৃশ্য দেখবে ন কারখানার আকাশ-চুম্বী চিম্‌নি ছাড়া! চাইনে যে আমাদের কর্ণ অন্য কোন শব্দ শুনবে না টাকার ঝন্‌ঝনানি ছাড়া! যেটুকু Industrialism ছাড়া চলা অসম্ভব—যেটুকুর হাত হতে পরিত্রাণ পাওয়া দুর্ঘট সেইটুকুকে সাদরে আহ্বান করতে চাই। কার্পাস রেশম, পশম, বস্ত্র, পিতল কাঁসা প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য, সাবান, আতর এসেন্স প্রভৃতি গন্ধ-দ্রব্য—এক কথায় যে সমস্ত জিনিস কুটীর-শিল্পে চলতে পারে সেগুলো আর বড় বড় কারখানা করে বিলিতি আদর্শে না করাই উচিত।

"ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্তবাগীশ কর্ম্মস্রোতের মধ্যে আমাদের জাতীয় প্রাণধারা, সেই ধর্ম্ম-বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মতত্ত্বের সাধনা যা কোন্ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গগনে প্রথম প্রভাত উদয়ের সঙ্গে তপোবনে প্রথম সামরবে অভিব্যক্ত হইয়া আমাদিগের ইতিহাসের ক্রম-বিকাশ দ্বারা আজও পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা আরও বিচিত্র গতিতে বহিতে থাকিবে, বিচিত্র বৈষয়িক অনুষ্ঠান এবং নূতন কর্ম্মজীবনের মধ্যে আমাদিগের সাধনা জাতীয় ইতিহাসের সুবৃহৎ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইবে। আমাদিগের শিল্পকলা অধ্যাত্ম সাধনায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রাণ পাইয়া বিশ্বপ্রকৃতির

সৌন্দর্য্যকে সুস্পষ্ট ও ধ্রুবরূপে দেখাইয়া দিবে, বিশ্ব-প্রকৃতিতে আত্মোপলব্ধি সহজ করিয়া দিবে। তখন আমাদিগের সেই অতীত একটি শতদলের উপর বসিয়া আছেন, শতদল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিহ্ন, তাঁহার দক্ষিণ করতল উন্মুক্ত, উহাতে বিতর্ক মুদ্রাচিহ্ন, তিনি শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। স্থির প্রশান্ত পরম ধ্যানের এই আনন্দ মূর্ত্তি—পৃথিবীর অন্য কোন দেশের স্থাপত্যে বা শিল্পকলায় ইহার তুলনা মিলে না! ইহাই ত ভারতবর্ষের অতীত এবং ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি—ভারতবর্ষের আপনার তপস্যার ধন, সমগ্র এসিয়ার হৃদয়ে ইহারই অমর সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা! আজ বহু শতাব্দীর পর এ মূর্ত্তি আমাদিগকে ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের পরম সার্থকতার সংবাদ আনিয়া দিতেছে। আমরা বুঝিয়াছি আমাদিগের বিচিত্র কর্ম্মময় জীবনকে একটি পরিপূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতির দিকে লইয়া গিয়া সার্থক হইবে, আমরা ভোগ-লালসার প্রতি অনাসক্ত হইয়া ভক্তি এবং বৈরাগ্যের অনুশীলন করিব—নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ত্যাগের চরম আদর্শ দেখাইব, এবং আকাঙ্ক্ষার, বাসনার বশবর্ত্তী না হইয়া সেই পরম জ্ঞান লাভ করিব, যাহা বুদ্ধের এবং প্রত্যেক ধ্যানীর "যল্লব্ধ্বা পুমান সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তোভবতি" যাহা লাভ করিলে মানুষ যাহা কিছু পাইবার তাহা পায়, যাহা পাইলে মানুষ অমর হয় এবং পরম তৃপ্তি অনুভব করে। আমরা জানিয়াছি আমাদিগের বৈজ্ঞানিক জীবন বিদেশের মূঢ় এবং অন্ধ অনুকরণ হইবে না, ইহা আমাদিগের আত্ম-প্রকাশ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায় হইবে, আধ্যাত্মিক বোধকে জাগাইয়া দিয়া ইহা একটি নূতন প্রাণ মহাজীবনের সূচনা করিয়া দিবে। অতীতের ইতিহাসে সমগ্র এসিয়া ভক্তি অর্ঘ্য আনিয়া যে মূর্ত্তিকে বহু শতাব্দী ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল, আমাদিগের জাতীয় জীবনের সেই অমর মূর্ত্তি আবার দিব্য সৌন্দর্য্যে ও বিমল শান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বিষয়-মত্ত য়ুরোপ আমাদিগের জাতীয় ইতিহাসের ভবিষ্যৎ বৃহৎ বিকাশের দিনে সেই ধ্যান-নিমগ্ন যোগীর নিকটে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিবে, "যদ্‌জ্ঞানাদ্ধ ন্মত্তো ভবতি স্তব্ধো, পুমানাত্মারামো ভবতি"—যে জ্ঞান লাভ করিলে উন্মত্ত ইউরোপ স্তব্ধ হইবে, আত্মার আনন্দ লাভ করিয়া পরম আনন্দ ও শান্তিলাভ করিবে।

"বিশ্বজগৎকে শান্তিদান বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দান হইবে, বিশ্বমানবের নিকট ঋণ হইতে ভারতবর্ষ তখন মুক্ত হইবে। বিশ্বদেবতা ভারতবর্ষকে আপনার কর্ত্তব্য-সম্পাদন করিতে আহ্বান করিতেছেন, ভারতবর্ষ কি সে আহ্বান শুনিয়া শীঘ্রই কর্ম্ম-তৎপর হইবে না?"

কথা-প্রসঙ্গে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। সহজ ও সরল ভাষায় এই কথাই সকলকে জানিয়ে দিতে চাই যে য়ুরোপে ইনডসট্রিয়ালিসম্ যতটা ক্ষতি করেছে, ভারতে ততটা ক্ষতি না করতেও পারে; কারণ ওখানকার লোক সাধারণতঃ ধর্ম্মের বড় একটা ধার ধারে না—এই দেহটাকে এই পৃথিবীটাকে চরম ও পরম পরিণতি বলে জানে। মৃত্যুর পর যে আবার সরস নবীন জীবন, নতুন সুখ আছে, সেটা তাদের ধারণার অতীত। আমাদের এ দেশ ত্যাগ ও সংযমের দেশ—ভোগ বা বিলাসের দেশ নয়। এই দেশে একদিন রাজার ছেলে রাজ-ঐশ্বর্য্য ছেড়ে প্রিয়তমা পত্নীর বাহুপাশ ছিন্ন করে, নয়নাভিরাম নন্দনের স্মৃতি মুছে ফেলে জগতের কল্যাণের জন্য পথে পথে ঘুরেছিল! এইদেশে একজন পিতার লালসার জন্য নিজের যৌবন দান করে চিরজীবন জরাকে গ্রহণ করেছিল! এই দেশেই অতীত যুগে অন্যজন জনকের তুষ্টির জন্য চিরকৌমার্য্যকে সানন্দে আলিঙ্গন করেছিল! এ ত্যাগের দেশ—এ সংযমের দেশ! এ দেশের ব্যক্তিগত নয়, সমাজ-গত, জাতিগত প্রার্থনা—

নধনং নজনং ন সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি রহৈতুকী ত্বয়ি॥

সে দেশের তর্পণের শেষ কথা—

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তৃপ্যন্তু"

যে দেশের লোক সমস্ত বস্তুতে ভগবৎ-সত্ত্বা উপলব্ধি করেছিল, যে দেশের দর্শনের প্রথম শিক্ষা:—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতু র্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্তকর্ম্মণি॥

এ সেই ত্যাগ-পূত দেশ, জগতের কোন স্থানে যা সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় তা এই বিপুল বৈচিত্র্যময় দেশে।

তাই সাহস করে বলছি, শ্রম-বিবর্ত্তন-মন্থনে প্রতীচীতে হলাহল উঠেছে, কিন্তু অমৃত উঠবে প্রাচীতে! য়ুরোপে যার বোধন হয়েছে—এসিয়ায় তার শোধন হবে! প্রাচ্যে যে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল প্রথম যৌবন আবেগে দেখা দিয়েছে—প্রতীচ্যে সে ধীর, স্থির, শান্ত, সুধীর, সুকুমার শিশুরূপে নয়নানন্দ বর্দ্ধন করবে।

য়ুরোপ আমেরিকার ক্ষতি হয়েছে—সে ক্ষতির একটা অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। গোড়া থেকেই আমরা factory law, labour union প্রভৃতি অমঙ্গল-নিবারক উপায়গুলি অবলম্বন করতে পারি।

তাই বলছি industrialismকে অকারণ ভয়ের চোখে না দেখে গোড়া থেকেই দূর হও না বলে যদি ঠাণ্ডা মাথায় এর অপকারগুলো প্রতিবিধান করবার চেষ্টা পাই, তা হ'লে এতে আমাদের অবনতির বদলে যথেষ্ট উন্নতি হবে। নিজেদের পায়ে নিজেরা ভর করে দাঁড়াতে শিখব—কারও মুখাপেক্ষী রব না। দেশের দুর্ভিক্ষ-নিবারণ হবে—অন্ন সমস্যা ও দারিদ্র্য সমস্যারও সমাধান হবে। Sir Guildford Mellesworth-এর ভাষায় দুঃখ করতে হবে না –

"India the land of pagoda tree! India the mine of wealth! India the wonder and admiration of Marco Pollow and foreign travellers of former times! India in poverty! Midas starving amid heaps of gold, does not allow a greater paradox, yet... India Midas-like, starving in the midst of untold wealth."

শ্রীসন্তোষকুমার দে।

রিক্তা

২৬

তখন সকাল বেলা, আটটা বাজে বাজে! সবিতার মা স্নান সারিয়া পূজা করিতে বসিয়াছিলেন। পণ্ডিত মশায় তখনো গঙ্গা হইতে ফেরেন নাই, তাঁর ফিরিতে অনেক বেলা হয়। স্নানান্তে অনেক পথ ঘুরিয়া দেব-দর্শনাদির পর তিনি বাসায় আসেন, সুতরাং দেরীই হইয়া যায়!

সবিতা তখন অন্য কাজ সারিয়া রান্নার আয়োজনে ছিল। পূজায় বসিবার আগে মা বিশেষ করিয়া বারণ করিলেন, সে যেন রান্না না চড়ায়!

তাঁর ভয় হইত, পাছে কাজ-কর্ম্মের ভার পড়িলে মেয়ের শরীরে কিছু ক্ষতি হয়! এখন যে সে পরের জিনিষ।

ঝী জানকীয়া বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, —আজ যে ওই ভোলাবাবুর ছেলে এলেন,—যিনি হাকিম!

সবিতা বলিল,—তাই নাকি? তুই ঠিক জানিস্?

—আমি নিজের চোখে দেখে আস্‌ছি, আর ওদের ঝী বল্‌লে!

—তাহলেই জ্যোতিকে এবার নিয়ে যাবেন!

—তা তো যাবেনই! এই দেখ না, এইবার তোমাকেও কোন্ দিন জামাইবাবু এসে নিয়ে চলে যান!

সবিতার অসঙ্কোচ চোখ দুটী মায়ের ঘরের দিকে ফিরিয়া সসঙ্কোচে নামিয়া পড়িল। সে জানে যে এ কথা কি অসম্ভব! যিনি এক বাড়ীতে থাকিয়াও নিজের ইচ্ছায় কখনো তার কোন খবর রাখেন নাই,—তিনি আসিবেন এখানে?

সে হেঁট হইয়া মায়ের জন্য শসা ছাড়াইতে বসিল। তাঁর ভয় হইতেছিল, মাও যদি এমনি একটা প্রশ্ন করিয়া বসেন! জানকীয়া বলিল,—জ্যোতি চলে যাবে বলে বুঝি দিদিমণির মন কেমন করছে।

সবিতা অন্য কথা পাইয়া হাসিয়া বলিল,—ঠিক বলেছিস্ জানকীয়া, এইবারেই তুই ঠিক ধরেছিস্!

জানকীয়া বলিল,—আমাদের দেশের মেয়েরা সব শ্বশুর বাড়ী যেতে এমন চেঁচিয়ে কাঁদে যে পাড়াপড়্সীরা সব জড়ো হয়ে দেখতে আসে।

সবিতা হাসিয়া বলিল,—আমি কাঁদিনি—

সবিতার মা পূজা শেষ করিয়া আসনে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—কি বলছিস্ তোরা?

সবিতা বলিল—আচ্ছা মা, আমি তো শ্বশুর-বাড়ী যেতে কাঁদিনি!

মা কথার জবাবও দিলেন না, কি মনে করিয়া বিরস মুখে সরিয়া গেলেন।

দিনের কাজ শেষ করিয়া অবকাশটুকু কি করিয়া কাটাইবে সবিতা তাই ভাবিতেছিল,—সেই সময়ে একটা ঝী জ্যোতির ছোট একখানি চিঠি দিয়া গেল। জ্যোতি লিখিয়াছে—

লক্ষ্মী দিদি, আজকার দিনটা একটু দেখা দিয়ে যাও ভাই। আমি আজই শেষ রাত্রে চলে যাব। নিজে যদি যেতে পারতুম, তাহলে গিয়েই দেখা করে আসতুম।

সবিতার মা তখন মাদুরের উপর শুইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিলেন। সবিতা গিয়া বলিল—মা, জ্যোতি চলে যাচ্ছে, একটু যাবে ওদের বাড়ী?

হাতের বই মুড়িয়া রাখিয়া তিনি বলিলেন,—আজই চলে যাচ্ছে? বড্ড দুর্ব্বল রয়েছে যে এখনো!

—লিখেছে যে আজই শেষ রাত্রে যাবে।

—তবে চল্, দেখা করে আসি।

বারান্দায় একখানি চৌকির উপর জ্যোতি তার শাশুড়ীর কাছে বসিয়াছিল। শাশুড়ী পাথরের বাটীতে বেদানার রস তৈরী করিতেছিলেন। সবিতা গিয়া বলিল,—কি গো, আজই চল্লে? যেতে পারবে তো?

জ্যোতি মাথা হেঁট করিয়া লজ্জিত মুখে হাসিল, তার শাশুড়ী বলিলেন,—ছেলের ঝোঁক মা,—তা নইলে এই শরীরে কি ঠাঁইনাড়া হয়!

—কোথায় যাবে?—

—পুরী। মা বাপ সেখানে গিয়েছেন, তাঁরা যেতে লিখেছেন, তাই—

সবিতা হাসিয়া বলিল,—পুরী? তা হলে তো খুসী হয়ে যাবার কথা।

জ্যোতি বেদানার রসটুকু খাইয়া বলিল,—তা বলে এমন তাড়াতাড়ি আজকেই চলে যেতে চাইনি আমি!

—তবে থাকো না আর দুদিন!

—উপায় নেই, ছুটী যে ফুরিয়ে যাবে—

সবিতা বলিল—যদি নিরাপদে পৌঁছে যেতে পারো তাহলে সেখানে গিয়ে বেশ সুস্থ হয়ে উঠবে!

—তা উঠ্বো,—নিশ্চয়—

আর দু-চার কথার পর জ্যোতি বলিল,—আমাকে তোমার মনে থাকবে তো?

সবিতা একটু হাসিল, বলিল,—যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি, তোমায় একেবারেই চিনতুম না, তখনও যে তোমাকে জানতুম, চব্বিশ ঘণ্টা মনে করতুম। আর এখন...?

—তখনো আমাকে জান্‌তে? কেমন করে জান্‌লে ভাই?

সবিতা কথা সামলাইয়া লইল, বলিল,—মনে মনে। আর কনকদের কাছ থেকে কিছু কিছু শুনেও ছিলুম—

—তা হলে এবারে বেশী বেশী করে মনে রেখো।

—কি জানি, মনের ইচ্ছে—

—ইস্! তা বৈ কি!

সবিতার মা বলিলেন,—সবি, চল্‌রে, সন্ধ্যে হয়ে গেল!

সবিতা জ্যোতির খোকাটীকে আদর করিয়া জ্যোতির দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—তাহলে চল্লুম জ্যোতি,—কাল এতক্ষণে, তুমি কতদূরে গিয়ে পড়বে!

জ্যোতি মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল।

সবিতা মায়ের সঙ্গে বাড়ীতে ফিরিল। মনে মনে সে নিজের আসনে জ্যোতিকে রাখিয়া কল্পনায় দেখিল,—কত সুন্দর হয়! তা যদি হইত, অরুণ সুখী হইত, সংসারও সুখের হইত!

কিন্তু এখন যে সকল দিকেই নিরুপায়! সবিতা যদি মরিয়াও যায়, তবু তো অরুণের সে আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হইবে না! সবিতা মনে মনে বলিল, কি অসার্থক জন্মই আমি জন্মেছিলুম!

সবিতার মা সেদিন সারাদিনই অন্যমনস্কে কি যেন ভাবিতেছিলেন। রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি সবিতার ঘুম আসে নাই. তারপর তরল নিদ্রার চমক ভাঙ্গিয়া শুনিল, ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিতেছে। চট্ করিয়া মনে পড়িল, জ্যোতিরা তিনটার সময়েই রওনা হইবে! পাশে চাহিয়া দেখিল মা তখনো জাগিয়া আছেন। তাঁর হাতের ছোট হাত-পাখাখানি একটু একটু নড়িতেছে। সে বলিল, —তুমি জেগে রয়েছ মা ?

মা মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ—

সবিতা বুঝিল, মায়ের মন ভাল নাই! খানিকক্ষণ পরে মা ডাকিলেন,—সবি!

—কি, মা ?

—হ্যাঁরে তুই সেখানে তাঁদের রাগিয়ে-টাগিয়ে দিয়ে আসিস্‌নি তো ?

সবিতা একটু আশ্চর্য্য হইল, বলিল,—না।

—তবে এতদিন হয়ে গেল অরুণ কেন তোকে একখানি চিঠি অবধি দিলে না? কেন তারা এমন করে সব চুপ করে রয়েছে ? এর মানে কি ?

—তা আমি কি করে জানবো!

—হুঁ! বাবা বলছিলেন যে, সবি নইলে তাদের সংসার এক দণ্ড চলে না! কৈ, আমি তো তার কোন লক্ষণই দেখতে পাইনে!

সবিতা বুঝিল যে, মাকে ভুলানো সহজ নয়, তার স্বামীর উপেক্ষা তিনি সন্দেহ করিয়া ফেলিয়াছেন! সবিতা নিজের দুর্ভাগ্যের আঘাতটা বুক পাতিয়া সামলাইয়া লইয়া বলিল,—অনেকদিন পরে এসেছি বলেই বোধ হয় শ্বশুর একটু আল্‌গা দিয়েছেন, আবার যখন নিয়ে যাবেন, তখন আর শীগ্‌গির আসা হবে না তো!

—তা বলে একখানা চিঠি অবধি দেয় না লোকে! এ আবার কি রকম বাপু, বুঝি না কিছু! আর অরুণ? সে কেন আজ অবধি একটা খোঁজ-খবরও নিলে না ?

সবিতার গায়ে যেন ছপ্ ছপ্ করিয়া ঘা কতক কাঁটার চাবুক পড়িল, বিবর্ণ মুখে সে চুপ করিল।

তারপর মা দুঃখ করিয়া বলিলেন, তাঁরা গরীব বলিয়াই কি অরুণ তাঁদের এমন করিয়া অবজ্ঞা-অবহেলা করে ?

সবিতার চোখ মুখ দিয়া যেন আগুনের হল্‌কা বহিল, তপ্ত নিশ্বাসে ওষ্ঠাধর জ্বালা করিতেছিল! মা যতগুলি দোষ তাঁর উপর দিতেছেন, তিনি যে এর কিছুই নন, —এটুকু সে বেশই জানে!

ঘন বর্ষার সময় এক একদিন আকাশ-ভরা কালো কালো মেঘের স্তূপ ঠেলিয়া ধ্বান্তারি রূপে একখানি ঝকঝকে চাঁদ বাহির হইয়া প্রকৃতির ম্লান মুখ হাসাইয়া তোলে, তেমনি, সবিতার মনের দর্পণে স্বামীর অমৃতময় স্নিগ্ধ কান্তি ফুটিয়া উঠিল!

সবিতার মা আবার কঠিন কণ্ঠে বলিলেন,—চুপ করে রইলি যে সবি,—আমাকেও তুই কি বলতে পারিস নে আসল কথাটা কি ?

সবিতা স্থির ভাবে উঠিয়া বসিল, বলিল,—তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর মা, কি তুমি জান্‌তে চাও? আমি জবাব দিচ্চি,—নইলে আমি বুঝতে পারিনে—যে কি তুমি জানতে চাও?

এইবারে সবিতা মাকে একটু বিপদে ফেলিল। তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। নিজের সন্তানের মুখের উপর প্রশ্নটা কি করিয়া যে গুছাইয়া উপস্থিত করিবেন, ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। একটু পরে বলিলেন,—সেখানে সকলে তোকে ভালবাসে ?

—তা কি করে বলবো মা!

—শ্বশুর স্নেহ করেন কি না বুঝতে পারিসনে? শাশুড়ী শুনেছি একেবারে দেখতে পারতেন না!

—তা করেন। আর শাশুড়ী স্বর্গে গিয়েছেন,—তবে তিনি যে আমাকে একেবারেই ভাল বাস্‌তেন না, তা নয়!

—তবে যে শুনেচি বউ অপছন্দ হয়েছে বলে তাঁরা দুই মায়ে-পোয়ে গোলমাল বাধিয়েছিলেন ?

—সে বিয়ের সময়কার কথা। অত আমার মনে নেই, তুমি এ-সব কথা জিজ্ঞাসা করছো কেন মা ?

—এমনি। মনটায় কেমন যেন খট্‌কা লাগাচ

সবিতা চোখ বন্ধ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। জোরের

আর বিলম্ব ছিল না। রাত্রির নিবিড় তামসরাশি ঈষৎ পিঙ্গল হইয়া আসিতেছিল। উঠি-উঠি করিয়াও সবিতা আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

শেষের দিকে জ্যোতিদেব ষ্টেশনে পৌছিবার সম্ভাবনা ভাবিয়া ষ্টেশনের চিত্রই তার মাথায় ঘুরিতেছিল। ষ্টেশন,—ষ্টেশনে লোকের ভিড়, কুলিদের হাঁক-ডাক, ছুটাছুটী, হুড়াহুড়ি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া স্বপ্নেও তার মাথায় ষ্টেশনই জাগিয়া উঠিল।

সেই ষ্টেশন! যে ষ্টেশনে অরুণ সেদিন তার স্বভাবের বিপরীত ভাবে আসিয়া,—সে কোন্ কথা, যা' বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিল না! সে যেন সেই সবল হাত দুখানায় তেমনি করিয়া হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছে,—আচ্ছা, শোনো তবে বলছি!

সে কোন্ কথা?

২৭

রাত্রি তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। শুভেন্দুর কলেজ বন্ধ ছিল বলিয়া সে সেইদিন বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু তার জ্বর হইয়াছিল বলিয়া সন্ধ্যার পরই শয্যাগ্রহণ করিয়াছে!

পুলককে রাখিয়া প্রভাত চলিয়া গিয়াছে। ঝী চাকরেরা তাকে যতক্ষণ রাখিত, সে এক রকম থাকিত; বাকী সময়টুকু সে তার দাদামশায়কে ও অরুণকে অতিষ্ঠ করিয়া ছাড়িত।

ভুগিয়া ভুগিয়া তার শরীর সাংঘাতিক দুর্ব্বল ছিল, তবু দিবারাত্র বায়না করিয়া, কাঁদিয়া চেঁচাইয়া সে বাড়ীশুদ্ধ সকলকে ত্যক্ত করিয়া তুলিত। বিরক্ত বোধ হইলেও কর্ত্তা অনেক সময় চুপ করিয়া সহ্য করিতেন।

কিন্তু অরুণ কোন কালেই শিশু-পালন-বিষয়ে দক্ষ নয়, রাগের মাথায় সে এক-আধটা চড়-চাপড়ও মারিয়া বসিত!

অনেক সময় পুলকের একঘেয়ে কান্নার সঙ্গে না পারিয়া তাকে কুপথ্য দিয়াও থামাইতে হইত, ফলে তার শরীর একমাসেও সারিল না! বাড়ীর সকলে জ্বালাতন হইয়া উঠিল।

রাত্রে সে আশার কাছে কিছুতেই থাকিত না সবিতার ঘরে তারা ঝিয়ের কাছে সে শুইত। রাত এগারোটার পর ঘুমন্ত তারাকে ফাঁকি দিয়া পুলক উর্দ্ধশ্বাসে কর্ত্তার ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিতেছিল।

দালান তখন অন্ধকার ছিল। দুর্ব্বল শরীরে দৌড়াইতে গিয়া সে সামলাইতে পারিল না, ঠোকর খাইয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল।

অরুণ তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কর্ত্তার তরল ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি নিজে আসিয়া পুলককে কোলে তুলিয়া লইলেন। সে তখন এমন এলাইয়া পড়িয়াছে যে চেঁচাইতেও পারিতেছিল না।

কর্ত্তা তাকে নিজের ঘরের খাটে বসাইয়া আলোর দম বাড়াইয়া দেখিলেন, রক্তে তার বুক-মুখ ভিজিয়া গিয়াছে,—গায়ে একটী জামা অবধি নাই,—সামনের কচি দাঁত দুটীই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন, দুর্ভাগ্য আমারও! নইলে, কি অসহ্য সহ্য করেও যে পদে পদে শুধু দুঃখই পেয়েছ মা, তা এখন আরো ভালো করেই বুঝছি! বাড়ীতে তো আরো সকলেই রয়েছে এখন—

পুলককে বুকে করিয়া তিনি অরুণের বন্ধ দ্বারে ঘা দিলেন। তাঁর দ্রুত জুতার শব্দে অরুণ আশ্চর্য্য হইয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

পুলককে অরুণের বিছানায় বসাইয়া দিয়া কর্ত্তা বলিলেন,—একে রাখ। তারপর আকস্মিক ঘুম ভাঙ্গার পর হৃদ্‌রোগের রুগীর স্বভাব-মত যন্ত্রণাকুল শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন,—ভাখো, যদি রক্তটা বন্ধ করতে পারো।

এতক্ষণে বিমূঢ়ভাবে অরুণ পুলকের দিকে তাকাইয়া বলিল,—এত রক্ত কিসের?

পুলকই হাত দিয়া ভাঙ্গা দাঁতের শূন্যস্থানটী দেখাইল।

কর্ত্তার গায়ের গঞ্জিটাতেও রক্ত লাগিয়াছিল, সেটা খুলিয়া রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কাঁচা ঘুম ভাঙ্গার শ্রান্তিতে অরুণের গা রাগে জ্বলিয়া

গেল। সে আপন-মনে বলিল, যেমন পাজী ছেলে! এই ঠিক হয়েছে এর! জ্বালিয়ে তুলেছে!

পুলক তখন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়াছিল। বাড়ীর ঝি, চাকর, আশা, শুভেন্দু প্রত্যেকের উপর রাগ করিয়া অরুণ পুলকের মুখ বুক ধোয়াইয়া দিতে দিতে ঠিক করিতেছিল যে, এইবার শুভেন্দুকে বাড়ীতে রাখিয়া সে কলিকাতায় গিয়া থাকিবে, এত ছাই-ভস্ম গোলযোগ আর সহ্য হয় না!

পুলক কিছুক্ষণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া তার পরে অরুণের কোলের কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

আকৃতির দিক হইতে পুলক অনেকটা তার মায়ের মত হইয়াছিল। ঘুমন্ত শিশুর পানে চাহিয়া অকস্মাৎ অরুণের রুক্ষ মন নরম হইয়া গেল,—মৃতা বালিকা বোনের একমাত্র চিহ্ন!

ভোরে উঠিয়া আশা দেখিল, খাটের বিছানায় পুলক নাই, তারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—খোকা কোথায়?

তারা নিরুপদ্রবে ঘুমাইতেছিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল,—কেন, বিছানায় নেই?

—না, নেই তো!

—কোথায় গেল তবে?

তারা খাটের নীচে, আলমারির পাশে ও এদিক-ওদিক খুঁজিয়া দেখিয়া বলিল,—কই, দেখ্‌তে পাইনে তো! যে দুষ্টু ছেলে, বাবা!

আশা ভীতভাবে বলিল,—ওমা,—সে কি কথা! তোমার কাছ থেকে, রাত্তিরে ছেলে কোথায় গেল?

তারা আশাকে একটুও ভয় করিত না। বিশেষ তার বিশ্বাস ছিল যে, সে যে কাজটি করে তা অন্যের ক্ষমতায় কুলাইবে না; তাই খুব স্পর্দ্ধা করিয়া বলিল,—তা আমি কি করবো? সারা রাত জেগে তো ছেলে পাহারা দিতে পারিনে!

—কেন, পুলক বিছানা থেকে নামতে পারে না বলে তুমি তার খাটের কাছে ঐ টুলটা রাখো কি জন্যে? ওটা না থাকলে তো সে নামতে পারতো না!

কর্ত্তা উঠিলেন। আশা ভয়ে তাঁকে কিছু বলিতেই পারিল না। কর্ত্তার মন তিক্ত ছিল, তাই তিনিও কিছু বলিলেন না, মুখ ধুইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

অরুণের কাছে যে পুলক থাকিতে পারে, এ কথা ভাবিতে আশার সাহস হইতেছিল না। কেন না সে জানিত, অরুণ ছোট ছেলেদের একেবারেই পছন্দ করে না। তবু অরুণকে বরং জানানো যায়, কর্ত্তা শুনিয়া যত রাগ করিবেন, অরুণ হয়তো তত করিবে না!

অরুণ অনেক বেলায় উঠিল। দ্বার খুলিয়া পুলককে কোলে করিয়া দালানে আসিবামাত্র তারা ছুটিয়া গিয়া পুলককে লইতে হাত বাড়াইল, অরুণ ধমকাইয়া বলিল,—না, থাক্‌—তোমাদের আর ওকে নিতে হবে না।

তারা ভয়ে ভয়ে সরিয়া গেল। অরুণ পুলককে লইয়াই শুভেন্দুর ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—কেমন আছিস? জ্বর আছে মনে হচ্ছে কি?

শুভেন্দু বলিল,—ভালই আছি। জ্বর নেই বোধ হয়।

—বাবা কি সকালে এদিকে এসেছিলেন নাকি?

—না, গুপী বললে যে, বাবা ডাক্তার বাবুকে ডাকতে পাঠিয়েছেন।

—তিনি রোজই আসেন পুলককে দেখতে,—আজ তোকে দেখতে ডাকিয়েছেন বোধ হয়।

শুভেন্দু বলিল,—কেমন আছে পুলক?

—বেশ আছে! মুখখানি দেখ না!

—তাই তো! ফুলেছে যে,—কি হল আবার?

অরুণ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল,—পটলা তোর মনে আছে? কমলা একবার মামার বাড়ীর খাটে পড়ে গিয়ে দাঁত ভেঙ্গেছিল?

—মনে আছে বৈ কি! মা তারি ওপর তাকে মেরেছিলেন বলে দাদামশায় মাকে খুব বকতে লাগলেন!

—ত্যাখ—ঠিক তেমনি হয়েছে এর মুখখানি,—একেবারে সামনের দুটী দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছে।

—কি ভয়ানক! কি করে ভাঙ্‌লো?

—তা তো জানিনে। এরা কেউ একটু সাবধানে রাখে

না। রাত দুপুরে এই কাণ্ড! বাবা একে আমার কাছে দিয়ে এসেছিলেন।

অরুণের মুখে রাগের চিহ্ন দেখিয়া শুভেন্দু চুপ করিয়া গেল।

বৈকালে অরুণ কি একটা দরকারে কর্ত্তার ঘরের দিকে যাইতে যাইতে শুনিল, তিনি তাঁর বন্ধু প্রাচীন ডাক্তারের কোন্ একটি কথার উত্তরে বলিতেছেন,—বাঁদর, বাঁদর! লেখাপড়া শিখেও যে মানুষ এমন বাঁদর হয়, তা আমি জানতুম না আগে! আমি আর ভগবানের কি দোষ দেব, বল! আমার সংসারে যেমনটী দরকার, তেমনি লক্ষ্মীই তো আমি পেয়েচি, কিন্তু, ওই যে হতভাগা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলচে, ওর এতটুকু বুদ্ধি নেই—

অরুণ বুঝিল, এ তারই উদ্দেশে হইতেছে! মায়ের মৃত্যুর পর আর সে বাপের কাছে এমন স্পষ্ট তিরস্কার কোনদিন পায় নাই।

অন্য এক সময়ে তাদের এই শুভার্থী ভদ্রলোকটী অরুণকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি তো বুদ্ধিমান ছেলে, অরুণ,—দেখ, একে তোমার বাবার শরীর খারাপ, তাতে কেন তুমি ওঁকে অমন করে কষ্ট দাও?

অরুণ একটু হতবুদ্ধি ভাবে থাকিয়া বলিল, -আমি কষ্ট দিই? কেমন করে?

—উনি তো সাংসারিক শান্তির আশা এখন তোমাদের কাছেই করেন। তোমাদেরও উচিত, যাতে উনি মনে কোন কষ্ট না পান, তাই করা।

—তা বেশ তো, আমাকে কি করতে হবে, তা বললেই তো পারেন।

—উনি বলেন যে—তুমি নাকি বৌমার সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার কর না,—অথচ তিনি না থাকলেও যে তোমাদের কত দিকে কত অসুবিধে হচ্চে তা তো দেখতে পাচ্চো!

অরুণ বিব্রত ভাবে বলিল,—আপাততঃ অসুবিধে কেবল পুলককে নিয়ে,—তা বাবা যদি বলেন, তা হলে আমি ওকে প্রভাতের ওখানে দিয়ে আসতে পারি।

—তার চেয়ে কেন যাও না, কাশী থেকে বৌমাকে নিয়ে এস না,—তাতে সব দিকেই যে ভাল হয়!

—তা জানালেও তো হয়! বলিয়া অপ্রসন্ন মুখে অরুণ থামিয়া গেল। তার মনে হইতেছিল যে, বাবার এ কি অনুচিত রাগ! আমিই কি তাকে কাশীতে রাখিয়া আসিতে গিয়াছিলাম নাকি? যত দূরে থাকিতে চাই, ততই অশান্তি বাড়িয়া ওঠে!

শুভেন্দু তার পিতাকে খুব বেশী ভয় করিত। নতুবা তার অনেক বার ইচ্ছা হইয়াছে যে নিজে গিয়া সবিতাকে লইয়া আসে, কিন্তু কর্ত্তার কাছে মুখ ফুটিয়া সে-ইচ্ছা প্রকাশ করিবার মত সাহস তার ছিল না। কেননা কর্ত্তার সে ইচ্ছা নাই,—থাকিলে তিনিই তো শুভেন্দুকে অনুমতি করিতে পারিতেন।

আরো কয়েক দিন কাটিয়া গেল। একদিন পুলককে বিছানায় শোয়াইয়া শুভেন্দু তার রোগ পরীক্ষা করিতেছিল। অরুণ চেয়ারে বসিয়া একখানা ডাক্তারি বই নাড়িতেছিল, শুভেন্দুর মুখ-পানে চাহিয়া বলিল,—কি দেখলি?

—যা সবাই বলছেন, তাই। লিভারটা মস্ত বড় হয়েছে,—কচি ছেলে, এর এখন যত্নের দরকার।

—আর কত যত্ন হবে?

—কি আর হচ্চে?

– তবে তুই ওকে সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে যা,—ওজন করে করে নার্সিং করিস্!

—আমার সে উপায় থাকলে আমি ঠিক ওকে বৌদির কাছে রেখে আসতুম!

—কেন, নিজের কাছে রাখতে পার না? আমি তো রাখি--

—আর, আমার সেখানকার ডিউটী? সে কে খাটবে?

—ওঃ ভারী তো ডিউটী! চব্বিশ ঘণ্টাই তো আর ডিউটী নয়!

—হ্যাঁ,—হ্যাঁ,—এ তোমার 'ল' কলেজ কি না! মেডিকেল কলেজের খাটুনি বাবুগিরি নয়!

—কে বলে খাটতে? ছেড়ে দে না পড়া!

অরুণ হাসিতেছিল। শুভেন্দু বলিল,—পড়া ছেড়ে দেব কেন? চাকরি-বাকরি না করলেও ডাক্তারি বিদ্যে

জলে যায় না! এখন পড়া ছেড়ে দিয়ে তো তোমার মত বাড়ী বসে থাকতে হবে!

—বাঃ! তা, তুমি চিরকাল বাইরে বাইরেই থাকবে, আর আমি এই জমিদারির খাতা-পত্র ঘাঁটবো? আমাকে দিয়ে তা হবে না।

—তা বললে চলবে কেন? দুজনে বাইরে থাকলে বাড়ী দেখবে কে?

—বাড়ী! বাড়ী দেখার মানে বন্দী হয়ে থাকা! আর ভাল লাগেনা আমার। এই সব ছাই-ভস্মর গোলমালে মানুষ পাগল হয়ে যায়!

আরও দিন কয়েক নানা অসুবিধায় কাটিবার পর পুলকের ভার প্রায় বেশীর ভাগ অরুণের হাতে পড়িল। অরুণ যাহা ইচ্ছা করিয়া না করিত, কর্ত্তা নিজে তাহা বাধ্য হইয়া করিতেন দেখিয়া অরুণ সতর্ক হইল, যাহাতে কর্ত্তার কিছু না করিতে হয়!

এবারে অরুণ সত্য সত্যই বন্দীর অবস্থায় পড়িল। একে তো সে ছেলে-মেয়েদের কোন দিনই পছন্দ করিত না, তায় মাতৃহীন রুগ্ন পুলক দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। চাকরদের কারো কাছে পুলক থাকিতে চাহিত না। তার অবিরাম চীৎকারে ও কান্নায় অরুণ তিক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল।

বড় বেশী বিরক্ত হইয়া সে প্রভাতের ছেলে প্রভাতকেই ফিরাইয়া দিয়া আসিবার প্রস্তাব করিবা মাত্র কর্ত্তা অনুমতি দিলেন।

কর্ত্তা নির্ব্বিকার মুখে পুলককে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া আবার ঘরে ঢুকিলেন!

মৃত সন্তানের স্মৃতি বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক এই রুগ্ন শীর্ণ মাতৃহীন শিশুটীকে তিনি কম ভাল বাসিতেন না। একে এমন করিয়া বিদায় করিতেও তাঁর মনে বড় অল্প আঘাত লাগে নাই। কিন্তু এবার তিনি এ সব মৌন ভাবেই সহিয়া গেলেন।

পুলক গাড়ীতে বসিয়া অবাক্ হইয়া বলিল,—বড় মামা আমরা কোথায় যাবো? বৌমার কাছে?

—না—তোমার বাবার কাছে—

—না, আমি বৌমার কাছে যাব,—আমাকে বৌমার কাছে নিয়ে চল।

পুলকের শিশু-কণ্ঠের মিনতি কাতর স্বরে অরুণ একটু বিচলিত হইল, বলিল, আচ্ছা।

শরতের অম্লান জ্যোৎস্না-প্লাবিত মাঠের দিকে উদ্দেশ দৃষ্টিতে চাহিয়া অরুণ কি যেন ভাবিতে লাগিল। নীরব প্রাণের সুরে যেন চাঁদের আলোও স্পন্দিত!

পচা পুকুরের পাঁকেও প্রকৃতির সোনার কাঠির স্পর্শে পঙ্কজ ফুটিয়াছে! বড় বড় কুমুদ বিকশিত পল্লবে সরিৎ বুকে শরৎ-লক্ষ্মীর পদ্মাসন বিছাইয়া দিয়াছে। সর্ব্বত্র গানে, গন্ধে, বর্ণে বৈচিত্র্য! ছন্দ-পতন কোথাও নাই!

সারা রাত্রি অরুণের বিনিদ্র দুই চোখ চাহিয়াই কাটিল। ভোরে সে ট্রেন বদ্‌লাইল। ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

নেবু-ফুল

ছোট্ট নেবুর ফুলটি, আমার ছোট্ট নেবুর ফুল—
স্বর্ণ-উষার কর্ণভূষার বর্ণ-তুষার দুল!
চন্দ্রধবল সরস কান্তি,
চন্দন-রস-পরশ শান্তি,
মন্দমারুত বন্দনারত—গন্ধ তব অতুল—
ছোট্ট নেবুর ফুল!
সন্ধ্যার তুই সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যা বুকের গৌরবী আশা,
গুপ্ত প্রেমের সুপ্ত পিয়াসা—বাসনার বুলবুল—
ছোট্ট নেবুর ফুল!
নিশীথ রাতের বিরহের গীতি—
নিমেষে পরাণ নিস্ তুই জিতি,
প্রথম প্রীতির মধুময়ী স্মৃতি—ব্যথা-ভরা দুটি ভুল—
ছোট্ট নেবুর ফুল।
গন্ধপুরবীর রাজকন্যার নাসায় বেসর-ফুল,
মুগ্ধ হিয়ার মন্দির ভোরি সৌরভে মশ্‌গুল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

পারিবারিক ও রাষ্ট্রসামাজিক কর্ত্তব্য

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রত্যেক আপনাপন পরিবার-সম্বন্ধে কর্ত্তব্য করিলেই হয়, তাহা হইলেই সকলের পরিবার সুশৃঙ্খল হওয়ার সহিত রাষ্ট্রসমাজও সুখশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে রাষ্ট্রসামাজিক কাজের চেষ্টা অনাবশ্যক। কিন্তু সমষ্টি ব্যষ্টির সমবায় বটে, ব্যষ্টিও সমষ্টির অঙ্গমাত্র। সমস্ত দেহের স্বাস্থ্য-বিধানের জন্য চেষ্টা না করিয়া একটী অঙ্গকে পুষ্ট করিবার চেষ্টায় কোন ফল হয় না। আর রাষ্ট্রসমাজ ত কেবল কতকগুলি স্বতন্ত্র পরিবার মাত্র নয়, তাহার সমগ্রতারও একটী রূপ, আইন-কানুন ইত্যাদি আছে। তাহার ফলাফল হইতে পরিবারও রক্ষা পায় না। রাষ্ট্রসামাজিক উন্নতি ও সুখসমৃদ্ধি লাভ না হইলে পরিবারও সুখী এবং উন্নত হইতে পারে না। কেবল পরিবার লইয়া থাকিলে ত রাষ্ট্রসমাজ গঠনের সহিত সভ্যতাই অসম্ভব হইত। ব্যক্তির জন্যই পরিবার এবং পরিবারের জন্যই রাষ্ট্রসমাজের প্রয়োজন হইয়াছে। অনেক কাজ যাহা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ভাবে হওয়া অসম্ভব; রাষ্ট্রসমাজের যোগেই তাহা সম্ভব হইতেছে। এই সুবিধার বিষয়ে দৃষ্টি যত খুলিতেছে, রাষ্ট্রসামাজিক কাজ ও কর্ত্তব্যের দিকেও লোকের মনও তত আকৃষ্ট হইতেছে। কর দেওয়াতেও রাষ্ট্রে সকলের দায়িত্ব স্বীকার করা হয়। এখন ঐ কর দেওয়া হইতে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা দ্বারা তাহার পরিচালনেও সকলের অধিকার-দাবী এবং তাহার সহিত তাহার ভারও গ্রহণ করা হইতেছে। সুতরাং রাষ্ট্রকে লোকে ক্রমেই আপনার দায়িত্ব, অধিকার ও মনোযোগের বিষয় করিয়া তুলিতেছে।

আর এই যে প্রত্যেকের আপনাপন পারিবারিক শৃঙ্খলা লইয়া থাকার কথা হয়, প্রত্যেকের অবস্থা কি সমান? কেহ হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া ঐ শৃঙ্খলা আনিতে পারে না,—কাহারও বা অপরের সাহায্যেই তাহা হইয়া থাকে, আপনারা আলস্য-ব্যসনে কাল কাটায়। কাজেই অতি-ক্লিষ্টেরাও যাহাতে কিছু সুখশান্তি ও সভ্যতার ফল লাভ করিতে পারেন, যাঁহাদের সময় ও সুবিধা আছে, তাঁহাদের তাহার চেষ্টা দেখা উচিত। ঐ সকল দুঃখ-যন্ত্রণা অনেক সময়ই আবার রাষ্ট্রসামাজিক কুনিয়মের ফল, কাজেই সেখানে তাহার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা না করিলে উহাও দূর করা যায় না। প্রতিবেশীর স্বাস্থ্য-নিয়ম ও পরিচ্ছন্নতার জ্ঞানের অভাবের ফলে পাশের বাড়ীর লোককেও দুর্গন্ধ ভোগ করিতে ও কুদৃশ্য দেখিতে হয়,—সংক্রামক রোগের হাত হইতেও তিনি নিস্তার পাইতে পারেন না। আপনার বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখিলেও স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না,—সমবেত চেষ্টার আবশ্যকতা সেখানেও আসিয়া পড়ে। সামাজিক প্রথা ও আইন-কানুনের সম্বন্ধেও ইহা খাটে। আজ যিনি সুখ-সৌভাগ্যে বিভোর, কোন বিপদ ঘটিলে তাঁহারও তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। রাষ্ট্রসমাজের ব্যবস্থা না থাকিলে ও তাহার সহায়তা না পাইলে অনেক কাজই করা যায় না, কতক বা কেবল ধনীলোকদের পক্ষেই করানো সম্ভব,—সাধারণের তাহাও অনায়ত্ত থাকিয়া যায়; সামাজিক কুসংস্কারের প্রভাব ও ফলের হাত হইতেও কেহই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্রসমাজের দিকে না দেখিলে পারিবারিক সুখশান্তি বা উন্নতি কিছুই সম্ভব নয়। এই পরস্পরাপেক্ষিকতার জ্ঞান হইতেই সার্ব্বজাতিক সম্মিলনের আবশ্যকতাও মানুষ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পারিবারিক কর্ত্তব্যের দ্বারা রাষ্ট্রসামাজিক কর্ত্তব্যের অনাবশ্যকতার কথা মেয়েদের বেলাই অবশ্য বিশেষরূপে বলা হয়। কিন্তু তাঁহারাও ত কেবল পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন নাই, রাষ্ট্রসমাজেও তাঁহাদের জন্ম। তাহার আইন-কানুন তাঁহাদেরও মানিয়া চলিতে হয় এবং তাহার ফলাফলও ভোগ করিতে হয়। প্রত্যেক পরিবারও কি রাষ্ট্রসমাজের ফল নয়? কাজেই রাষ্ট্রসমাজের কাজে যোগদান তাঁহাদের যেমন কর্ত্তব্য, তেমনি আবশ্যক। তেমনি পুরুষেরও যে

পরিবারিক কর্ত্তব্য নাই, এমন নয়। কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার পারিবারিক কর্ত্তব্য কেবল অর্থোপার্জ্জনে দাঁড়াইয়াছে। আর ঐ অর্থোপার্জ্জন করিতে গিয়াও তাঁহাকে রাষ্ট্রসমাজের কাজও করিতে হয়। কিন্তু মেয়েদের রাষ্ট্রসমাজে কোন দাবী না থাকায় তাঁহাদের কাজগুলি কেবল পারিবারিক মাত্র হইয়া আছে। রাষ্ট্রসমাজের সহিত তাহার কোন প্রত্যক্ষ যোগ নাই। এইজন্য রাষ্ট্রসামাজিক কোন কাজ করিতে হইলে ঐগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে করিতে হয়। সেইজন্যই আরও মেয়েদের ঐ সকল কাজ করা এত কঠিন হয়। একে ত তাহার কোন কার্য্যক্ষেত্র বা শিক্ষা কিছুরই সুবিধা নাই, তাহার পর তাঁহাদের বর্ত্তমান কার্য্য-ব্যবস্থার মধ্যে অধিকাংশেরই তার জন্য সময় হওয়াও সম্ভব নয়। ঐ সকল কাজে তাঁহাদের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও নাই, বরং অর্থব্যয়ই আবশ্যক। সে অর্থও তাঁহাদের হাতে নাই।

যাহাদেরই রাষ্ট্রসমাজ আপনাদের যত অনায়ত্ত,তাহাদেরই এই সকল অসুবিধা সেই পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। বিলাতের লোকে করমাত্র দিয়াই রাষ্ট্রকে যে পরিমাণে আপনার ইচ্ছানুযায়ী চালাইতে পারে ও সেই অর্থে রাষ্ট্রের নিকট হইতে আপনাদের সুবিধা ও প্রয়োজনীয় বিষয় আদায় করিয়া থাকে এবং রাষ্ট্রের কাজ করিয়াই দেশের সেবাও করিতে সমর্থ হয়, আমাদের দেশের লোকে তাহা পারে না, উহা ছাড়াও দেশের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কাজ ও অর্থব্যয় করার আবশ্যক হয়।

সেইজন্য মেয়েদের এখন দেশের কাজে আসিতে হইলে বেগ পাইতেই হইবে। কিন্তু তাঁহারা ঐ সকল কাজে না আসিলেও ত ইহার প্রতিকার হইবে না। এ বিষয়েও আমাদের দেশের রাজনীতি ও লোকহিত-প্রচেষ্টার সহিত তাঁহাদের সাদৃশ্য আছে। এখন যে সকল কাজ তাঁহাদের উপর রহিয়াছে, তাহার আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় মূল্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হওয়ার সহিত তাহা সুসম্বদ্ধ। সুশৃঙ্খল হইয়া রাষ্ট্র-সাহায্য পাইলেই ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সন্তান-জন্ম ও পালন রাষ্ট্রের পক্ষেও গুরুতর ব্যাপার ও তাহার মনোযোগের বিষয় বলিয়া ক্রমেই স্বীকৃত হইতেছে। তাহার সহিত একদিকে যেমন সন্তানের উপর পিতামাতার অখণ্ড অধিকার খর্ব্ব হইয়াছে, তেমনি সকল সভ্যদেশেই অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুর আশ্রয়স্থান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অসহায় মাতৃত্বস্থলে রাষ্ট্রসাহায্যে শিশুরক্ষাগার ইত্যাদি নানারূপেই মাতাকে সাহায্য করিবার পরিকল্পনা চলিতেছে। গৃহকর্ম্ম গুলিও শ্রম-লাঘব-যন্ত্রের দ্বারা ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবসায়ে পরিণত হইয়া একসঙ্গে শ্রম-লাঘব, অপচয়-নিবারণ, ঐ সকল শিল্পের উন্নতি ও তাহার সাহায্যে অর্থোপার্জ্জনের উপায়ও আবিষ্কৃত হইতেছে। মেয়েদের রাষ্ট্রসমাজে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের কাজগুলিরও এইরূপে প্রকৃত উন্নতি এবং রাষ্ট্রসমাজেও তাহার গুরুত্ব ও মূল্য ঠিকভাবে স্বীকৃত হইতে পারে। এদিকে তাহার সহিত শিক্ষার সুযোগ ও তাঁহাদের কাজগুলি সুশৃঙ্খল ও সাহায্যপ্রাপ্ত হইলে তাঁহারা দেশের কাজে আসিবার সময়ও যেমন পাইবেন, তাহার দ্বারা এবং তাঁহাদের বর্ত্তমান কাজগুলি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনও করিতে পারিবেন। কাজের জাতিভেদ দূরও তাঁহাদেরই করিতে হইবে। সকল রকম প্রয়োজনীয় সৎকাজই নর-নারী সকলের পক্ষেই গ্রহণীয় ও মুক্ত থাকিবে। সেইজন্য ছেলেবেলা হইতে ছেলেমেয়েদের সকলকেই মনের উন্নতি-জনক শিক্ষা ও কোন একটী অর্থকরী বিদ্যার সহিত রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়; কিছু পরিমাণ গৃহকর্ম্মও শিখাইতে হইবে। এইরূপেই মেয়েদের কাজ যাহা কেবলমাত্র পারিবারিক ও তাঁহাদের মধ্যেই বদ্ধ থাকায় তাঁহাদের সকল উন্নতির অন্তরায় হইয়া আছে, তাহার দাসত্ব ঘুচিয়া সেগুলিও যেমন সার্ব্বজনিক ও মূল্যবান হইয়া উঠিতে পারে, তাঁহারাও তেমনি বর্ত্তমানের সার্ব্বজনিক ও মূল্যবান কাজগুলিতে যোগ দিতে পারেন। মেয়েরা দেশের ও দশের কাজে আসিলে ঘরকন্নার নিরর্থক খুঁটিনাটির দাবীগুলিতে শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাদের যে সময়ের অপচয় হয়, তাহাও নিবারিত হইবে। আপনাদের ব্যক্তিগত ছোটখাট কাজগুলিও সকলে আপনারাই করিবেন, পরিবারের সকলেই তাহা নবাবের মত মেয়েদের ঘাড়েই চাপাইতে পারিবেন না। বিশেষ প্রয়োজনের স্থলে আপনার

জনের মধ্যে পরস্পরের সাহায্যের কথা স্বতন্ত্র; তাহার জাতি-বিচারই থাকিবে না।

কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহাদের এই অচলায়তন মাথায় করিয়া তাহার উপর আবার আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করা অবশ্য সহজ নয়। ইহার জন্য প্রথমে আবশ্যক তাঁহাদের সকলেরই এ বিষয়ে মুক্ত দৃষ্টি ও সহানুভূতি,প্রত্যেকের আপনার অবস্থার মধ্যে যতদূর সম্ভব শিক্ষালাভ ও তাহার চর্চ্চা রাখার চেষ্টা এবং সন্তানদের ঐ ভাবে গড়িয়া তোলা। আপনার পরিচিতদের মধ্যে এভাব জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টাও সকলেই করিতে পারেন। তার পর আপনার শক্তি, প্রকৃতি, ও সুবিধা অনুসারে উহার জন্য যে-কোন রকমের কাজ যথাসাধ্য করিয়া যাওয়া। ইহা কেহ হাতে-কলমে,কেহ আবার অর্থদ্বারা করিতে পারেন। আর যথাসম্ভব কোন বিভাগ কোন পদ্ধতি অনুসারে সঙ্ঘবদ্ধভাবে করিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হয়। লেখাপড়ার কাজে সাধারণভাবে লেখালেখি ছাড়াও কেহ এই সকল বিষয়ের পাশ্চাত্য ভাল বই ও প্রবন্ধাদির অনুবাদ, ঐ বিষয় লইয়া সাহিত্য-রচনা, সাময়িক সকল ঘটনা ও আলোচনা লইয়া আন্দোলন, যিনি যেখানে থাকেন সেখানকার ঘটনা সংগ্রহ করিয়া ও সকল শ্রেণীর লোকের অবস্থা ও মনোভাব জানিয়া প্রকাশ, যে সকল দেশহিতকামী এ সকল বিষয়ে কাজ ও চেষ্টা করিতেছেন চিঠিপত্র লিখিয়া তাঁহাদের ধন্যবাদ ও উৎসাহ-দান এবং নূতন নূতন অভাবাদির প্রতিকার-বিষয়ে চেষ্টার জন্য অনুরোধ, রাষ্ট্রসামাজিক বিশেষ বিশেষ অধিকার-প্রাপ্তির জন্য নিয়মিত আন্দোলন, শিক্ষার প্রণালী ও এক একটী বিষয় লইয়া রীতিমত পড়াশুনা ইত্যাদি অসংখ্য কাজের যে কোনটীর জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। কোন সভা-সমিতির সহিত যোগ রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া এবং তাহার সহায়তায়ও ইহার অনেকগুলি বিষয়ে কাজ করিতে গেলে বেশী ফল হইতে পারে। তার পর হাতের কাজেও কেবল নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য সচেষ্ট না হইয়া যেগুলি আছে ও হইতেছে, তাহাতেই সাহায্য ও সেগুলিকেই উন্নত করিয়া লইবার চেষ্টা করাই ভাল। অবশ্য নূতনও যে অনেক এবং অনেক রকমের করিতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

কোন একটী শিক্ষিত মহিলা সংসার ও সন্তান লইয়া ব্যস্ত থাকায় তাঁহার এ সকল কাজ করিবার সময় নাই বলিয়া এ-সব সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতেই চান নাই। কিন্তু তাহার কোন অর্থ নাই। যাঁহার সত্যই বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ আছে, তাঁহাকে ঐ সকল কাজে সাহায্যের ব্যবস্থা না করিয়া অবশ্য কেহই অন্য কোন কাজে তখনই লাগিয়া যাইতে বলিতে পারেন না। কিন্তু সহানুভূতি ও ঐ সকল বিষয়ে আগ্রহ রাখিয়া চলিতে সকলেই পারেন। তাহার দ্বারাও নানারকমে অলক্ষিতে "কাজ"ও হইয়া থাকে। আর যে মহিলাটী উহা বলিয়াছিলেন, তিনি ত সেভাবে অনেক কাজই করিতে পারেন। কারণ বড় লোকের মধ্যেই তাঁহার গতিবিধি চেনা পরিচয় আছে। ঐ সকল কাজের সভা-সমিতি ও শিক্ষালয়াদির সদস্য হইয়া ও তাহাতে অর্থসাহায্য ও বন্ধুদের মধ্যে সেগুলি পরিচিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে বিশেষ কঠিন নয়। চারিদিকের খবরাখবর লওয়া ও তাহার মধ্যে এ সকল ভাবের কিছু কিছু প্রচারও যে তিনি একেবারে না করিতে পারেন, এমন নয়। এইভাবে আগ্রহ ও যোগ রাখিয়া চলিতে পারিলে সন্তানেরা বড় হইলে আমাদের দেশের মেয়েদের তুলনায় যে কোন কাজের ভার পুরাপুরি লওয়ার সুযোগ তাঁহার যথেষ্টই হইতে পারে! কাজেই সন্তানেরা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কথা কানে না তুলিবার প্রতিজ্ঞা তাঁহার ঠিক হয় নাই। ওরূপ করিলে সে সময় আসিলেও তাহার জন্য সত্য আগ্রহ, আর চেষ্টা না আসাই সম্ভব। তখন এক প্রকার অসন্তুষ্ট আরামে জীবন যাপন করিবারই ইচ্ছা হইতে পারে। তাহা যে বিশেষ অপরাধ তাহাও নয়। কিন্তু মেয়েদের বর্ত্তমান সঙ্কটকালে যাঁহাদের একটু সৌভাগ্য, সুবিধা আছে তাঁহাদের ছাড়িয়া চলে না। চেষ্টা করিলেও এমনই তাঁহাদের মুষ্টিমেয় সংখ্যার মধ্য হইতেও অনেকেই বাদ পড়িবার সম্ভাবনা। বাস্তবিক মেয়েদের কাজের মুস্কিলই ত এই। একে ত তাঁহাদের অর্থ সামর্থ্য ও সময়—সকলেরই অসদ্ভাব তাহার উপর আবার যাঁহারা সুখ-সৌভাগ্যশালী তাঁহারা প্রকৃত ব্যাপার কিছুই তেমন বুঝিতে বা অনুভব করিতে

পারেন না। এদিকে যাহারা দুঃখ-দুর্দ্দশায় হাবুডুবু খাইতেছে, তাহাদেরও কিছু করা দূরে থাক, আপনাদের বিষয় জানাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু সুখ-সৌভাগ্যশালীদের এখন ইহা বুঝিয়া কাজে নামার সময় আসিয়াছে। ইহাও মনে রাখা উচিত সুখসৌভাগ্য কাহারও চিরদিন থাকে না;—তখন রাষ্ট্রসমাজের ফল তাঁহাদেরও পাইতে হইবে। আর যাঁহারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন অথবা উন্নততর জীবনের স্বাদ লাভ করিবার কোন সুযোগই পান নাই,—তাঁহারাও তাঁহাদেরই মত নারী ও মানুষ। সুতরাং পৃথিবীর কাম্য বস্তুগুলি পাইবার অধিকার তাঁহাদেরও আছে। কাজেই তাহা যাহাতে তাঁহারা যতদূর সম্ভব পাইতে পারেন, তাহার ও যে সকল কারণে তাঁহাদের ঐরূপ অবস্থা ঘটিতেছে তাহার কারণানুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা সকলেরই একটী অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম। এই জ্ঞান সকলেরই ঠিক-মত জাগিলে অনেকেই যে কিছুই করিতে পারিবেন না, এমন বোধ হয় না। তাহাতে একদিকে আপনাদের কার্য্য ক্ষমতা ও তাহার ফল দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইবেন;—অন্যদিকে কাজে হাত দিলেই ঐ "সুখী সন্তুষ্ট" ভাবও আর থাকিবে না;—আপনাদের প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তব পৃথিবী যে কি জিনিষ, তাহা দেখিতে পাইবেন। শিক্ষাভিমানও এককালে ঘুচিয়া যাইবে;—আপনাদের অক্ষমতা দেখিয়া লজ্জায় দুঃখে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য প্রেরণা তাঁহাদের অস্থির করিবে। ইহার জন্য পারিবারিক কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দেওয়ার আবশ্যক হয় না, তবে এখন ঐ নামে যে সকল বাহুল্য ও বাজে জিনিষে তাঁহারা জড়াইয়া আছেন, সেগুলি ছাড়াইতে হইবে বটে। তাহাতেও মঙ্গলই হইবে।

বোম্বাই, মান্দ্রাজের মেয়েরা সহজেই যেমন দেশের ও দশের কাজে আসিতে পারেন, তাঁহাদের অপেক্ষা শতগুণে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বাঙ্গালী শিক্ষিতারা যে তাহা পারেন না, তাহার কারণ খুঁজিতে গেলে দেখা যায় একে ত পর্দ্দার জন্য দেশের লোকের বিরুদ্ধতা তাঁহাদেরও কিছু বাধা দিয়া থাকে, তার পর তাঁহারা ভিক্টোরিয়া যুগেই অবস্থান করিতেছেন। বিশেষতঃ আহার, পরিচ্ছদ ও সংসারের যে আড়ম্বর ও খুঁটিনাটির দাবী তাঁহাদের মিটাইতে হয়, তাহাতেও কাজের ক্ষতি কম করে না। বোম্বাই, মান্দ্রাজ-বাসীরা ইহা অপেক্ষা অনেক সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। ইহার মধ্যে পরিচ্ছদের যে উন্নতি তাঁহারা করিয়াছেন, তাহার কতক অবশ্যই রাখার যোগ্য ও প্রশংসনীয়। কিন্তু তাহার ও আহারের আড়ম্বরের বাহুল্যগুলি তাঁহাদের বর্জ্জন করিতে হইবে।

আর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন ত নানা সুখ দুঃখ, কর্ত্তব্যের বোঝা লইয়া আমাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছেই, তাহার হাত হইতে ছুটি পাওয়া কি সহজ? না, আমাদের মন ও চিন্তাই তাহার গণ্ডী ছাড়াইয়া সহজে যাইতে চায়? কিন্তু তবু রাষ্ট্রসমাজ ও সমধর্ম্মী মানুষের কথাও ভুলিলে চলিবে না। ব্যক্তিগত পারিবারিক গণ্ডীর বাহিরে মনের গতি যদি রুদ্ধই থাকে, তাহা হইলে দুর্দ্দিনেই বা আমাদের আশ্রয় কোথায় মিলিবে? তাই স্বার্থের জন্যও সময় থাকিতে পরের চিন্তাকে আত্মচিন্তা করিয়া লওয়া ভাল;—তাহা হইলে নিছক আত্মচিন্তার প্রয়োজন যতই কম বা তাহা বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিবে, ততই পর-চিন্তার দিকে মনকে প্রবাহিত করা সম্ভব হইবে। বিদ্যা ও কলানু-শীলনেও ইহা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে মনের সম্পন্ন অবস্থার প্রয়োজন হয়। "অজরামরবৎ" হইয়াই বিদ্যার সাধনা করা যায়, কিন্তু "গৃহীত ইব কেশেষু" অবস্থায় সমান তীব্র ঔষধ না হইলে চলে। আপনার মনের ক্ষত অন্যের অধিকতর ক্ষতাক্ত অবস্থার কথা ভাবিয়াই ভুলিয়া থাকা যায়, এবং অন্যের ক্ষতশান্তির চেষ্টায় নিজেরও শান্তিলাভ ঘটে। আর বিদ্যায় আশ্রয় থাকিলেও আর একটী "অধিকন্তু" অবলম্বন থাকিলেও ত ক্ষতি নাই।

ঐ রকম অবস্থায় ধর্ম্মের দিকেও অবশ্য অনেকেরই মন গিয়া থাকে; আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের প্রভাবও যেমন কমিয়াছে মনে হয়, তাহা নয়। এখনও নূতন নূতন মঠ, মন্দির, গুরুর আবির্ভাব নিত্যই হইতেছে। তাহার শিষ্য, সেবাইত ও অর্থের বলও কম নয়। বিশেষতঃ মেয়েদের ইহার জন্য ব্রত, পূজা, তীর্থ-দর্শন, গুরুপুরোহিত পাণ্ডাদির সেবা ও তাঁহাদের দান দক্ষিণা দিতে যে পরিমাণ সময়, অর্থ,

শক্তি ও সদ্ভাবের অপচয় ঘটে, তাহা দেখিয়া অবসন্ন হইতে হয়। তাহার শতাংশও তাঁহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইলে অনেক কাজই হইতে পারে। ইহার মধ্যেও প্রকৃত অধিকার তাঁহাদের সামান্যই আছে,—হাজার শুদ্ধ, সংযমী ব্রাহ্মণীও যে বিগ্রহ স্পর্শও করিতে না পাইয়া পূজার জন্য সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া অপেক্ষা করেন, অশুচি, কদাচারী, কপট এক বামুন এক নিমেষ ঘণ্টা নাড়িয়া তাহা সমাধা করিতে পারে। শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার তাঁহাদের সামান্যই। তবু একে ত শিক্ষার অভাব, তাহার উপর এইগুলিই একাধারে তাঁহাদের অবলম্বন ও চিত্ত-বিনোদনের ক্ষেত্র। আর এগুলি তাঁহাদের যেমন হাতের কাছে তৈরী হইয়া আছে ও ইহাতেই তবু তাঁহাদের যেটুকু অধিকার ও সমস্ত সমাজ-রাষ্ট্রের সহায়তা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, নূতন কিছুতেই তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। যে অর্থ ও সময় তাঁহারা ঐ সকল ব্যাপারে সহজে খরচ করিতে পারেন, তাহার শতাংশের একাংশও অন্য কিছুর জন্য করিতে গেলে প্রলয় বাধিবে। বাস্তবিক দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, এই সকলের জন্য স্বামী, সন্তান, সংসারে যে পরিমাণ মনোযোগের শৈথিল্য তাঁহাদের সহজেই চলিয়া যায় ও তাহার জন্য স্বামীর বিরুদ্ধাচরণও তাঁহারা করিতে পারেন, কোন "স্বাধীনা"ই তাহা মনেও করিতে পারেন না।

ধর্ম্মের ধ্যান, ধারণা, সাধনা, উপাসনা বা ভজন কীর্ত্তন লইয়াও অনেকে ব্যাপৃত থাকেন। ইহার মধ্যে প্রথম চারিটী ও শেষের দুইটী অবশ্য একশ্রেণীর নয়। ভজন কীর্ত্তনের মাতামাতি দেশ হইতে অদৃশ্য হইলেই মঙ্গল। কেবল ধর্ম্ম-সঙ্গীত গান হইতে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার বিষয় বলিতে গেলে অনেকই বলিতে হয়। মেয়েরা আপনারা এ-সকল না করিলেও এসবে সাহায্য করেন, উৎসাহ দেন,—কাজেই তাঁহাদের শক্তিব্যয় ইহাতেও হয়। অন্যগুলি ইহাপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর হইলেও শুধু এ-সব হইতে তাঁহাদের মনোযোগ লোকহিতে আকৃষ্ট হইলেই সুখের বিষয় হয়। বাস্তবিক যাঁহাদের ঐ বিষয়েই বিশেষ প্রতিভা, তন্ময়তা আছে, তাঁহারা ভিন্ন সকলেরই ধর্ম্মকে চরিত্রগঠন, মনের মাধুর্য্য-রক্ষা ও সৎকর্ম্মের দিকে নিয়োজিত করাই উচিত। নতুবা ইহা সর্ব্বত্রই আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় পরিণত হইয়া প্রকৃত লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। ভাবাবেগ জিনিষটা বড়ই বিপজ্জনক ও সংক্রামক। অল্প লোকেই ইহার অধিকারী,—কিন্তু সহজেই ইহা লোককে পাইয়া বসে। এমন কি যাঁহারা সত্যই ভাব-রাজ্যের মানুষ,—তাঁহাদেরও কিছু বস্তুগত কঠিন জিনিষের অবলম্বন দরকার,—নহিলে মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। এই সব বুঝিয়া সংসার ছাড়া ব্যয় করিবার মত সময়, অর্থ ও সদিচ্ছার যে অল্প পুঁজিপাটা-টুকু মেয়েদের থাকে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়ে খাটাইবার চেষ্টা করাই উচিত। তাঁহাদের আপনাদের অবস্থার উন্নতি এবং শিশু ও নারীমঙ্গলের চেষ্টাই এ বিষয়ে প্রথম স্থান পাইবার অধিকারী। কারণ মানব-কল্যাণমাত্রই তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হইলেও এবিষয়ে তাঁহারা না করিলে সত্য কিছু হওয়ার আশাও যেমন কম, লোকের যথার্থ মনোযোগও ইহাতে তেমনি কম গিয়াছে। এদিকে মানুষের পাপ তাপও ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।

বঙ্গনারী।

ঝর্-ঝর্

চারিধার ঢেকে আজ
আঁধিয়ার!
ঝিম্ ঝিম্ ঝরে ঐ
বারি-ধার!
ছিপ্ ছিপ্ টিপ টিপ
নির্জীব নির্জীব
ঘন ঘন হতাশ্বাস
দুনিয়ার—
থেকে থেকে জাগে ঘোর
আঁধিয়ার।
ব্যথা-মাখা বাতাসের
ক্রন্দন
পাষাণেরো প্রাণ করে
মন্থন!
সারা রাত সারা রাত
বেদনার ধারা-পাত
ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্
ঝম্‌ঝম্—
হতাশার, বেদনার
ক্রন্দন।

ঘন ঘন সারা বন-
মর্ম্মর—
উচ্ছ্বাসে ঢালে বারি
ঝর্ঝর!
বিলকুল বিলকুল
কাঁদে ঐ ভেককুল—
শিহরিয়া ওঠে সারা
অন্তর—
উচ্ছ্বাসে আঁখি ঝরে
ঝর্ঝর!

আকাশের মুখে কালো
আবরণ—
দূরে ফেলে দেছে সব
আভরণ!
প্রাণ কাঁদে হায়-হায়
বেদনায় বেদনায়—
ক্রন্দন নহে মোর
অকারণ—
হারায়েছি জীবনের
আভরণ!

শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাদল-বাতাস

দীপ্তি থাক্‌ত আমহার্ষ্ট-ষ্ট্রীটের ওপরে, আর নিপুণ থাক্‌ত শোভাবাজার ছাড়িয়ে সরু কুণ্ডলী পাকানো এঁদো একটা নামহারা গলিতে। এ ছিল তাদের স্থানের ব্যবধান কিন্তু আজ তাদের অবাক্ করে প্রাণের ব্যবধানও ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়্‌চে দিক্-দিগন্তর ছাড়িয়ে, যেন কোন্ আট্‌লাণ্টিকের এ-পার ও-পার! মাঝখানে কান্নার তুফান, দীর্ঘশ্বাসের ঝঞ্ঝা, আহত অভিমানের ভরা গুমোট!···

ছিল তো তারা দেশ সাগরের বুকে পাশাপাশি দুটি ঢেউয়ের মতো, কোকিলের দু-ফের রাগিণীর মতো, আঁখি-যুগের দুটি তারার মতো! কিন্তু ভাঁটায় ঢেউ নাচে না, বর্ষায় কোকিল ডাকে না, আঁখি আজ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে! নিপুণ ভাবচে, দীপ্তি মিথ্যাবাদী! আর দীপ্তি ভাবচে, নিপুণ মর্ম্মহীন!

জাহাজের সামান্য একটা ফুটো থেকে জাহাজের সর্ব্বনাশ

হয়, ধূমকেতু তার পুচ্ছ একটুখানি ছোঁয়ালে সারা সৃষ্টি ছারখার হয়ে যায়, আনাড়ির জিভে নেশার সথে একটু 'আফিং পড়লেই তার সব শেষ হয়ে আসে !······

অনেকদিন নিপুণ দীপ্তির চিঠি পাচ্ছে না। দীপ্তি চিঠি দিচ্ছে না এই ভেবে, কেন! সেঁ তো এক দিন বিকেলবেলা অনায়াসেই আমার সঙ্গে এসে দেখা করে' যেতে পারে! নিপুণ ভাবচে, সে তো অনায়াসেই একখানা ছোট্ট কার্ড লিখে ফেলে দিতে পারে, তা হলেই তো যেতে পারি একদিন !...

এম্‌নি করে' অনেকদিন কেটে গেল, দীপ্তি খায়না চিঠি, নিপুণও আসে না দেখা করতে। দুজনের, বিশেষ করে' দীপ্তির বুকে অভিমান গাঢ় হয়ে উঠ্‌ল। সে ভাবলে, পুরুষ জাতটা এম্‌নি কপট, এম্‌নি নিষ্ঠুর!

কিন্তু পুরুষ নিপুণের ভারী কষ্ট হল, অভিমানী দীপ্তির কথা মনে করে-করে!...অভিমানের সংগ্রামে মেয়েরা চিরকালই জিতেচে। ব্রহ্মাস্ত্র তাদের সজল চোখ, স্ফুরণ-কাঁপা ঠোঁট, আরক্ত গাল, গর্ব্বিত গতি! তারপর যদি কথা কয়,সে যেন জলে-ভেজা বাতাসের একটা বিলাপ-কাকলী, যদি ছোঁয় সে যেন শিশির-লাগা গোলাপের গন্ধময় একটা পিছ্‌লে-পড়া চুম্বন! মেয়েদের অভিমান মানেই নিরুপদ্রব অসহযোগ—এর জয় অবশ্যম্ভাবী।...তাই একদিন নিপুণ খুব সাজ-সজ্জা করে বেরিয়ে পড়্‌ল তার দীপ্তি-প্রিয়ার অভিমানের ঘোম্‌টা খুলে ফেলতে! তার বর্ষা-ভেজা স্যাঁতা মনটা আকাশ-ফাটা শরৎ-রৌদ্রে মাখিয়ে বেশ তাজা করে' তুল্‌লে! পা-ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে স্ফূর্ত্তির একটা ছন্দ দোদুল হয়ে উঠ্‌ল! কিন্তু, হায়রে, তাকে ভূতে পেয়ে বস্‌লো। কি খেয়াল যে পেল তার, সে দীপ্তিদের বাড়ীর কাছে এসে ভাব্‌লে, ঢুকবে না।...দরজা খুলে এল দীপ্তির ছোট ভাই রুনু··· নিপুণ তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌ল—রুনু, এই বইটা তোমার দিদিকে দিও, বুঝ্‌লে—বলেই দীপ্তির চাওয়া একখানি বটানীর বই রুনুর হাতে গুঁজে নিপুণ বড় বড় পা ফেলে কলেজ-স্কোয়ারের মুখে চলল!

দীপ্তি তখন তার স্প্রীং-এর খাটে একটা নরম বালিসে ভর দিয়ে একখানা মাসিক-পত্র পড়্‌ছিল। রুনু তার হাতে বইখানা দিয়ে বল্লে—নিপুণ দা তোমাকে দিলে...

নিপুণ! দীপ্তি চম্‌কে উঠে বল্লে—কোথায় সে?—

—সে আমাকে দিয়েই চলে' গেল।

চলে' গেল! দীপ্তি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লে। এসেছিল তো চলে' গেল কেন? তার এই নির্দ্দয়তার অর্থ কি? নিপুণ কি তবে আর দীপ্তিকে ভালবাসেনা? দীপ্তির ইচ্ছা হলো, জান্‌লা দিয়ে বইটাকে ছুড়ে ফেলে দেয়! এমন দয়ার প্রত্যাশা সে করেনা। সে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদ্‌তে সুরু কর্‌লে।...

নিপুণ বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে ভাব্‌তে লাগল, দীপ্তিকে খুব আঘাত দিয়েচি, না? কেন, সে বুঝি একছত্র একটা কার্ড লিখতে পার্‌ত না? ভারী তো গুমর! আমরাই বুঝি চিরকাল কাঙাল হয়ে থাকবো? কেন, ওরা বুঝি সেধে কিছু কর্‌তে পারে না?···

দিন যায়। নিপুণ রোজ কলেজ থেকে আস্‌বার সময় ভাবে, টেবিলের ওপর বড় কোরে লেখা তার নাম-ওয়ালা একখানি চিঠি দেখতে পাবে, উঃ, তা হলে কি সুখই হয়! আর দীপ্তি ভাবে, এই বুঝি নীচের বারান্দায় কোন্ আকাঙ্ক্ষিতের পরিমিত পায়ের শব্দ ধ্বনিয়ে ওঠে, অঃ, তা হলে তার বুকের ভেতরটা কি রকম ঢিপ্ ঢিপ্ করতে সুরু করে, না জানি! কিন্তু কই সে চিঠি, কই বা জুতোর মস্‌মস্? অভিমানের আগুনে দুজনেই খাক্ হতে লাগ্‌ল।···

যুদ্ধে নিপুণের আবার হার হল। সে এবার পলায়ন কর্‌লে না, দস্তুরমতো বন্ধুতা স্বীকার করলে; অর্থাৎ অন্য কোন কার্‌সাজি না করে বরাবর দীপ্তিদের বাড়ীতে ঢুকে পড়্‌ল। অনিশ্চিতের আশঙ্কায় কি-রকম দুর্-দুর্ করে উঠ্‌ছিল যে বুকটা!

নীচে নিপুণের গলার আওয়াজ পেয়ে দীপ্তির অভিমানে যেন হিম হয়ে এল। সে তাড়াতাড়ি বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। নিপুণ দীপ্তির ঘরে ঢুকে দীপ্তিকে স্পর্শ করে' ডাক্‌লে—দীপ!

দীপ্তি কথা কইলে না; কান্নায় ফুঁপে বুক তার ফুলে-ফুলে' উঠ্‌ছিল। মাথা থেকে হাতখানা সরিয়ে

দীপ্তির নগ্ন নিটোল নরম শাদা বাহুটির ওপর রেখে নিপুণ ধরা গলায় বল্লে—কথা কইবে না আমার সঙ্গে ?

গভীর অভিমানে দীপ্তি তার দিকে এনে হাতটা ছুড়ে দিলে তাকে ঠেলে দেবার জন্যে। নিপুণ ভাব্‌লে, দীপ্তি তার স্পর্শ অস্বীকার কর্‌চে, তাকে সে চায় না! অসহ দুঃখে নিপুণের অন্তর দুর্ব্বহ হয়ে উঠল। তাকে আরো খানিকক্ষণ আদর কর্‌লে হয়ত দীপ্তির মনের মেঘ দূর হয়ে যেত; কিন্তু নিপুণ ব্যথা পেলে বিষম! তাই খেয়ালের মাথায় আবার বড় বড় পা ফেলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, মনে-মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, এ-বাড়িতে আর না!...

দীপ্তির ডাগর দুই চোখ তখনো ছলছলাচ্ছে! সে ভাব্‌লে—তার বুকে বড্ড লেগেচে! তবে কেন সে সেদিন এত সাম্‌নে এসেও আমার সঙ্গে দেখা করে' গেল না? ভারী তো—! আমি বুঝি রাগ কর্‌তে পারিনা? বেশ হয়েচে। এতদিন না এসে আমাকে কষ্ট দিতে পারে, আর আমি বুঝি...কিন্তু...দীপ্তির কেমন যেন মনে হতে লাগ্‌ল, ব্যথার মাত্রাটা খুব বেশী হয়ে গেছে!...

নিপুণ বাড়ী এসে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, মেয়ে-জাতটা এম্‌নি কুটিল, এমন অবিশ্বাসী, এমন বিশ্বাসঘাতক! কান্না তার চোখ ছাপিয়ে উঠচে! সে মনে-মনে বল্লে—আমি তাকে কী ভালোই বাস্‌তাম। সে বুঝবে না! তার জন্য কত সহ্য করেচি,...হায়, সে বুঝলে না!...

কয়েকদিন বাদে নিপুণের কানে বাতাস-ভাসা এক গুজব এল, দীপ্তির বিয়ে হচ্চে। নিপুণ চমকের একটুও ভাণ কর্‌লে না। সে জানে, এই-ই হচ্চে তরুণীর ভালো-বাসার প্রতিদান! শুধু তার চোখে অশ্রুর বাঁধনহীন জোয়ার ডেকে এল! সে অনর্থক আবার প্রতিজ্ঞা কর্‌লে—তার বাড়ীতে আর কখনো না, কখনো না।...

দীপ্তি শুয়ে-শুয়ে ভাবে, হায়, সে কি দয়াহীন পাষাণ! কিন্তু তার ঐ কঠোর মুখখানা কি কোমল, কি স্নেহময়! সে বুঝি একবারও আস্‌তে পারে না? না, সে আর আমাকে ভালোবাসেনা, তা হলে একেবারে কি আস্‌তনা আর? যাক্ গে, ভাবব না তার কথা! তার যা খুসী, তাই করুক সে! আমার কে যে...দীপ্তি চোখের জল আর চেপে রাখতে পার্‌লে না।...

ভাবতে-ভাবতে অনিয়ম-অত্যাচারে নিপুণ-দীপ্তির দুজনেরই বিষম অসুখ হল, একজনের নিউমোনিয়া আর এক জনের টাইফয়েড! তারা দুজনেই একুশ দিন ভুগে ভালো হল। একই সুরের হাওয়া দুটি জীর্ণ শাখাকে পল্লবিত করে' তুল্‌ল।...

এ-ক'দিন নিষ্ফল বেদনায় গুমরে মরে' নিপুণ ককিয়ে উঠেচে—মরে' যাই, আমার জীবনের আর কি প্রয়োজন আছে? হায়, আমার সে দীপ্তি যদি একবার আস্‌ত আমার মুমূর্ষু দেহের পেয়ালায় শেষবারের মতো তার স্পর্শের অমিয় ঢাল্‌ত, যদি একটি বার আস্‌ত গো!...উঃ, এতদিনে সে হয়ত পর হয়ে গেছে! পর! নইলে আমার এ ব্যারাম শুনে একটা চিঠিও লিখলে না? না, না, সে যে আমাকে ঘৃণা করে, তাই ত সেদিন নীরব ইসারায় আমাকে বলেছিল, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, তোমাকে আমি চাইনা, কোন দিন না!...

দীপ্তি কাঁদ্‌ত—মরে যাচ্চি, তবু সে আসচে না, একবার, শুধু শেষবার একটুখানি 'দীপ' বলে ডাক্‌তে! পুরুষের এম্‌নি অভিমান, তা এত উগ্র, এত ভীষণ! না, সে আমাকে ভালো বাস্‌লে একটিবারও কি আস্‌ত না এই জ্বরো কপালটাতে একটুখানি...

একমাস পরে সত্যেনের বিয়েতে নিপুণ নিমন্ত্রণ পেয়েছিল বন্ধু-হিসেবে, আর দীপ্তি পেয়েছিল দূর-সম্পর্কে মাস্‌তুত বোন্ বলে'। একটা লোক-ভরা ঘরে তাদের দেখা হয়ে গেল, এক সন্ধ্যায়। তারা খানিকক্ষণ দুজনের দিকে বচন-হারা অতৃপ্তিতে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে চেয়ে রইল। নিপুণ দেখলে, দীপ্তির মাথায় তো ঘোম্‌টা নেই, সিঁথের সিঁদুরের চিহ্নও নেই! আর দীপ্তি দেখ্‌লে, নিপুণের কি সে স্নেহাতুর বিরস রঙের দুই চোখ!...

সমস্ত লোকের অস্তিত্ব আমোলে না এনে দুজনেই দুজনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। নিপুণ আবছা-স্বরে

বল্লে—তোমার চেহারা এত বিশ্রী হয়ে গেচে, তোমাকে যে আর চেনাই যাচ্ছে না!···হাতে হাতে তারা পরস্পরকে স্পর্শ করলে!...

এর বছর-খানেক পরে এক মেঘলা রাতে নির্জ্জন ছাতে একটা চেয়ারে ঠেসাঠেসি করে গা-ঘেঁষাঘেঁষি দুটি তরুণ-তরুণী বসে' ছিল। তরুণীর ঘোমটাটা ফেলে দিয়ে গভীর সোহাগে অতি আচম্‌কা তার লাল গালে তরুণ ঠোঁটের একটু পরশ দিলে!

দু-চোখে টলটলে ইঙ্গিত পূরে তরুণী বল্লে—তুমি ভারী···

তরুণ তাকে বুকের ওপর টেনে বল্লে—আর তুমি বুঝি...

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

আলোচনা

ম্যালথস প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান সময়ে নানাবিধ যন্ত্র ও উপায় সাহায্যে গর্ভ-নিবারণ তথা জন্ম-নিবারণ-পদ্ধতির প্রচলন এত বেশী হয়েছে যে বিজ্ঞানের তরফ থেকে তার সম্যক বিচার না করলে কেবলমাত্র অজ্ঞতার প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কেমন করে এই পদ্ধতির সূত্রপাত হল এবং তার ফলাফল কি, এ সমস্তই আমাদের জ্ঞাতব্য। কেবলমাত্র সমাজ-তন্ত্রের দিক থেকে নয়, চিকিৎসা-শাস্ত্রের দিক থেকেও এর আলোচনা প্রয়োজন, কারণ সমাজ-দেহের পরিবর্ত্তনের মূল কারণ মানুষের দেহ ও মন।

দেশ-বিদেশের নানা সমাজে গর্ভ-নিবারণ—কেবলমাত্র অবৈধ মিলনে নয়,—বিবাহিত জীবনেও এমন একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বর্ত্তমানে সমাজ-দেহে তার ফলাফল স্পষ্টই লক্ষিত হচ্ছে; য়ুরোপের বড় বড় শহরে সমাজের উচ্চশ্রেণীর সবায়ের কাছে এ প্রথার যথেষ্ট আদর হওয়ায় পরিবার-পিছু সন্তান-সংখ্যা গড়-পড়তায় প্রায় দুটির বেশী নয়—দরিদ্র নাগরিক যে আজও এ প্রথা গ্রহণ করেনি তার মূলে তার অজ্ঞতা ও দৈহিক ও মানসিক আলস্য। মা-ষষ্ঠীর কৃপালাভের যে মন্ত্র তারা বাইবেলে পেয়েছে (increase and multiply) আজও এক-মনে তাই জপ করে চলেছে, তবে সে কৃপা যে ছদ্মবেশী অভিশাপ, এ কথা তারা এবার বুঝবে আশা করা যায়।

পুরাকালে শাস্ত্রকারেরা অত্যধিক জন্মবিধানের ন্যূনতা-কল্পে নানাবিধ নিষেধ-বাণী প্রচার করেছিলেন এবং যারা মস্ত বড় পরিবার প্রতিপালনের হাত থেকে পরিত্রাণ চাইত, তারা অস্বাভাবিক উপায়ে গর্ভস্রাব নিয়মিত ঘটাত। অসভ্যজাতি-সমূহে গর্ভ-প্রতিষেধক-প্রণালীর প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়।

প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম্ম বা আইন-কার Solon শিশু-হত্যার প্রশ্রয় দিতেন —Plato তাঁর The Republic নামক গ্রন্থে নাগরিক-সংখ্যা নিয়মিতকরণ ও অসম্ভব জন বৃদ্ধি বন্ধ করা শাসন-প্রণালীর অবশ্য কর্ত্তব্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে নির্দ্দেশ করেছেন। তাঁর মতে নর-নারী দৈহিক শক্তির প্রাচুর্য্যের সময় মাত্র সন্তান-জন্মদানের অধিকারী এবং দুর্ব্বল বা দুঃস্থ শিশু-হত্যা সমাজের মঙ্গলার্থে নিতান্ত প্রয়োজন। নারীর উচিত একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সন্তানের জননী হওয়া এবং তদতিরিক্ত গর্ভপাত করাই বিধেয়, ইহাই Aristotle-এর উপদেশ। তিনি বলেন, যদি প্রত্যেকেই যত-খুসী সন্তানের জন্ম দেয় (যেমন তখন অন্য অনেক দেশে দিত), তবে পাপ ও বিদ্রোহ-বিগ্রহ-জননী দারিদ্র্য-রাক্ষসীর করাল কবলে সংসার অচিরে ধ্বংস পাবে।

রোমে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ ছিল জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির হন্তারক। সাম্রাজ্য-যুগে গর্ভ নিবারক নানা উপায় জন-সমাজে প্রচলিত ছিল যৌন মিলনের নানা বিকৃতির আকারে। কবি Juvenal এর এই সমস্ত প্রণালীর অশেষ নিন্দায় এদের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়, এবং যৌননীতির কদর্য্যতাই বোধ হয় জন-সংখ্যার অত্যধিক হ্রাস ও সাম্রাজ্যের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

পূর্ব্বে প্রচলিত গর্ভ-নিবারকগুলির অধিকাংশই বিজ্ঞান-সম্মত ছিল না এবং অনেকগুলি শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী কি না, তাও সন্দেহজনক; ধর্ম্মানুশাসনের জোরে এ সম্বন্ধে প্রকাশ্য আলোচনা নিষিদ্ধ থাকায় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে Thomas Robert Malthus on Essay on the Principle of Population প্রবন্ধে জন্মসংখ্যার হার-সম্বন্ধে নিয়ম আবিষ্কার ও জন্ম-প্রতিষেধ সমাজ-সঙ্গত এই কথা প্রচার করে খৃষ্টীয় চিন্তা-জগতে বিদ্রোহের সূচনা ও ঐ সমস্যায় সভ্যদেশ-সমূহের জাগ্রত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বর্ত্তমান সভ্যতায় পরিবার প্রতিপালন বহু ব্যয়সাধ্য ও জীবন-রক্ষোপযোগী দ্রব্যজাতের মূল্য-বৃদ্ধিই Malthus বচনে জন-সাধারণের আস্থা-বৃদ্ধির কারণ বলে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।

পুনঃ-পুনঃ গর্ভ ধারণ-জনিত স্বাস্থ্য-ভঙ্গ প্রভৃতি আয়ুর্বেদ-গ্রাহ্য কোন কারণই এ স্বেচ্ছা-গর্ভ-নিবারণের কারণ নয়। অন্ন-সমস্যা-সমাধানের প্রয়াসের মূলেই এর জন্ম।

জন-সংখ্যা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে ম্যালথাস দেখাতে চেয়েছেন যে মানুষের সুখান্বেষণে ও তৎ-প্রাপ্তিতে বাধার কারণ খাদ্য-সংস্থানের চেয়ে জন্মহার-বৃদ্ধি প্রকৃতির ধাতুগত বলে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম অতি সরল। প্রকৃতিগত অন্ধ শক্তির বশে তারা জন্ম দেয় বিস্তর, অথচ খাদ্য-সংগ্রহের প্রতুলতা ও অপ্রতুলতার কোন কথাই তারা চিন্তা করে না এবং তৎফলে খাদ্য ও শক্তি-অভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর হ্রাস ঘটে যথেষ্ট। মানুষের বুদ্ধি কিন্তু এই জন্ম-প্রদানের পথে নানা বাধা এনে দিয়েছে—প্রাণীর মত মানুষের উপর প্রকৃতিগত অন্ধ শক্তির পীড়া কিছু কম নয়, কিন্তু মানুষ ভাবে ভবিষ্য সন্তানের আহার-আবাসের ব্যবস্থার কথা এবং এই চিন্তাই একটা বিশেষ প্রতিষেধক। মানুষ যদি এতদিন আদৌ সে কথা না ভাবত, তবে তাঁর মতে পৃথিবীতে স্থানাভাব ও খাদ্যাভাব ঘটতো নিশ্চয়।

ম্যালথাস প্রচার করলেন যে বাধা না পেলে জন-সংখ্যা ২৫ বৎসরে তত গুণ (অর্থাৎ ২৫+২৫) বৃদ্ধি পায়, অথচ সে হিসাবে জীবন-রক্ষার উপযোগী খাদ্য বৃদ্ধি পায় খুব সামান্যই। অঙ্কে লিখলে জন্মের হার যদি হয় ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১২৮, ২৫৬ তবে খাদ্য-বৃদ্ধির মাত্রা হবে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯। অবশ্য জন্ম-বৃদ্ধি যে একেবারে বাধাহীন তা নয়। ম্যালথাসের মতে সে বাধা দ্বিবিধ, প্রাকৃতিক বাধা ও নিবার্য্য প্রতিষেধক। (positive and preventive checks).

জন্মসংখ্যা-বৃদ্ধির প্রাকৃতিক বা স্বভাবজ বাধা বিস্তর, কারণ যা কিছু মানুষের জীবনী-শক্তির হ্রাস করে, তা এর মধ্যে ধর্ত্তব্য ; যথা - অস্বাস্থ্যকর কাজ, গুরুতর পরিশ্রম, জল-বায়ুর প্রতিকূল অবস্থা, দারিদ্র্য-সন্তান-পালনের ভুলচুক, নাগরিক জীবন,দেহে ও মনে সর্ব্ববিধ অত্যাচার, রোগ, মহামারী, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ।

স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নিবার্য্য বাধা বা প্রতিষেধক উপায় কেবলমাত্র মানুষেরই বিশেষত্ব এবং তার উদ্ভব ভবিষ্যতে নিজ কর্ম্মের ফলাফল দর্শনের দূরদৃষ্টি-জাত বুদ্ধিবৃত্তিতে। প্রাত্যাহিক জীবনে বৃহৎ পরিবারের সাধারণ দারিদ্র্য-কষ্ট যে দেখে তার নিজের বর্ত্তমান সম্পত্তি বা আয় যদি কেবল তার পক্ষেই যথেষ্ট মাত্র হয়, তবে সে নিশ্চয়ই ভাবে যে পরিবার-বৃদ্ধির মানে ভূ-ভার সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সব চিন্তাই সভ্য মানুষকে সংস্কারের হাত থেকে পরিত্রাণের মন্ত্র শেখায় এবং বাল্য-বিবাহ ও তজ্জনিত বহুতর সন্তান-সম্ভাবনার হাত থেকে তাকে রক্ষা করে।

সর্ব্বদেশেই নিবার্য্য উপায় ও স্বভাবজ বাধা কম-বেশী বিশেষভাবে কার্য্য-করী, অথচ খাদ্য সংস্থানের মাত্রা ছাপিয়ে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না, এ-হেন দেশ নেই বল্লে অত্যুক্তি হবে না।

এভাবে জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির শোচনীয় ফল হয় যে অজ্ঞ কল্পিকজনের মধ্যে দারিদ্র্য চিরকালের মত বাসা বাঁধে এবং কোনরকম চিরস্থায়ী উন্নতির ব্যবস্থা অসম্ভব হয়ে যায়।

স্বেচ্ছা-প্রণোদিত রতি-বিরতি, রোগ ও দারিদ্র্য এই ত্রিবিধ শক্তির ক্রিয়ায় কেমন করে প্রাচীন কালে ও বর্ত্তমানে নানা দেশে জন্ম-সংখ্যা হ্রাসের সাহায্য করেছে ও করছে, ম্যালথসের মতে, অনুকূলে এর প্রমাণ তাঁর গ্রন্থেই মেলে। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন যে অসভ্য সমাজে, নরভোজন, স্ত্রী ও পুরুষের স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গহানি, বেশী বয়সে বিবাহ, ধর্ম্মানুমোদিত কৌমার্য্য, বিবাহ পরাঙ্মুখতা প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিষেধক উপায়ে জনসংখ্যার অনাবশ্যক বৃদ্ধি দমন করা হত।

তৎকালীন য়ুরোপের জন-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির আলোচনায় ম্যালথস বিবাহ ও জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্টার-পরীক্ষান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে খুব কম দেশেই লোকেরা যতগুলি সন্তানের জন্ম দেয়, ততগুলির উপযুক্ত অশন-বসন প্রভৃতি সংস্থানের ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করে, বিবাহ করবার মত তাদের আত্মসংযম আছে। সুতরাং প্রাচীন সভ্য ও অসভ্য সমাজের তুলনায় স্বভাবজ বাধার প্রভাব কম হলেও নিবার্য্য উপায়ের আশ্রয় বহুলোকেই গ্রহণ করে থাকে।

গর্ভ-নিবারক নানাবিধ প্রকরণের উপর আস্থা রেখে ম্যালথাস তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল নৈতিক সংযম অর্থাৎ রতি-বিরতিই, দারিদ্র্য ও জন-বৃদ্ধিজাত অন্যবিধ কুফল থেকে দেশের জনসাধারণকে মুক্তি দেবে। সুচির সংযমই তাঁর মতে আবশ্যক ও অত্যধিক জন-বৃদ্ধিজনিত দোষ-দমনের একমাত্র নৈতিক উপায়। সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে কিছুতেই মানুষের বিবাহ করা উচিত নয়। অপিচ যৌবনোদ্ভেদ ও বিবাহের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কোনরূপ দৈহিক বা মানসিক অসংযমের প্রশ্রয় দেওয়া স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই যথেষ্ট নিন্দনীয়। আত্মজের জন্মদানই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য নয়, ধর্ম্ম ও সুখ উৎপাদনও তার কর্ত্তব্য এবং শেষোক্ত সম্বন্ধে যার অক্ষমতা আছে, ধর্ম্মে তার অধিকার কোথায়।

জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে শিক্ষা-প্রচারে ম্যালথাস যথেষ্ট পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে সাধারণ শিক্ষনীয় বিষয় ব্যতীত জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কার্য্যকারণ-তত্ত্ব ও তজ্জনিত দারিদ্র্য-উৎপত্তির প্রকরণ প্রতি বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। জন-সংখ্যা-হ্রাসের সম্যক ব্যবস্থা না করলে সাধারণের দারিদ্র্য দুঃখ অনিবার্য্য, এবং তার ফলে স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব। কারণ সংস্কার যত সুন্দর ও সার্থক হোক, কিছুদিনের মধ্যে আবার পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরে আসা কিছু বিচিত্র নয়।

জন-বৃদ্ধির অনুপাত প্রভৃতি তথ্য ও নিবারক প্রকরণ-আবিষ্কারে ম্যালথস দেশে-বিদেশে এক বিরাট আন্দোলনের সূচনা করেন এবং তাঁর কয়েকজন শিষ্য অচিরেই তাঁর সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করবার ও জনসমাজের গ্রহণ-যোগ্য নানা উপায়-উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হন। সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য কিন্তু নিঃসন্দেহ সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী ম্যালথস প্রশংসিত গর্ভনিবারক প্রণালী হচ্ছে সুচির রতি-বিরতি। ম্যালথাসের গ্রন্থে কার্য্যকরী কোন প্রণালীর উল্লেখ না থাকায় তদীয় শিষ্য James Mill ও Francis Place প্রায় বিশবৎসর পরে "স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে, নারীসুলভ লজ্জার ব্যত্যয় না ঘটিয়ে গর্ভ নিবারণ করতে পারে" এমন প্রণালী নির্ব্বাচন ও গ্রহণ-যোগ্য বলে প্রচার করেন। খাদ্য সংস্থানের এবং অতিরিক্ত জন-সংখ্যা দমনের উদ্দেশ্য মাত্র লক্ষ্য করে এই সব প্রণালীর প্রচলন হলেও শরীর তত্ত্ববিদ ও চিকিৎসকেরাও এ দলে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর Book of Woman গ্রন্থে Richard Carlile গর্ভনিবারণের সর্ব্বপ্রথম ও উপযুক্ত আলোচনা করেছেন। Robert Dale Owen এর Moral Physiologyতেও এ বিষয়ের সম্যক বিবরণ আছে।

Knowlton এর The Fruits of Philosophyর মত গর্ভ নিবারক ও নিয়ামক উপদেশ সম্বলিত নানা পুস্তিকা সুলভে ও সময় বিশেষে বিনামুল্যে কর্ম্মিক শ্রেণীর মধ্যে বিতরিত হয়েছিল এবং এমম্বিধ প্রচারের ফলে Drysdale ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতিকে বিশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করতে হয়েছে। গর্ভ নিয়ামক উপায় ও উপদেশ প্রচার উদ্দেশ্যে Bradlaugh ও Mrs Besant, Malthusina Sociely প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ও জারমানীতে Malthusian League ও Union of Social Harmony নামে সমিতি আছে, দেশের বহু বিজ্ঞজন ও বিখ্যাত চিকিৎসক তাদের সভ্যশ্রেণী অলঙ্কৃত করেছেন। সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে পুস্তিকা বিতরণ ও নব্য ম্যালথাস তত্ত্বসম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রভৃতি সভার মুখ্য কর্ত্তব্য।

আনন্দসুন্দর ঠাকুর।

ইচ্ছার কর্ত্তৃত্ব

অনেক অবস্থার সমাবেশে ও আরও অনেক অবস্থার অভাবহেতু (positive, and negative conditions) একটি কার্য্যফল (effect) উৎপন্ন হয়। কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হইতে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি প্রয়োজনীয়।

১। সর্ব্বপ্রথমে বস্তুটি দর্শনীয় হইবে।

২। বস্তুটি অতি দূরে বা অতি নিকটে থাকা।

৩। আলোর অভাব না থাকা।

৪। অতিরিক্ত আলো না থাকা।

৫। অন্য বস্তু দ্বারা দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত না হওয়া।

৬। চক্ষুর দোষ না থাকা।

৭। একই জাতীয় দুইটি বস্তু পরস্পর সংমিশ্রিত না হওয়া।

৮। অন্যমনস্ক না হওয়া।

আমরা প্রতিদিনের এত আপদ-বিপদের মধ্যে যে কি প্রকারে বাঁচিয়া আছি, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমার কার্য্যের জন্য আমার ইচ্ছার দায়িত্ব কতটুকু! আমার ইচ্ছা (will) আমার মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া। আমার ইচ্ছাই কি আমার ইচ্ছার কারণ?

আমার হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের কার্য্য কি আমার ইচ্ছায় চলিতেছে? কত অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা (forces and counter-forces) যে আমাদের জীবনের গতি নিয়মিত হইতেছে, ইহার মূল কোথায়? ইহা আমাদের কল্পনাতীত। সমুদায় জাগতিক ক্রিয়াই নিয়তির (Causality) অধীন। "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?"

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বরপণ

বরপণ আমাদের দেশে চিরকালই ছিল। সেকালে বরকে বরণ করে কন্যাদানের সঙ্গে দক্ষিণা-স্বরূপ নানা সামগ্রী দেওয়া হত। এখনো সে সব দেওয়া হয়, তবে সেগুলি ওজনে কিছু ভারী এই যা তফাৎ। আর নূতনের মধ্যে টাকার তোড়া অনাবশ্যক স্ফীত হয়ে উঠেছে। সেকালে বরকর্ত্তা নাছোড়বান্দা বামুনের মতো দানের সঙ্গে দক্ষিণাটা জোর করে আদায় করতেন না, তাই দক্ষিণা দিয়ে পুণ্য-লাভ বেশ সুলভ ছিল। আজ কিন্তু দক্ষিণা-দানে পুণ্য-লাভের অর্থ শূন্য লাভ—যে-কোনো মেয়ের-বিয়েতে-ফতুর পিতা এর সাক্ষ্য দেবেন।

এককালে এদেশে কৌলীন্য-প্রথা প্রচলিত ছিল। তারও ভিত্তি ছিল কন্যাদাতার গরজের ওপরে। সে প্রথার মৃত্যুর পরে তার দেহটার সৎকার হল বটে, আত্মা অন্য দেহ আশ্রয় করে অমর হয়ে রইল। জাতি-কৌলীন্য গেল, কিন্তু জাত হল শিক্ষা-কৌলীন্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচুর অর্থ ও প্রভূত সম্মান দিত, এটা কন্যাদাতাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তাঁরা আর জাতি-কুলীনের দ্বারে ধর্ণা দিলেন না, ধর্‌লেন ঐ ইংরেজী-শিক্ষিত বরের পিতার পায়ে।

বরপণ প্রথার আধুনিক রূপ ইংরেজী শিক্ষার প্রসাদে। প্রথমতঃ কন্যাকর্ত্তারাই শিক্ষিত বরের যোগ্যতা বেশী এই ভেবে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে পণ দিতে চাইলেন। অশিক্ষিত পাত্র বেচারাদের কেউ চেয়েও দেখলেন না। আর তারাও সেই দুঃখে আদা-নুন খেয়ে লেখাপড়ায় লেগে পড়্‌ল, যদি ডিগ্রী পেলে বিয়ের বাজারে একটা দাঁও বাগাতে

পারে। দ্বিতীয়তঃ বরকর্তা দেখলেন, পুত্রের বিবাহেই তার শিক্ষার ব্যয়টাও আদায় করে নিলে চলে। তাছাড়া, তাঁর ছেলেরও তো একটা দাম আছে। সে যে যোদো-মোধোর মতো অশিক্ষিত নয়, সুতরাং সস্তাও নয়, এটা প্রমাণ করা চাই। তৃতীয়তঃ বরের এতে আপত্তি ছিল না। একে তো তিনি যোদো-মোধোর চেয়ে অনেক-বেশী শিক্ষিত ও সেই কারণে মূল্যবান—কন্যাকর্তা তাঁকে অল্প মূল্যে হস্তগত করলে লোকে ভাববে তাঁর বিদ্যে বেশী নয় কিংবা হয়তো কোন রোগ আছে—তারপর যাকে তিনি জীবনের সঙ্গিনী করবেন, তার সঙ্গে ভালবাসা দূরে থাক, পরিচয়ই নেই; তার কেমন রূপ, কতখানি গুণ কিছুই জানেন না,—বিনা-স্বার্থে এ বোঝা তাঁকে বইতে হবে, তাঁর গরজ এমন কি বেশী? এ ভার লাঘব করতে পারত ভালবাসা, কিন্তু সে বস্তু এদেশে বিবাহের পূর্ব্বে আশা করা যায় না, বিবাহের পরেও পাবার ভরসা কম। দশ-বারো বৎসরের একটি বালিকার সঙ্গে এমন কোন বন্ধন নেই যাতে মজুরিহীন বেগার খাটা সুখ বা সান্ত্বনা দিতে পারে। বরং পণ নিলেই অনেকখানি সান্ত্বনা পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ ইংরেজী-শিক্ষাহীন বরের বিবাহ-বয়স গড়ে যত বেড়েছে কন্যার বিবাহ-বয়স তেমন বাড়েনি। আগে কন্যার বিবাহ হতো দশ-এগারো বৎসর বয়সে বা তারও আগে, বরের সাধারণতঃ পনেরো-ষোল বৎসরে। এখন শিক্ষাধীন থাকায় ছেলের বিয়ে একুশ-বাইশের নীচে হয় না, অথচ মেয়ের বিবাহ-বয়স সে অনুপাতে বাড়েনি। অনূঢ়া মেয়ে ক্বচিৎ চোদ্দ পেরোয়। বর কন্যার বিবাহ-বয়স-বৃদ্ধির অসঙ্গতির দরুণ বরের দাম বেড়ে গেল। এই তথ্যটি যাঁদের চোখে পড়ে না, তাঁরাই বলে বসেন, দেশে ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশী। অথচ সেন্সাস্ যে এর উল্টো কথা বলছে সেদিকে দৃষ্টি নেই। আসল কথা, ছেলেদের বিবাহে age-limit (একটা বিশেষ বয়সের মধ্যেই বিয়ে করতে হবে এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা) নেই; তারা বিবাহ নাও করতে পারে, করেও না অনেক স্থলে। কিন্তু মেয়েদের একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতেই হবে, বিবাহ না করেও তারা পারে না। এতে বরের supply (যোগান) কম আর demand (চাহিদা) যে বেশী হবে, সেটা ভুলে গেলে চলবে কেন?

তবু আধুনিক শিক্ষার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাতে গেলে সুবিচার করা হয় না। বরপণে আরো বড় শক্তি কাজ করছে—সে আমাদের বিবাহের আদর্শ পরিবর্ত্তন। বহু-বিবাহের দেশে এক-বিবাহ প্রবর্ত্তিত হচ্ছে; সুদীর্ঘকাল বহু বিবাহের প্রচলনে স্ত্রীজাতির credit যে পরিমাণে কমে গিয়েছিল তা কি এত শীঘ্র rise করতে পারে? এখন কোনো বাপ-মা পারত-পক্ষে মেয়েকে সতীনের ঘরে দেয় না; কিন্তু ছেলের বাপ-মা ছেলের স্বচ্ছন্দে একাধিক বিয়ে দিতে পারেন। এ অবস্থায় ছেলের বাপ যদি মেয়ের বাপের ওপরে পণের বোঝা চাপান, বিবেক ছাড়া তাতে বাধা দেবার আর কেউ নেই। মনে করুন, যদি মেয়ের বিয়ের পরে শ্বশুর-শাশুড়ী বেহাই-বেহানকে এই বলে ধমক দেন যে তোমরা আরো কিছু না দিলে ছেলের অন্যত্র বিয়ে দেব, তবে সে বেচারিদের বাধ্য হয়েই তাঁদের দাবী মেটাতে হবে।—বিয়ের সময় ও পরে ভেবে কিছু বেশী দিতে হয় যে মেয়ে শ্বশুর-শাশুড়ী টাকার খাতিরে চক্ষু-লজ্জা-বশতঃ ছেলের অন্য বিয়ে দেবেন না।

কিন্তু বরপণের কারণ জানতে হলে আরো ভিতরে যেতে হবে। দেখতে হবে এর প্রতিষ্ঠা কার ওপরে।

এর প্রতিষ্ঠা নারীর পর-নির্ভরতার ওপরে।

আমাদের দেশে নারী পুরুষের পোষ্য। বাল্যে পিতার ও পরজীবনে পতি-পুত্রের গলগ্রহ না হলে তাঁর চলে না। তিনি স্বয়ং অক্ষম। এ দেশে নারীকে বিশ্বাস করে না কেউ; তিনি যে কুমারী হয়ে সারা জীবন নিষ্কলঙ্ক থাকতে পারেন, এ বিশ্বাস কারও নেই। তাই তাঁকে সারা জীবন অন্যের বোঝা হয়ে থাকতে হয়। এ বোঝাটি সারা জীবন বইতে হলে যেটুকু আর্থিক ক্ষতি ও সামাজিক অত্যাচার সইতে হবে এবং কন্যার সুচরিত্রের ওপর বিশ্বাস রেখে যে-পরিমাণ risk নিতে হবে, কন্যার পিতার কাছে তা আশা করা যায় না। তাই তিনি অপরের ঘাড়ে এ বোঝা নিক্ষেপ করে নিষ্কৃতি পেতে চান। কিন্তু ঘরের খেয়ে পরের বেগার খাটতে কেই বা চায়? মজুরি না পেলে এ বোঝা বওয়া [যার সংস্কৃত নাম "বিবাহ"] পোষায় না। ভালবাসার মজুরি এদেশে অগ্রিম পাবার জো নেই, পরেও পাবার ভরসা নেই। রূপের মজুরিতে কিছু কিছু পোষায় বটে, কিন্তু সেটা বাহকের পিতা মাতা গণনার মধ্যে আনেন না, আনলেও পুত্রের ওপরে আপনাদের বিগত যৌবনের রুচি চাপান। গুণের মজুরির পরিমাণ বিয়ের আগে বোঝা যায় না, হয়ত হাতের রান্না চেখে বা 'বর্ণ পরিচয়' বিদ্যার বহর দেখে চুকতে হয়। তার পর বাকী থাকে কুলের, বংশের প্রভাবের বা বিভবের মজুরি। কুল ও বংশে বিংশ শতাব্দীতে সম্মান মেলে না, শ্বশুরের প্রভাবে কতকটা সুবিধে হয় বটে—কিন্তু শ্বশুরের টাকার তোড়ায় যে চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হয় সেইটেই moder prógmatic বরের বিবেচনা-যোগ্য। তাই বরপণের অর্থ মজুরি-স্বরূপ বাহকের কিঞ্চিৎ অর্থ-প্রাপ্তি।

বরপণে কন্যাকর্ত্তার খুব কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু স্পষ্ট হচ্ছে তাঁর নিজেরই মূর্খতা। মেয়েকে অক্ষম, পঙ্গু করে পালন করবার শাস্তিটা তাঁরই প্রাপ্য। তার পর তিনিও বরপণ-প্রথার উচ্ছেদ চান কি না সন্দেহ। দেখা যাচ্ছে, মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্ব দিয়ে পিতা ছেলের বিয়েতে ক্ষতি পূরণ করে নিচ্ছেন। লাভ-ক্ষতির অনুপাত ছেলেমেয়ের জন্মের অনুপাতেই নিরূপিত হচ্ছে। কাজেই বরপণের বিরুদ্ধে একটা স্থায়ী আন্দোলন দাঁড়াতে পারছে না—যেমনটি হত যদি বরপণ শুধু

একটি বিশেষ দলেরই লাভের কারণ হয়ে থাকৃত। যাঁরা আজ মেয়ের বিয়ে দিয়ে গলা কাঁপাচ্ছেন তাঁরাই কাল ছেলের বিয়েয় বোবা হয়ে যাবেন। স্নেহলতার ভাই যে বিয়ের সময় টাকা নিয়ে ছিলেন এ সংবাদ কাগজে দেখা গিয়েছিল।

বরপণের সুফলের মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে কন্যার বিবাহ বয়সের স্বল্প বৃদ্ধি। টাকা আর সুপুত্রের অভাবে কন্যাকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কিছু দেরীতে পাত্রস্থ করতে হয়। এতে সে বেচারীর দেহটা কিছু পরিণত হয়; ফলে তার নিজের ও তার সন্তানদের ইহলোকে আরো কিছুকাল থেকে যাবার সুবিধে হয়। দ্বিতীয়তঃ পণ-প্রথার ফলে মেয়েদের একটু একটু শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যাতে তাদেরও দাম কিছু বাড়ে। একটু বেশী বয়সে বিয়ে হচ্ছে, তাই কিছু শিক্ষা দিতে পারা যাচ্ছে। এতে শুধু যে তাদের বিয়ের কিছু সুবিধে হচ্ছে, তা নয়, তাদের উন্নতির পথও মুক্ত হচ্ছে। ঘরের কোণে থেকেও তারা বাইরের বাণী শুনতে পাচ্ছে। সাড়া দিতেও যে ত্রুটী করছে না, এর প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে উত্তরোত্তর নারীর প্রভাব-বিস্তার আর অসহযোগ প্রভৃতি নানা আন্দোলনে তাঁদের আগ্রহ উৎসাহ।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, বরপণে তাঁদের দেহ-মনের উন্নতিই হচ্ছে। তবু বরপণ শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র সকলেরই নিন্দা লাভ করছে। এর উচ্ছেদ সকলেই চায়—কেউ মুখে, কেউ বা মনে। বাস্তবিক এর মধ্যে বড় একটা গলদ আছে, সেটা কন্যাকর্ত্তার কষ্ট নয়, কন্যার অপমান; বর-কর্ত্তার লোভোন্মত্ততা নয়, বরের নীচতা। একেই তো কন্যাকে "দান" করাতে তার অপমান, তার পরে তার নারীত্বকে এত মূল্যহীন মনে করা হয় যে, তাকে অমনি দিলে কেউ নেবে না। টাকা যদি তার মূল্য বৃদ্ধি না করে, রৌপ্য যদি তার রূপ বৃদ্ধি না করে, নিজে সে অতি সস্তা, অতি সুলভ! এ কি কম অপমান! বরের নীচতার তো সীমা নেই। নিলামে আত্ম-বিক্রয় করতে হয়, যাকে হৃদয় দিতে পারেনি তাকে অর্থের বিনিময়ে শয্যা-সঙ্গিনী করতে হয়, ভুলে যেতে হয় "অপবিত্র ও কর-পরশ সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে!" এ হীনতা সে স্বীকার করে কেন?

বরপণ-প্রথা উচ্ছেদ করতে হলে বরের পিতার ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত করবার চেষ্টা বৃথা। বরের সুবুদ্ধির ওপরও বিশ্বাস নেই। বরের সুবুদ্ধির ওপরও আস্থা স্থাপন করা যায় না, কারণ অনেক ছেলের বিয়ের সময় পিতৃভক্তি উথলে ওঠে। যদি কিছু জাগ্রত করতে হয়, তা হচ্ছে জন-সাধারণের নারী-চরিত্রের ওপর দৃঢ়তর বিশ্বাস। কিন্তু বরপণ-নিবারণের একমাত্র উপায় নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে তোলা,—তাঁকে এমন ভাবে পালন করতে হবে যাতে তিনি বিবাহ না করেও স্বচ্ছন্দে আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারেন; আর বিবাহ করলেও স্বামীর বোঝা না হন। কন্যাকর্ত্তার গরজ যদি বর-কর্ত্তার গরজের চেয়ে বেশী না হয়, বিবাহ-বিষয়ে নারীর ইচ্ছাধীনতা যদি পুরুষের ইচ্ছাধীনতার মতো অবাধ হয়—অর্থাৎ নারী যদি অপরের গলগ্রহ না হয়ে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হন তবেই বরপণ-প্রথা অন্তর্হিত হবে। কোন প্রকার গোঁজামিলে এর উচ্ছেদ হবে না।

যাঁরা বরপণ উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করছেন তাঁদের বলে রাখি, এ প্রথার নিবারণের একমাত্র পন্থা স্ত্রী-পুরুষের সমান স্বাধীনতা—কারণ এর জন্ম স্ত্রীপুরুষের অধিকার-বৈষম্যে। এ প্রথা দেহত্যাগ করে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করবে নব নব রূপে, যদি তাঁরা অন্য উপায়ে না সফল হন। আর এর নিবারণ হবে কেবল একটি পন্থা-অবলম্বনে—সেটি নর-নারীর সমান আত্ম-নির্ভরতায়, সমান স্বাধীনতায়, সমান অনন্য-কর্ত্তৃত্বে।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়।

কালীঘাটের ইতিবৃত্ত

অনেকের একটা ধারণা আছে যে কাশী বা বৃন্দাবন প্রভৃতির মত কালীঘাটও অতি পুরাতন ও পবিত্র তীর্থস্থান। কারণ অন্যান্য অনেক পুরাতন তীর্থস্থানের ন্যায় এখানেও মৃতা সতীর দেহের অংশ-বিশেষ পড়িয়াছিল বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। যদি ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কেহ বলে যে কালীঘাট ইংরেজের আগমনের সময় হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; এইস্থান এমন কি "কলকাত্তা" অপেক্ষা আধুনিক তাহা হইলেও হয়ত অনেকে আজন্ম সংস্কার বশতঃ তাহা মিথ্যা বলিয়া মনে করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যদি ইতিহাস সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তবে মানিয়া লইতেই হইবে যে কালীঘাট কলিকাতা অপেক্ষাও আধুনিক। সর্ব্বাপেক্ষা প্রমাণ-সাপেক্ষ ও বিশ্বাস-যোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য যাহা আমরা পাই—সেটা "আইন-আকবরী" —আবুল ফজল্ দ্বারা রচিত। এই গ্রন্থে সম্রাটের রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল কর্ত্তৃক বাংলা দেশে যে কটা বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল তাহাদের নামের মধ্যে আমরা "কলকাত্তা" নামের উল্লেখ দেখিতে পাই কিন্তু কালীঘাটের নাম পাই না। এই "কলকাত্তা" তখন মহল "সাতগাঁর" অধীন ছিল। ইহার দ্বারা এইটুকু প্রমাণিত হয় যে তখন কালীঘাট বলিয়া কোন প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান ছিল না, তবে কালী বিগ্রহ গুপ্ত অবস্থায় থাকিলেও থাকিতে পারে। কালীঘাট বলিয়া যে কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল না তার আর এক কারণ মানসিংহ যখন বাংলা দেশে ১৫১১ শকে সুবাদার হইয়া আসেন তখন কালীঘাট বলিয়া যদি কোন প্রসিদ্ধ স্থান থাকিত বা "কালী" বিগ্রহ থাকিত বা আছে বলিয়া তিনি জানিতে পারিতেন

তবে "যশোরেশ্বরী" লইয়া যেমন তিনি অম্বরে স্থাপন করিয়াছিলেন, এই কালী-বিগ্রহকেও অন্ততঃ তেমন কিছু না করিলেও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন বা করিতে পারিতেন। কালীঘাট যে তীর্থস্থান তখন বা তার পরেও হইতে পারে নাই তার আর এক কারণ যে মানসিংহের পর অনেক কালাপাহাড় সম্রাট ও নবাব দিল্লী ও বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ; যদি কালীঘাট সে সময়ে প্রসিদ্ধ হইত তবে কাশী বা মথুরার মত এই বিগ্রহের ভাগ্যেও কিছু একটা হওয়া অসম্ভব হইত না। তবে কালী-বিগ্রহ যে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ তৎকালীন কবিদের গ্রন্থে আমরা বিগ্রহের অস্তিত্ব বিষয়ে সুস্পষ্ট আভাস পাই। কবিরাম তাঁহার দিগ্বিজয় নামক সংস্কৃত ভূগোলে "কালী" দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও বিখ্যাত খাঁটী বাঙ্গালী কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কালীঘাটের উল্লেখ করিয়াছেন। কবিরাম প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর ভূগোল কাব্যে লিখিতেছেন,

প্রতাপাদিত্য ভূপস্য যশোরভূমিপস্ত চ
গঙ্গাবাসস্থলো রাজন্ ইদানীং বর্ত্ততে নৃপ ॥ ৬৮৩

* * * *

গঙ্গাযমুনয়োর্ম ধ্যে পাটলগ্রামবাসিনম্।
কায়স্থানাং শাসনঞ্চ বর্ত্ততে অধুনা নৃপ ॥ ৬৯২
গোবিন্দাদিপুরং তথাহি ভট্টপল্লিকম্।
কালীদেব্যাঃ সমীপেচ শৃগালদাহাদিকং নৃপ ॥ ৬৯৩

কবিকঙ্কণ তাঁর চণ্ডী কাব্যে শ্লোকে তাঁর গ্রন্থ রচনার সময় লিখিতেছেন।

৬ ৬ ৪ ১

শব্দ রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা।

কেহ কেহ পরবর্ত্তী পদটী লিখেন "অভয়া-মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।" ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ১৪৬৬ শকে সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণ করিবার ১১ বৎসর পূর্ব্বে কবি রচনা শেষ করিয়াছেন। কিন্তু শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার কারণ আছে। প্রধান কারণ কাব্য রচনা হয় যখন "ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্ভোজভৃঙ্গ গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধীপ।" মানসিংহ সুবাদার হইয়াছিলেন ১৫১১ শকে ; অতএব ঐ শ্লোকটি যদি প্রক্ষিপ্ত না হয় তবে রাম জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে রামায়ণ লেখার মত উহা লেখা হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। দীনেশ বাবু পদটী প্রক্ষিপ্ত মনে করেন না। কারণ ঐ মুখবন্ধটী কাব্য রচনা শেষ করিবার পর লেখা হইয়াছে। তিনি উপরে লিখিত পদটীর পরেকার পদটী লিখিয়াছেন "অধর্ম্মী রাজার কালে * *" কিন্তু আর কেহ কেহ লিখিয়াছেন, "সেই মানসিংহের কালে।"

যাই হোক, যদি এই পদটী প্রক্ষিপ্ত নাও হয় তবে আমরা বুঝিলাম ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে (১৪৬৬ শকে) কবিকে হরের বনিতা গীত দিলেন। কবিকঙ্কণ কালীঘাট বিষয়ে লিখিতেছেন,

বেতোড়েতে উত্তরিল বেনিয়ার বালা
কলিকাতা এড়াইল অবসান-বেলা।
বেতাই চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে
কান্ত গ্রামখানা সাধু এড়াইল বামে ॥
ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজলীর পথ
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত।
বালিঘাটা এড়াইল বাণিয়ার বালা
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান-বেলা ॥

এই সমস্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে "কালী" বিগ্রহ এবং আদিগঙ্গার উপর প্রতিষ্ঠিত একটী ঘাট ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্রমশ ফুটিয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু তাহা তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই।

কালীঘাটের উৎপত্তি বিষয়ে লোক-পরম্পরায় কথিত হয় যে "দশনামী" সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক সেবাইৎ সন্ন্যাসী যোগী চৌরঙ্গীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তৎকালীন গোবিন্দপুরের নিকটস্থ নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কালী পূজা করিতেন। তখন গোবিন্দপুরের হুগলী-নদীর দিকে মানুষের আলয় আর সমস্ত ভীষণ অরণ্য ও বিশেষভাবে শ্বাপদসঙ্কুল ছিল ; মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই ভীষণ অরণ্যে বন্য হস্তী ও রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখাইয়া নবাব আলীবর্দ্দীর নিকট হইতে ২২' লক্ষ টাকা রাজকর দেওয়ার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই নিবিড় জঙ্গলের প্রান্তে সন্ন্যাসী কালী উপাসনা করিতেন। ঠিক কোথায় যে উপাসনা করিতেন, তাহা অনিশ্চিত ; তবে চৌরঙ্গীর নিকটে বলিয়াই বোধ হয়। সন্ন্যাসীকে কালী উপাসনা করিতে দেখিয়া সকলে মনে করিত, সতীর পদাঙ্গুলি যেস্থানে পড়িয়াছে সন্ন্যাসী সেই স্থানেই উপাসনা করিতেন। উপাসনান্তর সন্ন্যাসী একদিন দেখিতে পাইলেন যে অনেকগুলি গাভী সমবেত হইয়া একটী স্থান দুগ্ধে সিক্ত করিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে ; সন্ন্যাসীও ইহার পূর্ব্বে স্বপ্নে এই বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন, তিনি উপস্থিত রাখালগণকে ডাকিয়া আনিয়া সেই স্নিগ্ধ স্থান খনন করিয়া বিগ্রহটী আবিষ্কার করেন। যদিও এই প্রকার কিম্বদন্তী অনেক বিগ্রহ ও তীর্থস্থান সম্বন্ধে আছে তবুও আমরা ইহার মধ্যে যোগী চৌরঙ্গী ও তাঁহার শিষ্য যুগল গিরি চৌরঙ্গী এই দুইটী ঐতিহাসিক নাম পাই। চৌরঙ্গীর নাম যেমন আজকাল শুনিতে ও দেখিতে পাই তেমি অনেক দিন পূর্ব্বে এই চৌরঙ্গীর নামোল্লেখ আমরা সরকারী কাগজ-পত্রে

দেখিতে পাই। মীর জাফর যখন ইংরেজকে কলিকাতা প্রভৃতি স্থান লাখরাজ ভাবে ছাড়িয়া দিলেন, তখন সেই সমস্ত স্থানের মধ্যে মৌজা চৌরঙ্গীও ছিল ; এই মৌজা হইতে ৪৪৮-২-২ আদায় হইত।

হঠপ্রদীপ গ্রন্থে এই যোগী চৌরঙ্গী আদিনাথ এবং গোরক্ষের ষড় পর্য্যায় ভুক্ত ছিলেন এবং কবীরের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কবীর সুলতান লোদীর রাজত্ব সময়ে জীবিত ছিলেন (১৪৮৮-১৫১৮) ; তাহা ভক্তমালগ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় ; যোগী চৌরঙ্গীরও সেই সময় জীবিত থাকিবার কথা এবং যুগল গিরি বা জঙ্গল গিরি তাঁহার প্রথম দলভুক্ত শিষ্য হইবার কথা। এই চৌরঙ্গীর কাহিনীর মধ্যকার ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতেছি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে কালী বিগ্রহ আবিষ্কৃত ও লোক চক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন কালী-বিগ্রহ বর্ত্তমানে যে স্থানে আছে পূর্ব্বে সে স্থানে ছিল না ; তবে তাহার যে ঐতিহাসিক যুক্তি ও কারণ প্রদর্শিত হয় তাহা নিতান্তই যৎসামান্ত ও আদৌ প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে। যোগী চৌরঙ্গীই যদি কালী বিগ্রহের প্রথম আবিষ্কারক হন তবে প্রথমে এই বিগ্রহ বর্ত্তমান চৌরঙ্গীতে বা উহার অতি নিকটস্থ কোন স্থানে ছিল ; এইরূপ ধারণা করা অসমীচীন হইবে না। তবে কি প্রকারে এবং কি জন্য ইহা বর্ত্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয় তার যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন করা কঠিন ব্যাপার। বোধ হয় পুরাতন দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কলিকাতা সহর যখন গড়িয়া উঠিল তখনই এই বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইংরেজ যখন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলায় আসেন, তখন যে চৌরঙ্গী জঙ্গল-পরিপূর্ণ স্থান তাহা ইংরেজী কেতাব হইতে আমরা জানিতে পারি ; তখন চৌরঙ্গীতে বেহারারা পাল্কী বহন করিতে ডবল ভাড়া আদায় করিত ; ইংরেজের ভৃত্যেরা চৌরঙ্গীর ওদিকে যাইতে হইলে সমস্ত দামী জিনিষ পরিত্যাগ করিয়া দলবদ্ধ হইয়া যাইত, পাছে দস্যুদোরা আক্রান্ত হয় এই ভয়ে। তারপর যখন আস্তে আস্তে কলিকাতা সহর গড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং পরে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মৌলবী-নবাব ইব্রাহিম রাজনীতি ভুলিয়া ধর্ম্মনীতি-অনুসারে ইংরেজকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার হুকুম দিলেন, তখন হয়ত কালী বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করিবার আরও প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং এই কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত পাত্রও তখন উপস্থিত হইয়াছিল ; আমরা তাহা পরে বলিতেছি। কালী বিগ্রহ প্রথম অবস্থায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল, এই বিগ্রহের সেবা বা যত্ন করিতে কোন ধনী ভক্ত জুটে নাই। তখনকার গোবিন্দপুরের নূতন উপনিবেশিক শেঠেরা ও বসাকেরা বৈষ্ণব ছিলেন। এই শাক্ত দেবীর জন্য তাঁহারা কিছুই করিতেন না ; তাঁহারা তৎকালে বিশেষ ধনী ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যবসায়ী। ইংরেজ তাঁহাদেরই প্রভাবে প্রথম এদেশে ব্যবসা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই শেঠেরা নিজেদের বংশ দেবতা গোবিন্দজী ও অন্যান্য দেবতার জন্য মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কিন্তু কালী বিগ্রহের জন্য কিছুই করেন নাই, কালী বিগ্রহ সেই আদিম কালে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল কিন্তু ক্রমে ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে থাকে।

এই বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করিবার কারণও দেখাইয়াছি। কে করিল, তাহার বিষয় বলিব ; এই প্রসঙ্গে আজকাল একটা কথা প্রচারিত হইতেছে, সে সম্বন্ধে দুই-একটা লিখিতেছি। মুসলমান আমলে কেবল কায়স্থই চাকুরীজীবী ছিল, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতিসমূহ কদাচিৎ চাকুরী করিত এই প্রকার একটা কথা প্রচারিত হইতেছে। এটা সত্য কথা, কায়স্থ রাজা তখন অনেক ছিল বলিয়া, কায়স্থ লেখাপড়া শিখিত বলিয়া ও রাজকার্য্যে জন্মগত যোগ্যতা ছিল বলিয়া অধিক সংখ্যক নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ অন্ততঃ যে চাকুরীতে কায়স্থ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিলেন না, তাহা মুসলমান-দত্ত উপাধিগুলির সংখ্যা গণনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। মুসলমান-দত্ত উপাধি বিশিষ্ট বাংলার চারি ঘর মজুমদারদের মধ্যে তিন ঘরই ব্রাহ্মণ। এই চারি ঘরের মধ্যে একঘর হইতেছেন বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী বংশ। ইঁহাদের আদিপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার নবাবের খাজনা-বিভাগে বিশেষ প্রশংসার সহিতকার্য্য করিলে সম্রাট আরঙজেব তাঁহাকে মজুমদার উপাধি ও বেহালার জমীদারী দান করেন। সম্রাট ১৬৫৮-১৭০৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। লক্ষ্মীকান্তের জমীদারী প্রাপ্তিও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ঠিক এই সময়ই পুরাতন দুর্গ ইংরেজ নির্ম্মাণ করিতে চাহিলে ও কালী বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইলে এই লক্ষ্মীকান্তই সে ভার গ্রহণ করেন ও এই বিগ্রহ বর্ত্তমান স্থানে আনয়ন করেন। বিগ্রহের সঙ্গে নামও স্থানান্তরিত হয়। কালীঘাটে বিগ্রহ আসিবার পরও বর্ত্তমান মন্দির স্থাপিত হয় নাই। বর্ত্তমান মন্দির উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই সাবর্ণ চৌধুরী * দ্বারা নির্ম্মিত হয়। কি উপলক্ষে ইহা সম্পাদিত হয় তার একটা কৌতুকাবহ কাহিনী আছে। তার নাম "কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা"। শ্রদ্ধেয় ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার সেকাল ও একাল নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। হাটখোলার দত্ত-বংশীয় কালীপ্রসাদ দত্ত "বিবী আনর" নাম্নী একজন পরমাসুন্দরী মুসলমানীকে উপপত্নী রাখিয়া তাহার ঘরে কিছুদিন বাস করেন। এই কার্য্যে বাংলার হিন্দু সমাজ বিক্ষুব্ধ ও তরঙ্গায়িত হয়। এই দত্তবাড়ীতে এক প্রান্তে আত্মজের বিরুদ্ধে বাংলার সমস্ত ব্রাহ্মণ ও শোভাবাজারের রাজারা দলবদ্ধ হন।

* কেহ কেহ বলেন বঁড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী দ্বারা

কালীপ্রসাদ মহা ফাঁপরে পড়িলেন। প্রাতঃস্মরণীয় রামদুলাল সরকার মহাশয় বাল্য জীবনে নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, তাঁহার মাতা এই দত্ত-বাড়ীতে রন্ধন করিয়া তাঁহার পুত্ররত্নকে প্রতিপালন করিতেন ; রামদুলাল অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। তিনি কালীপ্রসাদকে অভয় দিলেন ও বলিলেন, "জাতি আমার বাক্সের ভিতর"। তিনি দর চড়াইতে লাগিলেন, টাকার লোভে সকলই পাত পাড়িতে আসিল ; বেহালার সাবর্ণ চৌধুরীরা গোষ্ঠীপতি ; তাঁহারা এই যজ্ঞে কিছুতেই আসিতে চাহিলেন না ; রামদুলালও ছাড়িবার পাত্র নহেন, দর চড়াইতে লাগিলেন। দশ হাজারে গোষ্ঠীপতির আসন টলিল। এই সময় একটা গান রচিত হইয়াছিল,—

গেল গেল গেল হিন্দুয়ানী, যার সাতপুরুষে মেট-গিরি
সেও করে দেওয়ানী।
ভাল মানষের ছেলে যারা ধুতি একলাই ছাড়ে তারা
ইজের চাপকান আর মুসলমান চেমনী॥ —

নিমন্ত্রণ খাইবার পর টাকাতে পাপ জড়াইয়াছে বিবেচনা করাতে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বাঙ্গালীর নির্ম্মিত মন্দির আমাদের স্মৃতিতে প্রথম "জাতীয় বন্ধন শিথিল-"কারী ঘটনা স্মরণ করাইয়া দেয়, ও ইঙ্গিত করে, এ পৃথিবী টাকার বশ। *

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস।

---

* প্রবন্ধটী লিখিতে প্রধানতঃ ও বিশেষভাবে কলিকাতা রিভিউ নামক পুরাতন মাসিক পত্রে ৺ গৌরদাস বসাক মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে সাহায্য লইয়াছি। "গেল গেল গেল হিন্দুয়ানী" গান ৺ রাজনারায়ণ বসুর প্রবন্ধে হস্তাক্ষরে লিখিত দেখিয়াছি। সে লেখা বোধ হয় তৎকালীন কোন পাঠকের হইবে।

লেখক।

মনের গতি

বন্ধুরা অবাক্ হয়ে গেছে, সমীরের পছন্দ দেখে—অথচ "রূপের জহুরী" বলে বন্ধু-মহলে তার ভারী নাম-ডাক...

সেও সমস্ত ব্যাপারটাকে ভাল করে তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিল। কেমন করে, কোন্ অজ্ঞাত শক্তির সবল আকর্ষণে অনবদ্য সুন্দর মানসীমূর্ত্তি তার কল্প-লোকের কুসুম-আসন হতে পড়ে চুরমার হয়ে ভেঙে গেল, আর তার জায়গায় স্থাপিত হল এই বাস্তব জগতের সাধারণ মূর্ত্তি...

সেদিন সন্ধ্যায় ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরে আসতেই তার মা বল্লেন,—সমীর, কাল সকালে তোর কনে দেখে আসিস্। আটটার সময় ঘটকী আসবে, বলে গেছে। বুঝলি?

—কালই? বলে একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে চেয়ে দেখে, তার মা চলে গেছেন।

সমীরের মা ভয়ানক রাশভারি লোক, বেশী কথা বলেন না ; কাজেই যা বলেন, তা সমীরের কাছে আদেশ।

সমীর তখনই বার হয়ে পড়ল, তার প্রাণের বন্ধুদের এ-সংবাদটা দিতে।

সে রাত্রিটা বল্‌তে গেলে এই আলোচনাতেই কেটেছে। বন্ধুদের কাছে তার মানসী-মূর্ত্তি সম্বন্ধে তাকে অনেক জবাব-দিহি করতে হয়েছিল। তার রঙ্ কতটা ফরশা হবে, তার চোখ দুটো আকর্ণ-বিশ্রান্ত হবে, না, সে হবে পদ্মপলাশাক্ষী, এমন কি মাথার কেশ কোঁকড়ানো ও কতখানি দীর্ঘ হবে, এমন প্রশ্নও কেউ করতে বাকী রাখেনি। তার গড়ন হবে কি রকম, প্রাচীন গ্রীসিয় মূর্ত্তির মতো, না ভারতীয় পাষাণ-গাত্রে খোদিত মূর্ত্তির মতো! এই রকম আলোচনাতেই রাত এগারোটা বাজিয়ে সে বাড়ী ফিরলে।

খেয়ে-দেয়ে শুলেও চিন্তায় এই আলোচনারই জের চলেছিল। সে ভেবে দেখছিল, তার কল্পনার মানসী মূর্ত্তি শুধু তার কেন, হয়ত পৃথিবীর সকলেরই মানসী-মূর্ত্তি, সৃষ্টি-কর্ত্তার সৃষ্ট বা কল্পিত সব-সেরা রূপসীর পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে!

এর পূর্ব্বে কখনো যদি তার কোন বন্ধুর জন্য সে মেয়ে দেখতে যেত, তখন তার কল্পনার মানসী মূর্ত্তির সঙ্গে তুলনা করে তাদের সৌন্দর্য্যের ত্রুটি ধরে সে

অনেক বাহবা পেত। কাজেই তার নিজের বেলায় সে আদর্শ কিছুতে না ক্ষুণ্ণ হয়, সে সম্বন্ধে নিজেকে সে বেশ সজাগ রেখেছিল।

সকাল আটটা বাজতে না বাজতে বন্ধুর দল সুসজ্জিত হয়ে এসে হাজির।

সেও যথাসম্ভব সহজ অনাড়ম্বর অথচ সুন্দর বেশে নিজেকে সজ্জিত করে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

২

ঘটকীকে বারণ করে দেওয়া সত্ত্বেও বাড়ীর কর্ত্তাদের আদর-আপ্যায়নের ভঙ্গীতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে এত গুলি যুবকের মধ্যে পাত্র কোন্‌টি, তা তাঁদের অজ্ঞাত নয়!

ঘরের ভিতরের দিকের বন্ধ জানলার ফাঁক হতে মাঝে মাঝে অনুসন্ধিৎসা-পরায়ণ কাদের চোখের দৃষ্টি সেই তরুণ যুবকের মেলার মধ্যে ভাগ্যবানটিকে খুঁজে ফিরছিল। সমীর যথা-সম্ভব নিজেকে বন্ধুদের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করলেও, নিজেরই অজ্ঞাতসারে সে বন্ধুর দল থেকে নিজেকে ছিটকে যে বার করে ফেলেছিল, সেটা তার লজ্জায় ঘাড় হেঁট করার ভঙ্গিমায়!

* * *

মেয়ের ছোট ভাই হাত ধরে এনে তার দিদিকে সভায় বসিয়ে দিলে।

বন্ধুদের সঙ্গে সেও মেয়েটিকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলে। বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন না উঠলেও পরস্পরের চোখে চোখে অপছন্দের একটা ইসারা খেলে গেল।

মেয়েটি দেখ্‌তে মন্দ না হলেও সুন্দরী নয়। রঙ্‌ চোখ মুখ বা গড়ন কোনটাই সমীরের মানসী-মূর্ত্তির অনুরূপ নয়!

* * *

একজন বন্ধু মেয়েকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে।

মেয়ের বাপ স্নেহ-কোমল স্বরে বল্লেন,—বল তো মা, তোমার নাম।

মেয়েটি দু'তিনবার চেষ্টা করে ঢোক গিলে অস্পষ্ট কম্পিত স্বরে তার নাম বল্‌লে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত সমীর মেয়েটিকে দেখবার চেষ্টা করলেও মুখ তুলে তার পানে চাইতে পারেনি। মেয়েটির গলা শুনে হঠাৎ একবার কেঁপে উঠে চেয়ে দেখে, মেয়ের বাপ স্থির নিরুৎসাহ মুখে বসে আছেন। তাঁর পাশে মেয়েটি পুতুলের মতো স্থির। মুখের রঙ্‌ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে! তাঁর মুখে সে কী ভয়ের, কী লজ্জার সুস্পষ্ট রেখা। তার চোখের চাহনিতে অন্তরের কী নিবিড় বেদনায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাচ্ছিল...

সমীর তার বান্ধবদের দিকে চেয়ে দেখলে। মনে হল, যেন তাদের মতো সমালোচকের নৃশংস দৃষ্টির আগুন মেয়েটিকে ঘিরে তাকে ভস্ম করতে উদ্যত। আবার সে মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলে। এ যেন নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া পাষাণ-মূর্ত্তি! লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও সঙ্কোচের ছবি!

সমীরের বুকের মধ্যে কে যেন তার সুপ্ত মানুষটাকে নিমেষে জাগিয়ে তুল্‌লে। এই নৃশংস অগ্নি-পরীক্ষার সাক্ষী ও কর্ত্তা-রূপে থাকার জন্য তার সমস্ত অন্তর ধিক্কারে পূর্ণ হয়ে উঠল। তার মনে পড়ল সেদিনের স্মৃতি, যেদিন প্রথম ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার ফল জানতে সে সেনেটে গিয়েছিল। একটা তুচ্ছ ব্যাপারে পরাজয়ের সন্দেহ-দোলায় দোদুল তার মন তার বুকের ভিতর কেমন করে আছাড়ি-পাছাড়ি খাচ্ছিল! তার মধ্যে সেদিন আনন্দ ও বেদনার সে কি ঘাত-প্রতিঘাত! সে চঞ্চল হয়ে উঠল। না মেয়ে, না তার বাপের দিকে চেয়ে সে বল্‌লে—আপনি যেতে পারেন।

তারপর যথাসম্ভব শীঘ্র ভদ্রতা-দস্তুর-মতো উঠে সে বাড়ী ফিরে এসেই বল্‌লে—মা, তাঁদের সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ কর্ত্তে বল। আমার কোন আপত্তি নেই।

ইতিমধ্যে তার বন্ধুরা তার পাশে জড়ো হয়ে তার মত শুনে অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

সমীর একবার তাদের দিকে চেয়ে, তাদের এই নিষ্ঠুর হৃদয়-হীন অবাক্ চাউনিটাকে একটা তীব্র ব্যঙ্গের হাসিতে জ্বালিয়ে দিয়ে আর দ্বিতীয় কথা না বলে তার ঘরের মধ্যে চলে গেল।

বন্ধুরা সে হাসির অর্থ না বুঝে কি একটা রসিকতা করে বেরিয়ে পড়ল।

শ্রীভূপতিচৌধুরী।

হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুর অবনতি

হিন্দু সর্ব্বপ্রকারে অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। উহার শারীরিক অবনতি সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন; মানসিক ও পারমার্থিক অবনতি শারীরিক অবনতির সহগামী। পারমার্থিক উন্নতি শারীরিক সবলতার উপর নির্ভর করে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই বাক্যে "বল" অর্থে শারীরিক ও মানসিক উভয় বলই বুঝিতে হইবে। শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয় কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। মনের বলের অভাব হইতে যে কোন কার্য্য সাধিত হয় না, ইহা ধ্রুব সত্য। একাগ্রতা ও চিত্ত-সংযম সকল প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক কর্ম্মের মূল; আর উহা সবল ও সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই লভ্য। শারীরিক দুর্ব্বলতা হইতে মানসিক দুর্ব্বলতা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও অনুমিত হয়। নৈতিক ও পারমার্থিক উন্নতির অর্থে অনেকে শরীরের উপর আত্মার ক্রমিক আধিপত্য লাভ বুঝিয়া থাকেন; তাহা হইলে পারমার্থিক উন্নতি যে শারীরিক উন্নতি-নিরপেক্ষ, তাহা বলা যাইতে পারে এবং অনেকে তাহাই ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু যে-সব মহাপুরুষের আত্মা উহাঁদের শরীরের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছে তাঁহাদের শরীর কি হীন-বীর্য্য বা কর্ম্মে অক্ষম? বস্তুতঃ তাহার বৈপরীত্যই লক্ষ্য হয়। ধর্ম্মগত-প্রাণ ব্যক্তিদিগের শরীর নীরোগ, সবল এবং তাহা কষ্ট ও পরিশ্রম-সহ। নিরীহ বা বেচারা বিশেষণ বিদেশীয় পরিদর্শকেরা ও পণ্ডিতগণ হিন্দুদিগের প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ, হিন্দুরা নিরুপদ্রব, শান্ত-স্বভাব, অত্যাচার-সহিষ্ণু; ইহাদের মূর্ত্তিতে কোন প্রকার তেজের ব্যঞ্জনা নাই। কি মানসিক, কি পারমার্থিক অবসাদ ও নির্লিপ্ততা যেন উহার মূর্ত্তিতে ও প্রতিপদক্ষেপে পরিস্ফুট হইতেছে! একই দেশে বাস করে এমন অন্য জাতি অনেক আছে, যাহাদের মূর্ত্তিতে এই নির্জ্জীবতার ভাব পরিস্ফুট নয়। বরং ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মূর্ত্তিতে তেজের ও কর্ম্মঠতার ভাব পরিস্ফুট দেখা যায়; মাত্র আকার প্রকার ও ভাবভঙ্গী দ্বারা হিন্দু মুসলমান পৃথক করা সহজ।

অবয়ব ও গতি-বিধি হইতে বর্ত্তমান হিন্দুজাতির যে অবসাদ ও তেজোহীনতা অনুমান করা হইল, ইহা অন্য প্রমাণ দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে কি না, দেখা যাক। মানুষের জীবনী-শক্তির পরিমাপ উদ্যম-শীলতা ও কর্ম্ম-পরতায়। ইহা কি প্রকৃত তথ্য নয় যে হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত উদ্যম-বিহীন ও অকর্ম্মঠ? যে-সকল কর্ম্ম কঠিন ও যাহাতে অবিশ্রাম পরিশ্রমের প্রয়োজন, সে সকল কর্ম্মে অন্যান্য জাতিকে হিন্দু অপেক্ষা ঢের বেশি অগ্রসর হইতে দেখা যায়। শ্রমজীবি মাত্রেই প্রায় অহিন্দু। রেলে, ষ্টীমারে মুসলমান জাতির একাধিপত্য। এমন কি কৃষিকার্য্যে মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে। অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও এমন অনেক কাজ ছিল, যাহাতে একাধিপত্য করিত, ঐ সকল কাজও যেন এখন তাহাদের অবসন্ন হস্ত হইতে স্খলিত হইতেছে। হিন্দুরা যেন ক্রমেই সকল দিক হইতে বিতাড়িত হইয়া গৃহের কোণে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। অবসাদপূর্ণ ভয়-চকিত দৃষ্টি ও অলস গতি হিন্দুর জীবনী-শক্তি ও উদ্যমের একান্ত অভাবের সাক্ষ্য দিতেছে।

অপর দিকে অপর জাতীয়দিগের মধ্যে জন-সংখ্যা ক্রমেই বৰ্দ্ধিত হইতেছে এবং হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। ইহা সরকারি আদম-সুমারিতে প্রকাশ পায়। হিন্দু যেন গুরু ভারে অবনমিত দেহ লইয়া হতাশভাবে ভব-সমুদ্রের উপ-কূলে বসিয়া উহার লহরী গণিতে স্থির-চিত্ত! তাহার জীবনে কোন কর্ত্তব্য নাই! অসহায় উদাসীনভাবে জীবন-ভার আর কতদিন বহন করিবে? ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া জীবন-প্রদীপ অচিরেই নির্ব্বাপিত হইবে। হিন্দু-বংশ লোপ পাইবে, হিন্দু স্মৃতি-মাত্র ইতিহাসের পত্রে অঙ্কিত থাকিবে ও কিছু

কাল পরে হিন্দুজাতি প্রত্ন-তত্ত্ববিদের গবেষণার বস্তু হইবে। যদি হিন্দু জাতির এই চিত্র যথার্থ হয়, তাহা হইলে হিন্দু-নাম ধারী ব্যক্তি মাত্রেরই এই ভয়াবহ অবনতির তথ্য-অনুসন্ধানে মনোযোগ অর্পণ করা উচিত।

সমান অবস্থাপন্ন বিভিন্ন জাতির মধ্যে যদি মাত্র হিন্দুজাতিরই বিশেষ অবনতি লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে হিন্দুর সমাজে ও ধর্ম্মে এমন কিছু আছে বুঝিতে হইবে, যাহার অবশ্যম্ভাবী ফল উহার ক্রমাবনতি ও অবশেষে ধ্বংস। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যখন ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে ও মানুষের মত ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করতঃ স্বীয় কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের ধর্ম্ম ও আচারে সে বস্তুটী নাই, যাহা হিন্দু সমাজে ও হিন্দুধর্ম্মে অন্তর্নিহিত থাকিয়া হিন্দু জাতিকে উৎসন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

পরমেশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার পূজা সকল ধর্ম্মেরই গোড়ার ব্যাপার। তাঁহার ধ্যান ও স্তবও সকলধর্ম্মের অনুমোদিত। পূজা-অর্থে সাধারণতঃ ইহাই বুঝায়। ভগবানের ধ্যান ও স্তবে শরীর ও মনের উন্নতি বই অবনতির সম্ভাবনা নাই। কোন ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষে তাহা দেখাও যায় না। যখন জাতি-গত বা ব্যক্তিগত উন্নতির সহিত ভগবানের ধ্যান ও স্তবের একত্র সমাবেশ লক্ষিত হইতেছে—উন্নতির সহিত উহার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ না থাকিলেও অবনতির সহিত এ সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর নহে। হিন্দুধর্ম্ম এক ভগবানের ধ্যান ও স্তব-স্তুতি ছাড়া আর কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পূজা প্রকরণ ও আনুসঙ্গিক এবং ব্যক্তিগত ও সমাজগত আচার-ব্যবহার লইয়া গঠিত। সামাজিক ও পারিবারিক এবং ব্যক্তি-গত নানাপ্রকার নিয়ম-পালন, আচার ও ব্যবহার হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্গ ভূত। হিন্দুধর্ম্মের প্রথম বিশেষত্ব এই যে হিন্দু ভগবানকে বহুরূপে পূজা করিয়া থাকে। সত্য-জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে মৃৎখণ্ড বা প্রস্তর-খণ্ড পর্য্যন্ত অসংখ্য প্রকারের স্থাবর জঙ্গম, পশু পক্ষী গুল্ম বৃক্ষ প্রভৃতি হিন্দুর উপাস্য বস্তু! ইহার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রহিয়াছে বা কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ইহা হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে, আমি তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত নহি। মাত্র চলিত হিন্দুধর্ম্ম কি লইয়া গঠিত, তাহাই কিয়ৎ পরিমাণ অনুধাবন করাই আমার উদ্দেশ্য। নিত্য শুদ্ধ, মুক্ত ব্রহ্মের উপাসক বেদান্ত-বাদী ব্রাহ্মণও ষষ্ঠীদেবী এবং মা-মনসার পূজা করিয়া থাকেন এবং বট, অশ্বত্থ ও নিম্বাদি বৃক্ষকে দেবাংশ বলিয়া উহাদের পাদদেশে প্রণত হয়েন। মাত্র গণ্ডকী শিলা হিন্দুর উপাস্য নহে; হরিদ্বারের উপল-খণ্ড মাত্রই তৎস্থানীয়। সিন্দুর-বিলেপিত সাধারণ প্রস্তর খণ্ডও বৃক্ষ এবং ফুল-জলাদি দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। উপাস্য বস্তু সকলের চরম সীমার অন্তর-ভাগে অসংখ্য স্থাবর জঙ্গম, ভূত, প্রেত, পিশাচ ও দেবতা রহিয়াছেন, যাঁহারা সকলেই হিন্দুর কাছে পূজা পাইয়া থাকেন। উপাস্য দেবতার অসংখ্য প্রকার-ভেদে পূজার বিধিও অসংখ্য প্রকার; ভিতরে, বাহিরে, দক্ষিণে, বামে উৰ্দ্ধে ও নিম্নে তিলমাত্র স্থান নাই, যাহা উপাস্য বস্তু দ্বারা পূর্ণ না আছে! প্রতি পদক্ষেপে, শয়নে উত্থানে, স্বপ্নে জাগরণে সকল দিক দেশ ব্যাপিয়া বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেবগণ হিন্দুর পূজা-গ্রহণের জন্য সজাগভাবে দণ্ডায়মান! সুতরাং প্রতি পদক্ষেপে হিন্দুর ধর্ম্ম-চ্যুতির আশঙ্কা ও ধর্ম্মচ্যুতি ঘটিতেছে! পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্য-মণ্ডল পর্য্যন্ত গ্রহ, উপগ্রহ সকলকেই বিশেষ বিশেষ পূজা, স্তব ও স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট না রাখিলে হিন্দুর কল্যাণ নাই! নড়িতে চড়িতে, শুইতে বসিতে ভয়ঙ্কর বা অন্য প্রকার পূজার্হ দেব-দেবীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিলে আত্ম-শক্তি-বিকাশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন দেব-দেবীগণের পূজা-পদ্ধতি, কতকাংশে পূজোপকরণগুলিও বিভিন্ন, এমন কি অনেক স্থলে বিপরীত প্রকারের। ছাগ-বলিতে এক দেবতা তুষ্ট হন, অপর কোন দেবতার মাত্র জীর্ণ তুলসী-দলেই পরিতৃপ্তি! একের নিকট যজ্ঞার্থে পশু-বধ পাপ-কার্য্য নহে, অপরের নিকট সম্পূর্ণ অহিংসাই ধর্ম্ম। কেহ ছাগ, কেহ মহিষ, কেহ পারাবত, কোন দেবতা বা আবার শূকর-বলিতে তুষ্ট, কোন দেবতা মাত্র বংশ-পত্র, জল, কেহ বা বিল্ব-পত্রেই পরম তৃপ্ত! বিপরীত প্রকৃতি-যুক্ত অসংখ্য দেবতা, উপদেবতায় সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব সময় পরিবেষ্টিত হইয়া অনুক্ষণ সেবা অপরাধ ও দেব-দেবীর কোপ এবং তজ্জন্য বিপদ ও দুঃখের আশঙ্কায় হিন্দু সদাই ভীত, ত্রস্ত ও চকিত!

অনেকে বলিয়া থাকেন, হিন্দুধর্ম্ম আচার-মূলক বা আচারাবয়ব ; ইহা শাস্ত্র-মূলকও বটে। শাস্ত্রের কার্য্য শাসন। হিন্দু শাস্ত্র হিন্দুর প্রত্যেক কর্ম্ম ও হিন্দুর সমগ্র জীবনকে বহুপ্রকার বিধি-নিষেধ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে শাসন করিতেছে ও করিয়াছে। এমন কোন কার্য্য হিন্দু করিতে পারে না, যাহার বিষয়ে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ নাই ; আহার বিহার প্রভৃতি সকল কার্য্যই শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে করিতে হইবে। জানি না, কোনো কালে সকল বিধি ও নিষেধ মানিয়া চলা নিষ্ঠাবান হিন্দুর পক্ষে সম্ভব ছিল কি না! কিন্তু ইহা স্পষ্ট অনুমান করিতে পারি যে সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিয়া জীবন রক্ষা করা নিতান্ত অসম্ভব। ইহার অসম্ভবতা উপলব্ধি করিয়াই শাস্ত্রকারেরা নিয়ম ও নিয়মের প্রতিপ্রসব ও পুনরায় উহার বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রে বিপরীত নিয়মসমূহের একত্র সমাবেশও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যবহার-শাস্ত্রও পৃথক্ পৃথক্। শাস্ত্রের শাসন অপেক্ষা আচারের শাসন কম শক্তিমান নহে ; আচারসমূহও শাস্ত্র অপেক্ষা বহুবিধ ও পরস্পর পরস্পরের বিপরীত। এই বহুল বিপরীত শাস্ত্রানুশাসন ও আচারের মধ্যে হিন্দুর জীবন যে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইবে, ইহাই স্বাভাবিক ; হইয়াছেও তাই। আত্মরক্ষার সহজাত চেষ্টা,—সকল প্রকার বন্ধনকে ছিন্ন করিবেই ; সেই কারণে উহা সামাজিক ধর্ম্মের কঠিন শাসনের বাধা সত্ত্বেও হিন্দুকে এ পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছে। কিন্তু অসংখ্য দৃঢ় বন্ধনের ফলে উহার জীবন-গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে ; ও উহাকে জীবিত না বলিয়া জীবন-মৃত বলিলেই উহার যথাযথ বর্ণনা হয়।

ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র ও বেদ ইহাদের তুল্য শাসন দর্শনের ; অপর দেশের মানবের নিত্য জীবনের উপর দর্শনের এত আধিপত্য নাই। দর্শন ও ধর্ম্মের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, একের পর আর চলিয়া আসিতেছে। ক্রমে পাশ্চাত্য দেশে দর্শন হইতে ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোথাও ধর্ম্মকে বিজ্ঞান ও দর্শন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নহে। অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রাকৃত জ্ঞানকে বিতাড়িত করিতে পারি[illegible] না। অপ্রাকৃতকে প্রাকৃতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করি[illegible] থাকিতে হইবে, সত্য। কিন্তু হিন্দু-জীবনে অপ্রাকৃতে[illegible] জ্ঞান প্রাকৃত জ্ঞান ও জীবনকে যেন আত্মসাৎ করি[illegible] ফেলিয়াছে!

হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান দর্শন,—বেদান্ত ; উহার মু[illegible] শিক্ষা, এক ব্রহ্মই নিত্য ও সত্য ; অপর সকল মায়া [illegible] অনিত্য। এই সত্য নানা শাস্ত্রে নানা আকারে হিন্দুকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে ; নলিনী-দলগত-জলবৎ জীব[illegible] চঞ্চল, এই ভাব হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে। কি রাজ প্রাসাদ ও কি দরিদ্রের কুটীর, কি ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী [illegible] কি নিরক্ষর শ্রমজীবী—সর্ব্বত্র ও সকল ব্যক্তিই ইহ[illegible] উপলব্ধি করে। শুধু তাহাই নহে—নিজ নিজ শিক্ষা, অভ্যাস ও অবস্থানুযায়ী সকলেই এই মন্ত্রকে জীবনের কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াস পায়। যখন সংসার অনিত্যই হইল, তখন ইহার জন্য বিশেষ যত্ন বা চেষ্টা লওয়া নিরর্থক। অতিথি-ভবনকে চির-বাসস্থান করিবার প্রয়াস বাতুলেরই শোভা পায়! এ সকল মিছা মায়া জানিয়া সেই তত্ত্ব-বস্তুতে সতত নিমগ্ন থাক। এই মন্ত্র অহিংসা মন্ত্রের পরিপোষক ; হয়ত ইহার মূলে অন্তর্নিহিত। উভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু যে ইহ-জীবনকে ও তাহার উপযোগী কর্ম্মসমূহকে অকিঞ্চিৎকর ভাবিবে, ইহাই স্বাভাবিক। শরীর-রক্ষা ও কোন প্রকার ঐহিক উন্নতি-সাধন অকিঞ্চিৎকর। ইহা জীবনের সুখ-সম্পদ জলে-বুদ্বুদবৎ।

অহিংসা মন্ত্র ও মায়া মন্ত্রই মানব-জীবনকে সঙ্কীর্ণ করিবার প্রচুর কারণ। ইহার উপরে ভারতের জল-বায়ু আছে ; এমন সুজলা সুফলা দেশ দুর্লভ। বহুবিধ ভোগের সামগ্রী এদেশে অল্প পরিশ্রমে লাভ করা যায়। দেশান্তরে নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু-লাভও বিশেষ পরিশ্রম-সাধ্য। ভারতের জল-বায়ু ও উর্ব্বরা-শক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল, ইহার অধিবাসীগণের অলসতা ও শ্রম-কাতরতা। প্রকৃতি মাতার এই বদান্যতার সহায়তায় উপরি-উক্ত ধর্ম্ম বিজ্ঞান ও দর্শন উহাদের মনের উপর শক্তি বিস্তার করিয়া অবশেষে

হিন্দুজাতিকে বর্ত্তমান নির্জ্জীব অবস্থায় উপস্থাপিত করিয়াছে। "স্বচ্ছন্দ বনজাত" শাক দ্বারা উদর-গহ্বর পূরণ করিতে পারিলেই যাহাদের তৃপ্তি, ও কৌপীন মাত্র যাহাদের যথেষ্ট পরিধেয়, তাহাদের জীবন ও কর্ম্ম-ভূমি সঙ্কীর্ণ হইবেই!

বর্ণাশ্রম লইয়া হিন্দুধর্ম্ম। অনেকের মতে বর্ণাশ্রমের পার্থক্য ও বিশেষ বিশেষ নিয়মই হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব। এই বর্ণ-বিভাগই জাতি-বিভাগ। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এক বর্ণের অভ্যন্তরে অসংখ্য অন্তর্জ্জাতি গঠিত হইয়াছে! আবার বাসস্থান, ও আচার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা-ভেদে এক একটী অন্তর্জ্জাতি কত ক্ষুদ্রতর শ্রেণীতে বিভক্ত। এক একটী ক্ষুদ্রতম শ্রেণী অপর শ্রেণী হইতে পৃথক। জাতি-ভেদ ব্যক্তি-গত স্বাধীন প্রবৃত্তির বিকাশ হইতে দেয় না। সুতরাং একটী শ্রেণী অপর শ্রেণীতে মিলিতে পারে না। বলিতে পারা যায়, ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে এই জাতি ও শ্রেণী-বিভাগ ক্রমেই প্রসার লাভ করিয়াছে, ও এই জাতি-বৈচিত্র্য লইয়া হিন্দুর সমাজ গঠিত। বিভাগ ও বৈচিত্র্য সকল উন্নতির মূলে অবস্থিত; পৃথকীকরণ ও একীকরণ এই উভয় লইয়াই ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। যদি অসংখ্য পৃথক্ পৃথক্ জাতির সৃষ্টির সঙ্গে ঐ সকল বিভিন্ন জাতিকে ব্যক্তিগত সমাজগত জীবন পালন ও জীবনের উন্নতি মুখ্য লক্ষ্য করিয়া তাহার অনুকূল নিয়ম দ্বারা এক করিবার চেষ্টা থাকিত, তাহা হইলে সকলের ও সমগ্র জাতির নিশ্চয় উন্নতি সাধিত হইত। একীকরণের অভাব মাত্র বিভাগ-অধোগতিরই হেতু হইবে। এই ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। ভাঙ্গা হইয়াছে, গড়া হয় নাই। এক ক্ষত্রিয় জাতির উপর দেশের শাসন ও রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া অন্যান্য জাতীয়েরা নিশ্চিন্তভাবে কালক্ষেপ করিতেন। যখন ক্ষত্রিয় জাতি ক্রমে বিভিন্ন অন্তর্জ্জাতিতে বিভক্ত হইল, তাহাদের মধ্যে ঈর্ষা ও কলহ প্রবেশ করায় ক্ষত্রিয় জাতিকে শক্তিহীন হইতে হইল। দেশ-রক্ষা অসম্ভব দাঁড়াইল।

ইহা সত্য যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে সমাজের বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি হয়। ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে কোন ব্যক্তি বৃত্তি বা কর্ম্ম বিশেষে তাহার শক্তি নিযুক্ত করিয়া তাহার চর্চ্চা করিলে উহার শরীর, মন ও বুদ্ধি সকলই সেই কর্ম্মের উপযোগী হইবে এবং তদনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিবে। কর্ম্মকার, কুম্ভকার ও স্বর্ণকারের পুত্র তাহার পিতা-পিতামহ যে নিপুণতা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া আপন আপন কর্ম্মে ও ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া থাকেন। উহার শরীর, প্রবৃত্তি, বুদ্ধিও সেই সেই কর্ম্মের উপযোগী হইয়া থাকে। বংশ-পরম্পরায় চালনার ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশেষ ও সেই সঙ্গে মানসিক প্রবৃত্তি বিশেষের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়, সত্য। কিন্তু অপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মানসিক প্রবৃত্তির সম্যক্ চালনা ও চর্চ্চার অভাবে অধোগতিও হয়। যে অঙ্গের চালনা বা যে প্রবৃত্তির চর্চ্চা হইবে না, তাহা হীন-বল হইবেই। সুতরাং জাতি-বিভাগের ফলে মানবের শরীরের ও মনের বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

সূত্রকার রজক গোপ প্রভৃতির বুদ্ধি ও কার্য্য অবলোকন করিলে এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। মাত্র ক্ষত্রিয় জাতিই উহার জাতি-গত যুদ্ধ-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত আছে বলিয়া তাহাদের শরীরে তেজস্বিতা কতকাংশে বর্ত্তমান। অপর জাতীয়েরা নিজ নিজ স্কন্ধে এই ভার গ্রহণ করিলে উহাদের শরীরে ও মনে এতদূর অবনতি হইত না।

অসংখ্য দেবতা ও উপদেবতার ক্রীড়া-কেন্দ্র যে মনুষ্য, তাহার পুরুষকারের অবকাশ কোথায়? তাহার পুরুষার্থ-সাধন অসংখ্য জীব জন্তু দেবতা ভূত প্রেত পিশাচের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। নিতান্ত অসহায় মানব প্রতি পদক্ষেপে নিজের অসহায়তা ও নিয়তির দুরতিক্রম্য প্রভাব উপলব্ধি করিতেছে। শাস্ত্র শিক্ষা দিতেছে, অহঙ্কারই সকল অনর্থের মূল; অহঙ্কারের বিনাশ হইলে তবে পুরুষার্থ লাভ হয়। তাই, যাহা পুরুষাকারে সাধ্য তাহা দেবতা প্রভৃতির করায়ত্ত জানিয়া হিন্দু নিশ্চেষ্ট ও অদৃষ্টের দাস হইয়া পড়িয়াছে। "অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহহং ইতি মন্যতে"—এই শাস্ত্রোক্তির অর্থ হিন্দু প্রতি পদে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। আমি কর্ত্তা নই বা আমি কেহ নহি

বা আমি ভ্রমাত্মক জ্ঞান, এই শিক্ষা আমাদের মজ্জাগত। সুতরাং আমি কিছু করিতে পারি না; অতএব করিবার চেষ্টা কেন? যাহা দেবতা করিবে, তাহাই হইতেছে ও হইবে। আমি মুদিত নেত্রে দেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকি বা ভাসিয়া যাই—তাহাই আমার ধর্ম্ম। হিন্দুশাস্ত্রের ইহাই শিক্ষা। সত্য, শাস্ত্র বিভিন্ন ও শাস্ত্রোপদেশও বিভিন্নমুখী; তথাপি "পরস্পরবিবদমানানামপি শাস্ত্রানাম্ অহিংসা পরমোধর্ম্ম ইতি।" অহিংসা—ইহা সকল ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; পরের অপকার-সাধন সর্ব্বদা সকল ধর্ম্মই নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু এই শিক্ষা সম্যকরূপে কার্য্যে পরিণত কেবল হিন্দুই করিয়াছে বা করিতে প্রযত্ন করিয়াছে।

কাহারো হিংসা করিবে না, এই বাক্যের মধ্যে আব্রহ্ম-স্তম্ব সকল জীব জন্তু, এমন কি তৃণ-গুল্মাদিও স্থান পাইয়াছে। তুলসী-পত্র চয়ন-কালে তুলসী বৃক্ষের পূজা করিয়া সময়-বিশেষে তবে সে পত্র চয়ন করিতে হয়। বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষেরও পূজা-পদ্ধতি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। বিশেষ দেব অথবা পিতৃ-কার্য্যের জন্য অথবা অত্যাবশ্যক সাংসারিক কার্য্যের জন্য বৃক্ষাদি ছেদন করিতে হইলেও উহাদিগকে পূজার দ্বারা তুষ্ট করতঃ কার্য্য করিতে হয়। যজ্ঞার্থ ভিন্ন পশু-বধ নিষেধ; যজ্ঞে বধও পশুর পরকালের হিত-সাধন-জন্য। এই অহিংসা মন্ত্রের বহু যুগের সাধনার ফল ভারতের অবনতি – অতীত যুগে মহামুনি শাক্য সিংহের আবির্ভাব। তাঁহারই প্রভাবে অহিংসা-মন্ত্র ভারতে সমধিক প্রচার লাভ করে। ইহার বহু পূর্ব্বে বৈষ্ণব ভারতে আপন আধিপত্য স্থাপিত করে। যজ্ঞে পশু-বধ বেদ-বিহিত। কোন কোন তন্ত্রেও পশু বধের ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণব গ্রন্থে পশু-বধের বিধান নাই, পশু-বলি দেব-উপাসনার অঙ্গীভূত নহে। যে তন্ত্র বা পুরাণে পশু-বলির ব্যবস্থা আছে, তাহাও বেদের শাখা-সম্ভূত; সুতরাং ক্রমশঃ পশু-বলি যে হিন্দু সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তথাপি পশু-হননের পূজা-বিশেষে-বিধি এত প্রকার প্রতিপ্রসব ও নিয়ম দ্বারা সীমাবদ্ধ যে, উহার অভ্যন্তরে অহিংসা বা বৈষ্ণব ভাব ঐ সকল নিয়মের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট প্রতীয়মান হয়। মনে হয় মানুষের রসনা পরিতৃপ্তির জন্য পশু-বধ নিষিদ্ধ। সাধারণ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া উহার দমন করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কোন্ শক্তির প্রভাবে জানি না অন্তর্নিহিত এই বৈষ্ণব ভাব ক্রমশঃ প্রবল হইয়া অবশেষে শাক্য মুনির বৌদ্ধ ধর্ম্মে ও জৈন ধর্ম্মে পরিণত হয়—এবং প্রাচীন বৈষ্ণব মতের উপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার হইয়া আধুনিক অহিংসা-প্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। মনে হয়, বঙ্গদেশের সরস কোমল মৃত্তিকা এই ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও পুষ্টির বিশেষ উপযোগী। তাই যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মাত্র প্রেমের তরঙ্গে সমগ্র দেশ নিমজ্জিত করিলেন, যাহার আঘাতে হিংসার কাঠিন্য দ্রবীভূত হইয়া বঙ্গবাসীর হৃদয় প্রেম-রসে আপ্লুত হইল। ঐ সময়ে অপর যে সকল খণ্ডাবতার বা মহাপুরুষ জন্ম লন, সকলেই প্রেমেরই জয় গান করিয়াছিলেন। পরম ব্রহ্মের সর্ব্বজীবে অবস্থান অনুভবই ব্রহ্ম-লাভ, ইহাই উচ্চতম সাধ্য; বস্তুমাত্রই ব্রহ্মের রূপ ভেদ ইহাই জ্ঞানের চরমাবস্থা। ভারতের জল-বায়ুর গুণে এই ধর্ম্ম-বীজ অহিংসা-প্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। জীবমাত্রই অবধ্য ও নারায়ণের স্বরূপ বলিয়া নমস্য, ইহা অন্য ধর্ম্মের শিক্ষা বা শাসন নহে। সকল জন্তুর মধ্যে হিংসা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে। ক্ষুধা, রোষ, দ্বেষ প্রভৃতি প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অথবা ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্যও এক জীব অন্য জীবকে হনন করে। হিংসা-প্রবৃত্তির দমন ঐ সকল প্রবৃত্তির দমন দ্বারা সম্ভব হয়। আত্মরক্ষা ও আত্মসন্ততি সকল জীব-জন্তুর জীবন কার্য্যের প্রধানতম ও মূল প্রবৃত্তি। হয়ত এই প্রবৃত্তিদ্বয় হইতে রোষ, দ্বেষ, আত্মাভিমান প্রভৃতি রিপু সকলের উৎপত্তি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি প্রবল রিপুচয়ের মূলে আত্মরক্ষা ও আত্ম-সন্ততির প্রবৃত্তিই বর্ত্তমান। এখন, হিংসাকে দমন করিতে হইলে তজ্জনক প্রবৃত্তিকে দমন করিতে হইলে, কাম, ক্রোধ,

অভিমান ইত্যাদি এমন কি বুভুক্ষাকেও বশীভূত করিতে হইবে—আত্ম-বশ্যতাতে ধর্ম্মের অবয়ব, আত্ম-জয়েই পুরুষকার ও পুরুষার্থ লাভ। সুতরাং কাম-ক্রোধাদির জয়ই সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু উহাদের জয় অর্থে বিলয় বুঝিলে চলিবে না। পুরুষত্বের প্রভাব দ্বারাই রিপু জয় হইবে। কিন্তু রিপুসকলের অত্যন্ত নাশ হইলে পুরুষত্বেরও হীনাবস্থা উপনীত হইবে। যেমন জন্মান্ধের চক্ষুরিন্দ্রিয় ও দর্শন-লালসা বা বধিরের শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রবণলালসা দমনে পুরুষের অর্থহীন, তেমনি নিতান্ত দ্বেষ বা রোষাদি-বিহীন মনুষ্যের আত্ম-জয়ে কৃতিত্ব কোথায়? যদি জন্ম হইতে ঐ সকল প্রবৃত্তি হীনাবস্থাপন্ন থাকে অর্থাৎ মন ও শরীরের উপর উহার শক্তি প্রকাশ না থাকে তাহা হইলে উহাদের জয় পরাজয়ের দ্বারা পুরুষের পাপ পুণ্যের সঞ্চার সম্ভাবনা। অবিশ্রান্ত যুদ্ধের দ্বারা প্রবল রিপু সকলের জয় দ্বারাই পুণ্য লাভ করা যায়।—অপর দিকে যদি কাম ক্রোধাদি রিপু সকলের মূল আত্মাভিমান, আত্মরক্ষা ও আত্ম অসন্তুষ্টই হয়, তাহা হইলে উক্ত রিপু সকল দমন করিলে উক্ত মূল প্রবৃত্তি সমূহও নিস্তেজ হইবে ও অবশেষে লয় প্রাপ্ত ও হইতে পারে। অহিংসার চূড়ান্ত উৎকর্ষে আত্মাভিমান ও আত্মরক্ষা-মূলক পুরুষকারে চূড়ান্ত অপকর্ষ হইবেই। যে সকল মহাপুরুষ প্রবল রিপু জয় করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনি অসাধারণ শক্তিশালী ও স্বীয় শক্তিশালিত্বের সম্পূর্ণ জ্ঞান ও রিপুজয়ের আনন্দ পরিস্ফুট ভাবে উপলব্ধি করেন ও স্বয়ং বীরপুরুষের ন্যায় ইন্দ্রিয় সকলের অধীশ্বর হইয়া সদানন্দ উপভোগ করেন, তাহাদের তেজ ও বল সাধারণ মনুষ্যের অলভ্য; রিপু সকল মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইতে থাকে। আমরা ধর্ম্ম অর্থে রিপুজয়, অসৎ রিপুগণের অত্যন্ত নাশ বুঝিয়া থাকি! সুতরাং যাহাতে রিপুগণ মস্তক উত্তোলন করিতে অসমর্থ হয়, সেই বিষয়ে যত্নই আমাদের মুখ্য ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রিপুজয়ের অন্যতম সাধন শরীরের জয়। এই শরীর-জয়ের জন্য নানা উপায় নানা ব্যক্তি কর্ত্তৃক অবলম্বিত হয়। সকল প্রকার আহার-বিহারে সংযম হিন্দুর সাধারণ ধর্ম্ম। আহারে সংযম, স্বল্পাহার ও অনাহারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অপর দিকে জীবনের অস্থায়িত্ব ও অসারতার জ্ঞান হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত, সুতরাং কায়ক্লেশে জীবন-ধারণের জন্য স্বচ্ছন্দ-বনজাত শাকই পর্য্যাপ্ত-আয়ু ও বলবৃদ্ধির উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য অনর্থক। ইহার স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ফলে শরীর নির্য্যাতিত হইয়া দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর ও তৎসঙ্গে মন নিস্তেজ ও বলহীন হইয়া পড়িয়াছে। যাহার নিকট জীবনের মূল্য নাই, তাহার জীবন উদ্যমবিহীন ও সঙ্কীর্ণ। নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত হইয়া অলসনেত্রে ও অবসন্নভাবে দিন যাপনই তাহার জীবন। শরীর ও ইন্দ্রিয় হীনবল হইয়াও একেবারে নষ্ট হয় না বা আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির একান্ত বিলয় সম্ভাবনা, তাই শরীর-রক্ষার উপযোগী কতক কার্য্য করিতেই হইবে, নহিলে নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল হইয়া জীবন-স্বপ্নের একান্ত ধ্বংসই হিন্দুর লক্ষ্যস্থল হইত। শরীর অবসন্ন উহার কর্ম্মোপযোগিতা লুপ্ত; তদনুরূপ চিত্তও ক্লান্ত ও নিস্তেজ—হিন্দুর জীবন অসহনীয় ভার-বহন মাত্র।

দ্বাপর ও কলির সন্ধি-স্থলে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডব-সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে স্বয়ং নারায়ণ ধর্ম্মরাজের পক্ষে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ তৃতীয় পাণ্ডবের সারথ্য গ্রহণ করিয়া রথোপরি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। শঙ্খনাদে ও তূরী-নাদে আকাশ পরিপ্লুত। অকস্মাৎ অর্জ্জুনের বজ্রমুষ্টি হইতে ধনুঃশর স্খলিত হইল। বিষম সময়ে অসংখ্য জ্ঞাতি বধের চিন্তায় মহাবীরের হৃদয় অক্ষত্রিয়োচিত কার্পণ্য-দোষে উপহত হইল। "নাহং যোৎস্যে" বলিয়া অর্জ্জুন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন বীরশ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয়াগ্রগণ্য অর্জ্জুনের এই অহিংসা বা হৃদয়ের কার্পণ্য বা কোমলতা কি হিন্দু চিত্তের উপর অহিংসা ভাবের প্রাধান্যের সূচনা নয়? দ্বাপরের শেষে যে ভাবের অঙ্কুর কুরুক্ষেত্র-প্রাঙ্গনে দৃষ্ট হয়, আজি তাহা মহাবৃক্ষ রূপে পরিণত হইয়া সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম নাশ করতঃ অবশেষে সমগ্র ভারত ভূমি সহ রসাতল-গমনে উন্মুখ হইয়াছে। ধর্ম্মের বেদীতে স্বার্থকে বলিদান দিয়া অহং জ্ঞানের উপর পরমাত্ম-জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ভগবদ্গতচিত্ত হইয়া কর্ম্ম করাই মানবের সনাতন ধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইলে উহার কল্যাণ

কোথায়? স্বয়ং ভগবান ভারতভূমিতে এই ধর্ম্মের গ্লানি অনুভব করিয়া উহারই সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হন ও মোহার্দ্র হৃদয় অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রে এই শিক্ষাদ্বারা ধর্ম্মযুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া তাঁহার তৎকালীন উদ্দেশ্য সাধন করেন। কলির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত কত যুগ গত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইলেও হিন্দুর সেই কার্পণ্য ও সংমোহ ধীরে ধীরে হিন্দুর সকল তেজ ও সকল ধর্ম্মকে আপন মায়াতে আবৃত করিয়া উহাদের জীবন শোষণ করিয়া লইয়াছে। যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, জানি না, পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া ভগবান বিনাশোন্মুখ হিন্দু জাতিকে পরিত্রাণ করিবেন, অথবা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে—তাঁহার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোনও গূঢ়তম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভূপৃষ্ঠ হইতে হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিবেন!

শ্রীবীরচন্দ্র সিংহ।

মুক্তি

আজ দশ বছর বাদে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আমার স্বামী আমার হাত ধরে বল্লেন,—যা হয়ে গেছে, গেছে, তুমি কিছু মনে করো না, এই বার—এই শেষ বার আমায় তুমি ক্ষমা কর।

চেয়ে দেখলুম স্বামীর দিকে, সর্ব্বাঙ্গ তাঁর পাপ ব্যাধি-শরে ভরে গিয়েছে। ব্যাধির নির্ম্মম আক্রমণ দেখে আমার বুক বেদনায় ভরে উঠল। নিজেকে সংযত করে, বেশ স্পষ্ট স্বরেই বল্লুম,—মানুষ-হিসাবে তোমায় ক্ষমা করতে বা তোমার সেবার প্রয়োজন হলে সেবা করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু ভবিষ্যতে তোমার স্ত্রী সেজে তোমার লালসার ইন্ধন জুগিয়ে আমি আমার নারীত্বকে কলঙ্কিত করতে কখনই প্রস্তুত নই। জীবনে কখনো তোমার কাছে আমি কিছু চাই নি, আজ চাইছি—তুমি আমায় মুক্তি দাও, এ মিথ্যার আসনে আমি নিজেকে আর বসিয়ে রাখতে পারছি না।

তোমরা আমার স্পর্দ্ধা আর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেছ! ভাবছ, এত সাহস আমার মত একটা মূর্খ স্ত্রীলোক পেলে কোথা থেকে?...এ শিক্ষা পেয়েছি আমি, আমার প্রাণের কাছ থেকে, দুঃখের কাছ থেকে।

বিয়ের পর কত সাধ, কত আহ্লাদ, কত আশা ভাল-বাসা বুকে পূরে স্বামীর ঘর করতে এসেছিলুম। স্বামীকে একটুখানি বোঝবার আগেই, এই সত্যটা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম, যে আমি তাঁর কেউ নই। তারপর...

বিয়ের দু' বছর বাদে ঠিক এই রকম ভাবে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে, ঠিক এই রকম ভাবেই স্বামী আমার কাছে আশ্রয় চাইতে এসেছিলেন। এতদিনের সঞ্চিত বিরাট রুদ্ধ ভালবাসা তার কপাট খোলা পেয়ে পাগল হাওয়ার মত তাকে ঘিরে ফেললে। ভুলে গেলুম যে, স্বামী আমার পাপের ছাপ সর্ব্বাঙ্গে মেখে আমার নারীত্বকে কলঙ্কিত করতে আসছেন, ভুলে গেলুম তিনি সত্যাশ্রয়ী নন! শুধু মনে হল, তিনি স্বামী, আমার ইহকাল-পরকালের একমাত্র উপাস্য দেবতা!

সকলে যখন ঘৃণায় দূরে সরে গিয়েছে, এক ঘরে একা, সংসার-অনভিজ্ঞ আমি তখন আমার আর্ত্ত আতুর স্বামীকে নিয়ে দিবারাত্র নিদ্রাহীন চোখে তাঁর পাশে বসে সেবা করে রোগ মুক্ত করে তুল্লুম।

ছ' মাস আমার বড় সুখে কাটল। আমার সুখ বাড়াবার জন্য, আর একজন অতিথির আগমন-সম্ভাবনা জেগে উঠল। আমার স্বামী এ কথা শুনলেন, কিছু বল্লেন না। দু'চার দিন বাদে আমার প্রতি আমার স্বামীর নিষ্ঠার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করতে লাগলুম। তারপর

দশ বছরের মধ্যে গোণা যে কটা দিন আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, সে ক'টা দিন এসেছেন, হয় গয়না নিতে, নয় পদাঘাত দিতে। গয়নাও খুলে দিয়েছি, পদাঘাতও বুক পেতে নিয়েছি, তাঁকে আবার ফিরে পাবার আশায়,—সে কথা এখন ভাবলে কিন্তু আমার হাসি পায়!

এ বিপদেও আমার সান্ত্বনা ছিল এই যে আমার এই তাপিত প্রাণকে শীতল করবার জন্য নারীর ঈপ্সিত সম্পদ আসছে। দিন গুণে, মুহূর্ত্ত গুণে সময় কাটাতুম, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাও সহ্য হল না। একদিন স্বামীর, আমার পতি-দেবতার অমোঘ দান—পদাঘাত—লাভ করলুম, তার দিন দুই বাদে আমি এক মৃত সন্তান প্রসব করলুম।

আমার মৃত সন্তানের জন্য নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছি। কিন্তু পুত্রের মরণে এখন আমি খুসী—সে মুক্তি দিয়ে নিজেকে আর আমাকেও মুক্তি দিয়ে গেছে। মা আমি—সন্তানের মরণে খুসী হয়েছি! বলছি কেন, জানো?

আমি নারী, পুরুষের মত আমিও ভগবানের সৃষ্ট জীব। পুরুষের মত আমিও মানুষ। পুরুষের মত সুখ-দুঃখের অনুভূতি আমারও আছে, সমান—একতিল কম নয়! কিন্তু পুরুষের চেয়ে ভগবান আমাকে এক মহৎ সম্পদ দিয়েছেন,—সে মাতৃত্বের মহিমা! তাই আমার এই মাতৃত্বের মহিমাকে এই রকমভাবে এক পুরুষের, আমার স্বামীর লালসা-বহ্নিতে আহুতি দিয়ে কলঙ্কিত করতে পারি না!

নারীরা সৃষ্টি করে আর সে সৃষ্টি রক্ষাও করে। মহিমান্বিত স্বর্গীয় জিনিষ সৃষ্টি করতে নারী মাত্রেই উন্মুখ। আমি চাই, দেশ, জাতি, সমাজকে দিতে এমন সন্তান, যে দেশের জাতির সমাজের মুখ উজ্জ্বল করবে, ধন্য করবে। আর সেই সন্তানকে রক্ষা করবে, মহৎ পথ দেখাবে, আমার শক্তি, নিষ্ঠা, আশীর্ব্বাদ!

কিন্তু যদি আমি আমার নারীত্বকে কলুষিত করে মাতৃত্বের আসন অধিকার করি, তবে মাতৃত্ব যে অপমানে মরে যাবে! এই রকম স্বামীর সংস্পর্শে এসে আমি কি সৃষ্টি করতে পারি?......একটী সন্তান, যে জন্মাবে, দুর্ব্বল, রুগ্ন, অক্ষম, মস্তিষ্কহীন, জড়! কি কাজ সে করবে দেশের জন্য? কিছু না, শুধু আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করবে মাত্র। কিন্তু নিজের হাতে তাকে নষ্ট করতে পারি না, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—আমি যে মা!

তাই বলছি যে মাতৃত্বের স্বর্গীয় সুধা পান করে আমি অমর হতে পারতুম, সেই অমৃত পান করতে আমি অক্ষম, তাই নারী মাত্রেরই বড় লোভের সামগ্রীর আশা আমি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছি, পাছে আমার সন্তান দেশের জাতির অকল্যাণ আনে। তাই মা হয়েও সন্তানের মরণ-বর কামনা ছাড়া কিছু করতে পারিনি!

কিন্তু আমার মধ্যে নারীত্ব জাগ্রত এখনও! মাতৃত্বের মধুর আস্বাদও উপলব্ধি করেছি! আমি এই দুটী জিনিষ দেশের জাতির সমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করতে চাই। কিন্তু আমাকে প্রথমেই ক্ষুদ্র সমাজ-বন্ধন আগে ছিন্ন করতে হবে, নইলে যে অধিকারের দাবী আসবে। তাই আমায় সর্ব্বাগ্রে স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। ওগো স্বামী, আমায় মুক্তি দাও।......

না, না, তোমাদের নীতি-কথা, ধর্ম্মকথা, সমাজ-বন্ধনের কথা শুনব না আমি, শুনতে চাই না, শুনে শুনে ক্লান্ত হয়েছি! ইচ্ছা হয়, তোমরা আমাকে ঘৃণা কর, অবজ্ঞা কর, লাঞ্ছিত কর, আশ্রয়চ্যুত কর, আমি সব সহ্য করব, তোমাদের বিরুদ্ধে একটী কথাও বলব না...

একটী কথাও না। আমি আমার পথ খুঁজে পেয়েছি। ঐ নারীত্বের আলোকমণ্ডিত স্নিগ্ধ মধুর রশ্মি দেখতে পাচ্ছি,—আমায় স্নান করতে দাও—পবিত্র হতে দাও। সত্য আমায় ডাকছে,—আমায় যেতেই হবে, আমি যাবই, শুধু দয়া করে আমার বন্ধন মুক্ত কর, আমায় মুক্তি দাও গো!

শ্রীসুধাংশুভূষণ দাশ গুপ্ত।

সঙ্কলন

ভূমি-সংগ্রহ

নগরের বর্ত্তমানে কি কি প্রয়োজন আছে এবং ভবিষ্যতেও তাহার কি কি সম্ভাবনা থাকিতে পারে এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া নগরের যথোপযোগী বিন্যাস করিতে হয়। তাহা হইলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, বাণিজ্যাদির প্রকার ও সুবিধা, পৌরবাসিগণের বৃত্তি ও প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখা স্থপতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। রাজ্যশাসন এবং নগরের পরিরক্ষার সুবিধা অসুবিধার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হয়। এতগুলি বিষয় বিবেচনা করিয়া তবে নগরের স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয়।

ময়মত এবং মানসার শিল্পশাস্ত্রের মতে ভূমির বর্ণ, গন্ধ, রস, আকার, দিক্, শব্দ এবং স্পর্শ পরীক্ষা করিয়া স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয়। গুণের তারতম্যানুসারে ভূমিরও জাতিভেদ আছে। শ্বেতবর্ণ, 'উদুম্বর-দ্রুমোপেত', 'উত্তরপ্রবর্ণ', 'কষায়মধুর', বর্গভূজ ভূমিই শ্রেষ্ঠ, সুখপ্রদ। এই ভূমিকে ব্রাহ্মণভূমি (অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত অথবা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভূমির মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণকল্প) কহে। রক্তবর্ণ, 'তিক্তরসান্বিত', 'প্রাঙনিম্ন', 'প্রবিস্তীর্ণ', 'অশত্থদ্রুম-সংযুত,' প্রস্থাপেক্ষা অষ্টমাংশ অধিক দীর্ঘ, ক্ষত্রিয়ভূমি প্রশস্ত ও সর্ব্বসম্পদ্‌কর। পীতবর্ণ, অম্লরসযুক্ত, প্লক্ষদ্রুমশালী, পূর্ব্বাবনত, প্রস্থাপেক্ষা ষড়ংশ অধিক আয়ত, বৈশ্যভূমি শুভদ। কৃষ্ণবর্ণ, প্রাক্‌প্রবণ, কটুকরসী, বটবৃক্ষযুক্ত, চতুরংশাধিক দীর্ঘ শূদ্রজাতিগণের পক্ষে প্রশস্ত ভূমি ধনধান্যসমৃদ্ধিকর।

ময়মতের ভূপরীক্ষা অধ্যায়ে ভূমির গুণাগুণ নির্ণয় করা হইয়াছে। দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে উন্নত অর্থাৎ পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে নিম্ন ভূমি অনিন্দ্য। যে ভূমিতে আঘাত করিলে ঘোড়া, হাতী, বীণা, বেণু, সাগর কিংবা দুন্দুভির মত ধ্বনি হয়; যাহা পুন্নাগ, জাতিপুষ্প, পদ্ম, ধান্য, পাটলাদি বৃক্ষে আমোদিত; যাহাতে সকল রকমের বীজ সহজে গজাইয়া উঠে; যাহার বর্ণ একরকম, যাহা ঘন, স্নিগ্ধ, সুখস্পর্শী, সেই ভূমিই শুভ ও শ্রেষ্ঠ। তাহার চারিদিকে জল থাকিলে (প্রদক্ষিণোদকবতী) ভাল হয়। পুরুষের হাত তোলা পর্য্যন্ত গভীর ভাবে (অর্থাৎ চারি হাত.) খনন করিলে যদি জলের দেখা পাওয়া যায়, সেই ভূমি মনোরম। নিষ্কপাল, নিরুপল, কৃমিবল্মীকবর্জ্জিত, অস্থিশূন্য, অসুসর, স্বল্পবালুকাযুক্ত হইলে পুরভূমি প্রশস্ত ও শুভ হয়। নরাস্থি-কপালপূর্ণ, অঙ্গারবহুল, নানা শূল, বৃক্ষমূলাদিতে পরিপূর্ণ, পঙ্কময়, নষ্টকূপযুক্ত, দারুলোষ্ট্রসঙ্কুল, কঙ্করময়, ভস্মপূর্ণ, গর্ত্তবহুল, অনুর্ব্বর, তুষাল কৃমিযুত এবং কণ্টকি-বৃক্ষ-পরিপূর্ণ ভূমিতে নগর-স্থাপন করিতে নাই। যে ভূমি হইতে দধি, ঘৃত, মধু, তৈল, রক্ত, শব বা মৎস্যের দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়, তাহাও বর্জ্জনীয়। বৃত্তাকার, ত্রিকোণাকৃতি, বিষমাকৃতি, অষ্টভুজাকৃতি, কচ্ছপোন্নত, চণ্ডালাবাসসমীপস্থ, চর্ম্মকারালয়াশ্রিত, নিম্ন, সর্পপরিপূর্ণ, শ্মশানকল্প স্থানের বাস্তুবিদগণ নিন্দা করিয়াছেন। ময়মুনি নিম্নলিখিত শ্লোকে এক কথায় যোগ্য ভূমির উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াছেন।

> শ্বেতাসৃক্‌পীতকৃষ্ণা হয়গজনিনদা ষড়্‌রসা চৈকবর্ণা
> গোধান্যাম্ভোজগন্ধোপলতুষরহিতাবাক্‌কৃতীচ্চোন্নতা যা।
> পূর্ব্বোদগ্‌বারিসারা বরসুরভিসমা শূলহীনাস্থিবর্জ্যা
> সা ভূমি সর্ব্বযোগ্যা কনদররহিতা সম্মতানৈমু নীন্দ্রৈঃ।

পুরভূমির প্রবনতার গুণাগুণ সম্বন্ধে ভোজদেব যুক্তি-কল্পতরুতে লিখিয়াছেন, ভূমি দক্ষিণপ্লাবী হইলে রোগকৃদ, উত্তরপ্লব হইলে ধনদ, পশ্চিমপ্রবন হইলে ভূমি সুখসম্পত্তিনাশন হইয়া থাকে। সকল শিল্পশাস্ত্রেই আছে, পূর্ব্বপ্রবনভূমি শুভকর; কারণ ইহাতে প্রাতঃসূর্য্যের উল্লাসকর কিরণজাল সমস্ত নগরকে আলোকিত করিয়া তুলিবার পক্ষে সুবিধা হয়। তারপর নগরের মলিন জলাদি পূর্ব্বদিকের পরিখায় গিয়া পড়ে। রৌদ্রতাপে তাহাদের অস্বাস্থ্য-জনক বিষবাষ্প ও দুর্গন্ধ অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন বাটীর পূর্ব্বভাগের পুষ্করিণীর জল পশ্চিম ভাগের পুষ্করিণীর জল অপেক্ষা নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্য পর্ব্বতের পশ্চিম দিকে নগর স্থাপন নিষিদ্ধ; কারণ সূর্য্যোদয়ে তাহাতে ছায়াই পড়ে (প্রাচ্যাং নিষিদ্ধো হি গিরিঃ তচ্ছায়াপ্যুদয়ে রবেঃ—শিল্পরত্ন)। একই কারণে পশ্চিমপ্রবন স্থান বর্জ্জনীয়। ভূমি উত্তরপ্লবন হইবার কারণও খুব সম্ভবতঃ এই। কারণ দক্ষিণপ্লাবী হইলে সহরের সমস্ত ময়লা জল দক্ষিণের খাতে গিয়া পড়িবে। সকলেই জানেন, ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে নানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয় এবং সে সময় দক্ষিণ দিক্ হইতে বাতাস প্রবাহিত হয়। কাজেই দক্ষিণদিকৃস্থ পরিখার অস্বাস্থ্যকর বাষ্প সহরে বায়ুতাড়িত হইয়া আসিলে উহাও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে। কারণ দ্রব্যাদি গ্রীষ্মকালেই বেশী পচিয়া যায়। কিন্তু উত্তরপ্লবন হইলে এই দোষ অনেকটা থাকে না। শীতকালে দ্রব্যাদি কম পচে, কাজেই শীতকালের উত্তরের হাওয়ায় সহরের তেমন অনিষ্ট করিতে পারে না, আর গ্রীষ্মকালে উত্তরদিকৃস্থিত পরিখার দুর্গন্ধ বাষ্প সহরের বাহিরের দিকে চলিয়া যাইবে। কিন্তু ভারতে দক্ষিণদ্বারী গৃহই প্রশস্ত; কারণ এই গরমের দিনে না বলিলেও চলে।

ভূমির দৃঢ়তা নির্ণয়ের প্রণালী বলিতেছি। এক হাত গভীর একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া, তাহা জলে পরিপূর্ণ করা হউক। তারপর সেই গর্ত্ত হইতে একশত পা দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়া আবার

ফিরিয়া আসিলে যদি দেখা যায় গর্ত্তে জল, ধার হইতে অতি সামান্ত (এক যব পরিমাণ) কমিয়া গিয়াছে, তবে সেই ভূমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি চারিভাগের একভাগ কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহা মধ্যম। গর্ত্তটী অর্দ্ধপূর্ণ থাকিলে উহা নিকৃষ্ট। ময়মুনি এই প্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন, সন্ধ্যাবেলা গর্ত্ত জলপূর্ণ করিয়া পরদিন প্রাতে দেখিতে হইবে। যদি জলের "অবশেষ" দেখা যায়, তবে উহা সর্ব্বসম্পৎকারী। ক্লিন্ন (অর্থাৎ কর্দ্দমময়) দেখা গেলে উহা বাস্তবিনাশক এবং শুষ্ক দেখা গেলে উহা ধনধান্যক্ষয়কর। উল্লিখিত পরীক্ষার যুক্তিবত্তা সহজেই অনুমেয় ভূমি দৃঢ় অথচ কৃষির উপযুক্ত কিনা, সরস কিনা এবং মাটীর নীচে কূপাদি খনন করিলে জল পাওয়া যাইবে কিনা তাহা ঠিক করিবার জন্যই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য।

শিল্পরত্নকার উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে ভূমির নামকরণ ও শ্রেণী-ভাগ করিয়াছেন। বৃক্ষ, নিম্ব, অর্জ্জুন, বকুল, অশোক, প্রভৃতি তরুশোভিত; মালতী, চম্পক, তিল, খদির প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষামোদিত; শৈলশিখর বা শৈলপার্শ্বে স্থিত; স্বল্পতোয়া, পুষ্টিদাত্রী ভূমিকে পূর্ণা কহে। কর্পূর, অগুরু, নারিকেল, কদম্ব, অর্জ্জুন, কেতক, কুশ, স্থলপদ্ম প্রভৃতি পরিশোভিত, পূর্ব্বোদগ্‌বারিসারা বহুজলা ভূমিকে সুপদ্মা কহে। বারিধিতীরে অথবা নদী বা তীর্থের দক্ষিণে স্থিত, শস্যক্ষেত্রবিচিত্র, দিকে দিকে যজ্ঞতরুশোভিত, পুষ্পফলপ্রবাল-তরুকীর্ণ উদ্যান-মনোরম, যজমানগণের প্রীতিপ্রদ ভূমিকে ভদ্রা কহে। অর্ক, বেণু, বিভীতক, স্নুহিশীল (exuding) শ্লেষ্মাতক প্রভৃতি বৃক্ষসঙ্কীর্ণ, বহুশর্করা, কঠিন কিংবা গর্ভান্বিত (গর্ত্তপূর্ণ কিংবা ফাঁপা), সোষর, গৃধ্রশ্যেনবরাহবায়সশিবাবানরজুষ্ট, যজমানের অনিষ্টকারক ভূমিকে সূরিগণ ধুম্রা আখ্যা দিয়াছেন। শিল্পরত্নকার আরও এক প্রকারে শ্রেণীভাগ করিয়াছেন। দোষগুণানুসারে তাহাদিগকে তিনি বারুণী, ঐন্দ্রী, আগ্নেয়ী, বায়বী সংজ্ঞা দিয়াছেন।

নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩৩০। শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত।

কচুরিপানা-জাত রং

কচুরি-পানার (water hyacinth) উপদ্রবে পূর্ব্ববঙ্গের জলপথে গমনাগমন করা যে কিরূপ বিষম কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে, এবং ধান্য ও অন্যান্য শস্যের পক্ষেও ইহা যে কিরূপ ক্ষতিকারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। কচুরির উপদ্রবে দেশের লোক উপায়হীন; সুতরাং উহাকে সকলেই অতি তুচ্ছ জঞ্জাল এবং বড়ই অনিষ্টকর ও অনাবশ্যক-পদার্থ বলিয়া মনে করিতেছেন। কচুরির অনিষ্টের কথা সকলেই বলেন; কিন্তু আমরা উহার ইষ্টের কথা শুনাইতেছি। কচুরি যে বিধাতার অযাচিত কৃপাদান, বিক্রমপুর ইছাপুরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নবকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আবিষ্কৃত কচুরিপানা-জাত নানা-বিধ রংই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার গবেষণার ফলে, দেশের দারুণ শত্রু এক্ষণে নানাবিধ রঙের ও কালির উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে! মুখোপাধ্যায় মহাশয় কচুরি হইতে হরিদ্রাবর্ণের একরূপ এসিড্ প্রস্তুত করিয়াছেন; এবং এই এসিড্ ও হিরাকসের নানা পরিমাণের সংমিশ্রন দ্বারা নানাপ্রকার রং প্রস্তুত করিতেছেন। নবকান্ত বাবু কচুরীপানার শিল্পোচিত-ব্যবহার আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান-রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া-ছেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার আবিষ্কৃত কচুরির এসিড্ হইতে বহুপ্রকার রং ও কালি প্রস্তুতের প্রক্রিয়া দেখাইয়া বিস্ময়ান্বিত ও মুগ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত কচুরিপানা-জাত কালি টাইপ-রাইটারের ফিতায় এবং ষ্টাইলো, ফাউন্‌টেইন্ পেন প্রভৃতিতেও ব্যবহার করা যায়। এই উদ্ভিজ্জাত কালি বিদেশী কালি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং অতি সুলভ। নবকান্তবাবু নানা রঙের কালি বড়িই প্রস্তুত করিয়াছেন; নবকান্তবাবু বলিয়াছেন যে তিনি কচুরিপানা হইতে চিনিও প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু কচুরিতে শর্করার ভাগ, ইক্ষু শর্করার তুলনায় অতি কম বলিয়া ইহার মূল্য সুলভ হয় না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কচুরি হইতে নানাবিধ মূল্যবান্ পদার্থই ভবিষ্যতে আবিস্কৃত হইবে।

কৃষি-সম্পদ, বৈশাখ ১৩৩০।

মাতৃমন্দিরের পরিকল্পনা

অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাই কি আজ দেশের সব চেয়ে বড় সমস্যা নয়? ঘরের ভাত কাপড়ের অনাটনেই না পুরুষ আজ বিদেশীর দুয়ারে আপনাকে বাঁধা রেখেছেন! পুরুষের নিজের পরিশ্রমের উপার্জ্জনে সংসার কুলায় না—পুরুষ সংসারের দায়ে এতই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন যে, পরিবারের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য সুশৃঙ্খলে করতে তাঁর সুযোগ হচ্ছে না। ফলে স্ত্রীজাতি সেই আদি যুগের গতানুগতিক ভাব ধরেই পড়ে আছেন।

একশত বছর পূর্ব্বে ঘরে ঘরে চরকা কাটা একটা নিত্যকর্ম্ম ছিল। মেয়েরা দিবসের অর্দ্ধেক সময় সংসারের কর্ম্ম ক'রে বাকী অর্দ্ধেক সময়টা চরকা কেটে সংসারের আনুকূল্য করতেন; কাল-বৈচিত্র্যে সেটীও আমরা হারিয়েছি। স্ত্রীজাতিকে অনেক কাজ করতে হবে। যাতে তাঁরা পুরুষের কাজে সাহায্য করতে পারেন, অবস্থা-বিশেষে উপার্জ্জন-শীল কার্য্য করতে পারেন, তাঁদের এমন শিক্ষা দিতে হবে। কি কি কাজ তাঁদের শেখবার উপযোগী, তা কাজ ধরলে ঠিক হবে।

প্রত্যেক সহরের উপপ্রান্তে খুব বড় স্থান নয়ে মেয়েদের নানা রকম কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য শিক্ষালয় স্থাপন করা হোক্। এখানে গৃহকর্ম্ম, জ্ঞান চর্চ্চা, সেবা-শুশ্রূষা, শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি আমাদের দেশের উপযোগী যত রকম মেয়েদের কাজ হতে পারে তার বিধান করা হোক। এটা শুধু মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হলে চলবে না, এখানে শিক্ষা দিবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ সবাই থাকবেন। অনেক পুরুষ-শিল্পী শিক্ষক দরকার হবে। এখানে যে-কোন বয়সের কুমারী, সধবা, বিধবা সকলেই শিক্ষা পাবেন। এই স্ত্রী-শিক্ষালয়টী গড়তে হবে দেশের মেয়েদের দুরাবস্থার দিকে তাকিয়ে—বিশেষতঃ অনাথা বিধবাদের বিষয় চিন্তা ক'রে। মেয়েরা যাতে ভবিষ্যতে বিলাসের পথে না যান, যাতে আড়ম্বরশূন্য সহজ জীবন যাপন কর্ত্তে পারেন, যাতে দেশের ও দশের কাজে সহায়তা করতে পারেন, যাতে কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জনের জন্য কোন একটা শিল্পকর্ম্মে অভ্যস্ত হন, এ-সব বিষয়ে লক্ষ্য রেখে এঁদের কাজ শেখাতে হবে।

মেয়েরা এইভাবে শিক্ষা পেলে গরীবের ঘরে বিয়ে হলেও সংসার চালাবার ভাবনা থাকবে না, আর বিয়ে না হলেও গৃহ-শিল্পের সাহায্যে বেশ অনায়াসেই সংসার চালাতে পার্ব্বেন। বাংলার মেয়েরা বহুদিন থেকে গৃহ-শিল্প ছেড়ে দিয়েছেন, তাই নতুন করে আরম্ভ করলে প্রথমে একটু অসম্মানের কাজ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষিত দেশের মেয়েরাই নানা রকম শিল্প কার্য্য করে থাকেন। শিল্পকর্ম্ম বর্ত্তমানে সব চেয়ে দরকারী কাজ ও সবচেয়ে সম্মানের কাজ।

অনেকের পক্ষে দূরে শিক্ষালয়ে গিয়ে কাজ শিক্ষা করা সুবিধা-জনক হবে না, তাঁদের পক্ষে সহজ কর্ম্ম এই—যে-বাড়ীতে ৫।৭ জন মেয়েদের বসবার মত স্থান আছে, তেমন বাড়ীতে চরকা নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। পরে যে যে কাজ হতে পারে, তার চেষ্টা করতে হবে। কি সহরে কি পল্লীগ্রামে সবস্থানেই এ ব্যবস্থাটী খুব সহজেই হতে পারে। পরে দরকার হলে এঁদের মধ্যে থেকে কেউ নারী-শিক্ষালয়ে গিয়ে কাজ শিখে এঁদের শিক্ষা দিতে পারবেন।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে,—

কাপড়ের সুতাকাটা, অন্য কার্য্যের জন্য মোটা সুতা কাটা, সুতার দড়ি, পাটের সুতা ও পাটের দড়ি প্রস্তুত, কাপড় গামছা, গেঞ্জি মোজা, বোনা, দড়ি ও ক্যাম্বিসের জুতা তৈরী, ছাতার কারখানা করা ও সকল রকম সেলাইএর কাজ। কাগজের বাক্স, ছোট কাঠের বাক্স, জুয়েলারী বাক্স, বোতাম তৈরী, কাঠ রবার-ফিতে-যোগে খড়ম তৈরী, বই খাতা তৈরী, হস্তীদন্তের সেফটীপিন, ব্রোচ, খেলনা, শাঁখা তৈরী, টিনের সো-কার্ড লেখা, সাইন বোর্ড লেখা। মেসিনের সাহায্যে সহজ জুয়েলারী গহনা তৈরী, নিব তৈরী, দেশলাই তৈরী, নানা রকম জিনিষের ট্যাবলেট তৈরী, লজেঞ্জেস তৈরী। ঢেঁকির সাহায্যে ধানভানা, চিঁড়ে মুড়ি খাবার ও নারিকেলের খাবার তৈরী। নানা রকম কবিরাজী ঔষধ, কালী, তেল, সাবান, এসেন্স তৈরী। নানা রকম আচার, জেলি, চাটনী, রান্নার মসলা তৈরী। এসমস্ত ভাল করে তৈরী হলে বিক্রির অসুবিধা হবে না। বিশেষতঃ নারী শিক্ষালয়ের প্রস্তুত বলে আরও আদরে কাটবে। এসব জিনিষ তৈরী ভিন্ন আরও অনেক সুন্দর সুন্দর শেখবার কাজ আছে,—যেমন জুয়েলারী এনগ্রেভিং—সোনার গহনার উপর সূক্ষ্ম অস্ত্র দ্বারা লতা ফুল, প্রভৃতি আঁকা। এই কার্য্য শিক্ষা করতে ২।৩ বৎসর সময় লাগে, শিখলে ঘরে বসে মাসে অন্ততঃ যেমন তেমন করে শ'খানেক করে টাকা আয় হতে পারে। ভাল এনগ্রেভার মাসিক তিন চারিশত টাকা পর্য্যন্ত উপায় করেন। এগুলি মেয়েরাই ভাল পারবেন বলে আশা করা যায়।

এই সমস্ত শিক্ষার জন্য নারী-শিক্ষালয়কে প্রথমতঃ ২।৩ বৎসরের জন্য পুরুষ-শিল্পীর সাহায্য নিতে হবে, পরে নারী শিল্পী গঠিত হলে তাঁরাই আবার অন্য ছাত্রীদের শেখাতে পারবেন। তবে এই সংক্রান্ত বাহিরের তত্ত্বাবধান (management) বরাবর পুরুষরাই করবেন।

এর জন্য টাকা কোথা হতে আসবে ঠিক বলা যায় না, তবে এটা বলতে পারি প্রাণের ইচ্ছা থাকলে টাকা প্রভৃতি কোন কিছুরই অভাব হবে না।

মাতৃ-মন্দির, ভাদ্র ১৩৩০। শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

গান

পুব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি!
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুর-ভরা তরী।
ব্যথা আমার কূল মানে না, বাধা মানে না;
পরাণ আমার ঘুম জানে না, জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অকূল-পানে
তোমার গানে আমার গানে
ভেসে যাবে রসের বাণে আজ বিভাবরী।

প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্কিমচন্দ্র

* * * ভারতবর্ষের পুরাতন যুগে যখন আমরা সজীব ছিলাম তখন গ্রীসের সঙ্গে রোমের সঙ্গে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের শুধু বস্তুপণ্যের নয় চিত্ত-সামগ্রীরও আদানপ্রদান ঘটেছিল। আমাদের মধ্যে অনেকে ভারত-সভ্যতার একান্ত অবিমিশ্রতার স্পর্দ্ধা করে

ঘোষণা করতে চেষ্টা করেন যে, আমরা কিছুই গ্রহণ করিনি। বড় লজ্জার কথা যদি গ্রহণ না করে থাকি। অন্তত আজকের দিনে আমরা গৌরব করে বলতে পারি, যে, য়ুরোপের বিদ্যা আমাদের প্রাঙ্গণের সামনে আসবার আরম্ভক্ষণেই বাংলাদেশ তাকে সমাদর করতে প্রস্তুত হয়েছিল। কোনো নূতন সত্য যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করে তখন গতানুগতিকের দলরা তাকে প্রাণপণে অস্বীকার করে, — যাঁদের উদার আত্মার মধ্যে সত্যের যাচাই সহজেই হয় সেই মহাত্মারাই তার আহ্বানে সাড়া দেন, তাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। বাংলাদেশে রামমোহন রায় দিয়েছিলেন। তিনি গ্রহণ করেছিলেন, বর্জ্জন করেন নি। গ্রহণ করেছিলেন মানে তিনি যে কেবল বিদেশের সামগ্রীকেই বর্জ্জন করেননি তা নয়, নিজেদের সারবিদ্যাকেও বর্জ্জন করেননি। তাঁর যে শক্তি তাঁর স্বদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পৎকে আয়ত্ত করেছিল সেই শক্তিই তাঁকে প্রবৃত্ত করেছিল বাইরের সম্পৎকে গ্রহণ করতে।

বাংলা দেশের মধ্যে নবযুগের স্বাতন্ত্র্যবোধের বাণী যাঁদের হৃদয়ে এসে পৌঁচেছিল তাঁদের প্রথম দৃষ্টি পড়েছিল কোন্ বন্ধনের পরে? সকলের চেয়ে বড় বন্ধন আমাদের দেশে সেই ধর্ম্ম যা প্রধানত আচার-মূলক হয়ে গিয়ে মানুষের চিত্তকে অবরুদ্ধ ও পরস্পরের সঙ্গে তার যোগকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বাহ্য আচারের জড় অভ্যাসে ভারতবর্ষ যে কেবল কর্ম্মক্ষেত্রেই পরাস্ত হয়েচে তা নয়, তার বুদ্ধিবৃত্তিও বাঁধা-বাধা হয়ে নিশ্চল ও অন্ধ সংস্কারে দূষিত হয়েচে। এই কারণে, স্বাধীনতার জন্যই আমাদের চিত্তে যে আকাঙ্ক্ষা নূতন জাগ্রত হয়ে উঠেছিল দেশের অন্ধ আচারমূলক ধর্ম্মের বন্ধনই সর্ব্বপ্রথমে ও সকলের চেয়ে বড় করে তাকে আঘাত করেছিল। তাই এই স্বাধীনতার ঔৎসুক্য ধর্ম্মসংস্কারের প্রয়াসেই আপনাকে প্রথম প্রকাশিত করেছিল তাতে দেশে তুমুল ক্ষোভ উৎপন্ন হয়েছিল।

নবযুগের য়ুরোপের ধাক্কায় আমাদের মনে যে একটা প্রকাশের উদ্যম জেগেছিল তার মধ্যে বয়সের ক্রমবিকাশ আছে। প্রথম বাল্য-অবস্থায় কৌতূহল ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মানুষকে বাইরের জিনিষ সংগ্রহে নিযুক্ত করে। তখন সে যা শিখেচে তাই নিজে আওড়ায় এবং অন্যকে শোনাতে থাকে। এটা যেন ইস্কুলের বালক এবং ইস্কুলের মাষ্টারের সংযোগে পাঠ্য বিষয়ের উৎপত্তি। বাংলা দেশে তেমনি নবসাহিত্যের আদিযুগ প্রধানত চারুপাঠ, বস্তুবিচার, বোধোদয়, সীতার বনবাস রচনার দিন ছিল। বস্তুত তখনকার সাহিত্য, সম্প্রদায়ের সাহিত্য নয়, তা পাঠ্য পুস্তকের সাহিত্য। পাশ্চাত্য বিদ্যা যাদের প্রথম থেকে শিক্ষা দিতে হবে তাঁদেরই দাবী তখন সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল। এই অবস্থাকে একেবারেই উত্তীর্ণ হওয়া কারো সাধ্য ছিল না, এবং এর ভিতর দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তখনকার কালের গদ্যভাষা যেন হামাগুড়ির অবস্থা থেকে সবে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করচে। এই অপরিণত বাংলা গদ্যেই রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখ্‌লেন তখন তাঁকে গদ্য বাক্যবিন্যাসের পদ্ধতি সম্বন্ধে পাঠকদের বুঝিয়ে লিখ্‌তে হয়েছিল। স্বভাবতই সাহিত্যের এই আদিপর্ব্বটি ভিৎ খোঁড়ার এবং মাল মসলা সংগ্রহ করার পর্ব্ব।

তারপরে তখনকার কালের অগ্রণীদের মধ্যে অন্তত রামমোহন রায়ের এবং আমার পিতৃদেবের মধ্যে স্বজাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রতি সুগভীর একটি নিষ্ঠা ছিল তা যদি না থাকত বড় বিপদ হতো। তখন পশ্চিম দেশের শিক্ষার জোয়ার বিপুল শক্তি নিয়ে আমাদের মনকে ভিটেছাড়া করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং যদি তাদের নিজেদের একজায়গায় প্রতিষ্ঠা না থাকত, তাহলে তাঁরাও ভাসতেন এবং অন্যকেও ভাসাতেন। এই যে স্বজাতির প্রতি নিষ্ঠা এটা তাঁদের ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা খর্ব্ব হয়েছিল এটা যেন কেউ মনে না করেন। তাঁদের সে সম্বন্ধে একটা তীব্র বোধশক্তি ছিল বলে আমি ত জানি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষত্ব কি? তিনি আজীবন কি এনে দিয়েছেন আমাদের সামনে? বাল্যকাল আমাদের পার হয়ে গেল যেই, যৌবনের বার্ত্তাটি এসে পৌঁছল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে। তার আগে আমরা সকলে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা ছিলাম ইস্কুলের ছেলে। বঙ্কিম বললেন, তোমরা ইস্কুলের ছেলে নও তোমাদের বয়স হয়েছে। যেই তিনি খবর দিলেন সকলে চমকে উঠে পড়লো: বললে, আমাদের যৌবন এসেছে। দেশসুদ্ধ লোককে এই বলানো এবং ভাবানো এইটেই আমার কাছে মনে হয় বঙ্কিমের সকলের চেয়ে বড় কীর্ত্তি। একেই বলে সোনার কাঠি ছোঁওয়ানো। কোনো বাহ্য সামগ্রী দেওয়ার চেয়ে বড় নাম হচ্চে জাগরণ দান।

সাহিত্যের মন্দিরে message নামক পদার্থটিকে সর্ব্বোচ্চ চূড়ার মত খাড়া করে তোলা আমি ভাল বুঝিনে। বঙ্কিমের আনন্দমঠে হোক বা দেবীচৌধুরাণীতে হোক বঙ্কিম কি পরিমাণ ইংরাজ রাজত্ব স্বীকার করেছেন, কি পরিমাণে করেননি সে সব তর্কের কথা, রসের কথা নয়। আনন্দমঠের শেষকালে বঙ্কিম বলেচেন যে ইংরেজ রাজত্বে আমাদের দরকার ছিল, কেননা তার সাহায্যে আমাদের বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান লাভ হবে। আমি হয়তো বলবো বরঞ্চ ইংরাজ আমাদের য়ুরোপীয় সভ্যতা থেকে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত করেছে; যেহেতু পরিবেষণের ভার তার উপরে; সেই জন্যেই সম্পূর্ণ করে আমাদের পাতে য়ুরোপের জ্ঞান সে দেয় না। অতএব ও জন্য আমি কৃতজ্ঞ হতে রাজী নই। এইত জাপান য়ুরোপীয় শাসনকে হাতির পিঠে মাহুতের মত মাথায় করে নেই বলে কি য়ুরোপীয় সভ্যতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে? যাই হোক, এ সব হল তর্কের কথা, এই যাকে বল মেসেজ। কিন্তু সাহিত্য তো তর্কের কথা নয়। সাহিত্যে আনন্দরূপের সৃষ্টি হয়, তা ভুল মেসেজ নিয়েও হতে পারে। আমি সেখানেই আনন্দ পাই এবং সেখানেই

আমি বঙ্কিমের কাছে কৃতজ্ঞ যেখানে উনি মেসেজ দেননি, যেখানে উনি আপনার সৃষ্টি করবার আনন্দকে রূপ দান করেছেন। এই যে রূপদান করাটি কত বড় দান এটি বুঝতে হবে। এই রূপটি প্রাণের সহজ সৃষ্টি এবং এই রূপটিই প্রাণকে ধারণ করে থাকে। প্রাণের গুণ হচ্ছে সে স্তব্ধ থাকে না, সে নিয়ত আমাদের প্রাণকে উদ্বোধিত করে। প্রাণময় বাণী প্রাণের বাণী-উৎসকে উৎসারিত করতে থাকে। যে ভাষার মধ্যে নানা আকারে সাহিত্যের আনন্দরূপ বিরাজ করে সে ভাষার প্রাণশক্তি নিত্য সক্রিয়। সে ভাষা আপন প্রাণবেগের জোরেই সাহিত্য-রচয়িতার কাছ থেকে তার প্রাণের কথাটি পূর্ণ ভাবে টেনে নিতে পারে। আনন্দময় সাহিত্য ভাষাকে প্রাণময় জগৎ করে' তোলে, মেসেজের সে শক্তি নেই। এই জন্য সাহিত্য সংসারে আমরা তাঁদেরই নমস্কার করি, যাঁরা তাঁদের প্রতিভা থেকে সাহিত্যের ভিতর প্রাণের চিরন্তন সুর ঢেলে দিয়ে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের সাম্প্রদায়িক দিকে মনের মিল না থাকতে পারে, তাঁদের উপরে সামাজিক অসামাজিক নানা কারণে রাগও হতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, তাঁরা আমাদের মস্ত দান করেছেন, যা দিলেন এ আর কেউ দিতে পারতো না।

নব্যভারত, ভাদ্র ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ গগন-অঙ্গনে,
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।
দিক্-হারানো দুঃসাহসে
সকল বাঁধন পড়ুক খসে';
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে?
বেদনা তোর বিজুল-শিখা জ্বলুক অন্তরে,
সর্ব্বনাশের করিস সাধন বজ্র-মন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন,
ঝড় হবে সে পথের বাহন,
শেষ করে' দিস্ আপনারে তুই প্রলয়-রাতের ক্রন্দনে।

প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপান

জাপান, সৌখীন জাপান, শিল্পী—জাপান প্রকৃতির সাজানো বাগান, কালের নির্ম্মম ইঙ্গিতে এক নিমেষে আজ শ্মশানে পরিণত হইয়া গেছে! হায় মানুষের শক্তি,—সে এত ক্ষুদ্র যে বিজ্ঞানের কল-কৌশলে কিছুতেই জাপানকে বাঁচাইতে পারিল না।

জাপান আগ্নেয় গিরির দেশ; ভূমিকম্প সেখানে লাগিয়াই আছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর অন্তর একটা করিয়া ভীষণ ভূমিকম্প হয়, আর তার ফলে ক্ষতিও যে না হয় এমন নয়! তবে সে ক্ষতি সামান্য। এক তোকিও সহরেই বৎসরে গড়ে ৯৬ বার ভূমিকম্প হয়। উৎসাহী কর্ম্মী জাপানীর কাজের ভারেই বুঝি বাসুকির শির স্থির থাকে না! কাজেই জাপানের বাড়ী-ঘর সব কাঠের তৈয়ারী। তাহাতে ভূমিকম্পের বেগ সহিতে পারিলেও দৈবাৎ যদি আগুন লাগে তো পাড়া-কে-পাড়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। দমকলের ব্যবস্থাও জাপানে খুব ভালো নয়। ঘোড়ায় এঞ্জিন টানে—কাজেই কোথাও আগুন লাগিলে সাজসজ্জা করিয়া দমকল বাহির করিতেই ওদিকে সব জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায়!

হংকং পীক ট্রামওয়ে

সুবেশিনী

কুটীর
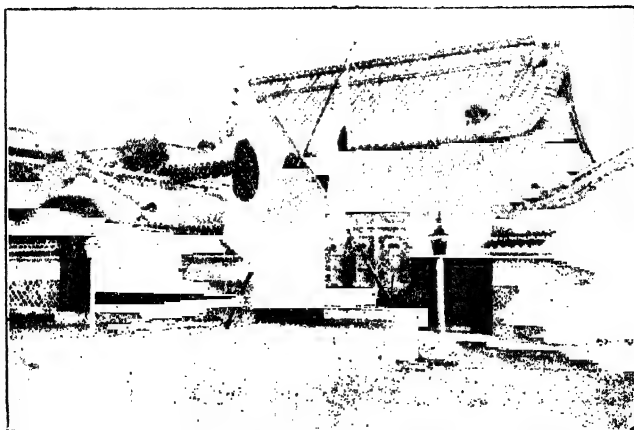
তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক

হাচিমান মন্দির

পীয়ারেস স্কুল

য়োশিওয়ারা

তোর

ফুলওয়ালী

নারী-বিশ্ববিদ্যালয়

সয়ায় ধরা

প্রধান কেন্দ্র ইয়োকোহামা বন্দর আজ জগতের বুক হইতে মুছিয়া গিয়াছে! তাদের বিরাট ঐশ্বর্য্য, সমারোহ, আনন্দ, বিলাস,—হাসি অশ্রু, পথ ঘাট, ট্রাম ট্রেণ, প্রাসাদ কুটীর, নাট্যশালা কারখানা, সব আজ ধূলিতে মিশাইয়াছে! তার উপর ভূমিকম্পের পর প্রলয়ের বিষাণ বাজিল, দারুণ জলোচ্ছ্বাসে, বিরাট অগ্নিদাহে। ভূমিকম্পে যা বাকী ছিল, তার কতক গেল আগুনের মুখে, কতক জলের কোলে! একসঙ্গে মরণের তিনটি দ্বার খুলিয়া গেল—ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিদাহ! এমন ব্যাপার জগতে আর কখনো কোথাও ঘটিয়াছে বলিয়া জানা নাই!
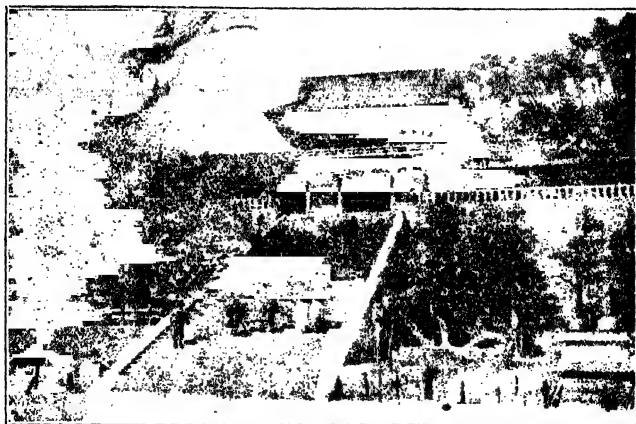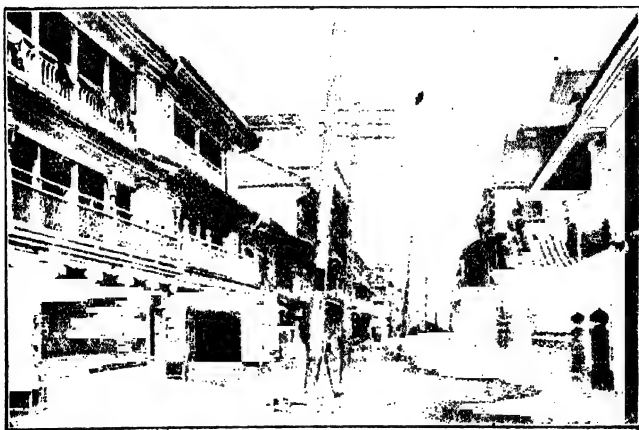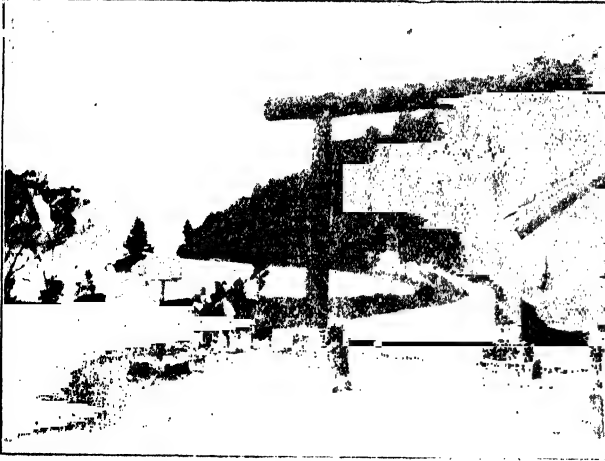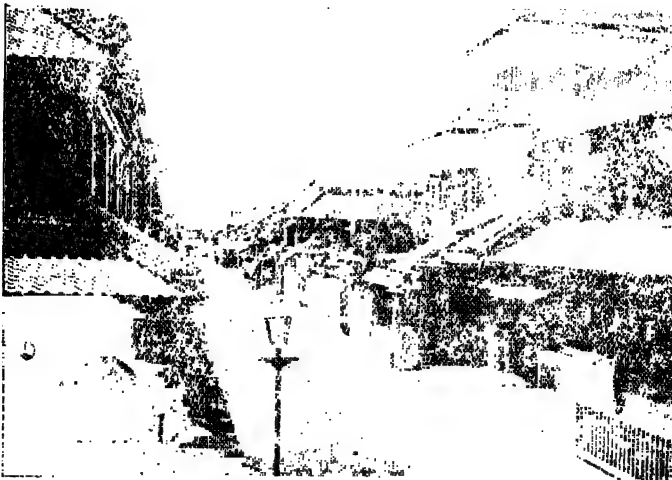
এবারে জাপানে ভূমিকম্প যা হইয়াছে, তেমন ব্যাপার বোধ হয় সুদূর অতীতে ঘটিয়াছে—সেই পম্পিতে। সহরে আমোদ-প্রমোদ বিলাস-লীলার অভিনয় জমিয়া উঠিয়াছে, সহসা আগ্নেয়-গিরির বিরাট অগ্ন্যুৎপাত—আর নরনারী, নায়ক-নায়িকা, ঘর-বাড়ী সব কোথায় মিলাইল! জাপানেও এবার ঠিক তাই ঘটিয়াছে। দারুণ ভূমিকম্পে দুই লক্ষের উপর লোক মরণ-পথের যাত্রী হইয়াছে। জাপানের রাজধানী প্রাচ্য জগতের বিরাট কর্ম্মশালা তোকিও শহর—এবং বাণিজ্যের

সাকুরা ফুলে-ভরা রমণীয় কানন, চেরির চারু কুঞ্জ, হাসি-গান কবিতার স্বপ্নপুরী আজ শ্মশান,—কল-কারখানার জালে-ঘেরা কর্ম্মী জাপানীর কোলাহল-ভরা জাপান আজ রুদ্রের রোষে অঙ্গারের স্তূপ!

জানিনা, কত শত বৎসরে জাপান আবার জাপান হইয়া উঠিবে!

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

পল্লীবর্ষা

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ছিপ্ ছিপ্ টিপ্ টিপ্
ঝর্ ঝর্ ঝরণার জল যেন ঝরছে!
আঁধিয়ার দুনিয়ার নিবে গেছে সব দীপ
কজ্জল নভ-তল পাংশুতে ভরছে!
এলো-মেলো জলো হাওয়া বন্ বন্ শন্ শন্
দোলা দ্যায় তোলা দ্যায় ঝাউবন দুলিয়ে—
কি যেন কি চাপা কথা, কি যেন কি ক্রন্দন
মন্থন করে মম সব কাজ ভুলিয়ে!
অম্বরে গম্ভীর আড়াঠেকা বাজলো
কেকারব উল্লাসে হল্লায় নাচ্ছে—
ঝলসিছে বিদ্যুৎ—আঁখি তার ঝাঁজলো
ঐ ফের ঝাপসায় বর্ষণ সাজছে।

খাল্-বিল জলভরা, থলভরা হরিৎ-এ
ঘর-ভরা পল্লীর কিশোরীর হাস্য—
যুবতীর-যুবকের যৌবন-সরিৎ-এ
যোগ দিল বাদলের মাতনের লাস্য!
কৃষাণীর কালো মেয়ে ছেলেগুলো কাঁদচে
জল ঠেলে প্রাণ ঢেলে কি ভোলায় ভুললো!
লাল-সাপলার মালা পাংশু ও লাল্‌চে
সুখ-ভরা বুক জুড়ে উল্লাসে দুললো!
পল্লীর বেণুবনে বেতসীর কুঞ্জে
মঞ্জুলে গাছে ঐ বর্ষার ঝর্ণা—
কভু হেরি কজ্জল-কালো মেঘ-পুঞ্জে
ছোগ্ দ্যায় কার তুলি সুবর্ণ-বর্ণা!

শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬

অনেক রাত্রে শৈল চোখ মেলিয়া চাহিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। শুইয়াই সে চারিদিকে আপনার অলস দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। জীবনের অত-বড় ব্যাপারখানা তার মন হইতে যেন কোথায় স্বপ্নের মত সরিয়া মিলাইয়া গিয়াছিল! চোখ মেলিয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর তার হুঁস হইল, সে কোথায় আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে, আর আসিবামাত্র তার মাথায় কত বড় বজ্রাঘাতই না হইয়া গিয়াছে! প্রচণ্ড একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে চোখ বুজিল। এ কি স্বপ্ন—সে কি স্বপ্নে চোখ মেলিয়া চাহিল? এ কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে; এই কোন্ নূতন অজানা ঘরে শুইয়া আছে! সে কি স্বপ্নে শুনিয়াছে—সেই অত-বড় কথাটা···যে কথার উপর তার জীবন-মরণ সমস্ত নির্ভর করিতেছে!

স্বামী···!

···সত্যই নাই? তার সারা বুক কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিল। সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল—সর্ব্বাঙ্গ তার ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে।

একে একে সব কথা তার মনে পড়িল। সেই প্রচণ্ড বৃষ্টি, বজ্রাঘাত আর বিদ্যুৎ-চমকের মধ্য দিয়া ট্রেনে চড়িয়া সে গ্রাম হইতে আসিয়াছে, এখানে, স্বামীর আহ্বানে! সেই ষ্টেশনে লোক-কোলাহলের মধ্যে নামিয়া কার দুটি সতৃষ্ণ চোখের সপ্রেম চাহনির আশায় চাহিয়া চাহিয়াও দেখা মেলে নাই—কত বড় আশা নিরাশায় পরিণত হইয়াছে! তারপর সেই জনহীন পথে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া এখানে আসিয়া নামিয়াছে—পা কি-রকম টলিতেছিল, বুক কি ভয়েই না কাঁপিতেছিল...আর নামিয়াই শুনিল...

—মাগো—বলিয়া শৈল ভূমে লুটাইয়া পড়িল। ততক্ষণে তার ঘোর কাটিয়াছে! সে বুঝিয়াছে, নাই গো নাই, স্বামী তার নাই! ··অবিশ্বাস হইল,—এ কি সত্য, না, সে এখনো জাগিয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে! নিজের গায়ে হাত দিয়া সে দেখিতে লাগিল, সে জাগিয়া না, ঘুমাইয়া এখনো স্বপ্ন দেখিতেছে। এত-বড় বিপদ...না, না, সে কি এমন পাপ করিয়াছে, কি অপরাধে অপরাধী সে, যে এত-বড় বিপদের বাজ ভগবান তার মাথায় অনায়াসে ফেলিয়া দিবেন!

ঘরে-ঘরে নর-নারীর মেলা—কি সুখ, কি আনন্দ, কি হাসির লহর বহিয়া চলিয়াছে গো—সে তো তত-খানির প্রত্যাশী নয়,—শুধু স্বামীর সান্নিধ্য, তাঁর একটু প্রেমের পরশ, এই সে চায়! তা হইতেও বঞ্চিত হইবে সে! জন্মদুঃখিনী, তার চোখের সামনে সুখের এ প্রলোভন ধরিয়া দিয়া চকিতে সেটুকু সরাইয়া লইবে, এতখানি নিষ্ঠুর বিধাতা কখনো হইতে পারে না!

কিন্তু না, না,—এ সত্যই! তার স্বামী চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে—আর ফিরিবে না, আর দেখা হইবে না! সে মুখ, সে চোখ··সে আজ অতীতের স্মৃতি!

শৈল ভাবিল, এত-বড় অসম্ভব কাণ্ডও সম্ভব হইতে পারে! আবার সে উঠিয়া বসিল, চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, এ তো ঘর! কিন্তু সে আসিয়া মাথায় বাজ ধরিয়াছিল বাহিরে,দাওয়ায়—এ ঘরে সে আসিল কি করিয়া!

তারপর একে-একে নানা কথা—অতীতের শত স্মৃতি, ভবিষ্যতের সহস্র কল্পনা তার বুকের মধ্যে উথলাইয়া উঠিল। এখানে বুকের কাছে আনিবার জন্য স্বামীর সে কি আগ্রহ, কি সাধ—এখানে সংসার পাতিয়া বসিবে, পয়সার অভাব দু জনে দু'জনের প্রাণের প্রেমে পূর্ণ করিয়া দিবে!...

তার দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। কাতর আর্ত্তস্বরে প্রাণটাকে চিরিয়া সে বলিল,—কেন তুমি চলিয়া গেলে গো! অভিমানে? সেই যে আমায় আনিতে গিয়াছিলে, আসা হইল না,—সজল চোখে নিবেদন ভরিয়া বলিয়াছিলে, এবারও তোমার যাওয়া হলো না! সেই অধীরতা, সেই ব্যাকুল কাতর কম্পিত কণ্ঠস্বর! উঃ!...একটা ঝড়ের ঝাপটা সব বাঁধন পলাইয়া হু-হু করিয়া তার মনটাকে দোলাইয়া

ছিঁড়িয়া একশা করিয়া দিল! ওগো সে অভিমানটাই তোমার এত বড় হইল যে বেচারী শৈলর মুখ না চাহিয়াই চলিয়া গেলে! তার আর কি রাখিয়া গেলে! ধরণীর ধূলায় মাথা তার লুটাইয়া দিয়া গেলে যে! তার সব কাড়িয়া, সব লইয়া তাকে একেবারে পথের দ্বারে নিঃস্ব করিয়া রাখিয়া গেলে! সে অভিমানের এত বড় শাস্তি দিয়া গেলে যে শাস্তির আর মাপ নাই। এমন শাস্তি যে তা আর ফিরানো যায় না!

শৈলর প্রাণটা যেন চুরমার হইয়া গেল। চারিদিককার বাতাস বন্ধ হইয়া গেছে, অসহ্য গুমট তার দম বন্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিল! মন হাঁপাইয়া উঠিল। তার সামনে হইতে সমস্ত বাহিরের বিশ্বখানা বিলুপ্ত হইয়া গেল। পাথরের পুতুলের মতই সে বসিয়া রহিল—তেমনি নিস্পন্দ, তেমনি অচেতন! মনে আর চিন্তার লেশমাত্র নাই,—জীবনের স্পন্দনটুকু অবধি যেন মুছিয়া গিয়াছে!

প্রৌঢ়া ভগবতী দেবী কাছেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন; হঠাৎ তিনি ঘুম ভাঙ্গিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিলেন; কেমন বিভ্রান্তের মত খানিক চুপ করিয়া রহিলেন; তারপর শৈলর কাছে আসিয়া ডাকিলেন,—বৌমা—

শৈলর চমক ভাঙ্গল। দুই চোখের জল রুখিয়া সে ভগবতীর পানে চাহিল।

ভগবতী বলিলেন —স্বপ্ন দেখছিলুম। মনে হল, পূর্ণ যেন ডাকলে—আমাদের যে এত-বড় সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, তা মনেও ছিল না!

তারপর আরো খানিক স্তব্ধ থাকিয়া ভগবতী দেবী আবার বলিলেন,—সত্যটা যদি স্বপ্ন হতো,আর স্বপ্নটা যদি সত্য হতো, মা! কথাটা বলিয়া তিনি একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিলেন।

শৈলর মনে হইল, সে নিশ্বাসে ভগবতী দেবীর মনটা বুঝি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল! তারও চোখের বাঁধ টুটিয়া গেল—দুই চোখে ধারা নামল।

ভগবতী বলিলেন,—এ যে সত্যই বিশ্বাস হয় না! জল-জ্যান্ত মানুষ কি আশা নিয়ে, কি হাসি-মুখে বাড়ীর বার হল—সে মানুষ আর ফিরল না!⋯ঐ হতভাগা মানুষ-খেকো গাড়ীর সৃষ্টি হয়েছিল আমাদেরি সর্ব্বনাশের জন্যে!

শৈলর মনে বিদ্যুৎ রেখার মত চকিতে অমনি ফুটিয়া উঠিল, সেই ষ্টেশনের সামনেকার দৃশ্য! 'এই মাগী' বলিয়া একখানা গাড়ী হইতে কে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল—সে চীৎকারে শৈল সরিয়া গেল—নহিলে ঐ গাড়ীতেই চাপা পড়িত!⋯আহা, কেন সে সতর্ক হইয়া সরিয়া গেল! তা যদি না যাইত তো ঐ গাড়ীর তলায় এই তুচ্ছ দেহখানা ফেলিয়া রাখিয়া সেও যে এতক্ষণে স্বামীর পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইতে পারিত! তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল সে সরিয়া আসিল? প্রাণের মমতা এতই—তার হয়তো, সে তাঁরই আহ্বান আসিয়াছিল—তাই গাড়ী তাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছিল! হয়তো গাড়ীটার পিছনে তিনিই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—গাড়ীটাকে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন নিজের হাতে—যে, এসো, এক-পথে একযাত্রায় অজানা পথের সাথী হইবে! কেন, কেন সে আহ্বান সে প্রত্যাখ্যান করিল! কেন সে গাড়ীর তলায় মাথা দিয়া পড়িল না! অত বড় সুযোগ—মিলনের অমন সহজ উপায়, তাও সে সর্ব্বনাশী অমন করিয়া হঠাইয়া দিল!

⋯সেবারে কলিকাতায় আসা সইয়ের বিবাহের বাধায় ঘটিয়া উঠিল না এবারও মহা-মিলনের অমন সুযোগ, তাও সরিয়া গেল! তার মত দুর্ভাগিনী আর আছে কোথাও! শৈলর সমস্ত অন্তর গুমরিয়া উঠিল নিজের উপর রাগে দুঃখে তার দুই চোখ ফাটিয়া ধারার পর ধারা ঝরিল।

ভগবতী বলিলেন, —তবু বুক বেঁধে তোমায় দাঁড়াতে হবে মা। এত-বড় বিপদে কাতর হলেও চলবে না।⋯ভগবতী থামিলেন। কি একটা বুকের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিয়া তাঁর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। থামিয়া আবার তিনি বলিলেন—বলছি বটে, কিন্তু মন কি শোনে! তার সে ক্ষমতা কোথায়⋯তবু মা, ঐ একরত্তি ছেলেটার পানে চেয়ে তোমায় দাঁড়াতেই হবে, সব করতে হবে, সব সইতে হবে—নাহলে তো চলবে না। ওটাকে মানুষ করে তুলতে হবে। তারি চিহ্ন! ওরি মধ্যেই তাকে পেতে হবে! তারপর দুই চোখের জল মুছিতে মুছিতে আবার বলিলেন,—আমার দেখ দিকি কপাল! নিজের সব হারিয়ে সব ভাসিয়ে পরের ধনে পিঠ দিয়ে দিয়েই সারা হলুম। খালি দুঃখ পাওয়া!...আমারো মরণ নেই...!

শৈল কাঁদিতেছিল, ভগবতী তার অশ্রুতে নিজের অশ্রু মিশাইয়া দিলেন। দুইজনের চোখের জল মিশিয়া সে এক মহাসিন্ধু রচিয়া তুলিল।

৭

সকালে মানুষের কলরব যখন সুপ্তি ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল, শৈল তখন একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। এই জনমানবের সামনে, এই কোলাহল-ভরা বিশ্বের সামনে সে নিজের দুর্ভাগ্য শিরে ধরিয়া দাঁড়াইবে কোন্ মুখে!...ছেলের মুখ চাহিয়া তবু দাঁড়াইতেই হইবে!—কিন্তু কি আশায়, কি ভরসায়।...

একদিন সে ভরসা ছিল—পূর্ণ যখন পাশে দাঁড়াইয়াছিল! দুইজনে দুইজনকে দেখিয়া আশার মস্ত প্রাসাদ গড়িয়া তুলিতেছিল! কল্পনার কি বিচিত্র রঙে সে প্রাসাদটিকে সুন্দর করিয়া তুলিতেছিল—হঠাৎ বজ্রাঘাতে সে প্রাসাদ পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল! আবার সে ঘর গড়িয়া তোলা, ঐ ছোট্ট বাবলাকে দেখিয়া! হায়রে, ও কতটুকু! তাছাড়া আশা-ভরসা করিতে সাহসও হয় না আর! শক্তিও নাই! তাকে মানুষ করা—তাহাতে প্রথম কথা, যেটা এই শোকের ঝড় ঠেলিয়াও গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে, সবার উপর সব চেয়ে হুঙ্কার তুলিতেছে—কোথায় এখন সে যাইবে, কোথাই বা থাকিবে—এই প্রথম কথাটার মীমাংসা হয় কি করিয়া! এখানে থাকা? সে তো সম্ভব নয়! দেশে? নিরাশ্রয়, দুর্ভাগিনী, সকল সৌভাগ্যের কাঁটা হইয়া কার বুকে এখন ফুটিবে গিয়া? আশ্রয় কোথায় মিলিবে!

ভগবতী এ সমস্যা ভাঙ্গিয়া দিলেন। দুপুর বেলায় জোর করিয়া শৈলকে স্নান করাইয়া তার মুখে দুইটা সন্দেশ গুঁজিয়া দিয়া ভগবতী বলিলেন,—একটা কথা ভাবছিলুম মা, বলবো? তা বলি কি, তুমি এখানেই থাকো, আমার কাছে। পূর্ণ আমার পেটের ছেলের মতই ছিল। সে যে কতখানি এই বুক জুড়ে ছিল মা, এ বুক থেকে মোছবার নয়! তার বৌ তুমি। তোমায় আমি ফেলতে পারব না।—কোথায় যাবে, একা, ঐ একরত্তি ওঁড়োটুকুকে নিয়ে! জানি তো সব কথা মা। এখানে আমার কাছেই থাকো। আমার যদি পেট চলে, তোমাদেরো চলে যাবে। আমার সব গেছে, আছে শুধু ঐ নালুটা—ভাইপো। ঐটেকে নিয়েই আবার খালি হাটে পুঁটলি বাঁধছি—ও কি আমার বরাতে থাকবে, মনে কর, মা? কোনো ভরসা রাখি না।—তুমিও তেমনি আমার নালুর মতই। তোমায় আমি ছাড়তে পারব না। তোমার মধ্যেই আমার পূর্ণকে আমি পাব সারাক্ষণ! সে আমার পেটের ছেলের বাড় ছিল...আহা, বাছা রে—

ভগবতী আঁচলে চোখ মুছিলেন।

জল-ভরা দৃষ্টি মেলিয়া শৈল ভগবতীর পানে চাহিয়াছিল; এই আদরের সুরে, দরদের মাঝখানে নিজের কথা সে যেন ভুলিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, এত আঁধারের মধ্যেও আলো আছে পৃথিবীতে,—সব আলো নিবিয়া যায় নাই তবে!

ভগবতী বলিলেন,—আমার কাছে পূর্ণর অনেকগুলি টাকা আছে। সুদে খাটাচ্ছিলুম—সেটা খাটুক! বাড়বে,—এর পর বাবলার দরকার হবে।

শৈল অবাক হইয়া গেল এই সন্তানহীনা, আত্মীয়হীনা নারীর কথা শুনিয়া। ভগবানের রাজ্য তা হইলে মমতা একেবারে লোপ পায় নাই! এই যে একটু আগে সে ভাবিয়াছিল, এটা অকরুণ বিধাতার হাতে গড়া নির্ম্মমতার রাজ্য—বিধাতাই যেখানে তার প্রতি বিমুখ, মানুষ সেখানে—

কিন্তু না, সে ভগবতীকে দেখে নাই, জানিতও না, তাই ও কথা ভাবিয়াছিল। ভগবতী কিন্তু...ভগবতীই বটে! বিস্ময়-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে নির্ব্বাক হইয়া সে ভগবতীর পানে চাহিয়া রহিল। চোখের কোণে জল শুকাইয়া সেখানে একটা কালো দাগ আঁকা পড়িয়া রহিল।

ভগবতী আবার বলিলেন,—আমার তো ঘরগুলো ভাড়া খাটছে তাছাড়া কিছু সুদও পাই—তাতে কটা পেট আর চলবে না? বলিয়া দরদ-ভরা দৃষ্টিতে শৈলর পানে চাহিলেন।

শৈল কোন কথা বলিতে পারিল না। এত বড় দুঃখ-শোকের মধ্যেও এ-সব তুচ্ছ কথা বলা চলে, হায়রে,—

অদৃষ্টের এ কি দারুণ পরিহাস! এ-সব চিন্তা এ সব আলোচনা,—যে গেল, তার কথা ছাড়িয়া নিজের ঘর সাজাইবার এ চেষ্টা...হায়রে মানুষ!

ভগবতী শৈলকে একেবারে নির্ব্বাক দেখিয়া ভাবিলেন বুঝি সে কুণ্ঠিত হইতেছে; তাই আবার বলিলেন,—তাছাড়া মা, আমারো স্বার্থ একটু আছে তো। আমার রোগ আছে, ভোগ আছে—বুড়ো মানুষ—সে সময় আমার সেবা করে কে! তা করবি না মা, তুই···?

এতখানি স্নেহের এ সুমধুর আবেদন—এ কি ঠেলার সাধ্য আছে! শোক ভুলিয়া দুঃখ ভুলিয়া, শৈল ভগবতীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল,—বলিল,—মা, তোমায় মা বলেই জেনেছি। যখন দেখিনি, তখন থেকেও ভগবতীর মতই তোমায় মেনেছি! তুমি আমার মা। তুমি যা বলবে, যা করবে, তাই হবে মা। আমি তো নিরাশ্রয়, আমার কে আছে—কার কাছে দাঁড়াব মা, ঐ গুঁড়োটুকু নিয়ে! তুমি আমায় আশ্রয় দিতে চাইছ—আমি আবার তা নেব না!

কথা আর শেষ হইল না। শৈলর দুই চোখে আবার সাগর ঠেলিয়া উঠিল—সে আর বাঁধা থাকে না, নিষেধ মানে না—দুই চোখে যেন বাণ ডাকিয়াছে! এত জলও ছিল চোখে।

শৈল এখানেই রহিয়া গেল। বাবলা, বাবলাই তার দুই পায়ে শিকল টানিয়া দিয়াছে, নহিলে তার প্রাণ যে চায়, কোথায় স্বামী—তাঁর পায়ে উধাও হইয়া যাইতে! শুধু বাবলা, এই এতটুকু স্মৃতি...শৈল কি করিবে? সে কান্ত নিরুপায়!

... ...

সেদিন কোর্টে সেই মোটর-ড্রাইভারটার মকর্দ্দমার রায় স্থির হইবে। কৈলাস, ঘনশ্যাম প্রভৃতি সকলেই পুলিশ কোর্টে গিয়াছিল। তারা ফিরিল অপরাহ্নে। ফিরিয়া খবর দিল, ড্রাইভারটার ছ'মাস জেল হইয়াছে, আর তিনশো টাকা জরিমানা। জরিমানার টাকা পূর্ণর স্ত্রী পাইবে।

শুনিয়া শৈল শিহরিয়া উঠিল। এত-বড় শোক—তার দাম লইতে হইবে! না, না—

ভগবতী বলিলেন [illegible]...

শৈল বাধা দিয়া বলিল,—না মা, ও টাকা ছুঁয়ো না। তাঁর বুকের পাঁজরা [illegible] টাকা [illegible]—না না, তা তুমি ছুঁতে পাবে না [illegible] দুই চোখে জল [illegible] পড়িল।.. ঐ টাকা হাতে [illegible] মাথা ..উঃ!

ভগবতী দেবী বলিলেন, [illegible] দাম তিনশো টাকা,—আর [illegible] বিচার বটে! তার ফাঁসি [illegible]

ফাঁসি—! না, না! [illegible] আছে হয়তো! যে বেদনা [illegible] আর-একজনকে দিবে!··· [illegible] কি শৈলর মত [illegible] আবার? তবে—

সন্ধ্যার অন্ধকারে শৈল [illegible] ডাকওয়ালা খানিক আগে একখানা চিঠি [illegible] গিয়াছে। গৌরীর চিঠি। গৌরী লিখিয়াছে,—

ভাই দিদি, এখানে এসে অবধি [illegible] লিখতে পারি নি—কিছু মনে ক[illegible] আমার নয় লিখতে দেরী হলো,—তুমি [illegible] দাওনি আমাকে, আগে! তাছাড়া এ [illegible] ত—দিনরাত্রি কাছে কাছে থাকতে [illegible] বাড়ী থাকেন সর্ব্বক্ষণ—একটু ফাঁক নেই। [illegible] করে ভাই! [illegible] আছে, পিসিমা আছে—ওঁদের [illegible] পুরুষ মানুষ—মার কাছে পিসিমার কাছে তো আর বসতে হয় না ওঁকে! তাঁরা কি ভাবেন, বল তো!

তোমরা কেমন আছ? সব গোছানো হলো? তোমরা স্বামী স্ত্রী, দুজনে বেশ আছ, না? তোমাদের সুখের সংবাদ সব লিখো ভাই! শুনতে সাধ হয় ভারী। বেশ ছুটিতে আছ! তোমার তো লজ্জা করবার কারণ নেই—মাও নেই, পিসিমাও নেই, শুধু দুজনে—। বেশ একলা-একলা,—না ভাই?

আমি এঁকে বলেছি, একদিন আমায় তোমার ওখানে নিয়ে যাবার জন্যে। তা বলেছেন, নিয়ে যাব। বিউটিবন,

চিড়িয়াখানা, এই সব দেখিয়ে আনবেন, বলছিলেন। মা পিসিমাও কালীঘাটে যাবে। যাবার আগে চিঠি দেব। তোমার ওখানেই উঠবে গিয়ে। তুমি দিদি, ছোট বোনকে দুদিন কি থাকতে দেবে না? তবে সত্যি কথা ভাই, আমার তো মিউজিয়ম দেখবার জন্যে যাওয়া নয় —আমি চাই তোমাদের দুটীকে দেখতে। এমন সাধ হয়!

আমার ভালবাসা নিও। বাবলা-ধনকে অনেকগুলো চুমু দিও।

তোমার
গৌরী-বোনটি।

শৈলর চোখের সামনে সেই হাস্যময়ী কৌতুকময়ী বালিকার ছবি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিল - তার হাসি, তার ... ফুলের গন্ধের মত ভাসিয়া আসিল।

চিঠিখানা পড়িয়া অবধি তার বুক হু-হু করিতেছে! এ ... বাঁধন আবার! সে মনে করিয়াছিল, তার ওদিককার ... ছ, তার চিহ্নও নাই, স্মৃতিও নাই, ... লোকে প্রাণহীন জীবন বহিয়া ... খন দেখে, তা তো নয়! ওদিক ... জানো।

... এখানে নয়, এখানে নয় বোন্! আমার কাছেও এসিস্ নে! আমার নিশ্বাসে বিষ আছে! তার চেয়ে দূরেই থাকো! ভগবানের কাছে নিশিদিন প্রার্থনা করি, সুখে থাকো বোন, তোমার ঐ ঘরটিতে, স্বামীর প্রেম বুকে ধরিয়া নিশ্চিন্ত আরামে থাকো, মিলনে নিবিড় হইয়া থাকো! আমার যে কি হইয়াছে, কেমন আছি, তা আর জানিয়া কাজ নাই! এত বড় দুঃখও মানুষকে সহিতে হয়, এ চিন্তাও না তোমার মনে প্রবেশ করিতে পারে!

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চোখে অশ্রু বহিতেছিল। এমন সময় ভগবতী আসিয়া বলিলেন,—এই ধর বৌমা, তোমার ছেলে ভারী কাঁদছে—। বোধ হয়, ক্ষিদে পেয়েছে, মা। ধর দিকিন্ একটু - আমি দুধটুকু গরম করে নিয়ে আসি।

শৈল কলের পুতুলের মতই উঠিয়া বসিয়া বাব্লাকে কোলে লইল। ভগবতী বাহিরে চলিয়া গেলেন। শৈল বাব্লার পানে চাহিয়া উদাসভাবে বসিয়া রহিল - কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাব্লা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! শৈল তার মুখের পানে চাহিয়া ভাবিল, আহা, অবোলা বেচারা জীব! জানেও না, তার কি সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! ওরে দুর্ব্বল, ওরে ভোলা... ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কল্পনা

... বাতায়নে ...।

... এসে পড়েনি কিন্তু রাত্রি তার ... ভয়ে কেঁপে উঠছিল। সে ভয়ের শীতল বাতাসের পরশ আমার গায়ে লাগছিল।

রাতের কুয়াশার ওড়না তখনও বাতাসের মুখে উড়ে যায়নি। সে একটা স্বপ্ন-জাল দিয়ে কোন এক অজানা গোপন রহস্যকে আগলে বসেছিল।

আমার মনে হল,আমি কবি—আমি বাঁধব উষার লজ্জাকে আমার কবিতার জালে! আমার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠল আমার প্রাণের ব্যথার কথা, মানুষের এই অকৃতজ্ঞতা। আমি ভাবলুম,আমি শিল্পী—আমি আঁকব ঐ বর্ণবিহীন বিচিত্রতা! কিন্তু আমার তুলির ডগায় রঙে রঙে ফুটে উঠল বিশ্বের ব্যথা, মানুষের কাঁদন! শেষে আমি ভাবলুম,আমি প্রেমিক। আমি নারীর মুখে ফুটিয়ে তুলব উষার রং আর লজ্জা। আমার প্রাণের শুকনো বালির চড়া বিলীন করে কলরোলে নূতন সঙ্গীতে নারীর প্রেমের জোয়ার বইল। কিন্তু হায়, সে ধারা যে শুধু কুমীরে ভরা। অশোকের মত রাঙা সিরাজীর মত চাঙ্গা আমার প্রেম আমার বুকের তলাই ভরে রইল—মুখে শুধু ফুটল একটা দীর্ঘশ্বাস!

শ্রীঅশোক চন্দ্র।

বাংলার শিশু-সাহিত্যের ওস্তাদ লেখক বিখ্যাত আর্টিষ্ট শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় চৌধুরী আর ইহলোকে নাই। সুকুমার উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রায় আড়াই বৎসর কাল তিনি কালাজ্বরে ভুগিতেছিলেন— মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হইয়াছিল ৩৭ বৎসর মাত্র।

স্কুল কলেজে সুকুমার চরিত্রগুণে সকলের স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। সসম্মানে বি-এস্-সি পাশ করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি লাভ করেন ও বিলাত যান। সেখানে ম্যাঞ্চেষ্টারে ফটোগ্রাফি, ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত নানা কায়দা-কানুন, ও ব্লক তৈয়ারী শিখিয়া আসেন। তাঁর পিতা ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় বাঙলা দেশে হাফটোন ব্লকে প্রথম বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। সুকুমার দেশে ফিরিয়া হাফটোন ব্লকে সোনার রঙ ফলান্। শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর নানা প্রবন্ধ বিলাতের বিখ্যাত পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে যশস্বী করিয়া তোলে এবং তিনি রয়েল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন্।

ব্লক করা, ছবি আঁকা ছাড়া লেখায় ও তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ হাল্কা ছন্দে অত্যন্ত হাল্কাভাবে যা তা লইয়া কবিতা লেখার বড় অল্প প্রতিভার কাজ না। এই রকম কবিতা লেখায় সুকুমার সিদ্ধান্ত ছিলেন—এ রকম লেখায় তাঁর আর একটি জুড়ি ছিল না। তাঁর সম্পাদিত শিশু-পাঠ্য 'সন্দেশে' হাসি ভরা তাঁর কবিতার রাশি হীরার কুচির মতই ছড়ানো আছে। এ রকম কবিতা এক তাঁর বই বাহির হইয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে তিনিই এ কবিতার আমদানি করেন। সেই কবিতাগুলি। "আবোল-তাবোল" নামে গুচ্ছকারে সংপ্রতি সংগৃহীত হইয়াছে।

এই দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়াও তিনি তাঁর শিল্পচর্চ্চা ছাড়েন নাই—ইহার মধ্যে তিনি ছবি আঁকিয়াছেন, সন্দেশ সম্পাদন করিয়াছেন। ছেলেমেয়েদের জন্য কত রচনাই না লিখিয়াছেন! এ-সব ছাড়া অভিনয় কলাতেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসীম গানে ও হাস্য-কৌতুকের অভিনয়ে বড় বড় মজলিশ তিনি মুগ্ধ রাখিতেন।

স্বর্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরী

অমায়িক চরিত্র। দরদী [illegible] লিখিয়ে—সুকুমার রায়কে [illegible] সাহিত্যের ও সমাজের যে [illegible] হইবার নয়!

ঘর ও বাহির

ঘর-সংসার

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাব অনুসারে বেঙ্গল গবর্মেণ্ট গত ১৯২১ সালের জুন মাসে বাঙ্গালায় কচুরী পানার বিস্তৃতি সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উহার উচ্ছেদ সাধনের উপায় স্থির করিবার [illegible] কমিটি নিযুক্ত করেন। সম্প্রতি উক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কচুরী পানা ধ্বংসের উপায় সম্বন্ধে কমিটির সদস্যগণ সকলে একমত হইতে পারেন নাই, তবে সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, কচুরী পানার জীবন ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উহার বিস্তৃতি বন্ধ এবং উহাকে কাজে লাগানোর উপায় স্থির করা আবশ্যক। এই সম্বন্ধে আরও তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কমিটি বলিয়াছেন, সকলে যেন কচুরীপানাসমূহ জড় করিয়া আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দেন। কমিটির [illegible] ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] সহিত জানাইতেছেন [illegible] অনুরূপ কার্য্য আরম্ভ করা [illegible] ক জিনিসের দ্বারা কচুরী [illegible] টির প্রস্তাব মত ইহা সংগ্রহ [illegible] ট আরও বলেন যে, তাঁহারা ঐ [illegible] ন এবং ব্রহ্মদেশে ১৯১৭ সালে [illegible] রূপ হইয়াছে, জানিবার জন্য ব্রহ্ম [illegible] করিতেছেন।

[illegible] দীয় গবর্মেণ্টের সহিত একযোগে [illegible] ক্ষণে এই সম্বন্ধে যে উপায় স্থির [illegible] করিবার জন্য জন-সাধারণকে [illegible] ইতিপূর্ব্বে বহু লোকাল বোর্ড, [illegible] মিউনিসিপালিটী, [illegible] বেঙ্গল রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কার্য্য [illegible] সমবেত চেষ্টার অভাবে তাহা বিশেষ ফলোপধায়ক হয় নাই। [illegible] গবর্মেণ্ট আশা করেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলের সাহায্য পাইবেন।

—ত্রিপুরা হিতৈষী।

কলিকাতার রাস্তায় ফেরিওয়ালার অভাব নাই। কত রকমের [illegible] তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কিন্তু এই ফেরিওয়ালাদের মধ্যেও বাঙ্গালী চোখে পড়ে না। ট্রামে উঠিয়া যাহারা জার্ম্মাণীর ছুরি [illegible] খেলনা ফেরি করে, যাহারা "টাকায় পাঁচটো" রুমাল ফেরি করে, তাহারা কেহ বাঙ্গালী নহে। বাঙ্গালী আম কিনিয়া খায়, কিন্তু ফেরি করে না। [illegible] সব। অথচ এই ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইতে হয় না। বাঙ্গালী এই ব্যবসায় ধরে না কেন? জীবন-যাত্রার প্রতি-পদক্ষেপে হটিয়া আসিয়া বাঙ্গালী কোন্ প্রশস্ত পথে মরণ-যাত্রা করিতেছে, কে জানে? অর্থাগমের নানা বিচিত্র পথ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী কেমন করিয়া যে বাঁচিবে, বুঝি না।

—স্বরাজ।

মনুষ্যত্ব

নদীয়া বাবিরাডাঙ্গা হইতে জনৈক পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন—গত ১৫ই আষাঢ় সেটেলমেণ্টের একজন আমীন অপরাহ্ন বাড়ী হইতে গ্রামান্তরে যাইবার সময় পথে এক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। একজন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বালক অসীম সাহসে অস্ত্রের সাহায্যে ভদ্রলোককে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করে।

— মোসলেম জগৎ।

পরলোক-গত মিঃ ম্যাডান যে কেবল বিখ্যাত ও ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু তাঁহাকে দানবীরও বলা যাইতে পারে। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। তাঁহার দানের পরিচয় দেশবাসী অনেকেই অবগত আছেন। প্রত্যেক মাসের [illegible] রবিবারে যাঁহারা তাঁহার বাস-ভবনের নিকট দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, দলেদলে আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া মাসিক ভাতা গ্রহণ করিতেছে। কত নিরাশ্রয় বালক-বালিকা ও অনাথা অসহায়া বিধবা যে তাঁহার প্রদত্ত সাহায্যে জীবন যাপন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এমন দাতব্য প্রতিষ্ঠান খুব কমই আছে, যেখানে তিনি কিছু না কিছু সাহায্য করেন নাই। গত ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সৌজন্যে ভারতের নারী সাহায্য কল্পে ম্যাডান থিয়েটারে এক অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এইভাবে তিনি নারীদিগের সাহায্য-কল্পে ১০,০০০ [illegible] প্রদান করিয়াছেন। দরিদ্র ও মধ্য অবস্থার পার্শী সম্প্রদায় যাহাতে অল্প ভাড়ায় কলিকাতায় অবস্থান করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে পার্শী সমাজের হস্তে এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার স্বজাতীয়দিগের জন্য তিনি দার্জ্জিলিংয়ে অনেকখানি জমি ক্রয় করিয়াছেন।

—হিন্দুস্থান।

রাজনীতি

গত ১০ই জুলাই তারিখে 'সুপী' এই স্বাক্ষরে কোন পত্রে একখানি বাহির হইয়াছে। লেখক তাহাতে নাভা-পাতিয়ালার বিরোধ সম্পর্কে য়াছেন—নাভা পাতিয়ালার সম্বন্ধে গতকল্য এসোসিয়েটেড প্রেসের খবরটি বাহির হইয়াছে, আমি তাহা পড়িলাম। ঐ খবরে ারান্তরে বলা হইয়াছে, গুজব যে নাভার মহারাজাই হারিবেন। যদি কথাই ঠিক হয়, তবে 'অকালী-তু-পরদেশী' এই পত্রখানিকে ব্যবস্থা বলিতে হয়। গদীতে আরোহণ করিবার পর হইতে নাভার রাজা যে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, সেরূপ স্বাধীনতা খুব কম মহারাজাই দেখাইতে পারেন একবার তিনি ডেন্টকে নজরানা পাঠাইতে অস্বীকৃত হন। এজন্য সরকারী শ ও গিয়াছিল, কিন্তু তাহা তিনি গ্রাহ্য করা সঙ্গত মনে করেন নাই। রাজা সাহেব অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, তিনি শিখ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। লিদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত প্রিয়, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য শিখেরা ই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সর্ব্বোপরি সুনজরে তিনি খুব ...ন, আমি যাহা শুনিয়াছি, ঠিক কি বলিতে পারি না, কোন সরকারী আমলার মনেও নাকি তাঁহার উপর তেমন ভাল ভাব না।

'সিভিল' এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রে য়াছেন—নাভার মহারাজা গদী ছাড়িলেও খেতাব তোপদাগার এ সব থাকাতে রাষ্ট্রের সহিত তাঁহার সম্পর্ক এখনও রহিল, ইহাই র বিষয়। বিদ্যা-বুদ্ধিতে, চরিত্রবলে সৌজন্যে, সর্ব্ববিষয়েই ন একজন জন-নায়ক। গদীতে বসার পর হইতে গদীত্যাগ সময় পর্য্যন্ত ব্রিটিশ পররাষ্ট্রবিভাগের সহিত তাঁহার মত-বিরোধ আসিতেছিল। আমি আশা করি মহারাজা তাঁহার অবসর পররাষ্ট্র বিভাগের স্বেচ্ছাতন্ত্রের ইতিহাস লিখিবেন, এবং ভারতের রাজারা কেমন স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন, আমাদিগকে একটু নমুনা দেখাইবেন। রাজদ্রোহ-সভা-বন্ধ আইন পাশ সময় ইনি মহামতি গোখলের সমর্থন করিয়া গবর্ণমেণ্টের ভোট দিয়াছিলেন। এই ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের ভগিনীপতি। এই মহেন্দ্রপ্রতাপেরই সেদিন সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। • •

াতিয়ালার সঙ্গে বিরোধ, মাত্র মহারাজকে গদীচ্যুত করিবার অজুহাত মাত্র, অনেক শিখের মনে একটা ধারণাও জন্মিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর, এ সম্বন্ধে লোকের মনে নানারূপ সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি হওয়া একান্তই বিক। ার ভিতরের কথা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ না করিলে, দেশের লোকের মনের সে সন্দেহ-সংশয়ের ভাব কাটিবে না, বরং নানা সূত্রে নানা কথা বাহির হইতে থাকিবে এবং তাহাতে ঐ সন্দেহ-সংশয়ই বাড়িয়া উঠিবে। আমরা আশা করি, সরকার বিবরটির সকল কথা দেশের লোকের কাছে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিবেন। এ সম্বন্ধে সরকারের যে ইস্তাহার ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই এ কথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিব। —হিন্দুস্থান।

লোকসেবা

ঢাকা জিলাবোর্ডের অধিবেশনে এ জিলায় ছয়টী হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেন্‌সারী স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত এবং অচিরে স্থান-নির্ণয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বহুপূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালী যেরূপ উপকারী ও অত্যল্পব্যয়সাধ্য, তাহাতে এই দরিদ্র দেশে ব্যয়বহুল এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপনের পরিবর্ত্তে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে ওলাউঠাই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক ও সংক্রামক ব্যাধি; এই ভীষণ রোগে, এমন কি যে কোন প্রকার উদরাময়ে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা একরূপ নিরর্থক প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই একমাত্র ফলপ্রদ বলিয়া অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কঠিন রোগেও হোমিওপ্যাথী এলোপ্যাথির সহিত প্রতিযোগিতায় পরাভূত হয় না। এ অবস্থায় জিলাবোর্ড হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করিয়া যে দেশের বিশেষ কল্যাণ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ কথা অবাধে বলা যাইতে পারে।

—ঢাকা প্রকাশ।

জন-গণ-মন

বাঙ্গালায় যতদিন [illegible] নব বীরজাতি গড়িয়া উঠিবে ততদিন বোধ হয় এ দুঃখ আমাদের ঘাড় পাতিয়াই লইতে হইবে। নিজেদের মাতা ভগ্নীর সম্মান রক্ষার ভার সরকারের হাতে সমর্পণ করিয়া আমরা এমনই অসহায় হইয়া পড়িয়াছি যে সামান্য কয়েকজন গুণ্ডা আসিয়া ঘরের ভিতর হইতে হিন্দুর কুলবধূকে বাহির করিয়া লইয়া নির্য্যাতন করিতে সক্ষম হয়। আজ রংপুরের যে ঘটনা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি তাহা তো দেশে নূতনও নয় বিরলও নয় যে, মনকে কিছুমাত্র প্রবোধ দিতে পারি। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান গুণ্ডার হাতে কত পরিবারে যে হাহাকার উঠিয়াছে তাহা বলা যায় না। ঘরের কাছে কুমারখালীর যে দুই একটা ঘটনা আমাদের কাণে আসিয়াছে তাহাতে লজ্জায় ক্ষোভে আত্মহারা হইতে হয়। সরকারের আইনে দুর্বৃত্তের সাজা হইতে পারে বটে কিন্তু হারাণো ইজ্জত তো ফিরিবে না! কোটী কোটী

টাকা পুলিশ ও সৈন্য বিভাগের জন্য খরচ করিয়াও, এত রেল ষ্টীমার টেলিগ্রাফের তার পাতিয়াও যখন সরকার বাহাদুর ভারত নারীর সম্মানকে নিরাপদ করিতে পারেন নাই, তখন কোন্ ভরসায় আমরা মাতা ভগ্নীর সম্মান রক্ষার ভার তাঁদের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব? তাই বাঙ্গালী যুবক তুমি না রবিবাবুর সেই "তরুণ", আর অরবিন্দের মতে সেই অনাগত দেব জাতির অগ্রদূত, যারা জগতে গ'ড়ে পিটে ঠিক করে দিয়ে যাবে। লাঞ্ছিতা জননীর আর্ত্ত ক্রন্দন কি তোমাকে স্পর্শ করিতেছে না? কত দ্রুত পলকের পর পলক অতীতে মিলাইতেছে! এস, আর কালবিলম্ব না করিয়া সাহসী ত্যাগী উজ্জ্বল চরিত্র কর্ম্মকুশল সন্তান-সঙ্ঘ গঠন কর। মাতৃ-অপমান স'য়ো না,—তোমার সকল আশা নিরাশায় আঁধারে ডুবিবে। —জাগরণ।

——

বাঙ্গালীর পর-নির্ভরতা ঘুচাইতে এক বাঙ্গালীই পারে, অন্যে নহে। কিন্তু সে বাঙ্গালী কোথায়? বাঙ্গালী-সমাজ ভারতের অন্য জাতির ন্যায় সংহতি-শক্তিসম্পন্ন নহে। তাহার উপর দরিদ্র জাতির যাহা ঘটিয়া থাকে, অর্থনীতি সমস্যায় বাঙ্গালী জাতি ঈর্ষাবিদ্বেষাদি বিষে জর্জ্জরিত, জীবন সংগ্রামে তাহারা সকলের নিকটই হঠিয়া আসিতেছে। সুতরাং বাঙ্গালীর পরনির্ভরতা দূর করিতে হইলে ইহাদের অর্থনীতি সমস্যার একটা মীমাংসা করিতে হইবে। ইহা প্রধানতঃ শিক্ষা প্রণালীর উপর যেমন কতক পরিমাণে নির্ভর করে, সেইরূপ সমাজের ধনী ও জমীদার সম্প্রদায়েরও এ বিষয়ে দায়িত্ব কম নহে। বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর জীবন-সমস্যা মীমাংসার উপায় করিয়া দিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে বাঙ্গালীকে ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি কার্য্যে সম্যক আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে; "রুটী রোজগারের" পথ বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালীকেই সৃষ্টি করিতে হইবে। শুধু অন্য-প্রদেশাগত লোকদিগকে দোষ দিলেই চলিবে না, সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোককে স্ব স্ব দায়িত্ব স্বীকার করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। "পয়সা সস্তার" দিক দিয়া দেখিলে চলিবে না, দেখিতে হইবে বাঙ্গালীর পয়সা বাঙ্গালীর ঘরেই যাহাতে যায়। —আনন্দবাজার পত্রিকা।

——

বিবিধ

বেনারসের ৩০শে জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, গত ২৮শে জুন তারিখে চুনার হইতে বেনারস পর্য্যন্ত এক সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। আঠারো জন ব্যক্তি এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেন; তাঁহাদের বয়স ১২ হইতে পঁচিশের মধ্যে এবং মাত্র একজন ভিন্ন সকলেই বাঙালী। চুনার হইতে বেনারস পনের মাইল দূরে। কলিকাতা লাইফ সেভিং সোসাইটির সভ্য শ্রীযুত আশুতোষ দত্ত প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। তিনি বেলা ১-১০ মিনিটে সাঁতার আরম্ভ ক[রিয়া] সন্ধ্যা ৭-১[?] মিনিটের সময় বেনারসের কেদার ঘাটে পৌঁছিয়া[ছেন।] কলিকাতার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় হইয়াছেন এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় হইয়াছেন। যার যে এই প্রতিযোগিতা প্রতি বৎসরেই করা হইবে।

বাঙ্গালীকে এই সব সাহসিকতার কাজে যোগদান করিতে [দেখিয়া] মন খুসী হইয়া ওঠে। কেবলি ঘরের কোণায় বসিয়া বাঙ্গালী[র] পায়ে খিল ধরিয়া গিয়াছে। এই খিল যাঁহারা খসাইতেছেন, বাঙলাকে নব জীবন দান করিতেছেন। আজ না বুঝুক, [কিন্তু] বাঙ্গালী ইহাদের কদর বুঝিবে নিশ্চয়। —[illegible]

——

দি 'উইমেন টুডে' নামক সংবাদ-পত্রে আমেরিকার নানা শ্রেষ্ঠ বারোজন নারীর নাম বাহির হইয়াছে:—

জেন এডাম্স		লোকহিত
সেসিলিয়া বো	...	চিত্রবিদ্যা
অ্যানি জাম্প ক্যানন	...	জ্যোতির্ব্বিদ্যা
ক্যারি চাপম্যান কাট	...	রাজনীতি
অ্যানা বটস্‌ফোর্ড কমস্টক	...	প্রাণীবিদ্যা
মিনি ম্যাডার্ণ ফিস্ক	...	রঙ্গমঞ্চ
লুই হোমার	...	সঙ্গীত
জুলিয়া লেথ্রপ	...	শিশু মঙ্গল
ফ্লোরেন্স রেনা স্যেবিন	...	অস্থিবিদ্যা
ক্যারে টমাস	...	শিক্ষা
মার্থা ভ্যান রেনসেলার	...	গার্হস্থ্য অর্থনীতি
হোয়ার্টন	...	সাহিত্য

—স্ব

——

নারী প্রসঙ্গ

গত ২৬শে জুন কুমারী [illegible] নাম্নী জনৈক বাঙ্গালী মহিলা কৃষ[্ণনগর] গ সন্ধ্যার ট্রেণে যাইতেছিলেন। নৈহাটী ষ্টেশন পরি[ত্যাগ] করিবার পর তাঁহার কামরায় যে দুইটী গোরা ছিল তাহারা [তাঁহার] চশমা খুলিয়া লয় এবং মহিলার ব্যাগ লইয়া পলাইবার চেষ্টা [করে।] মহিলাটী বিপদসূচক শিকল ধরিয়া টান দেওয়া মাত্র গোরা দুইটী [গাড়ী] হইতে লাফাইয়া পড়ে। মহিলাটীও তাহাদের পিছু পিছু গাড়ী[হইতে] নামিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট আদ[ালতে] গোরা দুইটীর বিচার হইয়াছে। প্রকাশ যে আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উপস্থিত করা হইছে। —আনন্দবাজার পত্রি[কা]

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।